সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলি

(ক) আধুনিক বাংলা উপন্যাস
(কল্লোলযুগ ও পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিকা ও পাশ্চাত্য উপন্যাসের আধুনিকতার প্রবণতাগুলির বিশ্লেষণ)

(খ) সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য:
সমাজচেতনা ও মূল্যায়ন
(সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের সমালোচনামূলক ইতিহাস অনার্স ও তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে)

(গ) সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা
(স্নাতকোত্তর ও উচ্চতর পর্যায়ের তথা গবেষণার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে)

(ঘ) ভবিষ্যতের কবিতা
(শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ The Future Poetry-র প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ অনুবাদটি বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত)

সুমঙ্গলা শ'র
কিছু গল্প কিছু রম্যরচনা
'এই করেছ ভালো'
(পুস্তক বিপণি)

ISBN 81-85471-12-6

ড. রামেশ্বর শ': জন্ম ১৯৩৬। শিক্ষা : স্কুল ফাইন্যাল (লেটার মার্ক্স সহ) এবং আই. এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলায় অনার্স ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম. এ। পরে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৭৩% নম্বর পেয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে (ভাষাবিজ্ঞান) এম. এ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার, স্বর্ণপদক এবং খেন্তমণি নগেন্দ্রলাল রৌপ্যপদক প্রাপ্তি। ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জার্মান ভাষায় সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা : যথাক্রমে ৮৫% ও ৮০% নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম। শ্রীঅরবিন্দের দর্শন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নিবন্ধ রচনার জন্যে Cultural Integration Fellowship, San Francisco, U.S.A ও শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির থেকে স্বর্ণপদক লাভ। ধ্বনিতত্ত্ব (A comparative Study in the Phonological Systems of Bengali and German) বিষয়ে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ. ডি ডিগ্রি। বিখ্যাত Central Institute of Indian Languages (Ministry of Education, Govt. of India) আয়োজিত International Institute In Phonetics- এ অংশগ্রহণ ও ধ্বনিতরঙ্গ (Acountics) বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি ভাষাবিদ। কর্ম: কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার প্রফেসর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে গেস্ট লেক্চারার। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস্ ও কমার্স ফ্যাকাল্টির প্রাক্তন ডিন ও বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান। এসিয়াটিক সোসাইটির অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের প্রাক্তন সদস্য। শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি ও শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের সদস্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান' প্রকল্পের বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর সদস্য। একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা। ড. শ' একজন কৃতী ছাত্র এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক এবং সর্বোপরি তাঁর প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তাঁর উপলব্ধি-'আমি তোমাদেরই লোক, আর কিছু নয়, এই হোক শেষ পরিচয়।'

সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান

ও

বাংলা ভাষা

হলমার্ক দেখে নেবেন
সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা
কেনার সময়।

ডঃ রামেশ্বর শ'

এম. এ. : তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (ভাষাবিজ্ঞান) ও বাংলা, পি-এইচ্ ডি.,
ডিপ্. ইন্ জার্মান

(বিশ্ববিদ্যালয়-স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত)

প্রাক্তন প্রফেসর্ : বাংলা বিভাগ : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাক্তন গেস্ট্-লেক্চারার : বাংলা বিভাগ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাক্তন ডীন্ : ফ্যাকাল্টী অফ্ আর্ট্স্ অ্যাণ্ড কমার্স্ : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান : বাংলা বিভাগ : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম প্রকাশ
প্রথম খণ্ড : ৮ই ফাল্গুন, ১৩৯০
দ্বিতীয় খণ্ড : ৮ই ফাল্গুন, ১৩৯৪
অখণ্ড : ৮ই ফাল্গুন, ১৩৯৪
দ্বিতীয় সংস্করণ
৩০শে শ্রাবণ, ১৩৯৯
তৃতীয় সংস্করণ :
৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৩
চতুর্থ সংস্করণ :
বৈশাখ, ১৪১৯

প্রকাশক
শ্রীমতী কুমকুম মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
এস. ঘোষ

মুদ্রক
বসু মুদ্রণ
কলকাতা-৭০০ ০০৪

ISBN 81-85471-12-6

মুল্য . ৩০০ টাকা

SĀDHĀRAṆ BHĀṢĀVIJÑĀN O BĀṄLĀ BHĀṢĀ

(General Linguistics and the Bengali Language)
Complete in one Vol.

by

Dr. Rameswar Shaw

M. A. : Comparative Philology (Linguistics) & Bengali, Ph. D.,
Dip. in Garman
(University Gold Medalist & Prizeman)
Ex-Professor of Bengali : University of Kalyani
Ex-Guest Lecturer in Bengali : University of Calcutta
Ex-Dean : Faculty of Arts and Commerce, University of Kalyani
Ex-Head : Dept. of Bengali : University of Kalyani.

First Published : Vol. I : the 21st. February, 1984
Vol. II : the 21st. February, 1988
Complete : the 21st. February, 1988
Second edition : the 15th. August, 1992
Third edition : the 24th. November, 1996
Fourth edition : April, 2012

Price : Rs. 300/-

ISBN 81-85471-12-6

Printed by : BASU MUDRAN
Kolkata 700 004

Published by : Smt. Kumkum Mahindar
PUSTAK BIPANI
27, Beniatola Lane
Kolkata 700 009 [India]

"This erring race of human beings dreams always of perfecting their environment by the machinery of government and society; but it is only by the perfection of the soul within that the outer environment can be perfected. What thou art within that outside thee thou shalt enjoy, no machinery can rescue thee from the Law of thy being."

Sri Aurobindo
(Thoughts and Aphorisms,
SABCL, 1972, Vol. 17. p. 120).

"...There is a sure method of distinguishing true intuition, true representation, from that which is inferior to it : the spiritual fact from the mechanical, passive, natural fact. Every true intuition or representation is also expression. That which dose not objectify itself in expression is not intuition or representation, but sensation and mere natural fact. The Spirit only intuites in making, forming, expressing."

Benedetto Croce
(Aesthetic, Rupa ed. Ch. I, p. 8).

আমার ভাষা-অনুশীলনের শিক্ষাগুরু

এবং

আমার ভাষাবিষয়ক গবেষণার নির্দেশক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানের

অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান

বহুভাষাবিদ্ অধ্যাপক প্রণবেশ সিংহরায় মহোদয়ের

করকমলে ভাষাবিষয়ক আমার এই গ্রন্থখানি

নিবেদন করি।

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

নীরস ও দুর্বোধ্য বিষয়কে আরো নীরস ও দুর্বোধ্য করে তোলার মধ্যেই অধ্যাপক-জীবনের সার্থকতা বা পাণ্ডিত্যের পরিচয়, একথা আমি বিশ্বাস করি না। আমার ছাত্রছাত্রীরা একথা জানে। আমার লেখাতেও আমি আমার অধ্যাপনার মূল নীতিই অনুসরণ করেছি। বিশ্ববিখ্যাত নন্দনতত্ত্ববিদ্ যে কথাটি শিল্পসৃষ্টি প্রসঙ্গে বলেছিলেন, সে কথাটি যে-কোনো বিষয়ে লেখা বা অধ্যাপনা প্রসঙ্গেও অনেকখানি প্রযোজ্য : লেখকের নিজের মনে কোনো বিষয়ের বোধ ও বোধি যদি স্বচ্ছ ও নিখুঁত হয় তবে তার প্রকাশ-রূপটিও হবে সহজ সুস্পষ্ট ; কিন্তু যখন নিজের বোধই অস্পষ্ট তখন প্রকাশ-রূপটি হবে অস্পষ্ট বাগ্‌জালে জটিল ও দুর্বোধ্য। বোধ ও প্রকাশক্ষমতা—মানব-ব্যক্তিত্বের দু'টি পৃথক্ দিক, একথা আমি জানি ; কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে একথা মানতেই হবে যে, প্রথমটিতে ফাঁক থাকলে দ্বিতীয়টিতেও ফাঁকি ছাড়া গতি নেই। ভাষাবিজ্ঞান বা ভাষাতত্ত্ব আমাদের ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের কাছে যে নীরস ও জটিল মনে হয়, দু'একটা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার একটা বড় কারণ হল ভাষাবিজ্ঞান অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ক্ষেত্রে এই ফাঁক ও ফাঁকি, যা আমাদের কৈশোর ও যৌবনের শিক্ষা-পর্বেরই অপুষ্ট মানসিকতার অপরিহার্য পরিণাম। আমাদের বোধ-বুদ্ধি-জ্ঞানের এই অপুষ্টির কারণটি আমাদের সর্বজন-স্বীকৃত শিক্ষাবিদ্ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই ব্যাখ্যা করেছেন—

'যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানব-জীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যক-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে

চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা, আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা, অর্থাৎ অত্যাবশ্যক, তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না।' (শিক্ষার হেরফের) —এই উক্তিতে ভাষাবিজ্ঞান-চর্চায় আমাদের শুধু জ্ঞানের অপুষ্টির কারণই নয়, ভাষাবিজ্ঞানে আমাদের ভীতি ও নিরানন্দের কারণও আমরা খুঁজে পাব। কারণটি উভয় ক্ষেত্রে একই। এই কারণটি হল আমরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিষয়টিকে 'যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ' করে রাখি, অর্থাৎ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির দিকে দৃষ্টি রেখে বই লিখি এবং পরীক্ষার প্রশ্নের দিকে দৃষ্টি রেখে পড়ি ও পড়াই। কিন্তু একথা আমরা বুঝি না যে, পাঠ্যসূচি আর পরীক্ষার কারাগারে অধ্যয়ন-অধ্যাপনাকে রুদ্ধ করে রাখলে মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হলে মনের গ্রহণ-ক্ষমতা ও ধারণ-ক্ষমতা নষ্ট হয় ; তখন মন ঐ অত্যাবশ্যক পরীক্ষার দায়টুকুও বহন করতে পারে না। একথা আমরা ভুলে যাই যে, ভাষাবিজ্ঞানও একটা বিজ্ঞান—এর একটি সামগ্রিক নীতি-পদ্ধতি আছে ; সেই সামগ্রিক নীতি-পদ্ধতির অন্তত মূল পরিচয়টুকু না জেনে শুধু বাংলা ভাষাতত্ত্ব অধিগত করতে গেলে আমাদের বিদ্যাবত্তায় ঐ ফাঁক ও ফাঁকি আসতে বাধ্য।

আমাদের ভাষাবিজ্ঞান-চর্চায় যাতে মূলীভূত কোনো ফাঁক ও ফাঁকি না থাকে, আমাদের বাংলা ভাষার তত্ত্ব যাতে ভাষাবিজ্ঞানের মূল নীতি-পদ্ধতির উপরে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সেদিকে দৃষ্টি রেখে বর্তমান গ্রন্থের পরিকল্পনা। তাই এই গ্রন্থে সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানের (General Linguistics) মূল সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করে তার আলোকে তুলনামূলক দৃষ্টিতে বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ সন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থের এই পরিকল্পনা থেকেই বোঝা যাবে বৈজ্ঞানিক পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা যেমন এখানে অন্বিষ্ট নয়,

তেমনি বাংলা ভাষাতত্ত্বের পূর্বালোচিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তিও উদ্দেশ্য নয়। তা ছাড়া আমি মনে করি বিভিন্ন প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা এবং বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ-চর্চার যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ইতিমধ্যে বিদেশী মনীষীরা ছাড়াও শুধু এদেশের মনীষীদের মধ্যে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন, অধ্যাপক ডঃ সত্যস্বরূপ মিশ্র এবং অধ্যাপক ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার সৃষ্টি করেছেন, তারপরে আর এক্ষেত্রে নতুন কিছু সংযোজনের অবকাশ বিশেষ নেই। সেইজন্যে ঐ বিষয়ের পুনরাবৃত্তির প্রচেষ্টা এখানে আমি করি নি। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের মূল নীতি এবং বাংলা ভাষার জন্ম ও ইতিহাসের মূল বিবর্তন-রেখাটুকু চিহ্নিত করার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন, শুধু ততটুকু প্রসঙ্গই এখানে আলোচনা করেছি ; বর্তমান গ্রন্থ-পাঠে ভাষাজিজ্ঞাসু পাঠক ভাষাবিজ্ঞানের মূল নীতি-পদ্ধতির জ্ঞান ও তার আলোকে বাংলা ভাষার বিশ্লেষণের দিগ্‌দর্শন লাভ করলে বাংলা ভাষার অধ্যয়ন সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে, আমার এই বিশ্বাস।

প্রাচীন ভারতবর্ষে ভাষাবিজ্ঞানের বিস্ময়কর সমৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল। দীর্ঘকাল পরে এখন আবার সর্বভারতে ভাষাবিজ্ঞান-চর্চায় নতুন প্রেরণা দেখা দিয়েছে। পাশ্চাত্য দেশেও ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষায় বর্তমানে ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা বিশেষ সমৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করেছে এবং আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের নিত্য নতুন তত্ত্ব সম্বলিত গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। স্বদেশী ও বিদেশী বহু মনীষীর গ্রন্থ পাঠে আমি উপকৃত হয়েছি। ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁদের গ্রন্থ থেকে কোনো-কোনো তথ্য গ্রহণ করেছি তাঁদের ঋণ আমি গ্রন্থ-মধ্যে যথাস্থানে স্বীকার করেছি এবং তথ্যসূত্র (reference) উল্লেখ করেছি। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রুফ সংশোধনে অনলস সহযোগিতা করেছেন সহধর্মিণী শ্রীমতী হেনা শ'। কিন্তু শাস্ত্রীয় নিয়মে তিনি যদি আমার সমস্ত পুণ্যের অর্ধেকের অধিকারিণী হন, তবে আধুনিক নিয়মে তিনি যোগ্যতা অনুসারে আমার সমস্ত কর্মের অর্ধেকের

নির্বাহিকাও বটে ; এই যুক্তিতে তাঁর 'অনলস পরিশ্রমে'র ফলশ্রুতিতে আমার শাস্ত্রীয় অধিকার থাকা উচিত। তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এই অধিকারকে ছোট করা উচিত নয়। কন্যা সুমঙ্গলা বয়সোচিত সহযোগিতা করে গ্রন্থ-রচনা ত্বরান্বিত করেছে।

পরিশেষে বক্তব্য, প্রকাশনার সুবিধার কথা ও পাঠকবর্গের ক্রয়-ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে বর্তমান গ্রন্থটিকে দুটি খণ্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। দুই খণ্ডের প্রথম খণ্ডটি আগেই প্রকাশ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় খণ্ডটিও যথাসময়ে প্রকাশ করা হল। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রিত করে একটি অখণ্ড সংস্করণও প্রকাশ করা হল। আরো একটি কথা। দ্রুত প্রকাশনার তাগিদে গ্রন্থশেষে নির্ঘণ্ট (index) দেওয়া সম্ভব হল না। তবে গ্রন্থে যে বিস্তৃত বিষয়-সূচি দেওয়া হল তাতে পাঠকবর্গের অনেকটা সহায়তা হবে।

বি ২/৪১, কল্যাণী
পিন ৭৪১২৩৫
৮ই ফাল্গুন, ১৩৯৪
২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮

রামেশ্বর শ'

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

আমার 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। অন্য লেখকের কয়েকটি পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও আমার এই বইটির প্রথম সংস্করণের আশাতীত চাহিদা থেকে প্রমাণিত হয় বিদগ্ধ পাঠক-সমাজ ভাষাতত্ত্বের পুরানো ধ্যানধারণা ছেড়ে নতুনতর আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি কি রকম আগ্রহী। তাঁরা আমার গ্রন্থকে যে ব্যাপক স্বীকৃতি দান করেছেন তার জন্যে আমি তাঁদের প্রতি যতটা কৃতজ্ঞ, তার চেয়ে বেশি আমি আনন্দিত এই দেখে যে তাঁরা গতানুগতিকতার সংকীর্ণ গণ্ডি ভেঙে তাঁদের মনীষা ও মানসিকতাকে নতুন দিগন্তের দিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং বৈজ্ঞানিকের খোলা মন নিয়ে বৈদিক কবির মতো বলেছেন— কল্যাণকর যেসব যজ্ঞ তা বিশ্বের চারিদিক থেকেই আসুক '—আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতঃ।' —ঋগ্বেদ, ১/৮৯/১

সাধারণ পাঠক-শিক্ষক-অধ্যাপক-ছাত্র-গবেষক ছাড়াও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি পত্রযোগে গ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁদের উচ্ছ্বসিত অভিমত জানিয়েছেন। দেশের বহু-প্রচলিত সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্রে এই গ্রন্থের যেসব সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে তা থেকেও গ্রন্থ সম্পর্কে পণ্ডিতবর্গের অনেক সপ্রশংস অভিমত জানা যায়। তাঁরা এইসব পত্র-পত্রিকায় ও চিঠিতে যে-সব পরিমার্জনামূলক ও সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন সেগুলি যথাসাধ্য যথাস্থানে অনুসরণের চেষ্টা করেছি। পরবর্তী কালেও কোনো আগ্রহী পাঠক তাঁর মতামত জানালে বা গ্রন্থের পরিবর্ধন ও পরিমার্জন বিষয়ে কোনো প্রস্তাব পাঠালে তা যথাসাধ্য বিবেচনা করে দেখবো।

এই গ্রন্থে যে-সব পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছি সেগুলি অধিকাংশই ভারত সরকারের নিযুক্ত Standing Commission for Scientific and Technical Terminology কর্তৃক নির্দিষ্ট ভাষাবিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা থেকে গৃহীত। অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ পূর্বাচার্যদের সৃষ্ট বহু-প্রচলিত পরিভাষা থেকে গ্রহণ করেছি। কিছু কিছু বাংলা পারিভাষিক শব্দ আমি নিজে সৃষ্টি করেছি, যেসব ক্ষেত্রে প্রাঞ্জলতা ও সহজবোধ্যতার দিকে সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিয়েছি।

এই দ্বিতীয় সংস্করণ মূলত পূর্ববর্তী অখণ্ড সংস্করণের পরিবর্তিত সংশোধিত রূপমাত্র। এই গ্রন্থে 'রোমীয় বর্ণমালা ও আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা' শীর্ষক ৮ম অধ্যায়ে ধ্বনিভিত্তিক লিপ্যন্তরণ (Phonetic Transcription) সম্পর্কে পূর্ববৎ আলোচনা আছে। দ্বিতীয় সংস্করণে এ বিষয়ে আরো দৃষ্টান্ত দিয়ে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা ছিল। এছাড়া ভাষাবিজ্ঞানের কয়েকটি আধুনিক ধারা—যেমন অতি সাম্প্রতিককালে জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও রাশিয়ায় বিকাশ লাভ করেছে,—তেমনটি আমাদের দেশে হয়নি, এসব বিষয়ে বিস্তৃত কয়েকটি অধ্যায়ে আলোচনার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু একদিকে আমার সময়াভাব, অন্যদিকে বর্তমান গ্রন্থের অত্যধিক চাহিদার জন্যে ঐ অধ্যায়গুলি যোগ না করেই বইটি দ্রুত প্রকাশ করতে হল। যদি সাধারণ পাঠকবর্গের মধ্যে এ বিষয়ে বিশেষ চাহিদা অনুভব করি তা হলে এসব বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা রইল।

দ্বিতীয় সংস্করণের নতুন সংযোজিত অংশ ছাড়া অধিকাংশটাই অফ্‌সেটে ছাপা হয়েছে বলে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন, প্রুফ সংশোধন প্রভৃতি কাজে সহধর্মিণী শ্রীমতী হেনা শ'কে পূর্ববৎ দিবারাত্র পরিশ্রম করতে হয়নি। তবু তিনি যেটুকু করেছেন তা-ই আমার ব্যস্ত ও বিপর্যস্ত জীবনে আমাকে 'মহৎ-ভয়' থেকে রক্ষা করেছে, যথার্থ ধর্ম যেমন করে থাকে—'স্বল্পম্ অপি অস্য ধর্মস্য ত্রায়তে ময়তো ভয়াৎ'।

ব্যক্তিগত সংগ্রহ, বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও তথ্যাদি সংগ্রহ করে দিয়ে আমায় যেসব শুভার্থী ব্যক্তি সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কুণাল সিংহ এবং আমার স্নেহভাজন ছাত্র ও গবেষক অধ্যাপক নির্মলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য, শ্রীসুভাষ চক্রবর্তী, শ্রীঅভিজিৎ মজুমদার ও শ্রীমতী মল্লিকা দাশের কথা বিশেষভাবে মনে আসছে। শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁদের ঋণ শোধ করার বৃথা চেষ্টা করবো না।

'দি কোয়েস্ট'
বি ২/৪১, কল্যাণী
পিন-৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ
১৫ই আগস্ট, ১৯৯২

রামেশ্বর শ'

তৃতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। আমার জীবনদেবতা অলক্ষ্যে থেকে আমার জীবনের চরম দুঃখের দিনে আমাকে যে মন্ত্রটিতে অবিচলিতভাবে জীবনসংগ্রামের প্রেরণা দিয়েছেন, তারই জোরে আমি বেঁচে আছি এবং নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি রচনা করতে পেরেছি। তাঁর সেই মন্ত্রটি আজ বারবার মনে আসছে—

> "ধৈর্যের সঙ্গে, দৃঢ়তার সঙ্গে জীবন ও জীবনের বাধাবিঘ্নের সাক্ষাৎ করবার সাহস যার নেই, সে কখনো যোগসাধনায় আরো কঠিন আন্তর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে যেতে পারবে না।......প্রথম শিক্ষাই হল—প্রশান্ত মন ও দৃঢ় সাহস নিয়ে জীবন ও জীবনের পরীক্ষাসমূহের সম্মুখীন হতে হবে। যুদ্ধ যতই কঠোর হোক, একমাত্র উপায় এখনই ও এইখানেই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যুদ্ধ সাঙ্গ করা।" —শ্রীঅরবিন্দ

তিনি নিজে যখন স্বাধীনতা-সংগ্রামে ছিলেন তখন চরমপন্থী ছিলেন ; যখন অমৃতসাধনায় চলে গেলেন তখনো তিনি চরমপন্থী—সেখানে মরণশীল জীবনের সীমা ও অপূর্ণতার নিয়তির বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন মুখোমুখি সংগ্রাম-ঘোষণা : "Fate shall be changed by an unchanging will"—Savitri, Book III, Canto IV। এই প্রেরণাই আমার সংগ্রামী-শক্তির মূল উৎস। আমার সেই জীবনদেবতারই কৃপায় 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ আজ প্রকাশিত হল। এই সংস্করণে সামান্য কিছু সংশোধন ও সংযোজন করেছি। পূর্ববর্তী সংস্করণের মতো বর্তমান সংস্করণটিও পাঠকসমাজে গৃহীত হলে আনন্দিত হব।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ভাষাবিজ্ঞানের আগ্রহী পাঠক গবেষক শ্রীকেশব আড়ু এই বৃহৎ-গ্রন্থের বহুপ্রতীক্ষিত নির্ঘণ্ট তৈরি করে দিয়েছেন। তাঁকে আমার অশেষ ধন্যবাদ জানাই। স্নেহের ছাত্রী শ্রীমতী উৎসা সেনগুপ্ত প্রথমাধি এই গ্রন্থের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানাই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহধর্মিণী শ্রীমতী হেনা শ' এবং কন্যা সুমঙ্গলার ভূমিকা পূর্ববৎ উল্লেখ্য। জীবনসংগ্রামে এদের সকলকে নিয়ে এগিয়ে চলেছি—এগিয়ে তো যেতেই হবে—চরৈবেতি...।

'দি কোয়েস্ট' **রামেশ্বর শ'**
বি ২/৪১, কল্যাণী ২৪শে নভেম্বর, ১৯৯৬
পিন-৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

চতুর্থ সংস্করণে প্রকাশকের কথা

পুস্তক বিপণির কর্ণধার অনুপকুমার মাহিন্দার এবং এই গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক রামেশ্বর শ' মহাশয়ের আকস্মিক অকাল প্রয়াণে আমরা বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। ফলে অধ্যাপক শ' যে-সব বিষয় চতুর্থ সংস্করণের জন্য সংযোজন করে গিয়েছিলেন তা পাঠক-সমাজে উপস্থাপিত করতে অতি বিলম্ব ঘটে গেল। এজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। এখন পাঠক-সমাজ পূর্ববৎ এই গ্রন্থ গ্রহণ করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত
কুমকুম মাহিন্দার
প্রকাশক

পুস্তক বিপণি
১৫.২.২০১২

চিহ্ন ও সঙ্কেত ব্যাখ্যা

*	= অনুমিত / পুনর্গঠিত (hypothetical/reconstructed) রূপ। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় (IPA) এই চিহ্নটি আবার ব্যক্তিনাম / স্থাননাম বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
>	= থেকে এসেছে / হয়েছে। যেমন—কৃষ্ণ > কেষ্ট = 'কৃষ্ণ' থেকে এসেছে 'কেষ্ট'।
<	= আগে ছিল। যেমন—কেষ্ট < কৃষ্ণ = 'কেষ্ট' আগে ছিল 'কৃষ্ণ'।
//	= স্বনিমভিত্তিক / ধ্বনিতাভিত্তিক লিপ্যন্তর (phonemic transcription)।
[ ]	= উপধ্বনিভিত্তিক / পূরকধ্বনিভিত্তিক / সূক্ষ্ম উচ্চারণভিত্তিক লিপান্তর (phonetic transcription)।
√	= ধাতু।
´	= তালব্য ধ্বনি (যেমন—শ্ = ś)।
.	= মূর্ধন্যধ্বনি (যেমন—ট্ = ṭ)।
সং	= সংস্কৃত।
অব	= অবহট্ঠ।
বাং	= বাংলা।
প্রা	= প্রাকৃত।
প্রা-বাং	= প্রাচীন বাংলা।
ম-বাং	= মধ্য বাংলা।
আ-বাং	= আধুনিক বাংলা।
´	= acute accent.
`	= grave accent.
^	= circumflex accent.
¨	= umlaut (e. g. ii).
IE	= Indo-European.
IIr	= Indo-Iranian.
OIA	= Old Indo-Aryan.
MIA	= Middle Indo-Aryan.
NIA	= New Indo-Aryan.

বিষয়-সূচি

উপক্রমণিকা

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

॥ ১ ॥

মানুষ : সমাজ : ভাষা
(Man : Society : Language)

> "From time immemorial, the animals and spirits of folk-Lore have had human characteristics thrust upon them, including always the power of speech. But the cold facts are that Man is the only living species with this power......The appearance of language in the universe–at least on our planet–is thus exactly as recent as the appearance of Man himself."[১]

ভাষাবিজ্ঞানী চার্লস্ এফ্. হকেট্ আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান-বিষয়ক তাঁর বিখ্যাত বইটির পরিসমাপ্তিতে যে কথাটি বলেছেন সেটি ভাষাজিজ্ঞাসার একেবারে গোড়ার কথা—ভাষা হচ্ছে মানুষের এমন এক অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্য (differentia) যা অন্য প্রাণী থেকে মানুষকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে ; এবং তার স্বাতন্ত্র্যের এই অভিজ্ঞানটি সে পৃথিবীতে তার আবির্ভাবের পরে ক্রমবিকাশের ধারায় অর্জন করেছে। এই অনন্যসুলভ সম্পদটি শুধু তারই আছে, কারণ শুধু তারই প্রয়োজন আছে এই সম্পদের। তার কারণটি অবশ্য আমরা যদি তলিয়ে দেখি তবে ধরতে পারব এর মূলে আছে আবার অন্য একটি আরো গভীরতর মানববৈশিষ্ট্য যেটি অন্য প্রাণীর নেই। সেটি হচ্ছে মানুষের মন এবং মনের ক্রিয়াজাত তার চিন্তারাজি। বিবর্তনের ধারায় জড়ের পরে প্রাণের বিকাশ হওয়ায় বৃক্ষলতা-পশুপক্ষীর আবির্ভাব। এরও পরের ধাপে মনের (mind) বিকাশের ফলে মানুষের আবির্ভাব। আর এই মন আছে বলেই মানুষ চিন্তাসম্পদের অধিকারী, সে ভাবসম্পদের জন্মদাতা। নিজের ভাব ও চিন্তার সম্পদকে অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে চায় বলেই তার প্রয়োজন হয় উন্নততর প্রকাশমাধ্যম—'ভাষা'। শুধু ক্ষুধাতৃষ্ণা বা অন্য জৈব বৃত্তি প্রকাশের তাগিদে ভাষার জন্ম হয়নি। জিল (Jill) নামে ছোট্ট মেয়েটি যখন ক্ষুধা অনুভব করে এবং একটি লাল

১। Hockett, Charles F. : *A Course in Modern Linguistics,* New York : The Macmillan Co., 1968, p, 569.

টুকটুকে আপেল তার চোখের সামনে গাছের উপর ঝুলে থাকতে দেখে তখন সে জ্যাক (Jack) নামক তার বন্ধুকে আপেল পেড়ে দিতে বলে।[২] ব্লুমফিল্ডের এই উদাহরণের অনুকরণে উদাহরণ দিয়েছেন আচার্য সুকুমার সেন : "রাম ও শ্যাম বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। পথে গাছে পাকা পেয়ারা দেখিয়া শ্যাম বলিল, দাদা, ক্ষুধা পাইয়াছে, পেয়ারা খাইব। রাম গাছে উঠিয়া পেয়ারা পাড়িয়া শ্যামকে দিল।"[৩] এইভাবে ক্ষুধার তাগিদে জিল বা শ্যামের মুখ থেকে কথা বেরিয়ে এসেছে ঠিকই, কিন্তু এ থেকে একথা মনে করলে ভুল হবে যে, শুধু জৈব বৃত্তির তাড়নায় ভাষার জন্ম। জৈব চাহিদাকে অন্যের মনে সঞ্চার করে সমস্যার সহজতর সমাধানে ভাষা আমাদের সহায়তা করে ঠিকই ; কিন্তু পুরোপুরি জৈব বৃত্তির তাগিদেই (biological necessity) ভাষার জন্ম হয়নি। যদি শুধু জৈব বৃত্তির তাগিদে ভাষার জন্ম হত, তবে জীব-জন্তুরাও ভাষার জন্ম দিতে পারত। কিংবা শুধু জৈব প্রয়োজন মেটাতে হলে জীবজন্তুর মতো অস্ফুট ভাষা ও ইঙ্গিত হলেই মানুষের কাজ চলে যেত। বস্তুত উন্নততর ভাব ও চিন্তাকে প্রকাশের জন্যেই মানুষের ভাষার প্রয়োজন। এইজন্যে চিন্তা ও ভাষার মধ্যে রয়েছে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। চিন্তার সঙ্গে, মানুষের মনের সঙ্গে, তার আত্মার সঙ্গে ভাষার এই অপরিহার্য সম্পর্ক আছে বলেই জার্মান মনীষী হুম্‌বোল্ট্ আরো গভীরে গিয়ে বলেছেন—মানুষের ভাষাই হল তার আত্মা, আর তার আত্মাই হল তার ভাষা :

"Ihre Sprache ist ihr Geist
und ihr Geist ihre Sprache."[৪]

উক্তিটিতে কবিসুলভ উচ্ছ্বাস আছে স্বীকার করি, কিন্তু অস্বীকার করতে পারি না যে, মনীষীর মূল অনুভূতিটি নির্ভুল—ভাষার সঙ্গে মানুষের মনের, তার আত্মার যোগ অবিচ্ছেদ্য। অর্থাৎ ভাষার উৎস তার মনে ; মনের চিন্তারাজির প্রকাশের তাগিদেই ভাষার জন্ম। ভাষা হচ্ছে মানুষের চিন্তার ধ্বনিমাধ্যম প্রকাশ।

২। "Suppose that Jack and Jill are walking down a lane, Jill is hungry. She sees an apple in a tree. She makes a noise with her larynx, tongue, and lips. Jack vaults the Fence, climbs the tree, takes the apple, brings it to Jill, and places it in her hand, Jill eats the apple."–Bloomfield, Leonard ; *Language*, Delhi ; Motilal Banarsidass, 1963, p. 22.

৩। সেন, ডঃ সুকুমার : 'ভাষার ইতিবৃত্ত', কলিকাতা, ১৯৭৫, ১-২শ সং, পৃঃ ২।

৪। Humboldt, Wilhelm von i, *Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues*, Darmstadt, 1949, p. 4■.

চিন্তা ও ভাষার মধ্যে মূলীভূত যোগসূত্রটি স্বীকার করে ভাষার স্বতন্ত্র রূপটি প্রতীচ্যের আদি আচার্য প্লাতো সুন্দর করে একটু কবিত্ব করে বুঝিয়ে বলেছেন : "চিন্তা ও ভাষা মূলত একই ; পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, চিন্তা হল আত্মার নিজের সঙ্গে নিজের নীরব কথোপকথন, আর যে প্রবাহটি আমাদের চিন্তা থেকে ধ্বনির আশ্রয়ে ওষ্ঠের মধ্যে দিয়ে বয়ে আসে তা-ই হল ভাষা।"[৫]

তা হলে, ভাষা হল মানুষের এমন এক অভিজ্ঞান যা অন্য প্রাণী থেকে তাকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে—হকেটের এই কথাটি তলিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারি এই অভিজ্ঞানটি তার বাহ্য অভিজ্ঞান ; আরো মূলীভূত অভিজ্ঞান হচ্ছে তার মন, তার অন্তর, তার আত্মা ; আর ভাষা হচ্ছে তার বাহ্যপ্রকাশ। তাই আধুনিকতম ভাষাবিজ্ঞানী চম্‌স্কি মনে করেন, মানুষের ভাষার প্রকাশরূপের অন্তরে আছে যে অর্থসম্পদ, তার বাহ্য গঠনের (surface structure) তলে রয়েছে যে গভীরতর গঠন (deep structure), এবং বাহ্য ব্যবহারের অন্তরে নিহিত আছে ভাবকেন্দ্র-স্বরূপ যে মন, তাকে আবিষ্কার করাই ভাষাজিজ্ঞাসার আসল লক্ষ্য :

"......in the technical sense, linguistic theory is mentalistic, since it is concerned with discovering a mental reality underlying actual behavior."[৬]

মানুষের এই মূল স্বাতন্ত্র্যচিহ্ন যে মনন ও চিন্তন তার উপযুক্ত গুরুত্ব স্বীকার করে আমরা বলতে পারি, এক মনের চিন্তাকে আমরা যখন অন্য মনের কাছে পৌঁছে দিতে চাই তখনই দরকার হয় এই চিন্তার একটি বাহনের, একটি প্রকাশমাধ্যমের। একজনের কথা যখন আমরা অন্য জনের কাছে পৌঁছে দিতে চাই তখনই ভাষার জন্ম। তা হলে ভাষাসৃষ্টির জন্যে অন্তত দু'টি মানুষের অস্তিত্ব প্রয়োজন। এবং যখনই একের বেশি দু'য়ে আমরা আসি, তখনই সৃষ্ট হয় সমাজ। এই সমাজ-বাঁধার বৃত্তিও রয়েছে ভাষাসৃষ্টির মূলে। উন্নততর সমাজ-সংগঠন হল মানুষের আর এক চিহ্ন।

৫। "thought (dianonia) is the same as language , with this exception that thought is the conversation of the soul with herself which takes place without voices, while the stream which, accompanied by sound, flows from thought through the lips, is called language (logos)"–Plato : *Dialogues (Sophist).*

৬। Chomsky, Noam ; *Aspects of the Theory of Syntax,* Cambridge, Massachusetts ; The M. I. T. Press, 1976, p. 4.

সুতরাং ভাষাসৃষ্টির মূলে রয়েছে মানুষের দু'টি দিক : ব্যক্তিমানুষের মন ও চিন্তা, আর সমাজবদ্ধ মানুষের ভাববিনিময়ের ইচ্ছা। অর্থাৎ ভাষার যেমন একটি ভাবগত উৎস আছে, তেমনি আছে একটি সমাজগত চাহিদা। আধুনিক কালে সাহিত্যের যেমন সমাজগত দিকটি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে, তেমনি ভাষারও সমাজগত দিকটি প্রাথমিক তাৎপর্য লাভ করেছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা তাই প্রথমেই মনে করিয়ে দিচ্ছেন : "The first point we must make about language, then, is that it is a social, rather than a biological, aspect of human life."[৭] তাই ভাষাবিজ্ঞানী হুইট্‌নির (Whitney, W. D.) সঙ্গে আজকাল সবাই বলছেন, ভাষা হচ্ছে একটি সামাজিক সংস্থা—Language is a social institution. একথার তাৎপর্য দ্বিবিধ। প্রথমত ভাষার জন্ম সামাজিক প্রয়োজনে—অর্থাৎ সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ভাববিনিময়ের প্রয়োজনে। দ্বিতীয়ত ভাষার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় সমাজের কাঠামো (pattern) অনুসারে। একটি দৃষ্টান্ত নিলেই ভাষার উপরে সমাজের প্রভাবটি বোঝা যাবে। যে সমাজে কাকা-মামা-জ্যেঠার স্বতন্ত্র ভূমিকা নেই, সেখানে ভাষায় তাদের একই নাম—'uncle'। আর যে সমাজে শিশুর প্রতি এই ত্রিবিধ সম্পর্কের আচরণের পার্থক্য আছে, সেখানে তাদের প্রত্যেকের জন্যে ভাষায় রয়েছে পৃথক পৃথক নাম—সম্পর্কচিহ্ন। তা ছাড়া কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক গঠনের পরিবর্তন ঘটছে, ফলে এসব সম্পর্কচিহ্নেরও পরিবর্তন ঘটছে। সামাজিক প্রয়োজন ও সামাজিক কাঠামো ভাষার প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই সব কারণে ভাষাকে আমরা বলতে পারি একটি সামাজিক সংস্থা। আবার ভাষার প্রকৃতি যেমন সমাজের গঠনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তেমনি ভাষার মান সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতির মানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-সভ্যতার ক্রমবিকাশের দ্বারা যেমন ক্রমোন্নতি লাভ করবে তেমনি তার নতুন নতুন নান্দনিক উপলব্ধি, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার প্রকাশের জন্যে ভাষাকেও হতে হবে ততই সূক্ষ্ম, উন্নত, মার্জিত, প্রকাশক্ষম।

সামগ্রিক বিচারে তাহলে মনে রাখতে হবে, ভাষা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়; আমাদের জীবন, মনন, সমাজ, সংস্কৃতির প্রতিটি দিকে তার শিকড় প্রসারিত, সবদিক থেকে রস সংগ্রহ করে ভাষা জীবন্ত বৃক্ষের মতো বিকশিত হয়ে উঠে। মানুষের জীবনের প্রয়োজনে তার সৃষ্টি, আবার মানুষকেই তা

৭। Fransis, W. Nelson ; *The Structure of American English.*

জীবনীশক্তি দান করে ; ভাষার শাখায় বিকশিত পত্রপুষ্প হল তার শৈল্পিক সৌন্দর্য, তা মানুষকে নান্দনিক তৃপ্তি (aesthetic satisfaction) দান করে।

॥ ২ ॥

শিল্প : সাহিত্য : ভাষা
(Art : Literature : Language)

আগেই বলেছি, বিশ্বপ্রকৃতির রাজ্যে মানুষের স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞানটি হল তার মন (mind)। বিবর্তনের ধারায় প্রথমে জড়ের বিকাশ, জড়ের পরে প্রাণ, প্রাণের পরে মন। এই মনের বিকাশ মানেই মানুষের জন্ম। যে মন মানুষের অনন্যসুলভ সম্পদ সেই মনের ত্রিধা বৃত্তি— চিন্তা (thinking), সঙ্কল্প (willing), অনুভব (feeling)। মনের এই ত্রিধা বৃত্তির প্রকাশ ঘটে ত্রিবিধ ক্রিয়ায়—জ্ঞানান্বেষণ, কর্মসাধনা ও সৌন্দর্যসৃষ্টি। ত্রিবিধ সাধনায় তার যে প্রাপ্তি তাকে সে যখন অন্য জনের কাছে পৌঁছে দিতে চায় তখন নানাবিধ প্রকাশ-মাধ্যম (medium) সে অবলম্বন করে ; ভাষা তার অন্যতম প্রকাশমাধ্যম।

মানবমনের ত্রিধা বৃত্তির মধ্যে অনুভব বৃত্তিটি যেমন কোমল সূক্ষ্ম তেমনি জটিল রহস্যময়। বৃত্তিসমূহের মধ্যে শুধু এই বৃত্তিটিরই রয়েছে বুদ্ধির বাঁধ-ভাঙা আবেগের উচ্ছ্বাস, প্রেমে আকর্ষণের যাদুশক্তি, পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের জন্যে চির-অতৃপ্ত তৃষ্ণা, সৃজনীপ্রতিভার স্পর্শে চিরন্তন সৌন্দর্যের মায়াসৃষ্টির রহস্যময় ইন্দ্রজাল। এই বৃত্তিকে পার্থিব জীবনে চালিত করে মানুষ স্নেহ-প্রেম-ভক্তি দিয়ে রচনা করতে চায় সংসারের স্বর্গ, অমৃত-সাধনায় চালিত করে রূপায়িত করে ভক্তিযোগে, মরমিয়া অন্বেষণায়, সুফী সাধনায়, খ্রীস্টীয় মিস্টিসিজ্‌মে। আবার এই বৃত্তিকে যখন সে চালিত করে সৌন্দর্যের পূর্ণরূপ সন্ধানে, তখন তার অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তি উদ্বোধিত হয় এবং সে তখন সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। তারই ফলশ্রুতি শিল্পসৃষ্টি।

মানুষের এই শিল্পসৃষ্টির জটিল প্রক্রিয়ার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এখানে অবান্তর। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, জীবনের নির্বাচিত তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার বর্ণানুরঞ্জন মিশ্রিত করে শিল্পস্রষ্টা আপন মনোলোকে যে ভাবমূর্তি রচনা করেন তা-ই হল সব শিল্পের মূল উপজীব্য। এই মূল উপজীব্যটি কল্পনায় মূর্তিলাভ করার পর শিল্পী যখন তাকে অন্যের মনে সঞ্চারিত করতে চান, যখন অন্য জনকে নিজের অনুভূতির অংশীদার করতে চান, তখনই প্রয়োজন হয় প্রকাশমাধ্যমের। এই প্রকাশমাধ্যমটি আরিস্তোতেল যাকে বলেছেন means of imitation—নানা

রকমের হতে পারে। এক-একজন শিল্পী নিজের বিশেষ মানসিক প্রবণতা অনুসারে এক-এক রকমের প্রকাশমাধ্যম বেছে নেন। এই প্রকাশমাধ্যমের পার্থক্য অনুসারে শিল্প পৃথক-পৃথক রূপ নেয়. শিল্পী যখন সুরকে তাঁর মাধ্যম হিসাবে বেছে নেন তখন সঙ্গীত নামক শিল্প গড়ে উঠে। যখন বর্ণ ও রেখার মাধ্যম অবলম্বন করেন তখন চিত্রশিল্পের জন্ম হয়। তেমনি শিল্পী যখন কথা বা ভাষার মাধ্যম গ্রহণ করেন তখন সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এইভাবে ছ'টি প্রধান শিল্প-শাখা গড়ে উঠেছে—সঙ্গীত, চিত্র, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, নৃত্য। সাহিত্য হল এমন একটি শিল্পকলা যার প্রকাশমাধ্যম হল ভাষা। সাহিত্যের সঙ্গে ভাষার সম্পর্কটি তা হলে পরিষ্কার—সাহিত্য হল অন্যতম একটি শিল্পকলা, আর ভাষা হল তার প্রকাশমাধ্যম। নন্দনতত্ত্ববিদের এই সিদ্ধান্ত আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীও স্বীকার করেছেন : "Literature is an art-form, like painting, sculpture, music, drama, and the dance. Literature is distinguished from other art-forms by the medium in which it works : language"[৮]

এখানে বলা প্রয়োজন, সাহিত্য ও ভাষার এই সম্পর্ক-সূত্রটি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীর আবিষ্কার নয়। প্রতীচ্যের সংস্কৃতির আদি পীঠস্থান গ্রীসের শিল্পতত্ত্ববিদ আরিস্তোতেল একথাটি ধরেছিলেন। ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত এই বিশেষ শিল্পটির তিনি কোনো নাম দিতে পারেননি। কারণ তখনো পর্যন্ত এই শিল্পের কোনো সাধারণ নাম প্রচলিত হয়নি।[৯] শিল্পীর অন্তরের ভাবমূর্তি যতক্ষণ বাহ্যরূপ লাভ না করছে ততক্ষণ তা শিল্প হয়ে উঠে না। শিল্পতত্ত্ববিদ ক্রোচে তো এতদূর মনে করেন যে, শৈল্পিক স্বজ্ঞার (intuition) অপরিহার্য অঙ্গই হল প্রকাশ (expression)। প্রকাশিত না হলে কোনো শৈল্পিক স্বজ্ঞাই পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠে না।[১০]

৮। Hockett, Charles F. ; *A Course in Modern Linguistics,* New York ; The Macmillan Company, 1968, p. 553.

৯। "There is........an art which imitates by language alone, without harmony, in prose or in verse, and if in verse, either in some one or in a plurality of metres. This form of imitation is to this day without a name"–Aristotle ; *Poetics,* Sec. 1. (*Aristotle on the Art of Poetry,* Trans. by Bywater, Ingram, Oxford, 1959, p. 24.)

১০। "Every true intuition or representation is also *expression.* That which does not objectify itself in expression is not intuition or representation, but sensation and mere natural fact. The spirit only intuites in making, forming, expressing. He who separates intuition from expression never succeeds in re-uniting them."– Croce, Benedetto ; *Æsthetic,* Cal : Rupa & Co., p. 8.

সুতরাং সাহিত্যের প্রকাশরূপ যে ভাষা, তাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য নামক শিল্পটি সম্ভবই হতে পারে না। কারণ কবি নিজেই অনুভব করেছেন 'নীরব কবিত্ব' বলে কিছু নেই। অনুভূতি বাণীমূর্তি লাভ না করলে তা কাব্য হয়ে উঠে না। সুতরাং ভাষা হল সাহিত্য-শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। সাহিত্য-শিল্পের মূল সম্পদ তার ভাবমূর্তি, শিল্পীর জীবনের অভিজ্ঞতা, অন্তরের অনুভূতি, কল্পনার সৃজনীক্ষমতা ; কিন্তু তাঁর শিল্পরূপের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল ভাষা। এই ভাষার স্তরেই সাহিত্য-শিল্পীর যাবতীয় কারুকার্য। তাই সাহিত্যকে যদি শুধু জীবনানুভূতির তত্ত্বকথা হিসাবে না দেখে দেখতে চাই শিল্পকলা হিসাবেও তাহলে সাহিত্যপাঠের অপরিহার্য অঙ্গ হবে ভাষাবিজ্ঞানও।

এখানে অবশ্য একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা অনেকেই সাহিত্যের ভাষাকে তাঁদের প্রধান আলোচ্যরূপে গুরুত্ব দেন না। তাঁদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল মানুষের মুখের বাস্তব ব্যবহৃত জীবন্ত ভাষা।

একথা ঠিক যে, সাহিত্যের ভাষার শিল্পরূপটি অধ্যয়নের স্বতন্ত্র ক্ষেত্র আছে। কিন্তু শুধু মুখের ভাষাকেই মানুষের ভাষার একমাত্র রূপ ধরে নিতে হবে, সাহিত্যের ভাষাকে তা থেকে বাদ দিয়ে আলোচনা করতে হবে—এ মতটি আমরা সমর্থন করি না। আমাদের মনে হয় মানুষেরই ভাষার দু'টি প্রধান প্রকাশরূপ—সাহিত্যের ভাষা ও মুখের ভাষা। দু'য়ের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য (water-tight) বিভেদও নেই। সাহিত্যশিল্পের অপরিহার্য অঙ্গরূপে আজকাল সাহিত্যে মুখের জীবন্ত ভাষার—এমনকি উপভাষা ও অপভাষার—প্রয়োগও ক্ষেত্রবিশেষে হচ্ছে। আবার মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশের ফলে মানুষের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের পরিমার্জন যতই হবে—যেমন রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ 'কবিমনীষী'র ক্ষেত্রে হয়েছেও—ততই সমগ্র জীবনই হয়ে উঠবে জীবন-শিল্প—ততই মুখের ভাষাও হয়ে উঠবে তার সাহিত্যের ভাষার মতোই মার্জিত—তার শিল্পিত স্বভাবের অপরিহার্য অথচ জীবন্ত প্রকাশ। এ সম্ভাবনা ভাষাবিজ্ঞানীদের চেতনায় আভাসিত হচ্ছে বলেই আধুনিকতম ভাষাবিজ্ঞানী চম্‌স্কি ভাষার সৃজনী দিকের (creative aspect) উপরে জোর দিয়েছেন : "...one of the qualities that all languages have in common is their "creative" aspect....The grammar of a particular language, then, is to be supplemented by a universal grammar that accommodates the creative aspect of language use."[১১] সুতরাং আমরা মনে করি ভাষার দুই রূপ—সাহিত্যের ভাষা ও মুখের ভাষা—দুই-ই ভাষাবিজ্ঞানের বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্থান পেতে পারে।

১১। Chomsky, Noam ; *Aspects of the Theory of Syntax*, Massachusetts, 1976, p. 6.

॥ ৩ ॥

ভাষার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

(Language : its definition and characteristics)

বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী স্টার্টেভান্ট (Edgar H. Sturtevant) ভাষার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি গ্রহণ করে অগ্রসর হলেই ভাষার স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য বুঝে নিতে সুবিধা হবে। তাঁর দেওয়া সংজ্ঞাটি হল : "A language is a system of arbitrary vocal symbols by which members of a social group co-operate and interact."[১২]

এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি সহজে ধরা পড়বে। প্রথমত আমরা উপলব্ধি করি, ভাষা হল মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত কতকগুলি ধ্বনিগত প্রতীকের (vocal symbols) সমষ্টি। সুতরাং ভাষার প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে, যে-কোনো রকমের ধ্বনিই ভাষা নয়, যে ধ্বনি মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত, শুধু তা-ই ভাষার মূল উপাদান। জীবজন্তুর কণ্ঠস্বর, মানুষের হাততালি বা একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর ঘর্ষণ বা সংঘর্ষের ফলে উৎপন্ন ধ্বনি ভাষা নয়। সাধারণত বলা হয়ে থাকে—যার সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, তা-ই হল ভাষা। কিন্তু এ সংজ্ঞাটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। অঙ্গভঙ্গি বা ইসারার সাহায্যেও মানুষ অনেক ভাব প্রকাশ করে থাকে, কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এগুলি ভাষা নয়। কোনো ভঙ্গিগত প্রতীক নয়, একমাত্র ধ্বনিগত প্রতীকই ভাষা, আবার সে ধ্বনি মানুষেরই বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি হওয়া চাই। ভাষাবিজ্ঞানে 'ভাষা' কথাটি অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হয়। অন্যভাবে বলতে পারি, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদির সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করা গেলেও ভাষাবিজ্ঞানে ভাবপ্রকাশের সেই সব মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা করা হয় না, সেইজন্যে ভাষাবিজ্ঞানে ভাষা কথাটি সুনির্দিষ্ট (precise) তাৎপর্য বহন করে।

ভাষার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিমাত্রেই ভাষা নয়, শুধু সেই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা যা বিশেষ-বিশেষ বস্তু বা ভাবের প্রতীক (symbol)। ধ্বনি যদি কোনো ভাবের বাহন বা প্রতীক না হয়, তা হলে তাকে ভাষা বলা যায় না। পাগলের অর্থহীন ধ্বনি বা শিশুর অস্ফুট চিৎকার মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি বটে, কিন্তু তাকে

১২। Sturtevant, Edgar H. ; *An Introduction to Linguistic Science,* New Haven : Yale University Press, 1947, Ch. I.

ভাষা বলা যায় না। কারণ তা কোনো ভাব বা বস্তুর প্রতিষ্ঠিত প্রতীক নয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভাষার দু'টি দিক আছে : একটি বহিরঙ্গ (Form), অন্যটি অন্তরঙ্গ (Content) ; প্রথমটি হল ধ্বনি বা sound, আর দ্বিতীয়টি হল অর্থ বা meaning। তা হলে সংক্ষেপে বলা যায়, ভাষার ধ্বনিগুলি হল অর্থের প্রতীক। ভাষাবিজ্ঞানী গ্লীসনের (Gleason) ভাষায় এ দু'টি যথাক্রমে expression ও content।

ধ্বনির এই যে প্রতীকধর্মিতা, এই প্রতীকধর্মিতা থেকেই ভাষার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। স্টার্টেভান্টের মতে সেই বৈশিষ্ট্যটি এই যে, ভাষার মধ্যে ব্যবহৃত কোন্ ধ্বনিটি কোন্ ভাবের প্রতীক হবে সে সম্পর্কে কোনো কার্যকারণগত সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই, এটি মানুষের খেয়াল অনুসারে নির্বাচনের উপরে নির্ভর করে। 'জল' বলতে যে তরল পদার্থকে বুঝি তার সঙ্গে 'জল' শব্দটির কোনো কার্যকারণগত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। তাই পৃথক-পৃথক ভাষায় মানুষ ঐ পদার্থটি বোঝাবার জন্যে জলের বদলে পৃথক-পৃথক ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার করে। যেমন,

সংস্কৃত	:	জল (जल)
গ্রীক	:	হুদর (ὕδωρ)
লাতিন	:	আকোয়া (aqua)
বাংলা	:	জল্ (জল)
হিন্দি	:	পানী (पानी)
ইংরেজি	:	ওয়াটার্ (water)
জার্মান	:	ভাসের্ (Wasser)
ফরাসি	:	ও (eau)

দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হলে ও বহুজন কর্তৃক গৃহীত হলে যে-কোনো নবনির্বাচিত শব্দই কোনো পুরাতন বস্তুর প্রতীক হয়ে উঠতে পারে। এইভাবে ধ্বনিগঠিত প্রতীকগুলিকে অর্থাৎ শব্দগুলিকে মানুষ প্রথমে তার খেয়ালখুশি-মতো নির্বাচন করে বলে এগুলিকে arbitrary বলা হয়েছে। আবার মানুষের খেয়াল অনুসারে এক-এক কালের মানুষ একই শব্দকে ভিন্ন-ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে। এই ব্যবহার মানুষের খেয়ালের উপর ভিত্তি করে প্রথমে চালু হয়। এ দিক থেকেও একে arbitrary বলা সঙ্গত। বহুকাল ব্যবহৃত হলে এক-একটি শব্দের অর্থ সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় বটে, কিন্তু মানুষের খেয়াল কালক্রমে তাকেও পরিবর্তিত করে ফেলে। এক সময় 'পাষণ্ড' শব্দের অর্থ ছিল বিশেষ 'ধর্ম-সম্প্রদায়', এখন তার অর্থ হয়েছে 'অত্যাচারী'। এক সময় 'পাত্র' শব্দের অর্থ ছিল 'পান করার আধার', এখন এর আর একটি অর্থ দাঁড়িয়েছে 'কন্যা সম্প্রদান করার আধার।'

এমনটি যে হয়, পাশ্চাত্য মনীষীদের মতে তার কারণ হল, অর্থ ও ধ্বনির মধ্যে কোনো অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই, ফলে যে-কোনো ভাব বা বস্তুকে প্রকাশ করার জন্যে আমরা যে-কোনো ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার করতে পারি, সমাজে সেটা গৃহীত হলেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এখানে ধ্বনির সঙ্গে অর্থের কোনো অপরিহার্য যোগ নেই ঠিকই, কিন্তু এই অর্থ শব্দের কোন্ অর্থ? এটা তার বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থ, ধ্বনির উপরে আমাদের আরোপিত অর্থ। এই অর্থ সমাজে প্রচলনের উপরে নির্ভর করে। কিন্তু ধ্বনিসমষ্টির এই বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থ ছাড়া একটি অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, এটা সব সময় ঠিক কোনো ভাব বা বস্তুকে প্রকাশ করে না, এটা মানুষের অন্তর্লোকে একটা অনুভূতি জাগিয়ে দেয়। বেহালার যে করুণ রাগ বিষাদের অনুভূতি জাগিয়ে দেয়, সেটা কোনো শব্দের সমাজ-প্রচলিত অর্থ নয়, সেটা ধ্বনির অন্তর্নিহিত শক্তি।

সমালোচক কোনো আধুনিক কবির কবিতা সম্পর্কে যে বলেছিলেন তাঁর কবিতা বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে, তাতেও তিনি ধ্বনির এই অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন। কৈশোরে গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ না বুঝেও ঐ মন্ত্রের আবৃত্তিতে রবীন্দ্রনাথের চোখে যে আনন্দাশ্রু নেমেছিল, তাতেও ধ্বনির ঐ অন্তর্নিহিত শক্তিরই ক্রিয়াশীলতা প্রমাণিত হয়।[১৩] ভারতীয় মনীষীরা বলেন, কোনো-কোনো সময় আমরা বিশেষ-বিশেষ ভাব বা বস্তু প্রকাশ করার জন্যে বিশেষ-বিশেষ ধ্বনিসমষ্টি বেছে নিই খেয়াল-খুশি অনুসারে, কিন্তু কখনো-কখনো ধ্বনিসমষ্টির নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তি এই নির্বাচনের পেছনে কাজ করে ; বিশেষ-বিশেষ অনুভূতি জাগাবার যে অন্তর্নিহিত শক্তি বিশেষ-বিশেষ ধ্বনির রয়েছে, সেই শক্তিই আমাদের ঐ বিশেষ ধ্বনি নির্বাচনের পেছনে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে। এই শক্তিই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে, মন্ত্রের ধ্বনিতরঙ্গে, মহৎ কাব্যের শব্দশক্তিতে ক্রিয়াশীল। নিজের বুদ্ধির অজান্তেই যেন একটা সহজাত বোধ দিয়ে এই শক্তির সঙ্গে সুর মিলিয়ে যখন আমরা বিশেষ-বিশেষ শব্দ নির্বাচন করি তখন তার প্রকাশক্ষমতা অনেক গভীর হয়। ভারতীয় মনীষীরা মনে করেন, বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থের সঙ্গে ধ্বনিসমষ্টির অবিচ্ছেদ্য যোগ নেই ; কিন্তু বিশেষ-বিশেষ অর্থ প্রকাশ করার জন্যে বিশেষ-বিশেষ ধ্বনিসমষ্টি আমরা যখন বেছে নিই তখন এই নির্বাচনের মূলে প্রথমে ধ্বনিসমষ্টির সেই অন্তর্নিহিত অনুভূতি-সঞ্চারী শক্তিটি কাজ করে। "...the reason why sound came to express fixed ideas ; lies not in any natural and inherent equivalence between the sound and its intellectual sense, for there is none,–

১৩। দ্রঃ রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিশ্বভারতী সং, ১৭শ খণ্ড, ১৩৬১, পৃঃ ৩০৯।

intellectually any sound might express any sense, if men were agreed on a conventional equivalence between them ; it started from an indefinable quiality or property in the sound to raise certain vibrations in the life-soul of the human creature, in his sensational, his emotional, his crude mental being."[১৪]

ধ্বনির যে নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্য আছে তার সঙ্গে বিশেষ-বিশেষ ভাব ও পরিবেশ অনেক সময় অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকে। বিষয়টি ভাল করে বোঝাবার জন্যে 'মেঘদূত' সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের আলোচনা থেকে একটু দীর্ঘ অংশ স্মরণ করা যাক : "রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের মতো আমরা নির্বাসিত হইয়াছি। সেই সেখানকার উপবনে কেতকীর বেড়া ছিল, এবং বর্ষার প্রাক্কালে গ্রামচৈত্যে গৃহবলিভুক্ পাখিরা নীড় আরম্ভ করিতে মহাব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং গ্রামের প্রান্তে জম্বুবনে ফল পাকিয়া মেঘের মতো কালো হইয়াছিল, সেই দশার্ণ কোথায় গেল। আর, সেই-যে অবন্তীতে গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়ন এবং বাসবদত্তার গল্প বলিত তাহারাই বা কোথায়। আর, সেই সিপ্রাতটবর্তিনী উজ্জয়িনী। অবশ্য তাহার বিপুলা শ্রী, বহুল ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু তাহার বিস্তারিত বিবরণে আমাদের স্মৃতি ভারাক্রান্ত নহে—আমরা কেবল সেই-যে হর্ম্যবাতায়ন হইতে পুরবধূদিগের কেশসংস্কারধূপ উড়িয়া আসিতেছিল তাহারই একটু গন্ধ পাইতেছি। ...সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদী-গিরি-নগরীর নামগুলিই বা কী সুন্দর। অবন্তী বিদিশা উজ্জয়িনী, বিন্ধ্য কৈলাস দেবগিরি, রেবা সিপ্রা বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে একটি শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে।" (—প্রাচীন সাহিত্য) এখানে 'দশার্ণ', 'অবন্তী', 'বিদিশা', 'উজ্জয়িনী' প্রভৃতি নামের বদলে যদি 'খাগ্‌ড়া', 'খড়গপুর', 'হবিবপুর', 'হোটর' ইত্যাদি নাম ব্যবহার করা হত তবে সেই শোভা, সেই সম্ভ্রম, শুভ্রতা ফুটে উঠত না। কিংবা 'রেবা' 'সিপ্রা', 'বেত্রবতী'র বদলে 'খ'রে', 'মাথাভাঙা', 'কাঁসাই' নাম ব্যবহার করলে নদীকে বোঝাত বটে, কিন্তু নদীর সঙ্গে যুক্ত সেই যুগের শ্রী-সৌন্দর্যটুকু ধরা পড়ত না। মনে রাখতে হবে, ধ্বনির শুধু বস্তুগত অর্থ প্রকাশ করাই ধ্বনির সব কথা নয়, ধ্বনির প্রসঙ্গগত অর্থ (contextual meaning), অনুষঙ্গ ইত্যাদিও তার অর্থশক্তির অন্তর্গত। এখানে বিশেষ-বিশেষ ধ্বনি-সমষ্টির সাহায্যেই সেই যুগের শ্রী-সৌন্দর্যটুকু ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। এই বিশেষ-

---

১৪। Sri Aurobindo ; *The Future Poetry,* 1953, p. 17.

বিশেষ ধ্বনিসমষ্টি ও নামের সঙ্গে সেই যুগের ভাবমণ্ডলের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। সুতরাং ধ্বনির সঙ্গে অর্থের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই, এমন কথাও আমরা বলতে পারি না।

এমন কি, ধ্বনির সঙ্গে কখনো-কখনো শব্দের নিতান্ত বস্তুগত ও আভিধানিক অর্থেরও মূলীভূত যোগ থাকে। বিখ্যাত ভারতীয় বৈয়াকরণ পাণিনি বলেন, প্রত্যেক শব্দের গঠন বিশ্লেষণ করলে তার মূলে একটি ধাতু পাব। সেই ধাতুটির একটি মূল অর্থ আছে। ধাতুর এই মূল অর্থের সঙ্গে ঐ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন শব্দের অর্থের যোগ আছে। ভাষাতত্ত্ববিদরা পাণিনির এই মতবাদকে root-theory নামে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'রক্তকরবী' সম্পর্কিত আলোচনায় 'রাম' ও 'রাবণ' শব্দের যে ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তা মনে আসে—"রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি ; রাবণ হল চিৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর, আর-একটিতে শানবাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি।"[১৫] এখানে নিশ্চয়ই 'রাম' ও 'রাবণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থটিই কবির মনে এসেছে : রম্ + ঘঞ্ (অধিবা) = রাম অর্থাৎ যাঁর মধ্যে সকলে রমণ করে বা আনন্দ লাভ করে। √রু + ণিচ্ + অন (কর্তৃবা) = রাবণ অর্থাৎ যে রোদন করে বা বিকট চিৎকার করে।

শেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বিশেষ-বিশেষ ভাব বা বস্তুকে প্রকাশ করার জন্যে যে ধ্বনিসমষ্টি আমরা বেছে নিই, সেই ধ্বনিসমষ্টির নিজস্ব অন্তর্নিহিত একটি শক্তি আছে, এই শক্তির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরা বিশেষ-বিশেষ ভাবের প্রকাশক ধ্বনিসমষ্টি বেছে নিই। সুতরাং ধ্বনির সঙ্গে অর্থের কোনো যোগ নেই বা ধ্বনি-নির্বাচন পুরোপুরি খেয়াল-খুশি অনুসারে হয়, পাশ্চাত্য মনীষীদের এই মত সর্বদা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, সব ক্ষেত্রে ধ্বনি-নির্বাচনে আমরা ধ্বনির অন্তর্নিহিত শক্তির সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলি না। কখনো কখনো ধ্বনি-নির্বাচন arbitrary বা খেয়ালখুশি অনুসারে হয়। যেমন আধুনিক সমাজে সবচেয়ে বীভৎস অসুর-প্রকৃতির লোকেরও নাম রামচন্দ্র হতে পারে। কিংবা কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন খুবই শোনা যায়। সে সব ক্ষেত্রে অবশ্য শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তিটি চাপা পড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলেও শব্দ তার অনুভূতি সঞ্চারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তখন কবিকে নতুন শক্তিসম্পন্ন শব্দ সৃষ্টি করতে হয় কিংবা কোনো পুরানো শব্দে নতুন শক্তির বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সঞ্চারিত করে শব্দটিকে

১৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিশ্বভারতী সং, ১৫শ খণ্ড, ১৩৬০, পৃঃ ৫৪৮।

শক্তিগর্ভ করে তুলতে হয়। মোট কথা হচ্ছে, ভাষায় যে ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহৃত হয় সেই ধ্বনিসমষ্টি সর্বক্ষেত্রে arbitrary নয়, আবার সর্বক্ষেত্রে সুনির্বাচিতও নয়। তাই এই বিতর্ককে উপলক্ষ করে যে পরস্পর-বিরোধী মত দেখা যায়, তার কোনোটিই পুরোপুরি মিথ্যা নয়, ভিন্ন-ভিন্ন ক্ষেত্রে দুই মতেরই সত্যতা রয়েছে। এই চির-বিতর্কিত বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এখন ভাষা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে দু'টি পরস্পর-বিরোধী দলই গড়ে উঠেছে। যাঁরা বলেন ধ্বনির সঙ্গে অর্থের কোনো অপরিহার্য যোগ নেই, ওটা খেয়াল-খুশির (anomaly) ব্যাপার, তাঁদের বলে anomalist ; আর যাঁরা বলেন ধ্বনির সঙ্গে অর্থের একটি সূক্ষ্ম সাদৃশ্য (analogy) আছে, অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে, তাঁদের বলে analogist। ক্ষেত্র-বিশেষে কিন্তু দুই মতই সত্য।

ভাষার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এই যে, ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগত প্রতীকগুলি প্রথমে খেয়াল-খুশি মতো নির্বাচিত হোক অথবা কোনো অপরিহার্য বিধানেই নির্বাচিত হোক, সমাজে স্বীকৃতিলাভ করার পরে শব্দমধ্যে বা বাক্যমধ্যে এদের খেয়াল-খুশি মতো সাজালে হয় না। এদের বিন্যাসটি বিধিবদ্ধ হওয়া চাই। এই বিন্যাসরীতিও প্রথার উপরে নির্ভরশীল। বাংলায় 'মানুষ' শব্দের ধ্বনিগুলিকে উল্টে 'ষনুমা' বললে চলে না, ধ্বনিগুলি সাজাবার একটি প্রথালব্ধ বিধি আছে, সেই বিধি অনুসারেই বলতে হয় 'মানুষ'। তেমনি বাক্যমধ্যে পদবিন্যাসেরও একটি system বা বিধি আছে। 'কুকুর মানুষকে কামড়ায়' এই বাক্যটির বিন্যাসবিধিটি উল্টে দিয়ে যদি লেখা যায় 'মানুষ কুকুরকে কামড়ায়' তা হলে বাক্যটির অর্থ ঠিক থাকে না। তাই ধ্বনি বা শব্দবিন্যাসের বিধিবদ্ধতা (system) ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ভাষার পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, বিশেষ-বিশেষ ভাষা বিশেষ-বিশেষ সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। ভাষার এই সামাজিক উপযোগিতার কথা বলতে গিয়েই ভাষাবিজ্ঞানী বলেছেন by which the members of a social group co-operate and interact. বস্তুত সমাজ না থাকলে ভাষার কোনো প্রয়োজনই হত না। এইজন্যে সমাজ থেকে আজন্ম বিচ্ছিন্ন একক মানুষ কোনো ভাষা শিক্ষা বা সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং বলা যায়, যদিও ভাষা ব্যক্তিমানুষের বাগ্‌যন্ত্র থেকে উচ্চারিত হয়, তবু সামাজিক উপযোগিতাই ভাষার পরোক্ষ স্রষ্টা। সমাজই পরোক্ষভাবে ভাষা সৃষ্টি করে বলে বিশেষ-বিশেষ ভাষার উপযোগিতা বিশেষ-বিশেষ সমাজেই মুখ্য। এই জন্যে সাধারণত এক-একটি জাতির বা জনগোষ্ঠীর পৃথক-পৃথক ভাষা থাকে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও ভাষার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতেও ভাষার সামাজিক দিকটির উপরে জোর দেওয়া হয়েছে : "মনের ভাব-প্রকাশের জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে

উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জন-সমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্র-ভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ-সমষ্টিকে ভাষা বলে।"[১৬]

ভাষাচার্যের উপরি-উক্ত সংজ্ঞার আলোকেই বাংলা ভাষারও একটি সংজ্ঞা এই প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করা যেতে পারে :

পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ, বিহার ও আসামের কোনো-কোনো অংশে বসবাসকারী বাঙালি জনসমাজে মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত যে-সমস্ত অর্থবহ্ বিধিবদ্ধ ধ্বনির সাহায্যে ভাব বিনিময় করা হয় তাদের সমষ্টিকে বাংলা ভাষা বলা হয়।

॥ ৪ ॥

বাঙ্‌মীমাংসা, ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণ
(Philology, Linguistics and Grammar)

বাংলায় ভাষাজিজ্ঞাসার ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয় বলে এ বিষয়ে সর্বক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য পরিভাষা এখনো গড়ে উঠে নি। ভাষাজিজ্ঞাসা-দ্যোতক একাধিক শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে। ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, শব্দবিদ্যা, ব্যাকরণ প্রভৃতি শব্দগুলি প্রায়ই শিথিলভাবে কখনো Philology, কখনো Linguistics শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারত-সরকারের নিযুক্ত Standing Commission for Scientific and Technical Terminology ভাষাবিজ্ঞানী ডঃ বাবুরাম সক্‌সেনার অধ্যক্ষতায় ভাষাবিজ্ঞান-বিষয়ক যে শব্দাবলী (Glossary V) প্রকাশ করেছেন তা অনুসরণ করে আমরা Philology-কে 'বাঙ্‌মীমাংসা' ও Linguistics-কে 'ভাষাবিজ্ঞান' বলতে পারি। বাংলায় সহজ করে Philology-কে সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব ও Linguistics-কে বিশুদ্ধ ভাষাতত্ত্বও বলা যায়।

ইংরেজিতে Philology ও Linguistics শব্দ দু'টির মধ্যে সূক্ষ্ম অর্থপার্থক্য করা হয়। এই দু'টি শব্দের পারিভাষিক তাৎপর্যটুকু ব্যাখ্যা করলেই এই পার্থক্য বোঝা যাবে। Linguistics-কে বাংলায় ভাষাবিজ্ঞান বা বিশুদ্ধ ভাষাতত্ত্ব বলি, তার কারণ Linguistics হচ্ছে science of language বা ভাষার বিজ্ঞান অর্থাৎ ভাষা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা। বিষয়টি পরিষ্কার করার

১৬। চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুনীতিকুমার : 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সং, ১৯৪২, পৃঃ ২।

জন্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষার বিশ্লেষণ ও তার সম্পর্কে আলোচনা বলতে আমরা কি বুঝি সেটা জানা দরকার। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো ভাষাবিজ্ঞানেরও আলোচ্য বিষয়টি প্রথমে সুনির্দিষ্ট করা হয়। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা মূলগত পার্থক্য এই যে, দর্শনশাস্ত্রে সমগ্র জগৎ-প্রক্রিয়াকে একসঙ্গে অখণ্ডরূপে গ্রহণ করে তার মূলীভূত রহস্য অনুসন্ধান করা হয়, আর বিজ্ঞানে সমগ্র জগৎকে অখণ্ড রূপে না গ্রহণ করে তার এক-একটা দিক বা এক-একটা অংশকে বিজ্ঞানের এক-এক শাখায় বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হয়। তাই পদার্থবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় আলাদা, রসায়নবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় আলাদা। অনুরূপভাবে ভাষাবিজ্ঞানেরও আলোচ্য বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা। এর আলোচ্য বিষয় হল শুধুই ভাষা এবং এই ভাষা মানুষের ভাষা। এই আলোচ্য বিষয়টিকে স্পষ্ট করে চিহ্নিত করে দেওয়া হয় এইভাবে : ভাষা হল মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত যথেচ্ছভাবে নির্বাচিত (arbitrary) বাক্যমধ্যে বিধিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত এমন কতকগুলি অর্থবহ ধ্বনিগত প্রতীক যার সাহায্যে বিশেষ-বিশেষ জাতি বা জনগোষ্ঠীর লোকেরা পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় করে। এই ভাষাই হচ্ছে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় (subject-matter)। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই ভাষা সম্পর্কে আলোচনার প্রথম ধাপ হচ্ছে ভাষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ (data collection) করে তাকে নথিভুক্ত করা (record)। প্রয়োজন অনুসারে কথ্য ও লেখ্য উভয়-প্রকার ভাষা থেকেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যদিও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে কথ্য ভাষার দিকেই ঝোঁক বেশি। কথ্য ভাষার তথ্য প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত ভাষাবিজ্ঞানী (trained linguist) কানে শুনে কিছুটা স্মৃতির সাহায্যে সংগ্রহ করে রাখতে পারেন ; অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ তথ্য ভাষাবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে তৈরি করা বিশেষ ধরনের আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার (International Phonetic Alphabet) সাহায্যে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়, আবার খুব সহজে টেপ-রেকর্ডারেও (tape recorder) তুলে রাখা হয়। প্রাচীন ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে ঐ ভাষায় লিখিত তথ্যাবলী (written records)—যেমন প্রাচীন প্রত্নলিপি (inscriptions), প্রাচীন গ্রন্থ ও পুঁথি ইত্যাদি—কাজে লাগানো হয়। ভাষার ধ্বনিসমূহের রেখাচিত্র, উচ্চারণ-প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয় কাইমোগ্রাফ (Kimograph), কৃত্রিম তালু (artificial palate), এক্স্‌রে ফটোগ্রাফ (X-ray photograph) প্রভৃতির সাহায্যে। এইরূপে ভাষার নানা দিকের নানা তথ্য সংগ্রহ করে ভাষাবিজ্ঞানের দ্বিতীয় ধাপে সেগুলির যথাযথ বর্ণনা (objective description) দেওয়া হয় এবং সেগুলিকে বিশ্লেষণ (analysis) করা হয়। ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক দিকটির

বর্ণনা ও বিশ্লেষণে আধুনিক কালে অসিলোগ্রাফ (oscillograph), স্পেক্ট্রোগ্রাফ (spectrograph) প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। ভাষার অন্যান্য দিক— যেমন শব্দগঠন, শব্দরূপ, বাক্যবিন্যাস ইত্যাদি-বিষয়েও ভাষাবিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ (observation), তথ্য-বিন্যাস (processing), বিশ্লেষণ (analysis) প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলি ক্রমান্বয়ে বা অনেক সময় একসঙ্গে কাজে লাগান। এভাবে ভাষার উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করে যখন দেখা যায় যে একই রকমের কারণ (cause) থাকলে বারবার একই রকমের ফল (effect) আসছে, অথবা একই রকমের পরিস্থিতিতে একই রকমের প্রতিক্রিয়া (reaction) দেখা যাচ্ছে তখন ভাষাবিজ্ঞানের চতুর্থ ধাপে সেই ব্যাপারটিকে সাধারণীকৃত (generalisation) করা হয়। যেমন সংস্কৃতে যেখানে 'ধর্ম' পালি ভাষায় সেখানে 'ধম্ম', সংস্কৃতে যেখানে 'ভক্ত' পালিতে সেখানে 'ভত্ত', সংস্কৃতে যেখানে 'বর্গ' পালিতে সেখানে 'বগ্গ' হতে যদি দেখি, তাহলে আমরা এই সাধারণ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বিষম-ব্যঞ্জন নিয়ে গঠিত সংস্কৃত যুক্ত ব্যঞ্জনগুলি (র্ম, ক্ত ইত্যাদি) পালি ভাষায় সম-ব্যঞ্জনে গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনে পরিণত হয়, যেমন র্ + ম্ হয়েছে ম্ + ম্, ক্ + ত্ হয়েছে ত্ + ত্। এই সাধারণ সিদ্ধান্তে আসার পরে আমরা ভবিষ্যদ্বাণী (prediction) করতে পারি বা অনুমান (hypothesis) খাড়া করতে পারি যে, সংস্কৃতে অনুরূপ যোগাযোগ যদি আরো দেখা যায় তো পালি ভাষায় তার একই পরিণতি হবে। তার পরের ধাপে এই অনুমান আরো দৃষ্টান্তের মাধ্যমে যাচাই (verify) করার পালা। আরো যদি দৃষ্টান্ত পাই সংস্কৃতে 'কর্ম', 'শক্ত', 'রক্ত' ইত্যাদি শব্দ, তবে পালিতে আমরা যাচাই করে দেখব সেই স্থানে 'কম্ম', 'সত্ত', 'রত্ত' পাই কিনা । যদি পাওয়া যায় তা হলে আমরা সাধারণ সিদ্ধান্তটিকে ভাষাতাত্ত্বিক সূত্রে (linguistic law) পরিণত করি। এই ভাবে ভাষাবিজ্ঞানে বিশেষ (particular) দৃষ্টান্ত থেকে সাধারণ (general) নিয়ম রচনা করার এই ধাপগুলি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো পর পর অনুসরণ করা হয়। ভাষাবিজ্ঞান (linguistics) তাই পুরোপুরি বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করেছে।

আবার ভাষাবিজ্ঞান হল বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতোই নিত্য-প্রগতিশীল (progressive) এবং নিত্য-সক্রিয় (dynamic) একটি বিদ্যা (discipline)। বিজ্ঞান যেমন নিত্য নতুন তথ্য আবিষ্কার করছে, ক্রমশ নতুন তথ্যের আলোকে পুরানো সিদ্ধান্ত ও নিয়মের সংশোধন ও পরিমার্জন করছে, ভাষাবিজ্ঞানও তেমনি দ্রুত উন্নতি করে চলেছে। যে-কোনো বিজ্ঞানীর মতো ভাষাবিজ্ঞানীও ভাষাকে খোলা মন নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। কখনো বলেন না, ভাষার চরম তত্ত্ব তাঁর জানা হয়ে গেছে, বলা হয়ে গেছে। খাঁটি মার্ক্স্‌বাদী সম্পর্কে লেনিন যে কথা বলেছিলেন সেটি খাঁটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা : "If I know that I

know little, I shall strive to learn more ; but if a man says that he is a communist and that he need not know anything thoroughly, he will never become anything like a communist." ভাষাবিজ্ঞান উন্মুক্ত মন নিয়ে এগোয় বলেই তার পুরানো সিদ্ধান্তগুলি নতুন নতুন তথ্যের আলোকে নিত্যই সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়ে চলেছে।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানেরও গতি হল বিশেষ (particular) থেকে সাধারণের (general) দিকে, তার পদ্ধতি হল আরোহমূলক (inductive)। কারণ তা কতকগুলি বিশেষ দৃষ্টান্তকে পর্যবেক্ষণ করে তা থেকে একটি সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করে। ভাষাবিজ্ঞান ক্রমশ বিশেষ থেকে সাধারণের দিকে এগিয়ে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো সাধারণ সূত্র রচনা করে চলে। এই সাধারণ সূত্রগুলি ভাষাপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে অর্থাৎ ভাষার বিভিন্ন উপাদান--ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি—কিভাবে সৃষ্ট হয়, কিভাবে কাজ করে তার রহস্য ব্যাখ্যা করে। ভাষাবিজ্ঞানের জিজ্ঞাসা বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে, বিশেষ ভাষা থেকে শুরু হয় ; কিন্তু ক্রমশ তা অধিকতর সাধারণ সূত্রের দিকে এগিয়ে যায়। সবশেষে তা ভাষার এমন সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করে যা সাধারণ ভাবে সব ভাষারই মূল প্রক্রিয়া ব্যাখ্যায় সহায়তা করে। এই জন্যে চরম বিচারে ভাষাবিজ্ঞান হল সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান (General Linguistics)।

পক্ষান্তরে Philology হল ভাষাবিশেষের আলোচনা, কোনো এক বা একাধিক ভাষার পুঁথি বা গ্রন্থ-পাঠ, তার ভাষার বিশ্লেষণ ও টীকা রচনা এবং তা থেকে তার সাহিত্যের ও সংস্কৃতির রহস্য-সন্ধান। Philology-কে তাই বলা যায় 'সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব'। Linguistics-এও ভাষাবিশেষের আলোচনা হতে পারে, কিন্তু সেখানে লক্ষ্য হল ভাষাবিশেষকে বিশ্লেষণ করে ভাষার সাধারণ সূত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আর Philology-তে ভাষাবিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সূত্রগুলি প্রয়োগ করে একটি বা একাধিক ভাষার বিশেষ রূপটি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়, সেখানে লক্ষ্য বিশেষ ভাষাটিকেই বুঝে তার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বুঝতে সহায়তা করা। সেখানে প্রবণতাটি হল বিশেষ থেকে বিশেষেরই অন্তরালশায়ী ভাববস্তুকে ধরার দিকে। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে, Linguistics ও Philology-র এই পার্থক্য চরম বা চূড়ান্ত কোনো ব্যাপার নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রাও (Philologists) ভাষার অনেক সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। আবার একালের ভাষাবিজ্ঞানীরাও (Linguists) অনেকে ভাষাবিশেষের রূপ বিশ্লেষণ করে তার অন্তরের গভীর অর্থসম্পদকে ধরবার কাজে সহায়তা করেছেন। সুতরাং

Philology ও Linguistics দুইয়ের মধ্যে লেনদেন প্রায়ই হয়ে থাকে এবং হওয়াই স্বাভাবিক। তবু তাত্ত্বিক বিচারের খাতিরে Philology ও Linguistics-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব (Philology) প্রধানত প্রাচীন ভাষার অধ্যয়নে নিবিষ্ট। গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত, গথিক, হিব্রু, আবেস্তীয়, প্রাচীন পারসিক প্রভৃতি ভাষায় রচিত গ্রন্থ ও প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা বিশ্লেষণ এবং তার দ্বারা সংশ্লিষ্ট জাতির ইতিহাস, তাদের ধর্ম-সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস অধ্যয়নে সহায়তা করেছেন সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ। অন্যপক্ষে ভাষাবিজ্ঞানীরা (Linguists) মন দিয়েছেন প্রধানত আধুনিক ভাষার—বিশেষত জীবন্ত কথ্যভাষার[১৭]—বিশ্লেষণে এবং ভাষার সাধারণ তত্ত্ব অনুসন্ধানে। সাংস্কৃতিক ভাষাবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ভাষার উৎস, বংশপরিচয় ও ইতিহাস সন্ধান করতেন, বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রধানত ভাষার গঠন (structure) ও ক্রিয়া (function) বিশ্লেষণ করেন। সাংস্কৃতিক ভাষাবিজ্ঞানের সমৃদ্ধি হয়েছিল প্রধানত ঊনবিংশ শতাব্দীতে, তার প্রধান পীঠস্থান ছিল জার্মানি। আর বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানের বিশেষ বিকাশ হল বিংশ শতাব্দীতে, তার প্রধান কেন্দ্র হল আমেরিকা। তবে সবশেষে মনে রাখতে হবে , আধুনিককালে ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্র অনেক প্রসারিত হয়েছে। ফলে সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বের (Philology) অনেক প্রসঙ্গই বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানে (Linguistics) এসে পড়েছে। এখন ভাষার ইতিহাস, ভাষার সঙ্গে জাতিতত্ত্বের সম্পর্ক, ভাষার সামাজিক দিক এবং ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হয়ে থাকে এবং তার ফলে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের নানা শাখা—historical linguistics, anthropological linguistics, sociolinguistics, semiology, semasiology, stylistics প্রভৃতি—গড়ে উঠছে। আসলে ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্র এখন প্রসারিত হচ্ছে ; ফলে সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানের এখন আর বিশেষ কোনো ভেদ নেই। Philology বনাম Linguistics-এর বিরোধ এখন অচল, বাঙ্‌মীমাংসা ও ভাষাবিজ্ঞানের পার্থক্য এখন শুধুই তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয়, কার্যত দুয়ের মধ্যে মিলন-মিশ্রণ আধুনিক মনের অনন্ত জ্ঞান-তৃষ্ণার ফলশ্রুতি ; এখন মিলন, সম্প্রসারণ, উদারতাই আধুনিকতার অভিজ্ঞান।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষা সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণার বিকাশ হয় আধুনিক কালেই ; তবু মানুষের ভাষাজিজ্ঞাসা ভারতবর্ষ এবং পাশ্চাত্যে বহু প্রাচীনকালেই

১৭। cf. "The problem of linguistics concerns mainly the spoken language though written language forms are also considered."–Pei, Merio : *Invitation to Linguistics,* London ; George Allen and Unwin Ltd., 1965.

সূচিত হয়েছিল। এমনকি, প্রাচীন ভারতে পাণিনি-প্রমুখ মনীষীরা তাঁদের ভাষাবিষয়ক আলোচনায় যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালে 'ভাষাবিজ্ঞান' (Linguistics), 'ভাষাতত্ত্ব', 'বাঙ্‌মীমাংসা' (Philology) প্রভৃতি শব্দের প্রচলন হয়নি। তখনকার ভাষাবিষয়ক আলোচনার নীতি-পদ্ধতিও ছিল খানিকটা স্বতন্ত্র ধরনের। যেরূপে সেকালের ভাষাবিষয়ক আলোচনার বিশেষ বিকাশ হয়েছিল তাকে ভারতবর্ষে সাধারণত 'ব্যাকরণ' বলা হত। কেউ কেউ তাকে 'শব্দবিদ্যা'ও বলেছেন। আর পাশ্চাত্যে বলা হত 'Grammar'। সেই থেকে ভাষা-বিশ্লেষণমূলক আলোচনার সাধারণ নাম দাঁড়িয়ে গেছে ব্যাকরণ বা Grammar। কথাটি এখন ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ একে Linguistics বা বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞান অর্থেও ব্যবহার করে থাকেন।

কিন্তু মধ্যযুগে ব্যাকরণ বা Grammar শব্দের একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তখন ব্যাকরণ বা Grammar বলতে নির্দেশমূলক (normative) বা বিধিনিষেধমূলক (prescriptive) ব্যাকরণ বোঝাত। কারণ ভাষাকে আমরা লোকমুখে বাস্তব ব্যবহারে কিরূপে পাচ্ছি তা বিশ্লেষণ না করে ভাষার শুদ্ধ মার্জিত রূপ কি হওয়া উচিত, সেই শুদ্ধ রূপ অর্জনের জন্যে আমাদের কোন্ কোন্ অশুদ্ধ রূপ সংশোধন করতে হবে, এইটা নির্দেশ করাই মধ্যযুগে ব্যাকরণের উদ্দেশ্য হয়ে উঠে। এই নির্দেশমূলক ধারণাটি এত বলিষ্ঠ ও ব্যাপক হয়ে উঠেছিল যে এখনো পর্যন্ত আমাদের বিদ্যালয়-পাঠ্য ব্যাকরণে তার জের চলেছে। একালের একটি প্রামাণিক ব্যাকরণ থেকে নিদর্শন দিচ্ছি : "যে বিদ্যার দ্বারা কোনও ভাষাকে বিশ্লেষ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয়, এবং সেই ভাষার পঠনে ও লিখনে এবং তাহাতে কথোপকথনে শুদ্ধ-রূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ (Grammar) বলে।"[১৮] আচার্য সুনীতিকুমার ভাষাতত্ত্ববিদ্ ছিলেন বলে এই সংজ্ঞায় তিনি ভাষার রূপ-বিশ্লেষণের দিকটি বাদ দেননি, কিন্তু অশুদ্ধি বর্জন করে শুদ্ধরূপটি শিক্ষাদান করাকেই তিনিও ব্যাকরণের উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ পুরানো নির্দেশমূলক ব্যাকরণের ধারণাটি এখনো রয়ে গেছে। এই শুদ্ধিবাদী (purist) আদর্শের দীক্ষা আমরা স্কুল থেকে পেয়ে আসি বলে ব্যাকরণ বলতে আমরা শুদ্ধি-অশুদ্ধি বিচারটাকেই মুখ্যত বুঝে থাকি। কিন্তু একে আধুনিকেরা 'Normative Grammar' বলে থাকেন। তাঁদের মতে ভাষায় অশুদ্ধ রূপ বলে কিছু নেই, কোন্‌টি প্রচলিত রূপ সেইটা দেখাই বৈয়াকরণের উদ্দেশ্য এবং প্রচলিত রূপটি বিশ্লেষণ করে তার গঠনরীতি সম্পর্কে সাধারণ সূত্র রচনা

১৮। চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুনীতিকুমার : 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২, পৃঃ ১০।

করাই তাঁর কাজ। এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির একজন বড় প্রবক্তার কথা হল : "......grammarians have absolutely no authority to prescribe what is 'right' or 'wrong' but can merely state what is the actual usage, and they are good or bad grammarians as they report truthfully on this point"[১৯] একটি উদাহরণ দিলে আধুনিকদের এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বোঝা যাবে। যেমন,—কেউ যদি বলে—"উনি বলল—এই গ্রামে বন্যা হয় নি।" তাহলে আমাদের মনে হতে পারে এই বাক্যটিতে ভুল আছে : বাক্যের কর্তা যেহেতু সম্মানসূচক সর্বনাম 'উনি', সেহেতু তার ক্রিয়াও হবে সেই রকম সম্মানসূচক 'বললেন'। এখানে 'বললেন' স্থলে 'বলল' প্রয়োগটি ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ। তেমনি ইংরেজিতে 'I will go', 'I will tell you' প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভুল আছে বলে মনে হতে পারে :

'I'-এর সঙ্গে 'will'-এর ব্যবহার ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ। বৈয়াকরণরা বলবেন, 'I'-এর সঙ্গে 'shall' এবং 'you'-এর সঙ্গে 'will'-এর প্রয়োগ হওয়া উচিত, 'I'-এর সঙ্গে 'will'-এর ব্যবহার হবে শুধু বিশেষ জোর (emphasis) দেবার সময়। কিন্তু ইংরেজরা জোর দেওয়া ছাড়া সাধারণ ক্ষেত্রেও 'I'-এর সঙ্গে 'will' ব্যবহার হামেশাই করে থাকে। ব্যাকরণের বিচারে ইংরেজদের এই প্রথা অশুদ্ধ। ব্যাকরণের এই যে বিচার, এটা Normative Grammar-এর বিচার। কিন্তু আধুনিকেরা বলবেন, বাক্যগুলিতে কোনো ভুল নেই। কারণ বাংলার ঐ পূর্বোল্লিখিত প্রয়োগটি বাংলার কোনো-কোনো অঞ্চলে গ্রাম্য লোকেদের মধ্যে প্রচলিত আছে। যা বাস্তবে প্রচলিত আছে তা বিশ্লেষণ করাই বৈয়াকরণের উদ্দেশ্য। প্রচলিত রূপের বাস্তব বিশ্লেষণ আধুনিক বৈয়াকরণদের উদ্দেশ্য বলে তাঁদের ব্যাকরণকে 'বাস্তব ব্যাকরণ' (Positive Grammar) বলে। ব্যুৎপত্তি বিচারে 'ব্যাকরণ' (বি + আ + √কৃ + অনট্ = ব্যাকরণ) কথাটির অর্থ ব্যাকৃত করা অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট করা—ভাষার গঠনের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করা[২০]। এই অর্থেই শব্দটির প্রথম প্রয়োগ পাওয়া যায় যজুর্বেদে [২১]। সেখানে বলা হয়েছে ইন্দ্র প্রথম ভাষাকে ব্যাকৃত করেছিলেন। কিন্তু এই বাস্তব

১৯। Wyld, H. C. : *Historical Study of the Mother Tongue*, p. 3.

২০। cf, "Vyākarana, n. separation, distinction, discrimination, MBh.; explanation, detailed description, ib. ; ..." —Monier-Williams : *A Sanskrit-English Dictionary*, Delhi ; Motilal Banarasidass, 1970, p. 1035.

২১। কৃষ্ণ-যজুর্বেদ, ৬ষ্ঠ কাণ্ড, ৪র্থ প্রপাঠক, ৭।

(positive) বিশ্লেষণের অর্থ শেষ পর্যন্ত ব্যাকরণের থাকেনি। বৈদিক ভাষাকে যাঁরা 'দেবভাষা' বলে শ্রদ্ধা করতেন তাঁরা তাকে অপরিবর্তিত রূপে ধরে রাখতে চাইলেন। কিন্তু ভাষা মাত্রেই প্রাকৃতিক নিয়মে পরিবর্তনশীল। বৈদিক ভাষার স্বাভাবিক যুগগত পরিবর্তনকে বিকৃতি মনে করে সেই বিকৃতি রোধ করার জন্যে যখন ভারতীয় মনীষীরা তৎপর হয়ে উঠলেন তখনই সংস্কৃত ব্যাকরণগুলি রচিত হল। সুতরাং ভারতবর্ষে ব্যাকরণ রচনার মূল উদ্দেশ্যের মধ্যেই সেই শুদ্ধিবাদী নির্দেশমূলক মনোভাবটি ছিল। তবু পাণিনি আদর্শ সংস্কৃত ভাষার যে রূপ-বিশ্লেষণ করেছেন তাতে সেকালের পক্ষে অপ্রত্যাশিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। পাশ্চাত্যেও প্রথমে গ্রীক-লাতিন ভাষার বাস্তব (positive) বিশ্লেষণ থেকেই সূত্র রচনা করে ব্যাকরণের জন্ম হয়েছিল। তার পরে মধ্যযুগে তার যান্ত্রিক অনুসরণের ফলে ব্যাকরণ সম্পর্কে নির্দেশমূলক দৃষ্টিভঙ্গিটি গড়ে উঠে। কিন্তু আধুনিককালে ভাষার বিশ্লেষণ, বর্ণনা এবং ব্যাখ্যাই ব্যাকরণের তাৎপর্য হয়ে উঠছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন তাঁরা নির্দেশমূলক দিকটির উপরে গুরুত্ব দেননি, তুলনামূলক বাস্তব বর্ণনাই তাঁদের ব্যাকরণের উদ্দেশ্য ছিল। এই ধারাটির চরম বিকাশ যাঁর রচনায় হয়েছিল সেই ব্রুগ্‌মান্‌ই (Karl Brugmann) তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন 'Outline of the Comparative Grammar of the Indo-European Languages'। আধুনিককালের চম্‌স্কির ভাষাতত্ত্বের নামও 'Transformational Generative Grammar'। আর বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরাও Descriptive Linguistics অর্থেই Descriptive Grammar কথাটির ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু বাংলায় প্রবীণ ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডঃ সুকুমার সেন Descriptive Linguistics ও Descriptive Grammar-এর মধ্যে পার্থক্য দেখাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে : "বর্ণনামূলক ব্যাকরণের সঙ্গে বর্ণনামূলক ভাষাবিশ্লেষণের (Descriptive Linguistics) পার্থক্য জানা দরকার। বর্ণনামূলক ব্যাকরণে ঐতিহাসিক ব্যাকরণের সম্পর্ক সম্পূর্ণ এড়ানো হয় না। কিন্তু বর্ণনামূলক ভাষাবিশ্লেষণে সে ভাষার অতীত ইতিহাস লইয়া কোনরূপ আলোচনা থাকে না, এখানে শুধু ব্যবহারিক দিক্ দিয়াই ভাষার গঠনরীতি বিশ্লেষণ করা হয়।"[২২] উদাহরণ দিয়ে তিনি এই পার্থক্যটি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন এইভাবে : বাংলায় 'করিল', 'করিব', 'করিতে'—এই ক্রিয়ারূপগুলি

২২। সেন, ডঃ সুকুমার : 'ভাষার ইতিবৃত্ত', কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ২৩।

বর্ণনামূলক ব্যাকরণে এইভাবে বিশ্লেষণ করা হয়—করিল = কর্ + ইল, করিব = কর্ + ইব, করিতে = কর্ + ইতে, কিন্তু ঐ একই ক্রিয়ারূপগুলি বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করলে বিশ্লিষ্ট অংশগুলি দাঁড়াবে অন্যরকম। যেমন, করিল = করি + ল, করিব = করি + ব, করিতে = করি + তে। বর্ণনামূলক ব্যাকরণ ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের বিশ্লেষণরীতির মধ্যে এই পার্থক্যের কারণ তাঁর মতে বোধ হয় এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে ব্যাকরণ-রচয়িতার মনে ঐতিহাসিক জ্ঞানের ফলে পূর্ব থেকেই এই বোধ ক্রিয়াশীল থাকে যে, ক্রিয়ার মূল ধাতুটি 'কর্'। সুতরাং সেটি আগে চিহ্নিত করে নিয়ে তিনি বিভক্তি-প্রত্যয়গুলি বিশ্লিষ্ট করেন। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের রূপমূল সনাক্ত করার (identification of morphemes) নিয়ম অনুসারে, তিনটি ক্রিয়ারূপের মধ্যে বৃহত্তম যতটুকু অংশ সাধারণ (common), সেইটুকুই ক্রিয়ার মূল অংশ ধরে নেওয়া হয়, তার পরে তিনটি ক্রিয়ারূপের মধ্যে যেটুকু অংশে পার্থক্য সেইটুকুকে বিভক্তিচিহ্নরূপে বিশ্লিষ্ট করা হয়। এখানে তিনটি ক্রিয়ারূপের মধ্যে সাধারণ (common) অংশ হল 'করি', আর এইটুকু বাদ দিলে তিনটি রূপের পার্থক্যচিহ্ন হল '-ল', '-ব' ও '-তে'। এখানে বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে ত্রুটি নেই। কিন্তু বিশ্লেষণের তথ্য (data) অপূর্ণ, সব পুরুষের সব ক্রিয়ারূপ ধরা হয়নি। তাই বিশ্লেষণ-ফলটি ভুল। এই ভুলের জন্যে মনে হচ্ছে ক্রিয়ামূলটি হল 'করি'। অন্তত আর একটি ক্রিয়ারূপ যদি আমরা তথ্যের মধ্যে আনি তা হলে ফল দাঁড়াবে অন্যরূপ। 'তুই' কর্তার সঙ্গে অনুজ্ঞায় যে ক্রিয়ারূপটি হবে সেটা হল 'কর্'। এটি যোগ করলে সমগ্র তথ্য হল 'করিল', 'করিব', 'করিতে' এবং 'কর্'। এবার সেই চারটি রূপের মধ্যে সাধারণ (common) অংশ হল 'কর্'। এটিকে ক্রিয়ার মূল অংশ ধরলে বিভক্তিগুলি হবে যথাক্রমে 'ইল', 'ইব', 'ইতে' এবং শূন্য-বিভক্তি। তা হলে দেখা যাচ্ছে, তথ্য যদি পূর্ণাঙ্গ হয় তবে বর্ণনামূলক ব্যাকরণের বিশ্লেষণ-ফল এবং বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-ফল মূলত একই দাঁড়াবে। বস্তুত ডঃ সেন কথিত বর্ণনামূলক ব্যাকরণের বিশ্লেষণে যে 'কর্' ধাতু সম্পর্কে ঐতিহাসিক ধারণাটি ক্রিয়াশীল সেই কর্ ধাতুও তো এইভাবে সব ক'টি ক্রিয়ারূপ বিশ্লেষণ করেই নির্ণীত হয়েছিল। চরম বিশ্লেষণে তাই বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ও বর্ণনামূলক ব্যাকরণে কোনো পার্থক্য নেই, এবং আধুনিক কালে পাশ্চাত্যে এরকম কোনো পার্থক্য ধরাও হয় না। অধ্যাপক সেন যে এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য দেখেছেন তার কারণ তিনি বোধ হয় বর্ণনামূলক ব্যাকরণ বলতে প্রচলিত ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণই (traditional grammar) বোঝাতে চেয়েছেন;

কারণ ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণের সঙ্গেই ঐতিহাসিক ব্যাকরণের সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু আধুনিক কালে পাশ্চাত্যে বর্ণনামূলক ব্যাকরণ প্রচলিত ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণ অর্থে গ্রহণ করা হয় না, যদিও ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণেও বর্ণনামূলক ব্যাকরণের অনেক উপাদান রয়েছে। আধুনিক কালে বরং বর্ণনামূলক ব্যাকরণ কার্যত বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান অর্থেই ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ দু'য়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। পার্থক্য যদি তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে কিছু করতেই হয় তবে তা এরকম হওয়া উচিত—বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে সাধারণ তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দিকটিই মুখ্য ; আর বর্ণনামূলক ব্যাকরণে ভাষাবিশেষের ব্যবহারিক বাস্তব বর্ণনা ও বিশ্লেষণই প্রধান।

॥ ৫ ॥

এককালিক / বর্ণনামূলক ও কালক্রমিক / ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান

(Synchronic/Descriptive and Diachronic/Historical Linguistics)

ভাষা সম্পর্কে আলোচনা ও ভাষার বিশ্লেষণ দু'ভাবে হতে পারে—

(ক) কোনো ভাষার একটি নির্দিষ্ট কালের রূপ বিশ্লেষণ ও বর্ণনা এবং

(খ) কোনো ভাষার বিভিন্ন কালের বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ।

প্রথমটিকে এককালিক বা বর্ণনামূলক (Synchronic / Descriptive), দ্বিতীয়টিকে কালক্রমিক বা ঐতিহাসিক (Diachronic / Historical) ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics) বলে। Synchronic ও Diachronic কথা দু'টির মধ্যেই এদের অর্থ নিহিত আছে। 'Chronos' শব্দের অর্থ 'একটি কাল', 'যে-কোনো একটি সময়'। আর 'dia' অর্থ হল 'অতিক্রম করে', 'পেরিয়ে'। সুতরাং diachronic মানে হল 'যা একটি কালকে অতিক্রম করে যায়', অর্থাৎ 'যা বিভিন্ন কালের ধারা অনুসরণ করে।' তেমনি synchronic কথার অর্থ হল 'যা একটি কালের সঙ্গে আছে।' কারণ 'syn' মানে 'সঙ্গে', আর 'chronos' মানে আগেই বলেছি 'একটি কাল'। Synchronic Linguistics-এর আলোচ্য বিষয় একটি কালের সীমা পেরিয়ে যায় না, একটি কালেই তার আলোচ্য বিষয় সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে একটি কাল বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি? কাল তো একটা প্রবাহ। তার একটি বিন্দুকে, একটি ক্ষণকে কি একটা কাল বলব? কালের একটা ক্ষণকে চিহ্নিত করে সেই ক্ষণের কোনো ভাষার রূপ বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করা কি সম্ভব? সূক্ষ্মতর বিচারে হেরাক্লিতাসের দার্শনিক উপলব্ধিটি মনে রেখে

বলা যায়, একই নদীতে আমরা দু'বার ডুব দিতে পারি না, কারণ প্রতি মুহূর্তেই নদী পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। ভাষাও তেমনি কোনো একটি কালের বিন্দুতে স্থির থাকে না। বর্ণনা ও বিশ্লেষণে যে সময়টুকু লাগে তাতে ভাষাও খানিকটা পরিবর্তিত হয়েই যায়। সুতরাং আমরা দাবি করতে পারি না যে, কোনো ভাষার একটিমাত্র কালের রূপবর্ণনা করতে পেরেছি। আসলে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের দাবি আপেক্ষিক মাত্র। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে শুধু মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, একটি যুগে ভাষা স্থির হয়ে আছে এবং সেই যুগের ভাষার রূপ বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করা হচ্ছে।

একটি উদাহরণ দিলে ভাষাবিজ্ঞানের দুই ধারার দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির পার্থক্য সহজ করে বোঝা যাবে। ভাষার বিভিন্ন উপাদান হল ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি। এগুলিকে বর্ণনামূলক ও ঐতিহাসিক উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিশ্লেষণ করা যায়। আগেই বলেছি, বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার উপাদানগুলির একটি নির্দিষ্ট সময়ের গঠন ও রূপ বিশ্লেষণও বর্ণনা করা হয়। যেমন বাংলার একটি সর্বনাম শব্দ হল 'আমি'। শব্দটিকে আমরা যদি বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে আগে স্থির করে নিতে হবে এই শব্দটির কোন্ সময়ের বা কোন্ যুগের রূপ বিশ্লেষণ করতে চাইছি। কারণ শব্দটি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে যে-কোনো একটি যুগেরই রূপ বিশ্লেষণ করতে হবে। আমরা যদি চাই যে শব্দটির এখনকার রূপ বিশ্লেষণ করব তা হলে দেখা যাচ্ছে শব্দটির এখনকার রূপ হল 'আমি'। শব্দটির এখনকার গঠন বর্ণনামূলক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে শব্দটি কয়েকটি ধ্বনি নিয়ে গঠিত। যেমন আমি = আ + ম্ + ই। বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শব্দটির গঠন আপাতত এইভাবে বর্ণনাই যথেষ্ট ; অতীতে শব্দটির কি রূপ ছিল তা বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শব্দটির সম্পর্কে আলোচনা হবে অন্যরকম। অনুসন্ধান করে দেখতে হবে অতীতে শব্দটির কি রূপ ছিল, অর্থাৎ কোন্ শব্দ থেকে 'আমি' শব্দটির জন্ম। বর্তমান রূপে পৌঁছাবার আগে শব্দটির মধ্যবর্তী স্তরই বা কি ছিল। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে আমরা শব্দটির আলোচনা এইভাবে করব—"আমি" শব্দটির আদি উৎস হল সংস্কৃত 'অস্মাভিঃ' ('অস্মদ্' শব্দের তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচনের রূপ)। 'অস্মাভিঃ' পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃত ভাষায় হল 'অম্হাহি', তা থেকে অপভ্রংশে হল 'অম্হহি'। অপভ্রংশের পরে প্রাচীন বাংলায় হল 'আম্হে' (আহ্মে, আম্ভে, অহ্মে, অম্ভে), সেটা মধ্য বাংলায় হল আহ্মে', 'আহ্মি' ; শেষে আধুনিক বাংলায় হল 'আমি'। অথবা বৈদিক ৪র্থী / ৭মীর বহুবচনের পদ 'অস্মে' > প্রা 'অম্হে' > প্রা-বাং 'আম্হে' / 'অম্হে' > 'অম্হি' > ম - বাং 'আহ্মি' > আ - বাং

'আমি'। আবার শব্দটির কারকভেদে পৃথক রূপও বর্ণনামূলক ও ঐতিহাসিক উভয় প্রকার ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা-আলাদা ভাবে আলোচিত হতে পারে। বিভিন্ন কারকে 'আমি' শব্দের শুধু একবচনের রূপই আপাতত দেখা যাক : কর্তৃকারক = আমি ; কর্মকারক ও সম্প্রদানকারক = আমাকে ; করণকারণ আমার দ্বারা ; অপাদানকারক = আমা হতে, আমা থেকে ; সম্বন্ধপদ = আমার ; অধিকরণকারক = আমাতে, আমার মধ্যে। পদগুলি বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করলে রূপগুলির বর্ণনা দাঁড়াবে এইরকম—

মূল্ শব্দ 'আমি'। কর্তৃকারকে আমি + শূন্য-বিভক্তি। কর্ম, সম্প্রদান, করণ, অপাদান ও অধিকরণে রূপতত্ত্বপ্রভাবিত ধ্বনি পরিবর্তন (morphophonemic change) হয়ে মূল শব্দটি হয়ে গেছে 'আমা'। তার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কারকের বিভক্তি-চিহ্ন বা অনুসর্গ এইভাবে বিশ্লিষ্ট হবে—

কর্ম ও সম্প্রদান = আমা + কে ; করণ = আমা + র দ্বারা (অনুসর্গ) ;
অপাদান = আমা হতে (অনুসর্গ) ; সম্বন্ধ পদ = আমা + র ;
অধিকরণ = আমা + তে।

মোটামুটি এই হল বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-ফল। এখানে আধুনিক বাংলার কোন্ বিভক্তি বা কোন্ অনুসর্গটি কোথা থেকে এসেছে, এবং প্রাচীন বাংলা ও মধ্য-বাংলায় তাদের রূপ কি ছিল তা আলোচনা করা হচ্ছে না। সে-সব হল ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে আলোচনা করে দেখান হবে 'আমি' শব্দটি কেমন করে ধাপে ধাপে 'অস্মে' / 'অস্মাভিঃ' শব্দ থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছে। সেটি আমরা আগেই দেখিয়েছি। তারপরে বিশ্লেষণ করা হবে বিভিন্ন কারকে এই শব্দের যে-সব রূপ পাই তাদের উৎস ও ইতিহাস। একটি কারকের দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। সংস্কৃত শব্দ অস্মাকম্ > প্রাচীন বাংলা আহ্মা > আদি-মধ্য বাংলা আহ্মা > অন্ত্য-মধ্য বাংলা আমা > আধুনিক বাংলা আমা। তার সঙ্গে 'কে' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। আবার এই 'কে' বিভক্তিরও ইতিহাস বিবৃত করা হবে এইভাবে—সংস্কৃত কৃত > প্রাকৃত কঅ > ক, ক + তির্যক এ = কে। অথবা সংস্কৃত কৃতঃ > কএ > কএ > কই > = কে।

এমনি করে প্রত্যেকটি মূল শব্দ ও তার বিভক্তির ইতিহাস আলোচনা করা যেতে পারে। সবগুলির আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজন নেই। যে উদাহরণ দেওয়া হল তাতেই বর্ণনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির মূল পার্থক্য বোঝা যাবে। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাষার যে বর্ণনা দেওয়া হয় তাকে সাধারণত যথাক্রমে বর্ণনামূলক ও ঐতিহাসিক ব্যাকরণ বলা হয়। ব্যাকরণ তাই দু'প্রকার। ডঃ সুকুমার সেনের মতে ব্যাকরণ তিন প্রকার—

বলা যায়, একই নদীতে আমরা দু'বার ডুব দিতে পারি না, কারণ প্রতি মুহূর্তেই নদী পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। ভাষাও তেমনি কোনো একটি কালের বিন্দুতে স্থির থাকে না। বর্ণনা ও বিশ্লেষণে যে সময়টুকু লাগে তাতে ভাষাও খানিকটা পরিবর্তিত হয়েই যায়। সুতরাং আমরা দাবি করতে পারি না যে, কোনো ভাষার একটিমাত্র কালের রূপবর্ণনা করতে পেরেছি। আসলে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের দাবি আপেক্ষিক মাত্র। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে শুধু মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, একটি যুগে ভাষা স্থির হয়ে আছে এবং সেই যুগের ভাষার রূপ বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করা হচ্ছে।

একটি উদাহরণ দিলে ভাষাবিজ্ঞানের দুই ধারার দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির পার্থক্য সহজ করে বোঝা যাবে। ভাষার বিভিন্ন উপাদান হল ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি। এগুলিকে বর্ণনামূলক ও ঐতিহাসিক উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিশ্লেষণ করা যায়। আগেই বলেছি, বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার উপাদানগুলির একটি নির্দিষ্ট সময়ের গঠন ও রূপ বিশ্লেষণও বর্ণনা করা হয়। যেমন বাংলার একটি সর্বনাম শব্দ হল 'আমি'। শব্দটিকে আমরা যদি বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে আগে স্থির করে নিতে হবে এই শব্দটির কোন্ সময়ের বা কোন্ যুগের রূপ বিশ্লেষণ করতে চাইছি। কারণ শব্দটি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে যে-কোনো একটি যুগেরই রূপ বিশ্লেষণ করতে হবে। আমরা যদি চাই যে শব্দটির এখনকার রূপ বিশ্লেষণ করব তা হলে দেখা যাচ্ছে শব্দটির এখনকার রূপ হল 'আমি'। শব্দটির এখনকার গঠন বর্ণনামূলক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে শব্দটি কয়েকটি ধ্বনি নিয়ে গঠিত। যেমন আমি = আ + ম্ + ই। বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শব্দটির গঠন আপাতত এইভাবে বর্ণনাই যথেষ্ট ; অতীতে শব্দটির কি রূপ ছিল তা বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শব্দটির সম্পর্কে আলোচনা হবে অন্যরকম। অনুসন্ধান করে দেখতে হবে অতীতে শব্দটির কি রূপ ছিল, অর্থাৎ কোন্ শব্দ থেকে 'আমি' শব্দটির জন্ম। বর্তমান রূপে পৌঁছাবার আগে শব্দটির মধ্যবর্তী স্তরই বা কি ছিল। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে আমরা শব্দটির আলোচনা এইভাবে করব—"আমি" শব্দটির আদি উৎস হল সংস্কৃত 'অস্মাভিঃ' ('অস্মদ্' শব্দের তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচনের রূপ)। 'অস্মাভিঃ' পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃত ভাষায় হল 'অম্হাহি', তা থেকে অপভ্রংশে হল 'অম্হহি'। অপভ্রংশের পরে প্রাচীন বাংলায় হল 'আম্হে' (আহ্মে, আম্ভে, অহ্মে, অম্ভে), সেটা মধ্য বাংলায় হল আহ্মে', 'আহ্মি' ; শেষে আধুনিক বাংলায় হল 'আমি'। অথবা বৈদিক ৪র্থী / ৭মীর বহুবচনের পদ 'অস্মে' > প্রা 'অম্হে' > প্রা-বাং 'আম্হে' / 'অম্হে' > 'অম্হি' > ম - বাং 'আহ্মি' > আ - বাং

'আমি'। আবার শব্দটির কারকভেদে পৃথক রূপও বর্ণনামূলক ও ঐতিহাসিক উভয় প্রকার ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা-আলাদা ভাবে আলোচিত হতে পারে। বিভিন্ন কারকে 'আমি' শব্দের শুধু একবচনের রূপই আপাতত দেখা যাক : কর্তৃকারক = আমি ; কর্মকারক ও সম্প্রদানকারক = আমাকে ; করণকারণ = আমার দ্বারা ; অপাদানকারক = আমা হতে, আমা থেকে ; সম্বন্ধপদ = আমার ; অধিকরণকারক = আমাতে, আমার মধ্যে। পদগুলি বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করলে রূপগুলির বর্ণনা দাঁড়াবে এইরকম—

মূল শব্দ 'আমি'। কর্তৃকারকে আমি + শূন্য-বিভক্তি। কর্ম, সম্প্রদান, করণ, অপাদান ও অধিকরণে রূপতত্ত্বপ্রভাবিত ধ্বনি পরিবর্তন (morphophonemic change) হয়ে মূল শব্দটি হয়ে গেছে 'আমা'। তার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কারকের বিভক্তি-চিহ্ন বা অনুসর্গ এইভাবে বিশ্লিষ্ট হবে—

কর্ম ও সম্প্রদান = আমা + কে ; করণ = আমা + র দ্বারা (অনুসর্গ) ;
অপাদান = আমা হতে (অনুসর্গ) ; সম্বন্ধ পদ = আমা + র ;
অধিকরণ = আমা + তে।

মোটামুটি এই হল বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-ফল। এখানে আধুনিক বাংলার কোন্ বিভক্তি বা কোন্ অনুসর্গটি কোথা থেকে এসেছে, এবং প্রাচীন বাংলা ও মধ্য-বাংলায় তাদের রূপ কি ছিল তা আলোচনা করা হচ্ছে না। সে-সব হল ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে আলোচনা করে দেখান হবে 'আমি' শব্দটি কেমন করে ধাপে ধাপে 'অস্মে' / 'অস্মাভিঃ' শব্দ থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছে। সেটি আমরা আগেই দেখিয়েছি। তারপরে বিশ্লেষণ করা হবে বিভিন্ন কারকে এই শব্দের যে-সব রূপ পাই তাদের উৎস ও ইতিহাস। একটি কারকের দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। সংস্কৃত শব্দ অস্মাকম্ > প্রাচীন বাংলা আহ্মা > আদি-মধ্য বাংলা আহ্মা > অন্ত্য-মধ্য বাংলা আমা > আধুনিক বাংলা আমা। তার সঙ্গে 'কে' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। আবার এই 'কে' বিভক্তিরও ইতিহাস বিবৃত করা হবে এইভাবে—সংস্কৃত কৃত > প্রাকৃত কঅ > ক, ক + তির্যক এ = কে। অথবা সংস্কৃত কৃতঃ > কএ > কএ > কই > = কে।

এমনি করে প্রত্যেকটি মূল শব্দ ও তার বিভক্তির ইতিহাস আলোচনা করা যেতে পারে। সবগুলির আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজন নেই। যে উদাহরণ দেওয়া হল তাতেই বর্ণনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির মূল পার্থক্য বোঝা যাবে। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাষার যে বর্ণনা দেওয়া হয় তাকে সাধারণত যথাক্রমে বর্ণনামূলক ও ঐতিহাসিক ব্যাকরণ বলা হয়। ব্যাকরণ তাই দু'প্রকার। ডঃ সুকুমার সেনের মতে ব্যাকরণ তিন প্রকার—

বর্ণনামূলক, ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক। কিন্তু ব্যাকরণের এই বিভাগ overlapping। কারণ তুলনামূলক ব্যাকরণ অর্থাৎ ভাষার তুলনামূলক আলোচনা ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক উভয় দৃষ্টিতেই করা যেতে পারে, সেই অনুসারে তুলনামূলক ব্যাকরণ কখনো বর্ণনামূলক, কখনো বা ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের অঙ্গ। উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করা হয়েছিল ভাষাসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য অনুসন্ধান করে তার ভিত্তিতে তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ করার জন্যে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের বংশগত (genealogical) উৎস সন্ধানের জন্যে। এই ভাবে তখনকার দিনে ভাষার উৎস ও ইতিহাস অধ্যয়নে সহায়তা করত বলে তুলনামূলক ব্যাকরণ ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের অঙ্গ ছিল। আর এখন একই কালের একটি ভাষার গঠনের সঙ্গে অন্য ভাষার গঠনের তুলনামূলক আলোচনার জন্যেও তুলনামূলক ব্যাকরণ রচিত হচ্ছে। এই তুলনার সাহায্যে এককালের ভাষার গঠনগত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে, তার বংশ বা ইতিহাস নির্ণয় এখানে উদ্দেশ্য নয়। এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার তুলনা করে পার্থক্যটি ধরিয়ে দেওয়ার ফলে অন্য ভাষা শিক্ষায় সহায়তা হচ্ছে। এর ফলে তুলনামূলক ব্যাকরণের একটি ফলিত (applied) ধারাও গড়ে উঠেছে—পার্থক্যমূলক বিশ্লেষণ—Contrastive Analysis। এখন তুলনামূলক ব্যাকরণ বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানেও স্থান লাভ করেছে। সুতরাং তুলনামূলক ব্যাকরণ ব্যাকরণের একটি পৃথক ধারা নয়, একে একটি পদ্ধতি বলতে পারি। ব্যাকরণ তা হলে দু'প্রকার—ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক। আর তুলনামূলক পদ্ধতি এই দু'য়ের যে কোনোটিতে সহায়ক পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

সাধারণভাবে এককালিক ভাষাবিজ্ঞানকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান এবং কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞানকে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বলে। এককালিক ভাষাবিজ্ঞান ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান এখন প্রায় একার্থক হয়ে গেছে ; কিন্তু এই দু'য়ের মধ্যেও সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্দেশ করেছেন ভাষাবিজ্ঞানী হকেট্ (Hockett)। সেই পার্থক্যটি এই যে, একই ভাষার মধ্যে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বা গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে বা অঞ্চলভেদে ভাষার যে অল্পস্বল্প পার্থক্য দেখা যায় বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে (Descriptive Linguistics) সেদিকে মনোনিবেশ করা হয় না, সেখানে একটি সমগ্র ভাষা-সম্প্রদায়ের শুধু সাধারণ ভাষারই এককালের রূপ বিশ্লেষণ করা হয়। অন্য দিকে এককালিক ভাষাবিজ্ঞানে (Synchronic Linguistics) একটি সমগ্র ভাষাসম্প্রদায়ের সাধারণ ভাষার এককালের রূপ তো বিশ্লেষণ করা হয়ই, তা ছাড়াও তাদের মধ্যে আবার ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বা গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে বা অঞ্চলভেদে ভাষার যে পার্থক্য দেখা যায় তাও বিশ্লেষণ করা হয়। অর্থাৎ বর্ণনামূলক (descriptive)

ভাষাবিজ্ঞানে শুধু ভাষা সম্পর্কে আলোচনা হয়, কিন্তু এককালিক (synchronic) ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার সঙ্গে ভাষার অন্তর্গত উপভাষা (dialect) ও ব্যক্তিভাষা (idiolect) সম্পর্কেও আলোচনা হয়।[২৩] তার ফলে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের চেয়ে এককালিক ভাষাবিজ্ঞানের গতি একটু বেশি গভীরতামুখী (intensive)। একই ভাষার মধ্যে যে আঞ্চলিক পার্থক্য তার অধ্যয়ন ও গবেষণা নিয়ে এককালিক (synchronic) ভাষাবিজ্ঞানে একটি স্বতন্ত্র ধারার বিকাশ হয়েছে যাকে বলে উপভাষাবিজ্ঞান (Dialectology)।

প্রায় অনুরূপ আর একটি ধারা হল ভৌগোলিক ভাষাবিজ্ঞান (Geolinguistics)। ভৌগোলিক ভাষাবিজ্ঞান হল মূলত বিভিন্ন ভাষার ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করা। এছাড়া অবশ্য সেই ভাষার জনজীবনের সঙ্গে যোগ, অবস্থানগত গুরুত্ব, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে যোগও নির্ণয় করা হয়। এর ফলে একটি ভাষা অন্য ভাষাকে যুগে-যুগে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা আমরা জানতে পারি, এবং তাতে ভাষার ইতিহাস অধ্যয়নের অনেক উপাদান লাভ করতে পারি। এদিক থেকে ভৌগোলিক ভাষাবিজ্ঞান ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের এক বিকশিত রূপের নাম গঠনকেন্দ্রিক বা অবয়ববাদী ভাষাবিজ্ঞান (Structural Linguistics)। ব্যাপক অর্থে গঠনকেন্দ্রিক ভাষাবিজ্ঞান বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকেই বোঝায়। কারণ ভাষার এককালের গঠন (Structure) বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করাই বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই ব্যাপক অর্থে নয়, এখন একটি বিশেষ অর্থে Structural Linguistics কথাটি ব্যবহৃত হয়। এই বিশেষ অর্থটি বোঝাবার জন্যে অনেকে অবয়ববাদ বা গঠনসর্বস্বতা (Structuralism) কথাটি ব্যবহার করেন। Structuralism এখন ভাষাবিজ্ঞানে একটি বিশিষ্ট মতবাদরূপেই প্রতিষ্ঠা

২৩। '*Descriptive linguistics* deals with the design of the language of some community at a given time, ignoring interpersonal and intergroup differences. Such differences are always to be found in any language spoken by more than one person, since no two people have exactly the same set of speech habits. *Synchronic linguistics* includes descriptive linguistics, and also certain futher types of investigation, particularly *synchronic dialectology,* which is the systematic study of inter-personal and inter-group differences of speech habit."– Hockett, Charles F. : *A Course in Modern Linguistics,* New York ; The Macmillan Company, 1968, p. 321.

লাভ করেছে। এই মতবাদের বক্তব্য হল—ভাষার গঠনে ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি সব মিলিয়েই একটা সামগ্রিক অবয়ব রচিত হয়। জীবন্ত সত্তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো ভাষার প্রত্যেকটি উপাদান পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, সব মিলিয়ে ভাষা একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়ারূপে কাজ করে ; তার কোনো উপাদানকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা যায় না। ভাষার দেহের একটি উপাদানে কোনো পরিবর্তন ঘটলে তা শুধু ঐ উপাদানকে প্রভাবিত করে না, অন্য উপাদানকেও প্রভাবিত করে—যেমন মানব শরীরের এক অঙ্গে কিছু ঘটলে তার অনুভূতি সর্ব-অঙ্গে পৌঁছায়। ভাষাকে এইভাবে একটি সামগ্রিক নিটোল অবয়ব বা গঠন (structure) রূপে গ্রহণ করা হচ্ছে structuralism-এর নতুন বক্তব্য।[২৪] এর আগে ভাষাকে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র উপাদানে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হত বলে তাকে অণু-ভাষাবিজ্ঞান (micro-linguistics) বলা হয়। আর আধুনিক Structural Linguistics-এ ভাষাকে তার পূর্ণ অখণ্ড রূপে দেখা হয় বলে তাকে অখণ্ড ভাষাবিজ্ঞান (macro-linguistics) বলা যায়। Structural Linguistics-এর আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ভাষার অর্থের দিকটি উপেক্ষা করে শুধু তার গঠনগত দিকটির উপরে জোর দেওয়া। অর্থনিরপেক্ষভাবে ভাষার বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করা গঠনসর্বস্বতাবাদীদের (Structuralists) বৈশিষ্ট্য।

এককালিক ভাষাবিজ্ঞানের যেমন নানা ধারা-উপধারা গড়ে উঠেছে কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞানেরও তেমনি আবার দুটি ধারা : Linguistic Ontogeny এবং Linguistic Phylogeny। একজন মানুষের মধ্যে শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার ভাষাশিক্ষা কিভাবে কালের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে বিবর্তিত হয় তা আলোচনা করাকে বলে ব্যক্তিবৃত্তীয় ভাষাতত্ত্ব বা ব্যক্তিগত ভাষার বিবর্তন-তত্ত্ব (Linguistic Ontogeny) ; আর ব্যক্তিনিরপেক্ষ ভাবে একটি ভাষাসম্প্রদায়ের ভাষা কিভাবে কালে-কালে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে তা অধ্যয়ন করাকে বলে সামগ্রিক ভাষার বিবর্তন-তত্ত্ব বা জাতিবৃত্তীয় ভাষাতত্ত্ব (Linguistic Phylogeny)। দ্বিতীয়টিরই বহুপ্রচলিত নাম হল ঐতিহাসিক

২৪। "Structural linguistics may also, however, be taken in a narrower sense to refer to the work of a particular school of descriptive linguistics which holds that language changes occur not in an individual or haphazard fashion but throughout the entire pattern or system of the language, with a definite inter-relation linking the changes to one another."--Pei, Mario : *Invitation to Linguistics,* London : George Allen & Unwin Ltd., 1965.

ভাষাবিজ্ঞান (Historical Linguistics বা Diachronic Linguistics)।

একটি ভাষার জীবনপ্রবাহের দু'টি স্তর আমাদের অভিজ্ঞতার আওতায় পড়ে—বর্তমান ও অতীত স্তর। দু'টিই ভাষাবিজ্ঞানে আলোচ্য। অতীত স্তরের আবার দুই পর্ব—ঐতিহাসিক (historic) ও প্রাগৈতিহাসিক (pre-historic)।

নীচের চিত্রের সাহায্যে আমরা ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটি উপস্থাপিত করতে পারি—
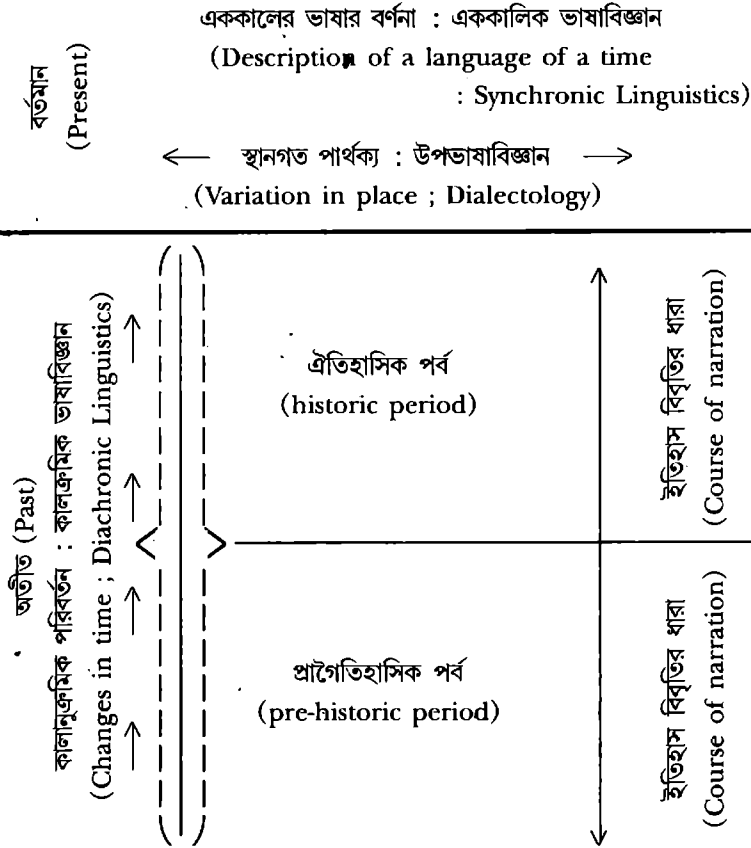
চিত্র নং ১

সুতরাং ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার যে ইতিহাস আলোচনা করা হয় তার এলাকা দুটি—ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক। কালের প্রবাহে দেখা যায়, কোনো

জাতি বা ভাষার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করতে গেলে কিছু দূর পর্যন্ত প্রাচীন কালের লিখিত প্রমাণাদি পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সীমা ছাড়িয়ে আরো প্রাচীন কালের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে দেখা যায় যে, আর কোনো লিখিত প্রমাণাদি পাওয়া যাচ্ছে না। ইতিহাসের উপাদানের লিখিত প্রমাণাদি যত পর্যন্ত পাঁওয়া যায় সেখান থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়কে ঐতিহাসিক কাল (historic period) বলে। আর ঐতিহাসিক কালের সীমা পেরিয়ে আরো প্রাচীনের দিকে এগিয়ে গেলে, প্রাচীনতম লিখিত প্রমাণাদি যা পাওয়া যায় তার চেয়েও প্রাচীনতর কালকে বলে প্রাগৈতিহাসিক কাল (pre-historic period)। যেমন, ভারতবর্ষে আর্যরা এসে বেদ রচনা করেন। আর্যদের ইতিহাসের প্রাচীনতম লিখিত প্রমাণ বেদেই পাওয়া যায়। বেদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে সময় তাকে ঐতিহাসিক কাল বলে। কিন্তু বেদের আগের কাহিনিটুকু প্রাগৈতিহাসিক কালের কাহিনি। ভাষার ইতিহাসেরও এরকম দু'টি পর্ব : — ঐতিহাসিক পর্ব (historical period) ও প্রাগৈতিহাসিক পর্ব (pre-historic period)। ভাষার ঐতিহাসিক কালের কাহিনি অধ্যয়নের জন্যে প্রাচীন পুঁথি, শিলালিপি, মৌখিক সাহিত্য, লোকসাহিত্য ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে প্রাগৈতিহাসিক কালের ভাষার ইতিহাস এবং ভাষাসমূহের বংশগত সম্পর্ক অধ্যয়নের জন্যে ভাষাবিজ্ঞানে চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়—

(১) আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন (Internal Reconstruction),

(২) বাহ্য পুনর্গঠন বা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পদ্ধতি (External Reconstruction or Comparative Method),

(৩) উপভাষাগত ভূগোল (Dialect Geography) এবং

(৪) শব্দভাণ্ডারের অবক্ষয় ও নতুন শব্দসৃষ্টির পরিসংখ্যান (Glottochronology অথবা Lexico-statistics)।

এই চারটির মধ্যে প্রথম দু'টি বহুপ্রচলিত ও বহুবিকশিত ধারা। এগুলি সম্পর্কে পরে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। এইভাবে আধুনিক কালে ভাষাবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক দুই ধারাই নানা পদ্ধতি ও গবেষণার মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে চলেছে এবং পরস্পরের পরিপূরক রূপে পরিপুষ্টি লাভ করেছে।

আধুনিককালে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান প্রতিদ্বন্দ্বী তো নয়ই, বরং পরস্পর-পরিপূরক। কারণ এ দু'টি হল একই বিষয়কে দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা। একের আবিষ্ক্রিয়া অন্যের প্রাপ্তিকে পূর্ণাঙ্গ করে। একটি

উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে আমরা একটি ভাষার একটি নির্দিষ্ট কালের রূপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করি। এই ব্যাখ্যা বুঝতে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের তথ্য অনেক সময় আমাদের সাহায্য করে। যেমন, বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের রীতিতে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি যে, তিনটি শিস্-ধ্বনি (sibilants) শ, ষ ও স-এর মধ্যে আধুনিক আদর্শ চলিত বাংলার (Standard Colloquial Bengali) উচ্চারণে (বানান-নিরপেক্ষভাবে) শুধু তালব্য 'শ'-এর প্রাধান্য রয়েছে, সেখানে দন্ত্য 'স' গৌণ। এত গৌণ যে বানানে যেখানে দন্ত্য 'স' লেখা হয় সেখানেও প্রায় তালব্য 'শ' উচ্চারিত হয়। যেমন 'সব'-এর উচ্চারণও 'শব'-এর মতো। বাংলায় বানানে 'সব' (all) ও 'শব' (dead body)-এর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও বাংলা উচ্চারণে দুই-ই এক। দু'য়ের উচ্চারণ-ই 'শব'। আবার আধুনিক আদর্শ হিন্দি (Standard Hindi) ভাষার উচ্চারণে (প্রায় বানান-নিরপেক্ষভাবে) দন্ত্য 'স'-ই প্রধান ধ্বনি, তালব্য 'শ' গৌণ। হিন্দি ভাষায় দন্ত্য 'স'-এর প্রাধান্য এত বেশি যে, অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতের তালব্য 'শ' হিন্দি বানানেও দন্ত্য 'স' হয়ে গেছে। যেমন সংস্কৃত 'দশ' > হিন্দি 'দস'। বাংলায় তালব্য 'শ'-এর প্রাধান্য ও হিন্দিতে দন্ত্য 'স'-এর প্রাধান্যের কারণটি আমরা ভাল করে বুঝতে পারব যদি আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাষা দু'টি অধ্যয়ন করে থাকি, অর্থাৎ এই ভাষা দু'টির বিবর্তনের ইতিহাস যদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমাদের জানা থাকে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক) থেকে ধাপে-ধাপে বিবর্তনের ফলে মধ্য ভারতীয় স্তরে ক্রমে পাঁচ রকমের সাহিত্যিক প্রাকৃতের জন্ম হয়েছিল—শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী, মাহারাষ্ট্রী। তারপরে অপভ্রংশ-অবহট্ঠের স্তর পেরিয়ে নব্যভারতীয় স্তরে শৌরসেনী থেকে জন্ম নিল হিন্দি আর মাগধী থেকে বাংলা ভাষা। এখন শৌরসেনীতেই ছিল দন্ত্য 'স'-এর প্রাধান্য আর মাগধীতে ছিল তালব্য 'শ'-এর প্রাধান্য। সুতরাং হিন্দিতে 'স'-এর প্রাধান্য ও বাংলায় 'শ'-এর প্রাধান্যের কারণটা যখন ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে উত্তরাধিকার সূত্রের মধ্যে পাই তখন বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাপ্ত আমাদের জ্ঞানটুকু পূর্ণাঙ্গ হয় ও দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পরিপূরক হতে পারে। তাই এককালে আধুনিকদের মধ্যে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি বিরূপ মনোভাব থাকলেও এখন তাঁদের অন্য সুর :

> ..."we may say that historical linguistics is actually one of the best means at the linguist's disposal for

> investigating the detailed structure of grammars...... careful analysis of linguistic changes may reveal otherwise inaccessible aspects of linguistic structure."[২৫]

অবশ্য বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীকে এ বিষয়ে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে—কোনো ভাষার উপাদান ও রূপ বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণের আগেই তিনি যেন ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা প্রভাবিত (biased) না হয়ে যান। যেমন, বাংলা ভাষার 'আমি' ও ভোজপুরী ভাষার 'হম্' যে মূল সংস্কৃত শব্দ থেকে জন্ম নিয়েছে সেই শব্দটি (অস্মাভিঃ) বহুবচনাত্মক। এখন এই ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টি যদি এতখানি প্রভাবিত হয়ে যায় যে তিনি বাংলা 'আমি' ও ভোজপুরী 'হম্' শব্দের, বর্তমান অর্থটি অনুসন্ধান না করেন তবে তিনি ধরে নিতে পারেন যে বর্তমানে শব্দ দু'টি বহুবচনাত্মক। এখানে ভাষাবিজ্ঞানী যদি বাংলা ভাষা না জানেন এবং ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা আগে থেকেই প্রভাবিত (biased) হয়ে থাকেন, তবে তাঁর পক্ষে এই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের তথ্য বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের তথ্যের পরিপূরক হতে পারে ; কিন্তু বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের তথ্য প্রতিষ্ঠার আগেই ভাষাবিজ্ঞানীর অন্বেষা যেন ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা চালিত না হয়।

উপযুক্তভাবে প্রযুক্ত হলে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের তথ্য যেমন ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের তথ্যের দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করতে পারে, তেমনি ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের দ্বারা পরিপুষ্ট হতে পারে। এমনকি, একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা বর্ণনা মূলক ভাষা-বিজ্ঞানের উপরেই। কারণ ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে আমরা কোনো এক বা একাধিক ভাষার বিভিন্ন কালের রূপের তুলনা করে তার কালানুক্রমিক বিবর্তনের ধারাটি চিত্রিত করি। এক্ষেত্রে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুম্‌ফিল্ডের সিদ্ধান্ত হচ্ছে :

> "All historical study of language is based upon the comparison of two or more sets of descriptive data. It can be only as accurate and only as complete as these data permit it to be."[২৬]

২৫। Kiparsky, Paul ; 'Historical Linguistics' in *New Horizons in Linguistics*, ed. by Lyon, John. penguin Books, 1980, p. 314.

২৬। Bloomfield, Leonard : *Language*, Delhi : Motilal Banarsidass, 1963. p. 19.

একটি ভাষার বিভিন্ন কালের রূপগুলির মধ্যে তুলনা করার আগে ঐ ভাষার প্রত্যেক কালের আলাদা-আলাদা রূপের বিশ্লেষণ ও বর্ণনা প্রয়োজন। এখন এক-একটি কালের আলাদা-আলাদা রূপ তো বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের দ্বারাই বিশ্লেষিত ও বর্ণিত হয়। প্রত্যেক কালের আলাদা-আলাদা রূপগুলি বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতিতে আগে বিশ্লেষিত ও উপস্থাপিত না হলে এক কালের রূপের সঙ্গে পরবর্তী কালের রূপের তুলনা হবে কি করে? উদাহরণ খুব সহজ এবং পর্যাপ্ত। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে ধাপে-ধাপে বিবর্তনের ফলে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা বাংলার যে জন্ম হল তাতে দেখা যায় মূল ভাষার চেয়ে বাংলার বিভক্তি-সংখ্যা অনেক কমে গেছে। এখন এই সিদ্ধান্তে আসার জন্যে তো মূল ভাষার বিভক্তি কি কি এবং ক'টি তা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে আগে নির্ণীত হওয়া দরকার। তেমনি মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার এবং বাংলা ভাষার বিভক্তিও পৃথক-পৃথক ভাবে নির্ণীত হওয়া দরকার। বিভিন্ন ধাপের বিভক্তিগুলির তুলনা করে যখন আমরা বিভক্তির বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করি, তখন সেইটাই হয়ে যায় ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের কাজ। সুতরাং ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে কাজে লাগায়, অর্থাৎ ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের উপরে।

আগেই বলেছি, প্রথম দিকে কিছু ভ্রান্ত ধারণার জন্যে ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক ছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বীজ বপন করেছিলেন ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরাই। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীদের সদর্প আত্মপ্রতিষ্ঠা যখন সোচ্চার হয়ে উঠেনি তখনও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরা খুব উদার ছিলেন না। বর্ণনামূলক দৃষ্টিতে ভাষার যে অধ্যয়ন হতে পারে এরকম সম্ভাবনার কথা তাঁরা ভাবতেও পারেন নি। হের্মান্ পাউল্ (Hermann Paul) প্রমুখ কেউ-কেউ এমন অনুদার মত পোষণ করতেন যে, ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান ছাড়া ভাষার অন্য কোনো বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন হতেই পারে না। অথচ তাঁদের ধারণা যে অভ্রান্ত ছিল তা নয়। তাঁরা প্রচলিত নির্দেশমূলক (normative, prescriptive) ব্যাকরণকেই বর্ণনামূলক ব্যাকরণ বলে ভুল করেছিলেন। নির্দেশমূলক ব্যাকরণ অনেকটা মনগড়া বিধিবিধান ভাষার উপরে আরোপ করে বলে তা অবৈজ্ঞানিক হতে পারে। কিন্তু বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান তো বাস্তব তথ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত (positive) ; তাকে অবৈজ্ঞানিক মনে করার কোনো কারণ নেই। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীদের আক্রমণাত্মক মনোভাব যে একটি ভ্রান্ত ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল তা একালের একজন ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীই স্বীকার করেছেন :

> "H. Paul made the categorical statement that there is no other scientific consideration of language than the historical one. This view is based on a confusion between the descriptive analysis of a language on the one hand and the practical and prescriptive grammar on the other."[২৭]

অন্যদিকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরাও প্রথমে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানকে বিরোধিতার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের যিনি জন্মদাতা সেই সোস্যুরই একটি আপোষহীন মনোভাব নিয়ে দেখেছেন সমস্যাটিকে :

> "The opposition between the two viewpoints, the synchronic and the diachronic, is absolute and allows no compromise."[২৮]

Hjelmslev-প্রমুখ কেউ-কেউ তো ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানকে স্বীকৃতিই দিতে চাননি, তাকে ইতিহাস (History) বা সমাজবিদ্যার (Sociology) অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আধুনিক যুগে অচল। এখন ভাষাবিজ্ঞানীরা স্বীকার করতে আরম্ভ করেছেন যে, এই দু'টি হল একই বিষয়কে দুই দৃষ্টিভঙ্গিতে দু'দিক থেকে দেখা। এই দুই দেখাতে আমাদের ভাষা-বিষয়ক জ্ঞানই পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। আমরা যেমন ভাষার রূপ ও গঠনগত বৈশিষ্ট্য জানতে চাই, তেমনি জানতে চাই তার ইতিহাস ও বংশপরিচয়। যে-কোনো একটিকে বাদ দিয়ে আমাদের ভাষা-বিষয়ক জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। তাছাড়া বর্ণনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান দুই বিদ্যাই যে পরস্পরের উপরে অংশত নির্ভরশীল তা আমরা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছি।

আধুনিক কালে ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকে পরস্পরের

২৭। Ghatage, A. M. ; *Historical Linguistics and Indo-Aryan Languages*, University of Bombay, 1962, Chap. I.

২৮। de Saussure, Ferdinand ; *Course in General Linguistics*, New York ; McGraw-Hill Book Co., 1966, p. 83.

পরিপূরক বলে মনে করা হচ্ছে। যিনি এই বিরোধকে বিশেষ করে তুলে ধরেছিলেন সেই সোস্যুর নিজে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা বাদ দেননি। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European) ভাষার পুনর্গঠনে (reconstruction) তাঁর বিশেষ অবদান ছিল, এবিষয়ে নতুন পদ্ধতি আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন (Internal Reconstruction) সূত্রবদ্ধ করাতে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়। তাঁর বিখ্যাত রচনা 'Course in General Linguistics'-এ তিনি ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের অনেক দিক নিজেই আলোচনা করেছেন। মনে হয়, ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যের উপরেই তিনি জোর দিতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু তার অর্থ এমন নয় যে, ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের কোনো উপযোগিতা নেই। পরবর্তী কালের বিখ্যাত বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুমফিল্ড, গ্লীসন্ এবং হকেট্ও (Bloomfield, Gleason এবং Hockett) তাঁদের গ্রন্থে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের কোনো-কোনো বিষয়কে স্থান দিয়েছেন। বরং এ সম্পর্কে তাঁরা আরো উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা করেছেন। Benveniste, Jakobson, Kurylowicz, Martinet প্রমুখ আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের দিক্‌পালগণ ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। এই সমন্বয়ী প্রবণতাই আধুনিক প্রবণতা। তাই একজন আধুনিক বিশেষজ্ঞ সিদ্ধান্ত করেছেন দুই বিদ্যা পরস্পরের উপরে এত নির্ভরশীল যে ক্রমে-ক্রমে এমন দিন আসবে যখন যে-কোনো পক্ষের আপোষহীন সমর্থক আর পাওয়াই যাবে না, কারণ এখন আমরা ক্রমশ সমন্বয় ও মিলনের দিকে এগিয়ে চলেছি :

> "Today, when developments in linguistic theory have powerfully influenced historical linguistics, and historical linguistics is showing signs of being able to repay its debt, one would have to search hard to find an adherent of either one of these extreme positions. This pendulum may finally have come to a position of rest"[২৯]

২৯। Kiparsky, Paul ; 'Historical Linguistics' in *New Horizons in Linguistics,* ed. by Lyons, John. Penguin Books, 1980. p. 315.

॥ ৬ ॥

ভাষাশাস্ত্রের প্রকারভেদ ও ভাষাবিজ্ঞানের বিভাগ

(Varieties of Language-Study and Sections of Linguistics)

মানুষের ভাষাশাস্ত্র-চর্চার প্রথম বিকাশ হয়েছিল ব্যাকরণের মাধ্যমে, মধ্যযুগে যার পরিণতি হয়েছিল নির্দেশমূলক ব্যাকরণে (Normative Grammar)। ক্রমে বাঙ্‌মীমাংসা বা সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বের (Philology) জন্ম হল। সবশেষে ভাষাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করল বৈজ্ঞানিক নীতিপদ্ধতির উপরে,—জন্ম হল আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের (Linguistics)। প্রথম যুগের ব্যাকরণ থেকে আজকের ভাষাবিজ্ঞান পর্যন্ত সবই হল আমাদের ভাষাশাস্ত্রের নানা প্রকারভেদ। আমরা বলতে পারি ভাষাশাস্ত্রের (Language-Study) তিনটি প্রধান প্রকারভেদ হল—(১) নির্দেশমূলক ব্যাকরণ (Normative Grammar), (২) বাঙ্‌মীমাংসা বা সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব (Philology) এবং (৩) বিশুদ্ধ ভাষাতত্ত্ব বা ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics)। এই তিনের মূল পরিচিতি চতুর্থ অধ্যায়ে দিয়েছি। এগুলির মধ্যে ভাষাবিজ্ঞানেরও যে নানা শাখা ও বিভাগ গড়ে উঠেছে এখানে সেই সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

যদিও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষের ভাষাশাস্ত্র-চর্চার প্রতিষ্ঠা বেশি দিনের নয়, তবু অল্প দিনের মধ্যেই ভাষাবিজ্ঞান বর্তমানে বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করেছে। এখন দৃষ্টিভঙ্গি ও আলোচ্য বিষয় অনুসারে তার নানা বিভাগ গড়ে উঠেছে। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা বর্ণনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের কথা বলেছি। এ দু'টিকে বলতে পারি আলোচকের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অনুসারে গড়ে-ওঠা দুই ধারা বা শাখা (branches)। আলোচকের দৃষ্টিভঙ্গি যদি হয় ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি তবে ভাষার কোনো একটি মাত্র কালের রূপের প্রতি তাঁর আগ্রহ হবে না, তিনি ভাষার বিভিন্ন কালের রূপ বিশ্লেষণ করে যুগে-যুগে তার বিবর্তনের কাহিনি এবং জন্মগত উৎস বর্ণনা করবেন। আর, আলোচকের দৃষ্টিভঙ্গি যদি ঐতিহাসিকের না হয়, তবে ভাষার বিভিন্ন কালের বিবর্তন ও বংশপরিচয় নির্ণয়ে তিনি আগ্রহী হবেন না। কোনো একটিমাত্র কালের রূপই খুঁটিনাটিভাবে তিনি বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করবেন। দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য অনুসারে ভাষাবিজ্ঞানের দুই শাখা গড়ে উঠেছে—ঐতিহাসিক বা কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান (Historical or Diachronic Linguistics) এবং বর্ণনামূলক বা এককালিক ভাষাবিজ্ঞান (Descriptive or Synchronic Linguistics)। উভয় ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় একই, পার্থক্য রয়েছে শুধু দৃষ্টিভঙ্গিতে। যেমন আমরা আগেই দেখিয়েছি, একই 'আমি' শব্দ

ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক উভয় প্রকার ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করা যায় ; দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অনুসারে পদ্ধতির পার্থক্য ও বিশ্লেষণের ফলশ্রুতিরও পার্থক্য হয়ে থাকে। ভাষার যে-কোনো অংশ বা উপাদান অথবা সামগ্রিকভাবে ভাষা সম্বন্ধেই এই দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গির যে-কোনোটি অবলম্বন করেই আলোচনা করা যায়। এখানে পার্থক্যটা হবে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অনুসারে।

কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের আরো এক রকম বিভাগ হয়। সেটা দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে নয়, আলোচ্য বিষয় অনুসারে। ভাষার এক-একটি অংশকে আলোচ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করে ভাষাবিজ্ঞানের পৃথক্-পৃথক্ বিভাগ (sections) গড়ে উঠতে পারে। একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাষার বিভিন্ন অংশ বিশ্লেষণ করলেই ভাষাবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক বা বর্ণনামূলক যে-কোনো শাখারই অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগ চিহ্নিত হতে পারে। ভাষাকে বিশ্লেষণ করলেই তার নানা স্তর পাই, নানা স্তরে নানা উপাদান পাই। ভাষাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা প্রথমেই দেখি যে, আমাদের ভাষা কতকগুলি বাক্যের সমষ্টি। আমাদের বাক্‌প্রবাহকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথম যে এক-একটি নিটোল অর্থপূর্ণ বৃহত্তম একক (Unit) পাই তা হল বাক্য। এই বাক্যকে আবার ক্ষুদ্রতর অংশে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি শব্দ পাই। আবার শব্দকেও যদি তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর অংশে বিশ্লিষ্ট করি তাহলে দেখব যে, এক-একটি শব্দ কতকগুলি ধ্বনি নিয়ে গঠিত। ধ্বনিকে আর আমরা তার চেয়ে কোনো ক্ষুদ্রতর উপাদানে ভাগ করতে পারি না। ভাষাতত্ত্ববিদেরা অবশ্য প্রত্যেকটি ধ্বনিকে কতকগুলি ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের (features) সমষ্টি বলে থাকেন, কিন্তু সাধারণত আমরা অতখানি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করি না। মোটামুটিভাবে আমরা ধরে নিতে পারি যে, ভাষা-বিশ্লেষণের শেষ ধাপ হল ধ্বনি, এই ধ্বনি হল ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান তার মূল উপাদান। ধ্বনি হচ্ছে ভাষার প্রথম স্তর। তারপরে কয়েকটি ধ্বনি সাজিয়ে (অথবা কখনো-কখনো একটি মাত্র ধ্বনিতেই) ভাষার যে অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক পাই তাকে আমরা সাধারণত বলি শব্দ (word), কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় তাকে 'শব্দ' না বলে 'রূপিম' বা 'মূলরূপ'ই (morpheme) বলা উচিত ; কারণ 'মূলরূপ' (বা 'রূপিম') ও 'শব্দের' মধ্যে পার্থক্য আছে। শব্দ অর্থপূর্ণ ধ্বনিসমষ্টি বটে, কিন্তু তা সব সময় অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি নয় ; কিন্তু 'মূলরূপ' হল অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি। ধ্বনির পরের ধাপ অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরটি হল 'রূপিম' বা 'মূলরূপে'র (morpheme) স্তর। এর পরের স্তরে আমরা দেখি, কতকগুলি মূলরূপ এবং 'শব্দ' মিলে এক-একটি বাক্য (sentence) রচিত হয়। বাক্য হচ্ছে ভাষার তৃতীয় স্তর। সাধারণত এই স্তর পর্যন্তই ভাষাবিজ্ঞানে ভাষা সম্পর্কে আলোচনা হয়। এর পরের স্তরে কয়েকটি বাক্য নিয়ে এক-একটি অনুচ্ছেদ রচিত হয়,

কবিতা হলে স্তবক রচিত হয়, অনেকগুলি অনুচ্ছেদ বা স্তবক নিয়ে একটি বক্তৃতা বা সাহিত্যসৃষ্টি গড়ে ওঠে। এসব সৃষ্টির বিশ্লেষণ ও গঠনভঙ্গি ব্যাখ্যা নিয়ে সাধারণত বক্তৃতাবিজ্ঞান, অলঙ্কারশাস্ত্র (rhetoric) প্রভৃতি নামে স্বতন্ত্র শাস্ত্র গড়ে উঠেছে ; এগুলিকে আগে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ধরা হত না। কিন্তু আগেই বলেছি, ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্র ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। আধুনিক কালে শৈলীবিজ্ঞান (stylistics) নামে ভাষাবিজ্ঞানের যে নতুন শাখাটি গড়ে উঠছে তাতে এসব বিষয়ও আলোচিত হচ্ছে। তা ছাড়া ছন্দোবিজ্ঞান (prosody) ভাষাবিজ্ঞানের অঙ্গ হিসাবে অনেক আগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

যাই হোক, ভাষার যে প্রধান তিনটি স্তর (Levels) তা হল ধ্বনি, মূলরূপ (ও শব্দ) এবং বাক্য। এইগুলিই হল ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই তিন আলোচ্য বিষয় অনুসারে ভাষাবিজ্ঞানের তিনটি প্রধান বিভাগ। এই তিন বিভাগের সাধারণ প্রচলিত নাম যথাক্রমে—ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), রূপতত্ত্ব (Morphology) এবং বাক্যতত্ত্ব (Syntax)।

(ক) ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) : সাধারণভাবে বলা যায় যে, ভাষাবিজ্ঞানের যে অংশে ধ্বনি সম্পর্কে আলোচনা হয়, তাকেই ধ্বনিতত্ত্ব বলে। তাহলে ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় যে 'ধ্বনি' সেই ধ্বনি বলতে আমরা কি বুঝি সেটা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত ইংরেজিতে sound বলতে আমরা যা বুঝি বাংলায় ধ্বনি বলতে তা-ই বোঝায়। ব্যাপক অর্থে পাখির কলধ্বনি, হাততালির শব্দ, বংশীধ্বনি থেকে শুরু করে মানুষের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত ধ্বনি পর্যন্ত সবকিছু sound বা ধ্বনি। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানে এই সব-রকমের ধ্বনি বা sound আলোচ্য নয়, মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিই শুধু আলোচ্য। মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত যে ধ্বনি তাকে 'phone' বলে, বাংলায় বলতে পারি 'বাগ্‌ধ্বনি' বা 'স্বন'। আবার, মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত যত বাগ্‌ধ্বনি বা স্বন (phone) আমরা শুনতে পাই তাদের সবগুলি সব ভাষায় তাৎপর্যপূর্ণ (significant) ভূমিকা গ্রহণ করে না, এক-এক ভাষায় এক-এক রকমের বাগ্‌ধ্বনি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রত্যেক ভাষার তাৎপর্যপূর্ণ ধ্বনিগুলি হল সেই ভাষার মূল স্বন। অন্যগুলি হল সেই সব মূল স্বনেরই উচ্চারণ-বৈচিত্র্য (variation)। যেমন, বাংলায় 'শ্লীল' শব্দের 'শ্‌' ও 'শীল' শব্দের 'শ্‌' হল একটিই মূল স্বন। কিন্তু দুই শব্দে সন্নিহিত ধ্বনির প্রভাবে দুই 'শ্‌'-এর উচ্চারণ পৃথক্। 'শ্লীল' শব্দে 'শ্‌'-এর সঙ্গে 'ল্‌' যুক্ত হয়ে আছে। ল্‌-এর উচ্চারণ-স্থান হচ্ছে দন্তের কাছাকাছি। এই 'ল্‌'-এর প্রভাবে এর সঙ্গে যুক্ত 'শ্‌'-এরও উচ্চারণ-স্থান দন্তের কাছাকাছি হয়ে গেছে। অর্থাৎ বানানে 'শ্‌' থাকলেও সাধারণ বাঙালির উচ্চারণে—যারা বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ অনুসরণ করে না

তাদের উচ্চারণে—'শ্লীল' শব্দের তালব্য 'শ্' কার্যত উচ্চারিত হয় দন্ত্য 'স্'-এর মতো। এই যে দন্ত্য 'স্', একে ভাষাবিজ্ঞানে বাংলার একটি স্বতন্ত্র মূল স্বন না বলে 'শ্'-এরই বিচিত্র রূপ (variation) বলা যায়। আবার 'শীল' শব্দের যে 'শ্' তার উচ্চারণ তালব্য 'শ্'-ই। সুতরাং আমরা দেখছি বাংলায় একই মূল স্বন 'শ্'। এই 'শ্'-এর উচ্চারণ 'শ্লীল' শব্দে দন্ত্য 'স্'-এর মতো এবং 'শীল' শব্দে এর উচ্চারণ তালব্য 'শ্'। আমরা বলতে পারি বাংলায় এক 'শ্'-এর দুটি উচ্চারণ-বৈচিত্র্য—দন্ত্য 'স্' ও তালব্য 'শ্'। ভাষাবিজ্ঞানের নিয়মে মূল স্বন 'শ্'-কে বলা যায় ধ্বনিতা বা স্বনিম (phoneme) আর সন্নিহিত-ধ্বনি-প্রভাবিত তার উচ্চারণগত বিচিত্র রূপগুলিকে বলা যায় পূরকধ্বনি বা উপধ্বনি (allophone)। সুতরাং ভাষায় যত বাগ্‌ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়, তার কিছু মূল স্বনিম, আর কিছু পূরকধ্বনি অর্থাৎ মূলধ্বনিরই বিবিধ উচ্চারণ-বৈচিত্র্য। তাহলে sound বা ধ্বনি হল একটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ, phone বা বাগ্‌ধ্বনি বা স্বন হল ধ্বনির একটি প্রকারভেদ যা মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ; আবার স্বনিম বা phoneme হল স্বন বা বাগ্‌ধ্বনির মধ্যেও তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি বাগ্‌ধ্বনি মাত্র ; সব বাগ্‌ধ্বনি স্বনিম নয়। যাই হোক্, ধ্বনিতত্ত্বে সবরকমের ধ্বনি বা sound সম্বন্ধে আলোচনা হয় না, শুধু phone (স্বন বা বাগ্‌ধ্বনি) ও phoneme (ধ্বনিতা বা স্বনিম) সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচ্য বিষয়ের প্রকারভেদ অনুসারে ধ্বনিতত্ত্বেরও নানা শাখা। যেমন—ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics), স্বনিমবিজ্ঞান বা ধ্বনিবিচার (Phonemics) ও স্বনিমপ্রক্রিয়াবিজ্ঞান (Phonology)।

ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics) : ভাষার স্বন বা বাগ্‌ধ্বনিগুলি (phones) মানুষের মুখ, নাসিকা, কণ্ঠ ইত্যাদি যে-সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে উচ্চারিত হয় তাদের বাগ্‌যন্ত্র (Organs of Speech or Vocal Organs) বলে। এই বাগ্‌যন্ত্রের গঠন ও প্রক্রিয়া ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রথম আলোচ্য বিষয়। ফুসফুস থেকে শ্বাসবায়ু মুখ ও নাসিকা দিয়ে যাতায়াত করার সময় তার গতিপথে আংশিক বা পূর্ণ বাধা দিয়ে অথবা তার গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করে আমরা সেই বাতাসে নানা তরঙ্গের সৃষ্টি করি। এই তরঙ্গগুলিই ধ্বনি-তরঙ্গ (sound-waves)। এগুলি বাতাসে ভাসতে-ভাসতে শ্রোতার কানে গিয়ে বাজে। শ্রোতার কান থেকে স্নায়ুর মাধ্যমে সেই তরঙ্গের খবর তার মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছায়। তখন তার মস্তিষ্ক সেই বিশেষ-বিশেষ ধরনের তরঙ্গের বিশেষ-বিশেষ অর্থ ব্যাখ্যা করে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, বাগ্‌ধ্বনির তিনটি স্তর (phases) আছে। বক্তার বাগ্‌যন্ত্রগুলি শ্বাসবায়ুতে নানা ভাবে যখন নানা রকমের তরঙ্গ সৃষ্টি করে তখন ধ্বনির উচ্চারণ (articulation) হয়। এটি ধ্বনির প্রথম স্তর। দ্বিতীয় ধাপে এই তরঙ্গগুলি

বাতাসে ভাসতে-ভাসতে শ্রোতার কান পর্যন্ত পৌঁছায়। বক্তার মুখ থেকে বেরোবার পর থেকে শ্রোতার কানে পৌঁছাবার আগে পর্যন্ত ধ্বনির এই দ্বিতীয় স্তর হল ধ্বনি-তরঙ্গের (sound-waves) স্তর। তার পরে শ্রোতার কানে ধ্বনিগুলি আঘাত করার পর ধ্বনির তৃতীয় স্তর। ধ্বনিগুলি কানের পর্দা থেকে স্নায়ুতন্ত্রীর মাধ্যমে স্নায়ুতরঙ্গের রূপে শ্রোতার মস্তিষ্কে পৌঁছোয়। একে ধ্বনির শ্রবণ-(audition) স্তর বলা যায়। ধ্বনির এই তিন স্তর নিয়ে ধ্বনিবিজ্ঞানের (phonetics) তিন শাখা। ধ্বনির উচ্চারণ (articulation) নিয়ে যে শাখা তার নাম উচ্চারণাত্মক স্বনবিজ্ঞান (Articulatory Phonetics), বাংলায় তাকে সাধারণত বলা হয় উচ্চারণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান। ধ্বনির দ্বিতীয় ধাপ অর্থাৎ ধ্বনিতরঙ্গ যে শাখায় আলোচিত হয় তাকে বলে ধ্বনিতরঙ্গবিজ্ঞান (Acoustics) ; কেউ-কেউ একে বলেছেন 'ভৌতিক স্বনবিজ্ঞান'। ধ্বনির তৃতীয় স্তর বা শ্রবণ ক্রিয়া নিয়ে গড়ে উঠেছে তৃতীয় শাখা—শ্রুতিমূলক স্বনবিজ্ঞান বা শ্রবণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান (Auditory Phonetics)। ধ্বনিতরঙ্গবিজ্ঞান পদার্থবিদ্যায় (physics) এবং শ্রবণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান দেহবিদ্যায় (physiology) বিশেষভাবে আলোচিত হয়। ভাষাবিজ্ঞানে সাধারণত উচ্চারণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞানই সবিস্তারে পঠিত হয়ে থাকে। তবে বাগ্‌ধ্বনির যথাযথ বাস্তব সত্তার (objective entity) স্বরূপ যাচাই করার জন্যে আধুনিক কালে ভাষাবিজ্ঞানেও ধ্বনিতরঙ্গবিজ্ঞানের বিশেষ চর্চা হয়ে থাকে।

ধ্বনিবিচার (Phonemics) : ভাষায় যে-সব স্বন বা বাগ্‌ধ্বনি (phones) শুনতে পাই তার সবগুলি তাৎপর্যপূর্ণ মূলধ্বনি বা স্বনিম বা ধ্বনিতা (phonemes) নয়, সেকথা আমরা আগে বলেছি। কোনো ভাষার কোন্ কোন্ বাগ্‌ধ্বনিকে মূলধ্বনি বা স্বনিম বলা যায় তা বিশেষ পদ্ধতিতে বিচার করা হল ধ্বনিবিচারের (Phonemics) আলোচ্য বিষয়। এক-একটি মূলধ্বনির কি কি উচ্চারণ-বৈচিত্র্য (variation), সেই উচ্চারণ-বৈচিত্র্য শর্তাধীন, না স্বাধীন, ইত্যাদি বিষয়ও ধ্বনিবিচারের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পড়ে। স্বনিমই ধ্বনিবিচারের আলোচ্য বিষয় বলে একে স্বনিমবিজ্ঞানও বলে।

স্বনিমপ্রক্রিয়াবিজ্ঞান (Phonology) : ভাষায় স্বনিমের ভূমিকা (function), একটি স্বনিমের সঙ্গে অন্য স্বনিমের সংযোগের (combination) নিয়ম এবং শব্দমধ্যে আদি-মধ্য-অন্তে স্বনিমের অবস্থানবিধি (distribution) বিশ্লেষণ ও সূত্রবদ্ধ করা স্বনিমপ্রক্রিয়াবিজ্ঞানের (phonology) নিজস্ব বিষয়। এবিষয়ে প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব নিয়ম আছে। যেমন 'ঙ্' ধ্বনি বাংলায় শব্দের গোড়ায় বসে না ; স [s] ধ্বনি জার্মান ভাষায় শব্দের গোড়ায় উচ্চারিত হয় না (জার্মান ভাষায় যেখানে বানানে শব্দের গোড়ায় s আছে সেখানে তার উচ্চারণ

/ এর মতো)। এই জন্যে প্রত্যেক ভাষার স্বনিমপ্রক্রিয়াবিজ্ঞান (Phonology) সেই ভাষাবিশেষেরই নিজস্ব নিয়ম। ধ্বনিবিজ্ঞান বা স্বনবিজ্ঞান (Phonetics) ভাষাবিশেষের হতে পারে, আবার ভাষাবিশেষের না হয়ে সব ভাষার সাধারণ ধ্বনিবিজ্ঞানও (General Phonetics) হতে পারে। কিন্তু স্বনিমবিজ্ঞান (Phonemics) ও স্বনিমপ্রক্রিয়াবিজ্ঞানে (Phonology) কিছু মূল নীতিগত সাধারণ প্রশ্ন আলোচিত হলেও ধ্বনিতত্ত্বের এই দুই শাখা প্রধানত ভাষাবিশেষকে কেন্দ্র করেই সমৃদ্ধ হয়, কারণ এক-একটি ভাষার স্বনিম-সম্পদ (phonemic property) স্বতন্ত্র। আবার এক ভাষার স্বনিমের নিয়মাবলী অন্য ভাষায় প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখলাম যে, ইংরেজিতে Phonology কথাটির একটি বিশেষ অর্থ আছে ; এই বিশেষ অর্থে ভাষাবিশেষের স্বনিমসম্পদ নির্ণয় করা ও তাদের তালিকা প্রণয়ন করা এবং সেই ভাষায় তাদের ভূমিকা, পারস্পরিক মিলন ও শব্দমধ্যে তাদের অবস্থানের নিয়মাবলীকেই বোঝায়। কিন্তু এই বিশেষ অর্থ ছাড়া Phonology (ধ্বনিতত্ত্ব) কথাটি ব্যাপক অর্থেই ইংরেজিতে বেশি ব্যবহৃত হয়, তাতে উপরিলিখিত বিশেষ অর্থ ছাড়াও ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics) ও স্বনিমবিজ্ঞানকেও (Phonemics) বোঝায়।[৩০] এই ব্যাপক অর্থে Phonology কথাটিকে গ্রহণ করেই এর তিনটি বিভাগ নির্ণয় করা হয়েছে : স্বনবিজ্ঞান বা ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics), স্বনিমবিজ্ঞান বা ধ্বনিবিচার (Phonemics) এবং স্বনিমপ্রক্রিয়াবিজ্ঞাম (phonology)। এ ছাড়া অনেক সময় ধ্বনির ঐতিহাসিক বিবর্তনতত্ত্বকেও (Historical Phonology) সংক্ষেপে ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) বলা হয়।

(খ) রূপতত্ত্ব (Morphology) : আমরা আগে বলেছি যে, এক বা একাধিক স্বনিমের সম্মিলনে যে অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক ('smallest meaningful unit') গঠিত হয় তাকে মূলরূপ বা রূপিম (morpheme) বলে। কোনো ভাষার মূলরূপগুলি (morphemes) এবং তাদের পরিবেশগত বৈচিত্র্য নির্ণয় করাকে মূলরূপ-বিজ্ঞান (বা রূপিমবিজ্ঞান = morphemics) বলে। মূলরূপ দিয়ে কি করে শব্দ গঠিত হয়, শব্দ ও ধাতুর সঙ্গে কি কি শব্দবিভক্তি, ক্রিয়াবিভক্তি ও প্রত্যয় যোগ হয়, যোগ হওয়ার ফলে শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপ কি রকম হয় ইত্যাদি বিষয় ভাষাবিজ্ঞানের যে বিভাগে আলোচিত হয়

৩০। cf. "Phonology is a cover-term embracing phonetics and phonemics."–Francis, Nelson ; *The Structure of American English*, New York ; Ronald Press Co., 1958, Ch. I.

তাকেই রূপতত্ত্ব বা রূপপ্রক্রিয়াতত্ত্ব (morphology) বলে। সাধারণত মূলরূপ-বিজ্ঞান (morphemics) এবং রূপপ্রক্রিয়াবিজ্ঞান (morphology)—এই দু'টিকে একত্রে নিয়ে ব্যাপক অর্থেই রূপতত্ত্ব (Morphology) কথাটি প্রচলিত আছে।

(গ) বাক্যতত্ত্ব (Syntax) : এক বা একাধিক মূলরূপ বা শব্দ একত্র মিলিত হয়ে মনের একটি গোটা ভাব প্রকাশ করলে বাক্য (sentence) গঠিত হয়, একথা আমরা জানি। কিন্তু বাক্যমধ্যে মূলরূপগুলি সাজাবার বিশেষ নিয়ম আছে, একটি মূলরূপের সঙ্গে অন্য মূলরূপের সম্পর্কেরও নানা প্রকারভেদ আছে। এই নিয়ম, প্রক্যরভেদ ইত্যাদি নির্ণয় করা হল বাক্যতত্ত্বের (syntax) আলোচ্য বিষয়।

অনেকে রূপতত্ত্ব (Morphology) ও বাক্যতত্ত্ব (Syntax)-কে ভাষাবিজ্ঞানের দু'টি স্বতন্ত্রবিভাগ রূপে গ্রহণ না করে এই দু'টিকে একই বিভাগের অন্তর্গত মনে করেন, সেই বিভাগকে তাঁরা ব্যাকরণ (Grammar) বলে থাকেন। তাঁদের মতে রূপতত্ত্ব (Morphology) ও বাক্যতত্ত্ব (Syntax) হল ব্যাকরণের দু'টি উপবিভাগ। আগে ব্যাকরণ (Grammar) কথাটি সাধারণত নির্দেশমূলক ব্যাকরণ (Normative Grammar) অর্থে ব্যবহার করা হত। অনেক সময় আবার ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics) অর্থেই কথাটি ব্যবহৃত হয়। তবে এই ব্যাপক অর্থ ছাড়া বিশেষিত অর্থে ব্যাকরণ বলতে রূপতত্ত্ব ও ব্যাক্যতত্ত্বই বোঝায়।

(ঘ) শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics) : দেখা গেছে ভাষার প্রকাশরূপের (expression aspect) তিনটি দিক—ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য—নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের তিনটি প্রধান বিভাগ—ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব। ভাষার আর একটি যে গভীরতর দিক আছে, সেটা হল তার অর্থের দিক (content or meaning aspect)। এই অর্থের তত্ত্ব নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের যে বিভাগটি গড়ে উঠেছে তাকে শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics) বলে। শব্দের অর্থ সর্বক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নয় এবং চিরকাল অপরিবর্তিতও নয়। যেমন, আমার হাতে আঘাত লেগেছে ; তুমি হাত চালিয়ে কাজটা সেরে নাও ; বিদ্যাসাগর কখনো কারো কাছে হাত পাতেন নি ; চাকরি করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে এখন পার্টির হাত সব চেয়ে বেশি ; হাত গুটিয়ে বসে থেকো না, চেষ্টা করে যাও ; পার্টির নেতাই ওরকম অসৎ লোককে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন, এখন হাত কাম্‌ড়ালে কি হবে?—এসব বাক্যে একই 'হাত' শব্দের নানা অর্থ, প্রথম বাক্যে মূল অর্থ = hand। অন্য বাক্যগুলিতে প্রসঙ্গগত অর্থ (contextual meaning) নানা রকম। একই শব্দের যেমন

বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন অর্থ হতে পারে, তেমনি বিভিন্ন কালেও একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যেমন, আগে 'প্রদীপ' বলতে যা দীপ্তি দেয় তাকেই বোঝাত, অর্থাৎ যে-কোনো রকমের আলোকেই প্রদীপ বলা হত। কিন্তু এখন শুধু তেল-সলতে যুক্ত একরকমের বিশেষ আলো-কেই প্রদীপ বলে। 'সন্দেশ' শব্দের অর্থ আগে ছিল 'সংবাদ'। এখন এর অর্থ 'একরকম মিষ্টান্ন'। শব্দের অর্থের এই সব তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও সূত্রবদ্ধ করা হল শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics)-এর আলোচ্য বিষয়। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা—বিশেষত গঠনসর্বস্বতাবাদীরা (structuralists)—শব্দার্থতত্ত্বকে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে স্থান দিতে রাজি নন। এ বিষয়ে নানা মতভেদ আছে। বিষয়টি সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনার চেষ্টা করব। আপাতত অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানীর অনুসৃত ধারা অনুসারে আমরা শব্দার্থতত্ত্বকে (Semantics) ভাষাবিজ্ঞানেরই একটি বিভাগ বলে গ্রহণ করতে পারি। অর্থ প্রকাশ করে বলেই ভাষার সামাজিক উপযোগিতা, এই অর্থই ভাষার অন্তরের মূল সত্তা। এই অর্থকে বাদ দিয়ে ভাষাসম্পর্কিত কোনো আলোচনাই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

তাহলে, আলোচ্য বিষয় অনুসারে ভাষাবিজ্ঞানের এই ক'টি প্রধান বিভাগ। উপরে উল্লিখিত এই সব আলোচ্য বিষয়—ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ—এগুলি সব ক'টিই আবার ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচিত হতে পারে এবং সেই অনুসারে আলোচনার পদ্ধতি পৃথক-পৃথক্ হয়। কেউ-কেউ একই বিষয় নিয়ে ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক দুই পৃথক্ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনার পৃথক্-পৃথক্ নাম দিতে চান। যেমন—ধ্বনিতা সম্পর্কিত বর্ণনামূলক আলোচনাকে Phonemics এবং ঐতিহাসিক আলোচনাকে Phonology বলেন, তেমনি রূপিম সম্পর্কিত বর্ণনামূলক আলোচনাকে Morphemics এবং ঐতিহাসিক আলোচনাকে Morphology বলতে চান। কিন্তু এরকম নামকরণ সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয় না। নিদা (Nida)-প্রমুখ বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা morpheme-সম্পর্কিত বর্ণনামূলক আলোচনাকেও Morphology নামেই অভিহিত করেছেন।

(ঙ) অভিধানবিজ্ঞান (Lexicography) : ভাষাবিজ্ঞানের একটি সমৃদ্ধ বিভাগ হল অভিধানবিজ্ঞান (Lexicography)। অভিধান রচনার ধারা প্রায় সব দেশেই প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে, এটি এখন একটি সমৃদ্ধ ধারা। যাস্কের 'নিরুক্তে'র মধ্যে সেই যে বৈদিক শব্দাবলীর ব্যুৎপত্তির ও বিশেষ-বিশেষ শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছিল, তখন থেকেই ভারতে অভিধানের সূত্রপাত। বৈদিক শব্দাবলীর তালিকা যে 'নিঘন্টু', তাতেও অভিধান রচনার প্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করা

যায়। তার পরে অমরসিংহ রচিত 'অমরকোষ' বা 'নামলিঙ্গানুশাসন' প্রাচীন ভারতের একটি অতি উন্নত অভিধান গ্রন্থ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রাধাকান্ত দেবের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্কলিত 'শব্দকল্পদ্রুম' এই ধারার সমৃদ্ধ উত্তরসাধনা ; এটি শুধু অভিধান নয়, একটি বিশ্বকোষ-বিশেষ। অভিধান রচনার ধারা প্রায় সব দেশেই বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করেছে। আধুনিক কালে ভাষাবিজ্ঞানীরা শুধু প্রাচীন ধারার অভিধান রচনার উত্তরাধিকারকে গতানুগতিকভাবে অনুসরণ করেন না, অভিধান রচনার বৈজ্ঞানিক রীতিপদ্ধতি সম্পর্কেও আলোচনা করে থাকেন। এই অভিধানবিজ্ঞানকে (lexicography) অনেকে প্রয়োগমূলক বা ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের (Applied Linguistics) একটি শাখা বলে মনে করে থাকেন। অভিধানকে আমরা ভাষাবিজ্ঞানের একটি সংযোগমূলক বিভাগ (liaison division) বলতে পারি ; এর কারণ অভিধান ভাষার প্রকাশগত দিক (expression aspect) এবং বিষয়গত দিকের (content aspect) মধ্যে—অর্থাৎ ভাষার ধ্বনি ও অর্থের মধ্যে—সংযোগ ব্যাখ্যা করে। এই হচ্ছে অভিধানের প্রধান ভূমিকা। এছাড়া অভিধানে শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ (synonyms) উল্লেখ ও ব্যুৎপত্তি (etymology) নির্ণয় করার ধারাও বহু প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। আধুনিক কালে অভিধানে শব্দের সর্বজন স্বীকৃত উচ্চারণ (standard pronunciation), শব্দের আঞ্চলিক ও উপভাষাগত পার্থক্য (dialectal variation), প্রসঙ্গ অনুসারে অর্থ-পার্থক্য (contextual meaning), যুগ অনুসারে শব্দের অর্থ-পরিবর্তন (historical semantics) এবং সাহিত্যিক ও আঞ্চলিক প্রয়োগের নিদর্শন, শব্দের পদ-পরিচয় (parts of speech) ইত্যাদিও স্থান পেয়ে থাকে। অভিধান ক্রমশ নিজের ক্ষেত্র প্রসারিত করে ক্রমিক সমৃদ্ধি ও বিস্তার লাভ করছে।

(চ) লিপিবিজ্ঞান (Graphics) : কথ্যভাষার দু'টি সীমা আছে—স্থানগত সীমা (limitation of space) এবং কালগত সীমা (limitation of time)। কারণ, যে-স্থানে আমরা কথা বলি, অন্য কিছুর সাহায্য না নিলে, সেই স্থানেই আমাদের কথা সীমাবদ্ধ ; আমাদের গলার জোর স্থানের সীমাকে অতিক্রম করে খুব বেশি দূর যেতে পারে না। তেমনি আমরা যে-সময়ে কথা বলি, আমাদের কথা শুধু সেই সময়ের মানুষ সোজাসুজি শুনতে পারে, অন্য সময়ের মানুষ তা পারে না। আমাদের কথ্য ভাষার এই দ্বিবিধ সীমাকে জয় করার জন্যে মানুষ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ধাপে ধাপে ভাষাকে লিখে রাখার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। এই লিপি-পদ্ধতির সাহায্যে এক কালের ও এক স্থানের মানুষের মুখের ভাষা অন্য স্থানের ও অন্য কালের মানুষ সোজাসুজি কানে

শুনতে পারে না বটে, কিন্তু পাঠ করে জানতে পারে। এই লিপি-পদ্ধতির ক্রমিক বিবর্তনের তত্ত্ব, বিভিন্ন ভাষার লিপি-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ও ক্রমোন্নতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হল লিপিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারে প্রিন্সেপ্ (Prinsep), ব্যুলার (Bühler)-প্রমুখ মনীষীরা বিশেষ অবদান রেখেছেন। ডেভিড্ ডিরিঙ্গার্ (David Diringer) পৃথিবীর একজন বিখ্যাত লিপিবিজ্ঞানী। তাঁর 'Alphabet' গ্রন্থে তিনি পৃথিবীর প্রায় সব ভাষার লিপির বিবর্তনকাহিনি রচনা করে অমরত্ব লাভ করেছেন।

(ছ) শৈলীবিজ্ঞান (Stylistics) : আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আর একটি সমৃদ্ধ বিভাগ হল শৈলীবিজ্ঞান। শৈলীবিজ্ঞান হল শৈলী (style) সম্পর্কে বিধিবদ্ধ আলোচনা—এই সংজ্ঞার তাৎপর্যটি তখনই পরিষ্কার হবে যখন আমরা শৈলী (style) কাকে বলে তা সহজ করে বুঝতে পারব। ভাষার যে বিভিন্ন উপকরণ—ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি—তাদের বিন্যাস ও ক্রিয়া বিধিবদ্ধভাবে চালিত করার জন্যে প্রচলিত ব্যাকরণ কতকগুলি নীতিনির্দেশ (norms) প্রস্তুত করে। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবণতা, বিশেষ-বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতি ও সাহিত্যিক প্রেরণার জন্যে ভাষা-ব্যবহারকারী সব সময় সেই প্রচলিত গতানুগতিক রীতিনীতি মেনে চলেন না ; প্রচলিত রীতিনীতি থেকে এই যে সরে আসা (deviation), এটা যদি বিশেষ ভাব প্রকাশে প্রতিবন্ধক না হয়ে বরং অপরিহার্য হয়, বক্তার সামগ্রিক প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে আমরা ব্যাকরণের সেই নিয়ম-লঙ্ঘনকে ('deviation from norms') আর অশুদ্ধ প্রয়োগ বলতে পারি না, তখন তাকে ভাষাব্যবহারে বৈচিত্র্য ('variation in the use of language') বলে স্বীকৃতি জানাই। যেমন, 'ছেলেভুলানো ছড়া' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত আলোচনা থেকে একটি সহজ দৃষ্টান্ত তুলে দিই—

ওপারেতে কালো রঙ।
বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্।।
এপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্‌টুক্ করে।
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।।

ধরিয়ে না দিলে সচরাচর চোখে পড়বে না যে, ব্যাকরণের নিয়মে ছড়াটিতে একটি অশুদ্ধ প্রয়োগ রয়েছে। 'ভাই' শব্দটি সাধারণত পুংলিঙ্গবাচক। কিন্তু তার বিশেষণটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক হয়েছে 'গুণবতী'। এখানে কবি স্পষ্টত ব্যাকরণের নিয়ম থেকে সরে এসেছেন। কিন্তু যদি ব্যাকরণের নিয়ম মেনে এখানে 'গুণবান্' শব্দটি আমরা বসাই তা হলে ছড়াটির বিশেষ রসই নষ্ট হয়ে যাবে। যে সরলা বালিকা-বধূটির শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পরে তার ফেলে-আসা ছোট্ট ভাইটির জন্যে মন

কেমন করে সেই বালিকাবধূর গ্রাম্য সারল্যের সঙ্গে ঐ প্রয়োগের সামঞ্জস্য আছে। ঐ শব্দটি ঐ ছড়ার সামগ্রিক মাধুর্যের সঙ্গে যুক্ত।

কিংবা—

খোকা এল বেড়িয়ে।
দুধ দাও গো জুড়িয়ে।।
দুধের বাটি তপ্ত।
খোকা হলেন খ্যাপ্ত।।
খোকা যাবেন নায়ে।
লাল জুতুয়া পায়ে।।

এই ছড়ায় 'জুতুয়া' শব্দের গঠন ব্যাকরণের প্রচলিত নিয়মে ব্যাখ্যা করা যাবে না। 'জুতা'র সঙ্গে 'উয়া' প্রত্যয় ব্যাকরণের নিয়মে সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি। কিন্তু শিশুটির প্রতি যে স্নেহমমতার ভাব তা তার ছোট্ট জুতার সঙ্গেও যেন জড়িয়ে আছে ; এই ভাবটি ঐ বিশেষ প্রত্যয়ের সাহায্যেই প্রকাশ পেয়েছে। এই যে ব্যাকরণের নিয়মের ব্যতিক্রম একে অশুদ্ধ বলতে পারি না, বরং ঐ বিশেষ ভাবটি প্রকাশের পক্ষে ঐ প্রত্যয়টিই অপরিহার্য। এই 'অপরিহার্য ব্যতিক্রমী' হল শৈলীর মূল পরিচয়। বোঝা যাচ্ছে প্রচলিত ব্যাকরণের এলাকা যেখানে শেষ হয়, শৈলীবিজ্ঞানের এলাকা সেখান থেকে শুরু হয়। এই যে ব্যতিক্রমী প্রকাশভঙ্গি—যা প্রচলিত ব্যাকরণের এলাকার বাইরে পড়ে—তাকে কেউ কেউ শৈলীর (style) আসল পরিচয় বলে চিহ্নিত করেছেন ; কিন্তু এই বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গির অন্তরের মূল প্রেরণা হল লেখকের ব্যক্তিত্বের নিজস্বতা, যাকে সাহিত্যিক শৈলীবিশেষজ্ঞরা বলেছেন idiosyncrasy। বস্তুত শৈলীর অন্তর্নিহিত মূল পরিচয়টি আমাদের চিরপরিচিত ফরাসি কথাটিতেই ধরা পড়েছে—

Le style c'est l'homme même.
(Style is the man himself)

অর্থাৎ শৈলী হচ্ছে লেখকের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। লেখকের বা বক্তার মনন, চিন্তন, অনুভবের যে নিজস্ব রীতি তারই প্রকাশ হচ্ছে শৈলী। এখন লেখকের এই ব্যক্তিত্বের মধ্যে সমাজ-প্রচলিত ধারা থেকে স্বাতন্ত্র্যের প্রবণতা যদি না থাকে, যদি তাঁর প্রকাশরীতিটি তাঁর গতানুগতিক ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি হয়, তবে তাতে ব্যতিক্রমী প্রকাশভঙ্গি না থাকতে পারে বা কম থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যাকরণের নিয়মানুগত ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গিই তাঁর শৈলী। সুতরাং ব্যতিক্রমী প্রকাশভঙ্গিই (deviation) যে সব ক্ষেত্রে শৈলীর পরিচয়-চিহ্ন তা নয়। লেখকের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যদি সেরকমের ব্যতিক্রমী প্রবণতা না থাকে

থাকলে তাঁর শৈলীর মধ্যেও তা প্রকাশ পাবে না। সেক্ষেত্রে অবশ্য একটা কথা আমরা বলতে পারি, যে-মানুষের ব্যক্তিত্বই গতানুগতিক স্বাতন্ত্র্যহীন বা বোধশক্তিবর্জিত, সেই মানুষের ব্যক্তিত্বটি আমাদের যেমন আকর্ষণ করে না, তেমনি যে প্রকাশভঙ্গির মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য, কিছু নিজস্বতা নেই তা আমাদের মুগ্ধ করে না। এই জন্যেই স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত প্রকাশভঙ্গিকে আমরা শৈলীর প্রধান পরিচয়চিহ্ন বলে থাকি। এই বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত প্রকাশভঙ্গি অধিকাংশ সময়ই ব্যাকরণের গতানুগতিক ধারাকে লঙ্ঘন করে যায়।

অবশ্য একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, শৈলী-বিশেষজ্ঞদের মতে বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গি অনেক সময় ব্যাকরণের এলাকার বাইরে পড়লেও তা কোনো নৈরাজ্যের জগৎ নয়, তারও একটি অন্তর্নিহিত বিধান আছে। এই অন্তর্নিহিত বিধান সম্পর্কে বিধিবদ্ধভাবে আলোচনা করাই শৈলীবিজ্ঞানের লক্ষ্য। তাই বলা হয়েছে, শৈলী (style) সম্পর্কে বিধিবদ্ধ (methodical) আলোচনাই হল শৈলীবিজ্ঞান :

> "...stylistics is that part of linguistics which concentrates on variation in the use of language, often, but not exclusively, with special attention to the most conscious and complex uses of language in literature. ...*Stylistics* means the study of style, with a suggestion, from the form of the word, of a scientific or at least a methodical study."[৩১]

সাধারণত শৈলীর বৈশিষ্ট্যই হল বিশেষ (particular) প্রকাশভঙ্গি। এই 'বিশেষ'কে বিশ্লেষণ করে তা থেকে 'সাধারণ ' (general) সত্য আবিষ্কার করে গেলেই 'শৈলীবিজ্ঞান'কে বৈজ্ঞানিক বিধির মর্যাদা দেওয়া হয়। শৈলীবিজ্ঞানী তাই জোরের সঙ্গে বলেছেন—

> "The study of style, stylistics, must, like other branches of linguistics, generalize".[৩২]

কোন্ কোন্ প্রেরণায় শৈলীর বিশেষ প্রকাশরূপটি গড়ে উঠে, অর্থাৎ শৈলীর ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য ও ব্যতিক্রম ঘটে তার মৌল কারণ কি, শৈলীর নিয়তৃশক্তি (determining factor) কি, শৈলীতে যে বিশেষ প্রকাশরূপটি পাই তার প্রকৃতি কি অর্থাৎ ধ্বনি, শব্দ, বাক্যগঠনের কোন্ বৈশিষ্ট্য ঐ প্রকাশরূপটি গড়ে

৩১। Turner, G. W. : *Stylistics,* Penguin Books, 1973, pp. 7-8.
৩২। ibid. p. 13.

তুলেছে এবং কিভাবে গড়ে তুলেছে, তার পরিমিতি ও পরিসংখ্যান কি, ইত্যাদি বিষয় শৈলীবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয় এবং তার অন্তর্নিহিত সাধারণ সত্য আবিষ্কার করা হয়।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, সাহিত্যিক রচনাশৈলীর যে ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আধুনিক কালে সূচিত হয়েছে তার তাৎপর্য এই নয় যে, শৈলীবিজ্ঞানে সাহিত্যসৃষ্টিকে—কাব্য-উপন্যাস-নাটকাদিকে—শুধু কতকগুলি ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদিতে বিশ্লেষণ করে সাহিত্যসৃষ্টিকে খণ্ড-খণ্ড করে তার সামগ্রিক সৌন্দর্যকে নষ্ট করা হয় বা একটি নিটোল শিল্পরূপ যে কাব্য তাকে শুধু কতকগুলি ধ্বনি, শব্দ, বাক্যের সমষ্টি ও বিশেষ-বিন্যাস মনে করা হয়। বস্তুত কাব্যকে বুঝতে, তার বিশেষ আবেদনসৃষ্টির উপকরণগুলিকে চিনে নিতে শৈলীবিজ্ঞান আমাদের সাহায্য করে মাত্র। কাব্যের বিশেষ ভাবটি যে ভাষার মাধ্যমে বাণীমূর্তি লাভ করে সেই ভাষার শিল্পসৌন্দর্য বিশ্লেষণের সহায়ক হল শৈলীবিজ্ঞান। ভারতের প্রতিষ্ঠিত শৈলীবিজ্ঞানী ডঃ রবীন্দ্রনাথ শ্রীবাস্তব এ প্রসঙ্গে যে সিদ্ধান্তটি প্রকাশ করেছেন তা আমাদের জানা থাকলে শৈলীবিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণাটি দূর হবে। তিনি বলেছেন :

> "শৈলীবিজ্ঞানও কবিতাকে সর্বপ্রথমে কবিতারূপেই গ্রহণ করে। শৈলীবিজ্ঞানও একথা স্বীকার করে যে, 'কবিতা' শুকনো কাঠ (অর্থাৎ নীরস পদার্থ) নয়।...শৈলীবিজ্ঞান এই সিদ্ধান্তের কখনো বিরোধিতা করে না যে, কবিতার সঙ্গে একদিকে বিশ্লেষণী বুদ্ধির অতীত এক বক্তব্য এবং ভাবজগতের জীবনদৃষ্টির চিরন্তন সম্পর্ক রয়েছে। বরং এসব কথা স্বীকার করেও শৈলীবিজ্ঞান এই সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে যে, কাব্যের সেই বুদ্ধির অতীত বক্তব্যের জগতে পৌঁছাতে হলে ভাষারূপী মাধ্যমের সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য।"[৩৩]

৩৩। "शैलीविज्ञान भी कविता को पहले कविता के रूप में ग्रहण करता है। वह भी यह मानता है कि 'कविता' सूखै काठ की चीज नहीं है।...शैलीविज्ञान इस तथ्य का कदापि विरोध नहीं करता कि कविता के एक पक्ष का सम्बन्ध 'अबौद्धिक कथ्य' और 'भावजगत की जीवनदृष्टि' के साथ बना रहता है। पर इन सबकी स्वीकृति के पश्चात भी उसकी यह मान्यता बनी रहती है कि 'अबौद्धिक कथ्य' तक भाषा का अवलम्बन लेकर हा पहुँचना सम्भव है।" श्रीवास्तव, डॉ. रवीन्द्रनाथ : 'संरचनत्मक शैलीविज्ञान', दिल्ली : आलेख प्रकाशन, १६८०, पृ. १६७।

সবশেষে সামগ্রিকভাবে ভাষাশাস্ত্রের যে-সব প্রকারভেদ ও ভাষাবিজ্ঞানের যে সব প্রধান বিভাগ আমরা পেলাম তা নিম্নোক্ত চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপিত করতে পারি :
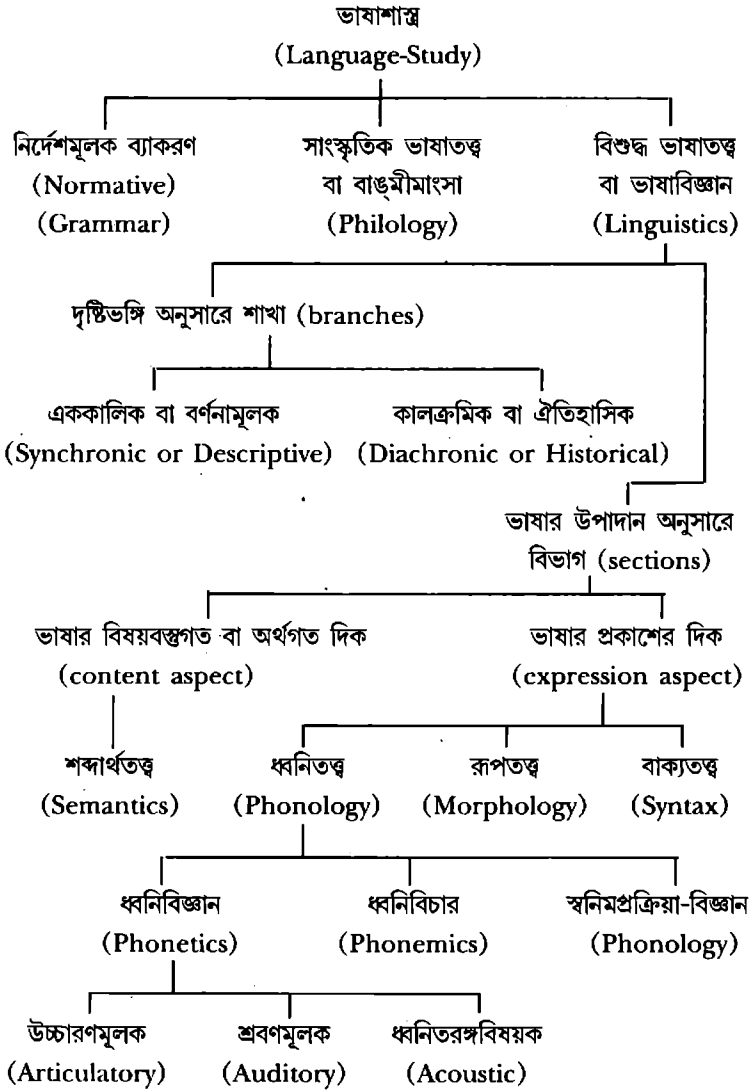
চিত্র নং ২

চিত্রে উল্লিখিত এই প্রধান-প্রধান বিভাগগুলি ছাড়া ভাষাবিজ্ঞানের আরো যে-সব বিভাগ বিশেষ বিকশিত হতে দেখি সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(১) ভৌগোলিক ভাষাতত্ত্ব (Geolinguistics)
(২) অভিধানবিজ্ঞান (Lexicography)
(৩) লিপিবিজ্ঞান (Graphics)
(৪) ফলিত ভাষাবিজ্ঞান ও পার্থক্যমূলক ভাষাবিশ্লেষণ
(Applied Linguistics and Contrastive Analysis)
(৫) শৈলীবিজ্ঞান (Stylistics)
(৬) উপভাষাবিজ্ঞান (Dialectology)
(৭) সমাজ-ভাষাবিজ্ঞান (Sociolinguistics) ইত্যাদি।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, প্রথমটি ছাড়া বাকি সবগুলিকেই ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের (Applied Linguistics) মধ্যেই কেউ-কেউ ধরে থাকেন। তবে এখন প্রধানত মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পার্থক্যমূলক ভাষাবিজ্ঞানের যে প্রয়োগ হয় তার সঙ্গেই সাধারণত ফলিত ভাষাবিজ্ঞান প্রায়শ উচ্চারিত হয়ে থাকে।

॥ ৭ ॥

ভাষাবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ
(Development of Linguistics)

যদিও 'ভাষাবিজ্ঞান' (Linguistics) কথাটির একটি সুনির্দিষ্ট (precise) অর্থ আছে, এবং এই অর্থে কথাটি গ্রহণ করলে বাঙ্‌মীমাংসা বা সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব (Philology) এবং ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণ (Traditional Grammar) তার মধ্যে পড়ে না, তবু আধুনিক কালে অনেক সময় ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics) কথাটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয় এবং সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব (Philology) ও ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণকে (Traditional Grammar) ভাষাবিজ্ঞানেরই (Linguistics) পূর্বসূচনা বলে মনে করা হয়। এই ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেই আমরা ভাষাবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশে পাশ্চাত্য এবং ভারতবর্ষীয় মনীষীদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করব।

পাশ্চাত্য : অন্যদেশে যেমন, পাশ্চাত্য দেশেও তেমনি, যে-কোনো বিদ্যারই আদি উন্মেষ অনেকটা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। পাশ্চাত্য দেশে ভাষাজিজ্ঞাসার প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় বাইবেলের 'ওল্ড্ টেস্টামেন্টে' (Old Testament)। ঈশ্বর

যেহেতু সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন সেহেতু তিনি ভাষাও সৃষ্টি করেছেন। ওল্ড্ টেস্টামেন্টের 'ফার্স্ট্ বুক্ অব্ মোসেজ্' (First Book of Moses) অংশে বলা হয়েছে, আদিতে একটিমাত্র মানবজাতি ছিল এবং তাদের একটিমাত্র ভাষা ছিল ; ক্রমে মানবজাতি পৃথিবীর নানা স্থানে যতই ছড়িয়ে পড়ে ততই তাদের পৃথক্-পৃথক্ ভাষা হয়ে যায়। ঈশ্বরের নির্দেশে মূল এক ভাষা থেকে এত পৃথক্-পৃথক্ ভাষার সৃষ্টি হয় যে একের ভাষা অন্যে বুঝতে পারে না।[৩৪] এক ভাষা থেকে বহু ভাষার জন্ম বিষয়ে বাইবেলের এই তত্ত্বটি সত্য মনে হয় যখন ভাষার ইতিহাসের ধারায় দেখতে পাই যে, একটি ভাষার মধ্যেই আঞ্চলিক পার্থক্য খুব বেশি হয়ে গেলে আঞ্চলিক রূপগুলিই ক্রমে পৃথক্-পৃথক্ ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু পৃথিবীর ভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে তাদের যে ক'টি ভাষাবংশে (Family of Languages) ভাগ করা হয়েছে, সেই আদি ভাষাবংশগুলির মধ্যে আর এমন কিছু পারস্পরিক সাদৃশ্য পাওয়া যায় না যাতে সেগুলিকে আবার কোনো একটিমাত্র প্রাচীনতম মূল ভাষা থেকে জাত বলে অনুমান করা যায়। সুতরাং বাইবেলের ভাষাজিজ্ঞাসায় আত্যন্তিক মানব-ঐক্যের ইঙ্গিত থাকলেও তা বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বরং বাইবেলের ভাষাজিজ্ঞাসার বাইরে প্রাচীন ইহুদিরা বিভিন্ন ব্যক্তি নামের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের যে চেষ্টা করেছিলেন তাতে কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাও সর্বত্র নির্ভুল ছিল না, তা ছিল মূলত আদিম মানুষেরই অনুন্নত ভাষাজিজ্ঞাসা। এসব ছাড়া আদিকালের ভাষা-জিজ্ঞাসার আরো একটি উল্লেখ পাই খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক লেখক হেরোদোতোসের (Hērodotos) 'History' গ্রন্থে। মিশরের রাজা সাম্মেটিকাসের (Psammeticus) একটি ভাষাবিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। পৃথিবীর প্রাচীনতম মানবজাতি কারা, এইটি নির্ণয়ের জন্যে তিনি দু'টি

৩৪। "And the Lord said, Behold, the people *is* one, and they have all one language...

Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech.

So the Lord scattered them...upon the face of all the earth......the Lord did there confound the language of all the earth... "

–The first Book of Moses, Ch 11, (*The Holy Bible*, London : Oxford University Press, p. 14)

সদ্যোজাত মানব-শিশুকে সরিয়ে নিয়ে যান নির্জন স্থানে। সেখানে মানুষের কাছ থেকে কোনো শব্দ শেখার আগে তারা নিজে থেকে কোন্ শব্দ প্রথম উচ্চারণ করে সেইটি পর্যবেক্ষণ করা হয়। দেখা যায়, তাদের মধ্যে একজন 'bekos' শব্দটি উচ্চারণ করল। পরে অনুসন্ধান করে জানা যায়, এই শব্দটি ফ্রীজীয় (Phrygian) ভাষায় আছে। এর অর্থ—'রুটি'। তা হলে, অনুমান করা হয় মানুষের আদিমতম ভাষা হচ্ছে ফ্রীজীয় ভাষা, এটিই মানুষের সহজাত ভাষা, অন্য সব ভাষা হল মানুষের পরবর্তী কালে অর্জিত ভাষা। মিশর-নৃপতির এই খেয়ালি পরীক্ষা-নিরীক্ষা বেশি দূর এগোয় নি, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে যে অনুমানটি খাড়া করা হয় তা কাকতালীয় যোগাযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সুতরাং এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা উন্মেষ-পর্বের নিতান্ত প্রাথমিক ভাষাজিজ্ঞাসারূপেই স্মরণীয় ; এসবের মধ্যে কোনো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নেই।

উন্মেষ-লগ্নের এই ভাষাজিজ্ঞাসার পরে পাশ্চাত্য দেশে ভাষাবিজ্ঞানের যে বিকাশ হয়েছে তাকে চারটি পর্বে ভাগ করেছেন ফের্দিনাঁ দ্য সোস্যুর (Ferdinand de Saussure)।[৩৫] এই চারটি পর্ব হল : (ক) ব্যাকরণ চর্চার (Grammar) পর্ব, (খ) বাঙ্‌মীমাংসার বা সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বের (Philology) পর্ব, (গ) তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philology) পর্ব এবং (ঘ) যথার্থ ভাষাবিজ্ঞানের (Linguistics Proper) পর্ব। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ভাষাবিজ্ঞানের বিকাশের ইতিহাসকে এরকম কোনো স্পষ্ট-চিহ্নিত পৃথক-পৃথক পর্বে ভাগ করা যায় না। কারণ একটি পর্ব শেষ হবার অনেক আগেই অনেক সময় অন্য পর্বের চর্চা সূচিত হয়ে গেছে, আবার একটি পর্বের সূচনা হবার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত পূর্ববর্তী পর্বের প্রবণতা বিকাশ লাভ করতে দেখা গেছে। সুতরাং পূর্বে যে চারটি পর্বের কথা বলা হয়েছে সেগুলিকে ঠিক চারটি পর্ব না বলে ভাষাবিজ্ঞানের বিকাশের ধারা বলতে পারি। প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশে ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করলে তাতে মোটামুটি ভাবে নিম্নোক্ত কয়েকটি ধারা আমরা বিকাশ লাভ করতে দেখি। এই ধারাগুলির সূচনার কালক্রম অনুসারে নিম্নে এগুলিকে পরপর সাজানো হল বটে, কিন্তু ধারাগুলির বিকাশ যেমন পুরোপুরি সমান্তরাল নয়, তেমনি তা স্পষ্টভাবে পর্যায়ক্রমিকও নয়।

৩৫। de Saussure, Ferdinand ; *Course in General Linguistics*, New York ; Mc. Graw-Hill Book Co., 1966. pp. 1–5.

(১) ব্যাকরণের ধারা :

(ক) দার্শনিক ও তর্কশাস্ত্রানুসারী ব্যাকরণ (Philosophical and Logical Grammar)

(খ) নির্দেশমূলক ব্যাকরণ (Normative Grammar)

(২) [illegible] ভাষাতত্ত্ব : তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ব্যাকরণের ধারা :

(ক) পুঁথি নির্ভর ভাষাতত্ত্ব (Textual Philology)

(খ) তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ব্যাকরণ (Comparative and Historical Grammar)

(৩) বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানের ধারা :

(ক) ভাষাবিকাশের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান (Science of Evolution of Language and General Linguistics)

(খ) বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান (Descriptive Linguistics)

(গ) রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণ (Transformational Generative Grammar)।

(১) ব্যাকরণ চর্চার ধারা (Course of Grammatical Studies) :

[illegible] পর্বের পূর্বোল্লিখিত খেয়ালি ভাষাজিজ্ঞাসার কথা ছেড়ে দিলে তাৎপর্যপূর্ণ ও গভীর ভাষাজিজ্ঞাসার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আদি পীঠস্থান গ্রীসের ব্যাকরণ-চর্চার মধ্যে। গ্রীসে এর সূচনা হয় প্লাতোর (Plato : Plătōn ৪২৭-৩৪৮ খ্রীঃ পূঃ) রচনায়। যদিও তার আগে খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের কাছাকাছি সময়ে গ্রীকেরা তাদের ভাষার বর্ণমালা প্রণয়ন করে যে লিপি-পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিল, কিংবা খ্রীস্টপূর্ব ৫ম-৪র্থ শতাব্দীতে সিসিলির গর্গিয়াস্ (Gorgiās) প্রমুখ আলঙ্কারিকেরা বক্তৃতাবিজ্ঞান (oratory) সম্পর্কে যে আলোচনা করেছিলেন, তাতেও ভাষার কোনো-কোনো দিক সম্পর্কে আলোচনার নিদর্শন আছে, তবু ভাষা সম্পর্কে গভীর তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা ও বৈয়াকরণিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় প্লাতোর রচনাতেই। পরবর্তী কালে ব্যাকরণের অনেক উন্নতি হলেও এ কথা সত্য যে, ব্যাকরণের মধ্যে যে প্রভূত সম্ভাবনা নিহিত আছে, সেই সম্ভাবনার বিষয়ে প্লাতোই প্রথম অনুসন্ধান করেছিলেন। প্লাতো তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'কথোপকথন' (Dialogues)-এর 'ক্রাতুলোস্' (Kratulos) অধ্যায়ে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের উৎসের কথা তো আলোচনা করেছেনই, তা ছাড়া ভাষার একটি মূল সমস্যাও উদ্‌ঘাটন করেছেন। ভাষায় যে-সব ভাব বা বস্তুকে প্রকাশের জন্যে নানা ধ্বনিসমষ্টি বা নামশব্দ আমরা ব্যবহার করি, সেইসব ভাব বা বস্তুর সঙ্গে ঐসব

ধ্বনির কোনো অপরিহার্য সম্পর্ক আছে কিনা, ভাষাজিজ্ঞাসার এটি একটি মূলীভূত সমস্যা। এই সমস্যাটিকে কেন্দ্র করে পরে দু'টি বিরোধী পক্ষ গড়ে উঠে। যাঁরা বলেন অর্থের সঙ্গে ধ্বনির, বস্তুর সঙ্গে তার নামের অপরিহার্য সাদৃশ্য (anology) আছে, তাঁদের বলা হয় সাদৃশ্যবাদী (Analogist) ; আর যাঁরা বলেন এরকম কোনো সাদৃশ্য নেই, ভাব বা বস্তুর যে-কোনো নাম আমরা খেয়ালখুশি (anomaly) অনুসারে দিয়ে থাকি, তাঁদের বলে খেয়ালখুশিবাদী (Anomalist)। এ বিষয়ে আমরা আগেই ভাষার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে (তৃতীয় অধ্যায়ে) আলোচনা করেছি। সমস্যাটি চির-বিতর্কিত এবং কোনো পক্ষেই যুক্তির অভাব নেই। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে শুধু এইটুকুই স্মরণীয় যে, ভাষার এই মূল সমস্যাটি যিনি ধরতে পেরেছিলেন, তিনি ভাষা সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। এবম্বিধ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় 'কথোপকথনের' 'সফিস্ট' (Sophist) অধ্যায়েও রয়েছে। তার কথাও আমরা আগেই উল্লেখ করেছি (প্রথম অধ্যায়ে)। সেখানে তিনি মানুষের চিন্তাশক্তির (diánonia) সঙ্গে ভাষার অপরিহার্য যোগের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—চিন্তা হল মানবাত্মার নিজের সঙ্গে নিজের নীরব কথোপকথন অর্থাৎ ধ্বনিহীন স্বগত সংলাপ। আর ধ্বনির সাহায্যে চিন্তা থেকে যে প্রবাহটি আমাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তা-ই হল ভাষা (lógos)। ভাষা সম্পর্কে এরকম গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা ছাড়া প্লাতো ভাষার বহিরঙ্গ গঠনেরও বিশ্লেষণ করেছেন অল্পস্বল্প। পুর্বোক্ত ক্রাতুলোস্ অধ্যায়ে তিনি গ্রীক ধ্বনিগুলির যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন, তার উপরে ভিত্তি করে পরবর্তী বৈয়াকরণরা গ্রীক ধ্বনিগুলির বর্গীকরণ করেছিলেন।

আরিস্তোতেল (Aristotle < Aristotelēs ৩৮৪-৩২২ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) প্লাতোর শিষ্য হলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্লাতোর ঠিক বিপরীত। প্লাতো ছিলেন মূলত দার্শনিক ও ভাবুক, বাহ্যত কবি-বিদ্বেষী হলেও অন্তরে-অন্তরে নিজেই কবি-মনোভাবের অধিকারী। কিন্তু আরিস্তোতেল ছিলেন বৈজ্ঞানিক ও বস্তুবাদী, পুরোপুরি বিধিবদ্ধ বিশ্লেষণী মনোভাবের অধিকারী। এই বিশ্লেষণী বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি তিনি তাঁর গুরুর কাছ থেকে নয়, তাঁর চিকিৎসাজীবী পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেছিলেন। এই বৈজ্ঞানিক মানসিকতার জন্যেই ভাষা সম্পর্কিত তাঁর আলোচনা তত্ত্বপ্রধান নয়, তথ্যপ্রধান ; তাঁর আলোচনার বিষয় ভাষার অন্তরঙ্গ ভাব নয়, ভাষার বহিরঙ্গ গঠন। ভাষা সম্পর্কে তিনি স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি, তবু তাঁর আলোচনা প্লাতোর আলোচনার মতো এলোমেলো নয়। কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'পোয়েটিক্‌সে'র (Poetics) (যার আসল নাম 'পেরি পোইএতিকেস্' περὶ ποιητικης τηι অর্থাৎ On the Art of Peotry) মাত্র তিনটি অধ্যায়ে (২০, ২১, ২২) তিনি ভাষা

ভাষাকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও অত্যন্ত বিধিবদ্ধ। প্রথমে তিনি ভাষাকে নিম্নোক্ত অংশ সমূহে বিশ্লেষণ করেছেন (১) Letter, (২) Syllable, (৩) Conjunction, (৪) Article, (৫) Noun, (৬) Verb, (৭) Case, (৮) Speech। দেখা যাচ্ছে, এখানে ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান থেকে ক্রমশ বৃহত্তর উপাদানের দিকে এগিয়ে গেছে তাঁর আলোচনা। Letter বা বর্ণ বলতে তিনি বুঝেছেন ভাষার মূল ক্ষুদ্রতম উপাদান ('ultimate element')। ভাষা বিশ্লেষণের শেষ ধাপ হচ্ছে বর্ণ ; বর্ণের পরে ভাষার আর বিশ্লেষণ চলে না। তাই বর্ণ হচ্ছে তাঁর মতে অবিভাজ্য ধ্বনি ('indivisible sound')। বর্ণকে তিনি তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন—স্বর (vowel), ব্যঞ্জন (mute) এবং অর্ধস্বর (semivowel)। বর্ণের চেয়ে বৃহত্তর একক (unit) হচ্ছে অক্ষর (syllable)। তার পরে তিনি যে এককগুলির কথা বলেছেন সেগুলি হল অক্ষরের চেয়ে বৃহত্তর একক--শব্দ বা পদ ; তাঁর মতে এগুলি হল Conjunction, Article, Noun, Verb, Case। সবশেষে তিনি যে বাক্যের (Speech) উল্লেখ করেছেন তাতে তিনি আসলে শব্দের চেয়ে বৃহত্তর একক বাক্য (sentence)-কেই বুঝিয়েছেন। আর শেষে ভাষার বিশিষ্ট ব্যবহারগুলির মূল তত্ত্ব আলোচনা করে তিনি যখন বলেছেন—

> "...the Diction becomes distinguished and nonprosaic by the use of unfamiliar terms, i. e. strange words, metaphors, lengthened forms, and everything that deviates from the ordinary modes of speech."[৩৬]

তখন বুঝতে পারি তিনি ভাষার শৈলীর (style) কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। আরিস্তোতেল-এর আলোচনায় শৈলীবিজ্ঞানেরও পূর্বসূচনা রয়েছে। বস্তুত তাঁর আলোচনা সেকালের পক্ষে বিস্ময়করভাবে বিধিবদ্ধ ও ব্যাপক। ভাষার বিভিন্ন দিক তিনি ধাপে-ধাপে আলোচনা করেছেন। বাক্যকে বিভিন্ন পদে (Parts of Speech) বিভক্ত করে তিনি ব্যাকরণের যে মূল কাঠামো রচনা করে দিলেন তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত আধুনিক ইউরোপীয় ব্যাকরণেরও কাঠামো হয়ে রইল। এমন কি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার ব্যাকরণ রচনাতেও আমরা যে ইংরেজি ব্যাকরণের কাঠামো অনুসরণ করি তাতেও আমরা পরোক্ষভাবে অনেকটা আরিস্তোতেলের পথই অনুসরণ করি। সুতরাং ব্যাকরণের ধারায় আরিস্তোতেলের প্রভাব ব্যাপক

৩৬। Aristotle ; *Poetics (Aristotle on the Art of Poetry,* trans, By Bywater. Ingram, London ; Oxford University Press, 1959, Sec. 22, p. 75).

ও সুদূরপ্রসারী। তবু তাঁর অবদানের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর আলোচনার কিছু-কিছু সীমার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীর মতো জীবন্ত মুখের ভাষার (spoken language) বিশ্লেষণ তিনি করেন নি। তাঁর আলোচ্য বিষয় কাব্যভাষা (Diction)। এ ভাষা সাহিত্যের ভাষা বলে অংশত কৃত্রিম। অবশ্য এই কাব্যভাষা বিশ্লেষণ করতে গিয়েও তিনি সাধারণ ভাষার মূল কাঠামো মোটামুটি ঠিকই ধরেছেন। তবু তাঁর আলোচনায় কিছু-কিছু ত্রুটি আছে। যেমন, তিনি বর্ণ ও ধ্বনির মধ্যে পার্থক্যটি ধরতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত তিনি শুধু সংযোজক অব্যয়ের (conjunction) কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অন্যবিধ অব্যয়ের কথা উল্লেখ করেন নি। বিশেষ্যের (noun) কথা বলেছেন, কিন্তু সর্বনাম (pronoun), বিশেষণ (adjective) ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি নীরব। বাক্যের বিশ্লেষণও তাঁর পূর্ণাঙ্গ নয়। অবশ্য এসব ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও প্রথম যুগের ভাষাজিজ্ঞাসু আরিস্তোতেল্ যে বিধিবদ্ধ বিশ্লেষণী দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন এবং ব্যাকরণের যে মূল কাঠামো রচনা করে দিয়েছেন তার জন্যে পাশ্চাত্য ব্যাকরণ-চর্চার ধারায় তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

প্লাতো তাঁর 'কথোপকথনে' নানা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ভাষা সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছিলেন ; আরিস্তোতেল্ কাব্যতত্ত্বের নানাদিক আলোচনার অংশরূপে কাব্যভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ভাষার গঠন বিশ্লেষণ করেছিলেন, কিন্তু দু'জনের কেউই ভাষাতত্ত্বকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের (independent discipline) মর্যাদা দিয়ে আলোচনা করেন নি। ভাষাকে দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে হলেও একটি স্বতন্ত্র বিদ্যার মর্যাদা দিয়ে পৃথক্ গ্রন্থে আলোচনা করেন আরিস্তোতেল্-এর পরে স্টোইক্ (Stoic) দর্শন-গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দ। ভাষার তিনটি দিক--ধ্বনি, শব্দরূপ-ক্রিয়ারূপ এবং ব্যুৎপত্তি বিষয়ে তাঁরা আলোচনা করেন যদিও শব্দরূপ-ক্রিয়ারূপের ক্ষেত্রেই তাঁদের অবদান সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। ভাষাতত্ত্বকে স্বতন্ত্র বিদ্যার মর্যাদা দিয়ে পৃথক্-ভাবে আলোচনার যে ধারা তাঁরা প্রবর্তন করেন তা আলেক্‌জান্দ্রীয় গোষ্ঠীর (Alexandrians) লেখকরা অনুসরণ করেন। তাঁদের মধ্যে গ্রীকভাষার প্রথম স্বতন্ত্র ব্যাকরণ রচনা করে অমর হয়ে আছেন দিওনুসিওস্ থ্রাক্স্ (Dionūsios Thrax) (খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী)। তাঁর ব্যাকরণ 'তেক্‌নে গ্রামাতিকে' (τέχνη γραμματική) অতি সংক্ষিপ্ত একটি রচনা। অথচ গ্রীক ব্যাকরণের প্রায় সমস্ত দিক তিনি আলোচনা করেছেন। যদিও বাক্যতত্ত্ব বোঝাতে sy'ntaxis

(συνταξις) কথাটি তিনি ব্যবহার করেছেন তবু বাক্যতত্ত্ব (syntax) সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন নি। তবে রূপতত্ত্বের (morphology) মূল কাঠামো তিনি বিধিবদ্ধভাবেই রচনা করে গিয়েছেন। বাক্যের তিনি যে পদবিভাগ করেছেন তা হল : noun *(ónoma)*, pronoun *(antōnymíā)*, article *(árthon)*, verb *(rhēma)*, adverb *(epírrhēma)*, participle *(metochḗ)*, preposition *(próthesis)* এবং conjunction *(sýndesmos)*। দেখা যাচ্ছে, আরিস্তোতেল্-এর আলোচনায় যে ঘাটতি ছিল তা থ্রাক্স্ অনেকটাই পূরণ করেছেন এবং ব্যাকরণের প্রায় পূর্ণাঙ্গ মূল কাঠামো রচনা করতে পেরেছেন।

থ্রাক্সের পরে গ্রীক বৈয়াকরণ আপোলোনিওস্ দুস্‌কোলোস্ (Apollonios Duskolos, খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী) ব্যাকরণের আরো উন্নতি বিধান করেন। বিশেষত যে বাক্যতত্ত্বের (Syntax) প্রসঙ্গ উত্থাপন করেও থ্রাক্স্ তার সম্পর্কে আলোচনা করেন নি, আপোলোনিওস্ দুস্‌কোলোস্ তার সম্পর্কে প্রথম বিধিবদ্ধ আলোচনা করেন। তিনি ব্যাকরণের একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু তার অধিকাংশই আজ আর পাওয়া যায় না। তাঁর পুত্র হেরোদিয়ানুস্ (Hērōdianus) গ্রীক ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উদ্‌ঘাটন করেন। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে যাকে ধ্বনির ছন্দোগুণ (prosodic features) ও অবিভাজিত স্বনিম (suprasegmental phonemes) বলে, তার একটি দিক হল স্বরাঘাত (pitch accent)। হেরোদিয়ানুস্ গ্রীক ভাষার এই স্বরাঘাত-বিধি ও বিরাম-বিধি (punctuation) সম্পর্কে আলোচনা করেন। এইভাবে ধাপে-ধাপে আরিস্তোতেল্, দিওনিসিওস্ থ্রাক্স্, আপেলোনিওস্ দুসকোলোস্ ও হেরোদিয়ানুস্-এর হাতে গ্রীক ব্যাকরণের আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হয়।

পূর্বোল্লিখিত গ্রীক বৈয়াকরণদের রচনায় শুধু গ্রীক ব্যাকরণই পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠে নি, ব্যাকরণ রচনার মূল দিগ্‌দর্শনই পাওয়া গিয়েছিল। ব্যাকরণ রচনার যে মূল কাঠামো তাঁরা রচনা করেছিলেন তা লাতিন (Latin) ভাষার বৈয়াকরণরা অনুসরণ করেছিলেন এবং তাঁদের মাধ্যমে এই কাঠামো দীর্ঘকাল পর্যন্ত আধুনিক ইউরোপীয় আর্যভাষা সমূহের ব্যাকরণ রচনায়ও অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রীক বৈয়াকরণদের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে গেলে তাঁদের আলোচনার কিছু সীমা ও ঘাটতির কথা আমাদের মনে আসে। প্রথমত তাঁদের ভাষাদৃষ্টি ছিল গ্রীক ভাষাতেই সীমাবদ্ধ। তাঁদের লেখা থেকে প্রমাণ হয় যে, অন্য ভাষার কথা তাঁরা জানতেন, এবং গ্রীকভাষা অন্য ভাষার সংস্পর্শেও এসেছিল। কিন্তু অন্য ভাষা সম্পর্কে তাঁদের সশ্রদ্ধ কৌতূহল তো ছিলই না, বরং ভিন্ন ভাষাভাষীকে

তাঁরা অবজ্ঞার চোখেই দেখতেন, বলতেন তারা বর্বর (*βάρβαροι* bárbaroi)। এই সঙ্কীর্ণ ভাষাদৃষ্টির ফলে তাঁরা অন্য ভাষার গঠনগত স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করতে পারেন নি, মনে করেছেন তাঁদের ভাষার যে ব্যাকরণের কাঠামো তা সব ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা হল বিশ্বজনীন (universal)। তাঁদের আলোচনার আর একটা বৈশিষ্ট্য আজকের দিনে ত্রুটি বলে মনে হয়। তাঁদের ভাষাদৃষ্টি ছিল বৈজ্ঞানিক নয়, মূলত দার্শনিক ; বিশেষত তাঁদের বাক্য বিশ্লেষণ ছিল তর্কশাস্ত্রের (logic) কাঠামোতে ঢালা। বাক্যকে উদ্দেশ্য (subject), বিধেয় (predicate) ও সংযোজক ক্রিয়া (copula)-তে বিভাজনের যে রীতি তাঁরা অনুসরণ করেছেন তা স্পষ্টত তর্কশাস্ত্রের syllogism থেকে গৃহীত। যদিও ব্যাকরণ (*γραμματική* grammatiké) কথাটি তাঁরাই প্রথম ব্যবহার করেন, তবু ব্যাকরণ ছিল তাঁদের কাছে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দর্শনশাস্ত্রের (philosophia = *φιλοσοφία*) অন্তর্গত। অবশ্য আরিস্তোতেল্ ভাষাকে কাব্যশাস্ত্রের (Poetics) অন্তর্গত করে আলোচনা করেছেন এবং থ্রাক্স ও দুস্কোলোস্ ভাষা সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনা করেছেন। কিন্তু সেখানেও যে ভাষা সম্পর্কে আলোচনা পাই তা কথ্য ভাষা (spoken language) নয়, সাহিত্যের ভাষা (literary language)। থ্রাক্স নিজেই স্বীকার করেছেন—ব্যাকরণ হল কবি ও গদ্যকারদের ব্যবহৃত ভাষার ('usages of poets and prose writers') আলোচনা। সাহিত্যের ভাষা অপেক্ষাকৃত কৃত্রিম, তাই আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা কথ্যভাষার উপরে ভিত্তি করেই ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন।

প্রাচীন কালের পাশ্চাত্যদেশের ভাষাজিজ্ঞাসার ইতিহাসে গ্রীসের পরে রোমের অবদান আলোচ্য। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যে গ্রীস ক্রমে ক্রমে রোমের অধীনে চলে আসে। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে রোমানরা গ্রীস অধিকার করলেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে গ্রীকেরাই রোমের উপরে অধিকার স্থাপন করে। অর্থাৎ সমৃদ্ধ গ্রীক সংস্কৃতি ও বলিষ্ঠ গ্রীক জীবনদর্শনের সংস্পর্শে এসে রোমানরা তার দ্বারা এত বেশি প্রভাবিত হয় যে, সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা মূলত গ্রীকদের পথই অনুসরণ করতে থাকে। ভাষাজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রেও দেখতে পাই, ব্যাকরণ রচনায় গ্রীক মনীষীরা যে কাঠামো রচনা করেছিলেন রোমানরা তাদের ভাষা লাতিনের ব্যাকরণে সেই কাঠামোই অনুসরণ করে। শোনা যায়, গ্রীসের একজন বৈয়াকরণ ক্রাতেস্ (Krătēs) খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোম ভ্রমণে এসে একটি দুর্ঘটনায় অসুস্থ হয়ে সেখানে দীর্ঘকাল থেকে যান। এই সময় তিনি ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে

যে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন তাতেই রোমানরা গ্রীক ভাষাদর্শন সম্পর্কে প্রথম অবহিত হয়। ক্রমে গ্রীসের উপরে রোমের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে রোমানরা আরো গ্রীক ব্যাকরণের সংস্পর্শে আসে এবং রোমে গ্রীক ব্যাকরণের আদর্শে লাতিন ব্যাকরণ রচিত হতে থাকে। প্রথম যে লাতিন ব্যাকরণের নিদর্শন পাওয়া যায় তা হল খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর বৈয়াকরণ ভারো (Varrō) রচিত 'দে লিঙ্গুয়া লাতিনা' (De Lingua Latina)। ভারো যখন ব্যাকরণ রচনা করেন তখনো রোমে গ্রীক প্রভাব ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি বলে তাঁর রচনায় কিছু মৌলিকতা রয়েছে। তবু তিনিও গ্রীক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না। তার প্রমাণ, ধ্বনি ও অর্থের সম্পর্ক বিষয়ে গ্রীকেরা যে বিতর্কের অবতারণা করেছিলেন, তিনিও সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। গ্রীক ব্যাকরণের আরো ব্যাপক প্রভাব পড়েছে পরবর্তী রোমান লেখক কুইন্তিলিয়ানুসের (Marcus Făbius Quintiliānus) (খ্রীঃ প্রথম শতাব্দী) রচনায়। তাঁর 'ইন্স্তিতুতিও ওরাতোরিও' (Institutio Oratorio) রচনাটিতে বক্তৃতাবিজ্ঞান, সাহিত্যতত্ত্ব ও ব্যাকরণের আলোচনা পাওয়া যায়। গ্রন্থটিতে মৌলিকতা বিশেষ নেই। ভারোর রচনাটি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় নি। কুইন্তিলিয়ানুসের রচনাটিও শুধু ব্যাকরণবিষয়ক নয়। লাতিন ভাষায় প্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ হচ্ছে দোনাতুসের (Donātus) লাতিন ব্যাকরণ (খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী) এবং প্রিস্কিয়ানুসের (Prisciānus) লাতিন ব্যাকরণ (খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী)। ব্যাকরণ দু'টি আদর্শ লাতিন ব্যাকরণের মর্যাদা লাভ করেছিল। বিশেষত প্রিস্কিয়ানুসের ব্যাকরণটিকে সেকালের ক্লাসিক্যাল লাতিনের শ্রেষ্ঠ বর্ণনামূলক ব্যাকরণ বলা যায়, যেমন আমাদের পাণিনির ব্যাকরণ ছিল সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ বর্ণনামূলক ব্যাকরণ (descriptive grammar)। প্রিস্কিয়ানুসের ব্যাকরণের নাম 'ইন্স্তিতুতিওনেস্ গ্রামাতিকাএ' (Institutiones Grammaticae)। গ্রীক আদর্শে রচিত লাতিন ব্যাকরণের চরম বিকাশ হয়েছিল প্রিস্কিয়ানুসের এই রচনায়। ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), রূপতত্ত্ব (Morphology) এবং বাক্যতত্ত্ব (Syntax) তিন দিক থেকেই তিনি ক্লাসিক্যাল লাতিন ভাষার যে ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন তা মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ। গ্রীক বৈয়াকরণ দিওনুসিওস্ থ্রাক্স্-এর আদর্শ অনুসরণ করলেও প্রিস্কিয়ানুসের নিজস্ব অবদান কম নয়। থ্রাক্স্ বাক্যতত্ত্বের আলোচনা করেন নি, প্রিস্কিয়ানুস্ করেছেন, এটা প্রিস্কিয়ানুসের মৌলিক সংযোজন। রূপতত্ত্বেও থ্রাক্সের কিছু কিছু ঘাটতি ছিল, প্রিস্কিয়ানুস্ তাঁর লাতিন ব্যাকরণে সেগুলি পূরণ করেছেন। প্রিস্কিয়ানুস্ যে আট প্রকার পদের (parts of speech) কথা উল্লেখ

করেছেন সেগুলি হল—noun (nōmen), pronoun (prōnōmen), verb (verbum,) participle (participium), adverb (adverbrum), preposition (praepositiō,) interjection (interiectiō) এবং conjunction (conjunctiō)। এই পদ-বিভাগের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, থ্রাক্স্ interjection-এর কথা উল্লেখ করেন নি, প্রিস্কিয়ানুস করেছেন। আর থ্রাক্স পদের মধ্যে article-কে ধরেছেন, প্রিস্কিয়ানুস্ বাদ দিয়েছেন। আমরা বুঝতে পারি, প্রিস্কিয়ানুস্ ক্রমশ ব্যাকরণকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন। ফলে শুধু রোমে নয়, সমগ্র পাশ্চাত্য দেশে মধ্যযুগ পর্যন্ত প্রিস্কিয়ানুসের ব্যাকরণের প্রভাব অব্যাহত ছিল। মধ্যযুগে ক্লাসিক্যাল লাতিনের চর্চা বুদ্ধিজীবী ও বিদগ্ধ ব্যক্তির আভিজাত্যের পরিচয়-চিহ্ন ছিল, আর লাতিনচর্চার মূল সহায়ক ছিল প্রিস্কিয়ানুসের ব্যাকরণ। তা ছাড়া পরবর্তীকালে যাঁরা লাতিন ব্যাকরণ রচনা করেন তাঁরাও প্রিস্কিয়ানুসের পথই অনুসরণ করেছিলেন ; তাঁদের লাতিন ব্যাকরণে মৌলিকতা বিশেষ ছিল না। মধ্যপর্বে রচিত লাতিন ব্যাকরণগুলির মধ্যে অ্যায়েল্‌ফ্রিকের (Aelfric) লাতিন ব্যাকরণ ('Latin Grammar') (আনুমানিক ১০০০ খ্রীস্টাব্দ) পুরোপুরি নির্দেশমূলক। তখনো পর্যন্ত প্রিস্কিয়ানুসের ব্যাকরণের প্রভাব যে কত গভীর ছিল তা এই অ্যায়েল্‌ফ্রিকের লাতিন ব্যাকরণটি থেকে বোঝা যায়। তাঁর লেখা 'কোলোকুইয়াম্' (Colloquium) চলিত লাতিন ভাষায় কথোপকথন শিক্ষা-বিষয়ক ব্যবহারিক গ্রন্থ। যতদূর জানা যায় চলিত ভাষা সম্পর্কে এইটিই হল প্রথম বই। খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায় ভিলেদ্যু-র আলেক্‌জান্দার (Alexander of Villedieu) 'দক্ট্রিনেল্' (Doctrinale) নামে একটি লাতিন ব্যাকরণ পদ্যবন্ধে রচনা করেন।

মধ্যযুগে আধুনিক ইউরোপীয় আর্যভাষাগুলির যে-সব ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে কোনো-কোনোটিতে অবশ্য কিছুটা মৌলিকতা চোখে পড়ে। একজন অজ্ঞাত লেখকের 'ফার্স্ট্ গ্রামাটিক্যাল্ ট্রিটিজ্' (First Grammatical Treatise)' গ্রন্থটিতে আইস্‌ল্যাণ্ডিক্ ভাষাগুলির প্রধানত ধ্বনিতাত্ত্বিক ও বানানগত দিক আলোচিত হয়েছে। লেখক লাতিন প্রভাব থেকে মুক্ত এবং মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে স্কলাস্টিক (Scholastic) দর্শনগোষ্ঠীর লেখকেরা 'দে মোদিস্ সিগ্‌নিফিকান্দি' (De modis significandi) নামে যে ব্যাকরণ-গ্রন্থাবলী রচনা করেন তাতে পূর্ববর্তী যুগের লাতিন ব্যাকরণের সূত্রের

সঙ্গে ব্যাকরণের তাত্ত্বিক দিকের সমন্বয়ের সূচনা হয়। ভাষাবিশেষের ব্যাকরণ থেকে ব্যাকরণের যে মূল সার্বভাষিক তত্ত্বের দিকে তাঁরা অঙ্গুলি-সঙ্কেত করেন তার উপরে ভিত্তি করেই ক্রমে পরবর্তী কালে সার্বভাষিক ব্যাকরণের (universal grammar) তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগের ব্যাকরণের অনেক ঘাটতি থাকলেও ভবিষ্যতের জন্যে এই যে তত্ত্বের নির্দেশ তাঁরা নিজের অজ্ঞান্তেই দিয়ে গেলেন তাঁদের এই অবদান বিশেষজ্ঞরাই স্বীকার করেছেন।[৩৭] তবু একথা মনে রাখতে হবে যে, সে যুগে সর্বভাষিক ব্যাকরণের (universal grammar) মূল দার্শনিক তত্ত্বটি অনেকেই উপলব্ধি করেন নি। বরং এ থেকে এই ভ্রান্ত ধারণা ক্রমশ গড়ে উঠছিল যে, লাতিন ভাষার ব্যাকরণের কাঠামো সব ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই স্কলাস্টিক্ দর্শনগোষ্ঠীরও আগে অ্যায়েল্‌ফ্রিক্ যে লাতিন ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন তাতে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে, তাঁর লাতিন ব্যাকরণটি প্রাচীন ইংরেজি ভাষারও ব্যাকরণের ভূমিকারূপে গৃহীত হতে পারে। অনেক পরবর্তী কালে যখন ফরাসি, ইতালিয়, স্পেনিয় প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় আর্য ভাষাগুলির ব্যাকরণ রচিত হয় তখনও মূলত প্রিস্কিয়ানুসেরই লাতিন ব্যাকরণের কাঠামো অনুসৃত হতে থাকে। আরো বিস্ময়ের কথা এই যে, ইংরেজি, জার্মান, আইরিশ প্রভৃতি যে-সব ভাষা লাতিন থেকে জন্ম নেয় নি তাদের ব্যাকরণেও লাতিন ব্যাকরণের প্রভাব খুব বেশি। এর কারণ এই যে, লাতিন ব্যাকরণের যে কাঠামো তা সব ভাষারই সাধারণ ব্যাকরণের (General Grammar) কাঠামো—এই ধারণা মধ্যযুগেই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। এই ধারণার চরম পরিণতি দেখা গেল পোর্ট-রয়্যালের ধর্মমঠ (Convent of Port-Royal) থেকে প্রকাশিত 'গ্রাম্যার্ জেনেরাল্ এ রেজোনে' (Grammaire générale et raisonée) (১৬৬০ খ্রীঃ) নামক ব্যাকরণে। অনেক পরে ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে হের্মান্ গট্‌ফ্রীট্ (Hermann Gottfried) যে ব্যাকরণ ('দে এমেন্দান্দা রাতিওনে গ্রাএকাএ গ্রামাতিকাএ' = De emendanda ratione graecae grammaticae) রচনা করেন তাতেও এই সাধারণ ব্যাকরণের বদ্ধমূল ধারণাটির পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধারণার ফলে ক্রমশ এই মনোভাব গড়ে উঠেছিল যে, যা এই ব্যাকরণের নিয়ম মানে না সেই প্রয়োগ অশুদ্ধ। ফলে

৩৭। "From this attitude consistently arose the conception of an underlying universal grammar, a recurrent quest of theoretical linguists thereafter."–Robins, Prof. R. H. ; *A Short History of Linguistics,* London ; Longmans, 1969, p. 76.

কোন্‌টি শুদ্ধ, কোন্‌টি অশুদ্ধ, এই বিচারই ব্যাকরণে স্থান পেতে থাকে এবং মন-গড়া শুদ্ধ প্রয়োগের নির্দেশ দিতে থাকায় ব্যাকরণ ক্রমশ নির্দেশমূলক ব্যাকরণ (Normative Grammar) হয়ে উঠে। যে গ্রীক ব্যাকরণ ছিল মূলত দার্শনিক তর্কশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত, তার আদর্শে রচিত পরবর্তী ব্যাকরণ প্রথমে কতকটা বাস্তব বর্ণনামূলক হলেও ক্রমে তার পরিণতি হয় নির্দেশমূলক ব্যাকরণে। ব্যাকরণের বিবর্তনের এই ধারাটি ব্লুমফিল্ড্‌ (Bloomfield) সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

> "An unfortunate outgrowth of the general grammar idea was the belief that the grammarian or lexicographer, fortified by his powers of reasoning, can ascertain the logical basis of language and prescribe how people ought to speak. In the eighteenth century, the spread of education led many dialect-speakers to learn the upper-class forms of speech. This gave the authoritarians their chance : thay wrote *normative grammars,* in which they often ignored actual usage in favour of speculative notions."[৩৮]

সুতরাং সামগ্রিকভাবে বলতে পারি, পাশ্চাত্য দেশে ব্যাকরণের ধারাটি ছিল প্রথমে দার্শনিক, পরে হয়ে উঠল নির্দেশমূলক। প্রায় আধুনিক কাল পর্যন্ত স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ মূলত মধ্যযুগীয় লাতিন ব্যাকরণের আদর্শে রচিত নির্দেশমূলক ব্যাকরণই ছিল। একালে ইংরেজি ভাষার বহু প্রচলিত নেস্‌ফিল্ড্‌ ব্যাকরণ (Nesfield's English Grammar) তার প্রধান নিদর্শন।

সবশেষে মধ্যযুগের নির্দেশমূলক ব্যাকরণের অবদান বিচার করতে গেলে মনে হয়, এই বৈয়াকরণরা সমাজে প্রচলিত ভাষার বাস্তব রূপ না দেখে ঐতিহ্যাগত (traditional) বা মন-গড়া (speculative) তত্ত্বের মানদণ্ডে ভাষার তথাকথিত শুদ্ধ রূপ ধরে রাখার জন্যে নির্দেশমূলক ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন, তাতে ভাষার জীবন্ত রূপের স্বাভাবিক পরিবর্তনকে রোধ করার চেষ্টা হয়েছিল। এতে লাতিন ভাষা ক্রমশ ব্যাকরণের জালে বাঁধা পড়ে কৃত্রিম হয়ে মৃত ভাষায় পরিণত হয়ে যায়, অন্যদিকে লোক-মুখে ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তন ব্যাকরণের শাসন উপেক্ষা করে চলতেই থাকে। এর ফলে জীবন্ত ভাষার সঙ্গে ব্যাকরণের একটা দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠে এবং লাতিন ব্যাকরণ

৩৮। Bloomfield, Leonard ; *Language,* Delhi ; Motilal Banarsidass, 1963. pp. 6-7.

প্রাদেশ ভাষার ব্যাকরণে পর্যবসিত হয়।

এ পর্যন্ত ব্যাকরণের ধারার যে আলোচনা করা হল তাকে আমরা মোটামুটিভাবে তিনটি পর্বে ভাগ করতে পারি—প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক পর্ব। পাশ্চাত্য দেশে প্লাতো থেকে প্রিস্কিয়ানুস্ পর্যন্ত ব্যাকরণের যে পর্ব, অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত, তাকে আদি বা প্রাচীন পর্ব বলা যায়। এই যুগে ব্যাকরণের ধারা বিকশিত হয়েছে গ্রীসে ও রোমে। তার পরে অর্থাৎ খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে শুরু করে ইতালিতে নবজাগরণের আগে (খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী) পর্দন্ত ব্যাকরণের যে পর্ব তাকে মধ্য পর্ব বলা যায়। এই পর্বে নতুন চিন্তা-চেতনা-শিল্প-দর্শনের বিকাশ বিশেষ হয় নি। প্রশাসন-শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ক্লাসিক্যাল লাতিনের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লাতিন ব্যাকরণের চর্চা অব্যাহত থেকেছে। এ ছাড়া খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে আধুনিক ইউরোপীয় আর্যভাষাগুলির জন্ম হতে থাকায় এরপর থেকে ফরাসি, ইতালিয়, স্পেনিয়, আইরিশ, ইংরেজি, জার্মান প্রভৃতি ভাষারও ব্যাকরণ রচিত হতে থাকে। নবজাগরণের আগে পর্যন্ত এসব আধুনিক ভাষার যে সব ব্যাকরণ রচিত হয়েছে তাও দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে মধ্যপর্বের ধারাতেই পড়ে। নবজাগরণের পর থেকে ইউরোপে আধুনিকতার সূচনা। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে আধুনিকতার প্রবর্তন হলেও ব্যাকরণে আধুনিকতার বিশেষ বিকাশ তখনো হয় নি।

মোটামুটিভাবে খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথমে ইতালিতে এবং পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশে নবজাগরণ (Renaissance) সূচিত হয়। এই নবজাগরণের পর থেকে ইউরোপে জীবনদৃষ্টিতে ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়। নবজাগরণের সুদূর প্রসারী ফলস্বরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে পাশ্চাত্যদেশে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philology) চর্চা নবোদ্যমে সূচিত হয়, সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। কিন্তু তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ছাড়া একক ভাষার প্রচলিত ব্যাকরণের ক্ষেত্রে মূলত পুরানো কাঠামোই অনুসৃত হতে থাকে। নতুনত্ব দেখা যায় কেবল দু'টি দিকে। প্রথমত, আগে যেমন মূলত প্রাচীন ভাষা ও লাতিনের ব্যাকরণ রচিত হত, নবজাগরণের পরে দৃষ্টিভঙ্গি সেরকম শুধু প্রাচীন ভাষায় সীমাবদ্ধ থাকে নি। ইতিপূর্বে ইতালিয় মহাকবি দান্তে খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতেই তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দে ভুল্গারি এলোকুএন্তিআ'-তে (De vulgari eloquentia) মৃত ভাষা ক্লাসিক্যাল লাতিনের বদলে জীবন্ত মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। নবজাগরণের যুগে প্রাচীন সংস্কৃতির নবীভূত চর্চা যেমন হয়, তেমনি দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তব-জীবনমুখী হওয়ার ফলে আধুনিক ভাষাগুলির গুরুত্ব

স্বীকৃত হয় এবং আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাগুলির ব্যাকরণ ব্যাপকভাবে লিখিত হতে থাকে। দ্বিতীয়ত, দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হবার ফলে ইন্দো-ইউরোপীয় বংশ-বহির্ভূত আরবি, হিব্রু, চীনা প্রভৃতি অন্য ভাষার দিকেও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সেমিয়-হামিয় (Semitic-Hamitic) বংশের ভাষা হিব্রুর ব্যাকরণ রচনা করে রয়ক্লিন্ (Reuchlin) এদিক থেকে সেকালের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর ব্যাকরণের নাম 'দে রুদিমেন্তিস্ হেব্রাইকিস্' (De rudimentis Hebraicis)। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ক্লেনার্ (Clénard) রচিত হিব্রু-ব্যাকরণও বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অন্যদিকে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকে আধুনিক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার যে-সব ব্যাকরণ রচিত হয় সেগুলির মধ্যে জে. পাল্‌গ্রেভ্ (J. Palsgrave)-রচিত ফরাসি ভাষার ব্যাকরণ 'লে ক্লেয়ার্‌সিস্‌মাঁ দ্য লা লাঁগ ফ্রাঁসোয়াজ্' ('L' esclarcissement de la langue francoyse) সে যুগের পক্ষে নতুন পদক্ষেপ।

নবজাগরণের যুগে রচিত ব্যাকরণগুলির মধ্যে পিয়ের্ রামে (পেত্রুস্ রাম্যুস্) (Pierre Ramée (Petrus Ramus)-রচিত ফরাসি ব্যাকরণে যথেষ্ট আধুনিকতার পরিচয় আছে। ফরাসি ভাষাকে লাতিনের ছত্রচ্ছায়ায় না রেখে তিনি বরং লাতিন থেকে ফরাসির উচ্চারণগত ও অন্যবিধ পার্থক্যই দেখাতে চেয়েছেন। নবজাগরণের যুগে গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি পুনর্জাগ্রত শ্রদ্ধার ফলে নতুন রীতিতে এইসব প্রাচীন ভাষারও ব্যাকরণ রচনা আবার সূচিত হয়। ইরাস্‌মুস্ Erasmus) গ্রীক ও লাতিন ভাষার ধ্বনির উচ্চারণ বিষয়ে আলোচনা করেন। জে. সি. স্কালিগের (J. C. Scaliger)-রচিত লাতিন-ব্যাকরণ 'দে কাউসিস্ লিঙ্গুআএ লাতিনাএ' (De causis linguae Latinae) এবং সাংক্তিউস্ (Sanctius)-রচিত লাতিন-ব্যাকরণ 'মিনের্ভা সেও দে কাউসিস্ লিঙ্গুআএ লাতিনাএ' (Minerva seu de causis linguae Latinae) এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এই নবজাগরণের পরেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত ঐতিহ্যাগত নির্দেশমূলক ব্যাকরণের ধারা অব্যাহত থাকে। কেউ-কেউ অল্পস্বল্প নতুনত্ব সাধন করলেও দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন কেউ সাধন করতে পারেন নি। ষোড়শ শতাব্দীতে পিয়ের্ রামে (পেত্রুস্ রাম্যুস্) [Pierre Ramée (Petrus Ramus)] ব্যাকরণের তত্ত্ব বিষয়ক তাঁর গ্রন্থ 'শোলাএ গ্রামাতিকাএ' (Scholae grammaticae) রচনা করে আধুনিকদের মতো গঠনবাদী (Structuralist) দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাষা বিশ্লেষণের উপরে প্রথম গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু তখনও তাঁর বক্তব্য ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করে নি। বর্তমান শতাব্দীতে ঐতিহ্যাগত নির্দেশমূলক ব্যাকরণের কৃত্রিমতা ধরা পড়তে থাকে এবং ফের্দিনাঁ দ্য সোস্যুরের বর্ণনামূলক

ভাষাবিশ্লেষণ স্বীকৃতি লাভ করে। এর পর গতানুগতিকতার বাঁধন ভাঙতে থাকে। ক্রমে ব্যাকরণ নতুনভাবে গঠনবিশ্লেষণমূলক (Structural) বা রূপান্তরমূলক-সৃজনমূলক (Transformational Generative) ব্যাকরণের তত্ত্বের আলোকে অথবা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহারিক বা ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের (Applied Linguistics) পদ্ধতি অবলম্বন করে লেখা শুরু হয়ে যায়। সুতরাং ব্যাকরণের ধারায় আধুনিকতার সূচনা হয়েছে সাম্প্রতিক কালেই।

(২) সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব ; তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ব্যাকরণের ধারা (Course of Philological Studies : Comparative and Historical Grammar) :

প্রথমেই বলা দরকার যে, পাশ্চাত্যদেশে বাঙ্মীমাংসা বা সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বের বিকাশ হয় যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীতেই, তবু এই ধারার প্রথম সূচনা হয়েছিল অনেক আগে প্রাচীন গ্রীসে। গ্রীসের স্টোইক (Stoic) দার্শনিক গোষ্ঠীর বৈয়াকরণরা যেমন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাকরণ রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন, তেমনি আলেক্‌জান্দ্রীয় বৈয়াকরণ-গোষ্ঠী (Alexandrians) সাহিত্য-আলোচনার অঙ্গ হিসাবে ব্যাকরণ চর্চায় মনোযোগী হয়েছিলেন। এই ধারারই শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ দিওনুসিওস্ থ্রাক্স্ ও আপোলোনিওস্ দুস্‌কোলোস্। এঁরা সাহিত্য থেকে উপাদান নিয়ে তা থেকে সাধারণ সূত্র বের করে ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন, এঁরা ছিলেন শুধুই বৈয়াকরণ (grammarian)। কিন্তু এই আলেক্‌জেন্দ্রীয় গোষ্ঠীরই অন্য লেখক আরিস্তার্কাস্ (Aristarchus, খ্রীস্টপূর্ব ২১৬-১৪৪) মূলত সাহিত্যের ভাষাই বিশ্লেষণ করে সাহিত্যপাঠে ও তার অন্তর্নিহিত ভাববস্তু অনুধাবনে সহায়তা করেছিলেন ; তাঁকে বলতে পারি পাশ্চাত্যের প্রথম বাঙ্মীমাংসক বা সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ববিদ্ (philologist)। হোমেরের (Hōmer < Hŏmērŏs) কাব্য দু'টি—ইলিয়াদ ও ওদিসি (Iliad < Ilias and Odyssey < Odusseia)—পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছিল বহু আগে খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে। প্রায় পাঁচ-ছ' শ' বছরের ব্যবধানে আরিস্তার্কাসের সময় কাব্যদু'টির ভাষা অনেকটা প্রাচীন ও দুর্বোধ্য হয়ে গিয়েছিল। তাই কাব্যদু'টির পাঠোদ্ধারের জন্যে, তার রসগ্রহণ ও বিষয়বস্তু অনুধাবনের জন্যে তার ভাষা বিশ্লেষণ ও তার টীকা রচনার প্রয়োজন হয়েছিল। এই কাজটুকু করে আরিস্তার্কাস্ যথার্থ সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের (philologist) কাজই করেছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার এই পুঁথিগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেকালে যে সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল সেই ধারা দীর্ঘকাল আর কেউ অনুসরণ করেন নি। শুধু আপোলোনিওস্ দুস্‌কোলোসের পুত্র হেরোদিয়ানুস্

(Herodianus) হোমরের ভাষার স্বরাঘাতের (accent) দিকটি আলোচনা করেছিলেন। তারপরে দীর্ঘকাল এই ধারার আর কোনো উত্তরসূরি পাওয়া যায় না।

এর বহুকাল পরে নবজাগরণ হয় এবং তারও অনেকদিন পরে পাশ্চাত্য দেশে যখন সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বের (philology) বিশেষ বিকাশ সাধিত হয় তখন তার রূপ ছিল অনেকটা অন্য ধরনের। তখন কোনো একটিমাত্র প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ নয়, তখন একাধিক প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা অধ্যয়ন, একাধিক ভাষার মধ্যে পারস্পরিক তুলনা এবং সেইসব ভাষার বংশনির্ণয় ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের রূপরেখা চিত্রিত করাই সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বের বা বাঙ্‌মীমাংসার উদ্দেশ্য হয়ে উঠে। তখনকার সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব (philology) যে রূপে বিকাশ লাভ করেছিল তাকে বলতে পারি তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ব্যাকরণ (Comparative and Historical Grammar) বা সংক্ষেপে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology)। তখনকার পাশ্চাত্য দেশের ভাষাজিজ্ঞাসুদের দৃষ্টি নিজের ভাষার গণ্ডির বাইরে আকৃষ্ট হওয়ার মূলে ছিল নবজাগরণ (Renaissance)। পাশ্চাত্যদেশের এই নবজাগরণের নানা কারণ ছিল এবং এর নানামুখী প্রবণতার বিকাশ হয়েছিল। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসের দিক থেকে প্রধানত তিনটি কারণ গুরুত্বপূর্ণ। সেই তিনটি কারণের ফলে ত্রিমুখী প্রবণতা প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল :

(ক) নানা দেশে ইউরোপীয়দের ভৌগোলিক অভিযান : ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দে কোলাম্বাস (Columbus) আমেরিকা আবিষ্কার করেন ; তার ফলে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের ভাষার মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়, এবং একাধিক দেশের ভাষার সঙ্গে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সংযোগ স্থাপিত হয়। ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভাস্কো দা গামা (Vasco da Gama) নতুন পথ আবিষ্কার করে ভারতের কালিকট বন্দরে এসে উপনীত হন। ভারত ও ইউরোপের মধ্যে সোজাসুজি যোগাযোগের এই সমুদ্র-পথটি আবিষ্কারের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকরা বলেছেন—

> "Perhaps no event during the Middle Ages had such far-reaching repercussions on the civilised world as the opening of the sea-route to India."[৩৯]

৩৯। Vide ; Majumdar, Dr. R. C.; Raychaudhuri, Dr. H. C. and Dutta, Dr. Kalikinkar ; *An Advanced History of India,* Macmillan, 1970, p. 623.

পথও এই নতুন পথটি আবিষ্কৃত হবার ফলে ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতের শুধু বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগই স্থাপিত হয় নি, এর ফলে সাংস্কৃতিক যোগাযোগেরও নতুন দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। ক্রমে একদিকে যেমন পাশ্চাত্য প্রভাবে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নবজাগরণ সূচিত হয়, তেমনি ইউরোপীয় পণ্ডিতরা ভারতীয় ভাষা, বিশেষত সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে অবহিত হয়ে উঠেন এবং তাঁদের তুলনামূলক ভাষা-অধ্যয়নে সংস্কৃতও স্থান লাভ করে।

(খ) ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে তুর্কিদের দ্বারা কন্‌স্তান্‌তিনোপ্‌ল্ অধিকার : রোমানরা গ্রীস অধিকার করার পরে কন্‌স্তান্‌তিনোপ্‌ল্‌ই (Constantinople) গ্রীক পণ্ডিতদের বিদ্যাকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। সেই কন্‌স্তান্‌তিনোপ্‌ল্ যখন তুর্কিরা অধিকার করে (১৪৫৩ খ্রীঃ) তখন সেখানকার গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতরা ইতালিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তার ফলে ইতালি গ্রীক-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে ; গ্রীসের বলিষ্ঠ জীবনবাদ, নানামুখী বিদ্যানুরাগ ও সংস্কৃতির প্রভাবে ইতালিতে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে যে জাতীয় নবোত্থান সূচিত হয় তাকেই আমরা নবজাগরণ বা Renaissance বলি। যদিও Renaissance কথাটির অর্থই 'নবজন্ম' (ফরাসি 'রনোত্র্' renaître = to be born again), তবু এই কথাটি যিনি প্রথম ব্যবহার করেন সেই জ্যুল্ মিশ্‌লে (Jules Michelet)[৪০] এক ব্যাপক অর্থ এর উপরে আরোপ করেছিলেন—'Discovery of the world and man'। ইতালি থেকে এই নবজাগরণ ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজদের মাধ্যমে ভারতেও এর স্পর্শ লাগে। এই নবজাগরণের একটি প্রবণতা ছিল প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি নবীভূত আগ্রহ ও তার নবমূল্যায়ন (revival of classical learning)। তার ফলে পাশ্চাত্যের ভাষাতত্ত্ববিদেরা গ্রীকভাষার প্রতি এবং ক্রমে অন্যান্য প্রাচীন ভাষার প্রতি নতুন করে আগ্রহী হয়ে উঠেন।

(গ) মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা : ১৪৪৩ খ্রীস্টাব্দে জার্মানির মাইন্‌ৎস্ (Mainz) অঞ্চলে প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ক্রমে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবার ফলে বিভিন্ন দেশের ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান, ধর্মগ্রন্থ ও প্রাচীন সাহিত্য মুদ্রিত হতে থাকে। মুদ্রিত হবার ফলে এক দেশের ভাষার লিখিত রূপ অন্যদেশের ভাষাজিজ্ঞাসুদের হস্তগত হয় এবং এতেও ভাষাদৃষ্টির প্রসার ঘটে, ভাষাবিষয়ে তুলনামূলক অধ্যয়নে সহায়তা ঘটে। মুদ্রাযন্ত্রের প্রসারের ফলে এক দেশের মনীষী অন্য দেশের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে যে কত গভীরভাবে

৪০। Symonds, John Addington ; *Renaissance in Italy, Part I (The Age of Despots),* New York ; H. Holt & Co., 1881, I, 15 n.

অবহিত হতে পারেন তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন জার্মান পণ্ডিত মাক্‌স্‌ম্যুলর্‌ (Max Müller)। বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌ মনীষী ভারতবর্ষে না এসেও ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য-ধর্ম সম্পর্কে এমন গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন যে তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন অবদানের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতিবশত বলেছিলেন—আমার মনে হয়, ভারতবর্ষই আমার জন্মস্থান। অন্যদিকে বিদেশে বসে ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে যে গবেষণা তিনি করেছিলেন তা নবযুগে ভারতবর্ষের স্বদেশী পণ্ডিতদের স্বীয় ভাষা-সাহিত্য-অধ্যয়নে এমন উদ্বুদ্ধ করেছিল যে, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন আমাদের প্রথম যুগের স্বদেশী ভারত-সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞরা যেন মাক্‌স্‌ম্যুলরের পাঠশালা থেকেই বেরিয়ে এসেছিলেন।[৪১]

তাহলে, পাশ্চাত্য দেশে নবজাগরণের যুগে যে ভৌগোলিক অভিযান সূচিত হয় এবং মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হল তার ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসাধারণের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এতে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার পার্থক্য ও সাদৃশ্য যতই ধরা পড়তে থাকে ততই ক্রমে-ক্রমে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে। খ্রীস্টান মিশনারীরা বিভিন্ন দেশে ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে সেইসব দেশের ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ন করেছিলেন। এবং সেইসব দেশের ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। এর ফলেও ইউরোপীয় মনীষীরা বিভিন্ন ভাষার মধ্যে তুলনার উপাদান লাভ করেন। আর কন্‌স্তান্‌তিনোপ্‌লের পতনের পরে গ্রীক পণ্ডিতরা ইতালিতে আসায় গ্রীক সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগের ফলে প্রাচীন সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের যে প্রবণতা দেখা দিল, তার ফলে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে প্রধানত প্রাচীন ভাষাসমূহের মধ্যে তুলনা করে তাদের বংশ-নির্ণয়ের প্রচেষ্টা দেখা দিল।

যদিও আগেই স্পেনিয় ইহুদি ইব্‌ন্‌ বারুন্‌ (Ibn Barun) আরবি ও হিব্রু ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন, তবু তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology) বলতে যা বুঝি তার সূত্রপাত হয় নবজাগরণ সূচিত হবারও প্রায় তিন শতাব্দী পরে। স্যার্‌ উইলিয়াম্‌ জোন্‌স্‌ (William Jones, ১৭৪৬-১৭৯৪ খ্রীঃ) কলকাতায় রয়্যাল এশিয়াটিক্‌ সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে যে বক্তৃতা দান করেন তাতেই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philology) সূচনা হয়। কারণ এই

৪১। "আধুনিক ভারত যখন ম্যাক্সম্যুলরের পাঠশালা থেকে বাহির হয়েই আর্যসভ্যতার দম্ভ করতে থাকে, তখন তার মধ্যে পশ্চিম গড়ের-বাদ্যের কড়িমধ্যম লাগে...।"

—রবীন্দ্রনাথ : শিক্ষা (শিক্ষার মিলন)।

বক্তৃতায় তিনি গ্রীক, লাতিন, গথিক (টিউটনিক), কেল্‌তিক, প্রাচীন পারসিক, আবেস্তীয় প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের সাদৃশ্যের সূত্রটি প্রথম ধরিয়ে দেন এবং এইসব প্রাচীন ভাষার মধ্যে যে পারস্পরিক সাদৃশ্য রয়েছে তার উপরে ভিত্তি করে এগুলির অভিন্ন বংশগত উৎসের ইঙ্গিত দেন। পরবর্তী কালে এই সাদৃশ্যসূত্রের উপরে ভিত্তি করেই প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অধ্যয়ন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ববিদের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠে। স্যর্ উইলিয়াম্ জোন্‌সের বক্তৃতাটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত বলে এর প্রাসঙ্গিক অংশটুকু দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃত-করা প্রয়োজন :

"The Sanscrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either ; yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs, and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident ; so strong, indeed, that no philologer could examine them all three, without believing them to have sprung from some common source, which, perhaps, no longer exists. There is a similiar reason, though not quite so forcible, for supposing that both the Gothic and Celtic, though blended with a different idiom, had the same origin with the Sanscrit ; and the old Persian might be added to the same family".—Sir William Jones (Asiatic Researches, Vol. I, 1979, Cosmo Publications. New Delhi, pp. 348-49).

সে-যুগের এই শ্রেষ্ঠ ভারতবিদ্যাবিদ্ মনীষী ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে প্রথম সসম্মানে তুলে ধরেছিলেন। এ ছাড়া ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের যে ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন তার মাধ্যমেই কালিদাসের এই নাটকের প্রতি ইউরোপীয় দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং পরে জার্মান মনীষী হের্ডার (Herder), হুম্‌বোল্ট্ (Humboldt), গ্যেটে (Goethe) এবং শিলার (Schiller) শকুন্তলা পাঠে মুগ্ধ হন আর শকুন্তলা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করেন। জোন্‌স্ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'রও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন।

যদিও ভারতবর্ষের মাটিতে কলকাতার রয়্যাল্ এশিয়াটিক্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠা-বেদীতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূচনা হয়েছিল জোন্‌সের বক্তৃতার মাধ্যমে, তবু এই ধারার পরবর্তী বিকাশ ঘটেছিল জার্মানিতেই। জার্মানিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূত্রপাত করেন ফ্রীড্রিশ্ ফন্ শ্লেগেল্ (Friedrich von

Schlegel, ১৭৭২-১৮২৯ খ্রীঃ)। তিনিই প্রথম জার্মান ভাষায় তুলনামূলক ব্যাকরণ (Vergleichende Grammatik) কথাটি ব্যবহার করেন এবং পরে তা-ই থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philology) প্রচলন হয়। আর তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology) অর্থে তুলনামূলক ব্যাকরণ (Comparative Grammar) কথাটিই দীর্ঘকাল ব্যবহৃতও হয়। পরবর্তী কালে যাঁদের হাতে এই ধারার চরম বিকাশ হয় সেই শ্লাইশারের (Schleicher) Compendium of the Comparative Grammar of Indo-Germanic Languages এবং ব্রুগ্‌মানের (Brugmann) Outline of the Comparative Grammar of the Indo-Germanic Languages গ্রন্থে শ্লেগেলেরই অনুসৃতি দেখতে পাই। জার্মানিতে শ্লেগেল্‌ই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের জন্মদাতা। অনেকে অবশ্য হুম্‌বোল্ট্‌কে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের জন্মদাতা বলেছেন। কিন্তু হুম্‌বোল্টের অবদান এই ক্ষেত্রে নয়, তাঁর আসল অবদান ভাষার গভীরতর তাত্ত্বিক দিকে, ভাষার মনস্তাত্ত্বিক দিকে। তাঁকে পাশ্চাত্যের মনস্তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানের (Psycho-linguistics) প্রথম জিজ্ঞাসু মনীষী বলা যায়। তাঁর সম্পর্কে পরে Linguistics বা বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানের ধারায় আলোচনা করা হবে। ফ্রীড্রিশ্‌ ফন্‌ শ্লেগেল্‌ ও তাঁর ভ্রাতা অধ্যাপক অ্যাডল্‌ফ্‌ শ্লেগেল্‌ (Adolf Schlegel, ১৭৬৭-১৮৪৫ খ্রীঃ) সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ফ্রীড্রিশ্‌ ফন্‌ শ্লেগেল ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে 'On the Language and Wisdom of the Indians' (Uber die Sprache und Weisheit der Indier) নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন তাতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের মূলনীতির প্রবর্তন করেন ; এই মূলনীতি হল বিভিন্ন ভাষার আভ্যন্তরীণ গঠনের তুলনা করে তাদের বংশগত অভিন্ন উৎসের নির্দেশ দেওয়া। জোন্‌স্‌ শুধু এই উৎসের ইঙ্গিতটুকু দিয়েছিলেন ; শ্লেগেল্‌ বললেন, এসব ভাষার মধ্যে গভীর ব্যাকরণগত সাদৃশ্য রয়েছে এবং এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে এই ভাষাগুলির বংশগত ঐক্য প্রতিপন্ন করা যায়। তিনি 'On the Language and Wisdom of the Indians' নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন তার গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে—"The work is considered the first attempt at Indo-Germanic linguistics and the starting point of the study of Indian languages and comparative philology."[৪২]

৪২। Stache-Rosen, Valentina ; *German Indologists,* New Delhi ; Max-Müller Bhavan, 1981, pp. 9-10.

শ্লেগেলের প্রায় সমসাময়িক মনীষী হুম্‌বোল্ট্‌কে (Wilhelm von Humboldt, ১৭৬৭-১৮৩৫ খ্রীঃ) কেউ-কেউ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আসল প্রতিষ্ঠাতা (real founder of the science of Comparative Philology) বলেছেন।[৪৩] কিন্তু আমরা আগে বলেছি যে, পাশ্চাত্যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের মূলনীতি প্রথম ধরিয়ে দেন ফ্রীড্রিশ্‌ ফন্‌ শ্লেগেল এবং তিনিই প্রথম 'তুলনামূলক ব্যাকরণ' কথাটি ব্যবহারও করেন। আমরা হুম্‌বোল্ট্‌কে নয়, ফ্রীড্রিশ্‌ ফন্‌ শ্লেগেল্‌কেই জার্মানিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রবর্তক বলতে পারি। হুমবোল্ট্‌ মালয়-পলিনেসীয় (Malay-Polynesian) ভাষাগুলির তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন বলে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বেও তাঁর অবদান স্মরণীয় ; কিন্তু তাঁর আসল অবদান সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ভাষার তুলনামূলক অধ্যয়ন নয়, বর্ণনামূলক দৃষ্টিতে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে গঠনগত দিক থেকে তুলনা করে ভাষাসমূহের বর্গীকরণ করেছেন তিনি। আর ভাষার মনোগত দিক উদ্‌ঘাটনে তিনি অগ্রণী বলে তাঁকে মনস্তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানের (Psycho-linguistics) পথিকৃৎ বলা হয়। এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানের ধারায় আলোচনা করা হবে।

জার্মানিতে ফ্রীড্রিশ্‌ ফন্‌ শ্লেগেল্‌ যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রবর্তন করেন, পর্যাপ্ত দৃষ্টান্ত সহ তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনার মাধ্যমে তাকে বিধিবদ্ধ আলোচনার রূপ দান করেন তিন জন ভাষাতত্ত্ববিদ্—ড্যানীশ্‌ মনীষী র‍্যাস্‌মুস্‌ ক্রিস্টীয়ান্‌ রাস্ক্‌ (Rasmus Kristian Rask, ১৭৮৭-১৮৩২ খ্রীঃ) এবং জার্মান মনীষী ফ্রান্‌ৎস্‌ বপ্‌ (Franz Bopp, ১৭৯১-১৮৬৭ খ্রীঃ) ও যাকপ্‌ গ্রীম্‌ (Jacob Grimm, ১৭৮৫-১৮৬৩ খ্রীঃ) এই তিনজন মনীষীর মধ্যে বয়সের বিচারে বপ্‌ সর্বকনিষ্ঠ হলেও তুলনামূলক আলোচনায় তিনিই অগ্রণী ছিলেন। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি গ্রীক, লাতিন, পারসিক ও জার্মানিক ভাষার সঙ্গে তুলনা করে সংস্কৃতের ক্রিয়ারূপ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন 'উয়েবর্‌ দাস্‌ কোন্‌য়ুগাৎসিওন্স্‌-জিস্‌টেম্‌দ্যের্‌ জান্‌স্ক্রিট্‌-শ্‌প্রাখে ইন্‌ ফ্যেরগ্লাইশুং মিট্‌ য়েনেম্‌ দের গ্রীশিশেন্‌, লাটাইনিশেন্‌, প্যেরজিশেন্‌ উন্ট্‌ গ্যের্‌মানিশেন্‌ শ্‌প্রাথে ('Über das Conjugations-system der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der Griechischen, Lateinischen, Persischen und Germanischen Sprache' অর্থাৎ On the Conjunction-System of the Sanskrit language in comparison with that of the Greek,

৪৩। Taraporewala, I. J. S. ; *Elements of the Science of Language*, Calcutta University, 1962, p. 450.

Latin, Persian and Germanic Languages)। এটিই হল তুলনামূলক ব্যাকরণের প্রথম বিধিবদ্ধ রচনা। কিন্তু এইটি ছিল ব্যাকরণের শুধু একদিকের আলোচনা। পরে ব্যাকরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে বপ্ লেখেন ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European) বংশের ভাষা সংস্কৃত, জেন্দ্, গ্রীক, লাতিন, লিথুয়ানীয়, গথিক ও জার্মান ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ 'ফ্যের্গ্লাইশেণ্ডে গ্রামটিক্ দেস্ জান্স্ক্রিট্, জেন্দ্, গ্রীশিশেন্, লাটাইনিশেন্, লীটাউইশেন্, গোটিশেন্ উন্ট্ ডয়ট্শেন্' ('Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Gotischen Und Deutschen,' অর্থাৎ Comparative Grammar of Sanskrit, Zend, Greek, Latin, Lithuanian, Gothic and German)। তাঁর এই তুলনামূলক ব্যাকরণের পরিপূরক রচনা হিসাবে ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে বপ্ সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষার স্বরাঘাত-বিধি সম্বন্ধে আরো একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বপ্-এর পরে ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European) ভাষাগুলির তুলনামূলক ব্যাকরণ অনেকগুলি রচিত হয়েছিল ; সেগুলির ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করলে বপ্-এর ব্যাকরণের অনেক ঘাটতি চোখে পড়বে। কিন্তু প্রথম বিধিবদ্ধ তুলনামূলক ব্যাকরণ-রচয়িতা হিসাবে বপ্ অবিস্মরণীয়।

রাস্ক্ ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে প্রাচীন নর্স ও প্রাচীন ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ—'ফেয়্লেৎনিং তিল্ দেৎ ইস্লান্দ্স্কে এলের্ গাম্লে নর্দিস্কে স্প্রোক্' (Vejledning til det islandske eller gamle nordiske sprog) প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর আসল সংযোজন হল তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ : প্রাচীন নর্স অথবা আইস্ল্যাণ্ডিক্ ভাষার উৎস সন্ধান বিষয়ক গবেষণা—'উন্দ্যের স্যোগেল্সে অম্ দেৎ গাম্লে নর্দিস্কে এলের্ ইস্লান্দ্স্কে স্প্রোক্ ওপ্রিন্দেল্সে' (Undersøgelse om det gamle nordiske eller islandske sprogs oprindelse')। গ্রন্থটি ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি প্রথম দেখিয়ে দেন যে টিউটনিক্ (জার্মানিক) শাখার ভাষার ধ্বনি এবং ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European) বংশের অন্যান্য শাখার ভাষার ধ্বনির মধ্যে একটা নিয়মিত (regular) বিধিবদ্ধ (systematic) পার্থক্য রয়েছে। যেমন, ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের অন্যান্য শাখার ভাষায় যেখানে 'প্' (p) হয়, টিউটনিক্ শাখার ভাষায় সেখানে উষ্ম 'ফ্' (f) হয়। যেমন, আমরা এখন দেখতে পাই বাংলার 'পাঁচ' শব্দের আদিতে 'প্', ইংরেজিতে 'five' শব্দের আদিতে উষ্ম 'ফ্' (f)। তেমনি আরো দেখা যাবে, অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সংস্কৃতে পিতৃ, গ্রীকে পতের্ (πατήρ), লাতিনে (pater) শব্দগুলিতে আদিতে প্ (p) আছে, কিন্তু টিউটনিক্ শাখার ভাষা গথিকে fadar

শব্দের আদিতে উষ্ম ফ্ (f) আছে। অর্থাৎ বর্গের প্রথম বর্ণস্থানে দ্বিতীয় বর্ণ নিয়মিতভাবে দেখা যাচ্ছে। এই যোগাযোগটি প্রথম উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন ভাষাতত্ত্ববিদ্ রাস্ক্। এ ছাড়া রাস্ক্ আবেস্তার পুঁথি সংগ্রহ করে তার ভাষাকে ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের সামনে তুলে ধরেন, এতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার কিছু মূল উপাদান পাওয়া গিয়েছিল।

রাস্ক্ জার্মানিক শাখার ভাষার ধ্বনির সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European) বংশের অন্যান্য শাখার ভাষার ধ্বনির যে নিয়মিত পার্থক্যের কথা প্রথম প্রকাশ করেন, যাকপ্ গ্রীম্ (Jacob Grimm) তাকে আরো দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করে সূত্রবদ্ধ করেন। তাই এর মূল আবিষ্কর্তা রাস্ক্ হলেও এটি গ্রীমের নামেই পরিচিত। গ্রীম্ এই ধ্বনি-পরিবর্তনের নাম দিয়েছিলেন জার্মানিক ধ্বনি-পরিবর্তন (Germanic Sound-shift)। পরবর্তীকালে এই পরিবর্তনের নাম দেওয়া হয় গ্রীমের সূত্র (Grimm's Law)। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে গ্রীমের জার্মান ব্যাকরণের (ডয়ট্‌শে গ্রামাটিক Deutsche Grammatik) প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বইটির নাম জার্মান ব্যাকরণ হলেও এটি আসলে শুধু জার্মান ভাষার ব্যাকরণ নয়, এটি হল জার্মানিক অর্থাৎ টিউটকিক্ শাখার ভাষা গথিক, স্ক্যাণ্ডিনেভীয়, ইংরেজি, ফ্রীজীয়, ওলন্দাজ (Dutch) ও জার্মান ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ। ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে এই গ্রন্থের যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাতেই গ্রীম্ তাঁর ধ্বনি-পরিবর্তনের (Sound-shift) নিয়ম ব্যাখ্যা করেন। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা (Indo-European Parent Speech) থেকে জার্মানিক অর্থাৎ টিউটনিক শাখাটি পৃথক হয়ে আসার সময় (আনুমানিক ৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে) এই শাখায় এমন কিছু ধ্বনি-পরিবর্তন ঘটে যা ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European) বংশের অন্যান্য শাখা থেকে জার্মানিক শাখাকে পৃথক্ করে দেয়। এই ধ্বনি-পরিবর্তন তিনটি ধারায় ঘটে—

(অ) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পর্শ-ধ্বনি (unaspirated voiceless plosive) জার্মানিক শাখার ভাষায় মহাপ্রাণ অঘোষ উষ্ম-ধ্বনিতে (aspirated voiceless fricative) পরিবর্তিত হয়ে গেছে অর্থাৎ মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার p t k k^w, জার্মানিক শাখার ভাষায় যথাক্রমে f θ x x^w হয়ে গেছে।

ফলে আমরা দেখতে পাই, অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সংস্কৃতে পিতৃ, গ্রীকে pater, লাতিনে pater হয়েছে, কিন্তু জার্মানিক ভাষা গথিকে হয়েছে fadar। সংস্কৃতে গ্রীকে লাতিনে রয়েছে যেখানে p (প্), গথিকে সেখানে ফ্ (f)। মোটামুটিভাবে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ হয়েছে, (তবে দ্বিতীয় বর্ণটি উষ্ম বর্ণ)।

(আ) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ স্পর্শ ধ্বনি (unaspirated voiced plosive) জার্মানিক শাখায় অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পর্শধ্বনিতে পরিণত হয়ে গেছে। অর্থাৎ মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার b d g g^w জার্মানিক শাখার ভাষায় হয়েছে যথাক্রমে p t k k^w। দৃষ্টান্ত—সংস্কৃতে দশ্‌, গ্রীকে déka, লাতিনে decem, কিন্তু গথিকে taihun। গ্রীক, লাতিন ও সংস্কৃতে যেখানে d (দ্‌) গথিকে সেখানে t। অর্থাৎ মোটামুটিভাবে বর্গের তৃতীয় বর্ণ স্থানে বর্গের প্রথম বর্ণ হয়েছে।

(ই) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ঘোষবৎ মহাপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনি (voiced aspirated plosive) জার্মানিক শাখায় ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার bh dh gh g^wh জার্মানিক শাখায় হয়েছে b d g g^w। ফলে সংস্কৃতে যেখানে ভ্রাতা (bhrātā), প্রাচীন ইংরাজিতে সেখানে brođor পাই। সংস্কৃতে যেখানে bh (ভ্‌), প্রাচীন ইংরেজিতে সেখানে b। অর্থাৎ মোটামুটিভাবে বর্গের চতুর্থ বর্ণ স্থানে হয়েছে বর্গের তৃতীয় বর্ণ।

গ্রীম্‌ এই ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়ম সূত্রবদ্ধ করেও বলেছিলেন--এই নিয়মটি শুধু সাধারণভাবেই গ্রহণীয়, এটি যে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেই, এমন নয়। অর্থাৎ এই নিয়মের অনেক ব্যতিক্রম তাঁর নিজের চোখেই ধরা পড়েছিল। এই ব্যতিক্রমগুলি পরে যাঁরা নতুনতর সূত্র রচনা করে ব্যাখ্যা করেন তাঁদের নাম অনুসারে নতুন সূত্রগুলির নামকরণ হয়--গ্রাস্‌মান্‌-এর সূত্র (Grassmann's Law) এবং ভের্নার-এর সূত্র (Verner's Law)।

যেমন, গ্রীমের সূত্র অনুসারে মূল আর্যভাষার (অর্থাৎ মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার) মহাপ্রাণ ঘোষবৎ স্পর্শ ধ্বনি (ভ ধ ঘ ঘ্ব bh dh gh g^wh) ইন্দো-ইউরোপীয় অন্যান্য শাখায় (সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন ইত্যাদি) অপরিবর্তিত থাকার কথা, শুধু জার্মানিক শাখায় (গথিক, প্রাচীন ইংরেজি ইত্যাদি) পরিবর্তিত হয়ে অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ স্পর্শ ধ্বনি (b d b^w) হয়ে যাবার কথা। গথিকে যেখানে 'ব্‌' (b) পাই, সংস্কৃতে সেখানে 'ভ্‌' থাকার কথা। কিন্তু এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যেগুলিতে গথিকে যেখানে 'ব্‌' আছে, সংস্কৃতেও সেখানে 'ব্‌'-ই আছে। যেমন, গথিক biudan, সংস্কৃত বোধতি। গ্রীমের সূত্র অনুসারে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় এই শব্দে 'ব্‌' স্থানে 'ভ্‌' ছিল, সংস্কৃতেও তা হলে 'ভ্‌'-ই থাকার কথা। অর্থাৎ 'বোধতি' স্থানে 'ভোধতি' থাকার কথা। কিন্তু সংস্কৃতে আমরা 'ভোধতি পাই না, 'বোধতি'ই পাই। এখানে তাহলে গ্রীমের সূত্রের ব্যতিক্রম ঘটেছে! এই ব্যতিক্রমগুলি নতুন সূত্র রচনা করে যিনি ব্যাখ্যা করলেন তিনি হলেন এইচ্‌ গ্রাস্‌মান্‌ (H. Grassmann)। গ্রাস্‌মানের সূত্রটি হল—মূল--

ইন্দো ইউরোপীয় ভাষায় যেখানে পর-পর দু'টি মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি (অর্থাৎ মোটামুটিভাবে বর্গের চতুর্থ বর্ণ bh dh gh gʷh) ছিল সেখানে সংস্কৃতে ও গ্রীকে দু'টি ধ্বনির মধ্যে একটি পরিবর্তিত হয়ে অল্পপ্রাণ হয়ে যাবে। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার 'ভোধতি' শব্দে 'ভ' ও 'ধ' পর-পর দু'টি মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি ছিল। তাই 'ভ' পরিবর্তিত হয়ে সংস্কৃতে 'ব্' হয়ে গেছে। 'ভোধতি' স্থানে সংস্কৃতে হয়েছে 'বোধতি'।

গ্রীমের সূত্রের আরো কিছু ব্যতিক্রম ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে ব্যাখ্যা করেন কার্ল্ ভের্নার্ বা কার্ল্ ভের্নার (Adolf Karl Verner) (১৮৪৬-৯৬)। তাঁর সূত্রটি তাঁর নামেই পরিচিত—ভের্নার্-এর সূত্র (Verner's Law)। গ্রীমের সূত্র অনুসারে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পর্শধ্বনি জার্মানিক শাখায় মহাপ্রাণ অঘোষ উষ্মধ্বনিতে পরিবর্তিত হবার কথা, আর অন্যান্য শাখায় (সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন ইত্যাদি) এগুলি অপরিবর্তিত থাকার কথা। সেই অনুসারে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় *septm থেকে সংস্কৃতে হয়েছে সপ্ত (saptá), গ্রীকে হয়েছে heptá, লাতিনে septém, কিন্তু জার্মানিক ভাষা গথিকে হবার কথা sifum (গ্রীমের সূত্র অনুসারে 'প' (p) স্থানে 'f' হওয়া উচিত)। অথচ গথিকে পাওয়া যায় sibum। এখানে গ্রীমের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে মনে হয়। কার্ল্ ভের্নার্ এই ব্যতিক্রমটি সূত্রবদ্ধ করলেন নতুন সূত্র দ্বারা। তাঁর সূত্রটি হল—গ্রীমের সূত্র অনুসারে p t k k^w পরিবর্তিত হয়ে f θ x x^w হবে শুধু যদি এসব ধ্বনির আগে স্বরাঘাত (accent) থাকে। কিন্তু যদি এসব ধ্বনির পরবর্তী অক্ষরে স্বরাঘাত থাকে তবে এসব ধ্বনির অন্যবিধ পরিবর্তন হবে, p t k k^w এবং s তখন হয়ে যাবে যথাক্রমে b d g g^w এবং z। যেমন পূর্ববর্তী উদাহরণে sibum হয়েছে। কারণ মূল শব্দে p-এর পরবর্তী m-এ স্বরাঘাত ছিল। এই কারণে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ * k̂mtóm, যখন সংস্কৃতে শতম্, গ্রীকে hekatón, লাতিনে centum হয়েছে তখন 't' অপরিবর্তিত আছে, কিন্তু যখন গথিকে hund হয়েছে তখন দেখতে পাই 't' স্থানে 'd' হয়ে গেছে।

পূর্বে গ্রীম্-কথিত যে ধ্বনি-পরিবর্তনের (sound-shift) কথা বলা হল তা জার্মানিক শাখাকে ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের অন্যান্য শাখা থেকে পৃথক্ করেছিল। এই ধ্বনি-পরিবর্তনকে বলে প্রথম ধ্বনি-পরিবর্তন (first sound-shift)। এটি ৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। এর পরে খ্রীস্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে জার্মানিক শাখায় আর একবার ধ্বনি-পরিবর্তন সংঘটিত হয়। সেই ধ্বনি-পরিবর্তন জার্মানিক শাখারই অন্তর্গত 'হাই জার্মান' (High German) উপশাখাকে অন্যান্য পশ্চিম জার্মানিক (West Germanic) উপশাখা থেকে পৃথক্ করে দেয়। একে দ্বিতীয় ধ্বনি-পরিবর্তন (second

sound-shift or High German sound-shift) বলে। এই পরিবর্তন নিম্নোক্ত দুই ধারায় সংঘটিত হয়—

(ক) পশ্চিম জার্মানিক ভাষার স্বরপরবর্তী পদমধ্যস্থ বা পদান্তিক p t k হাই জার্মানিক উপশাখায় দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয়ে উষ্মধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন প্রাচীন ইংরেজি open (আধুনিক ইংরেজি open), কিন্তু প্রাচীন হাই জার্মান offan (আধুনিক জার্মান offan)। জার্মান হল হাই জার্মানিক উপশাখা, আর ইংরেজি পড়ে হাই জার্মানিক ভিন্ন অন্য পশ্চিম জার্মানিক উপশাখায়।

(খ) শব্দের আদিতে, শব্দের মধ্যস্থানে (*l, m n, r*-এর পরে) এবং শব্দের অন্তে (*l, m, n, r*-এর পরে) এবং দ্বিত্বপ্রাপ্ত অবস্থায় পশ্চিম জার্মানিক শাখার *p t k* হাই জার্মানিক উপশাখায় হয়েছে ঘৃষ্টধ্বনি যথাক্রমে *pf* tz kh (= kχ) (বানানে ch ও ck)। যেমন প্রাচীন ইংরেজি pund (আধুনিক ইংরেজি pound), হাই জার্মান উপশাখা (পূর্ব ফ্রাঙ্কোনীয়) pfunt (আধুনিক জার্মান pfund)।

গ্রীম্ যে ধ্বনি-পরিবর্তনের সূত্র রচনা করেন তা ভাষাবিশেষের ধ্বনি-পরিবর্তন ব্যাখ্যা করে বলে ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই সূত্র এবং তার পরবর্তী সংশোধিত রূপগুলি নিয়ে বিচার করলে এগুলির তাৎপর্য ভাষাবিশেষের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। এগুলিতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, ভাষার পরিবর্তন কোনো এলোমেলো (haphazard) ব্যাপার নয়, তার মধ্যে একটি গভীর শৃঙ্খলা বিদ্যমান। তাকে বৈজ্ঞানিক নিয়মের মতো ভাষাবিজ্ঞানের নিয়মের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় ও সূত্রবদ্ধ করা যায়। গ্রীম্ তাঁর সূত্রের দ্বারা ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এই নিয়মবদ্ধ বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রতিষ্ঠা করলেন বলে সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসেও তাঁর সূত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভিল্‌হেল্ম গ্রীম্ (Wilhelm Grimm) ও যাকপ্ গ্রীম্ (Jacob Grimm) দুই ভাই মিলিত প্রচেষ্টায় জার্মানির লোককথা (folk-tales) সংগ্রহ ও প্রকাশ করে জার্মান সাহিত্যেও অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। তেমনি স্বীয় গবেষণায় যাকপ্ গ্রীম্ তাঁর ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্রটি আবিষ্কার করে ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।

আউগুস্ট্ ফ্রীড্রিশ্ পট্ (August Friedrich Pott, ১৮০২-১৮৮৭) ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর ব্যুৎপত্তিগত অনুসন্ধান বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ 'এটিমোলগিশে ফোর্‌শুংগেন্' (Etymologische Forschungen অর্থাৎ Etymological Investigations) প্রকাশ করা শুরু করেন। ১৮৩৬ সালের মধ্যে প্রথম সংস্করণের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। ব্যুৎপত্তি বিষয়ে অনুসন্ধান অতি প্রাচীনকালে ইহুদিরাই পাশ্চাত্যে সূচনা করেছিলেন কতকগুলি নামের ব্যুৎপত্তি-

নানা দিয়ে। কিন্তু সে-সব ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় অনেকটাই ছিল কল্পনা-নির্ভর এবং উপকথা নির্ভর (legendary)। বস্তুত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ের সূত্রপাত করেন পট্। শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে তার প্রাচীনতম রূপটি আবিষ্কার করা এবং সেই প্রাচীনতম রূপের সংগে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমসাময়িক ভাষার রূপগুলি নির্ণয় করার যে পদ্ধতি পট্ আবিষ্কার করেন তাতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব আরো সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ একই উৎস থেকে জাত বিভিন্ন সহোদর-স্থানীয় শব্দ (Cognate words)-এর উপরেই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ের সাহায্যেই সহোদর-স্থানীয় শব্দগুলিকে চিনতে সুবিধা হয়। যেমন,—সিন্ধী 'মাউ', পঞ্জাবী 'মাঁউ', অসমিয়া 'মা' 'মাউ', বাংলা 'মা", ওড়িয়া 'মাআ', 'মা', মৈথিলী-ভোজপুরী-অবধী 'মাঈ', হিন্দী 'মা', মারাঠী 'মা', 'মাঈ' প্রভৃতি শব্দগুলি যে সহোদর স্থানীয় শব্দ তা এদের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় করলেই জানা যায়। এই ব্যুৎপত্তি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণার সূত্রপাত করে আউগুস্ট্ পট্ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের নতুন দিগন্ত উদ্‌ঘাটিত করেন। এছাড়া তিনি ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাসমূহের সমতুল্য ধ্বনির যে তালিকা প্রণয়ন করেন তাতেও তুলনামূলক ধ্বনিতত্ত্ব (Comparative Phonology) অধ্যয়নের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব আরো অগ্রগতি লাভ করে দু'জন মনীষীর হাতে—আউগুস্ট্ শ্লাইশার্ ও কার্ল্ ব্রুগমান্। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে আউগুস্ট্ শ্লাইশার্ (August Schleicher, ১৮২৩-১৮৬৮ খ্রীঃ) তাঁর 'কম্‌পেণ্ডিউম্ দ্যের্ ফ্যের্‌গ্লাইশেন্‌ডেন্ গ্রামাটিক 'দ্যের্ ইণ্ডো-গের্‌মানিশেন্ স্প্রাখেন্' (Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen অর্থাৎ Compendium of the Comparative Grammar of the Indo-Germanic Languages) প্রকাশ করেন। নতুনতর তথ্য দিয়ে ব্যাকরণের বিভিন্ন দিক অবলম্বন করে তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের প্রায় পূর্ণাঙ্গ তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করেন। একটি গাছের গুঁড়ি থেকে যেমন বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা বেরিয়ে যায় তেমনি মূল আর্যভাষা বা আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে ক্রমে-ক্রমে নানা ভাষার শাখাপ্রশাখা বিকশিত হয়েছে। বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করে ভাষা-বিকাশের এই যে তত্ত্বটি শ্লাইশার্ প্রবর্তন করেন, একে 'স্টাম্‌বাউম্ থিওরি' (Stammbaum theorie) বলে। পরবর্তীকালে শ্লাইশারের এই তত্ত্বটি থেকেই ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' গ্রন্থে ভাষাবৃক্ষ-চিত্রটি উপস্থাপিত করেন, অথচ তিনি শ্লাইশারের ঋণ স্বীকার করেন নি। শ্লাইশার্ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-সমূহের মধ্যে যে তুলনা করেছেন তা পূর্ণাঙ্গ হলেও

তাতে একটি ঘাটতি আছে। তিনি শুধু ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের দিক থেকেই তুলনা করেছেন, বাক্যতত্ত্বের দিকটি আলোচনা করেন নি।

উনিশ শতকের শেষপাদে জার্মানিতে নব্যবৈয়াকরণ-গোষ্ঠী (Junggrammatiker) ভাষাতত্ত্বে কঠোর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ করেন। এই গোষ্ঠীর অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন কার্ল্ ব্রুগ্‌মান্। শ্লাইশারের পরে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় এই কার্ল্ ব্রুগ্‌মানের (Karl Brugmann, ১৮৪৯-১৯১৯ খ্রীঃ) হাতে। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ—'গ্রুণ্ড্রিশ্ দ্যের্ ফ্যের্গ্লাইশেণ্ডেন্ গ্রামাটিক্ দ্যের্ ইণ্ডোগ্যের্মানিশেন্ স্প্রাখেন্' ('Grundriss der vergleichenden Grammatik der indo-germanischen Sprachen' অর্থাৎ Outline of the Comparative Grammar of the Indo-Germanic Languages)। বের্টোল্ট্ ডেল্‌ব্র্যুক্ (Berthold Delbrück)-এর সঙ্গে সহযোগিতায় ব্রুগমান্ ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে এই গ্রন্থের প্রকাশ সূচিত করেন। ১৮৯৭—১৯১৬ সালের মধ্যে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সংস্কৃত, প্রাচীন ইরানীয়, প্রাচীন আর্মেনীয়, প্রাচীন গ্রীক, লাতিন, উম্ব্রীয়-সাম্নীতীয়, প্রাচীন আইরিশ, গথিক, প্রাচীন জার্মান, লিথুয়ানীয় এবং প্রাচীন বুল্‌গারীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচনা করা হয়েছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণ হিসাবে আজ পর্যন্ত এইটিই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়। শ্লাইশারের গ্রন্থের যে ঘাটতি ছিল—তাতে বাক্যতত্ত্বের (syntax) আলোচনা ছিল না। ব্রুগ্‌মান ও ডেল্‌ব্র্যুকের গ্রন্থে এই ঘাটতি পূরণ করে গ্রন্থটিকে পূর্ণাঙ্গ তুলনামূলক ব্যাকরণের রূপদান করা হয়। এর ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব অংশ রচনা করেছিলেন ব্রুগ্‌মান্ নিজে। বাক্যতত্ত্ব অংশটি ডেল্‌ব্র্যুকের রচনা। সম্প্রতি এই গ্রন্থের ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব অংশটি নিয়ে 'Elements of the Comparative Grammar of the Indo-Germanic Languages' নামে এর একটি ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।[৪৪]

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়নের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সমূহের তুলনা করে তার সাহায্যে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী আর্যজাতির ইতিহাস নির্ণয় করা এবং তাদের আদি বাসস্থান ও সংস্কৃতির রূপ নির্ণয় করা। অধ্যাপক অটো শ্র্যাডার্ (Otto Schrader,

---

৪৪। Chowkhamba Sanskrit Studies, Vol. LXXXIV, Varanasi, 1972.

১৮৫৫-১৯১৯ খ্রীঃ) এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছিলেন। তাঁর দু'টি রচনা 'শ্প্রাখ্ফ্যেরগ্লাইশুং উন্ট্ উর্গেশিস্টে' ('Sprachvergleichung und Urgeschichte' অর্থাৎ Comparative Linguistics and Pre-History) (১৯০৬) এবং 'রেয়াল্লেক্সিকন্ দ্যের্ ইন্ডো-গ্যের্মানিশেন্ আল্টের্টুম্স্কুণ্ডে' ('Reallexikon der indo-germanischen Aitertumskunde' অর্থাৎ Encyclopaedia of the Indo-Germanic Ancient Documents) (১৯১৭)। রাশিয়ার দক্ষিণে উরাল পর্বতের পাদদেশে ভল্গা উপত্যকায় আর্যজাতির আদি বাসস্থান ছিল—এই মত শ্র্যাডারই প্রথম প্রবর্তন করেন। এইমত আধুনিক কালে অধিকাংশ পণ্ডিত গ্রহণ করেছেন।

নব্য বৈয়াকরণ-গোষ্ঠীর শিক্ষায় শিক্ষিত ফরাসি ভাষাতত্ত্ববিদ্ আঁতোয়ান্ মেইয়ে (Antoine Meillet) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব এবং সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান রেখেছেন। তাঁর দু'টি গ্রন্থ 'ল্যাঁগিস্তিক্ ইস্তোরিক এ ল্যাঁগিস্তিক্ জেনেরাল্' ('Linguistique historique et linguistique générale' অর্থাৎ Historical and General Linguistics) (১৯৪৮) এবং 'এ্যাঁত্রোদ্যুক্সিয়ঁনালেত্যুদ্ কঁপারাতিভ্ দে লাঁগ্ জ্যাঁদোএরোপেএন্' ('Introduction a I'étude comparative des langues indo-européennes,' অর্থাৎ Introduction to the comparative study of Indo-European Languages) (১৯২২) আজকাল তুলনামূলক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বে ব্রুগ্মানের গ্রন্থের পরেও গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। জে. ভেন্দ্রিশ্-এর সঙ্গে সহযোগিতায় তিনি প্রাচীন ভাষাসমূহের যে তুলনামূলক ব্যাকরণ—'গ্রাম্যার্ কঁপারে দে লাঁগ্ ক্লাসিক' ('Grammaire Comparée des langues classiques' অর্থাৎ Comparative Grammar of the Classic Languages)—রচনা করেন, তা তুলনামূলক ব্যাকরণের ক্ষেত্রে নব্যবৈয়াকরণদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সার্থক প্রয়োগের নিদর্শন। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে মেইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান এই যে তিনি ভাষা-সমূহের শুধু তুলনাই করেন নি, তুলনামূলক ব্যাকরণের মূল নীতিপদ্ধতিও সূত্রবদ্ধ করেছেন। ব্রুগ্মান্ ও ডেল্ব্র্যুক্ ভাষা-সমূহের তুলনাকে পূর্ণাঙ্গ করেছিলেন, কিন্তু তার নীতিপদ্ধতি সূত্রবদ্ধ করেন নি। এই ঘাটতি পূরণ করেন মেইয়ে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এইটাই মেইয়ের আসল অবদান। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পদ্ধতি সম্পর্কে মেইয়ের গ্রন্থ 'লা মেতোদ্ কঁপারাটিভ্ আঁ ল্যাঁগিস্তিক ইস্তেরিক্' ('La méthode comparative en linguistiqe historique' অর্থাৎ The

Comparative Method of Historical Linguistics) (১৯২৫) আজ পর্যন্ত প্রামাণিক রচনা বলে বিবেচিত হয়। এ কালের ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ও এই গ্রন্থটিকে 'best introduction to the comparative method'[৪৫] বলে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। বস্তুত মেইয়ে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি ভাষার সাধারণ সূত্র যেমন লিপিবদ্ধ করেছেন, তেমনি ভাষাবিশেষের বিস্তৃত আলোচনাও করেছেন। সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বে (Philology) তাঁর অবদান কম নয়। পারসিক ভাষা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা 'গ্রাম্যার্ দ্যু ভিয়্য পেৢর্স্' ('Grammaire du vieux Perse' অর্থাৎ A Grammar of Old Persian) এবং আবেস্তার 'গাথা' সম্পর্কে তাঁর আলোচনা 'ত্রোয়া কঁফেরাঁস্ স্যুর্ লে গাথা' (Trois Conferences sur les Gathas) সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বে দু'টি প্রামাণিক গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়। মেইয়ের দৃষ্টিভঙ্গির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সমন্বয়ী প্রবণতা। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান এবং ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রথাগত বিরোধ তিনি মানেন নি। তাঁর রচনাতে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় তো আছেই, তাছাড়া তিনি ভাষার সামাজিক দিকটির উপরেও গুরুত্ব দিয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে এশিয়া মাইনরের আংকারা থেকে ৯০ মাইল দূরে বোঘাজ ক্যোই অঞ্চলে খনন কার্য করে হিত্তী ভাষায় লিখিত কতকগুলি প্রত্নলিপি পাওয়া যায় এবং সেই প্রত্নলিপি থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের একটি প্রাচীন ভাষা হিত্তী (Hittite) সম্পর্কে নানা তর্কবিতর্ক ও গবেষণা শুরু হয়। এই হিত্তী ভাষা সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন ই. এইচ্. স্টার্টেভান্ট্ (E. H. Sturtevant)। ১৯৩৩ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'A Comparative Grammar of the Hittite Language' প্রকাশিত হয়। উপরি-উক্ত প্রত্নলিপিগুলি আবিষ্কারের আগে ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের ভাষাগুলির মধ্যে হিত্তী ভাষা যুক্ত ছিল না। এরপর থেকে এই বংশের ভাষার মধ্যে হিত্তী ভাষাও গণ্য হওয়ায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। স্টার্টেভান্ট-এর আরো দু'টি গ্রন্থ হল—'The Indo-Hittite Laryngeals' এবং 'A Hittite Glossary'। স্টার্টেভান্ট্ আধুনিক আমেরিকার একজন প্রতিষ্ঠিত ভাষাবিজ্ঞানী।

৪৫। Lehmann, Winfred P. : *Historical Linguistics : An Introduction* Oxford & IBH Publishing Co. 1966 p. 97.

সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর রচনা হল 'An Introduction to Linguistic Science'।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হবার আগেই ওটো য়েস্পার্‌সেন্ ভাষাবিজ্ঞান চর্চা শুরু করেন। তা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিকতা ছিল। ১৯০৫ সালে তাঁর যে 'Growth and Structure of the English Language' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তাতে তিনি ইংরেজি ভাষার যেমন বিবর্তন আলোচনা করেছেন তেমনি তার গঠনও বিশ্লেষণ করেছেন। ১৯০৭ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Progress in Language with special reference to English' নামক গ্রন্থে ভাষা-বিবর্তনের তাত্ত্বিক দিক আলোচিত হয়েছে। য়েস্পার্‌সেনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক রচনা হল 'Language, its Nature, Development and Origin' (১৯২২)। এই গ্রন্থে তিনি সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানের অনেকগুলি মূল প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। শিশুর ভাষাবিকাশের যে পর্যায়ক্রম তিনি আলোচনা করেছেন তা আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞানেরও অন্যতম অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয়। তাঁর 'Philosophy of Grammar' (১৯২৪) গ্রন্থে তিনি ভাষা-বিবর্তনের দার্শনিক দিক আলোচনা করেছেন। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের নীতি অনুসরণ করে তিনি ইংরেজি ভাষার একটি ব্যাকরণ রচনা করেন--'A Modern English Grammar on Historical Principles'। সামগ্রিক বিচারে য়েস্‌পার্‌সেন্ যদিও ভাষাবিজ্ঞানে যথেষ্ট আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছেন এবং সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব আলোচনা করেছেন তবু তিনি ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের পরিমণ্ডলের বাইরে চলে আসতে পারেন নি। তাঁর আসল অবদান ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানেই। অধ্যাপক রবিন্‌স্ তাঁর মূল্যায়ন করতে গিয়ে ঠিকই বলেছেন—'

> "O. Jespersen, who did as much as many to foster synchronic, descriptive linguistics, could write in the still prevailing nineteenth-century climate of opinion that linguistics was mainly a historical study."[৪৬]

পাশ্চাত্য দেশের অনেক মনীষী সংস্কৃত, পালি, আবেস্তার ভাষা ও পারসিক ভাষা সম্পর্কে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন এবং এইসব ভাষার প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্যগ্রন্থ পাশ্চাত্য দেশে প্রকাশ করেছিলেন। এর ফলে পাশ্চাত্য দেশে প্রাচ্যবিদ্যা প্রচারিত হয়েছিল এবং সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব চর্চার উপাদান এবং

৪৬। Robins, Prof. R. H. : *A Short History of Linguistics*, London : Longmans, 1969, p. 164.

তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনার উপাদান পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা লাভ করেছিলেন। এই সব প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতেরা সবাই ভাষাতত্ত্ব চর্চা করেন নি, কিন্তু ভাষাতত্ত্ব চর্চার জন্যে উপকরণ সরবরাহ করেছিলেন বলে ভাষাতত্ত্ব চর্চায় এঁদের অবদান পরোক্ষ। এই সব মনীষীর মধ্যে প্রধান কয়েকজনের কথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

এক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল জার্মান মনীষী মাক্স্ ম্যুলারের (Friedrich Max Müller, ১৮২৩-১৯০০) অবদান। সায়ণ-ভাষ্যসহ ঋগ্বেদ-সংহিতা ও ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ (Rigveda Samhita, the Sacred Hymns of the Brahmanas, together with the commentary of Sayanacharya) সম্পাদনা করে তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন (১৮৪৯-১৮৭৪)। তাঁর পরে জার্মান ভাষায় ঋগ্বেদের অনুবাদ করেন কার্ল্ ফ্রীড্রিশ্ গেল্ড্নার্ (Karl Friedrich Geldner, ১৮৫২-১৯২৯ খ্রীঃ)। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে ঋগ্বেদের জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করে ভবিষ্যতের ভাষা-জিজ্ঞাসুদের জন্যে পথ প্রশস্ত করে যান তিনি।

যাকপ্ ভাকের্নাগেল্ (Jacob Wackernagel, ১৮৫৩-১৯৩৮ খ্রীঃ)—বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার এই অধ্যাপক প্রাচ্যবিদ্যায় অনুরাগী ছিলেন। তাঁর একটিমাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'আল্টিণ্ডিসে গ্রামাটিক্' ('Altindische Grammatik' অর্থাৎ Ancient Indian Grammar) সংস্কৃত ভাষার একটি সুবৃহৎ ব্যাকরণ-গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে রূপতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের আরো দু'টি খণ্ড প্রকাশিত হবার কথা। ভাকের্নাগেল্ সংস্কৃত ভাষার শুধু ব্যাকরণ সম্পর্কেই আলোচনা করেন নি, এই গ্রন্থের অবতরণিকা-অংশে তিনি ভারতীয় ভাষার জন্ম-ইতিহাসও আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত বৈয়াকরণদের ব্যাকরণ গ্রন্থাদি তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। Journal of Comparative Linguistics-এ তিনি ইরানীয় ভাষা সম্পর্কে প্রবন্ধ (Indo-Iranica) প্রকাশ করেছিলেন।

এ ছাড়া কিছু-কিছু মনীষী প্রাচীন ভারতীয় লিপির পাঠোদ্ধার করেও ভাষাতত্ত্ব চর্চার উপকরণ সরবরাহ করেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় লিপি দু'প্রকার ছিল : খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী। এই লিপিতে অশোক বুদ্ধদেবের বাণীগুলি পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। সুতরাং এই লিপির পাঠোদ্ধারের উপরে নির্ভর করে সেই সব প্রত্নলিপির ভাষা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান। আবার ভারতীয় ভাষার ইতিহাস অধ্যয়নের জন্যেও এই লিপির সঠিক পাঠ ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তাছাড়া এই দু'প্রকার লিপির মধ্যে ব্রাহ্মী লিপি থেকেই পরবর্তীকালের অধিকাংশ ভারতীয় লিপির জন্ম। সুতরাং ভারতীয় লিপিসমূহের ইতিহাস রচনার

আলোও এই লিপির সঠিক পাঠোদ্ধারের গুরুত্ব আছে। খরোষ্ঠী লিপির পাঠোদ্ধারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন জেম্‌স্ প্রিন্‌সেপ্ (James Prinsep, ১৭৯৯-১৮৪০ খ্রীঃ)। ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধারেও তাঁর অবদান অপরিসীম। ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে তিনিই প্রথম ব্রাহ্মীলিপি থেকে ব্রাহ্মী বর্ণমালার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রদান করেন।

প্রিন্‌সেপের পরে ভারতীয় লিপি সম্পর্কে প্রশংসনীয় গবেষণা করেছিলেন গিওর্গ্ ব্যুলার্ (Johann Georg Buhler, ১৮৩৭-১৮৯৮ খ্রীঃ)। বোম্বাইতে অবস্থান করে সংস্কৃত পণ্ডিতের অধীনে ঐ ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন তিনি। ভারতীয় লিপি সম্পর্কে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক নিবন্ধ 'দি ইণ্ডিশেন্ ইন্সরিফ্‌টেন্ উন্ট্ দাস্ আল্টের্ দ্যের্ ইণ্ডিশেন্ কুন্স্ট্‌পোয়েজি' ('Die indischen Indchriftenund das Alter der indischen Kunstpoesie' অর্থাৎ Indian Inscriptions and the Age of Kāvya Literature) ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে ভিয়েনা একাডেমির কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল 'On the Origin of the Indian Brahmi Alphabet' (১৮৯৪ খ্রীঃ)। 'Encyclopedia of Indo-Aryan Research'-এ তিনি Indian Palaeography সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (১৮৯৬)। ব্রাহ্মীলিপি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মত হল এই যে, ব্রাহ্মীলিপিও সেমীয় লিপি থেকেই জাত। ব্যুলার কাশ্মীর, রাজপুতানা ও মধ্য-ভারতে প্রাপ্ত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির একটি বিস্তৃত তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন। 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষার একটি সহজ ব্যাকরণও তিনি রচনা করেছিলেন (১৮৮৩)।

পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে যেমন সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষা এবং প্রাচীন ভারতীয় লিপি সম্পর্কে গবেষণা করেছেন, তেমনি আবার কেউ-কেউ করেছেন ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের ইরানীয় শাখার প্রাচীন ভাষা ও লিপি সম্পর্কে। ইরানীয় শাখার দু'টি প্রাচীন নিদর্শন হল 'আবেস্তা' নামক ধর্মগ্রন্থ এবং হখামনীয়ীয় (Achaemeniæn) বংশের রাজা দারয়বহুশ্ (Dereios / Darius) এবং খ্শয়র্শা (Xerxes)-এর প্রত্নলিপি (প্রাচীন পারসিক ভাষায় উৎকীর্ণ)। এই আবেস্তার প্রাচীন পুঁথির কয়েকটি পাতা দেখে এ সম্পর্কে প্রথম আগ্রহী হয়ে উঠেন একজন ফরাসি যুবক—আঁকতিল্ দ্যু পেঁরো (Anquetil du Perron, ১৭৩১-১৮০৫ খ্রীঃ)। দুর্দমনীয় আগ্রহে তিনি আবেস্তা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার জন্যে অন্যভাবে ভারতবর্ষে আসার পথ না পেয়ে ফরাসি ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হয়ে আসেন।

এদেশে পার্সি পুরোহিতদের কাছে পাঠ গ্রহণ করে এবং পরে প্রায় দশ বছর গবেষণা করে তিনি 'ল্য জ্যাঁদাভেস্তা, উভ্রাজ্ দ্য জোরোয়াস্ত্র্ ত্রাদ্যুই তাঁ ফ্রাঁসে স্যুর্ ল'রিজিনাল্ জ্যাঁদ্ (Le Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre, traduit en Francais sur l'original Zend) ১৭৭১ সালে প্রকাশ করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে এইটিই আবেস্তার প্রথম প্রকাশ। এই সংস্করণে যেসব ত্রুটি ছিল বিভিন্ন পাঠ মিলিয়ে সেগুলি সংশোধন করে ইউগ্যান্ ব্যুর্ন্যুফ্ (Eugene Burnouf, ১৮০১-১৮৫২ খ্রীঃ) আবেস্তার প্রথম নির্ভুল সংস্করণ 'কোমাঁত্যের্ স্যুর্ ল্য য়াশ্ন্' ('Commentaire sur le Yacna' অর্থাৎ Commentarry on the Yacna) প্রকাশ করেন ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে। আবেস্তার এই প্রকাশ সম্পর্কে জনৈক ভাষাতত্ত্ববিদ্ বলেছেন—"This great work might·be called the starting point of all works on Avesta texts done in the West ever since"[৪৭] ব্যুর্ন্যুফ্ই পালি ভাষা ও সাহিত্যকেও তাঁর 'এসেই স্যুর্ ল্য পালি' ('Essai sur le Pali' অর্থাৎ Essay on Pali) গ্রন্থে প্রথম ইউরোপে তুলে ধরেন (১৮২৬)। এই মনীষী প্রাচীন লিপি-বিশেষজ্ঞও ছিলেন। তিনি বাণসুথ লিপি (Cuneiform Inscription) সম্পর্কেও গবেষণা করেছিলেন। তাঁর পথ ধরে পরে ফ্রীড্রিশ্ স্পীগেল্ (Friedrich Spiegel, ১৮২০-১৮৯৫ খ্রীঃ) এবং ভেস্টার্গার্ট্ (Westergaard) পৃথক্-পৃথক্-ভাবে আবেস্তার পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ ও অনুবাদ প্রকাশ করেন।

প্রাচীন পারসিক ভাষায় উৎকীর্ণ দারয়বহুশ্-খোদিত 'বেহিস্তুন প্রত্নলিপি'র পূর্ণাঙ্গ প্রতিলিপি সংগ্রহ করে তার প্রামাণিক অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন স্যর্ হেন্রী রাউলিন্সন্ (Sir Henry Rawlinson, ১৮১০-১৮৯৫ খ্রীঃ)। তাঁর আগে অবশ্য গিওর্গ্ ফ্রীড্রিশ গ্রোটেফেন্ট্ (Georg Friedrich Grotefend, ১৭৭৫-১৮৫৫ খ্রীঃ) প্রাচীন পারসিক লিপির পাঠোদ্ধারে খানিকটা সফলতা অর্জন করেছিলেন।

ইরানীয় ভাষা, সাহিত্য ও ধর্ম বিষয়ে এ. ভি. ডব্লু. জ্যাক্সন্-এর (A. V. W. Jackson) গবেষণাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইরানীয় ধর্মগুরু জরথুশ্ত্র সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'Zoroaster, the Prophet of Ancient Iran'। তাঁর 'Avesta Grammar' দীর্ঘকাল পর্যন্ত আবেস্তার ভাষার একমাত্র ব্যাকরণ বলে বিবেচিত হত। পাশ্চাত্য মনীষীদের মধ্যে ইরানীয় শাখার ভাষা,

---

৪৭। Taraporewala, I. J. S. : *Elements of the Science of Language.* Calcutta University, 1962. p, 454.

সাহিত্য ও ধর্ম বিষয়ে বিশ্বকোষতুল্য সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করে অমর হয়ে আছেন ক্রিস্টীয়ান্ বার্টোলোমে (Christian Bartholomae)। তাঁর দু'টি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ হল 'আল্টইরানিশেস্ ভ্যোয়র্টারবুখ্ (Altiranisches Wörterbuch) (১৯০৪) এবং 'ৎসুম্ আল্টইরানিশেন্' ভ্যোয়র্টারবুখ্' (Zum Altiranischen Wörterbuch, ১৯০৬)। আবেস্তা এবং প্রাচীন পারসিক প্রত্নলিপিতে যেসব শব্দ আছে তার বিস্তৃত পরিচয় সম্বলিত এই দু'টি অভিধান-গ্রন্থ ইরানীয় ভাষা-সাহিত্য অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

এই পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করলাম, তাতে দেখা গেল ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philology) বিকাশ হয়েছিল তার মুখ্য আলোচ্য ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের প্রাচীন ভাষাগুলির তুলনামূলক ব্যাকরণ ও ইতিহাস। কিন্তু এর প্রভাব ক্রমশ ব্যাপক হয়ে পড়েছিল। তার ফলে দু'টি লক্ষণীয় নতুনত্বও দেখা গেল। এক, ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের বাইরে অন্য ভাষারও তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনার সূত্রপাত হল। দুই, প্রাচীন ভাষা ছেড়ে আধুনিক ভাষার তুলনার দিকে, এমনকি একক আধুনিক ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ রচনার দিকেও ভাষাজিজ্ঞাসুদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের বাইরে দ্রাবিড় ভাষা-বংশ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন বিশপ্ কাল্ড্ওয়েল্ (Bishop Caldwell, ১৮১৪-১৮৯১ খ্রীঃ)। দ্রাবিড় বংশের প্রধান চারটি ভাষা—তামিল, তেলুগু, মলয়ালম্, কন্নড। এগুলির ক্ষেত্র মূলত দক্ষিণ ভারত। এই দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘকাল বসবাসের সুযোগ লাভ করেছিলেন এই বিশপ। ফলে আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে এই ভাষাগুলি তিনি শিখে নেন। ভাষাতত্ত্বে তাঁর পূর্বার্জিত শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে তিনি ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে দ্রাবিড় বংশের ভাষাগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করেন—'Comparative Grammar of the Dravidian Languages'। পরবর্তী কালে দ্রাবিড় ভাষাগুলি সম্পর্কে অনেকে গবেষণা করেছেন এবং কেরালায় অবস্থিত Dravidian Linguistics Association-এর উদ্যোগে নিত্য-নতুন গবেষণাও হয়ে চলেছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত দ্রাবিড় বংশের ভাষাগুলির তুলনামূলক ব্যাকরণ হিসাবে Caldwell-এর গ্রন্থটিই প্রামাণিক বলে গৃহীত হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক কালের K. Zvelebil, Yu. Glasov এবং M. Andronov-রচিত 'Introduction to the Historical Grammar of the Tamil Language' দ্রাবিড় বংশের একক ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

আগেই বলেছি, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্র প্রাচীন ভাষার আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকে নি। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা প্রাকৃতের ব্যাকরণ রচনা করেন

রিশার্ড পিশেল্ (Richard Pischel, ১৮৪৯-১৯০৮)। কালিদাসের 'শকুন্তলা'র দেবনাগরী ও বাংলা সংস্করণের তুলনামূলক আলোচনা করে পি-এইচ্. ডি. ডিগ্রি লাভ করেছিলেন তিনি। শিক্ষাজীবনের প্রথম থেকেই ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী এই জার্মান মনীষী। প্রাকৃত ভাষা সমূহের প্রামাণিক ব্যাকরণ রচনা করে আজ পর্যন্ত পিশেল্ ভারতীয়দের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। পিশেল্ প্রাচীন প্রাকৃত বৈয়াকরণদের রচনা নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন ; তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'দে গ্রামাতিকিস্ প্রাকৃতিকেস্' ('De Grammaticis Prakritices' অর্থাৎ The Prakrit Grammarians) গ্রন্থে এবং তাঁর সম্পাদিত হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণে। প্রাচীন প্রাকৃত বৈয়াকরণদের সিদ্ধান্তগুলি সুসমন্বিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাকৃত ব্যাকরণ রচনা করেন তিনি—'গ্রামাটিক্ দ্যের্ প্রাকৃতশ্প্রাখেন্' ('Grammatik der Prakritsprachen' অর্থাৎ Grammar of the Prakrit Languages)। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থটি প্রথমে ব্যুলার-পরিকল্পিত 'গ্রুণ্ড্রিশ্ দ্যের্ ইণ্ডো-এ্যারিশেন্ ফিলোলগী উন্ট্ আল্টের্টুম্স্কুণ্ডে'র ('Grundriss der Indo-arischen Philologie und Altertumskunde' অর্থাৎ Outline of Indo-Aryan Philology and Antiquities বা সংক্ষেপে Encyclopædia of Indo-Aryan Research)-এ প্রকাশিত হয়। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার পর ডঃ এস্. ঝা-কৃত এর ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়। পিশেল্ ভারতীয় পুতুল ও ছায়ানৃত্য সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন এবং জিপ্সিদের সম্পর্কেও গবেষণা করেছেন। গেল্ড্নারের সহযোগিতায় বেদ সম্পর্কে তিনি তিন খণ্ডে আলোচনা করেন, 'বেদিশে স্টুডিয়েন্' ('Vedische Studien' অর্থাৎ Vedic Studies)। বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে তাঁর আলোচনা 'লেবেন্ উন্ট লেরে দেস্ বুদ্ধ' ('Leben und Lehre des Buddha' অর্থাৎ Life and Teaching of Buddha) এখনো গুরুত্বপূর্ণ রচনারূপে বিবেচিত হয়।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে আর যাঁরা গবেষণা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় হলেন ভিল্হেল্ম্ লুড্ভিক্ গাইগার্ (Wilhelm Ludwig Geiger, ১৮৫৬-১৯৪৩ খ্রীঃ)। এই জার্মান মনীষী প্রথমে ইরানীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা করেন। আবেস্তার যুগ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের প্রথম প্রকাশ ঘটে সংস্কৃত ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণে। সিংহলের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেন। ১৯১৬ সালে তিনি 'Encyclopedia of Indo-Aryan Research'-এ 'পালি লিটরাটুর্ উন্ট্ শ্প্রাখে' ('Pali Literatur und Sprache' অর্থাৎ Pali Literature and

Language) নামে তাঁর বিখ্যাত রচনাটি প্রকাশ করেন। পরে এটি স্বতন্ত্রভাবেও প্রকাশিত হয়। ভারতীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ এই গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন।

জার্মান মনীষীরা শুধু প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্যভাষাতেই তাঁদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন নি। নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলি সম্পর্কেও তাঁরা আলোচনা করেছেন। কেউ-কেউ অধিক-সংখ্যক ভারতীয় ভাষার তুলনা না করে বিশেষিত ক্ষেত্রে আলোচনাকে নিবিষ্ট করেছেন। যেমন—আর্নস্ট্ ট্রাম্প্ (Ernst Trumpp, ১৮২৮-১৮৮৫ খ্রীঃ)। তিনি পশ্‌তো ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। শিখদের ধর্মগ্রন্থও অনুবাদ করেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো সিন্ধি ভাষার ব্যাকরণ। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথমে প্রাকৃত ভাষা এবং নব্যভারতীয় আর্যভাষার মধ্যে তুলনা করে একটি নিবন্ধ রচনা করেন—'দাস্ জিন্দি ইম্ ফেরগ্লাইশ্ ৎসুম্ প্রাকৃত্ উন্ট্ আন্দোরেন্ নয়েরেন্ ডিয়ালেক্‌টেন্ জান্‌স্ক্রিটিশেন্ উর্‌শ্‌প্রুঙ্' ('Das Sindhi im Vergleich Zum Prakrit und anderen neueren Dialekten Sanskritischen Ursprungs' অর্থাৎ Sindhi as comparaed to Prakrit and other new dialects of Sanskrit origin)। পরে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে এই নিবন্ধটি পরিবর্ধিত করে সিন্ধি ব্যাকরণ (Grammar of Sindhi Language) নামে প্রকাশ করেন।

হোয়ের্নল্ (August Rudolf Friedrich Hörnle, ১৮৪১-১৯১৮ খ্রীঃ)—এই জার্মান মনীষীর জন্ম ভারতবর্ষে, শিক্ষা জার্মানিতে ও ইংল্যাণ্ডে এবং কর্মজীবন আবার ভারতবর্ষে। হোয়ের্নল্ বাংলার এশিয়াটিক্ সোসাইটির সদস্য ছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যার নানা দিগন্তে তাঁর সঞ্চরণ ছিল। তিনি একটি প্রাকৃত ব্যাকরণ সম্পাদনা করেছিলেন এবং একটি জৈন গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু হোয়ের্নলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হলো 'Grammar of Eastern Hindi compared with the other Gaudian Languages' (১৮৮০)। গ্রীয়ার্সনের সঙ্গে সহযোগিতায় তিনি 'A Comparative Grammar of Bihari Language' (১৮৮৫-১৮৮৯ খ্রীঃ) সংকলন করেন। মধ্য এশিয়ায় বাওয়ার্ (Bower) কর্তৃক আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা ও প্রকাশনা তাঁর অন্যতম কীর্তি।

আমরা দেখেছি, প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা ছাড়া নব্য ভারতীয় আর্যভাষার ক্ষেত্রেও তুলনামূলক ব্যাকরণের দিগন্ত প্রসারিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। জন্ বীম্‌স্ (John Beames) ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের চাকরি গ্রহণ করে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি এই চাকরির সূত্রেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বসবাস করেন ও অনেকগুলি নব্য ভারতীয় আর্যভাষা শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। এই সময়ে কাল্ড্‌ওয়েল্-লিখিত

'Comparative Grammar of the Dravidian Languages' দেখে তারই কাঠামোতে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে বীম্‌স্‌ নিজেই লিখেছেন—

> "It was, I think, in 1865 that I first saw Dr, Caldwell's Grammar of the Dravidian Languages, and it immediately occured to me that a similar book was much wanted for the Aryan group."[৪৮]

এই পরিকল্পনা নিয়ে তিনি হিন্দি, পঞ্জাবি, সিন্ধি, গুজরাটি, মারাঠি, ওড়িয়া ও বাংলা ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করেন—'Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India' (১৮৭২-৭৯)। এই ভাষাগুলির মধ্যে পঞ্জাবি, হিন্দি, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার জ্ঞান তিনি নিজে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করেছিলেন। বাকি ভাষাগুলি তিনি গ্রন্থাদি পাঠ করে শিখেছিলেন। বীম্‌স্‌ কর্মসূত্রে প্রশাসনিক আধিকারিক হলেও ভাষাতত্ত্বে তিনি যথাযোগ্য অধিকার লাভ করেছিলেন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নিবিষ্ট অধ্যয়নের মাধ্যমে। তখনকার দিনে পাশ্চাত্যে যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিকাশ হয়েছিল তিনি তার সঙ্গে নিবিড় যোগ বজায় রেখেছিলেন। তিনি ফ্রান্‌ৎস্‌ বপ্‌, যাকপ্‌ গ্রীম্‌ এবং ট্রাম্প্‌-এর রচনা পাঠ করেছিলেন। ফলে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের নীতিপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি যথাযোগ্যভাবেই অবহিত ছিলেন। যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান তিনি লাভ করেছিলেন তা ছিল ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব। যদিও বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি নব্য ভারতীয় ভাষাগুলির তুলনা করেছিলেন, তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃত থেকে শুরু করে প্রাকৃতের মাধ্যমে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির বিভিন্ন দিকের বিবর্তন আলোচনা কবেছেন। তিন খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর বৃহৎ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ধ্বনিতত্ত্ব, দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষ্য ও সর্বনাম এবং তৃতীয় খণ্ডে ক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তিনি। আধুনিক কালে ভাষাবিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে ; কিন্তু এমন সুমহান্‌ পরিকল্পনা নিয়ে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির তুলনামূলক ব্যাকরণ বিশেষ রচিত হয় নি।

ভারতবর্ষে প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত পাশ্চাত্য মনীষীদের মধ্যে যাঁরা নব্য ভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গবেষণা ও অনুসন্ধান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জন্‌ বীম্‌সের পরেই স্মরণীয় হলেন স্যর্‌ জর্জ্‌ আব্রাহাম্‌ গ্রীয়ার্সন্‌

৪৮। Beames, John : *Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India,* Delhi : Munshiram Manoharlal, 1966, Preface.

(Sir George Abraham Grierson, C. I. E. Ph.D., D. Litt., I. C. S., ১৮৫১-১৯৪১ খ্রীঃ)। প্রথম থেকেই গ্রীয়ার্সনের মধ্যে ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে যে অকৃত্রিম আগ্রহ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ট্রিনিটি কলেজের ছাত্রজীবনে সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় কৃতিত্বের জন্যে তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তি থেকে। কর্মসূত্রে তিনি প্রথমে বাংলায় আসেন, পরে দীর্ঘকাল বিহারে অতিবাহিত করেন এবং বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। বিহারে দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে তিনি সেখানকার জনজীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। এর সার্থক ফলশ্রুতিস্বরূপ আমরা তাঁর দু'টি রচনা পাই—'Seven Grammars of the Dialects and Sub-dialects of Bihari Language' (১৮৮৩-৮৭) এবং 'Bihar Peasant Life' (১৮৮৫)। ভারতীয় ভাষাবিষয়ে তাঁর অতুলনীয় কৃতিত্বের নিদর্শন হল আধুনিক ভারতের ভাষাসমূহের জরিপ : 'Linguistic Survey of India'। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি এই জরিপ-কার্য শুরু করেন এবং প্রায় ৩০ বছর ধরে অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে অতিমানবীয় পরিশ্রম করে এই মহৎ কার্য সম্পন্ন করেন। এতে ভারতীয় ভাষাগুলির শুধু ভৌগোলিক জরিপই দেওয়া হয় নি ; ভারতীয় ভাষাগুলির, এমনকি তাদের প্রধান-প্রধান উপভাষাসমূহের, সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ, শব্দভাণ্ডার এবং ভাষার নমুনাও তিনি দিয়েছেন। এই বিশাল কর্ম তাঁর একার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই উপযুক্ত শিক্ষণ-প্রাপ্ত অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ্ ক্ষেত্রানুসন্ধানীকে তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন। স্টেন্ কোনো (Sten Konow) নামে বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্—যিনি পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্যেরও অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন—গ্রীয়ার্সনের এই বৃহৎ পরিকল্পনায় ভারতের অনার্য ভাষাগুলির বিস্তৃত তথ্য বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করে দিয়েছিলেন। তথ্য সংগ্রহে অনেকে সহায়তা করলেও এই গ্রন্থের সামগ্রিক পরিকল্পনা, বিন্যাস ও বিশ্লেষণ গ্রীয়ার্সনের নিয়ন্ত্রণাধীনেই সাধিত হয়েছিল, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এবিষয়ে প্রায় সমসাময়িক ভাষাতত্ত্ববিদের প্রামাণিক সাক্ষ্য অবশ্যই গ্রহণীয় :

> "The main plan and the execution of the task was distincly Grierson's own. He has left his impress definitely on every volume."[৪৯]

গ্রীয়ার্সনের এই Linguistic Survey of India-র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে। দিল্লি থেকে এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে। এই মহাগ্রন্থ ভারতীয় ভাষাসমূহের অপরিহার্য আকর-গ্রন্থ বলে

৪৯। Taraporewala, I. J. S. : *Elements of the Science of Language,* Calcutta University, 1962, p, 474.

ভবিষ্যৎ গবেষকদের সুবিধার জন্যে এর বিষয়-বিন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হল : (১) প্রথম খণ্ড—(ক) প্রথমাংশ : অবতরণিকা ; (খ) দ্বিতীয়াংশ : ভারতীয় ভাষাসমূহের শব্দ-ভাণ্ডার ; (২) দ্বিতীয় খণ্ড—মোন্‌-খ্‌মের থাই ভাষা-পরিবার ; (৩) তৃতীয় খণ্ড—(ক) প্রথমাংশ : হিমালয়ী উপভাষাগুচ্ছ, উত্তর অসমীয়া গোষ্ঠী ; (খ) দ্বিতীয়াংশ : ভোট-বর্মী ভাষাসমূহের মধ্যে বোডো-নাগা ও কোচীন-গোষ্ঠীসমূহ ; (গ) তৃতীয়াংশ : ভোট-বর্মী ভাষাসমূহের মধ্যে কুকী-চীন ও বর্মী গোষ্ঠীসমূহ ; (৪) চতুর্থ খণ্ড—মুণ্ডা ও দ্রাবিড় ভাষাসমূহ ; (৫) পঞ্চম খণ্ড—ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহ (প্রাচ্য গোষ্ঠী) : (ক) প্রথমাংশ : বাংলা ও অসমীয়া ; (খ) দ্বিতীয়াংশ : বিহারী ও ওড়িয়া ; (৬) ষষ্ঠ খণ্ড—ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহ (মধ্যপ্রাচ্য গোষ্ঠী) : পূর্বী হিন্দি ; (৭) সপ্তম খণ্ড—ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহ (দাক্ষিণাত্য গোষ্ঠী) : মারাঠি ; (৮) অষ্টম খণ্ড—ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহ (উত্তর-পশ্চিমা গোষ্ঠী) : (ক) প্রথমাংশ : সিন্ধি ও লাহ্‌ন্দা, (খ) দ্বিতীয়াংশ : দরদীয় বা পৈশাচী ভাষাসমূহ (কাশ্মীরি সহ) ; (৯) নবম খণ্ড : ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহ (মধ্যদেশীয় গোষ্ঠী) : (ক) প্রথমাংশ : পশ্চিমা হিন্দী ও পঞ্জাবি, (খ) দ্বিতীয়াংশ : রাজস্থানি ও গুজরাটি (গ) তৃতীয়াংশ : ভীল ভাষাসমূহ (খান্দেশী, বন্‌জারী ইত্যাদি সহ) (ঘ) চতুর্থ অংশ : পাহাড়ি ভাষাসমূহ ও গুর্জারী, (১০) দশম খণ্ড : ইরানীয় ভাষা-পরিবার। (১১) একাদশ খণ্ড : জিপ্‌সি ভাষা।

জার্মান মনীষীরাই ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য সম্পর্কে সমধিক গবেষণা করেছেন। তাঁদের পরেই উল্লেখযোগ্য অবদান হল ইংরেজ ও ফরাসিদের। ফরাসি অধ্যাপক জ্যুল্‌ ব্লক্‌ (Jules Bloch) নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলির একটি ঐতিহাসিক ব্যাকরণ 'ল্যাঁদো-আরিয়ঁা' ('L Indo-aryen' অর্থাৎ The Indo Aryan) রচনা করেছিলেন (১৯৩৪)। মারাঠি ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ 'ফর্মাস্যিঅঁ দ্য লা লাঁগ্‌ মারাৎ' ('Formation de la Langue Marathe' অর্থাৎ Formation of the Marathi Language) রচনা করে তিনি ভারতীয়দের কাছে একটি নতুন দিগন্ত উদ্‌ঘাটিত করেন। এই ব্যাকরণের আদর্শ অনুসরণ করেই ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Origin and Development of the Bengali Language' রচনা করেন। ভারতীয়দের পক্ষ থেকে এই ঋণ স্বীকার করে ভাষাচার্য লিখেছেন—

> "In preparing the present work, the plan adopted by Professor Bloch in his 'Formation de la Langue marathe' has given me the clearest notions about what

a book on the origin and development of a modern Indo-Aryan language should contain."[৫০]

নব্য ভারতীয় ভাষাগুলির পৃথক্-পৃথক্ ঐতিহাসিক ব্যাকরণ আধুনিক কালে যে লিখিত হচ্ছে তার দীক্ষাগুরু হলেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ; আবার তাঁরও পথ-নির্দেশক হলেন জ্যুল্ ব্লক্। সুতরাং জ্যুল্ ব্লক্ হলেন আধুনিক ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক ব্যাকরণ রচয়িতাদের আদি আচার্য।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের একটি সহায়ক উপকরণ হলো তুলনামূলক অভিধান-গ্রন্থ। নব্যভারতীয় আর্য ভাষাগুলির তুলনামূলক অভিধান রচনা করেন আর্. এল্. টার্নার্ (R. L. Turner)। টার্নারের গ্রন্থের নাম 'A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages'। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই গ্রন্থের রচনা সূচিত হয়। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে টার্নার্ ভারতবর্ষে আসার পর ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন এবং সেই সূত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে তিনি অনেকগুলি ভারতীয় ভাষার সঙ্গে পরিচিত হন। W. Meyer-Lübke-প্রণীত 'রোমানিশেজ্ এটিমোলগিশেজ্ ভ্যোটার্বুখ' (Romanisches Etymologisches Wörterbuch)-এর আদর্শে তিনি নব্য ভারতীয় ভাষাগুলির তুলনামূলক অভিধান রচনা করেন। ১৯২০ সালে যখন গ্রীয়ার্সনের Linguistic Survey of India প্রকাশের কাজ চলছে, তখন গ্রীয়ার্সনই টার্নার্কে উৎসাহিত করে বলেছিলেন—এরকম তুলনামূলক অভিধান তাঁর Linguistic Svrvey-র পরিপূরক গ্রন্থ হবে। কালের বিচারে তাঁর কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। টার্নার্ তাঁর অভিধানে বৈদিক থেকে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত হয়ে নব্যভারতীয় আর্যভাষায় বিভিন্ন শব্দের বিবর্তন ও বর্তমান রূপ পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, একই ভাষায় একটি শব্দের যতগুলি রূপবৈচিত্র্য তিনি পেয়েছেন, সবগুলিই সংগ্রহ করে দিয়েছেন। কিন্তু টার্নারের অভিধানের ত্রুটিও এইখানেই। একই ভাষায় একটি শব্দের যতগুলি রূপবৈচিত্র্য প্রচলিত আছে, তাদের মধ্যে কোন্ রূপটি বেশি প্রচলিত এবং কোন্ রূপটি আদর্শ ভাষার (standard language) রূপ আর কোন্ রূপটি উপভাষাগত রূপ (dialectal form) তা টার্নার উল্লেখ করেন নি। টার্নার্ এই বৃহৎ গ্রন্থ ছাড়া নেপালি ভাষারও একটি অভিধান (Comparative and Etymological Dictionary of the Nepali Language) রচনা করেছিলেন।

৫০। Chatterji, Dr. Suniti Kumar ; The Origin and Development of the Bengali Language, Volume One, London ; Grorge Allen and Unwin, 1970, Preface.

(৩) বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানের ধারা (Course of Linguistics Proper) :

উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানিতে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের চরম বিকাশ হয়। আবার ঐ শতাব্দীতেই জার্মানিতে বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানেরও (Linguistics Proper) সূচনা হয়। জার্মান মনীষী ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ফন্‌ হুম্‌বোল্ট্‌ (১৭৬৭-১৮৩৫) (Wilhelm Von Humboldt) ভাষার বিচিত্র গঠন বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন—'উয়েবার্‌ দি ফের্‌শীদেন্‌-হাইট্‌ দেস্‌ মেন্‌শ্লিশেন্‌ স্প্রাখ্‌বাউয়েস্‌' ('Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues' : 'On The Variety of Human Language Structure')। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পরে ভাষা সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়। তাঁর গ্রন্থটিকে সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানের প্রথম মহান্‌ গ্রন্থের ('first great book on general linguistics')[৫১] মর্যাদা দিয়েছেন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুম্‌ফিল্ড্‌। ব্লুম্‌ফিল্ডের অনুসরণে হুম্‌বোল্ট্‌কে আমরা সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানের পথিকৃৎ বলতে পারি। ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ফন্‌ হুম্‌বোল্ট্‌ ছিলেন ভূগোলবিজ্ঞানী-নৃবিজ্ঞানী এ. ফন্‌ হুম্‌বোল্টের ভ্রাতা ; তাছাড়া তিনি নিজেও ভূপৃষ্ঠের বহুস্থানে ভ্রমণ করেছিলেন এবং পৃথিবীর বহু ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাই পৃথিবীর ভাষাগুলির মধ্যে যে গঠনগত পার্থক্য রয়েছে, তা তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। বিভিন্ন ভাষার তুলনা করে তাদের ইতিহাস অধ্যয়ন নয়, তাদের গঠনপার্থক্য নির্ণয়ের দিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। তিনিই প্রথম গঠনগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পৃথিবীর ভাষাসমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—

(ক) অশ্লেষহীন বা অযোগাত্মক বা অসমবায়ী (Isolating),

(খ) সমাসাত্মক বা যোগাত্মক বা যৌগিক (Agglutinating) এবং

(গ) সবিভক্তিক বা বিভক্তিপ্রধান বা সমন্বয়ী (Infexional)।

আধুনিক কালে বাংলায় ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে ভাষার গঠনগত শ্রেণী-বিভাগের বিষয়টি অনেকেই ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু আমাদের জানা দরকার, এরকম গঠনগত দিক থেকে ভাষা-বর্গীকরণের পথিকৃৎ হুম্‌বোল্টেরই মূল কাঠামো অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গঠনগত শ্রেণীবিভাগ করেছেন। হুম্‌বোল্ট্‌ পাশ্চাত্যে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের জন্ম হবার পূর্বে এই যে বর্গীকরণ-রীতি প্রবর্তন করেন তাতে বর্ণনামূলক

৫১। Bloomfield, Leonard : *Language,* Delhi, Motilal Banarsidass, 1963. p. 18.

দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় পাই। এই ধরনের বর্গীকরণকে যে বর্ণনামূলক বর্গীকরণও (descriptive classification) বলা হয়, তাতেই হুম্‌বোল্টের বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির স্বীকৃতি আছে। যদিও হুম্‌বোল্ট্ তাঁর পূর্ববর্তী রচনা 'Origin of Grammatical Forms and their Influence on the Development of Thought' (১৮২২) গ্রন্থে ভাষার গঠনগত বিবর্তন আলোচনা করেছেন, তবু সেখানেও তাঁর মূল লক্ষ্য মানুষের চিন্তায় ভাষাবিবর্তনের প্রভাব নির্ণয় করা। বস্তুত ভাষার তথ্য বা ইতিহাস নয়, ভাষার তত্ত্ব ও বিজ্ঞান অন্বেষণার দিকেই হুম্‌বোল্ট্ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বেশি। হুম্‌বোল্ট্ ভাষাকে শুধু ধ্বনি শব্দ, বাক্যের যান্ত্রিক বহিরঙ্গ-গঠন রূপে দেখেন নি। তাঁর মতে ভাষার একটি আভ্যন্তরীণ গঠন (inner Sprach-form) আছে এবং তার সঙ্গে মানবমনের গভীর যোগ আছে। ভাষার অন্তরালশায়ী এই মন, এই ভাবসত্তা, এই আত্মা হচ্ছে ভাষার অন্তর্নিহিত মূল নিয়ন্তৃশক্তি। তাই হুম্‌বোল্ট্ বলেছেন, মানুষের ভাষাই হচ্ছে তার আত্মা এবং তার আত্মাই হচ্ছে তার ভাষা (Ihre Sprache ist ihr Geist und Ihr Geist Ihre Sprache)[৫২]—একথা আমরা আগে অন্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। বস্তুত ভাষাকে তিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। ভাষাকে হুম্‌বোল্ট্ মানুষের অন্তর্নিহিত মূল সৃজনীশক্তির (Erzeugung) প্রকাশরূপে দেখেছেন। হুম্‌বোল্টের এই ভাষাদৃষ্টি সম্পর্কে ভাষাতত্ত্ববিদ্ তারাপুরওয়ালা বলেছেন—

> "Language...is an energy found in human beings, a manifestation of the Divine Life in man."[৫৩]

মানুষের মধ্যে ভাষাসৃষ্টির এই অপরিসীম ক্ষমতা আছে বলেই মানুষ সীমাবদ্ধ উপাদানের সাহায্যে অফুরন্ত বাক্যসৃষ্টি করে চলে। হুম্‌বোল্ট্ই এই তত্ত্বটির প্রতি প্রথম অঙ্গুলি-সঙ্কেত করেন—

> "Die Sprache muss von endlichen Mittel einen unendlichen Gebrauch machen."[৫৪]

পরবর্তী কালের ভাষাবিজ্ঞানে এই তত্ত্বের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। আধুনিকতম ভাষাবিজ্ঞানী চম্‌স্কি (Chomsky) তাঁর সৃজনমূলক ব্যাকরণের তত্ত্বে হুম্‌বোল্টের

৫২। Von Humboldt, Wilhelm : *Über die Vershiedenheit des menschlichen Sprachbaues,* Darmstatt. 1949, p. 41.

৫৩। Taraporewala, I. J. S., : *Elements of the Science of Language,* Cal. University. 1962, p 450.

৫৪। Von Humboldt, op. cit., p. 103.

এই উত্তরাধিকার স্বীকার করেছেন :

> "......it is necessary.......to return...to the Humboldtian conception of underlying competence as a system of generative processes."[৫৫]

হুম্‌বোল্ট্ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ ও প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বেও তাঁর কিছু অবদান ছিল, কিন্তু সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্যে সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানের প্রবর্তক তিনি, মনস্তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানেরও সূত্রপাত তাঁরই হাতে, আবার ভাষাবিজ্ঞানের আধুনিকতম ধারা রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণেও তাঁর প্রভাব রয়েছে। সুতরাং সামগ্রিক বিচারে পাশ্চাত্যে সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানে একজন প্রভাবী ব্যক্তিত্ব রূপে আমরা তাঁকে স্মরণ করি।

এইচ্, স্টাইন্‌ট্‌ল্ (H. Steinthal, ১৮২৩-১৮৯৯) হুম্‌বোল্টের প্রদর্শিত ভাষার মনস্তাত্ত্বিক দিকটি সম্পর্কে আরো বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে মনস্তত্ত্ব, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতির আন্তর্বিদ্যা (inter-disciplinary) সম্পর্ক অধ্যয়নের ধারণা আধুনিক কালে যে সূচিত হয়েছে স্টাইন্‌টল্‌ই তার পথপ্রদর্শক। স্টাইন্‌টল্ ভাষার বিভিন্ন প্রকার গঠন সম্পর্কেও একটি গ্রন্থ (১৯৬১) রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে মনস্তত্ত্ববিদ্ ভিল্‌হেল্‌ম্ ভুন্ট্ (Wilhelm Wundt, ১৮৩২-১৯২০) মনস্তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানের ধারাকে আরো বিকশিত করে তোলেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর সমাজ-মনস্তত্ত্ব বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থটি (Völkerpsychologie) প্রকাশিত হবার পরে মনস্তাত্ত্বিক ধারাটি পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে একদিকে যেমন ভাষার তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক অধ্যয়নের চরম বিকাশ হয়, অন্যদিকে তেমনি ভাষার বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক দিকও ভাষাজিজ্ঞাসুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাত্ত্বিক দিকে আবার একটি ধারায় ভাষার মনস্তাত্ত্বিক দিক অধ্যয়নের প্রবণতা দেখা যায়, অন্য ধারায় ভাষার বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক দিক অধ্যয়নেরও সূচনা হয়। জার্মান মনীষী ফ্রীড্রিশ্ মাক্স্ ম্যূলর্ (Friedrich Max Müller, ১৮২৩-১৯০০)-এর আসল গবেষণা প্রাচ্যবিদ্যায় হলেও সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বেও তাঁর অবদান কম নয়। আরও উল্লেখযোগ্য হল সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর অবদান। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর Lectures on the Science of Language প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৯১

৫৫। Chomsky, Noam : *Aspects of the Theory of Syntax*, Massachussetts ; M. I. T. Press, 1976, p. 4.

খ্রীস্টাব্দে তাঁর এই বক্তৃতামালা দুই খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হবার আগে তার ১৪টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এ থেকে অনুমান করা যায় মাক্স্ মূলরের এই গ্রন্থটি ভাষাজিজ্ঞাসুদের মধ্যে কি রকম জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ভাষাবিজ্ঞানের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে তাঁর ভাষাবিষয়ক সিদ্ধান্তে অনেক ভুলত্রুটি পাওয়া যাবে কিন্তু সেযুগে ভাষাবিজ্ঞানকে জনপ্রিয় রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অতুলনীয়।

আমেরিকার উইলিয়াম্ ড্বাইট্ হুইট্নির (William Dwight Whitney, ১৮২৭-১৮৯৪ খ্রীঃ) দু'টি গ্রন্থ 'Language and the Study of Language' (১৮৬৭ খ্রীঃ) এবং 'The Life and Growth of Language' (১৮৭৪ খ্রীঃ) ভাষার বৈজ্ঞানিক দিক সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'A Sanskrit Grammar' প্রকাশ করেন। ইংরেজি ভাষায় লিখিত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণগুলির মধ্যে এই গ্রন্থটি বিশেষ সম্মানিত। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি রচনা করেন, 'The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives of Sanskrit Language'। গ্রন্থটি তাঁর পূর্বোক্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিপূরক গ্রন্থ।

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারউইন্ (Charles Robert Darwin, ১৮০৯-১৮৮২)-এর বিপ্লবাত্মক গ্রন্থ 'The Origin of Species' (১৮৫৯) প্রকাশিত হবার পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চিন্তাজগতের সমস্ত দিগন্তে তার যুগান্তকারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রন্থে ডারউইন প্রমাণ করেছিলেন প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে আপনা থেকেই ক্রমে-ক্রমে বৃক্ষলতা-পশুপক্ষী-মানুষের জন্ম হয়েছে। এই মতবাদের ফলে বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টি-বিষয়ক অলৌকিক তত্ত্বই শুধু খণ্ডিত হয় নি, সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতির প্রতিটি দিকে প্রখর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা হয়। ভাষাতত্ত্বেও এর প্রভাব পড়ে এবং জার্মানিতে একদল ভাষাজিজ্ঞাসু ব্যাকরণ-চর্চায় কঠোরভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। এই নবীন ভাষাজিজ্ঞাসুগোষ্ঠীকে 'নব্য বৈয়াকরণ' (Jung-grammatiker) বলা হয়। এই গোষ্ঠীতে ছিলেন কার্ল ব্রুগমান্ (Karl Brugmann), বের্টোল্ট্ ডেল্ব্রুক্ (Bertold Delbruk), এইচ্. স্টাইন্টল্ (H. Steinthal), হের্মান্ ওস্টোফ্ (Hermann Osthoff), হের্মান্ পাউল্ (Hermann Paul) প্রভৃতি। এই নব্য বৈয়াকরণ-গোষ্ঠীর মধ্যে তিনজনই ছিলেন প্রধান—কার্ল ব্রুগমান, হের্মান্ ওস্টোফ্ এবং হের্মান পাউল্। নব্য বৈয়াকরণ আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিল এই যে, ভাষায়—বিশেষত ধ্বনিতত্ত্বে—যা কিছু সংঘটিত হয় তা বৈজ্ঞানিক নিয়মের দ্বারা চালিত হয়। এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই। ব্রুগ্মান্ এবং ওস্টোফ্ দু'জনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে

লিখিত তঁদের গবেষণা-গ্রন্থ Morphological Investigations (Morphologische Untersuchungen)-এর প্রথম খণ্ড ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ করেন। এর ফলে ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি কঠোরভাবে অনুসরণের প্রবণতা বলিষ্ঠ হয়ে উঠে। ব্রুগ্‌মান্ এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের যে তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করেন তা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ রচনা বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ সম্পর্কে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ধারায় ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

নব্য বৈয়াকরণ-গোষ্ঠীর সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন বা এই আন্দোলনের দ্বারা যাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানে তাঁদের অবদান এই যে, তাঁরা ভাষার ইতিহাস আলোচনার উপরে গুরুত্ব দেন নি, ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক দিক আলোচনায় বেশি উৎসাহী ছিলেন। এই কারণে সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানে তাঁদের অবদান অবিস্মরণীয়। হেরমান্ পাউল্ (১৮৪৬-১৯২১ খ্রীঃ) তাঁর 'প্রিন্সিপিয়েন্ দ্যের্ শ্প্রাখ্‌গেশিস্তে' ('Principien der Sprachgeschichte' অর্থাৎ Principles of the History of Language) ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক দিক সম্পর্কে যে আলোচনা করেছিলেন, তা আজ পর্যন্ত আদর্শ-স্থানীয় হয়ে আছে। হের্‌মান্ পাউলের আলোচনা ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে অতুলনীয় হলেও তাঁর দৃষ্টি ছিল একপেশে। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের গুরুত্ব তিনি স্বীকার করেন নি। তবে তাঁর আলোচনার একটি গুণ হল এই যে, তিনি ভাষার বৈজ্ঞানিক দিক আলোচনা করলেও ভাষার মনস্তাত্ত্বিক দিকটি উপেক্ষা করেন নি। একে কেউ-কেউ তাঁর আলোচনার ত্রুটি বলেছেন ; কিন্তু আধুনিক কালে ভাষার মনস্তাত্ত্বিক দিকটিও যখন বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে তখন একে তাঁর আলোচনার ত্রুটি না বলে গুণই বলা উচিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ভাষাজিজ্ঞাসায় নব্য বৈয়াকরণ-গোষ্ঠীর কঠোর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। যদিও তার আগেই সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা সূচিত হয়েছিল, তবু এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠার ফলেই পাশ্চাত্য দেশে ভাষাজিজ্ঞাসা ক্রমে তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ব্যাকরণের ধারা ছেড়ে বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানের (Linguistics proper) ধারায় পুরোপুরি দিক্‌পরিবর্তন করে। এই সময় প্রাচীন ভারতীয় বৈয়াকরণ পাণিনির প্রভাবও পাশ্চাত্যে বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ওটো ব্যোট্‌লিঙ্ক্ (Otto Böhtlink) পাণিনির ব্যাকরণ 'অষ্টাধ্যায়ী'র ইউরোপীয়

সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর ব্যাকরণে ধ্বনির বর্গীকরণে এবং রূপতত্ত্বের বর্ণনামূলক আলোচনায় যে অতি উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিকাশ হয়েছিল পাশ্চাত্য ভাষাজিজ্ঞাসুগণ তার দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেই নব্য বৈয়াকরণদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে এবং পাণিনির বর্ণনামূলক পদ্ধতির প্রভাবে পাশ্চাত্যে ক্রমে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা সূচিত হল। এই সময় ফ্রীড্রিশ্ ম্যুলার্ (Friedrich Müller, ১৮৩৪-১৮৯৮ খ্রীঃ) তাঁর ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় পৃথিবীর ভাষাগুলির যে বর্ণনা দেন তাতে তিনি তাদের ইতিহাস বা বংশ-পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করেন নি। তাঁর আলোচনা থেকেই বোঝা যায় সেকালের ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ধারা থেকে তিনি সরে এসেছেন। ফ্রান্ৎস্ নিকোলাস্ ফিঙ্ক্ (Franz Nikolaus Finck, ১৮৬৭-১৯১০ খ্রীঃ) ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে রচিত তাঁর প্রবন্ধে এবং গ্রন্থে বর্ণনামূলক ভাষাবিশ্লেষণের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকেই পাশ্চাত্য দেশে বর্ণনামূলক ভাষবিজ্ঞানের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল ; বিংশ শতাব্দীর প্রথমে সুইস্ ভাষাবিজ্ঞানী ফের্দিনাঁ দ্য সোস্যুর্ ব্যাপকভাবে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করেন।

সুইস্ ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক ফের্দিনাঁ দ্য সোস্যুর্ (Ferdinand de Saussure, ১৮৫৭-১৯১৩ খ্রীঃ) নব্যবৈয়াকরণ-গোষ্ঠীর (Neo-grammarians) কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছিলেন। কিন্তু নব্য বৈয়াকরণগণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হলেও তাঁরা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রধানত তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ব্যাকরণের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেছিলেন। ফের্দিনাঁ দ্য সোস্যুর্ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। ফের্দিনাঁ দ্য সোস্যুর্ হুইট্‌নির সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়েছিলেন এবং নিজে জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ব্যাকরণ ও সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন (১৮৯১-১৯০৭)। এই সূত্রে সংস্কৃত বৈয়াকরণদের--বিশেষত পাণিনির—বর্ণনামূলক পদ্ধতির সঙ্গে তিনি নিশ্চয়ই পরিচিত হয়েছিলেন। সোস্যুর্ পাশ্চাত্য দেশে যে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন, তাতে পাণিনির পরোক্ষ প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। সোস্যুর্‌কে পাশ্চাত্য বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রবর্তক বলা হয়। তাঁর যুগান্তকারী মতবাদের প্রতিষ্ঠার ফলে পাশ্চাত্য দেশে ভাষাবিজ্ঞানে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর নতুন মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। মৃত্যুর পরে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নোট থেকে সাজিয়ে নিয়ে সোস্যুরের বক্তৃতাবলী শার্ল্ বাল্লি ও আল্‌বেয়র্ শেসেই (Charles Bally and

Albert Sechehaye) 'কুর্ দ্য ল্যাঁগিস্তিক্ জেনেরাল্' ('Cours de Linguistique Générale' অর্থাৎ Course in General Linguistics) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন ১৯১৫ সালে।[৫৬] তারপরে গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয় এবং পাশ্চাত্যে ভাষাবিজ্ঞানে বিপ্লবাত্মক আন্দোলন সূচিত করে।

সোস্যুর্ প্রথমেই ঐতিহাসিক বা কালক্রমিক (historical or diachronic) এবং বর্ণনামূলক বা এককালিক (descriptive or synchronic) ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির যে আমূল পার্থক্য, তা ব্যক্ত করেন এবং প্রধানত বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের নীতি-পদ্ধতি সূত্রবদ্ধ করে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর আগে ভাষাবিজ্ঞানের যে বিকাশ হয়েছিল তা ছিল প্রধানত ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান। এমন কি সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁর পূর্বসূরিরা যে অল্পস্বল্প অবদান রেখেছিলেন, তাতেও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের একটি সুসঙ্গত সুসমঞ্জস নীতি-পদ্ধতির (principles and methods) প্রতিষ্ঠা হয় নি। সোস্যুর্ তাঁর সারা জীবনের সাধনায় সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানের সুসমঞ্জস নীতি-পদ্ধতি রচনা করেন এবং বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর গ্রন্থের পূর্বোক্ত সম্পাদকদ্বয় সোস্যুরের এই মূল অবদানের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন সর্বপ্রথমে—

> "We have often heard Ferdinand de Saussure lament the dearth of principles and methods that marked linguistics during his developmental period. Throughout his lifetime, he stubbornly continued to search out the laws that would give direction to his thought amid the chaos."[৫৭]

সোস্যুর্ বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের নীতি-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করেন ; তার চেয়েও বড় কথা তিনি ভাষা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেই আমূল পরিবর্তন আনেন। পূর্ববর্তী ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার বিভিন্ন উপাদান খণ্ড-খণ্ড করে আলোচনা করতেন অর্থাৎ ভাষার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র উপাদান বিশ্লেষণের দিকে তাঁদের

৫৬। অধ্যাপক রবীন্‌স্ এই গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন (*A Short History of Linguistics*, Longmans, 1969, p. 199); কিন্তু আসলে গ্রন্থটি ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে জুলাই মাসেই প্রথম প্রকাশিত হয়।

৫৭। Preface to the First Edition of *Course in General linguistics*, 1915, p. XIII.

দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ; এইজন্য তাঁদের ভাষাবিজ্ঞানকে অণু-ভাষাবিজ্ঞান (Micro-linguistics) বলা হত। সোস্যুর্ প্রথম ধরিয়ে দেন যে, ভাষার খণ্ড-খণ্ড উপাদান মিলে যে অখণ্ড রূপটি সৃষ্টি হয়, সেই অখণ্ড রূপেই ভাষার সামগ্রিক তাৎপর্য রয়েছে। ভাষার উপাদানগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কোনো সার্থকতা বহন করে না। উপাদানগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত হয়েই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে। তাঁর প্রবর্তিত ভাষাবিজ্ঞানকে অখণ্ড ভাষাবিজ্ঞান (Macro-linguistics) বলা যায়। পূর্ববর্তী অণু-ভাষাবিজ্ঞানের ধারণার (atomistic conception of speech) বদলে এই অখণ্ড ভাষাদৃষ্টির প্রতিষ্ঠাই সোস্যুরের মৌলিকতম অবদান। সোস্যুরের গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদক Wade Baskin ভাষাবিজ্ঞানে সোস্যুরের এই মৌলিক অবদানের কথাই উল্লেখ করেছেন :

> "The atomistic conception of speech, reflected in the historical studies of the comparative philologists, had to give way to the functional and structural conception of language. De Saussure was among the first to see that language is a self-contained system whose interdependent parts function and acquire value through their relationship to the whole."[৫৮]

সোস্যুরের এই মতবাদের উপরে ভিত্তি করেই পরবর্তী কালে ভাষা সম্পর্কে অখণ্ড গঠনবাদী (Structuralist) মতবাদ গড়ে উঠে। সোস্যুর্ ভাষার অর্থের (meaning) দিকটি বাদ দিয়ে শুধু তার বহিরঙ্গ গঠনের ('Gestalteinheit' = structure) দিকটির উপরে জোর দেন। তাই তাঁর মতবাদকে গঠনসর্বস্বতাবাদের (structuralism) পূর্বসূচনা বলা যায়। সোস্যুর্ ভাষার এই বহিরঙ্গ গঠনের এককালিক (synchronic) বিশ্লেষণকেই প্রাধান্য দিয়েছেন ; তাই তাঁর হাতে এককালিক বা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

ভাষাবিজ্ঞানে সোস্যুরের আর একটি মৌলিক সংযোজন হল ভাষা (language = 'langue') এবং লোকভাষা বা কথা (speech = 'parole') এর পার্থক্য নির্ণয়। কথা বা speech (parole) হল মানুষের নিত্য ব্যবহারের দৈনন্দিন কথাবার্তা। তা যেমন এলোমেলো তেমনি বিমিশ্র (heterogeneous)। তা যেমন ব্যক্তিগত প্রকাশ-মাধ্যম, তেমনি সামাজিক ভাববিনিময়ের মাধ্যম। তাতে ব্যাপ্তি আছে, কিন্তু সংহতি বা সুবিন্যাস নেই। আর ভাষা বা language

---

৫৮। Introduction to de Saussure's *Course in General Linguistics*, p. XII.

(langue) হল আদর্শ ভাষা—তা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুবিন্যস্ত। সোস্যুরের নিজের ভাষায় :

> "Taken as a whole, speech is many-sided and heterogeneous; straddling several areas simultaneously–physical, physiological, and psychological–it belongs both to the individual and to society ; we cannot put it into any category of human facts, for we cannot discover its unity. Language, on the contrary, is a self-contained whole and a principle of classification. As soon as we give language first place among the facts of speech, we introduce natural order into a mass that lends itself to no other classification."[৫৯]

সোস্যুর্ ভাষার অখণ্ড গঠন (structure) সম্পর্কে যে মতবাদ প্রবর্তন করেন এবং যে বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির সূচনা করেন তার ধারা ব্যাপক প্রচার লাভ করে এবং বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে তা অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভাষা (langue = language) ও বাস্তব কথার (parole = speech) মধ্যে পার্থক্যের যে ধারণাটি তিনি গড়ে তুলেন তার প্রভাব আরো সুদূরপ্রসারী হয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চম্‌স্কি তাঁর রূপান্তরমূলক-সৃজনমূলক (Transformational-Generative) ব্যাকরণে Competence ও Performance-এর মধ্যে যে পার্থক্য নির্দেশ করেন তার উত্তরাধিকার সোস্যুরের Langue ও Parole-এর ধারণাটি থেকেই বর্তেছিল।[৬০]

সোস্যুরের গ্রন্থ প্রকাশিত হবার আগেই বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য তাদের মধ্যে ফ্রান্‌ৎস্ বোয়াসের (Franz Boas)

৫৯। de Saussure, Ferdinand : *Course in General Linguistics,* New York ; McGraw-Hill, 1966, p. 9.

৬০। Cf. "The distinction between competence and performance, a necessary dichotomy in the investigation of any aspect of complex human behavior, has always existed in linguistics. It has in fact been observed almost universally, though only recently has it been so explicitly formulated and insisted upon. Saussure's famous distinction between 'langue' and 'parole' is partially analogous to competence and performance."–King, Roberi D. : *Historical Linguistics and Generative Grammar,* New Jersey, 1969, p. 21.

অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর সম্পাদিত 'Handbook of American Indian Languages' প্রকাশ করেছিলেন। এই গ্রন্থে উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের অলিখিত অনুন্নত ভাষাগুলির যে বিশ্লেষণ ও বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানেরই পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল। তাছাড়া অলিখিত ভাষার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ব্যাপারে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল তাতে প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞানের (Applied Linguistics) একটি দিক উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানে ক্ষেত্র-গবেষণার নীতি-পদ্ধতি (principles and methods of field investigation) যা অনুসরণ করা হয়েছে তা এখনো এ ব্যাপারে আমাদের মূল দিগ্‌দর্শক পদ্ধতি হয়ে আছে।

সোস্যুরের গ্রন্থ প্রকাশের (১৯১৫ খ্রীঃ) পরে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের দিকে ক্রমশ ব্যাপক প্রবণতা দেখা যায় ; বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা প্রায় একচ্ছত্র হয়ে উঠে। তার প্রধান কেন্দ্র ছিল আমেরিকা। ১৯২৪ সালে 'আমেরিকার লিঙ্গুইস্টিক্ সোসাইটি'র (Linguistic Society of America) প্রতিষ্ঠা হবার পরে এই সোসাইটির বার্ষিক পত্রিকা 'Language' এই ভাষাবিজ্ঞানীদের একটি প্রধান মুখপত্ররূপে প্রচারিত হতে থাকে। এই সময় দু'জন ভাষাবিজ্ঞানী বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ব্যাপক প্রতিষ্ঠার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—এডওয়ার্ড স্যাপীর্ ও লিওনার্ড ব্লুম্‌ফিল্ড্।

স্যাপীর্ ও ব্লুম্‌ফিল্ড্ দু'জনেই বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী হলেও দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল। স্যাপীর্ (Edward Sapir, ১৮৮৪-১৯৩৯) জন্মসূত্রে ইউরোপীয় এবং সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বের (philology) চর্চা দিয়েই তাঁর ভাষাজিজ্ঞাসার সূত্রপাত। স্যাপীর্ এই উত্তরাধিকার পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলতে পারেন নি। ১৯২১ সালে তাঁর 'Language' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে দেখি, আমেরিকার গঠন-সর্বস্বতাবাদীদের (structuralists) মতো তিনি ভাষার শুধু বাহ্যগঠন বিশ্লেষণে আগ্রহী নন। তিনি ভাষার মনস্তাত্ত্বিক দিক এবং ভাষার সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতির যোগও স্বীকার করেছেন। ভাষার কালানুক্রমিক ইতিহাস তাঁর প্রধান আলোচ্য নয়, ভাষার এককালিক বর্ণনার (synchronic description) নীতি-পদ্ধতি এবং তত্ত্বই তাঁর মুখ্য আলোচ্য। তাই তিনিও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীই। কিন্তু তাঁর এককালিক বর্ণনাও অনেকটা মনস্তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত। উদাহরণ-স্বরূপ বলতে পারি, ধ্বনিমের (phoneme) স্বরূপ বিশ্লেষণে তিনি তার মনস্তাত্ত্বিক দিক—অর্থাৎ শব্দের অর্থ-নিয়ন্ত্রণে তার ভূমিকার কথা—উল্লেখ করেছেন। ব্লুম্‌ফিল্ড্ (Leonard Bloomfield, ১৮৮৭-১৯৪৯) দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে যথার্থই গঠন-সর্বস্বতাবাদীদের (structuralists) পথ-প্রদর্শক। ভাষার যে বিশ্লেষণ-পদ্ধতি তাঁর 'Language' (১৯৩৩) গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে দেখা

যায় তিনি ভাষার অর্থ-প্রসঙ্গের সাহায্য না নিয়েই ভাষার বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ ও বর্ণনার পক্ষপাতী। সোস্যুরের বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন তিনিই। এইজন্যে তাঁকে কেন্দ্র করে আমেরিকায় একটি বলিষ্ঠ ব্লুম্‌ফিল্ড-গোষ্ঠী (Bloomfieldians) গড়ে উঠেছিল। ব্লুম্‌ফিল্ডের ভাষা-বিজ্ঞান শিক্ষার সূত্রপাত নব্য-বৈয়াকরণ-গোষ্ঠীর (Neo-grammarians) কাছে হলেও তিনি তাঁদের ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি, তাঁদের প্রখর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিরই অনুসরণ করেছিলেন। ফলে ভাষা সম্পর্কে তাঁর যে আলোচনা তাতে ভাববাদী বা মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির স্পর্শমাত্র নেই। কট্টর 'জড়বাদী'র মতো ভাষার অর্থগত আত্মা, সাহিত্যরস বা সাংস্কৃতিক দিক বাদ দিয়ে শুধু তার বাহ্য দেহের— তার ধ্বনি-শব্দ-বাক্যের—বিশ্লেষণে মন দিয়েছেন তিনি। ভাষার অর্থের দিকটি বাদ দিয়েই ভাষার বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করতে চান তিনি। অর্থের (meaning) প্রসঙ্গের সাহায্য নিয়ে ভাষার কোনো উপাদানের সংজ্ঞা দেওয়া বা স্বরূপ বিশ্লেষণ করাকে তিনি বর্ণনামূলক পদ্ধতির দুর্বল দিক বলে মনে করেন।[৬১] এই সময়ে মনস্তত্ত্ববিদ জে. বি. ওয়াট্‌সন্‌ (J. B. Watson) পুরোপুরি জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন কতকগুলি অভ্যাসসিদ্ধ আচরণের (behaviour) প্রতিক্রিয়ারূপে। তাঁর এই আচরণবাদের (Behaviourism) প্রভাব ব্লুম্‌ফিল্ডের ভাষাচিন্তার উপরেও পড়েছিল। ভাষাকে তিনি আচরণবাদের কাঠামোতে ফেলে তার অর্থগত ও মনস্তাত্ত্বিক দিক বাদ দিয়ে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া রূপে ব্যাখ্যা করেন। ব্লুম্‌ফিল্ডের মূল ভাষাদৃষ্টির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে একালের ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেছেন—

"Bloomfield did attempt to work out his philosophy of grammar within the behaviorist boundaries."[৬২]

গঠনসর্বস্বতাবাদী (Structuralist) দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি চরম বিকাশ লাভ করে ব্লুম্‌ফিল্ডের উত্তরসাধক জেলিগ্‌ হ্যারিসের (Zellig S. Harris) হাতে। ১৯৫১ সালে তাঁর 'Methods in Structural Linguistics' গ্রন্থটি প্রকাশিত

৬১। Cf. "It was Bloomfield's view that the analysis of meaning was 'the weak point in language study' and that it would continue to be so 'until human knowledge advances very far beyond its present state'."–Lyons, John : *Chomsky*, London ; Fontana / Collins, 1970, p. 33

৬২। Grinder, John T. and Elgin, Suzette Haden : *Guide to Transformational Grammar*, Holt, Rinehart and Winston Inc., 1973, p. 31.

না। ভাষার অর্থের দিক পুরোপুরি বাদ দিয়ে ভাষার বিভিন্ন উপাদানের বিশ্লেষণ তাঁরা করেন শুধু তার গঠন (structure) ও অবস্থান (distribution)-এর দিক থেকে।

ভাষাবিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগে মনোযোগ না দিয়ে প্রধানত ধ্বনিতত্ত্বের ক্ষেত্রে সোস্যুর্-প্রবর্তিত বর্ণনামূলক রীতির ব্যাপক প্রয়োগে উদ্যোগী হয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে প্রাগ্-গোষ্ঠীর (Prague School) ভাষাবিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন অধ্যাপক প্রিন্স্ নিকোলাই ত্রুবেৎস্কয় (Prince Nikolai Trubetzkoy)। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এই গোষ্ঠীর গবেষণা বিশেষ বিকাশ লাভ করে এবং চতুর্থ-পঞ্চম দশকে তার প্রভাব বিস্তার লাভ করে। ত্রুবেৎস্কয়-রচিত 'গ্রুন্‌ৎস্যুগে দ্যের্ ফোনোলগী' (Grundzüge der Phonologie' অর্থাৎ Features of Phonology) ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই গোষ্ঠীর মতে প্রত্যেক ধ্বনির অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য (features) আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কোনো-কোনোটি কোনো-কোনো ভাষায় স্বনিমের (Phoneme) এমন স্বাতন্ত্র্য দ্যোতিত করে যে ঐ স্বাতন্ত্র্যের জন্যেই ঐ স্বনিমটি অন্য স্বনিম থেকে পৃথক্। যেমন বাংলায় ঘোষবৎ মহাপ্রাণ ধ্বনি হল 'ঝ্'। এর দু'টি বৈশিষ্ট্য হল—ঘোষবত্তা (voicing) ও মহাপ্রাণতা (aspiration)। এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যেই অন্য ধ্বনি থেকে এই ধ্বনির স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য (contrast)। মহাপ্রাণতার জন্যে এটি 'জ্' থেকে পৃথক্। কারণ 'জ্' আর সব দিক থেকে 'ঝ্'-এরই মতো ; পার্থক্য শুধু এই যে, 'জ্' হচ্ছে অল্পপ্রাণ, আর 'ঝ্' হচ্ছে মহাপ্রাণ ধ্বনি। তেমনি 'ছ্'-এর সঙ্গে 'ঝ্'-এর পার্থক্য হল ঘোষবত্তার দিক থেকে ; 'ছ্' হচ্ছে অঘোষ ধ্বনি, আর 'ঝ্' হচ্ছে সঘোষ ধ্বনি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মহাপ্রাণতা ও ঘোষবত্তা হচ্ছে 'ঝ্'-এর স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য (distinctive features)। এই স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের উপরে ভিত্তি করে স্বনিমের সম্পর্কে যে আলোচনার ধারা প্রাগ্-গোষ্ঠী গড়ে তোলেন তা-ই তাঁদের প্রধান অবদান। ত্রুবেৎস্কয়ের আরো একটি নতুন আবিষ্কার 'রূপস্বনিমে'র (Morphophoneme) ধারণা। এছাড়া প্রাগ্-গোষ্ঠীর ভাষাবিজ্ঞানীরা পরে শৈলীবিজ্ঞান (stylistics) সম্পর্কেও আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু প্রধানত ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার জন্যেই ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁরা অমর হয়ে আছেন।

ত্রুবেৎস্কয়ের উত্তরসূরিদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাষাবিজ্ঞানী হলেন রোমান্ যাকব্‌সন্ (Roman Jakobson)। প্রাগ্-গোষ্ঠীর মূল নীতিকে তিনি ধ্বনিতত্ত্বের বাইরে এনে রূপতত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন। প্রাগ্-গোষ্ঠীর গবেষণার ক্ষেত্র তিনিই উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত করেন। রুশীয় ভাষার কারক-

বিভক্তি সম্পর্কে তিনি যে আলোচনা করেন তাতে এই তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। বিশ শতকের চতুর্থ এবং পঞ্চম দশকে তিনি প্রাগ্-গোষ্ঠীর মতবাদ অনুসারে ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ও গবেষণা করেন। যাকব্‌সনের রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : 'কিণ্ডার্‌শ্প্রাখে, আফাজি উন্ট্ আল্‌গেমাইনে লাউট্‌গেজেৎসে' ('Kindersprache, Asphasie und Allgemeine Lautgesetze' অর্থাৎ Child-Language, Aphasia and General Phonetic Laws) এবং 'Selected Writings I : Phonological Studies'। তাঁর ছাত্র Morris Halle-এর সহযোগিতায় যাকব্‌সন্ যে 'Fundamentals of Language' প্রকাশ করেন সেটিও বিশেষ পরিচিত রচনা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠা হল তার ফলস্বরূপ ধ্বনিবিজ্ঞানের ধারার বিকাশ হল অর্থাৎ ধ্বনি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সূচিত হল। এ. এম্. বেল্ (A. M. Bell, ১৮১৯-১৯০৫) ধ্বনির দৃশ্যরূপ উদ্ভাবনায় যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন তা পরবর্তী ধ্বনিবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ইংল্যাণ্ডে ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন হেন্‌রী সুইট্ (Henry Sweet, ১৮৪৫-১৯১২)। তাঁর 'Primer of Phonetics' গ্রন্থে (১৮৯০) তিনি প্রত্যেক ধ্বনির জন্যে স্বতন্ত্র বর্ণচিহ্ন প্রবর্তন করে ধ্বনিমূলক প্রতিলিখনের (Phonetic Transcription) প্রথম চেষ্টা করেন। ধ্বনিতত্ত্ববিষয়ক তাঁর আলোচনা ঐতিহাসিক রীতি অনুসরণ করে নি, বর্ণনামূলক রীতিই অনুসরণ করেছে। যখন সোস্যুরের বর্ণনামূলক রীতির প্রবর্তন হয় নি তখনই তাঁর আলোচনা-পদ্ধতির এই আধুনিকতা বিস্ময়কর। ধ্বনিবিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'Handbook of Phonetics'-এ (১৮৭৭ খ্রীঃ) তিনি ধ্বনিতাত্ত্বিক লিখন-পদ্ধতির নানা সমস্যার কথা উপলব্ধি করেছিলেন। ধ্বনির কোন্ রূপটি লিখিত হবে? ধ্বনির মূলরূপ স্বনিম (Phoneme) এবং তার উচ্চারণ-বৈচিত্র্য উপধ্বনি (Allophone)—এদের মধ্যে কোন্‌টি অনুসরণ করে ধ্বনিতাত্ত্বিক লিখন-পদ্ধতি এগোবে? সুইট্ নিজে Phoneme ও Allophone শব্দ দু'টি ব্যবহার করেন নি। কিন্তু তিনি নিজে যে Broad এবং Narrow Transcription-এর কথা বলেছিলেন তাতে বোঝা যায় যে তিনি Broad Transcription বলতে মোটামুটিভাবে আধুনিক কালের phonemic Transcription এবং Narrow Transcription বলতে phonetic Transcription-ই বুঝিয়েছিলেন। তাঁর পরে ধ্বনিবিজ্ঞানের ধারা বিশেষ উন্নতি

লাভ করে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বনিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডানিয়েল্ জোন্সের (Daniel Jones, ১৮৮১-১৯৬৭ খ্রীঃ) গবেষণায়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Outline of English Phonetics' ১৯১৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি যদিও ইংরাজি ভাষার ধ্বনিগুলি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা তবু এই গ্রন্থে সাধারণ ধ্বনিবিজ্ঞানের তত্ত্বও সুবিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। ডানিয়েল্ জোন্স্ তাঁর দীর্ঘকালের অধ্যাপক-জীবনে যন্ত্রনির্ভর ধ্বনিবিজ্ঞান (Instrumental Phonetics) বিষয়ে নিত্যনতুন গবেষণা করে গেছেন। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক সংস্থার (International Phonetic Association) মূল কেন্দ্র ফ্রান্স্ থেকে লণ্ডনে চলে আসার পর জোন্স্ আজীবন তার মধ্যমণি স্বরূপ ছিলেন। এবং আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালাকে (International Phonetic Alphabet) পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছিলেন তিনিই। তাঁর ধ্বনিজিজ্ঞাসা ক্রমশ বিবর্তিত হয়ে গেছে। শেষজীবনে তিনি ধ্বনিম সম্পর্কেও আলোচনা করেছিলেন। 'The Phoneme : Its Nature and Use' গ্রন্থে ধ্বনিম (Phoneme) সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব-যা আমেরিকান ধ্বনিতত্ত্ববিদ্দের মতবাদ থেকে খানিকটা স্বতন্ত্র—ব্যাখ্যা করেছেন। 'The Pronunciation of English' এবং 'English Pronouncing Dictionary' (১৯১৭) গ্রন্থ দু'টির জন্যে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন। শেষোক্ত গ্রন্থে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার সাহায্যে ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করার যে পদ্ধতি তিনি প্রবর্তন করেছেন, তা এখন অনেক ভাষারই অভিধানে অনুসৃত হচ্ছে। আধুনিক ভারতের অনেক অগ্রণী ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক জোন্সের কাছে ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁকে নিজের 'শিক্ষাগুরু' রূপে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েছেন।[৬৩]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভাষাবিজ্ঞানে সবচেয়ে প্রভাবী ব্যক্তিত্বের নাম নোয়াম্ চম্স্কি (Noam Chomsky, জন্ম ১৯২৮)। একালের প্রভাবশালী অন্য মহামনীষী বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মতো তিনিও জন্মসূত্রে ইহুদি। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা প্রধানত আমেরিকায় হলেও কোনো-ক্রমেই তিনি আমেরিকার মানবতা-বিরোধী রাষ্ট্রনীতির সমর্থক নন। রাজনীতিতে সমাজতন্ত্রবাদে এবং পরিণামে রাষ্ট্রহীন শাসনব্যবস্থায় (anarchism) বিশ্বাসী চম্স্কি হলেন মানবতাবাদী। তাই ভিয়েৎনামের প্রতি আমেরিকার মানবতা-বিরোধী নীতির কঠোর সমালোচনা

৬৩। Chatterji, Dr. Suniti Kumar : *The Origin and Development of the Bengali Language,* London George Allen & Unwin Ltd., 1970, Preface. p. XII.

করেছেন তিনি। তাঁর পরিণত বয়সের রচনা 'American Power and the New Mandarins' বইটি তিনি যুদ্ধবিরোধী নবযুবক-সম্প্রদায়ের নামে উৎসর্গ করেছেন। এ থেকে তাঁর জীবনদৃষ্টির মূল পরিচয় পাওয়া যায়, এ যুগের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী চম্‌স্কি ব্যক্তিজীবনে মানবতাবাদী, মানবপ্রেমিক।

আগেই বলেছি, চম্‌স্কির শিক্ষাদীক্ষা. প্রধানত আমেরিকায়। পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া (Pennsylvania) বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভাষাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন, সেখানে তিনি আরো পড়েছিলেন অঙ্কশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র। তাঁর ভাষাবিজ্ঞানে অঙ্কশাস্ত্রের যথাযথতা ও দর্শনশাস্ত্রের গভীরতার নিদর্শন রয়েছে। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে হার্ভার্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ে জুনিয়র্ ফেলো থাকার সময় তিনি যে বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন মূলত সেই বিষয়টি কাজে লাগিয়ে তিনি পরে পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া থেকে পি-এইচ্. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৫ সাল থেকে তিনি মাসাচুসেট্‌স ইন্সটিটিউট্ অব্ টেক্‌নোলজিতে আধুনিক ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞানে 'ফেরারি পি. ওয়ার্ড' পদে (Ferrari P. Ward Chair of Modern languages and Linguistics) অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে চম্‌স্কি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন : Syntactic Structures (১৯৫৭), Current Issues in Linguistic Theory (১৯৬৪), Aspects of the Theory of Syntax (১৯৬৫), Topics in the Theory of Generative Grammar (১৯৬৬) Cartesian Linguistics : A Chapter in the History of Rationalist Thought (১৯৬৬), এবং Language and Mind (১৯৬৮)।

চম্‌স্কির পর থেকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। তাঁর আগে পাশ্চাত্য দেশে ভাষাবিজ্ঞানে আধুনিকতার প্রথম সূত্রপাত করেছিলেন সুইস্ ভাষাবিজ্ঞানী সোস্যুর্। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর 'Cours de Linguistique Générale' (Course in General Linguistics) প্রকাশিত হবার পরে যে নবযুগের সূচনা হয় তাকে বর্ণনামূলক এবং গঠন-সর্বস্বতাবাদী ভাষাবিজ্ঞানের (descriptive and structuralist linguistics) যুগ বলতে পারি। এই যুগ প্রায় অর্ধ শতাব্দী অব্যাহত থাকে। তারপরে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে আবার যুগান্তর সাধন করেন আমেরিকার মাসাচুসেট্‌স ইন্সটিটিউট্ অব্ টেক্‌নোলজির (Massachusetts Institute of Technology) অধ্যাপক ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম্ চম্‌স্কি (Noam Chomsky)। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'Syntactic Structures' ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হবার পর পাশ্চাত্য দেশে ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষা সম্পর্কে এক নতুন ভাবনার স্পর্শ পান। কিন্তু তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'Aspects of the Theory of Syntax'-এ চম্‌স্কি তাঁর মতবাদ

ঈষৎ সংশোধিত করে ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে যখন সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন তখন ভাষাবিজ্ঞানে এক নতুন তত্ত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একে বলা হয় রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণের (Transformational Generative Grammar) তত্ত্ব।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ একে বাংলায় 'সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণে'র তত্ত্ব বলেছেন। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে পাশ্চাত্যে চম্‌স্কি প্রবর্তিত রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণের যুগ সূচিত হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই যুগবিভাগ মোটামুটি বিভাগ মাত্র। কারণ চম্‌স্কির মতবাদ প্রবর্তিত হবার পরেও গ্লীসন্ (Gleason), হকেট্ (Hockett) প্রমুখ অনেক ভাষাবিজ্ঞানী বলিষ্ঠ সাম্প্রদায়ের সঙ্গে পূর্ববর্তী ধারার বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানই চর্চা করে চলেছেন ; এমনকি, হকেট্ চম্‌স্কির মতবাদকে আক্রমণ করে নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করে চলেছেন। তাহলে ১৯৬৫ সালের পর থেকে পাশ্চাত্য দেশে, এবং অন্যান্য দেশগুলিতেও, চম্‌স্কির তত্ত্বের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। এই তত্ত্ব এত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আধুনিক ভাষাগুলির বিশ্লেষণ ও ব্যাকরণ রচনা এই নতুন তত্ত্বের আলোকে সূচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের (Applied Linguistics) এবং এমনকি ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও এই নতুন তত্ত্বের প্রয়োগ করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ভাষাবিজ্ঞানের সীমানা ছাড়িয়ে চিন্তাজগতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করেছে চম্‌স্কির দৃষ্টিভঙ্গি। চম্‌স্কির আগে কোনো ভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি ভাষার রাজ্যের বাইরে এমন ব্যাপক আন্তর্বিদ্যা (inter-disciplinary) প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় নি। আমি অন্যত্র যে কথা বলেছি তা ঈষৎ পরিবর্তিত করে আবার স্মরণ করতে পারি :

> "সাহিত্যে শেক্স্‌পীয়র্, মনোবিজ্ঞানে ফ্রয়েড্, শিল্পতত্ত্বে ক্রোচে, বিজ্ঞানে আইন্‌স্টাইন্, দর্শনে শ্রীঅরবিন্দ যেমন জ্ঞানরাজ্যের একটি নির্দিষ্ট শাস্ত্র ছাড়াও অন্য শাস্ত্রের উপরে এবং জনচিত্তে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছেন, ভাষাবিজ্ঞানে তেমনটি চম্‌স্কির আগে আর কেউ করতে পারেন নি।[৬৪]

চম্‌স্কির মতবাদের এই ব্যাপক স্বীকৃতি ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কারণ হচ্ছে ভাষাবিজ্ঞানে যুগগত চাহিদার সঙ্গে তাঁর তত্ত্বের ইতিহাস-নির্দিষ্ট সাদৃশ্য। ভাষাবিজ্ঞানের বিবর্তনের ধারায় একটি বিশেষ সঙ্কট-লগ্নে তিনি এমন একটি মতবাদ নিয়ে এলেন যার অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে সেই যে জার্মানিতে 'নব্যবৈয়াকরণ-গোষ্ঠী' (Junggrammatiker)

৬৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ১৯৮২, পৃঃ ১৫৪।

ভাষা-আলোচনায় কঠোর বৈজ্ঞানিক বিধিবিধান অনুসরণের পক্ষপাতী হয়েছিলেন, তারপর থেকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক প্রতিষ্ঠা হয়। নব্যবৈয়াকরণ-গোষ্ঠীর অনেকে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ব্যাকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন, কেউ-কেউ সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেন। তারপরে সোস্যুর্ প্রবর্তিত বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান যখন ব্লুম্‌ফিল্ড্-গোষ্ঠীর হাতে গঠন-সর্বস্বতাবাদে (structuralism) পরিণতি লাভ করল তখন বৈজ্ঞানিক বিধিবিধান প্রয়োগে আরো কঠোরতা দেখা দিল, এবং তার অতিরেক যখন চরমে উঠল তখন ভাষা তাঁদের কাছে হয়ে উঠল নিয়মে বাঁধা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, ধ্বনি-শব্দ-বাক্যের বহিরঙ্গ গঠন মাত্র। এ এক রকমের অন্ধ দেহবাদ যেখানে ভাষার ভাবসত্তা, তার সৃজনী সত্তা উপেক্ষিত হল!

ভাষাবিজ্ঞানে এই যান্ত্রিক মতবাদে মানুষের সৃজনশীল চিত্ত যখন হাঁপিয়ে উঠেছে, তখনই চম্‌স্কি নিয়ে এলেন তাঁর রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণের তত্ত্ব যার প্রথম মূল কথাই হল, ভাষা কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, তা একটা সৃজনমূলক ব্যাপার ; মানুষের সৃজনী চেতনার (creative consciousness) সঙ্গে যুক্ত। ভাষার সৃজনমূলক দিকের উপরে গুরুত্ব আরোপ চম্‌স্কির ভাষাতত্ত্বের প্রথম সূত্র। তাঁর পূর্বোদ্ধৃত উক্তিটি এখানে স্মরণীয় :

> "...One of the qualities that all languages have in common is their 'creative' aspect...The grammar of a particular language, then, is to be supplemented by a universal grammar that accommodates the creative aspect of language use."[৬৫]

পূর্ববর্তী বর্ণনামূলক গঠনসর্বস্বতাবাদীরা ভাষার মনোগত দিকটি, তার ভাবগত অর্থগত দিকটি উপেক্ষা করে ভাষার বাহ্যগঠন তার দেহসত্তাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। চম্‌স্কি ভাষার সৃজনশীলতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ভাষার মনোগত দিকটিকে গুরুত্ব দিলেন। এইজন্যে তাঁর তত্ত্বকে মনস্তত্ত্ব-প্রধান তত্ত্ব (mentalistic theory) বলে। এই তত্ত্বের উত্তরাধিকার তিনি প্লাতো, হুম্‌বোল্ট্, স্যাপীর্ প্রভৃতির কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ভাষাপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়েই চম্‌স্কি এই সৃজনমূলক তত্ত্বটির সাক্ষাৎ পেয়েছেন। আমরা দেখি, একজন মানুষ যখন তার মাতৃভাষায় স্বাভাবিকভাবে কথা বলে, তখন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উপলক্ষে তাকে বহুপ্রকারের বহুসংখ্যক বাক্য ব্যবহার করতে হয়।

৬৫। Chomsky. Noam : *Aspects of the Theory of Syntax*, Massachusetts ; The M. I. T. Press, 1976, p. 6.

সারাজীবনে অসংখ্য নতুন-নতুন পরিস্থিতিতে নতুন প্রয়োজনে অসংখ্য বাক্য তাকে বলতে হয়। এত বাক্য কি সবই সে পৃথিবীতে জন্মাবার পরে পিতা-মাতা বা সমাজের কাছ থেকে আগে থেকে শিখে রাখে? মানুষের মন কি সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি কল্পনা করে তার জন্যে প্রয়োজনীয় বাক্য আগেই সমাজের কাছ থেকে শিখে টেপ্-রেকর্ডারের মতো ধরে রাখে এবং পরে যথাসময়ে সেগুলি উদ্‌গিরণ করে? বস্তুত মানুষের মন টেপ্-রেকর্ডারের মতো যন্ত্র নয়, এবং ভাষাপ্রক্রিয়া সে-রকমের যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। মাতৃভাষাভাষী মানুষের মন ভাষার মূল নীতিটুকু নিজের সহজ বোধ ও বোধির সাহায্যে আয়ত্ত করে থাকে ; তারপরে সেই মূলনীতিটুকু প্রয়োগ করে ভাষার সীমাবদ্ধ উপকরণকে নিজের সৃজনী ক্ষমতা দিয়ে নিত্য-নতুন করে সাজিয়ে নতুন-নতুন পরিস্থিতির প্রয়োজনে নতুন-নতুন বাক্য সৃজন (generate) করে চলে। এই বাক্য সৃজনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলেই চম্‌স্কির ব্যাকরণকে সৃজনমূলক ব্যাকরণ (generative grammar) বলে। চম্‌স্কির এই মূল তত্ত্বটি সহজ করে ব্যাখ্যা করেছেন একজন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী :

> "The theory centres on the following simple but essential observation. Whoever speaks a natural language does not simply carry around in his head a long list of words or sentences which he has stored, but is able to form new sentences and to understand utterances he has never heard before. The command of language is thus a productive capacity, not merely the knowledge of an extensive nomenclature...The theory...is, then, mainly concerned with accounting for how sentences are generated, and is appropriately called 'generative' grammar."[৬৬]

মানুষ মাতৃভাষার ব্যাকরণের মূল নিয়মগুলি তার সহজ বোধের (intuition) সাহায্যে আপনা থেকেই শিখে নেয়। তারপরে ভাষার সীমাবদ্ধ শব্দভাণ্ডার থেকে উপাদান আহরণ করে ব্যাকরণের নিয়ম প্রয়োগ করে সেই শব্দগুলিকে নিত্যনতুনরূপে সাজিয়ে নতুন-নতুন বাক্য সৃষ্টি করে চলে। চম্‌স্কির এই যে তত্ত্ব এর পূর্বসূচনা তিনি দেখেছিলেন জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ্ হুমবোল্টের মধ্যেই। এই তত্ত্ব আমাদের ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, কিন্তু হুম্‌বোল্ট্‌ই প্রথম স্পষ্টভাবে বললেন—ভাষার সীমাবদ্ধ উপাদানের সাহায্যে

৬৬। Bierwisch, Manfred : *Modern Linguistics*, The Hague, Paris : Mouton, 1971, pp. 45-46

অফুরন্ত বাক্য সৃষ্টি করা হয়।—

"Die Sprache muss von endlichen Mitteln einen unendlichen Gebrauch machen."[৬৭]

মাতৃভাষাভাষী বক্তার (native speaker) মধ্যে এই যে সৃজনী ক্ষমতা রয়েছে, এর দু'টি দিক আছে : একটি বাস্তব ব্যবহারের দিক, আর একটি আদর্শ সম্ভাবনার দিক। প্রথমটিকে চম্‌স্কি বলেছেন Performance, দ্বিতীয়টিকে Competence। আমরা দৈনন্দিন কথাবার্তায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভাষাকে যেভাবে প্রয়োগ করি, তাতে আমাদের ভাষা-ব্যবহারের সমস্ত সম্ভাবনাকে নিশ্চয়ই আমরা কাজে লাগাই না। তাতে আমাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার সবটার প্রকাশ ঘটে না। ভবিষ্যতের সব সম্ভাব্য পরিস্থিতি আমরা বর্তমানে শেষ করতে পারি না, সুতরাং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার খানিকটা সবসময়ই প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। এই সম্ভাবনায় রয়েছে ভাষার আদর্শ রূপ। ভাষার পরিপূর্ণতার সেই আদর্শ রূপের সবটার প্রকাশ বাস্তবে ঘটে না ; যেটুকু বাস্তবে ঘটে, বক্তার প্রয়োগের সেই বাস্তব ব্যবহারকে বলে Performance ; আর ভাষার পরিপূর্ণতার যেটুকু আদর্শ (ideal) রূপে থেকে যায় তাকে বলে সম্ভাবনা (Competence)। ভাষাতত্ত্ববিদ্ ভাষার বাস্তবরূপ (Performance) বিশ্লেষণ করে ব্যাকরণ রচনা করেন, কিন্তু ভাষার আদর্শ সম্ভাবনা (Competence) সম্পর্কে কোনো বিধিনিষেধমূলক (normative / prescriptive) যান্ত্রিক ব্যাকরণ রচনা করতে পারেন না। চম্‌স্কি নিজেই বলেছেন :

"When we speak of a grammar as generating a sentence with a certain structural description, we mean simply that the grammar assigns this structural description to the sentence...this generative grammar does not, in itself, prescribe the character or functioning of a perceptual model or a model of speech production."[৬৮]

অর্থাৎ ভাষা যেমন সৃজনশীল প্রক্রিয়া, ব্যাকরণও তেমনি সৃজনশীল উদ্‌ঘাটন ; ব্যাকরণ হল বিশ্লেষণ ও বর্ণনা, কিন্তু তা কোনো যান্ত্রিক বিধান নয়।

৬৭। Von Humboldt, Wilhelm : *Über die Verschiedenheit des manschlichen Sprachbaues,* Darmstadt, 1949, p. 103,

৬৮। Chomsky, Noam : *Aspects of the theory of Syntax,* Massachusetts ; The M. I. T. Press, 1976, P. 9.

চমস্কির ভাষাদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হল যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি। এর কারণ হল ভাষাকে তিনি গঠন-সর্বস্বতাবাদীদের (structuralists) মতো শুধু বহিরঙ্গের গঠন বলে গ্রহণ করেন নি, বহিরঙ্গ গঠনের অন্তরে যে গভীর অর্থগত দিক আছে তাকেও তিনি উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। ভাষার দু'টি দিক তিনি স্বীকার করেছেন—বহিরঙ্গ গঠন (surface structure) এবং অন্তরঙ্গ গঠন (deep structure)। ভাষার বহিরঙ্গ গঠনটি আমাদের ধ্বনিপ্রবাহ (sound structure) দিয়ে গঠিত। অন্তরঙ্গ দিকের সঙ্গে রয়েছে ভাষার অর্থের (semantic structure) যোগ। চমস্কির ব্যাকরণে এই বহিরঙ্গ গঠন ও অন্তরঙ্গ গঠন, এই ধ্বনি ও অর্থের যোগটি এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে, বাক্য-গঠনের আসল স্বরূপটি ধরা পড়ে এবং বাক্যের মধ্যে অর্থের সঙ্গে ধ্বনির সম্পর্কের সূত্রটি পরিষ্কার হয়। ভাষায় যে বাক্য আমরা ব্যবহার করি তাতে এই সম্পর্কের সূত্রটি সর্বত্র পরিষ্কার নয়, ফলে বাক্যে অনেক সময় অস্পষ্টতা থেকে যায়, একই বাক্যের একাধিক অর্থ হয়। চমস্কি বাক্য-বিশ্লেষণের যে রীতি রচনা করেছেন, তাতে ধ্বনির সঙ্গে অর্থের সম্পর্কটি পরিষ্কার হয় এবং বাক্যের অস্পষ্টতা (ambiguity) ধরা পড়ে। যেমন 'দর্শনবাবু প্রথম গণনাট্য আন্দোলনের ইতিহাস লিখেছেন।'—এই বাক্যের অর্থ অস্পষ্ট। এর একাধিক অর্থ হতে পারে—(১) গণনাট্য আন্দোলন অনেকবার হয়েছিল, প্রথম যে আন্দোলনটি হয়, তারই ইতিহাস দর্শনবাবু লিখেছেন ; (২) গণনাট্য আন্দোলনের ইতিহাস আগে কেউ লেখেন নি, দর্শনবাবুই প্রথম লিখেছেন। বাক্যটির এই একাধিক অর্থ হবার কারণ হল--'প্রথম' শব্দটির সঙ্গে বাক্যের কোন্ শব্দের সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক তা স্পষ্ট নয়। যদি 'গণনাট্য আন্দোলনে'র সঙ্গে এর সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক হয় তবে ১নং অর্থটি পাওয়া যাবে ; আর যদি 'লেখা'র সঙ্গে এর সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক হয় তবে ২নং অর্থটি পাওয়া যাবে। এই বাক্যে 'প্রথম' শব্দটির অর্থ অস্পষ্ট, এর আভিধানিক অর্থ দিয়ে এখানে বাক্যটির অর্থ পরিষ্কার হচ্ছে না। 'প্রথম' শব্দটি বিশেষণ কি ক্রিয়ার বিশেষণ তা বোঝা যাচ্ছে না, পদ-পরিচয় (parts of speech) ধরা যাচ্ছে না বলে প্রচলিত ব্যাকরণ (traditional grammar) এই বাক্যের অর্থ নির্ণয় করতে ব্যর্থ। শব্দটির গঠনগত (structural) এমন কোনো চিহ্ন (বিভক্তি, প্রত্যয় ইত্যাদি) নেই, বা বাক্যগঠনের এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যাতে এই শব্দের অর্থটি ধরা যায় এবং বাক্যের অর্থগত

শৈথিল্যকে উদ্‌ঘাটিত করা যায়। এখানে গঠনসর্বস্বতাবাদীর (structuralist) প্রচেষ্টাও ব্যর্থ। এখানে উপায় হচ্ছে পূর্বোক্ত প্রকারে নির্ণয় করা যে, বাক্যের অন্য কোন্ শব্দের সঙ্গে 'প্রথম' শব্দটির সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে একটি বাক্যে শব্দগুলির সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার তারতম্য আছে। এই তারতম্য নির্দেশ করার জন্যে চম্‌স্কি একটি বাক্যের পদসমূহকে যে পারম্পর্যের ক্রম (heirarchical order) অনুসারে বিন্যস্ত করেছেন তাকে একটা বৃক্ষানুরূপ চিত্রের (tree-diagram) সাহায্যে উপস্থাপিত করতে পারি। এখানে বাক্যকে প্রথমে দু'টি বৃহত্তম এককে ভাগ করা হয়েছে—NP অর্থাৎ Noun Phrase এবং VP অর্থাৎ Verb Phrase। মোটামুটিভাবে বোঝবার সুবিধার জন্যে আমরা আপাতত ধরে নিচ্ছি যে, প্রচলিত ব্যাকরণে আমরা যাকে বলি Subject (উদ্দেশ্য) এখানে তাকে Noun Phrase বলা হয়েছে, এবং প্রচলিত ব্যাকরণের Predicate (বিধেয়) এখানে হল Verb Phrase।[৬৯] এবার Noun Phrase ও Verb Phrase-এর অন্তর্গত শব্দগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের তারতম্য এইভাবে বৃক্ষানুরূপ চিত্রের সাহায্যে নির্ণয় করতে পারি। একটি সরল বাক্য গ্রহণ করা যাক : 'লোকটি মোটা বই পড়ে।'

[দ্রষ্টব্য পরের পৃষ্ঠায় চিত্র নং ৩]

৬৯। "A traditionally-minded grammarian might say, of our simple model sentence, that (like all simple sentences) it has a *subject* and a *predicate* ; that the subject is a *noun phrase* [NP],...and that the predicate is a *verb phrase* [VP], which consists of a verb [V] with its *object*."–Lyons, John : Chomsky, London : Fontana / Collins, 1970, p. 57.
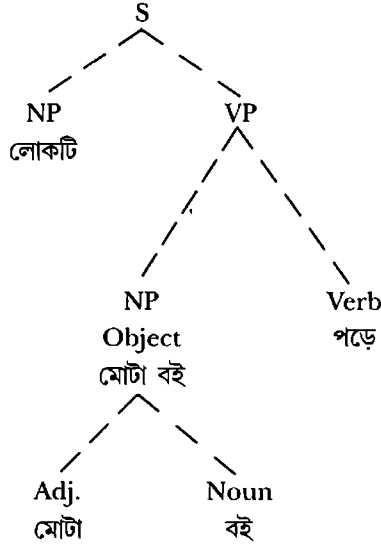
S = Sentence = বাক্য

N = Noun = বিশেষ্য

V = Verb = ক্রিয়া

P = Phrase = পদ-বন্ধ

NP = Noun Phrase = বিশেষ্য-কেন্দ্রিক পদবন্ধ

VP = Verb Phrase = ক্রিয়া-কেন্দ্রিক পদবন্ধ

চিত্র নং ৩

এই চিত্রের সাহায্যে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সম্পর্ক কত দূরের বা কত কাছের। যেমন 'মোটা' শব্দটির সঙ্গে সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক 'বই' শব্দের। 'লোকটি' শব্দের সঙ্গে 'মোটা' শব্দের সম্পর্ক খুব দূরের। এই হল চম্‌স্কির বাক্য বিশ্লেষণ রীতির সহজ পরিচয়। এই রীতিতে এবার যদি আমরা আমাদের আগের বাক্যটির অর্থের বিশ্লেষণ করি তবে এর অর্থের অস্পষ্টতা সহজেই উদ্‌ঘাটিত করা যাবে। এতে 'প্রথম' শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সম্পর্ক পরিষ্কার বোঝা যাবে। চম্‌স্কি-পরিকল্পিত পরম্পরা-বিন্যাসের (heirarchical arrangement) চিত্রে বাক্যটিকে সাজালে এই বাক্যের দু'টি

অর্থ এবং তার গঠনগত কারণ ধরা পড়বে। যেমন—

১নং অর্থ ঃ—
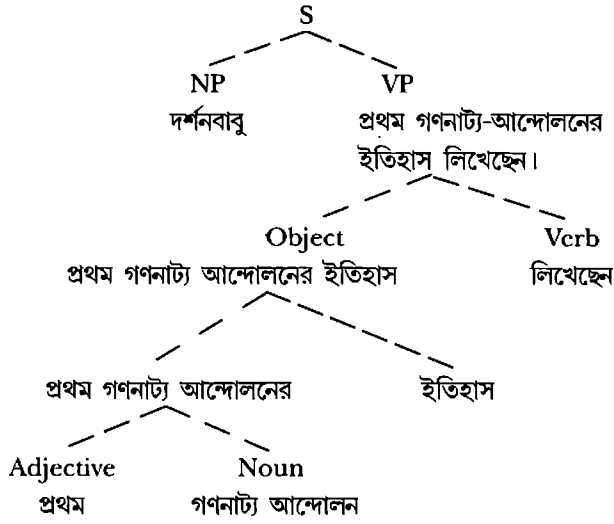
চিত্র নং ৪

২নং অর্থ ঃ—
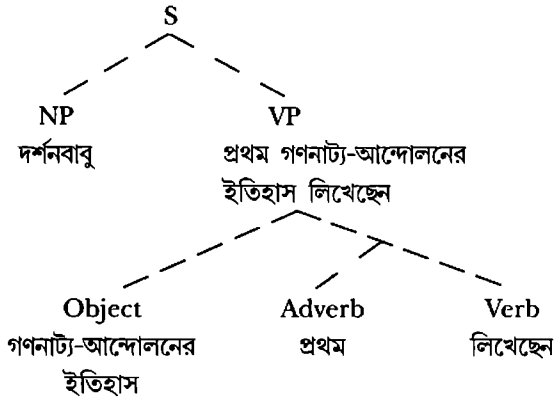
চিত্র নং ৫

চম্‌স্কির ব্যাকরণের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল ভাষাগত বিশ্বজনীনতার (Linguistic Universals) তত্ত্ব। একথা ঠিক যে, প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেক ভাষার স্বনিম-সংখ্যা আলাদা, স্বনিমের ক্রিয়াপদ্ধতি আলাদা, এমনকি শব্দরূপ-ধাতুরূপের বিধান এবং বাক্যগঠনের রীতিও পৃথক্। তবু সব ভাষার মধ্যে কিছু সাধারণ ধর্ম আছে এবং সব ভাষার ব্যাকরণের মধ্যে কিছু মূলীভূত ঐক্য আছে। বিভিন্ন ভাষা ও ব্যাকরণের মধ্যে মূলীভূত ঐক্যের প্রতিষ্ঠা মানুষের মূল ঐক্য যে মনুষ্য-প্রকৃতি তার উপরে। জাতিতে-জাতিতে যত পার্থক্যই থাকুক মানুষ সর্বত্র মূলত এক, তার রক্ত-মাংসের দেহ, তার দেহযন্ত্র বাগ্‌যন্ত্র থেকে শুরু করে তার গভীর মানবিক চাহিদা এবং তার উচ্চতর মানবিক অনুভূতি মূলত এক। এর ফলে সব জাতির ভাষাপ্রক্রিয়ায় এবং ব্যাকরণে একটা মূল সর্বগত ঐক্য আছে।

এই বিরাট মানবিক ঐক্যের উপরে বিশ্বজনীনতা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। এর উপরে ভিত্তি করে বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণের বিভিন্ন উপাদানে যে মূল ঐক্য তাকে substantive universals বলা যায়। একটি ভাষার বাক্যগঠনের বাহ্যরূপে অন্য ভাষার বাক্যগঠনের কিছু পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু দুই ভাষার বাক্যগঠনের গভীর স্তর (deep structure) তলিয়ে দেখলে একটা অন্তরালশায়ী ঐক্য ধরা পড়বে। যেমন ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষার দু'টি বাক্য বিশ্লেষণ করা যাক :—

বাংলা—লোকটি মোটা বই পড়ে।

ইংরেজি—The man reads voluminous books.

বাক্য দু'টির গঠন বিশ্লেষণ করলে দাঁড়াবে—
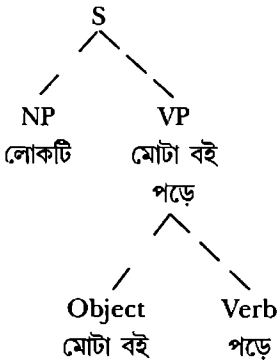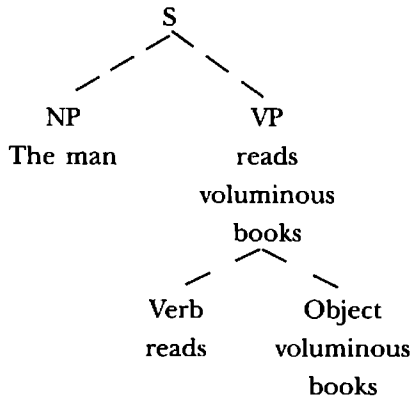
চিত্র নং ৬ চিত্র নং ৭

এখানে দেখা যাচ্ছে বাংলায় Object (মোটা বই) Verb (পড়ে)-এর আগে বসেছে। আবার ইংরেজিতে Verb (reads)-ই Object (books)-এর আগে বসেছে। সুতরাং দুই ভাষার মধ্যে বাক্যের গঠনে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু একথা ঠিক যে, দুই ভাষার বাক্যেই NP ও VP আছে, এবং দুই ভাষার বাক্যেই Verb ও Object আছে। এই NP, VP, এই Verb, Object ইত্যাদির ধারণা স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে সব ভাষাতেই থাকে। এই মূলীভূত ধারণাগুলিই হল Linguistic Universals। অনেক সময় ভাষার বাহ্যগঠনে সব সময় NP, VP ইত্যাদি ধরা পড়ে না, কিন্তু তার আন্তর গঠনে সেগুলি প্রচ্ছন্ন থাকে। যেমন—'বেরিয়ে যাও'। এ বাক্যে শুধু VP আছে। কিন্তু আমরা জানি, এর NP (তুমি) উহ্য আছে। Linguistic Universal গুলি সব সময় ধরা পড়ে না, কিন্তু এগুলি হল ভাষার আন্তর গঠনের মূল সত্য। সহজ করে এই হল চম্‌স্কির Linguistic Universals-এর তত্ত্ব। একজন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীর সমর্থন নিয়ে এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা যেতে পারে—"The analysis of various language types has shown that the deep structures, despite differences between structural types, have essential properties in common. Even without any knowledge of Chinese or Mohawk one could understand the semantic structure of their sentences if one knew the meaning of their morphemes and their deep structure. This leads to the assumption that the basic syntactic categories and functions such as subject, predicate, object, verb, adverb, noun, etc., are substantive universals. Corresponding to the basic inventory of phonological and semantic features there is then a set of syntactic categories from which each language makes a characteristic selection."[৭০]

এই হল চম্‌স্কির ভাষাতত্ত্বের মূল সহজ পরিচয়। ভাষাবিজ্ঞানের ধারার সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রসঙ্গে এই তত্ত্বের বিস্তৃত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের অবকাশ এখানে নেই। যাই হোক, চম্‌স্কির তত্ত্বই পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানের ধারার শেষ উল্লেখযোগ্য বিকাশ। তাই চম্‌স্কিতেই এই ধারার আলোচনার পরিসমাপ্তি।

ভারতীয় : ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশে যে তুলনামূলক ব্যাকরণ ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের বিকাশ সাধিত হয়েছে, তা থেকে প্রাচীন

৭০। Bierwisch, Manfred : *Modern Linguistics,* The Hague, 1971, p. 61.

ভারতের ভাষাজিজ্ঞাসার স্বরূপ ও প্রকৃতি অনেকটা পৃথক্ ; প্রাচীন ভারতীয় ভাষাজিজ্ঞাসা প্রধানত ব্যাকরণের (Grammar) রূপেই বিকাশ লাভ করেছিল। যদিও নবদ্বীপের নব্য নৈয়ায়িকদের ভাষাজিজ্ঞাসা গভীর দার্শনিকতার পরিচয় দেয়, তবু ভারতের প্রধান বৈয়াকরণদের রচনা গ্রীক ব্যাকরণের মতো দার্শনিক দৃষ্টিপ্রভাবিত ছিল না, বরং তা ছিল প্রধানত বর্ণনামূলক, যদিও পরবর্তীকালে তাতে নির্দেশমূলক ব্যাকরণের প্রবণতাও অল্পস্বল্প দেখা দিয়েছিল। এ ছাড়া প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্যগ্রন্থের যে সব টীকা-ভাষ্য লেখা হত তাতে ঐ সব গ্রন্থের ভাষার ব্যাকরণগত আলোচনাও কিছু-কিছু থাকত। এইসব রচনায় সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব চর্চার (textual philology) বিকাশ হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় ভাষাজিজ্ঞাসার সমৃদ্ধি ইউরোপীয় ব্যাকরণের তুলনায় কোনো অংশেই কম ছিল না। প্রাচীন ভারতীয় বৈয়াকরণদের রচনায় কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিধিবদ্ধ আলোচনার এমন পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় যে, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন শুধু পরিমাণগত ব্যাপ্তিতেই নয়, গুণগত উৎকর্ষেও প্রাচীন ভারতীয় ভাষাজিজ্ঞাসুদের অবদান পৃথিবীতে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করার যোগ্য :

> "...it is not merely the quantity...but the quality of the work produced that has won for it a recognition and an honourable mention even at the hands of the regorously scientific philologists of our own day, who are not ashamed to own their obligations to works and authors of over twenty-five hundred years old."[৭১]

এই সমৃদ্ধির জন্যেই আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় ভাষাবিজ্ঞানীরাও প্রাচীন ভারতের বৈয়াকরণদের অবদানকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

প্রাচীন ভারতে এই যে ভাষাজিজ্ঞাসার বিকাশ হয়েছিল তার সূচনা হয়েছিল বৈদিক যুগেই। বৈদিক সংহিতাগুলির মধ্যে ভাষা সম্পর্কে বিধিবদ্ধ আলোচনা নেই ঠিকই, কিন্তু কোথাও-কোথাও ভাষা সম্পর্কে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যেসব উক্তি পাওয়া যায় তাতে গভীর তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে। অবশ্য কোনো-কোনো মনীষী ঋগ্বেদ থেকে যেসব শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখাতে চেয়েছেন যে সেগুলিতে ভাষাজিজ্ঞাসার পরিচয় আছে, নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ঐসব শ্লোকে ভাষার প্রসঙ্গ ঠিক নেই, মনীষীরা সেখানে ভাষার প্রসঙ্গ আরোপ করেছেন মাত্র। যেমন ঋক্-সংহিতার একটি সূক্তের অংশ

৭১। Belvalkar, Dr. Shripad Krishna : *An Account of the Different Existing Systems of Sanskrit Grammar,* Amritsar ; Oriental Publishers, 1980, p. 1

'সপ্তসিন্ধবঃ'-কে পতঞ্জলি 'সপ্ত বিভক্তয়ঃ' (শব্দরূপের সাতটি বিভক্তি) বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু গোটা শ্লোকটি যদি আমরা পড়ি তো বোঝা যাবে তার বিষয়ের সঙ্গে এরকমের ব্যাখ্যার সঙ্গতি নেই ; ভাষার বিভক্তির কথাটা এখানে ভাষ্যকারের কষ্ট-কল্পনা মাত্র। ঋক্-সংহিতার শ্লোকটি হল :

সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্তসিন্ধবঃ।
অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্যং সুষিরামিব।।[৭২]

অর্থাৎ, 'হে বরুণ! তুমি সুদেব, রশ্মিরা যেমন সূর্যের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি তোমার তালুতে সপ্তনদী অনুক্ষণ প্রবাহিত হচ্ছে।'

জলের দেবতা বরুণের প্রসঙ্গে 'সপ্তসিন্ধবঃ'কে সাতটি নদীরূপে ব্যাখ্যা করাই বেশি যুক্তিযুক্ত। শুধু তালুর উল্লেখ আছে বলেই একে সাতটি বিভক্তি মনে করার কোনো কারণ নেই। 'তালু' বলতে ধ্বনির উচ্চারণস্থান না বুঝিয়ে অর্ধবৃত্তাকার দিগন্তকে (concave horizon) বোঝাতে পারে। এখানে মেঘ বৃষ্টির লীলাক্ষেত্র এই দিগন্তকে বোঝানোই বেশি স্বাভাবিক। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সংখ্যক সূক্তের ঋষি হিসাবে 'বাক্'-এর উল্লেখ থেকে পণ্ডিত বেলভারকর ভাষার প্রসঙ্গ আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু এই সূক্তে 'বাক্' বলতে ভাষার অধিষ্ঠাত্রীকে বোঝাচ্ছে না, সর্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী সর্বব্যাপিনী মহাশক্তিকেই বোঝানো হচ্ছে :

অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্।।
ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপ ক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি।।[৭৩]

অর্থাৎ, 'আমি রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী, ধন উপস্থাপিত করি, আমি জ্ঞানসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপযোগী বস্তু সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এরকম আমাকে দেবতারা নানা স্থানে সন্নিবেশিত করেছেন, আমার আশ্রয়স্থান বিস্তর, আমি বিস্তর প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট হয়ে আছি। যিনি দর্শন করেন, প্রাণ ধারণ করেন, কথা শ্রবণ করেন অথবা অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমার সহায়তাতেই সে সকল কার্য করেন। আমাকে যারা মানে না তারা ক্ষয় হয়ে যায়। হে বিদ্বান্! শোনো, আমি যা বলছি তা শ্রদ্ধার যোগ্য।'

মনে হয় এই দেবী ভাষার অধিষ্ঠাত্রী নন, 'চণ্ডী'র শক্তিকল্পনার সঙ্গেই এর মিল বেশি। বরং ঋক্-সংহিতার অন্য একটি সূক্তে বাক্-শক্তির উল্লেখ আছে ;

৭২। ঋগ্বেদ-সংহিতা, ৮/৬৯/১২।

৭৩। ঋগ্বেদ-সংহিতা ১০/১২৫/৩-৪।

অথচ সেই সূক্তের কথা অনেকেই বলেন নি। ঐ সূক্তে ভাষা সম্পর্কে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি পাই :

চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।।[৭৪]

অর্থাৎ, 'বাক্ চার প্রকার। ব্রাহ্মণ মনীষীরা তা জানেন। এর মধ্যে তিনটি গুহায় নিহিত, প্রকাশিত হয় না। শুধু চতুর্থ প্রকার বাক্ মনুষ্যেরা বলে থাকে।'

এখানে তাৎপর্যটি গভীর। মনুষ্যেরা যা বলে, বাক্ বলতে সেই ভাষাকে বোঝাচ্ছে। ভাষার অনন্ত শক্তি, অপরিসীম সম্ভাবনা (Competence)। তার অংশমাত্র আমরা ব্যবহার করি। আমাদের ভাষার যে বাস্তব ব্যবহৃত রূপ (Performance) তা সেই সম্ভাবনার স্বল্পাংশের প্রকাশ মাত্র। আর এই অনন্ত সম্ভাবনার যেটুকু এখনো অপ্রকাশিত, ভাবীকালের কবি-সাহিত্যিক-বাক্‌শিল্পীরা তাকেই ক্রমশ উদ্‌ঘাটিত করে যাবেন। বাণী-সাধকের সাধনা এই লক্ষ্যেই পরিচালিত।

ঋক্-সংহিতার এসব উক্তি ভাবগর্ভ হলেও এগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। এখানে বিধিবদ্ধ আলোচনা বা ভাষার বস্তুনিষ্ঠ (Objective) বিশ্লেষণ নেই। একে ভাষার ব্যাকরণও বলা যায় না। ভাষাবিশ্লেষণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কৃষ্ণ-যজুর্বেদে। সেখানে বলা হয়েছে, ইন্দ্র প্রথম ভাষাকে ব্যাকৃত করেছিলেন অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট করেছিলেন :

"বাগ্বৈ পরাচ্যব্যাকৃত্যাহবদত্তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্নিমাং নো বাচং ব্যাকুর্বিতি সোহব্রবীদ্বরং বৃণৈ মহ্যং চৈবৈষ বায়বে চ সহ গৃহ্যাতা ইতি তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ গৃহ্যতে তামিন্দ্রো মধ্যতোহবক্রম্য ব্যাকরোত্তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যতে তস্মাৎ সকৃদিন্দ্রায় মধ্যতে গৃহ্যতো দ্বির্বায়বে দ্বৌ হি স বরাববৃণীত।"[৭৫]

অর্থাৎ, 'বাক্ প্রথমে অপ্রত্যক্ষ ও অব্যাকৃত (অর্থাৎ অখণ্ড) ছিল। দেবতারা তখন ইন্দ্রকে বললেন—আপনি এই অব্যাকৃত বাক্-কে ব্যাকৃত করুন অর্থাৎ অখণ্ড বাক্-কে বিশ্লিষ্ট করুন। তখন ইন্দ্র সেই অব্যাকৃত বাক্-এর মধ্যভাগ বিশ্লিষ্ট করে তাকে ব্যাকৃত করলেন, তাই তাকে ব্যাকৃত বাক্ বলা হয়।'

এই যে বিশ্লেষণ করা অর্থে ব্যাকৃত করা, এই থেকে 'ব্যাকরণ' (বি + আ + √ কৃ + অনট্) শব্দের প্রচলন হয়। কিন্তু এখানেও ভাষাবিশ্লেষণের শুধু উল্লেখ পাওয়া যায় ; কোনো ভাষাবিশেষের বিশ্লেষণ এখানে লক্ষ্য করা হয় নি বা

৭৪। ঋগ্বেদ-সংহিতা ১/১৬৪/৪৫।

৭৫। কৃষ্ণ-যজুর্বেদ, ৬ষ্ঠ কাণ্ড, ৪র্থ প্রপাঠক, ৭।

ভাষাবিশ্লেষণের নীতিপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নি।

সংহিতার পরে ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিতে বৈদিক সংহিতার কোনো-কোনো সূক্তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেগুলির ভাষা সম্পর্কে আলোচনা আছে। অর্থাৎ পাশ্চাত্যে যাকে সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব (Philology) বলা হয় সেই ধরনের ভাষাচর্চার সূত্রপাত ব্রাহ্মণের মধ্যে হয়েছিল। প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সেখানে ধ্বনির উচ্চারণ, সন্ধির বিধান, পদবিভাগ, বিভক্তি, বচন এবং ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে অল্পস্বল্প আলোচনা করা হয়েছে। এইভাবে বৈদিক যুগেই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থাবলীতে ব্যাকরণেরও মূল ধারণা গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন ভারতে এই হল ভাষাজিজ্ঞাসার প্রথম উন্মেষ। এই উন্মেষ-লগ্নের ভাষা-চিন্তাকে বিশেষজ্ঞ মনীষীরাই উপযুক্ত স্বীকৃতি দিয়েছেন :

> "In the Brāhmanas of the Vedic period we find sufficient proof that, as in Greece, grammatical study in India began with consideration of such points as pronunciation and euphonic combination, and the discrimination of parts of speech which gives us terms such as *Vibhakti,* case termination, *vacana,* number, *kurvant,* present tense. Possibly hence it derived its name Vyākarana."[৭৬]

বৈদিক যুগের শেষে যথার্থ ভাষাবিজ্ঞানের নানা শাখার সুস্পষ্ট বিকাশ দেখা যায় 'বেদাঙ্গ'র মধ্যে। বেদ পাঠের জন্যে যে প্রস্তুতি দরকার, সেই প্রস্তুতি রচিত হত বেদাঙ্গের অনুশীলনে। বেদাঙ্গগুলি উত্তর-বৈদিক পর্বের রচনা হলেও বেদের সঙ্গে যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে অন্বিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মুণ্ডকোপনিষদে (১/১/৫) চারটি বেদের সঙ্গে ছ'টি বেদাঙ্গেরও নামোল্লেখ থাকে। ছ'টি বেদাঙ্গ হল—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ। এগুলির মধ্যে কল্প ও জ্যোতিষ বাদ দিয়ে বাকি চারটি—শিক্ষা, নিরুক্ত, ব্যাকরণ ও ছন্দ—হল ভাষারই বিভিন্ন দিকের আলোচনা, অর্থাৎ ভাষাবিজ্ঞানের অঙ্গ। এগুলি প্রাচীন ভারতের ভাষাবিজ্ঞানের উৎস-স্বরূপ।[৭৭] এই উৎস থেকে যে চারটি ধারা প্রবাহিত তারই উত্তর-সাধনারূপে প্রাচীন ভারতে ভাষাবিজ্ঞানের চারটি শাখার বিকাশ। সেই

৭৬। Keith, A. Berriedale : *A History of Sanskrit Literature,* Oxford University Press, 1973, p. 422.

৭৭। বেদাঙ্গের অন্তর্গত ভাষাজিজ্ঞাসার বিস্তৃত পরিচয়ের জন্যে বর্তমান লেখকের 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য : সমাজচেতনা ও মূল্যায়ন' গ্রন্থ (পৃঃ ৭৪-৮৪) দ্রষ্টব্য।

চারটি ধারা হল যথাক্রমে ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics), ব্যুৎপত্তি ও অভিধান (Etymology and Lexicon), ব্যাকরণ (Grammar) এবং ছন্দঃশাস্ত্র (Prosody)। সুতরাং এই চারটি ধারায় আমরা প্রাচীন ভারতের ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করব।

শিক্ষা : বৈদিক মন্ত্র নির্ভুলভাবে পাঠ করার জন্যে বৈদিক ধ্বনিগুলির যথাযথ উচ্চারণ জানা দরকার। কারণ বৈদিক ভাষায় স্বরধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা, শব্দমধ্যে স্বরাঘাতের (pitch accent) স্থান ইত্যাদির উপরে শব্দের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অর্থ-পার্থক্য নির্ভর করত। এছাড়া বৈদিক মন্ত্রের ছন্দোমাধুর্যও ধ্বনির সঠিক উচ্চারণ ও মাত্রাজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত। তাই বেদাঙ্গের 'শিক্ষা' শাখায় ধ্বনির প্রকৃতি, হ্রস্বতা-দীর্ঘতা, মাত্রাভেদ, স্বরাঘাত ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হত। সুতরাং আধুনিক কালে যাকে আমরা ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics) বলি, বৈদিকযুগে 'শিক্ষা' বলতে তাই বোঝাত। অর্থাৎ শিক্ষা কথাটি তখন বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হত। এখনকার দিনে অর্থবিস্তারের ফলে শিক্ষা বলতে সর্ববিধ বিদ্যাশিক্ষা (education) বোঝায়। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব—এই প্রত্যেক বেদের শিক্ষাগ্রন্থ ছিল পৃথক্, যদিও সব বেদের শিক্ষাগ্রন্থ পাওয়া যায় নি। ঋগ্বেদের মূল শিক্ষাগ্রন্থটি এখন লুপ্ত। উত্তরকালের রচনা 'পাণিনীয় শিক্ষা'-কেই এখন ঋগ্বেদের শিক্ষাগ্রন্থ বলে ধরা হয়। এটি ঋগ্বেদের শিক্ষা বলে পরিচিত হলেও এতে সাধারণ ধ্বনিতত্ত্বের প্রসঙ্গই প্রধান। আর এর নামের সঙ্গে পাণিনির নাম যুক্ত হলেও প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে এটি পিঙ্গলের রচনা। পরবর্তী কালের রচনা হলেও ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে এর মধ্যে যে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক আলোচনা আছে, তার জন্যে ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই শিক্ষাগ্রন্থটিই প্রধান বলে বিবেচিত হয়। পাণিনীয় গোষ্ঠীর বৈয়াকরণরা এই শিক্ষার দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। সামবেদের শিক্ষাগ্রন্থের নাম 'নারদীয় শিক্ষা'। শুক্ল-যজুর্বেদের শিক্ষাগ্রন্থ হল 'যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা' এবং অথর্ববেদের শিক্ষাগ্রন্থ হল 'মাণ্ডুকী শিক্ষা'। মূল শিক্ষাগ্রন্থগুলি অধিকাংশই পরবর্তীকালে বিলুপ্ত হয়ে যায়, পরবর্তীকালের রচনা কিছু শিক্ষাগ্রন্থ পাওয়া যায়। শিক্ষার পরিপূরকরূপে যে গ্রন্থমালা রচিত হয় সেগুলি হল 'প্রাতিশাখ্য' বা 'পার্ষদ গ্রন্থমালা'। 'প্রতি শাখা' থেকে 'প্রাতিশাখ্য' কথাটির সৃষ্টি। বেদের প্রতিশাখার পৃথক্-পৃথক্ প্রাতিশাখ্য ছিল। ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্য শৌনক-রচিত ঋক্-প্রাতিশাখ্য, শুক্ল (বাজসনেয়) যজুর্বেদের প্রাতিশাখ্য কাত্যায়ন-রচিত শুক্ল-প্রাতিশাখ্য-সূত্র, কৃষ্ণ (তৈত্তিরীয়) যজুর্বেদের প্রাতিশাখ্য তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য-সূত্র, সামবেদের প্রাতিশাখ্য সাম-প্রাতিশাখ্য ও অথর্ববেদের প্রাতিশাখ্য অথর্ব-প্রাতিশাখ্য। প্রাতিশাখ্যগুলি সব বিলুপ্ত হয় নি, অধিকাংশই এখনো পাওয়া যায়। প্রাতিশাখ্যগুলিতে কোনো-কোনো বেদের পদপাঠ

দেওয়া হয়েছে এবং বেদের ধ্বনির স্বরাঘাত, মাত্রা, সন্ধি ইত্যাদি সম্পর্কেও আলোচনা পাওয়া যায়। শিক্ষা-গ্রন্থগুলিতে প্রথমে বৈদিক ধ্বনির উচ্চারণ সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত, পরে ধ্বনিতত্ত্বের মূল নীতি (Theory) আলোচনা করা হয়। পরে প্রাতিশাখ্য-গ্রন্থগুলিতে এই মূলনীতি প্রয়োগ করে বেদের ধ্বনিগুলির বিচার করা হয় :

> "The Prātiśākhya...was a treatise on phonetics applied to a group of schools of a particular Veds."[৭৮]

অর্থাৎ শিক্ষা-গ্রন্থগুলিতে প্রধানত সাধারণ ধ্বনিবিজ্ঞান (General Phonetics) এবং প্রাতিশাখ্যগুলিতে প্রধানত প্রয়োগমূলক বা ফলিত ধ্বনিবিজ্ঞানের (Applied Phonetics) বিকাশ হয়েছিল।[৭৯] তবু প্রাতিশাখ্যগুলিতেও সাধারণ ধ্বনিতত্ত্বের অনেক বিষয় এবং ব্যাকরণের কিছু আলোচনা পাওয়া যায়। এগুলিতে বৈদিক ভাষার ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। এছাড়া 'গণ' অনুসারে শব্দের বর্গীকরণ এবং কিছু-কিছু সংজ্ঞার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। শিক্ষা-গ্রন্থগুলিতে প্রাতিশাখ্যের পূর্বরূপ (prototype) পাওয়া যায়। শিক্ষাগ্রন্থগুলি এখন অধিকাংশ লুপ্ত (extinct), কিন্তু প্রাতিশাখ্যগুলি এখনো অধিকাংশ লভ্য (extant)। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ড. সিদ্ধেশ্বর বর্মা এগুলির মোটামুটি রচনাকাল নির্ণয় করে বলেছেন :

> "The chronology of the earlier but extinct phonetic literature should therefore range between 800-500 B. C., while that of the Prātiśākhyas proper between 500-150 B. C."[৮০]

অর্থাৎ মোটামুটিভাবে বলতে পারি ৮০০ থেকে ৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের মধ্যে শিক্ষা-গ্রন্থাবলী এবং ৫০০ থেকে ১৫০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের মধ্যে প্রাতিশাখ্যগুলি রচিত হয়েছিল। অনেকে মনে করেন মূল প্রাতিশাখ্যগুলি পাণিনির পূর্ববর্তী। সেসব মূল প্রাতিশাখ্য এখন পাওয়া যায় না। এখন যে প্রাতিশাখ্যগুলি পাই সেগুলি পাণিনির পরবর্তী।[৮১]

শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যের যুগে বৈদিক ধ্বনির স্বরূপ, হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের পার্থক্য,

---

৭৮। Varma, Dr. Siddheshwar : *Critical Studies in the Phonetic Observations of Indian Grammarians*, Delhi ; Munshiram Manoharlal, 1961, p. 13.

৭৯। ibid., pp. 5-12.

৮০। ibid., p. 21.

৮১। Belvalkar, Dr. S. K : *An Account of the Different Existing Systems of Sanskrit Grammar*, Amritsar, 1980., p, 4.

স্বরাঘাত ও সন্ধি সম্পর্কে যে জ্ঞানের বিকাশ হয়েছিল তা প্রয়োগ করে বেদের সূক্তগুলির সমাস ও সন্ধি বিশ্লিষ্ট করা হয়, প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে প্রত্যেক পদ ও পদাংশকে পৃথক করে দেখানো হয় এবং স্বরাঘাত চিহ্নিত করা হয়। একে বলা হত বেদের ‘পদ-পাঠ’।

যেমন, ঋগ্বেদের একটি মূল সূক্ত হল :

অগ্নিমীলে পুরোহিতং।
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতরং রত্নধাতমম্।।[৮২]

এর পদপাঠ এইভাবে রচনা করা হল--

অগ্নিম্ । ঈলে । পুরঃ ∫ হিতম্

যজ্ঞস্য । দেবম্ । ঋত্বিজম্

হোতারম্ । রত্ন ∫ ধাতমম্।।

বৈদিক যুগের পরে বেদের ভাষা যখন অপেক্ষাকৃত প্রাচীন হয়ে এল তখন পাঠককে বুঝিয়ে দেবার জন্যে তার ভাষার এ রকম বিশ্লেষণের প্রয়োজন হল। তাছাড়া বেদ তখনো লিখিত হয়নি, শ্রুতির সাহায্য গ্রহণ করে স্মৃতিতে ধরে রাখা হত। এই মানবীয় ক্ষমতার যে সীমাবদ্ধতা, তার ফলে বেদের মূলরূপটি বিকৃত হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। মূলত এই বিকৃতি থেকে রক্ষা করার জন্যেই বেদের পদপাঠে বৈদিক কবিতার শব্দগুলি বিশ্লিষ্ট করে স্পষ্ট-চিহ্নিত করে দেওয়া হল। এতে বেদের অর্থ গ্রহণে এবং মূল পাঠটি বুঝে স্মৃতিতে ধরে রাখতে সুবিধা হত। এই পদপাঠ-কে কেউ কেউ প্রাচীন ভারতের প্রথম ভাষাজিজ্ঞাসার নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কীথের পূর্বোদ্ধৃত উক্তি থেকেই বুঝতে পারি ব্যাকরণের মূল ধারণা এর আগে বৈদিক যুগেই ‘ব্রাহ্মণ’-গ্রন্থাবলীর মধ্যে গড়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণের পরে প্রাচীন ভারতীয় ভাষাজিজ্ঞাসার প্রাগ্রসর নিদর্শন স্বরূপ বেদের পদপাঠগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। বেদের পদপাঠের বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যায়—সমাস, সন্ধি, ধ্বনির স্বরূপ, স্বরাঘাত ইত্যাদি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক চেতনা যথেষ্ট উন্নত না হলে বেদের পদপাঠ রচনা

৮২। ঋগ্বেদ-সংহিতা ১/১/১।

সম্ভব হত না। বস্তুত 'ব্রাহ্মণে' ও বেদাঙ্গের 'শিক্ষা'য় ধ্বনিবিজ্ঞানের যে বিকাশ হয়েছিল তারই সার্থক পরিচয় বহন করে বেদের পদপাঠগুলি। কারণ পদপাঠগুলি মূলত 'শিক্ষা'রই অঙ্গ : "Pada-Pāthas..are the oldest productions of the Siksā schools"[৮৩] বৈয়াকরণ শাকল্য ঋগ্বেদের যে পদপাঠ রচনা করেন তা 'শিক্ষা'-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত বলে বিবেচিত হয়। পরে অন্যান্য বেদের পদপাঠ যা রচিত হয় তা 'শিক্ষা'রই পরবর্তী সংযোজন বলে মনে করা হয়।

নিরুক্ত ও কোষগ্রন্থ : প্রাচীন ভারতের ভাষাবিজ্ঞানের আরো একটি সমৃদ্ধ ধারা হল ব্যুৎপত্তি (etymology) ও কোষগ্রন্থের ধারা। ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের প্রথম প্রয়াস দেখা যায় ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিতে। কিন্তু সেই সব ব্যুৎপত্তি বৈজ্ঞানিক ও বিধিবদ্ধ ছিল না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিধিবদ্ধভাবে ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের সার্থক নিদর্শন পাওয়া যায় যাস্কের 'নিরুক্ত'-এর মধ্যে। বৈদিক ভাষার অপ্রচলিত দুর্বোধ্য শব্দগুলির একটি তালিকা 'নিঘন্টু' নামে রচিত হয়েছিল। এই তালিকার রচয়িতার নাম সঠিক জানা যায় না। প্রাচীন টীকাকারদের মতে নিঘন্টু কোনো অজ্ঞাতনামা লেখকের রচনা। মহাভারতের উল্লেখ থেকে জানা যায় প্রজাপতি কাশ্যপ নিঘন্টুর রচয়িতা।

বৃষো হি ভগবান্ ধর্মঃ খ্যাতো লোকেষু ভারত।
নৈঘন্টুক পদাখ্যানে বিদ্ধি মাং বৃষমুত্তমম্।।
কপির্বরাহঃ শ্রেষ্ঠশ্চ ধর্মশ্চ বৃষ উচ্যতে।
তস্মাদ্ বৃষাকপিং প্রাহ কশ্যপো মাং প্রজাপতিঃ।।

—মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৪২ / ৮৮-৮৯।

অর্থাৎ, 'হে ভারত! ভগবান্-ধর্ম সমস্ত ভুবনে 'বৃষ' নামে বিখ্যাত। বৈদিক শব্দার্থবোধক 'নৈঘন্টুক' নামক কোষসমূহে বৃষের অর্থ করা হয়েছে ধর্ম। আমি শ্রেষ্ঠ ধর্মস্বরূপ বাসুদেব, সুতরাং তুমি আমাকে 'বৃষ' বলে মনে করো। কপি শব্দের অর্থ বরাহ এবং শ্রেষ্ঠ ও বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম বলা হয়েছে। আমি ধর্ম ও শ্রেষ্ঠ বরাহরূপধারী ; তাই প্রজাপতি কশ্যপ আমাকে 'বৃষাকপি' নামে অভিহিত করেছেন।'

স্বামী দয়ানন্দ ও পণ্ডিত ভগবৎ দত্ত দু'জনেরই মতে নিরুক্তকার যাস্কই নিঘণ্টুরও রচয়িতা। প্রধানত নিঘন্টুর শব্দ-তালিকা অনুসরণ করেই যাস্ক তাঁর

৮৩। Winternitz, Maurice : *A History of Indian Literature ;* Vol. I, New Delhi ; Oriental Books Reprint Corpn., 1972, p. 283.

নিরুক্ত রচনা করেন। মূল নিঘন্টুতে পাঁচটি অধ্যায় ছিল। প্রথম তিন অধ্যায়কে নৈঘন্টুক কাণ্ড বলে। চতুর্থ অধ্যায়ের নাম নৈগম কাণ্ড এবং পঞ্চম অধ্যায়ের নাম দৈবত কাণ্ড। আমাদের মনে হয় মূল নিঘন্টুতে যে শব্দ-তালিকা দেওয়া আছে, সেই তালিকাটি যাস্কের রচনা নয়, সেটি কোনো পূর্বসূরির রচনা হতে পারে। যাস্কের ভাষাজিজ্ঞাসা ভাষার ধ্বনি বা রূপতত্ত্বের আলোচনা নয়, তাই যাস্ককে প্রচলিত অর্থে বৈয়াকরণ (grammarian) বা ভাষাবিজ্ঞানী (linguist) বলা যায় না। তাঁর রচনা প্রাচীন সাহিত্যের ভাষাবিশ্লেষণ ও তার অর্থগ্রহণে সহায়তা করে বলে বিশেষজ্ঞরা তাঁকে সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ববিদ (philologist) রূপেই স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। নিঘন্টুর শব্দগুলি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং যাস্কের নিরুক্তেরও পাঁচটি অধ্যায়। প্রথম তিনটি অধ্যায়ে বৈদিক শব্দের প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে, চতুর্থ অধ্যায়ে দুরূহ শব্দাবলীর তালিকা ও পঞ্চম অধ্যায়ে বৈদিক দেবদেবীর তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যাস্কের নিরুক্তে শব্দের ব্যুৎপত্তিই শুধু দেওয়া হয় নি, তাদের অর্থও দেওয়া হয়েছে এবং আরো লক্ষণীয় যে, আধুনিক অভিধানের মতো শব্দগুলির প্রয়োগ দেখাবার জন্যে বেদের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিও উৎকলিত হয়েছে। যাস্ক বৈয়াকরণ ছিলেন না। কিন্তু ব্যাকরণের মূল কাঠামোর বোধ তাঁর ছিল মনে হয়। কারণ পদবিভাগের (parts of speech) ধারণা তাঁর ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর রচনায় নাম (বিশেষ্য), সর্বনাম (সর্বনাম), আখ্যাত (ক্রিয়া), উপসর্গ এবং নিপাত শব্দের উল্লেখ থেকে। শব্দবিভক্তি ও ক্রিয়াবিভক্তি সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। সমস্ত ক্রিয়া, এমনকি নাম-শব্দও, মূলত কোনো ধাতু থেকে জাত—এই মতবাদের (root theory) সূচনা করেছিলেন শাকটায়ন[৮৪] ; আর যাস্কের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের মাধ্যমে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিশেষজ্ঞের মতে ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এইটাই যাস্কের আসল অবদান :

> "...he [Yāska] definitely formulates the theory that every noun is derived from a verbal root and meets the various objections raised against it,–a theory on which the whole system of Pāṇini is based, and which is, in fact, the postulate of modern Philology."[৮৫]

৮৪। শাকটায়ন যে যাস্কের পূর্ববর্তী তার প্রমাণ, যাস্ক তাঁর নিরুক্তে পূর্বাচার্যদের নামের মধ্যে শাকটায়নেরও নাম উল্লেখ করেছেন।

৮৫। Belvalkar, S. K. : *An Account of the Different Existing Systems of Sanskrit Grammar,* Amritsar, 1980, p. 7

পরবর্তী কালের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ পাণিনির ব্যাকরণে এই মতবাদের যে পূর্ণ বিকশিত রূপ দেখি, তার আসল প্রতিষ্ঠা যাস্কের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের উপরেই। পাণিনির প্রায় দুই শতাব্দী আগে যাস্কের আবির্ভাব (আনুমানিক ৮০০-৭০০ খ্রীঃ পূঃ)। সুতরাং পাণিনি যাস্কের আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা নিশ্চয়ই লাভবান হয়েছিলেন। মহাভারতে যাস্কের উল্লেখ থেকে তাঁর আবির্ভাবকাল সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

যাস্কো মামৃষিরব্যগ্রো নৈকযজ্ঞেষু গীতবান্।
শিপিবিষ্ট ইতি হ্যস্মাদ্ গুহ্যনামধরো হ্যহম্।।
স্তুত্বা মাং শিপিবিষ্টেতি যাস্ক ঋষিরুদারধীঃ।
মৎপ্রসাদাদধো নষ্টং নিরুক্তমভিজগ্মিবান্।।[৮৬]

অর্থাৎ, 'যাস্কমুনি শান্তচিত্তে অনেক যজ্ঞে 'শিপিবিষ্ট' বলে আমার গুণকীর্তন করেছেন ; তাই আমি এই গুহ্য নাম গ্রহণ করেছি। উদার-হৃদয় যাস্কমুনি শিপিবিষ্ট নামে আমার স্তুতি করে আমার কৃপায় পাতাল-লোক থেকে নষ্ট নিরুক্ত-শাস্ত্র পুনরায় খুঁজে পেয়েছেন।'

মহাভারতের মূলরূপটি গড়ে উঠেছিল পাণিনির আগে অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর আগে। মহাভারতের উপরি-উক্ত শ্লোকটি যদি পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ না হয় তবে ঐ শ্লোকের দ্বারা আধুনিক পণ্ডিতদের মতই সমর্থিত হয়। আধুনিক পণ্ডিতেরা অনেকেই স্বীকার করেছেন যাস্ক পাণিনির পূর্ববর্তী এবং তাঁর আবির্ভাব-কাল খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে।

নিঘন্টু ও নিরুক্তের মধ্যে এই যে বৈদিক শব্দগুলি সাজিয়ে যাস্ক তাদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করে অর্থ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছিলেন এতেই অভিধান রচনার পূর্বসূচনা দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য আধুনিক অর্থে নিরুক্তকে ঠিক অভিধান বলা যায় না।

পরবর্তী কালে বেদাঙ্গের যুগ যখন শেষ হয়েছে এবং ক্লাসিক্যাল যুগের সূচনা হয়েছে, তখন এই ধারা অনুসরণ করে সংস্কৃতে কোষগ্রন্থগুলি রচিত হতে থাকে। এগুলি নিরুক্তের মতো ব্যুৎপত্তি-প্রধান নয়, এগুলিতে শব্দের প্রতিশব্দ এবং অনেকার্থ দেওয়া হয়েছে। অনেকে এগুলিকেই অভিধানরূপে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক কীথ্ যথার্থই বলেছেন—এগুলিকেও ঠিক আধুনিক অর্থে অভিধানরূপে চিহ্নিত করা যায় না, কারণ এগুলিতে আধুনিক রীতির বর্ণানুক্রম (alphabetic order) অনুসরণ করে সর্বক্ষেত্রে শব্দগুলি বিন্যস্ত করা হয়নি।[৮৭]

৮৬। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৪২/৭২-৭৩।

৮৭। Keith, A Berriadale : *A History of Sanskrit Literature*, Delhi : Oxford University Press, 1973, p. 413.

প্রাচীন ভারতের কোষগ্রন্থগুলির মধ্যে অনেকগুলিই অধুনা লুপ্ত, অন্য উৎস থেকে তাদের নামমাত্র জানা যায়। যেমন, কাত্যায়নের 'নামমালা', বাচস্পতি ও বিক্রমাদিত্যের 'শব্দার্ণব' ও 'সংসারাবর্ত' ইত্যাদি। এসব লুপ্ত রচনার কথা বাদ দিলে যে-সব কোষগ্রন্থ এখনো পাওয়া যায় তাদের মধ্যে প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল অমরসিংহ-রচিত 'নামলিঙ্গানুশাসন'। প্রাচীন ভারতের কোষগ্রন্থের মধ্যে এইটি ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। সংক্ষেপে এটি 'অমরকোষ' নামে পরিচিত। গ্রন্থটি বিষয়বস্তু অনুসারে তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রধানত এতে শব্দের প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। তবে পরিশিষ্ট অংশে কিছু শব্দের অনেকার্থও প্রদত্ত হয়েছে। কিংবদন্তী অনুসারে অমরসিংহকে কালিদাসের সমসাময়িক এবং বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভার অন্যতম রত্ন মনে করা হয় :

ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য।।[৮৮]

--অর্থাৎ, 'ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচি—এই ন' জন বিক্রমের (বিক্রমাদিত্যের) সভার বিখ্যাত রত্ন ছিলেন।'

ভারতবর্ষের ইতিহাসে একাধিক রাজার উপাধি 'বিক্রমাদিত্য' পাই। কালিদাসের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে অধিকাংশ পণ্ডিত যে বিক্রমাদিত্যকে গ্রহণ করেন তিনি হলেন গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৩৮০-৪১৩ খ্রীস্টাব্দ)। কালিদাসের সঙ্গে অমরসিংহও যদি ঐ বিক্রমাদিত্যেরই সভাকবি হয়ে থাকেন তা হলে অমরসিংহের জীবনকাল মোটামুটিভাবে খ্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী। কীথ্ অনুমান করেছেন, অমরসিংহ বৌদ্ধ ছিলেন এবং মহাযান মতবাদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, সুতরাং বৌদ্ধধর্মের পতনের পরে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তিনি জীবিত ছিলেন।

অমরসিংহের 'অমরকোষ' এত জনপ্রিয় ছিল যে, এর অনেকগুলি টীকা রচিত হয়েছিল। অমরকোষের টীকার মধ্যে ক্ষীরস্বামী, সর্বানন্দ, ভানুজি, মহেশ্বর ও রায় মুকুটমণির টীকা বিখ্যাত। এঁদের মধ্যে বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের টীকাটি ('টীকাসর্বস্ব', ১১৫৯ খ্রীঃ) বঙ্গদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অমরকোষের প্রায় সমসাময়িক আরো একটি কোষগ্রন্থ হল শাশ্বত-রচিত 'অনেকার্থ-সমুচ্চয়'। পরবর্তী কালে যেসব কোষগ্রন্থ ও অভিধানগ্রন্থ রচিত হয় সেগুলির মধ্যে হলায়ুধ-রচিত 'অভিধান-রত্নমালা' (খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী),

---

৮৮। জ্যোতির্বিদাভরণ।

যাদব-রচিত 'বৈজয়ন্তী' (খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দী), জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র-রচিত 'অভিধান-চিন্তামণি' ও 'অনেকার্থ-সংগ্রহ' (খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী), জৈন ধনঞ্জয়-রচিত 'নামমালা' (খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী), মহেশ্বর-রচিত 'বিশ্বপ্রকাশ' (খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী), মেদিনীকার-রচিত 'অনেকার্থ-শব্দকোষ' (খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী), তারানাথ বাচস্পতি-রচিত 'বাচস্পত্য' (খ্রীস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী) এবং রাধাকান্ত দেবের পৃষ্ঠপোষকতায় একাধিক সংস্কৃত পণ্ডিত কর্তৃক সঙ্কলিত 'শব্দকল্পদ্রুম' (ঊনবিংশ শতাব্দী)। এইসব কোষগ্রন্থের অধিকাংশ ছিল শুধু সংস্কৃত ভাষার শব্দের অভিধান। কিন্তু কোষগ্রন্থের ধারায় নতুনত্ব সাধিত হয়েছিল আকবরের সময়ে সঙ্কলিত পারসি-সংস্কৃত অভিধান 'পারসীপ্রকাশ' গ্রন্থে। ইতিপূর্বে অবশ্য জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র দেশি শব্দের অভিধান 'দেশী নামমালা' রচনা করেও অভিনবত্ব সাধন করেছিলেন।

ছন্দ : বৈদিক সংহিতার প্রধান অংশই ছন্দোবদ্ধ পদ্যে রচিত। এইজন্যে বেদ অধ্যয়নের প্রস্তুতি হিসাবে ছন্দঃশাস্ত্র পঠিত হত এবং ছন্দোবিজ্ঞান (Prosody) বেদাঙ্গের অন্যতম শাখা ছিল। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থাবলীতে এবং ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্যে ছন্দ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল, কিন্তু এগুলি ছন্দ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নয়। ছন্দ সম্পর্কে প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনাগ্রন্থ হল পিঙ্গলের 'ছন্দঃসূত্র'। এই গ্রন্থে বেদের সাতটি প্রধান ছন্দ—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পুংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী—সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এই গ্রন্থে বৈদিক সাহিত্যের ছন্দের চেয়ে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের ছন্দ সম্পর্কেই বেশি আলোচনা করা হয়েছে। এ থেকে মনে হয় গ্রন্থটি বৈদিক যুগের পরবর্তী কালের রচনা। কেউ কেউ মনে করেন পিঙ্গলের আগে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' এবং 'অগ্নিপুরাণে' ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। কিন্তু কীথের মতে পিঙ্গলের গ্রন্থটিই এদের পরবর্তী। পিঙ্গল-রচিত প্রাকৃত ছন্দ বিষয়েও একটি গ্রন্থ আছে—'প্রাকৃত-পৈঙ্গল'। এটি অপভ্রংশে রচিত এবং পরবর্তী অন্য কোনো পিঙ্গলের রচনা। সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা হল—ক্ষেমেন্দ্র-রচিত 'সুবৃত্ততিলক' (১১শ শতাব্দী), কেদারভট্ট-রচিত 'বৃত্তরত্নাকর' (১৫শ শতাব্দী), নারায়ণ-রচিত 'বৃত্তরত্নাকর' এবং গঙ্গাদাস-রচিত 'ছন্দোমঞ্জরী'। পরবর্তীকালের রচনাগুলির মধ্যে 'ছন্দোমঞ্জরী' সমধিক প্রসিদ্ধ।

প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যে ছন্দ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংস্কৃতের চেয়ে কোনো অংশেই কম হয় নি। ফলে প্রাকৃত-অপভ্রংশে রচিত ছন্দ-বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়। স্বয়ম্ভূ-রচিত 'স্বয়ম্ভূছন্দ' (খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দী) এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে স্মরণীয়। গ্রন্থটিতে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

তাছাড়া এই গ্রন্থে ছন্দোবিশেষজ্ঞ প্রায় পঞ্চাশ জন পূর্বসূরির উল্লেখ আছে। বিরহাঙ্ক-রচিত 'বৃত্তজাতি-সমুচ্চয়' গ্রন্থে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা আছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র সংকলন করেছিলেন 'ছন্দোহনুশাসন' নামে একটি গ্রন্থ। এতেও প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ছন্দের আলোচনা আছে।

ব্যাকরণ : আগেই বলা হয়েছে যে, ভাষাকে বিশ্লেষণ করা অর্থে 'ব্যাকৃত' করার উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় কৃষ্ণ-যজুর্বেদে (৬।৪।৭), কিন্তু তখনো ব্যাকরণের নীতিপদ্ধতি কিছুই গড়ে উঠে নি। ভাষা বিশ্লেষণের প্রাথমিক প্রয়াস দেখা যায় ব্রাহ্মণ-গ্রন্থাবলীতে এবং ব্যাকরণের কিছু মূল ধারণারও প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় সেখানেই। 'ব্যাকরণ' কথাটিরও প্রথম ব্যবহার দেখা যায় 'গোপথ ব্রাহ্মণে' (১।২৪)। তারপরে বেদাঙ্গের যুগে ব্যাকরণের স্বতন্ত্র ধারার উল্লেখ পাওয়া যায়। মনে হয়, তখন ব্যাকরণ বলতে প্রধানত রূপতত্ত্বকেই (Morphology) বোঝাত, কারণ ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে স্বতন্ত্র শাখাই গড়ে উঠেছিল যার নাম 'শিক্ষা' ও 'প্রাতিশাখ্য'। কিন্তু বেদাঙ্গের অঙ্গ হিসাবে ব্যাকরণের স্বতন্ত্র ধারার স্বীকৃতি থাকলেও বেদাঙ্গের যুগে রচিত কোনো ব্যাকরণের নিদর্শন পাওয়া যায় নি। বেদাঙ্গের অন্যান্য শাখার মতো বেদ-পাঠের প্রস্তুতি হিসাবে নিশ্চয়ই ব্যাকরণ শাখারও সূত্রপাত হয়েছিল। কারণ বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন আরণ্যকে এবং ব্রাহ্মণ-গ্রন্থাবলীতে ব্যাকরণের কোনো-কোনো পারিভাষিক শব্দ ও ধারণার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু বৈদিক যুগে রচিত কোনো ব্যাকরণ-গ্রন্থ পাওয়া যায় নি। প্রথম যে ব্যাকরণ-গ্রন্থের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সেটি হল পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণ। এটি বেদাঙ্গের ধারারই উত্তরসাধনা হলেও বেদাঙ্গের যুগের রচনা নয়। শুধু কালের বিচারেই যে এই ব্যাকরণ বেদ থেকে দূরবর্তী তা নয় ; এটি মূলত বেদোত্তর পর্বের ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতেরই ব্যাকরণ। অথচ এই ব্যাকরণে ভাষাবৈজ্ঞানিক চেতনার যে উন্নত বিকাশ দেখা যায় তাতে একথা মানতেই হয় যে, তার আগে ভাষাজিজ্ঞাসার পূর্বপ্রস্তুতি অনেক দিন থেকে চলছিল, এবং ব্যাকরণ-চর্চায় বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তাই গবেষক মনীষীরা সিদ্ধান্ত করেছেন প্রস্তুতি-পর্বের ব্যাকরণচর্চার নিদর্শনগুলি ইতিহাসের অভিঘাতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, পাণিনির ব্যাকরণই দাঁড়িয়ে আছে ব্যাকরণ-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর সমৃদ্ধিপর্বের নিদর্শন হয়ে :

"The old Vedāṅga texts on grammar are entirely lost......But the oldest and most important text-book of grammar that has come down to us, that of *Pāṇini,* metes

out to the Vedic language only casual treatment ; it no longer stands in close relation to any Veda school, and altogether belongs to a period at which the science of grammar was already pursued in special schools."[৮৯]

পাণিনি তাঁর পূর্ববর্তী অনেক বৈয়াকরণের উল্লেখ করেছেন। যেমন, শাকটায়ন আপিশলি, শৌনক, কাশ্যপ, গার্গ্য, ভরদ্বাজ, গালব ইত্যাদি। কিন্তু এই পূর্বসূরিদের ব্যাকরণ-গ্রন্থের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি। পাণিনির পূর্ববর্তী যুগের ভাষাজিজ্ঞাসুদের মধ্যে একমাত্র যাস্কের রচনা 'নিরুক্ত' পাওয়া গেছে। এটি ব্যুৎপত্তিবিষয়ক রচনা এবং ব্যাপক অর্থে ব্যুৎপত্তিকে ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত বলে গ্রহণ করলে যাস্ককে পাণিনির পূর্ববর্তী একমাত্র ভাষাবিজ্ঞানী রূপে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু তাঁর রচনাটি ঠিক ব্যাকরণের ধারায় পড়ে না বলে এ সম্পর্কে আগেই স্বতন্ত্র ধারায় আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী পাণিনির ব্যক্তিজীবনের কোনো তথ্যই তাঁর রচনায় পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালের সাহিত্যে তাঁকে 'শালাতুরীয়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই থেকে কেউ-কেউ অনুমান করেছেন যে, "পাণিনি তক্ষশিলার নিকটে শালাতুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।" কানিংহামের মতে এই শালাতুর গ্রাম লাহোরের কাছে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে অবশ্য পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে শালাতুর নামে এখনো একটি গ্রাম আছে। পাণিনিকে পতঞ্জলি 'দাক্ষীপুত্র' বলে উল্লেখ করেছেন। এই উল্লেখ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি তাঁর মায়ের নাম ছিল দাক্ষী। কিন্তু পাণিনির পিতার নাম জানা যায় না। এবং আরো দুঃখের কথা, ভারতের ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসের দিক থেকে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হল পাণিনির কালনির্ণয়টি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত থেকে গেছে। পাণিনির নিজের রচনা থেকে তাঁর জীবনকালের কোনো সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। অন্যান্যদের রচনায় যেটুকু উল্লেখ পাওয়া যায় তা থেকেও কোনো নির্ভুল সিদ্ধান্তে আসা যায় না। তাই এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য দেখা যায়। একদিকে বিখ্যাত ভারতীয় পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী বলেছেন, পাণিনির আবির্ভাবকাল ২৪০০ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ। অন্যদিকে ভেবর্ (Weber) ও মাক্সম্যুলরের (Mux Müller) মতে পাণিনি যিশুখ্রীস্ট জন্মাবার মাত্র ৩৫০ বছর আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই দুই চরমপন্থী মতবাদের মাঝামাঝি সিদ্ধান্ত করেছেন গোল্ড্স্ট্যুকার্

৮৯। Winternitz, Maurice : *A History of Indian Literature,* Vol. I., New Delhi ; Oriental Books Reprint Corpn., 1972, p. 289.

(Goldstücker)। পাণিনির কাল সম্পর্কে তিনি সুবিস্তৃত গবেষণা করেছিলেন।[৯০] তাঁর মতে পাণিনির আবির্ভাব-কাল খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী। আবার ভাণ্ডারকরের মতে পাণিনি ৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের আগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেছেন—খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পাণিনি তাঁর ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন :

"In the 5th century B. C., the great grammarian Pāṇini wrote his 'Aṣṭādhyāyi.'[৯১]

সব দিক বিবেচনা করে আমরা মোটামুটিভাবে সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, পাণিনি খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীতেই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

পাণিনির ব্যাকরণের নাম 'অষ্টাধ্যায়ী' ; কারণ এই ব্যাকরণ আটটি অধ্যায়ে সমাপ্ত। প্রত্যেক অধ্যায় আবার চারটি পাদে বিভক্ত। এই ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়ে কতকগুলি সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং পরিভাষায় পরবর্তী অধ্যায়সমূহের সূত্রগুলি ব্যাখ্যার নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমাস, কারক-বিভক্তি ইত্যাদির প্রসঙ্গ আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আছে কৃৎপ্রত্যয়ের কথা এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে তদ্ধিত প্রত্যয়ের কথা। ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় স্বরাঘাত ও ধ্বনি-পরিবর্তন। অষ্টম অধ্যায়ে আছে স্বরাঘাতবিধি, সন্ধির নিয়ম ইত্যাদি। অষ্টম অধ্যায়ের শেষ তিন পাদ-কে পাণিনি আলাদা করে রেখেছেন। অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদ থেকে অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম পাদ পর্যন্ত যেন একটা অংশ, আর অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ থেকে চতুর্থ পাদ পর্যন্ত যেন আর একটা অংশ। অষ্টম অধ্যায়ের শেষ তিন পাদে ব্যাকরণের নানা প্রসঙ্গ যেন আবার নতুন করে আলোচনা করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী বৈয়াকরণদের মতও এই সব প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদ থেকে অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম পাদ পর্যন্ত অংশে যেসব সূত্র আছে সেইসব সূত্রের মধ্যে সর্বদা পূর্বসূত্র অপেক্ষা পরবর্তী সূত্র অধিক বলবান অর্থাৎ যেখানে কোনো সূত্রের সঙ্গে পরবর্তী সূত্রের বিরোধ দেখা দেবে সেখানে পরবর্তী সূত্র গ্রহণীয় বিবেচিত হবে। কিন্তু অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ থেকে চতুর্থ পাদ পর্যন্ত যে অংশ তার মধ্যে কোনো পূর্ববর্তী সূত্র ও পরবর্তী সূত্রের

৯০। Goldstücker, Theodor : *Pāṇini. his place in Sanskrit Literature,* Reprint.

৯১। Chatterji, Dr. Suniti Kumar : *The Origin and Development of the Bengali Language,* London : George Allen Unwin Ltd., 1970, p. 50.

মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে পূর্বসূত্রই গ্রহণীয় বিবেচিত হবে অর্থাৎ পূর্ববর্তী সূত্রই অধিকতর বলবান বিবেচিত হবে। আবার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদ থেকে অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম পাদ পর্যন্ত যে অংশ তার কোনো সূত্রের সঙ্গে অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ থেকে চতুর্থ পাদ পর্যন্ত অংশের কোনো সূত্রের বিরোধ উপস্থিত হলে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদ থেকে অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম পাদ পর্যন্ত অংশের সূত্রই গ্রহণীয় হবে, অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ থেকে অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ পর্যন্ত অংশের সূত্র এক্ষেত্রে অধিকতর বলবান বিবেচিত হবে না।

পাণিনির ব্যাকরণের বিষয়-বিভাগ আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের মতো নয়। অনেক সময় একটি বিষয়ের কথা আলোচনা করতে গিয়ে পাণিনি সেই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিষয়ের আলোচনাও সেরে নিয়েছেন। যেমন তৃতীয় অধ্যায়ে কৃৎপ্রত্যয়ের কথা আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটা রূপতত্ত্বের (morphology) আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এই রূপতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে পাণিনি মাঝে-মাঝে (যেমন ৩/১/৩ সূত্রে স্বরাঘাতের কথাও আলোচনা করেছেন ; অথচ স্বরাঘাত (pitch accent) আধুনিক দৃষ্টিতে রূপতত্ত্বের মধ্যে পড়ে না, তা ধ্বনিতত্ত্বের (phonology) আলোচ্য বিষয়। আরো লক্ষণীয় এই যে, স্বরাঘাতের আলোচনা এখানেই শেষ হয় নি, পরে অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম পাদে ক্রিয়ার আলোচনা প্রসঙ্গে স্বরাঘাতের কথা আবার আলোচিত হয়েছে। তেমনি সন্ধিও আধুনিক দৃষ্টিতে ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু পাণিনি একে রূপতত্ত্বের বিভিন্ন প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করে রূপতত্ত্বের আলোচনার মাঝে-মাঝে বিন্যস্ত করেছেন। পাণিনির এই বিষয়-বিন্যাস আপাতদৃষ্টিতে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এটা পাণিনির আলোচনার ত্রুটি নয়, এটা তাঁর বিষয়বিন্যাসের নিজস্ব রীতি। বস্তুত রূপতত্ত্বের সঙ্গে ধ্বনিতত্ত্ব যেখানে যুক্ত (যেমন morpho-phonemic change) সেখানে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরাও রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের এই পার্থক্য সর্বত্র মেনে চলেন না। পাণিনির নিজস্ব বিন্যাসরীতি অপূর্ব এবং গ্রন্থের সংক্ষিপ্ততা ও সংহতির জন্যে এই বিন্যাসরীতিই ছিল অপরিহার্য।

পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে প্রায় চার হাজার সূত্রের সাহায্যে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করা হয়েছে। এই চার হাজার সূত্রের মধ্যে আড়াই হাজার সূত্র পাণিনির এবং বাকি দেড় হাজার কাত্যায়নের 'বার্তিক-সূত্র'। পাণিনির ব্যাকরণে সাত রকমের সূত্র আছে : (১) সংজ্ঞা (definition), (২) পরিভাষা (interpretation), (৩) বিধি (general rule), (৪) নিয়ম (particular rule), (৫) অধিকার (governing rule), (৬) অতিদেশ (extention

rule) এবং (৭) অপবাদ (exception) সূত্র। এই সব সূত্র পাণিনি এমন কৌশলে রচনা করেছেন এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, ব্যাকরণটি যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত ও সংহত হয়ে উঠেছে। এত বেশি সংক্ষিপ্ত হয়েছে যে, কেউ যদি চায় যে টীকা-ভাষ্যের সাহায্য না নিয়েই এই ব্যাকরণের সাহায্যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করবে, তবে তাকে নিরাশ হতে হবে। অধ্যাপক কীথ্ (Keith) ঠিকই বলেছেন—যারা সংস্কৃত ভাষা জানে না তাদের এই ভাষা শিক্ষা দেবার জন্যে পাণিনির ব্যাকরণ রচিত হয় নি। যারা সংস্কৃত ভাষা জানে ও ব্যবহার করে তাদের ভাষা-ব্যবহার যাতে নির্ভুল হয় তার জন্যেই পাণিনির ব্যাকরণ রচিত। এই ধরনের শিক্ষার্থীরা নির্ভুলভাবে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহারের জন্যে যাতে ব্যাকরণের সূত্রগুলি কণ্ঠস্থ করে রাখতে পারে প্রধানত সেই লক্ষ্য সামনে রেখে পাণিনির ব্যাকরণের সূত্রগুলি অতি সংক্ষিপ্ত আকারে রচনা করা হয়েছে। এই ব্যাকরণে যে সংক্ষিপ্ততা অর্জন করা হয়েছে তার পদ্ধতি সম্পর্কে অধ্যাপক কীথ্ এবং ড. বেল্‌ভাল্‌কর দু'জনেই স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছেন। পাণিনির এই পদ্ধতিগুলি সংক্ষেপে এই—পাণিনির ব্যাকরণে যেসব সূত্র রচনা করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রধান সূত্র (main-laws) (অধিকার সূত্র) এবং কতকগুলি উপ-সূত্র (sub-laws)। অধিকার সূত্রগুলি উপসূত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং প্রত্যেকটি উপসূত্রের সঙ্গে প্রধান সূত্র পাঠ্য। কিন্তু পাণিনি প্রত্যেক উপসূত্রের সঙ্গে বারবার প্রধান সূত্রগুলির পুনরাবৃত্তি করেন নি। কোনো বিষয়ের আলোচনায় তিনি একবার প্রধান সূত্র উল্লেখ করেছেন, তারপর ক্রমান্বয়ে তার অধীনস্থ উপ-সূত্রগুলিই শুধু উল্লেখ করে গেছেন। যেমন পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পাণিনি বলেছেন—'সুপ্‌তিঙন্তং পদম্' (১/৪/১৪)। অর্থাৎ যার শেষে সুপ্ (কারক-বিভক্তি) বা তিঙ্ (ক্রিয়া-বিভক্তি) যুক্ত হয়ে আছে তা-ই হল, 'পদ'। এই সূত্রটি একটি অধিকার সূত্র বা প্রধান সূত্র। তারপরে একটি উপসূত্রে বলা হয়েছে—'নঃ ক্যে' (১/৪/১৫) অর্থাৎ যেসব শব্দের শেষে 'ন্' আছে, সেগুলির সঙ্গে 'ক্য' (ক্যচ্, ক্যঙ্ ও ক্যশ্) যোগ করে যখন বিভক্তি যোগ করা হয় তখন সেগুলি পদ হয়ে উঠে। যেমন রাজন্ + ক্যচ্ = রাজীয়। রাজীয় + তি = রাজীয়তি।

এই যে প্রধান সূত্রের সঙ্গে 'পদম্' কথাটি আছে, ঐ কথাটি উপসূত্রের সঙ্গেও পাঠ্য। তাই ব্যাখ্যাকার উপসূত্রটি পূর্ণাঙ্গ করে লিখেছেন—নঃ ক্যে (পদম্)। কিন্তু পাণিনি প্রধান সূত্রের ঐ 'পদম্' কথাটি প্রত্যেকটা উপসূত্রের সঙ্গে বারবার পুনরাবৃত্ত করেন নি। এই যে অধিকার সূত্রের অংশ (যেমন এখানে 'পদম্') বারবার উপসূত্রের সঙ্গে ধরে নিতে হয় একে 'অনুবৃত্তি' বলে। অথচ এই অনুবৃত্তিটি উহ্য থাকে। এতে উপসূত্রটি সংক্ষিপ্ত হয়েছে।

উপরি-উক্ত সূত্রগুলি লক্ষ্য করলে পাণিনির ব্যাকরণের আরো একটি পদ্ধতি ধরা পড়বে। সূত্রগুলি তো এক-একটি বাক্য। কিন্তু সূত্রগুলিতে বাক্যের ক্রিয়া উহ্য রাখা হয়েছে। যেমন 'সুপ্‌তিঙন্তং পদম্' কিংবা 'নঃ ক্যে'—কোনো সূত্রেই ক্রিয়া নেই। বাংলায় ব্যাখ্যা করে অনুবাদ করতে হলে ক্রিয়াটি আমাদের যোগ করে নিতে হয়। যেমন প্রথম সূত্রের ক্রিয়া 'হল' (verb to be) এবং দ্বিতীয় সূত্রের ক্রিয়া 'হয়ে উঠে' (verb to become) বা ঐ ধরনের কোনো ক্রিয়া।

পাণিনির ব্যাকরণে সংক্ষিপ্ততা সাধনের জন্যে প্রায়ই যে কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে তা হল—সূত্রগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পুরো বাক্য ব্যবহার না করে শুধু কতকগুলি বর্ণের সাহায্যে সংক্ষেপে বীজগণিতের সূত্রের মতো প্রতীকধর্মী সূত্র রচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের প্রথমে উদ্ধৃত যে ১৪টি প্রত্যাহার-সূত্র আছে, যেগুলি পাণিনি শিবের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন বলে শিবসূত্র বা মাহেশ্বর সূত্র নামে পরিচিত, সেগুলি এই ধরনের বীজগাণিতিক সূত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—

১। অইউণ্, ২। ঋ৯ক্, ৩। এওঙ্, ৪। ঐঔচ্, ৫। হয়বরট্, ৬। লণ্, ৭। ঞমঙণনম্, ৮। ঝভঞ্, ৯। ঘঢধষ্, ১০। জবগডদশ্, ১১। খফছঠথচটতব্, ১২। কপয়্, ১৩। শষসর্, ১৪। হল্।

এই সূত্রগুলি পাণিনির ব্যাকরণের মূল চাবিকাঠি। কিন্তু এগুলি এতই সংক্ষিপ্ত যে প্রথম শিক্ষার্থীর কাছে এগুলি অর্থহীন ধ্বনিসমষ্টি (non-sense sounds) রূপে প্রতিভাত হবে। অথচ ব্যাখ্যা করে দিলে বোঝা যাবে এগুলি কত তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কৃত ধ্বনির প্রসঙ্গ সংক্ষেপে উল্লেখ করার জন্যে সূত্রগুলি খুব কাজে লাগে। অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয় এবং উপধ্ মানীয়কে বাদ দিলে ঐ সূত্রের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার সমগ্র বর্ণমালা বর্তমান রয়েছে। এবার এই সূত্রগুলির তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করা যাক। প্রথমে বলে রাখা দরকার, ব্যঞ্জনের মধ্যে যেখানে-যেখানে 'অ' যুক্ত হয়ে আছে সেখানে-সেখানে ঐসব 'অ' যোগ করা হয়েছে উচ্চারণের সুবিধার জন্যে, কারণ স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হয় না। সুতরাং সূত্রগুলি ব্যাখ্যার সময় ঐ সব 'অ' ধ্বনি বাদ দিয়ে নিতে হবে। যেমন—'কপয়্' সূত্রটি ধরতে হবে 'ক্ প্ য়্' রূপে। আবার প্রত্যেক সূত্রের শেষে যেসব ব্যঞ্জনবর্ণ (হসন্ত বর্ণ) আছে সেগুলি সূত্র ব্যাখ্যার সময় 'ইৎ' হয় অর্থাৎ সেগুলিকে বাদ দিয়ে নিতে হয়। এবার যে-কোনো সূত্রের প্রথম বর্ণ থেকে পরবর্তী যে-কোনো ইৎ-বর্ণ পর্যন্ত বললে এই দু'য়ের মধ্যবর্তী ধ্বনিসমূহকে বোঝাবে। যেমন—'অণ্' বললে বুঝতে হবে প্রথম সূত্রের প্রথম বর্ণ থেকে ঐ সূত্রের শেষে অবস্থিত ইৎ-বর্ণ (অর্থাৎ ণ্) এর আগে পর্যন্ত। অর্থাৎ 'অ ই উ'-কে সংক্ষেপে 'অণ্' বলা হয়েছে। তেমনি 'অক্' বললে বুঝতে হবে প্রথম সূত্রের প্রথম বর্ণ 'অ' থেকে দ্বিতীয় সূত্রের ইৎবর্ণ 'ক্'-এর আগে পর্যন্ত,

অর্থাৎ অ ই উ ঋ ৯—এতগুলি ধ্বনিকে সংক্ষেপে 'অক্' বলা যায়। তেমনি 'এচ্' বললে বোঝাবে তৃতীয় সূত্রের প্রথম থেকে চতুর্থ সূত্রের ইৎবর্ণ 'চ্'-এর আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ এ ও ঐ ঔ। এই সূত্রগুলির সাহায্যে পরে ব্যাকরণের মধ্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে পাণিনি বর্ণগুলিকে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। যেমন সন্ধির একটা সূত্রে বলেছেন—'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ'। আমরা জানি অ ই উ ঋ ৯—এতগুলি বর্ণকে সংক্ষেপে অক্ বলা হয়। সুতরাং সন্ধির ঐ সূত্রটির অর্থ হল অ ই উ ঋ ৯—এদের সমান স্বরের পর সমান স্বর থাকলে দীর্ঘ হয়। অর্থাৎ অ ই উ ঋ ৯—এদের মধ্যে অ-এর পরে অ থাকলে উভয়ে মিলে আ হবে, তেমনি ই-এর পরে ই থাকলে ঈ হবে ইত্যাদি। এই সমগ্র সূত্রটিতে অতগুলি স্বরবর্ণ (অ ই উ ঋ ৯)-কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল 'অকঃ' বলে। এসব প্রত্যাহার-সূত্র ছাড়া আরো অনেক সূত্র এরকম বীজগাণিতিক নিয়মে রচনা করেছেন পাণিনি। যেমন—ঘ, ষষ, লুক্, শ্লু, লুপ্ ইত্যাদি।

যেসব শব্দ ও ধাতু একই রকম নিয়ম অনুসরণ করে তাদের এক-একটি 'গণে' বিন্যস্ত করে পাণিনি 'গণ' অনুসারে সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। যেমন, সংস্কৃতের যেসব ধাতু এক রকম নিয়ম অনুসরণ করে এক রকম ক্রিয়ারূপ লাভ করে সেইসব ধাতুকে একটি 'গণে' বিন্যস্ত করা হয়েছে। এইভাবে সংস্কৃতের সমস্ত ধাতুকে ১০টি গণে ভাগ করা হয়েছে—ভ্বাদি, তুদাদি, দিবাদি, স্বাদি, ক্র্যাদি, রুধাদি, তনাদি, অদাদি, হ্বাদি, চুরাদি। যেসব ধাতুর রূপ 'ভু' ধাতুর মতো হয় তাদের ভ্বাদি-গণীয় বলে। তেমনি যেসব ধাতুর রূপ 'তুদ্' ধাতুর মতো হয় তাদের তুদাদি-গণীয় বলে। এইভাবে এক-একটি ধাতুর নাম ধরে সেই শ্রেণীর ধাতুগুলির গণের নাম করা হয়েছে। গণবিভাগের মূল কথাটুকু পাণিনি অষ্টাধ্যায়ীতে উল্লেখ করেছেন, এবং গণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাঁর 'গণপাঠ' গ্রন্থে। গণ অনুসারে সংস্কৃতের ধাতুগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করার ফলে প্রত্যেক গণের সব ধাতুর রূপ পৃথক্-পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করতে হয়নি, প্রত্যেক গণের নিয়ম উল্লেখ করে সেই গণের একটিমাত্র ধাতুর রূপ দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়। সেই গণের বাকি ধাতুগুলির রূপ সেই অনুসারে করলেই হয়। এই গণবিভাগের ফলেও পাণিনির ব্যাকরণ সংক্ষিপ্ত হতে পেরেছে।

পাণিনি বাক্যকে ভাষার প্রথম বৃহত্তম এককরূপে (unit) গ্রহণ করে ক্রমশ বিশ্লেষণ করে ক্ষুদ্রতর এককের দিকে এগিয়ে গেছেন। তিনি বাক্যের বিভিন্ন অংশ রূপে পদকে (parts of speech) স্বীকার করেছেন। পদের মধ্যে বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে ক্রিয়া। ক্রিয়ার যে মূল অংশ তা হল ধাতু। কিন্তু পাণিনির বিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্য হল ক্রিয়া ছাড়াও নামশব্দের বিশ্লেষণেও তার মূলে তিনি ধাতুই পেয়েছেন। পাণিনির ব্যাকরণের এই মূলনীতি বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক

কীথ্ (Keith) বলেছেন :

"The principle underlying the grammar is the derivation of nouns from verbs......All derivation is done by affixes, and, therefore, when the word agrees with the root-form of a verb, or one nominal form is the same as that whence it is derived, it is necessary to assume suffixes which are invisible, e. g. *'badara'* fruit of the *'badara'* tree."[৯২]

—পাণিনির মতে সব শব্দের মূলে একটি করে ক্রিয়ার ধাতু রয়েছে। অর্থাৎ সব শব্দই, এমন কি নামশব্দও ধাতু থেকেই নিষ্পন্ন। ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি বা প্রত্যয় যোগ করে বিভিন্ন শব্দের জন্ম হয়। যেখানে দেখা যায়, কোনো ধাতু থেকে জাত শব্দটি হুবহু ধাতুরই মতো সেখানে মনে করা হয় যে, ধাতুর সঙ্গে সেখানে শূন্য বিভক্তি যোগ করে শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। শব্দের মূলে ধাতুর এই তত্ত্বকে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা পাণিনির 'root theory' নামে অভিহিত করেছেন। এই তত্ত্বটি প্রথম প্রবর্তন করেন বৈয়াকরণ শাকটায়ন। কিন্তু তাঁর উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। তাঁর মতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। শাকটায়নের পরে যাস্কের 'নিরুক্তে' বিভিন্ন শব্দের যে ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়েছে তাতে ঐ তত্ত্বটিই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু যাস্কের ব্যুৎপত্তিগুলি ঐ মতবাদের দৃষ্টান্তসমূহ বলা যায়, ব্যাখ্যা বলা যায় না। পাণিনি বিভিন্ন সূত্র রচনা করে, ব্যাখ্যা দিয়ে এই মতবাদকে পরিপূর্ণ তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা দান করেন। শুধু তাই নয়, মূলত এই মতবাদের উপরে ভিত্তি করেই তিনি তাঁর পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করেন। এইজন্যে একে পাণিনির ব্যাকরণের মূল নীতি (underlying principle) বলা হয়েছে।

সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনায় পাণিনির পদ্ধতি হল এককালিক বর্ণনামূলক (synchronic/descriptive)। কারণ তিনি সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন কালের বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করেন নি, তার এককালের রূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এমন কি তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে গঠনসর্বস্বতাবাদী বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীর (structuralist) মতো ভাষার রূপ বিশ্লেষণ করেছেন অর্থের (meaning) সাহায্য না নিয়ে শুধু ভাষার গঠনের (structure) দিকে দৃষ্টি রেখে। যেমন, পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পাণিনি বলেছেন 'সুপ্‌তিঙন্তং পদম্' অর্থাৎ যার শেষে 'সুপ্' বা 'তিঙ্' যোগ হয় তাকে পদ বলে। এই যে বিশ্লেষণ এ হল পদের গঠনগত বিশ্লেষণ। অর্থাৎ পদ কি নিয়ে গঠিত হয় তা উল্লেখ

৯২। Keith, A. Berriedale : *A History of Sanskrit Literature,* 1973, p. 424.

করে এখানে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, পদের অর্থ বা ভাবের প্রসঙ্গ এখানে আনাই হয় নি। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে অর্থের সাহায্য নিয়েও কোনো-কোনো সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। যেমন, অব্যয়ীভাব সমাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে 'পূর্বপদার্থপ্রধানোহব্যয়ীভাবঃ'—অর্থাৎ পূর্বপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হলে অব্যয়ীভাব সমাস হয় ; কিংবা তৎপুরুষ সমাসের সংজ্ঞা হল—'উত্তরপদার্থপ্রধানস্তৎপুরুষঃ'—অর্থাৎ উত্তরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হলে তৎপুরুষ সমাস হয়। এখানে স্পষ্টত অর্থের (meaning) সাহায্য নিয়ে সংজ্ঞা রচনা করা হয়েছে। সুতরাং পাণিনির দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি গঠনসর্বস্বতাবাদীর (structuralist) নয়। বস্তুত পাণিনি ভাষার গঠন ও অর্থ উভয়কে সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কোনোটিকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে ভারসাম্য হারাননি। তাই পাণিনি পুরোপুরি গঠনসর্বস্বতাবাদী নন, কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী। কারণ, আগেই বলেছি, তিনি সংস্কৃত ভাষার এক কালের রূপ বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করেছেন। তিনি শুধু প্রাচীন ভারতের নন, সারা পৃথিবীর প্রথম বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী। এ দিক থেকে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ গুরুত্ব এই যে, পৃথিবীর এই প্রথম বর্ণনামূলক ব্যাকরণটি সংস্কৃতকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল। এ দেশের ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরাও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে পাণিনির এই অবদান ও সংস্কৃতের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন :

> "Sanskrit laid the foundation of comparative philology as well as of Descriptive Linguistics, the first descriptive Grammar of a language, being the Sanskrit Grammar of Pāṇini..."[৯৩]

শুধু এদেশের ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরাই নয়, পাশ্চাত্যের বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরাও পাণিনিকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়ে বলেছেন—পাণিনির ব্যাকরণ মানব-মনীষার একটি মহত্তম কীর্তিস্তম্ভ ('the grammar of Pāṇini...is one of the greatest monuments of human intelligence'[৯৪])। আর অতি আধুনিক কালের যাঁরা ভাষাবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক তাঁরা পাণিনির ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির গুরুত্ব স্বীকার করে এই ব্যাকরণকে

৯৩। Misra, Dr. S. S. : *A Comparative Grammar of Sanskrit, Greek and Hittite*, Calcutta : World Press Pvt. Ltd., 1968, p. 3.

৯৪। Bloomfield, Leonard : *Language*, Delhi : Motilal Banarasidass, 1963, p. 11.

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় রচিত প্রথম বৈজ্ঞানিক রচনা বলে উল্লেখ করেছেন ('the earliest scientific work in any Indo-European language'[৯৫])। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে পাণিনির ব্যাকরণের সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য দেশে পাণিনির ব্যাকরণের যে সংস্করণ ওটো ব্যোয়েট্‌লিঙ্ক (Otto Bōhlingk) প্রকাশ করেছিলেন তাতে ওদেশে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের জন্ম ত্বরান্বিত হয়েছিল। আর পরবর্তী বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীদের উপরে পাণিনির যে প্রভাব পড়েছিল তা তাঁদের পূর্বোদ্ধৃত স্বীকৃতি থেকেই প্রমাণিত হয়। শুধু বর্ণনামূলক ভাষবিজ্ঞানীই নয়, একেবারে আধুনিক রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ভাষাবিজ্ঞানী চম্‌স্কিও (Chomsky) পাণিনির ব্যাকরণে তাঁর নিজের অভিনব তত্ত্বের বীজ আবিষ্কার করেছেন।

> "What is more, it seems that even Panini's grammar can be interpreted as a fragment of such a 'generative grammar' in essentially the contemporary sense of this term."[৯৬]

চম্‌স্কির এই স্বীকৃতি পাণিনির প্রতি শুধু উচ্ছ্বাসপূর্ণ শ্রদ্ধা-নিবেদন নয়, এর মধ্যে যে তথ্যনির্ভর সত্যের উদ্‌ঘাটন রয়েছে তা পরবর্তী কালের গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন। পাণিনির ব্যাকরণে চম্‌স্কি-কথিত deep structure ও surface structure-এর তত্ত্বও আধুনিক অনুসন্ধানীরা পূর্বাভাসিত দেখেছেন।[৯৭]

পাণিনি যখন সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন তখন ভারতবর্ষে মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার যুগ সূচিত হয়েছে অর্থাৎ বৈদিক সংস্কৃত ভাষা তখন আর লোকমুখে বেঁচে নেই, ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে ঐ ভাষা থেকে প্রাকৃত ভাষার জন্ম হয়েছে এবং সাধারণ লোকে তখন প্রাকৃত ভাষাতেই কথা বলে। শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ('শিষ্ট') লোকেরাই তখন সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে। তৎকালীন

৯৫। Robins, Prof. R. H. : *A Short History of Linguistics*, Longmans, 1969, p. 144.

৯৬। Chomsky, Noam : *Aspects of the Theory of Syntax*, Massachusetts, The MIT Press, 1976, Preface, p. V.

৯৭। Subrahmanyam, S. P. : *'Deep Structure and Surface Structure in Panini' in Indian Linguistics,* Journal of the Linguistic Society of India, Vol, 36, No. 4, [Dec. 1975] p. 346.

ভারতের 'মধ্যদেশে'র (বর্তমান দিল্লি, মিরাট, মথুরা) শিক্ষিত লোকের মুখের ভাষাকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করে পাণিনি সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। এ ছাড়া পাণিনির নিজের জন্মস্থান ভারতের উত্তর-পশ্চিম (উদীচ্য) অঞ্চলের ভাষাও তাঁর সংস্কৃত ভাষার আদর্শ রূপ-পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। বৈদিক ভাষার যে যুগগত পরিবর্তন হয়ে আসছিল তাকে বিকৃতি মনে করে ব্যাকরণ রচনার দ্বারা এই ভাষার যেন সংস্কার সাধন করা হল, তাই এর পর থেকে এই ভাষার নাম হল 'সংস্কৃত' ভাষা। ব্যাকরণের বিধিবিধানে সংস্কৃত ভাষাকে বেঁধে দেওয়ার ফলে সংস্কৃত ভাষা ক্রমশ আরো কৃত্রিম হয়ে গেল। ফলে সাধারণ লোকের জীবন্ত ভাষা প্রাকৃত থেকে সংস্কৃত ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সংস্কৃতের প্রথম বিধিবদ্ধ ব্যাকরণ-রচয়িতা হিসাবে পাণিনির কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে, পাণিনির ব্যাকরণ রচনার ফলে সংস্কৃত ভাষা ক্রমশ কৃত্রিম হতে হতে মৃত ভাষায় পরিণত হল। জীবন্ত ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তনের গতিকে পাণিনি বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন, এর ফল সংস্কৃতের পক্ষে ভাল হয় নি। ব্যাকরণের কঠোরতা আরোপিত না হলে সংস্কৃত ভাষা হয়তো আরো কিছুদিন লোকমুখের ভাষারূপে বেঁচে থাকতে পারত। এ বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত হল :

"Pāṇini gave this new literary language a fixity for all time...As the distance between the vernaculars and this newly arisen Sanskrit grew greater and greater, the latter became an artificial language...Its grammar grew hide-bound, and prevented any change or growth that is characteristic of a living language."[৯৮]

সংস্কৃত ভাষার বিবর্তনের পক্ষে পাণিনির ব্যাকরণের প্রভাব এইভাবে ইতিহাসের প্রগতিশীল ধারার পরিপন্থী। এ ছাড়া পাণিনির ব্যাকরণের একটি ঘাটতির কথা উল্লেখ করেছেন জনৈক প্রবীণ ভাষাতত্ত্ববিদ্। তাঁর মতে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করতে গিয়ে তুলনামূলকভাবে তৎসম্পৃক্ত অন্য কোনো ভাষার উল্লেখ করেন নি পাণিনি। পাণিনি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। অর্থাৎ তিনি ইরানীয় এবং বিদেশাগত গ্রীকদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। কিন্তু সংস্কৃতের সঙ্গে ইরানীয় ও গ্রীক ভাষার যে গভীর সাদৃশ্য

৯৮। Chatterji, Dr. Suniti Kumar : *The Origin and Development of the Bengali Language,* London ; George Allen Unwin, 1970, pp. 51-52.

আছে তা তিনি লক্ষ্য করেন নি। অর্থাৎ তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনার সুযোগ পেয়েও পাণিনি তাকে কাজে লাগাতে পারেন নি।[৯৯] কিন্তু পাণিনির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ নিঃসংশয়ে গ্রহণীয় নয়। কারণ ভারতে গ্রীকদের আগমন সূচিত হয় আলেকজান্দারের ভারত-আক্রমণের পরে। আলেকজান্দার ভারত আক্রমণ করেন ৩২৭-২৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। কিন্তু পাণিনির আবির্ভাব যে তার পরবর্তী তা অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণিত হয় নি। বরং অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে ৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের আগেই পাণিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং তিনি তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করেন নি, এজন্যে অহেতুক সমালোচনায় উৎসাহিত হবার কারণ নেই। বরং প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ এবং পৃথিবীর প্রথম বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী পাণিনি যে অবদানটুকু রেখে গেছেন ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে তা-ই চিরস্মরণীয়।

পাণিনির পরে ভারতবর্ষে ব্যাকরণ-চর্চার ধারায় দীর্ঘকাল অনুর্বরতার পর্ব চলে। তারপরে ভারতীয় ব্যাকরণ-চর্চার ধারায় যে দু'জন উল্লেখযোগ্য মনীষীকে পাই তাঁদের নাম পাণিনির ব্যাকরণের ধারার সঙ্গেই যুক্ত। এঁরা হলেন কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি। এঁদের মধ্যে কাত্যায়ন মূলত পাণিনির বিরুদ্ধ-সমালোচনা করেছিলেন, অপরপক্ষে পতঞ্জলি পাণিনিকে সমর্থন করেছিলেন। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি—এই তিনজনকে ভারতীয় ব্যাকরণের তিন শ্রেষ্ঠ মনীষী ('মুনিত্রয়ঃ') বলে অভিহিত করা হয়। পাণিনির মূল রচনাটি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির সমালোচনা, সংশোধন, সংযোজন ও ভাষ্যের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

যদিও কথাসরিৎসাগরে কাত্যায়নকে পাণিনির সহপাঠী বলে উল্লেখ করা হয়েছে তবু আধুনিক গবেষকদের অধিকাংশের মতে কাত্যায়ন পাণিনির অনেক পরবর্তী। আমরা আগে বলেছি, পাণিনির আবির্ভাব-কাল খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দী। আর কাত্যায়নের আবির্ভাব-কাল বেলভালকরের মতে খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতাব্দী[১০০] এবং কীথের মতে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী।[১০১] মোটামুটিভাবে ধরে নিতে পারি যে, কাত্যায়ন খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতাব্দীতে কোনো এক সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

৯৯। Taraporewala, I. J. S. : *Elements of the Science of Language,* Calcutta University, 1962, pp. 427-28.

১০০। Belvalkar. S. K. : *An Account of the Existing Systems of Sanskrit Grammar,* Amritsar, 1980, p. 24.

১০১। Keith, A. Berriedale : *A History of Sanskrit Literature,* Delhi, 1973, p. 426.

কাত্যায়নের রচনার নাম 'বার্তিক'। এই রচনার প্রচ্ছন্ন মনোভাব থেকে বোঝা যায়, পাণিনির পরেও সংস্কৃত ভাষার যে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যাকরণেরও পরিমার্জনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই যুগগত প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পাণিনির ব্যাকরণের যেসব অংশ অচল সেগুলি সংশোধন করাই কাত্যায়নের 'বার্তিক'-সূত্র রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল। ফলে ব্যাকরণ সম্পর্কে একটি সুসঙ্গত নিজস্ব পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব রচনা করার চেয়ে পাণিনির ব্যাকরণের সমালোচনা ও সংশোধনেই কাত্যায়নের কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ। পাণিনির অনেক সূত্র তিনি বাতিল করে দিয়ে অনেকগুলি নিজস্ব সূত্র রচনা করেছেন। অবশ্য পাণিনির সব সূত্রের তিনি সমালোচনা করেন নি। পাণিনির মাত্র দেড় হাজার সূত্র তিনি সংশোধন করেছেন। বার্তিকের সূত্রগুলি কোথাও গদ্যে কোথাও পদ্যে রচিত। 'বার্তিক' ছাড়া কাত্যায়নের আরো রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়—'বাজসনেয়ি প্রাতিশাখ্য'। এতে শুক্ল যজুর্বেদের ভাষার ধ্বনি, বানান ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়। পাণিনির ব্যাকরণ থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও পাণিনির ব্যাকরণের বিরুদ্ধ-সমালোচনা থেকে অনেকে মনে করেন তিনি পাণিনীয় সম্প্রদায়ের বহির্ভূত ছিলেন। কথাসরিৎসাগরের উল্লেখ থেকে অনুমান করা হয় তিনি ঐন্দ্র সম্প্রদায়ের বৈয়াকরণ ছিলেন। পাণিনির ব্যাকরণের প্রসার ছিল আর্যাবর্তে অর্থাৎ উত্তর ভারতে। কিন্তু পতঞ্জলির উল্লেখ থেকে জানা যায় কাত্যায়ন দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসী ছিলেন। ভাসের নাটক থেকে অনুমান করা হয় দক্ষিণ ভারতে পাণিনির ব্যাকরণ থেকে পৃথক কোনো ব্যাকরণের প্রভাব ও প্রসার ছিল এবং ভাস সেই ব্যাকরণের আদর্শই অনুসরণ করেছিলেন। এই কারণে ভাসের নাটকে অনেক অপাণিনীয় প্রয়োগ চোখে পড়ে।

কাত্যায়নের ঠিক পরে আর যাঁরা ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন তাঁদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি পাওয়া যায় পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে', কিন্তু তাঁদের কারো স্বতন্ত্র রচনার সন্ধান পাওয়া যায় নি। কাত্যায়নের পরে যাঁদের ব্যাকরণ পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ হলেন পতঞ্জলি। কাত্যায়নের সঙ্গে পতঞ্জলির কালগত ব্যবধান অনেক। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে পতঞ্জলি তাঁর ব্যাকরণ 'মহাভাষ্য' রচনা করেন। গ্রন্থটি কোনো মৌলিক রচনা নয়, এটি পাণিনির ব্যাকরণের ভাষ্য এবং এই জাতীয় রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শুধু তাই নয়, পাণিনির সূত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রে অকারণে খণ্ডন করে কাত্যায়ন তাঁর বার্তিক সূত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পতঞ্জলি সেইসব ক্ষেত্রে কাত্যায়নের সূত্র খণ্ডন করে পাণিনির সূত্রকেই পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন। পাণিনির ব্যাকরণের এই ভাষ্যটি মূল ব্যাকরণের মতোই আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রত্যেক অধ্যায়ে রয়েছে চারটি পাদ। প্রত্যেক পাদ আবার বিভিন্ন আহ্নিকে বিভক্ত। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে

পাণিনীয় সম্প্রদায়ের ব্যাকরণ-ধারার চরম বিকাশ হয়েছিল। শুধু তাত্ত্বিক আলোচনাতেই নয়, রচনারীতিতেও 'মহাভাষ্য' ব্যাকরণের ধারায় অতুলনীয়। এর রচনারীতি এত আকর্ষণীয় ও প্রাঞ্জল যে যাঁরা নীরস ব্যাকরণ-চর্চায় অনুরাগী নন তাঁরাও এর রচনারীতিতে আকৃষ্ট হন। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ পাণিনির অনুরাগী পাঠক ছিলেন এবং পাণিনির ব্যাকরণের এই ভাষ্যগ্রন্থটির জীবন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন : "সংস্কৃতের দিকে দেখ দিকি। 'ব্রাহ্মণে'র সংস্কৃত দেখ, শবরস্বামীর 'মীমাংসাভাষ্য' দেখ, পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' দেখ, শেষ—আচার্য শঙ্করের ভাষ্য দেখ, আর অর্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ। এখুনি বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়।" (—'ভাববার কথা')। বিবেকানন্দ পাণিনির অনুরাগী পাঠক ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রচলিত অর্থে ভাষাবিজ্ঞানী ছিলেন না, একথা আমরা জানি, কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞালব্ধ ভাষাবোধ যে কত নির্ভুল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল তার প্রমাণ আমরা বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা থেকেই পাই। পতঞ্জলির রচনারীতির যে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন তিনি করেছেন তা বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্তের দ্বারা সমর্থিত হতে পারে। পতঞ্জলির ভাষারীতি সম্পর্কে বেলভালকরও অনুরূপ কথাই বলেছেন।

পতঞ্জলির পরে পাণিনীয় ব্যাকরণের ধারায় অবক্ষয় সূচিত হয়। পতঞ্জলি পর্যন্ত আমরা পেয়েছি মূল পাণিনীয় ব্যাকরণের মৌলিক সমালোচনা বা ভাষ্য। তাঁর পরে সূচিত হয় প্রধানত গতানুগতিক ভাষ্য বা ভাষ্যের ভাষ্য ও তস্য ভাষ্যের ধারা! মৌলিক চিন্তার বিকাশ বিশেষ দেখা যায় না। পতঞ্জলির পরে চন্দ্রগোমী যে ব্যাকরণ রচনা করেন তাতে তিনি পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির সংশোধন ও পরিমার্জনের চেষ্টা করেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ। তাই হিন্দু অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে তিনি সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনার চেষ্টা করেছিলেন (৪৭০ খ্রীঃ)। কিন্তু তাঁর ব্যাকরণ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নি।

চন্দ্রগোমীর পরে উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ হলেন ভর্তৃহরি। 'রাবণবধ' কাব্যের রচয়িতা ভর্তৃহরি এবং বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি যে একই ব্যক্তি সে বিষয়ে কেউ-কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে কবির নিজের একটি উক্তি থেকে সমস্যা সমাধানের কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কবি বলেছেন—'দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোহয়ং শব্দলক্ষণ-চক্ষুষাম্'। (রাবণবধ ২২/৩৩) অর্থাৎ ব্যাকরণে বিদগ্ধ ব্যক্তির কাছে এই কাব্য উজ্জ্বল দীপতুল্য, কিন্তু যার ব্যাকরণের জ্ঞান নেই তার কাছে এই কাব্য অন্ধের হাতে দর্পণের মতো। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ভর্তৃহরি তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থটিতে যেসব নিয়ম সূত্রবদ্ধ করেছিলেন তারই দৃষ্টান্ত তাঁর মহাকাব্যে তিনি সন্নিবিষ্ট করেছেন। বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি ও মহাকবি ভর্তৃহরি একই ব্যক্তি। ম্যাক্‌ডোনেলের মতে এই মহাকবির মৃত্যুকাল হল ৬৫১ খ্রীস্টাব্দ।

মোটামুটিভাবে সিদ্ধান্ত করা হয় ৪৯৫ থেকে ৬৪১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে ভর্তৃহরি তাঁর মহাকাব্যটি রচনা করেছিলেন। তা হলে তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থটিও এরই কাছাকাছি সময়ে রচিত। ভর্তৃহরির ব্যাকরণের নাম 'বাক্যপদীয়'। এই ব্যাকরণ গ্রন্থটির দু'টি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রথমত এটি পদ্যবন্ধে রচিত, দ্বিতীয়ত এতে ভাষার গঠনগত বিশ্লেষণের চেয়ে ভাষার দার্শনিক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের প্রবণতা বেশি। সংস্কৃত ব্যাকরণের ধারায় ভর্তৃহরির এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দীর্ঘকাল পরে বাংলার নব্যনৈয়ায়িক-গোষ্ঠী ভাষার যে দার্শনিক দিক আলোচনায় গভীর সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার সূচনা হয়েছিল ভর্তহরির ব্যাকরণে।

ভর্তৃহরির ব্যাকরণের প্রায় সমসাময়িক রচনা হল জয়াদিত্য ও বামন-রচিত 'কাশিকাবৃত্তি' (৬৫০ খ্রীঃ)। এই ব্যাকরণটি সচরাচর 'বৃত্তিসূত্র' নামে পরিচিত। এই বৃত্তিসূত্রের বিভিন্ন অধ্যায় যাঁরা রচনা করেছিলেন সেই জয়াদিত্য ও বামন দু'জনেই কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। এই বৃত্তিসূত্র হল পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রগুলির উদাহরণসহ বিস্তৃত ব্যাখ্যা। বর্তমানে পাণিনির ব্যাকরণ পাঠের পক্ষে এই ভাষ্যগ্রন্থটি অপরিহার্য বিবেচিত হয়। পরবর্তীকালে কাশিকাবৃত্তিরও দু'টি ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয়। একটি জিনেন্দ্রবুদ্ধি-রচিত 'কাশিকা-বিবরণ-পঞ্জিকা' বা 'কাশিকা-ন্যাস' (খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী) এবং অপরটি হরদত্ত রচিত 'পদমঞ্জরী' (খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী)। পাণিনির ধারার শেষ উল্লেখযোগ্য টীকাকার হলেন কাশ্মীরের বৈয়াকরণ কৈয়্যট (খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দী)। তাঁর টীকা গ্রন্থটির নাম 'প্রদীপ'। কৈয্যট নিজে স্বীকার করেছেন যে, তিনি ভর্তৃহরির আদর্শ অনুসরণ করেছেন। কিন্তু কৈয্যটের রচনাটি ভর্তৃহরির রচনার মতো দার্শনিক তত্ত্বপ্রধান নয়। এটি আসলে পতঞ্জলির মহাভাষ্যের টীকা। কৈষ্যটের গ্রন্থটি এক সময়ে বহুপঠিত গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় এর একাধিক টীকা গ্রন্থ থেকে। 'প্রদীপ' অবলম্বনে রচিত তিনটি টীকাগ্রন্থ প্রধান: নাগোজি ভট্ট-রচিত 'প্রদীপোদ্যত', নারায়ণ-রচিত 'বিবরণ' এবং ঈশ্বরানন্দ-রচিত টীকাগ্রন্থ।

এ পর্যন্ত পাণিনির ব্যাকরণের যে টীকা-ভাষ্য রচিত হয় তাতে দেখতে পাই যে মূল ব্যাকরণকে অবিকৃত অপরিবর্তিত রেখে তাকে বুঝিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে। কিন্তু এই টীকার টীকা, ভাষ্যের ভাষ্য জাতীয় রচনার ধারায় যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল আলোচনা ও বিশ্লেষণ সূচিত হয়েছিল তাতে মূল ব্যাকরণ থেকে তা অনেক দূরবর্তী হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে বিষয়ের প্রাঞ্জল পরিস্ফুটনের চেয়ে দুর্বোধ্যতাই প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়েছিল। এই অবস্থায় ব্যাকরণের চর্চা কূট বুদ্ধির নীরস কসরতে পর্যবসিত হয়েছিল। অন্যদিকে মুসলমান-আক্রমণে হিন্দুসংস্কৃতির বিপর্যয় সাধিত হয় এবং সংস্কৃতের পঠন-পাঠনের উৎসাহ কমে

আসে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সংস্কৃতের ব্যাকরণ সহজপাঠ্য করে তোলার জন্যে অনেকে পাণিনির ব্যাকরণকে নতুন কাঠামোতে বিষয়বস্তু অনুসারে ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করেন। এই জাতীয় রচনার মধ্যে প্রথম, হল বিমল সরস্বতীর 'রূপমালা' (খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী)। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রচনা হল রামচন্দ্রের 'প্রক্রিয়া-কৌমুদী' (খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী)। এবং এই ধারার শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত রচনা হল ভট্টোজি দীক্ষিতের 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' (১৬৩০ খ্রীঃ)। আধুনিক কালে পাণিনির ব্যাকরণ পাঠের অপরিহার্য সহায়ক-গ্রন্থ হল এই সিদ্ধান্তকৌমুদী। যুগের প্রয়োজন মিটিয়ে অন্যান্য বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাণিনিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ভট্টোজি দীক্ষিতের এই ব্যাকরণের ভূমিকা অদ্বিতীয়। ভট্টোজি দীক্ষিত নিজেই তাঁর সিদ্ধান্তকৌমুদীর দু'টি টীকা রচনা করেন, যেটি বিস্তৃত তার নাম 'প্রৌঢ়-মনোরমা' এবং যেটি সংক্ষিপ্ত তাঁর নাম 'বাল-মনোরমা'। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে তিনি পাণিনির ব্যাকরণটিকে নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছিলেন যুগের প্রয়োজনে। কিন্তু তিনি তাঁর আর একটি রচনায় পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর একটি সুবিস্তৃত ভাষ্য রচনা করেছিলেন, তার নাম 'শব্দকৌস্তুভ'। এই রচনাটি তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি এবং এটি তেমন জনপ্রিয়তাও লাভ করে নি। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তকৌমুদীই বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং তার একাধিক টীকা রচিত হয়েছিল। এই সব টীকার মধ্যে জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী রচিত 'তত্ত্ববোধিনী' সবচেয়ে পরিচিত। কিন্তু এই টীকার একটি অপূর্ণতা ছিল। টীকাকার স্বর ও বৈদিকী প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেন নি। পরে জয়কৃষ্ণ এই দু'টি বিষয় অবলম্বনে একটি স্বতন্ত্র টীকাগ্রন্থ রচনা করেন।

ভারতবর্ষে ব্যাকরণ-চর্চার ধারায় পাণিনীয় সম্প্রদায়ের প্রভাব এবং প্রসারই সবচেয়ে বেশি। এ পর্যন্ত আমরা যে ব্যাকরণ-চর্চার ধারার কথা আলোচনা করলাম তা প্রধানত পাণিনীয় ধারা। এই পাণিনীয় ধারা ছাড়া অন্য কয়েকটি বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ও ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই সব সম্প্রদায়ের ব্যাকরণ রচনার দৃষ্টিভঙ্গি, আলোচনার পদ্ধতি ও পরিভাষার ক্ষেত্রে পারস্পরিক পার্থক্য রয়েছে। এক-এক সম্প্রদায়ের যিনি প্রধান বৈয়াকরণ বা প্রবক্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর নাম অনুসারেই ঐ সম্প্রদায়ের নামকরণ করা হয়েছে। পাণিনীয় সম্প্রদায় ছাড়া অন্য যে-সব বৈয়াকরণ-সম্প্রদায় ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তাদের মধ্যে কয়েকটি প্রধান সম্প্রদায় হল—

ঐন্দ্র সম্প্রদায় : অপাণিনীয় বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হল ঐন্দ্র সম্প্রদায়। এমন কি এই সম্প্রদায় পাণিনিরও পূর্ববর্তী। আমরা আগেই

বলেছি কৃষ্ণযজুর্বেদে (৬/৪/৭) উল্লিখিত আছে যে, ইন্দ্র প্রথম ভাষাকে ব্যাকৃত অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট করেছিলেন এবং সেই জন্যে ইন্দ্র হলেন প্রথম বৈয়াকরণ। এই প্রসঙ্গ থেকে ঐন্দ্র সম্প্রদায়ের সূচনা। পাণিনি তাঁর যেসব পূর্বসূরির কথা বলেছেন তাঁদের মধ্যে আপিশলি ও কাশকৃৎস্নকে কেউ-কেউ ঐন্দ্র সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মনে করেন। কিন্তু পাণিনির নিজের লেখায় এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় না। এমন কি, পাণিনি নিজে কোথাও 'ঐন্দ্র' নামটি উল্লেখ করেন নি। আগে আমরা যে কাত্যায়নের কথা উল্লেখ করেছি তিনি পাণিনির বিরুদ্ধ-সমালোচক ছিলেন বলে অনেকে তাঁকে ঐন্দ্র সম্প্রদায়ের উত্তরসাধক মনে করেন। পতঞ্জলি তাঁকে দক্ষিণভারতীয় বৈয়াকরণ বলে উল্লেখ করেছেন। দক্ষিণভারতেই ঐন্দ্র সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা ছিল সবচেয়ে বেশি এবং দক্ষিণভারতীয় দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাগুলির ব্যাকরণে ঐন্দ্র ব্যাকরণের উত্তরাধিকার লক্ষ্য করা যায়।

চান্দ্র সম্প্রদায় : চন্দ্রগোমীর রচিত 'চান্দ্র ব্যাকরণে' (খ্রীস্টীয় ৫ম শতাব্দী) এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তন হয়। ভর্তৃহরির 'বাক্যপদীয়' ব্যাকরণে চান্দ্র সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণিনির ব্যাকরণের বৈদিক স্বরাঘাত ও অন্য কিছু-কিছু প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে চন্দ্রগোমী ব্যাকরণকে সংক্ষিপ্ত করেন এবং অনেকটা নতুন করে বিন্যস্ত করেন। পাণিনির ব্যাকরণে যেখানে চার হাজার সূত্র ছিল সেখানে চন্দ্রগোমীর ব্যাকরণে প্রায় তিন হাজার সূত্র পাই। পাণিনির ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ততা সাধন ও পুনর্বিন্যাসই চান্দ্র গোষ্ঠীর বৈয়াকরণদের মূল বৈশিষ্ট্য। খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকে অনুলিখিত চান্দ্র ব্যাকরণের একটি পূর্ণাঙ্গরূপ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তিব্বত, চীন, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধদের মধ্যে চান্দ্র ব্যাকরণ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং তার একাধিক টীকা রচিত হয়েছিল।

জৈনেন্দ্র সম্প্রদায় : জৈনদের ধর্মগুরু শেষ তীর্থঙ্কর জিন বা মহাবীরকে জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের আদি রচয়িতা বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু ঐ ব্যাকরণের যেসব পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় ঐ ব্যাকরণের রচয়িতা ছিলেন দেবনন্দী (পূজ্যপাদ)। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মূল জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ রচিত হয়। এই ব্যাকরণের মৌলিকতা বিশেষ কিছু নেই। পাণিনীয় ব্যাকরণকে সংক্ষিপ্ত করাই জৈনেন্দ্র ব্যাকরণেরও উদ্দেশ্য ছিল। এখন জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের দু'টি রূপ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত রূপটি অভয় নন্দী রচিত, আর অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত রূপটি সোমদেবের রচনা। দ্বিতীয়টির নাম 'শব্দার্ণবচন্দ্রিকা'।

শাকটায়ন সম্প্রদায় : যাস্কের নিরুক্তে ও পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে শাকটায়ন নামে একজন বৈয়াকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় ; কিন্তু তাঁর রচনাবলীর কোনো নিদর্শন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সেই প্রাচীন শাকটায়ন এই শাকটায়ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নন। একজন অভিনব শাকটায়ন আমাদের আলোচ্য শাকটায়ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। অধ্যাপক পাঠকের মতে এই অভিনব শাকটায়নের জীবনকাল হল খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দী।[১০২] তিনি জৈন শাকটায়ন নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'শব্দানুশাসন'। এ ছাড়া তিনি আরো কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যেমন—'অমোঘবৃত্তি', 'পরিভাষাসূত্র', 'গণপাঠ', 'ধাতুপাঠ', 'উনাদিসূত্র', 'লিঙ্গানুশাসন' ইত্যাদি। শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ে তাঁর ব্যাকরণের প্রতিষ্ঠা ছিল সবচেয়ে বেশি। শাকটায়নের শব্দানুশাসন ব্যাকরণে পূর্ববর্তী বৈয়াকরণ পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, চন্দ্রগোমী এবং পূজ্যপাদের ব্যাকরণের বিষয়বস্তু নতুন করে সাজিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপিত করা হয়েছে ; এমন কি কোথাও-কোথাও পাণিনির সূত্রের হুবহু পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। সুতরাং এই বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের মৌলিক অবদান কিছু চোখে পড়ে না।

হেমচন্দ্র সম্প্রদায় : জৈনদের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ মনীষী হেমচন্দ্র এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। হিন্দু বৈয়াকরণদের মধ্যে যেমন পাণিনি, জৈনদের মধ্যে তেমনি হেমচন্দ্র। ১০৮৮ খ্রীস্টাব্দে ধুন্দুকা গ্রামে (বর্তমান আমেদাবাদের কাছে) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে তিনি জৈনধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপরে তিনি ধর্মশাস্ত্র ও জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন গ্রন্থ গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন। তিনি ব্যাকরণ-গ্রন্থ ছাড়াও যোগশাস্ত্র বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত ব্যাকরণ-গ্রন্থটি যদিও সংক্ষেপে 'শব্দানুশাসন' বা 'সিদ্ধহেম-শব্দানুশাসন' নামে পরিচিত, তবু তার আসল নাম হল 'সিদ্ধহেমচন্দ্রাভিধস্বো পঞ্চশব্দানুশাসন'। গ্রন্থটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে প্রায় সাড়ে চার হাজার সূত্র আছে। এর শেষ অধ্যায়ে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ পাওয়া যায়, অন্য অধ্যায়গুলি সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ। হেমচন্দ্র পূর্ববর্তী বৈয়াকরণদের বিষয়বস্তুই একত্রিত করে বিন্যস্ত করেছেন, বিশেষ করে শাকটায়নের ব্যাকরণের তিনি ব্যাপক অনুসরণ করেছেন। হেমচন্দ্র নিজেই তাঁর ব্যাকরণের একটি টীকা রচনা করেছিলেন, নাম 'শব্দানুশাসন-বৃহদ্বৃত্তি'। 'বৃহদ্বৃত্তি ঢুণ্ঢিকা' নামে এর আর একটি টীকা পাওয়া

১০২। Vide : *Indian Antiquary,* October, 1914.

যায়। কিন্তু তার লেখক ধনচন্দ্র অথবা জীনসাগর তা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না, কারণ এক-একটি পাণ্ডুলিপিতে এক-একজন লেখকের নাম আছে।

কাতন্ত্র সম্প্রদায় : পাণিনীয় সম্প্রদায়ের বাইরে ভারতবর্ষে যে সব বৈয়াকরণ সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে বাংলায় ও কাশ্মীরে সব চেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল কাতন্ত্র সম্প্রদায়ের ব্যাকরণ। কারণ জনসাধারণের ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এই ব্যাকরণকে করা হয়েছিল সবচেয়ে সরল ও সংক্ষিপ্ত। উত্তরকালের ভাষ্যকারেরা উল্লেখ করেছেন কাতন্ত্র কথার অর্থই হল সংক্ষিপ্ত আলোচনা। কাতন্ত্র ব্যাকরণের আরো দু'টি নাম হল 'কৌমার' ও 'কলাপ' ব্যাকরণ। এই নামকরণ সম্পর্কে প্রচলিত গল্পে বলা হয়েছে, দক্ষিণ ভারতের রাজা সাতবাহন একদিন যখন রানীর সঙ্গে জলকেলি করছিলেন সেই সময় রানী তাঁকে বলেন 'মোদক দেহি রাজন্'। তাতে রাজা মনে করেন, রানী 'মোদক' নামক মিষ্টান্ন দ্রব্য চাইছেন এবং তিনি রানীকে একটি মোদক দান করেন। কিন্তু একটু পরেই তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তিনি বুঝতে পারেন 'মোদক' মানে 'মা উদক'। অর্থাৎ রানী বলতে চেয়েছেন 'আর জল দিও না'। সংস্কৃত ভাষায় নিজের অজ্ঞতার কথা ভেবে রাজা লজ্জিত হন এবং নিজের পণ্ডিত শর্ববর্মাকে বলেন তাঁকে সংক্ষেপে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখিয়ে দিতে। তখন শর্ববর্মা শিবের কৃপা প্রার্থনা করেন। শিব তাঁর পুত্র কার্তিকেয় বা কুমারকে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে বলেন। কুমার তখন এই ব্যাকরণের সূত্রগুলি দান করেছিলেন বলে একে কৌমার ব্যাকরণ বলে। আবার কুমারের বাহন কলাপী (ময়ূর) এই ব্যাকরণ পৌঁছে দিয়েছিল বলে এই ব্যাকরণকে কলাপ ব্যাকরণও বলা হয়। এই গল্পটি কাল্পনিক উপকথা হলেও এতে কাতন্ত্র ব্যাকরণের মূল বৈশিষ্ট্যটিই প্রকাশ পেয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য হল এর সংক্ষিপ্ততা ও সহজগম্যতা। পাণিনীয় ব্যাকরণের জটিলতা বাদ দিয়ে কাতন্ত্র ব্যাকরণে মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলি নতুন করে বিন্যস্ত করা হয়েছিল। মূল কাতন্ত্র ব্যাকরণ বহুকাল পূর্বে শর্ববর্মা রচনা করেছিলেন। তারপরে দুর্গাসিংহ তার যে টীকা রচনা করেন তার নাম 'বৃত্তি' (খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দী)। এই 'বৃত্তি'র একটি টীকা রচনা করেন বর্ধমান (খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে)। আবার এই টীকার টীকা রচনা করেন পৃথ্বীধর। কাতন্ত্র ব্যাকরণ পূর্ববঙ্গে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

সারস্বত সম্প্রদায় : সারস্বত সম্প্রদায় অন্যান্য বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ের তুলনায় অর্বাচীন। খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে যখন মুসলমান সম্রাটরা এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে উদয়পুরের হিন্দু রাজারা সংস্কৃত চর্চায় নতুন করে উদ্দীপনা সঞ্চার

করেন তখন সহজ করে সংস্কৃত শিক্ষাদান করার জন্যে সারস্বত ব্যাকরণের প্রসার ঘটে। প্রধানত উত্তর-ভারত ও বঙ্গদেশে এই ব্যাকরণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই ব্যাকরণের মূল বৈশিষ্ট্যই হল সংক্ষিপ্ততা। মাত্র ৭০০ সূত্রের সাহায্যে সংস্কৃত ব্যাকরণের নানা দিক এই সারস্বত ব্যাকরণে আলোচিত হয়েছে। সারস্বত ব্যাকরণের বার্তিকগুলির মূল রচয়িতা অনুভূতি-স্বরূপাচার্য। লোকবিশ্বাস অনুসারে তিনি দেবী সরস্বতীর কাছ থেকে তাঁর ব্যাকরণের সূত্রগুলি লাভ করেছিলেন বলে এই সম্প্রদায়ের নাম সারস্বত সম্প্রদায়। অনুভূতি-স্বরূপাচার্যের ব্যাকরণের নাম 'সারস্বত প্রক্রিয়া' (খ্রীস্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী)। পরবর্তী কালে পুঞ্জরাজ, অমৃতভারতী, ক্ষেমেন্দ্র, চন্দ্রকীর্তি, মাধব, বাসুদেব ভট্ট, মণ্ডন, ধনেশ্বর, জগন্নাথ প্রভৃতি অনেকেই সারস্বত ব্যাকরণের টীকা রচনা করেছিলেন।

মুগ্ধবোধ সম্প্রদায় : অপাণিনীয় শাখার ব্যাকরণে যে সরলীকরণের প্রবণতা দেখা যায় তাতে আর একধাপ অগ্রগতি সাধন করেন বোপদেব তাঁর 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণে (ত্রয়োদশ শতাব্দী)। তিনি ব্যাকরণের পরিভাষা ব্যাখ্যায় দেবদেবীর প্রসঙ্গ (যেমন হর, হরি, রাম) ব্যবহার করেছেন। বোপদেব মহারাষ্ট্রের দৌলতাবাদের অধিবাসী ছিলেন। এই ব্যাকরণের যাঁরা ভাষ্য রচনা করেন তাঁদের মধ্যে রাম তর্কবাগীশ ও দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ বিশেষ পরিচিত। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের প্রসার ঘটেছিল পশ্চিমবঙ্গে।

জৌমর সম্প্রদায় বা সংক্ষিপ্তসার সম্প্রদায় : বৈয়াকরণ ক্রমদীশ্বর তাঁর ব্যাকরণ 'সংক্ষিপ্তসার' রচনা করে এই ধারার প্রবর্তন করেন (খ্রীঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী)। এই ধারার উত্তরসূরি জুমর নন্দীর নামে এই সম্প্রদায়ের নাম হয়েছে জৌমর সম্প্রদায়। ভর্তৃহরির ব্যাকরণের আদর্শে ক্রমদীশ্বর তাঁর ব্যাকরণটি রচনা করেছিলেন এবং তাঁরই কাব্য থেকে উদাহরণগুলিও আহরণ করেছিলেন। হেমচন্দ্রের ব্যাকরণের মতো এই ব্যাকরণের প্রথম সাতটি অধ্যায়ে সংস্কৃত ও শেষ অধ্যায়ে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ রচিত হয়েছে। এই ব্যাকরণ বিশেষ প্রসার লাভ করে নি।

সৌপদ্ম সম্প্রদায় : পদ্মনাভ দত্ত খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে তাঁর 'সুপদ্ম ব্যাকরণ' রচনা করার পর থেকে এই সম্প্রদায়ের সূচনা হয়। এই ধারাও বিশেষ প্রসাার লাভ করেনি।

বিভিন্ন বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ের উপরি-উক্ত ব্যাকরণগুলি ছাড়া আরো কয়েকটি ব্যাকরণ ধর্মীয় আচার্যদের দ্বারা রচিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি

ব্যাকরণ হল—'হরিনামামৃত'—রূপগোস্বামী (ষোড়শ শতাব্দী) এবং 'হরিনামামৃত'—জীবগোস্বামী।

নব্যন্যায় সম্প্রদায় : এ পর্যন্ত যেসব ব্যাকরণের কথা আলোচনা করা হল, সেগুলির মধ্যে দু'একটি ব্যাকরণে ভাষার গঠনগত বিশ্লেষণকে গৌণ করে দিয়ে দার্শনিক তত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করেছে। সেগুলির কথা আগেই বলা হয়েছে। ভট্টোজি দীক্ষিতের ভ্রাতুষ্পুত্র কোণ্ডভট্ট এই ধারার অনুসরণে 'বৈয়াকরণ-ভূষণ' ও 'বৈয়াকরণ-ভূষণসার' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থ দুটিতেও ব্যাকরণের দার্শনিক দিক আলোচিত হয়েছে। ভাষার দার্শনিক আলোচনার চরম বিকাশ হয় নবদ্বীপে নব্যন্যায় সম্প্রদায়ের আলোচনায়। খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে গঙ্গেশ যে 'তত্ত্বচিন্তামণি' রচনা করেন তাতে এই নব্যনৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই ধারার দুই পরবর্তী লেখক জগদীশ ও গঙ্গাধর। জগদীশ তর্কালঙ্কারের 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা (ষোড়শ শতাব্দী) ও গঙ্গাধরের 'ব্যুৎপত্তিবাদ' (সপ্তদশ শতাব্দী) গ্রন্থে শব্দার্থতত্ত্ব এবং ভাষার নানা কূট দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

প্রাকৃত ও পালি ব্যাকরণ : খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার কাল সূচিত হয়। বৈদিক সংস্কৃত থেকে ক্রমবিবর্তনের ফলে প্রাকৃত ভাষার জন্ম হয়। এবং প্রাকৃতের বিভিন্ন উপাদান মিশ্রিত করে তা থেকে বৌদ্ধদের ধর্মসাহিত্যের জন্যে একটি কৃত্রিম ভাষা তৈরি করা হয় যার নাম 'পালি'। ক্রমে প্রাকৃত ও পালি ভাষায় সাহিত্যচর্চা হতে থাকলে এই ভাষাগুলির ব্যাকরণ রচনারও সূত্রপাত হয়। ইতিপূর্বে আমরা হেমচন্দ্র-রচিত 'সিদ্ধহেম শব্দানুশাসন' (খ্রীস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী) গ্রন্থের উল্লেখ করেছি। এই গ্রন্থের সাতটি অধ্যায়ে সংস্কৃত ও একটি অধ্যায়ে প্রাকৃত ব্যাকরণ আলোচিত হয়েছে। এছাড়া খ্রীস্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত ক্রমদীশ্বরের 'সংক্ষিপ্তসার' ব্যাকরণেরও সাতটি অধ্যায়ে সংস্কৃত এবং একটি অধ্যায়ে প্রাকৃত ব্যাকরণ স্থান পেয়েছে। পূর্ণাঙ্গ প্রাকৃত ব্যাকরণগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হল বররুচির 'প্রাকৃত-প্রকাশ' (খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী)। এই ব্যাকরণটি বারোটি অধ্যায়ে সমাপ্ত। এতে বররুচি মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী প্রধানত এই চারটি সাহিত্যিক প্রাকৃতের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। বররুচির ব্যাকরণ এত প্রসার লাভ করেছিল যে, এর অনেকগুলি টীকা রচিত হয়েছিল। যেমন, ভামহের 'মনোরমা', কাত্যায়নের 'প্রাকৃত-মঞ্জরী', বসন্তরাজের 'প্রাকৃত-সঞ্জীবনী', সদানন্দের 'সুবোধিনী' ইত্যাদি। ত্রিবিক্রম-রচিত 'প্রাকৃত ব্যাকরণে' (খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী) নানা প্রকারের প্রাকৃত সম্পর্কে আলোচনা করা

হয়েছে। লক্ষ্মীধর নামে একজন বৈয়াকরণ 'ষড়্‌ভাষা-চন্দ্রিকা' (খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী) নামক গ্রন্থে ছ' রকমের প্রাকৃতের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে অপ্পয় দীক্ষিত একটি প্রাকৃত ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন, তার নাম 'প্রাকৃত-মণিদীপ'। সপ্তদশ শতাব্দীতে মার্কণ্ডেয় নামে আরো একজন প্রাকৃত বৈয়াকরণ 'প্রাকৃতসর্বস্ব' গ্রন্থে ১৬ রকমের প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রাকৃতের আরো দু'টি ব্যাকরণ হল রাম তর্কবাগীশের 'প্রাকৃত-কল্পতরু' এবং পুরুষোত্তমের 'প্রাকৃতানুশাসন'। ধনপাল-রচিত 'পাইঅলচ্ছী-নামমালা' গ্রন্থে বিভিন্ন প্রাকৃত শব্দের প্রতিশব্দ এবং হেমচন্দ্র রচিত 'দেশী নামমালা'য় দেশি শব্দের তালিকা পাওয়া যায়। এ দু'টিকে ঠিক ব্যাকরণ না বলে অভিধান বা কোষগ্রন্থের ধারায় স্থান দেওয়া উচিত।

প্রাকৃতের মতো পালি ভাষারও অনেকগুলি ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল। সুভূতির 'নামমালা' গ্রন্থের ভূমিকায় অন্যূন পঞ্চাশটি পালি ব্যাকরণের উল্লেখ পাই। এই সব ব্যাকরণের মধ্যে তিনটি ব্যাকরণ প্রধান—কচ্চায়ন, মোগ্‌গল্‌লায়ন ও সদ্দনীতি। এইগুলির মধ্যে কালের বিচারে প্রাচীনতম হল কচ্চায়ন ব্যাকরণ। অনেকে মনে করেন বুদ্ধদেবের শিষ্য মহাকচ্চায়নই হলেন এই বৈয়াকরণ কচ্চায়ন। তা যদি সত্য হয় তবে কচ্চায়ন ব্যাকরণের রচনাকাল খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী বলে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু পালি-বিশেষজ্ঞ গাইগার্‌ মনে করেন বুদ্ধশিষ্য মহাকচ্চায়ন এবং বৈয়াকরণ কচ্চায়ন একই ব্যক্তি নন।[১০৩] কচ্চায়নের ব্যাকরণ খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। কচ্চায়নের ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসৃতি রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন "কচ্চায়ন ব্যাকরণের বহু সূত্র অষ্টাধ্যায়ী ও কাতন্ত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। ...কচ্চায়ন ব্যাকরণ অবশ্যই সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে রচিত, কিন্তু সংস্কৃতের সঙ্গে পালির যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক সেদিকে এই ব্যাকরণে বিশেষ আলোকপাত করা হয়নি।"[১০৪] বিমলবুদ্ধি কচ্চায়ন ব্যাকরণের যে টীকা রচনা করেন তা 'ন্যাস' বা 'মুখমত্থ-দীপনী' নামে পরিচিত। কচ্চায়নের ধারা অনুসরণ করে উত্তরকালে যেসব ব্যাকরণ রচিত হয় তাদের মধ্যে বুদ্ধপ্পিয় দীপঙ্কর-রচিত 'রূপসিদ্ধি', ধম্মকিত্তি-রচিত 'বালাবতার' উল্লেখযোগ্য।

মোগ্‌গল্লায়ন তাঁর মোগ্‌গল্‌লায়ন-ব্যাকরণ রচনা করেন খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। গ্রন্থকার নিজেই এর একটি টীকা রচনা করেছিলেন, তার নাম 'মোগ্‌গল্‌লায়ন পঞ্জিকা'। মোগ্‌গল্‌লায়ন ব্যাকরণেও পাণিনীয়, কাতন্ত্র ও চান্দ্র

১০৩। Geiger, Wilhelm : *Pali Literature and Language*, p. 37.

১০৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ বিশ্বনাথ : 'পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস,' কলকাতা, ১৩৭৯, পৃঃ ১১৬-১১৭

ব্যাকরণের প্রভাব আছে। এই ধারার পরবর্তী ব্যাকরণ হল পিয়দস্‌সির 'পদসাধনা' এবং রাহুলের 'পদসাধন-টীকা'।

'সদ্দনীতি' ব্যাকরণের রচয়িতা অগ্‌গবংস। পালি ভাষার যতগুলি ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল তাদের মধ্যে 'সদ্দনীতি' সর্বশ্রেষ্ঠ। এই ব্যাকরণের রচনাকাল খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী। এই গ্রন্থটি প্রধানত ব্রহ্মদেশে প্রচলিত ছিল।

সবশেষে বলতে পারি, ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় প্রাচীন ভারতের অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দর্শনের বা সাহিত্যের ইতিহাসে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা ভারতের অবদানের কথা সাধারণত উল্লেখ করেন না। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য মনীষীদের রচিত এমন কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ চোখে পড়ে নি যাতে ভারতের কথা—বিশেষত বৈয়াকরণ পাণিনি ও সংস্কৃত ভাষার কথা—উল্লিখিত হয় নি। ভাষাবিজ্ঞানের যে দু'টি ধারা—ঐতিহাসিক (historical or diachronic) ও বর্ণনামূলক (descriptive or synchronic)—তাদের উভয়ক্ষেত্রেই ভারতের ভূমিকা দু'দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। পাণিনিকে পাশ্চাত্যের মনীষীরাই বিশ্বের প্রথম বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী বলে স্বীকার করেছেন। আর ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সংস্কৃত ভাষা যুক্ত হবার ফলেই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (comparative philology) ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় রয়্যাল্‌ এশিয়াটিক্‌ সোসাইটিতে স্যর্‌ উইলিয়াম্‌ জোন্‌স্‌ (Sir William Jones) সংস্কৃতকে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে যে ভাষণ দেন তাতেই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। সুতরাং, কি বর্ণনামূলক, কি ঐতিহাসিক, কোনো ভাষাবিজ্ঞানেই ভারতবর্ষের কথা বাদ দেওয়া যায় না। এমনকি অতি আধুনিক রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণের (Transformational Generative Grammar) বীজও চম্‌স্কি পাণিনির ব্যাকরণে আবিষ্কার করেছেন, সেকথা আমরা আগে বলেছি।

প্রাচীন ভারতে ভাষাবিজ্ঞানের যে সমৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল তা বিকাশ লাভ করেছিল প্রধানত ব্যাকরণ-চর্চার মাধ্যমে। অবশ্য এই ব্যাকরণের ধারায়—বিশেষত পাণিনির ব্যাকরণে—বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতিও বিস্ময়কর সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। তার পরে কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির রচনায় ব্যাকরণের ধারা আরো সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিপুষ্টি লাভ করে। কিন্তু তারপরে ভারতবর্ষে ব্যাকরণের যে চর্চা হয় তাতে মূল প্রবণতা ছিল ব্যাকরণকে সহজ করে সংক্ষিপ্ত করে উপস্থাপিত করা আর প্রধান-প্রধান ব্যাকরণ-গ্রন্থগুলির টীকা, টীকার টীকা, টীকার টীকার টীকা ইত্যাদি রচনা করার দিকে। সুতরাং পাণিনি-কাত্যায়ন-পতঞ্জলির পরে ভারতবর্ষে ব্যাকরণের চর্চা সংখ্যায় ও সম্প্রদায়ে বেড়েছে, কিন্তু সৃজনশীলতা ও মৌলিকতায় ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে গেছে।

বঙ্গদেশে ভাষাবিজ্ঞান-চর্চা :

ভাষাবিজ্ঞান-চর্চায় প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব যা-ই থাক না কেন, মধ্যযুগের শেষে ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা ভারতবর্ষে অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে আসে। নবযুগে ভাষাবিজ্ঞান-চর্চায় ভারতের লুপ্ত গৌরব আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করে ; এবং এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে অবিভক্ত বঙ্গদেশ। এখানকার ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার দুই ধারা—(১) ঐতিহাসিক ব্যাকরণের ধারা, এবং (২) বর্ণনামূলক ও অন্যান্য আধুনিক ধারা। এখানে আমরা দুই ধারা সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে আলোচনা করব।

ঐতিহাসিক ব্যাকরণের ধারা : আধুনিক যুগে বঙ্গদেশে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান-চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। (জন্ম ২৬শে নভেম্বর, ১৮৯০ ; মৃত্যু ২৯শে মে, ১৯৭৭) ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব পুনরুজ্জীবন লাভ করে এই বাঙালি মনীষীর অবদানে। অথচ ভাষাবিজ্ঞানে ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করলেও, তাঁর মধ্যে নবযুগের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ভারতকে অন্ধ ধর্মীয় দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা নয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির মোহমুক্তি নিয়ে তার বিচার ও মূল্যায়ন করাও তাঁর পুনরুজ্জীবনের বৈশিষ্ট্য। এই পুনরুজ্জীবনের অর্থ প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণের নবীভূত চর্চা নয়, নিজের মৌলিক সৃষ্টির দ্বারা স্বদেশি ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি সাধন। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা বাংলার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ রচনা করেন। ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে যে শাখাটি সবচেয়ে বেশি বৈজ্ঞানিক বিধিবিধানের আওতায় পড়ে তা হল ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics)। এবং সেই ধ্বনিবিজ্ঞানেই আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন সে-যুগে এবিষয়ে পাশ্চাত্যে যিনি সবচেয়ে বেশি গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করেছিলেন সেই ডানিয়েল্ জোন্সের (Daniel Jones) কাছে।

পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য যে বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, সেই বৈশিষ্ট্যটি আচার্য সুনীতিকুমার সুযোগ্য গুরুর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। ফলে দৃষ্টিভঙ্গির সেই দেশ-কাল-ধর্মের গণ্ডিমুক্ত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা তিনি স্বকীয় সাধনায় অর্জন করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স ও ইংরেজিতে (প্রাচীন ইংরেজি ও ভাষাতত্ত্ব শাখায়) এম. এ. পাশ করেছিলেন তিনি। ফলে ইংরেজির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যার দ্বার তাঁর কাছে উন্মুক্ত হয়েছিল ছাত্রাবস্থাতেই। তাছাড়া তিনি রাজ্য সরকারের সংস্কৃত পরিষদের বৈদিক-সংস্কৃতে 'মধ্য' পরীক্ষাও পাশ করেছিলেন। এইভাবে ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের মূল

উৎসের সঙ্গেও তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয়েছিল। প্রাচ্যবিদ্যায় এই মূল প্রতিষ্ঠা অর্জন করে ভারত-সরকারের বৃত্তি নিয়ে যখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন ভাষাবিজ্ঞান পড়তে তখন পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক বিদ্যায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ তাঁর হল। সেখানে ধ্বনিবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। এছাড়া বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ('Indo-Aryan Linguistics—The Origin and Development of the Bengali Language') বিষয়ে গবেষণা করে সর্বোচ্চ ডিগ্রি ডি. লিট্. লাভ করেন (১৯২১)। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের কাছে পড়ার সুযোগ তিনি লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ডক্টর ডি. এল্. বার্নেট্ (Dr. D. L. Barnett), তাঁর নির্দেশক। তারপরে তিনি যখন পারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চলে আসেন তখনো তাঁর গুরুভাগ্য অপূর্ব। সেখানে জ্যুল্ ব্লক্ (Prof. Jules Bloch) ও আঁতোয়ান্ মেইয়ে (Prof. Antoine Meillet)-র মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে পড়ার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। ভাযাচার্য সুনীতিকুমারের প্রতিভার রূপনির্মিতিতে ত্রিমুখী প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। প্রথমত, যৌবনে বৈদিক সংস্কৃত পড়তে গিয়ে প্রাচ্য সংস্কৃতির একটি মূল আদি উৎসের সঙ্গে তাঁর যোগ স্থাপিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, লণ্ডনে ভাষাবিজ্ঞান পড়তে গিয়ে তৎকালের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী আচার্যদের কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছিলেন। তৃতীয়ত, চিরকালের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য তাঁর হৃদয়ে মানবিকী বিদ্যার নিষ্কর্ষস্বরূপ কোমল উদার মানবপ্রেমিক হৃদয়বৃত্তির স্ফুরণ ও প্রসারিত বিশ্বদৃষ্টির বিকাশ সাধন করেছিল।

সুনীতিকুমারের মধ্যে প্রথমাবধি ছিল তাঁর নিজস্ব সহজাত প্রতিভার বিশ্বতোমুখী জ্ঞানতৃষ্ণা। তাঁর এই জ্ঞানভিক্ষু প্রতিভা তাঁকে ছাত্রাবস্থাতেই বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বিষয়ে অনুসন্ধানে আগ্রহী করে তুলেছিল। ভাষাচার্য নিজেই লিখেছেন, যখন ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর প্রাগ্রসর প্রশিক্ষণ কিছুই হয় নি তখন এম. এ. ক্লাশে প্রাচীন ইংরেজির রূপ ও ইংরেজি ভাষার ইতিহাস পড়তে গিয়ে তাঁর মনে এসেছিল নিজের মাতৃভাষার ইতিহাস ও বিবর্তনরেখা বিধিবদ্ধভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণের কথা। ছাত্রাবস্থার আকাঙ্ক্ষা প্রথম পরিকল্পনারূপে দানা বাঁধে ১৯১৬ সালে যখন বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ব্যাকরণ (An Historical Comparative Grammar of the Bengali Language) বিষয়ে গবেষণার জন্য তাঁর খসড়াটি আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রেমচাঁদ ও রায়চাঁদ বৃত্তির (P. R. S.) জন্যে অনুমোদিত হয়। তার পরে এ বিষয়ে লণ্ডনে ড. ডি. এল্. বার্নেটের

নির্দেশনায় গবেষণা করে শুধু ডি. লিট্. ডিগ্রিই তিনি লাভ করেন নি, রেখে গেছেন বাঙালি জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতির আধার তার চিরগর্বের মাতৃভাষার জন্ম-পরিচয় ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ—'The Origin and Development of the Bengali Language'। তাঁর মূল গবেষণা-নিবন্ধটিই পরিবর্ধিত পরিমার্জিত হয়ে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার উৎস ও ক্রমবিকাশ বিষয়ে এই গ্রন্থ প্রণয়নে ভাষাচার্য তাঁরই একজন অগ্রণী আচার্য জ্যুল্ ব্লকের (Jules Bloch) মারাঠি ভাষা-বিষয়ক গ্রন্থ 'ফর্ম্যাসিওঁ দ্য লা লাঁগ্ মারাৎ' ('Formation de la Langue Marathe' অর্থাৎ Formation of the Marathi Language)-এর কাঠামোটি গ্রহণ করেছিলেন। এই গুরুঋণ তিনি স্বীকার করেছেন।[১০৫] জ্যুল্ ব্লক্ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর এই স্বীকৃতিটি আমরা উদ্ধৃত করেছি।

জ্যুল্ ব্লকের কাঠামো অনুসরণ করে যে গ্রন্থ তিনি রচনা করেন, তার পথ ধরে ভারতের অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্যভাষারও বিশ্লেষণ হতে থাকে--ডঃ বাণীকান্ত কাকতী রচনা করেন 'Assamese, its Formation and Development', ড. উদয়নারায়ণ তেওয়ারী রচনা করেন 'The Origin and Development of Bhujpuri', ড. বাবুরাম সক্সেনা লেখেন 'Evolution of Awadhi' এবং ড. সুভদ্র ঝা লেখেন 'The Formation of Maithili'। এইভাবে ভারতীয়দের মধ্যে নবোদ্যমে ভাষাবিজ্ঞান-চর্চা সূচিত হয়। ভাষাবিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ছিল তাকে নতুনরূপে পুনরুজ্জীবিত করেছেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তিনি আধুনিক ভারতীয়দের ভাষাবিজ্ঞান-চর্চায় পথিকৃতের শ্রদ্ধেয় আসনে অধিষ্ঠিত।

আচার্য সুনীতিকুমারের মনীষার দু'টি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল—বিষয়ের ব্যাপ্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। মূলত এবং সত্যত ভাষাবিজ্ঞানী বলে পরিচিত হলেও ভাষা ছাড়াও নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর সক্রিয় আগ্রহের অন্ত ছিল না। ব্যাপ্তিতে তিনি দেশের সীমা ও বিজ্ঞান-নিষ্ঠায় তিনি ধর্মের গণ্ডি অতিক্রম করে গেছেন। প্রাচীন সাহিত্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ আগ্রহ, অথচ সর্ববিধ অন্ধ আনুগত্য থেকে মুক্তি--এবম্বিধ সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি সচরাচর চোখে পড়ে না। ভাষাবিজ্ঞান ও প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ সক্রিয়

১০৫। Chatterji, Dr, Suniti Kumar : *The Origin and Development of the Bengali Language,* London : George Allen & Unwin Ltd., 1970. Preface, p. xiii.

আগ্রহ নবযুগে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় বাঙালি ও মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতমহলে। কিন্তু কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতদের তুলনায় সুনীতিকুমারের দৃষ্টিভঙ্গির বৈজ্ঞানিক বস্তু-নিষ্ঠা যে অনেক বেশি, তা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে। বেদের রচনাকাল নির্ণয়ে মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক বেদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধার বশে অতি সামান্য যুক্তির উপরে ভিত্তি করে যতদূর পেরেছেন বেদকে ততদূর প্রাচীন প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে বেদের ঋক্‌সংহিতার রচনাকাল ৬০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ এবং বেদ-সঙ্কলন ও বেদ-বিভাগের কাল ৪০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। কিন্তু বাঙালি ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমার বিষয়টিকে দেখেছেন যথার্থ বৈজ্ঞানিকেরই দৃষ্টিতে। অন্ধ শ্রদ্ধার বশে নয়, যুক্তির মানদণ্ডে বিচার করে এবং সর্ববিধ ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন ঋক্-সংহিতার সূক্তগুলির রচনাকাল ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের আগে নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন সেটা লক্ষ্য করার মতো :

"আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ঐতিহাসিক বিচার, এই দুইটি হইতেছে বিভিন্ন পর্যায়ের বস্তু,......অন্ধ বিশ্বাস-প্রণোদিত একের সঙ্গে অপরের মিশ্রণে আধ্যাত্মিকতা ও ইতিহাস উভয়ই ক্ষুণ্ণ হয়। এই কারণে, মানবীয় ভাষায় রচিত কোনও রচনা-সম্পুটের আলোচনা করিতে গেলে, উহাকে মানব-চিত্তের ও মানব-সংস্কৃতির প্রকাশক Human Sciences বা 'মানবী বিদ্যা' অথবা 'মানবিকী'র অংশ বলিয়াই ধরিতে হয়। প্রতিভার দিব্য দীপ্তি থাকিলে,......মানবিকীকে যদি......অপৌরুষেয় বলি, তাহাতে শ্রদ্ধা ও আস্থা এবং ধর্মবোধ তৃপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিতর্কমূলক বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক বিচার ও আলোচনার পথ তাহাতে অনেকটা রুদ্ধ হইয়া যায়।"[১০৬]

বেদের রচনাকাল তিনি যা নির্ণয় করেছেন, ভাবীকালের নবতর গবেষণায় হয়তো তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে (যদিও সেই সম্ভাবনা এখন আর বড় একটা নেই), তবু এ প্রসঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্তটি বড় কথা নয়, এখানে লক্ষণীয় তাঁর সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিই।

এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আচার্য চট্টোপাধ্যায় ভারতের একটি আধুনিক ভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তন বিশ্লেষণ করলেন। বোধ হয়, ভারতবর্ষে যাঁরা একক নব্য ভারতীয় আর্যভাষার চর্চা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করেন, তাঁদের মধ্যে ভারতীয় হিসাবে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ই অগ্রণী। নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির

১০৬। চট্টোপাধ্যায়, ড. সুনীতিকুমার : 'সাংস্কৃতিকী', (২য় খণ্ড), ১৩৭২, পৃঃ ১৭৫।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের প্রাথমিক সূত্রপাত অবশ্য আচার্য সুনীতিকুমারের আগেও কেউ-কেউ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসময়ে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় এক শ' বছরেরও বেশি আগে, জন্ বীমস্ (John Beams)-এর 'A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India' প্রকাশিত হয় ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে। জন্ বীম্‌সের এই রচনাটি সাতটি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার মূলত বর্ণনামূলক-তুলনামূলক ব্যাকরণ হলেও তিনি গ্রন্থের সূচনায় ভারতীয় আর্যভাষাগুলির জন্ম-ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করেছিলেন এবং আধুনিক ভাষার অনেক উপাদানের উৎস ও বিবর্তনও চিহ্নিত করেছেন। তাঁর পরে এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য অন্বেষণার নিদর্শন দিলেন একজন ভারতীয় পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর (Ramakrishna Gopal Bhandarkar) তাঁর Wilson Philological Lectures (১৮৭৭)-এর মধ্যে। ভারতীয় পণ্ডিতের নব্য ভারতীয় ভাষা-চিন্তা বোধহয় এই প্রথম। বিদেশি মনীষীদের মধ্যে হোয়ের্নল্ (R. Hörnle) রচনা করেছিলেন 'A Comparative Grammar of the Gaudian Languages with special reference to Eastern Hindi' (১৮৮০ খ্রীঃ)। যাই হোক, এক্ষেত্রে আচার্য সুনীতিকুমারের আগে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রায় অতিমানবীয় সাধনা যিনি করেছিলেন তিনি হলেন স্যর্ জর্জ্ আব্রাহাম্ গ্রীয়ার্সন্ (George Abraham Grierson)। খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিত (১৯২৭) Linguistic Survey of India-তে তিনি ভারতীয় ভাষাগুলির উৎস ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। ১৯০৩ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত রচনাতেও ('Languages of India') এ সম্পর্কে তিনি বিধিবদ্ধভাবে আলোচনা করেছিলেন। এসব রচনার অনেক আগে ১৮৮৩-৮৭ সালে গ্রীয়ার্সন্ 'Seven Grammars of the Bihari Languages'-এ কয়েকটি নব্য ভারতীয় ভাষার বিশ্লেষণ করেন। এছাড়া পাণ্ডুরঙ্গ দামোদর গুণে (Dr. Pandurang Damodar Gune)-র বহু-পরিচিত রচনা 'An Introduction to Comparative Philology' (১৯১৮)-তেও নব্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রসঙ্গ কিঞ্চিৎ স্থান পেয়েছে। এসব পূর্ব-ঐতিহ্য স্মৃতির তাৎপর্য হল ভারতীয় আর্যভাষাগুলির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচনায় ও তার স্তর-পরম্পরা বিশ্লেষণে আচার্য সুনীতিকুমারের মৌলিক ভাবনার পরিচিতি দান। তাঁর পূর্বসূরিরা ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন আলোচনায় সাধারণত তার তিনটি স্তর (আদি, মধ্য ও অন্ত্য) নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। সেখানে আচার্য সুনীতিকুমার এই বিশ্লেষণ আরো সূক্ষ্মভাবে করেছেন। জন্ বীম্‌স্ শুধু এইটুকু বলেই নীরব হয়েছিলেন যে, নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির জন্ম সোজাসুজি সংস্কৃত থেকে হয় নি, হয়েছে প্রাকৃত থেকে :

"......it (Sanskrit) certainly ceased to be a vernacular in the sixth century B. C.......From that time the Aryan people of India spoke popular dialects called Prakrits. It is from these latter, therefore, and not directly from Sanskrit, that the modern languages derive the most ancient and distinctly national and genuine portion of their words and grammatical inflections."[১০৭]

কিন্তু আচার্য সুনীতিকুমার মধ্য ভারতীয় আর্যভাষারই বিবর্তনকে আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে তার চারটি উপ-পর্ব নির্ণয় করেছেন :[১০৮]

(১) প্রথম পর্ব (Early Stage) : ৬০০ খ্রীঃ পূঃ–২০০ খ্রীঃ পূঃ ;

(২) উৎক্রান্তি পর্ব (Transitional Stage) : ২০০ খ্রী ঃ পূঃ–২০০ খ্রীঃ ;

(৩) দ্বিতীয় পর্ব (Second Stage) : ২০০ খ্রীঃ–৬০০ খ্রীঃ এবং

(৪) তৃতীয় পর্ব (অপভ্রংশ) (Third Stage) : ৬০০ খ্রীঃ–১০০০ খ্রীঃ।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা-তত্ত্বের ক্ষেত্রে আচার্য সুনীতিকুমারের আর একটি সংযোজনার কথা উল্লেখ করেছেন ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ অতি মূল্যবান একটি আলোচনায়।[১০৯] সেটা হল তাঁর Fortunavo's Law-এর পরিবর্ধন—মাগধী প্রাকৃতে 'র্'-এর উচ্চারণ যে 'ল্' হয়ে যায় তার সঙ্গে র্-এর প্রভাবে দন্ত্যবর্ণের মূর্ধন্যীভবনের যোগ রয়েছে। স্বর-মধ্যবর্তী স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার transitional পর্বটিতে ও দ্বিতীয় পর্বে উষ্ম বর্ণের মতো উচ্চারিত হত, এটিও আচার্য সুনীতিকুমারেরই আবিষ্কার। মধ্য ভারতীয় ও নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় অর্ধতৎসম শব্দের ব্যাপক প্রয়োগটিও তিনিই প্রথম আমাদের ধরিয়ে দেন।

সাধারণভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে নব্য ভারতীয় আর্যভাষা পর্যন্ত ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনের ইতিহাস সংক্ষেপে ড. গুণে-র পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে পাওয়া

১০৭। Beames John : *'A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India'*, Delhi ; Munshiram Manoharlal, 1966, p. 111.

১০৮। Chatterji, Dr. Suniti Kumar : *'The Origin and Development of the Bengali Language'*, George Allen & Unwin, 1970, pp.. 18-19.

১০৯। Bhattacharya, Dr. [Mrs.] Sukumari : 'Suniti Kumar Chatterji : Scholarship and Personality' in Suniti Kumar Chatterji : *The Scholor and the Man*, Calcutta ; Jigñāsā, 1970.

যায়। আবার সাতটি প্রধান নব্য ভারতীয় আর্যভাষার তুলনামূলক আলোচনা পাই জন্ বীম্‌সের 'A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India' বইটিতে। কিন্তু একটিমাত্র নব্য ভারতীয় আর্যভাষাকে আলোচ্য বিষয় রূপে গ্রহণ করে তারই ঐতিহাসিক বিবর্তন বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা আচার্য সুনীতিকুমারই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম করেন। এই অর্থেই তিনি অগ্রণী। তাঁর আগে জ্যুল্ ব্লক্ নামে জনৈক বিদেশি ভাষাবিজ্ঞানী মারাঠি ভাষার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করেছিলেন। আগেই বলেছি ড. চট্টোপাধ্যায় যখন তাঁর 'The Origin and Development of the Bengali Language' রচনা করেন, তখন Jules Bloch-এর রচনাটি তাঁর সামনে আদর্শস্বরূপ ছিল। পরে অবশ্য তাঁর নিজের গ্রন্থটিই বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিকতায় ও আলোচনার ব্যাপকতায় নব্য ভারতীয় আর্যভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে দিঙ্‌নির্দেশক হয়ে উঠে ; তাঁর এই গ্রন্থটি ১৯২৬ সালে প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হবার পর তার আদর্শ অনুসরণে অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্যভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ রচনার ব্যাপক সূত্রপাত হয়ে যায়। এই কারণে তাঁকে নব্য ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানের শুধু শিক্ষাগুরু নয়, দীক্ষাগুরুও বলা যেতে পারে। 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে আচার্য চট্টোপাধ্যায় অবশ্য বাংলা ভাষার শুধু ইতিহাস, ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) ও রূপতত্ত্ব (Morphology) আলোচনা করেছেন, বাংলা ভাষার শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics) এবং বাক্যগঠনতত্ত্ব (Syntax) তিনি আলোচনা করেন নি। এই কাজটুকু তিনি যে ফেলে রেখেছিলেন তার নানা কারণ ছিল। একটা কারণ বোধ হয় এই যে, শব্দের অর্থ পরিবর্তন অনেকটাই মানবমনের খেয়ালখুশির উপরে নির্ভর করে, তাকে ধ্বনি-পরিবর্তনের মতো বৈজ্ঞানিক সূত্রে বাঁধা যায় না। এই কারণে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে কেউ-কেউ শব্দার্থতত্ত্বকে (semantics) ঠিক ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করতে চান না, তাকে মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের এলাকায় সরিয়ে দিতে চান। এই কারণেই হয়তো ভারতে এই শাখাটি একদিন ন্যায়দর্শনের অন্তর্গত ছিল এবং পাশ্চাত্যে অনেকে একে পরাবিদ্যার (metaphysics) অন্তর্গত করেছিলেন। আর বাংলা বাক্যগঠনরীতি (syntax) সম্পর্কে তিনি যে আলোচনা করেন নি, তার কারণ বোধ হয় এই যে, রূপতত্ত্বের আলোচনাতেই তিনি এ সম্পর্কে কিছু-কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমারকে আমরা সাধারণত ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানী বলে থাকি। কিন্তু তাঁর দু'টি গ্রন্থে আধুনিক বাংলা ভাষার কোনো-কোনো দিকের যে এককালিক বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ (Synchronic Descriptive Analysis) পাওয়া যায় তা বিস্ময়কর। গ্রন্থ দু'টি হল : 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' এবং

'A Brief Sketch of Bengali Phonetics'। এই দু'টি গ্রন্থে আধুনিক বর্ণনামূলক ব্যাকরণের পরিভাষা তিনি সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করেন নি, কোথাও-কোথাও সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণপদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই বর্ণনামূলক।

ভাষাচার্য তাঁর সারা জীবনের জ্ঞান-সাধনায় ২০টিরও বেশি ইংরেজি গ্রন্থ এবং অনেকগুলি বাংলা গ্রন্থ রচনা করেছেন। এদের মধ্যে অনেকগুলি হল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তাঁর লিখিত বক্তৃতার সংকলন। তবে সব ক'টিই তাঁর পাণ্ডিত্যের ব্যাপ্তি ও মৌলিক ভাবনায় অনন্য। তাঁর বহুসংখ্যক রচনার মধ্যে এখানে শুধু সেইগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলি থেকে তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তার প্রসারতা ও বৈচিত্র্য ধরা পড়ে :

The Origin and Development of the Bengali Language, Two Vols. (Ist. ed. Calcutta University, 1926, 2nd. impression with the addition of a third Vol., London ; George Allen & Unwin, 1970), Bengali Self-Taught (Marlborough's Self-Taught Series, London, 1927), A Bengali Phonetic Reader (University of London Press, 1928), A Brief Sketch of Bengali Phonetics (London ; International Phonetic Association, 1921), Indo-Aryan and Hindi (Ist ed. 1942, 2rd. ed. Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1969), Languages and Linguistic Problems (Oxford University Press, Ist. ed. 1943), Scientific and Technical Terms in Modern Indian Languages (Vidyoday Library, Calcutta, 1953), Dravidian (Annamalai University, 1965), The People, Language and Culture of Orissa (The Orissa Sahitya Akademi, 1966), Phonetics in the Study of Classical Languages in the East (University of Bangalore, 1967), Balts and Aryans (Indian Institute of Advanced Study, Simla, 1968), বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সং, ১৯২৯, ৬ষ্ঠ সং ১৯৫৩), ভারতের ভাষা ও ভাষা-সমস্যা (বিশ্বভারতী, ১ম সং, ১৩৫১), সাংস্কৃতিকী (বাক্‌সাহিত্য, কলকাতা, ১ম খণ্ড ১৩৬৮, ২য় খণ্ড ১৩৭২), ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সং, ১৯৩৯, ৩য় সং ১৯৪৫), সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (বাক্ সাহিত্য, সংশোধিত সং, ১৩৭৭)। এছাড়া তাঁর সম্পাদিত বহু গ্রন্থও আছে। আর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর ইংরাজি ও বাংলা প্রবন্ধ ও অন্যবিধ রচনা ছড়িয়ে আছে প্রায় এক হাজার। সম্প্রতি দিল্লির People's

Publishing House এসব রচনা থেকে নির্বাচন করে পাঁচ খণ্ডে Select Papers নামে ক্রমান্বয়ে তা প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। এছাড়া কলকাতা থেকে 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশন সংস্থা প্রকাশ করেছেন তাঁর নির্বাচিত বাংলা প্রবন্ধের সঙ্কলন-- 'বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে' (১৯৭৫)। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়, বিশেষত হিন্দিতে, তাঁর অনেকগুলি বই অনূদিতও হয়েছে।

আগেই বলেছি, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মনীষা শুধু ভাষাচিন্তাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। The Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থের Introduction অংশে এবং Indo-Aryan and Hindi গ্রন্থের চারটি বক্তৃতায় তিনি আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির ঐতিহাসিক বিবর্তন আলোচনা করেছেন, তেমনি Languages and Literatures of Modern India (১৯৬৩) গ্রন্থে তিনি সমস্ত আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থের আগে সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত 'Contemporary Indian Literature' (১৯৫৭), Prof. V. K. Gokak সম্পাদিত 'Literatures in Modern Indian Languages' (১৯৫৭) ও শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য' (১৩৬১) গ্রন্থে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যগুলির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু প্রত্যেকটি সাহিত্যের বাহন তার নিজস্ব ভাষার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে, এমন কি তার লিপিরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে বৈজ্ঞানিক বিধিবদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন তা অন্যত্র দুর্লভ, এবং বোধ হয়, এটা একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই প্রত্যাশিত।

ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে-সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্লেষণেও তাঁর প্রতিভা সমান তৎপর। এক অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখেছেন—যদিও 'ভারত-তীর্থে'র মাটিতে নানা দেশ ও জাতির সাংস্কৃতিক তীর্থরেণু এসে মিশেছে তবু ভারত-ইতিহাসের নির্মিতিতে প্রধানভাবে কাজ করেছে দু'টি উপাদান : (১) প্রাচীন ভারতীয় উপাদান ও সংস্কৃত সাহিত্য-সংস্কৃতির জগৎ (২) ঐশ্লামিক উপাদান ও আরবি-ফারসি সাহিত্য-সংস্কৃতির জগৎ। এর সঙ্গে আরও দু'টি উপাদান কাজ করেছে : এক, এখানকার আর্য-পূর্ব সংস্কৃতির ও উপজাতির আঞ্চলিক উপাদান, যাকে আদি substratum বলতে পারি ; দুই, পাশ্চাত্য উপাদান (মুখ্যত ইংরেজি সাহিত্য-সংস্কৃতির জগৎ), নব্যভারতের রূপরচনায় যার বিশেষ প্রভাব রয়েছে।

মূলত ভাষাবিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও আচার্য সুনীতিকুমার সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন, তার কারণ তাঁর দৃষ্টি ভাষাকে কখনো খণ্ডিত বিচ্ছিন্নভাবে দেখে নি। সোস্যুর্ (de Saussure)-এর আধুনিক বর্ণনামূলক ও গঠনসর্বস্বতাবাদী গোষ্ঠী ভাষাকে স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দিতে

গিয়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাষাকে দেখে থাকেন। কিন্তু ভাষার প্রাণের উৎসটি যে জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যেই নিহিত এবং ভাষার উপযোগিতা ও মর্যাদা যে তার সাহিত্যিক সম্ভারের জন্যেই, এই কথাটি তাঁরা ভুলে যান। এবিষয়ে আচার্য সুনীতিকুমার কিন্তু গভীর ও অখণ্ড দৃষ্টির অধিকারী। ভাষার কোনো সমস্যাকেই তিনি সেই ভাষাভাষী জাতির সমস্যা থেকে পৃথক্ করে দেখেন নি। এদিক থেকে অনেকটা ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মান philologist-দের সগোত্র তিনি। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে কেন্তুম্ ও সতম্ নামে দু'টি ভাষাগুচ্ছে ভাগ করেন নি এমন ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানী বোধ হয় কমই আছেন। কিন্তু তাঁদের এই বিভাগের মূলসূত্র হল : মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পুরঃকণ্ঠ্য স্পৃষ্ট ধ্বনি (Palato-guttural stop) কেন্তুম্ গুচ্ছে বিশুদ্ধ কণ্ঠ্য ধ্বনিতে (guttural-velar) পরিণত হয়েছে, কিন্তু সতম্ গুচ্ছে সেগুলি উষ্ম ধ্বনি স-কারে (sibilant spirant) পরিবর্তিত হয়েছে। এই বিভাগটি ভাষা-ভিত্তিক, কিন্তু এরও মূলে যে জাতিভিত্তিক ভৌগোলিক পার্থক্য নিহিত রয়েছে, সেটি সুনীতিকুমারের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। কেন্তুম্‌কে তিনি যে মূলত পশ্চিমী ও সতম্‌কে পূর্বী গুচ্ছ বলেছেন, এতেই বোঝা যায় ভৌগোলিক পার্থক্যটি তিনি ধরেছেন। এছাড়া জাতিগত পার্থক্য তো ছিলই। সাধারণত ধারণা, মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী জনসাধারণ—V. G. Childe যাদের ব্যাপক অর্থে Aryans বলেছেন, আর P. Giles যাদের নাম দিয়েছেন Wiros—তারা একটি অবিমিশ্র আর্যজাতি ছিল ; কিন্তু ড. সুনীতিকুমার বলেছেন "There is again, no proof that Primitive Indo-Europeans, were a pure and unmixed race"[১১০] এ বিষয়ে ড. চট্টোপাধ্যায় বরং A. H. Kaene-এর মত আত্মপক্ষ সমর্থনে উদ্ধৃত করেছেন : the Indo-European speakers were "a conglomerate of peoples of different origins"[১১১] এবং এর স্বাভাবিক পরিণাম-স্বরূপ তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন : "Marked dialectal differences were present among the primitive Indo-Europeans."[১১২]

একথা অনস্বীকার্য যে, philology-র, বিশেষত linguistic palaeontology-র সাহায্যে প্রাচীন সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান করতে

১১০। Chatterji, Dr. Suniti Kumar, *The Origin and Development of the Bengali Language,* 1970, pp. 23-24.

১১১। A. H. Kaene : *Man ; Past and Present,* Cambridge. 1920. p. 505.

১১২। Chatterji, Dr. Suniti Kumar. *The Origin and Development of the Bengali Language,* 1970, p. 24,

হলে ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানও প্রয়োজন। ড. চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে এইসব সম্পৃক্ত বিদ্যার সার্থক সমন্বয় হয়েছে। এই সমন্বয় ঘটেছে বলেই হোয়ের্নল্‌-প্রবর্তিত এবং গ্রীয়ার্সন্‌-ব্যাখ্যাত নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বর্গীকরণ (inner and outer classification)-এর তত্ত্বকে আর্‌. পি. চন্দ যখন নৃতত্ত্বের ভিত্তিতে সমর্থন করেছেন, তখন ড. চট্টোপাধ্যায় তাঁর সিদ্ধান্তকে নৃতত্ত্বেরই প্রতি-যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন।

প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির পরিচয় সন্ধান করতে গিয়ে ড. চট্টোপাধ্যায় যেমন ইন্দো-ইউরোপীয়দের মূল জাতিগত বা racial উপাদান অন্বেষণ করেছেন, তেমনি বাংলা ভাষার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে বাঙালি জাতিরও মূল racial উপাদান বিশ্লেষণ করেছেন। বাঙালিও মূলত কোনো একটিমাত্র জাতি নয় ; সে জাতি চারটি জাতির মিশ্রণে গঠিত :

> 'Bengal originally did not form one country and one nation...The...four tribes, Pundra, Vanga, Radha and Sumha, were the important ones, who gave their names to the various tracts they inhabited.'[১১৩]

ভাষার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে এইভাবে তিনি জাতির ইতিহাসকেও তলিয়ে দেখেছেন। এর জন্যে প্রতিভার যে বহুমুখী সঞ্চরণ ও অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা দরকার, তা ড. চট্টোপাধ্যায়ের ছিল।

আচার্য চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে একটা নিজস্ব উদারতা প্রথমাবধি ছিল। এই উদারতার সঙ্গে বিশ্ব-মানবতাবাদী বিশ্বকবির ব্যক্তিগত সাহচর্য যুক্ত হয়ে আচার্য চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যেও একটি বিশ্বমানবিক জীবনদর্শন গড়ে উঠেছিল। তাঁর বিশ্বমানবিকতার বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি শুধু তাত্ত্বিক দর্শন বা প্রচারমূলক প্রচেষ্টা নয়, এ হল তাঁর সক্রিয় জীবন-সাধনার অঙ্গ। অন্য সংস্কৃতিকে জ্ঞানের মধ্যে তপস্যার দ্বারা এই যে পাওয়া এই পাওয়াই আমাদের চিত্তের প্রসারতা ঘটায়, মানবতার মুক্তির পথ প্রশস্ত করে এবং সর্ববিধ ঐক্যের বনিয়াদ রচনা করে। এর অভাবেই আমাদের আজকের বিশ্বমানবতার বুলি আত্মপ্রবঞ্চনায় পর্যবসিত এবং যুগের এই আত্মপ্রবঞ্চনা দেখেই বাংলার বর্তমান শতাব্দীর শেষ বিশ্বমানবীয় সংস্কৃতি-চর্চার এই মহান্‌ আচার্য জীবনের শেষ পর্বে মর্ম-পীড়িত ছিলেন।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রণী প্রচেষ্টার পর আধুনিক ভারতে নবোদ্যমে ভাষাবিজ্ঞান-চর্চা সূচিত হয়। আধুনিক ভারতে ভাষাবিজ্ঞান চর্চায়

১১৩। Chatterji, Dr. Suniti Kumar : *The Origin and Development of the Bengali Language,* 1970, p, 67.

বিভিন্ন প্রদেশে নতুন উদ্যোগ সূচিত হলেও তার দু'টি প্রধান কেন্দ্র হল বঙ্গদেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহারাষ্ট্রে পুণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেকান কলেজ (Deccan College)। বর্তমানে কলকাতা, যাদবপুর, কল্যাণী, গৌহাটী, পুণে, দিল্লি, হায়দ্রাবাদ, আন্নামালাই, কেরালা, বোম্বাই, কুরুক্ষেত্র, সগর, কর্ণাটক , লক্ষ্নৌ, মহীশূর, নাগপুর, ওস্‌মানিয়া, জব্বলপুর, রবিশঙ্কর, বরোদা এম. এস আলিগড় মুসলিম এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ বিদ্যা (discipline) রূপে বা বিবিধ আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগে বিশেষ পত্র (special paper) রূপে ভাষাবিজ্ঞানের পঠনপাঠন ও গবেষণা চলছে। মহীশূরের Central Institute of Indian Languages (CIIL) এবং হায়দ্রাবাদের Central Institute of English and Foreign Languages (CIEFL)-এ ভাষাবিজ্ঞানের পঠনপাঠন ও প্রাগ্রসর গবেষণার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া, আমেরিকার Linguistic Society এবং লণ্ডনের International Phonetic Association-এর মতো পুণের ডেকান কলেজে অবস্থিত Linguistic Society of India (১৯২৮) এবং ত্রিবান্দ্রমে অবস্থিত Dravidian Linguistics Association (১৯৭১) ভারতবর্ষে ভাষাবিজ্ঞানের প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্যে সুসংগঠিত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এই দুই প্রতিষ্ঠানের পত্রিকা যথাক্রমে Indian Linguistics (১৯৩১) এবং International Journal of the Dravidian Linguistic Association (১৯৭২) ভাষাবিজ্ঞানীদের দু'টি স্বীকৃত মুখপত্র। এছাড়া আগ্রায় অবস্থিত 'কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থান' (১৯৬১)-এ প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞানকে (Applied Linguistics) কাজে লাগিয়ে বহুমুখী গবেষণা এগিয়ে চলেছে। আধুনিক ভারতবর্ষে ভাষাবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই সব বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান ও পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

আধুনিক কালে বৃহত্তর ভারতবর্ষে এই যে ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার প্রসার ঘটেছে তার ক্রমবিকাশের বিস্তৃত ইতিহাস আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। পরিসরের স্বল্পতার কথা মনে রেখে আমরা শুধু বঙ্গদেশে ভাষাবিজ্ঞান-চর্চায় প্রধান কয়েকজন মনীষী ও গবেষকের কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। আমরা জানি, আধুনিক ভারতবর্ষে ভাষাবিজ্ঞান-চর্চায় বঙ্গদেশের একটি সুদীর্ঘ সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে। আমরা মনে করতে পারি, এখানেই কলকাতার রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে (১৭৮৬) তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology) সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল যেদিন এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতৃ-গ্রন্থাগারিক প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌ মনীষী স্যার্‌ উইলিয়াম্‌ জোন্‌স্‌ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে গ্রীক লাতিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতকেও যুক্ত

করে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিধিবদ্ধভাবে চর্চার ক্ষেত্রেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই পথিকৃৎ। কারণ স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সারা ভারতের মধ্যে এখানেই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পঠন-পাঠন প্রথম প্রবর্তিত হয়। এইজন্যে একসময় বঙ্গদেশে ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার মূলকেন্দ্র ছিল এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সূচনা (১৯০৪) হবার পর তার প্রথম বিভাগীয় অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন গুজরাটি মনীষী আই. জে. এস্ তারাপুরওয়ালা (Irach Jehangir Sorabji Taraporewala)। তিনি প্রথম যুগের বঙ্গদেশীয় ভাষাজিজ্ঞাসুদের শুধু শিক্ষাগুরুই নন, ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষক ও গ্রন্থ-প্রণেতাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দীক্ষাগুরুও। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'The Origin and Development of the Bengali Language' (১৯২৬ খ্রীঃ) গ্রন্থটি ছাড়া আর যে ক'টি গ্রন্থ এ বিষয়ে প্রথম যুগে এদেশের ভাষাবিজ্ঞানীদের দিগ্‌দর্শন দিয়েছিল সেগুলির মধ্যে প্রধান হল তারাপুরওয়ালা-রচিত 'Elements of the Science of Language' (১৯৩১)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক কালে বর্ণনামূলক এবং রূপান্তরমূলক-সৃজনমূলক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা সূচিত হলেও প্রথমাবধি এখানে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ধারাই বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করেছিল। ভাষাবিজ্ঞানের এই ধারায় বিদেশি মনীষীদের রচনার মধ্যে বিশেষ করে কার্ল্ ব্রুগমানের (Karl Brugmann) 'Outline of the Comparative Grammar of Indo-Germanic Languages' (প্রথম প্রকাশ : ১৮৮৬ খ্রীঃ), আঁতোয়ান্ মেইয়ের (Antoine Meillet) 'The Comparative Method of Historical Linguistics' (La méthode comparative en linguistique historique, ১৯২৫), জ্যুল্ ব্লকের (Jules Bloch) 'Formation of the Marathi Language' (Formation de la Langue Marathe) ও 'The Indo-Aryan from the Veda to Modern Times' (L' indo-aryan du Veda aux temps modernes' ১৯৩৪) ও পেটার গাইল্‌সের (Peter Giles) 'A Manual of Comparative Philology' (১৯০১), এবং ভারতীয় মনীষীদের রচনার মধ্যে ড. পাণ্ডুরঙ্ দামোদর গুণে-র 'An Introduction to Comparative Philology' (১৯১৮), ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'The Origin and Development of the Bengali Language' (১৯২৬) এবং আই. জে. এস্. তারাপুরওয়ালার 'Elements of the Science of Language' (১৯৩১)-ই প্রথম যুগের বঙ্গদেশীয়

ভাষাজিজ্ঞাসুদের পথ দেখিয়েছিল। পরবর্তী কালে ভাষাবিজ্ঞানে প্রভূত অগ্রগতি হবার ফলে এইসব গ্রন্থের অনেক তত্ত্ব ও তথ্য অপূর্ণ মনে হয়, কিন্তু সেকালের এইসব গ্রন্থের উপযোগিতা এখনো কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অপরিম্লান রয়ে গেছে।

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology) বিভাগ স্থাপিত হবার পর এখানে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে পরবর্তীকালে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই স্মরণীয় হলেন ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯ খ্রীঃ)। তিনিই এই বিভাগের প্রথম ছাত্র। সংস্কৃতে অনার্স ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ. (১৯১২) পাশ করায় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে সুদৃঢ় ভিত্তি তাঁর রচিত হয়েছিল। এই রকম যথাযোগ্য প্রস্তুতি অর্জনের পর তিনি পারী বা সর্‌বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে (L'universite de Paris ou Sorbonne) গবেষণা করতে যান। সেখানে জ্যুল্ ব্লক্, আঁতোয়ান্ মেইয়ে, র্যোনু প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেছিলেন। সেখানে তিনি বৌদ্ধ তান্ত্রিক কাহ্নপাদ ও সরহপাদের মরমিয়া সাধনগীতি ('লে শাঁ মিস্তিক্ দ্য কাহ্ন এ দ্য সরহ' ('Les Chants Mystique de Kanha et de Saraha') সম্বন্ধে গবেষণা করে ডি. লিট্. ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া তিনি পারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধ্বনিবিজ্ঞানে ডিপ্লোমাও লাভ করেছিলেন। ভাষাবিজ্ঞানে স্বদেশে-বিদেশে উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত মনীষী শহীদুল্লাহ্ প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রথম থেকেই তিনি ভাষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে কৌতূহলী ছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় ভাষাবিষয়ে রচিত তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধাবলীতে। ইতিপূর্বে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণের খসড়া প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্যে অনুমোদিত হয়েছিল (১৯১৬) এবং তিনি লণ্ডনে এ বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় শহীদুল্লাহ্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters-এ বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশ করেন—'Outline of an Historical Grammar of the Bengali Language' (১৯২০)। পরিণত বয়সে তিনি ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। ভাষা সম্পর্কিত তাঁর গ্রন্থাবলী হল : 'ভাষা ও সাহিত্য' (১৯৩১), 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৯৩৫), 'আমাদের সমস্যা' (১৯৪৯), 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৬৫)। তাঁর প্রধান-সম্পাদনায় প্রকাশিত 'পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' (১৯৬৪) আঞ্চলিক ভাষা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য আকরগ্রন্থ। বাংলা ভাষার আঞ্চলিক শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে বাংলার লোকসংস্কৃতি এবং জীবন্ত ভাষার

মূল পরিচয় ও প্রাণশক্তি। মুহম্মদ্ শহীদুল্লাহ্ পূর্ববাংলার আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহ করে এ বিষয়ে বাংলা ভাষার আংশিক রূপ উদ্ঘাটন করেছেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পশ্চিমবাংলার আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহের যে সুমহান্ পরিকল্পনা কার্যান্বিত হয়ে চলেছে, তা সম্পন্ন হলে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহের বহু-অপেক্ষিত কাজটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে। ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার এই কাজ (আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান) এখন পরিচালনা করছেন। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। (পৃঃ ৬৯৩)।

শহীদুল্লাহ্ রচিত ভাষাবিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁর সবচেয়ে পরিচিত ও মৌলিকতা-সম্পন্ন রচনা হল 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৬৫)। বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে এই গ্রন্থ রচনায় শহীদুল্লাহ্ ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ থেকেই প্রধান দিগ্দর্শন লাভ করেছিলেন, এ ছাড়া জ্যুল্ ব্লক্ ও পিশেলের গ্রন্থ থেকেও তিনি অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন, একথা তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় স্বীকার করেছেন। কিন্তু পূর্বসূরিদের ঋণ স্বীকার করলেও বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের কোনো-কোনো প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হবে। সাধারণত স্বীকৃত মত হল এই যে, মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশের মাধ্যমে বাংলা ভাষার জন্ম। শহীদুল্লাহ্ এই মত সমর্থন করেন নি। এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত তাঁর ভাষাতেই উদ্ধৃত করা যায় :

"প্রশ্ন হইবে কোন্ প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি। এস্থলে বলিয়া রাখা কর্তব্য যে বৈয়াকরণদিগের বর্ণিত কোনও প্রাকৃতের সহিত এই মূল ভাষার ঐক্য পাওয়া যাইবে না। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে আমাদিগকে এই প্রাকৃতের লক্ষণ আবিষ্কার করিতে হইবে। সুবিধার অনুরোধে আমরা ইহাকে গৌড়ীয় প্রাকৃত বলিতে পারি।"[১১৪]

মাগধী প্রাকৃত থেকে নয়, গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম—মুহম্মদ্ শহীদুল্লাহের এই সিদ্ধান্তের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তির অভাব নেই। শহীদুল্লাহের সিদ্ধান্ত ব্যাপক স্বীকৃতিও লাভ করেনি। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় এই যে শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষা সম্পর্কিত পূর্বপ্রচলিত বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলির অন্ধ পুনরাবৃত্তি করেন নি, অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখেছেন। তাঁর ভাষা-

---

১১৪। শহীদুল্লাহ্, ড. মুহম্মদ্ : 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত', ঢাকা : বাঙ্লা একাডেমী, ১৯৬৫, পৃঃ ২৯।

আলোচনায় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে মৌলিক চিন্তার স্পর্শ পাওয়া যায়।

বহু ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য সুনীতিকুমারের মতো শহীদুল্লাহেরও দৃষ্টিভঙ্গিকে করেছে উদার, হৃদয়কে করেছে মানবতাবাদী এবং ভাষাবোধকে করেছে বাস্তব জীবনমুখী। আজহারউদ্দীন খান তাঁর মূল্যবান গ্রন্থে শহীদুল্লাহের একটি ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। এই ভাষণের অংশবিশেষ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় : "যেমন আমরা বাংলায় হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান এক মিশ্রিত জাতি, আমাদের বাংলা ভাষাও এক মিশ্রিত ভাষা।...আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষার ক্ষেত্রে গোঁড়ামি বা ছুঁৎমার্গের কোনও স্থান নেই। ঘৃণা ঘৃণাকে জন্ম দেয়। গোঁড়ামি গোঁড়ামিকে জন্ম দেয়। একদল যেমন বাংলাকে সংস্কৃত-ঘেঁষা করতে চেয়েছে, তেমনি আর একদল বাংলাকে আরবী-ফরাসী ঘেঁষা করতে উদ্যত হয়েছে। এক দল চাচ্ছে খাঁটি বাংলাকে বলি দিতে, আর এক দল চাচ্ছে 'জবে' করতে। একদিকে কামারের খাঁড়া, আর একদিকে কসাইয়ের ছুরি। নদীর গতিপথ যেমন নির্দেশ করে দেওয়া যায় না, ভাষারও তেমনি। একমাত্র কালই ভাষার গতি নির্দিষ্ট করে।"[১১৫]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব-বিভাগে প্রত্যক্ষভাবে যাঁদের শিক্ষা ও দীক্ষা, তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক চেতনা এবং ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বে সুগভীর পাণ্ডিত্যের জন্যে সর্বভারতীয় খ্যাতি এবং অবিসংবাদিত স্বীকৃতি লাভ করেছেন আচার্য সুকুমার সেন। ১৯০১ সালে কলকাতায় তাঁর জন্ম। ১৯২১ সালে সংস্কৃত অনার্সে তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার পক্ষে সংস্কৃত জ্ঞানের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা তিনি প্রথম জীবনেই অর্জন করেছিলেন। ১৯২৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। 'Syntax of Old and Middle Indo-Aryan Language' বিষয়ে গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি (P. R. S.) লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ্. ডি. ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল—'Historical Syntax of Middle and New Indo-Aryan'। সব দিক থেকেই ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য উত্তরসাধক তিনি। ১৯৩০ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে সুনীতিকুমার

১১৫। পূর্ব-পাকিস্তান বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতিরূপে প্রদত্ত ভাষণ : ঢাকা, ৩১/১২/১৯৪৮। (দ্রষ্টব্য : 'বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'— আজহারউদ্দীন খান্, কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৫৮, পৃঃ ১৪৫-১৪৬)।

চট্টোপাধ্যায়ের পরে দীর্ঘকাল ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্বের খয়রা অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৯৫৩-১৯৬৪)। এই সময় তাঁর অধ্যাপনায় ভাষাতত্ত্ব ছাড়াও সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজি প্রভৃতি বিভাগ সমৃদ্ধ হয়েছে। একাধারে ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর সমান আগ্রহ। উভয়ক্ষেত্রে তাঁর গভীরতা ও মৌলিক অবদানে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ। সুনীতিকুমারের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য যেমন নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি বহুবিষয়ে ব্যাপ্তি, সুকুমার সেনের মনীষার বৈশিষ্ট্য তেমনি নিজস্ব বিষয়ে গভীরতা ও তন্ময়তা। ভাষা ও সাহিত্য তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্র। এবং ভাষাজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা নানামুখী কৌতূহলে পল্লবগ্রাহী হয়ে উঠে নি। ভাষাবিদ্যার মধ্যেও বিশেষ করে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে তিনি অকৃত্রিম নিশ্ছিদ্র পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় লিখিত বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ। কিন্তু বাংলা ভাষায় লিখিত বাংলার প্রথম উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ব্যাকরণ হল আচার্য সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৩৯)। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব, ভারতীয় ভাষাসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ, সংযত, বৈজ্ঞানিক ভাষায় বাহুল্যবর্জিত আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর গ্রন্থটি অদ্বিতীয়। গ্রন্থটি সম্পূর্ণ মৌলিক নয়, সুনীতিকুমারের গ্রন্থ অনুসরণেই লিখিত। তবু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী। নিত্য-নতুন সংস্করণে তিনি এই গ্রন্থে কিছু কিছু বর্ণনামূলক ভাষা-বিজ্ঞানেরও প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও ধারণাগুলিকে গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করে গেছেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের আধুনিক সংস্করণে স্বনিমের (Phoneme) মূল তত্ত্ব আলোচনা এবং বর্ণনামূলক দৃষ্টিতে আধুনিক বাংলার বাক্যগঠন রীতির (Syntax) বিশ্লেষণ স্মরণ করতে পারি।

ভাষাবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড স্যাপীরের মনোলোকে ভাষা ও সাহিত্য ছিল অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে অন্বিত। আচার্য সুকুমার সেনও সাহিত্যকে দেখেছেন ভাষার সঙ্গে নিত্য-সম্বন্ধে যুক্ত করে। 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' (১৯৩৪) গ্রন্থে তিনি বাংলা গদ্যরীতির ক্রমবিকাশ আলোচনা করেছেন ভাষাবিশ্লেষণের আলোকে। আধুনিক কালে শৈলীবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা গদ্যরীতির যে আলোচনা সূচিত হয়েছে তার দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি অনেকটা পৃথক্ হলেও বাংলা গদ্যের ইতিহাস ও প্রথম ধারাবাহিক ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পাই তাঁর এই গ্রন্থে। আচার্য সুকুমার সেনের ঐতিহাসিক ভাষাজিজ্ঞাসার ক্ষেত্র বাংলা ভাষার গণ্ডির বাইরেও ব্যাপক ভূমিতে প্রসারিত। তাঁর প্রথম জীবনের রচনা 'The Use of Cases in the Vedic Prose' (১৯২৯) থেকেই তাঁর ভাষাজিজ্ঞাসার ব্যাপ্তি পরিলক্ষিত

হয়। 'History and Pre-history of Sanskrit' (১৯৫৮) গ্রন্থে তিনি মূল ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্য বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার জন্ম-কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। তাঁর 'A Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan' (১৯৬০) গ্রন্থে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা পালি ও প্রাকৃতের বিভিন্ন স্তরের রূপবৈচিত্র্য ও তুলনামূলক ব্যাকরণ আলোচিত হয়েছে। নব্য ভারতীয় আর্যভাষার ক্ষেত্রে 'ভাষার ইতিবৃত্তে'র পরে তাঁর উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল 'An Etymological Dictionary Bengali' (১৯৭১)। ১৯৯২ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে যুক্ত প্রথম যুগের অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে ভাষাবিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা ও স্বকীয় ঐতিহ্যে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা দুইই লক্ষ্য করা যায়। একদিকে ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এদেশি ভাষার ঐতিহাসিক অধ্যয়ন, অন্যদিকে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণে সুগভীর পাণ্ডিত্য—এই ধারার সূত্রপাত ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের মধ্যে এবং এর পরিপুষ্টি আচার্য সুকুমার সেনের হাতে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে যাঁরা নব্য-ভারতীয় আর্যভাষার অধ্যয়নে মনোনিবেশ না করে প্রধানত প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তন অধ্যয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় হলেন ড. বটকৃষ্ণ ঘোষ। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে জার্মানি ও ফ্রান্স থেকে প্রাগ্রসর শিক্ষার সঙ্গে স্বদেশীয় ভাষা বৈদিক ও সংস্কৃতে নিবিড় পাণ্ডিত্যের সমন্বয়ে রচিত তাঁর গ্রন্থ 'Linguistic Introduction to Sanskrit' (১৯৩৭) চিরকালের সংস্কৃত-জিজ্ঞাসুদের অপরিহার্য দিগ্‌দর্শক গ্রন্থ হয়ে আছে। সংস্কৃত ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণকে আরো বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিচার করে এবং সমগ্র ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-বংশেরই বিভিন্ন ভাষা ও ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যার আলোচনা করে আধুনিক কালে আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছেন ভাষাতত্ত্ববিদ্ ড. সত্যস্বরূপ মিশ্র। একদা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ববিভাগের অধ্যাপক এবং বর্তমানে কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ ড. মিশ্র তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা 'A Comparative Grammar of Sanskrit, Greek and Hittite' (১৯৬৮) গ্রন্থে ভারতীয় ভাষাবিদ্‌দের মধ্যে প্রথম সংস্কৃতের সঙ্গে হিত্তি ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করেন। ইতিমধ্যে প্রাচীন ভাষা গ্রীক ও লাতিনের তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন Carl Darling Buck তাঁর 'Comparative Grammar of Greek and Latin' গ্রন্থে, কিন্তু এ বিষয়ে অভিনবত্ব বিশেষ ছিল না, কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মান মনীষীরাই তার আসল কাজটুকু করে

রেখেছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে হিত্তি ভাষার আবিষ্কারের পরে সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন সমৃদ্ধ ভাষার সঙ্গে হিত্তি ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা উপেক্ষিত ছিল। ড. মিশ্র এক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের একটি বিশেষ ঘাটতি পূরণ করেছেন। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে কোনো-কোনো সমস্যা প্রসঙ্গে তিনি নতুন আলোকপাত করে কিছু মৌলিক মত প্রকাশ করেছেন তাঁর 'New Lights on Indo-European Comparative Grammar' গ্রন্থে। A. V. A. Jackson-এর পরে আবেস্তার ভাষার আরো বিধিবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক ব্যাকরণ রচনা করেছেন তিনি তাঁর 'Avestan : A Historical and Comparative Grammar' গ্রন্থে। বৈদিক ও সংস্কৃতের সঙ্গে তার সহোদর স্থানীয় ভাষা আবেস্তীয় ও প্রাচীন পারসিকের অধ্যয়নও প্রথমাবধি গুরুত্ব লাভ করেছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এদেশে এই ধারার প্রবর্তন করেছিলেন আই. জে. এস. তারাপুরওয়ালা। তিনি আবেস্তার অংশ-বিশেষের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন।[১১৬] প্রাচীন পারসিক ভাষার প্রত্নলিপির অনুবাদ ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করেন ড. সুকুমার সেন 'Old Persian Inscriptions' গ্রন্থে (১৯৪১)। আবেস্তা ও প্রাচীন পারসিক প্রত্নলিপির আধুনিক সংস্করণ সম্পাদনা করে এযুগের পাঠকদের সবিশেষ উপকার সাধন করেছেন ইরানীয়-ভাষাতত্ত্ববিদ ড. চিন্ময় দত্ত তাঁর 'Selections from Avesta and Old Persian' গ্রন্থে (১৯৭৩)। এই গ্রন্থে মূল পাঠ, ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা ও ভাষাতাত্ত্বিক টীকা থাকায় গ্রন্থটি বিশেষ উপাদেয়। বৈদিক, সংস্কৃত, আবেস্তীয় ও পারসিক ভাষার অধ্যয়নের সঙ্গে-সঙ্গে পরিপুষ্টি লাভ করেছে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষারও অধ্যয়ন। পিশেল্ ও গাইগারের গবেষণার পরে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার অধ্যয়নকে সংহত বিধিবদ্ধ তুলনামূলক রূপদান করেছিলেন আচার্য সুকুমার সেন তাঁর 'A Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan' গ্রন্থে। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার অধ্যয়নকে যাঁরা একালে সমৃদ্ধি দান করেছেন তাঁদের মধ্যে ড. সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা স্মরণীয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'Eastern School of Prakrit Grammarians' (১৯৭৮)। বররুচির প্রাকৃত ব্যাকরণের আধুনিক সংস্করণ প্রকাশ করেও তিনি এবিষয়ে গবেষণার পথ প্রশস্ত করেছেন। একদিকে বৈদিক, আবেস্তীয়, প্রাচীন পারসিক, পালি, প্রাকৃত, অন্যদিকে নব্য ভারতীয় আর্যভাষা বাংলার বিশেষ অধ্যয়নে সমৃদ্ধ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু একদিকে প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা এবং অন্যদিকে নব্য ভারতীয় আর্যভাষা—এর মধ্যবর্তী

১১৬। Sir Asutosh Mookherjee Silver Jubilee Volume, 1921-27.

স্তরটির বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীকালের ভাষাজিজ্ঞাসু ডঃ সুভদ্র কুমার সেনের 'Proto New Indo-Aryan' (১৯৭৩) গ্রন্থে এই ঘাটতি সার্থকভাবে পূরণ করা হয়। ভারতীয় আর্যভাষার এই বিশেষ স্তরটির বিধিবদ্ধ তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার ফলে শুধু বাংলা নয়, সমস্ত নব্য ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাস অধ্যয়ন পূর্ণাঙ্গতা লাভ করবে।

নব্য ভারতীয় আর্যভাষা বাংলার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ এবং বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ রচনার যে ধারা বাংলা ভাষায় আচার্য সুকুমার সেন প্রবর্তন করেন পরবর্তীকালে তার সঙ্গে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় সাধারণ তত্ত্ব যোগ করে আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কৃষ্ণপদ গোস্বামী। তাঁর গ্রন্থটির নাম 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস' (১৯৬৬)। 'Place Names of Bengal' বিষয়ে তাঁর গবেষণাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাতাত্ত্বিক টীকা সম্বলিত যে সংস্করণটি তিনি প্রকাশ করেছেন তা আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার ইতিহাস অধ্যয়নে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে শুরু করে প্রাচীন ভারতীয় আর্য, মধ্য ভারতীয় আর্য ও নব্য ভারতীয় আর্যভাষা বাংলার সুবিস্তৃত ধারাক্রম সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যসহ উল্লেখযোগ্য গবেষণা করে সাম্প্রতিককালে সর্বাধিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ' (১৩৭৮) ও 'বাঙ্‌লা ভাষা পরিক্রমা' (প্রথম খণ্ড ১৩৮৩, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৮৬) যেন পরস্পরের পরিপূরক দু'টি গ্রন্থ। ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ব্যাকরণ এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাংলা ভাষায় আর রচিত হয় নি। বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ধারা এই ভাষাবিজ্ঞানীর হাতে সমৃদ্ধ পরিণতি লাভ করেছে। সংস্কৃত, বাংলা, ওড়িয়া, ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় সুপণ্ডিত ড. মজুমদার বাংলা ভাষা ছাড়াও অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা সম্পর্কে প্রশংসনীয় গবেষণা করেছেন। তাঁর ডি. লিট্. ডিগ্রির গবেষণা-নিবন্ধটি (A Historical Phonology of Oriya, 1970) পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছে।

ঐতিহাসিক ধারায় আর যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে ড. সুকুমার বিশ্বাস ('ভাষাবিজ্ঞান পরিচয়'), পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য ('বাংলা ভাষা'), মুরারিমোহন সেন ('ভাষার ইতিহাস') এবং অতীন্দ্র মজুমদারের ('Bengali Language : Historical Grammar') নাম উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক ও উদীয়মান লেখকগণের মধ্যে ড. নির্মল দাশ, ড. মৃণাল নাথ, ড. গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নামও স্মরণীয়। এঁদের মধ্যে

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নির্মল দাশ বাংলা ব্যাকরণের ক্রমবিকাশ বিষয়ে প্রশংসনীয় গবেষণা করে ভবিষ্যৎ অন্বেষুদের অপরিহার্য প্রয়োজন সিদ্ধ করেছেন।

বর্ণনামূলক ও অন্যান্য আধুনিক ধারা : আধুনিক বঙ্গদেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার যে ধারা নবোদ্যমে সূচিত হয়েছিল তার বিকাশ হয়েছিল প্রধানত ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান-চর্চায়। কিন্তু প্রথমাবধি বর্ণনামূলক ব্যাকরণ রচনার প্রচেষ্টাও দুর্লক্ষ্য নয়। আধুনিক কালে পাশ্চাত্যে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের যে ধারা প্রবর্তিত হয় তার পরিভাষা ও জটিল বিশ্লেষণ-পদ্ধতি অবলম্বিত না হলেও মোটামুটি সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা ব্যবহার করে বাংলা ভাষার বর্ণনামূলক বিশ্লেষণের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে' (১৯৩৯)। তারও আগে ভাষাচার্য 'A Brief Sketch of Bengali Phonetics' (১৯২১) রচনা করেন ; তাতেও আধুনিক বাংলা ভাষার ধ্বনিগুলির এককালিক বর্ণনামূলক বিশ্লেষণই স্থান পেয়েছে। পাশ্চাত্যে তখনো সোস্যুরের বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি এবং ব্লুমফিল্ডের গ্রন্থ (Language, ১৯৩৩) প্রকাশিত হয় নি ; তখন ভাষাচার্য এই গ্রন্থে যে এককালিক বর্ণনামূলক ভাষাবিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছিলেন, আধুনিক কালের পদ্ধতির মানদণ্ডে তাতে অনেক ঘাটতি চোখে পড়লেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রগতিশীলতা সেকালের পক্ষে বিস্ময়কর। বাঙালির পক্ষে গর্বের বিষয় যে, তিনিই আধুনিক বঙ্গদেশে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রেও পথিকৃৎ।

আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার না করলেও বাংলা ভাষার বর্ণনামূলক বিশ্লেষণে আরো একজন পথিকৃৎ ভাষাবিদ্ হলেন অধ্যাপক ড. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। তাঁর 'বাগর্থ' (প্রথম প্রকাশ ১৯৫০) গ্রন্থে চলিত বাংলা ও তার বানান, মেদিনীপুরের প্রাদেশিক ভাষার উচ্চারণ-প্রণালী প্রভৃতি সম্পর্কে এককালিক বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিকে বাংলা ভাষার বিভিন্ন দিকের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনামূলক ব্যাকরণ বলা যায় না ঠিকই, কিন্তু বাংলা ভাষার কোনো-কোনো প্রসঙ্গের আলোচনায় লেখকের নিজস্ব মৌলিক ভাবনার জন্যে গ্রন্থটি স্বীকৃতি লাভ করেছে।

তুলনামূলক ও সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞতা সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে বহুভাষায় অকৃত্রিম পাণ্ডিত্যের উপরে ভিত্তি করেই। এদিক থেকে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ভাষাবিদ্ মনীষী শহীদুল্লাহের ধারার শেষ সার্থক উত্তর-সাধক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের

অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক প্রণবেশ সিংহরায় (জন্ম ১৯১২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হবার পরে ফরাসি ভাষায় এম. এ. পাশ করেন ; পরে জার্মান, রুশীয় প্রভৃতি ভাষায় বিশেষজ্ঞতা লাভ করেন। কর্মজীবনে প্রথমে স্যর্ উইলিয়ম্ জোন্‌সের পদে এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক রূপে যোগদান করেন। পরে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাবিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিভাগীয় প্রধানরূপে যোগদান করেন। এই বিশ্বসাহিত্য-রসিক বহুভাষাবিদ্ ভাষাবিজ্ঞানীর অধ্যাপনায় সমৃদ্ধ হয়েছে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ—ফরাসি, জার্মান, বাংলা ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব। বহুভাষায় বৈদগ্ধ্য ও বহুবিদ্যায় আগ্রহে তিনি ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের উত্তরসূরি, এবং ভাষা ও সাহিত্যের সমন্বিত অধ্যয়নে তিনি আচার্য সুকুমার সেনের অনুগামী। বাংলা সাহিত্যের গদ্যকারদের সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা করেছিলেন ড. সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' গ্রন্থে (১৯৩৪)। এই ধারা অনুসরণ করে, অথচ বহুসংখ্যক গদ্যশিল্পীর সাহিত্য এবং ভাষার মূল বৈশিষ্ট্যের আলোচনা না করে, একজন গদ্যকারের ভাষাশিল্পের পূর্ণাঙ্গ সর্বমুখীন বিশ্লেষণ করেন অধ্যাপক প্রণবেশ সিংহরায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকবৃন্দ বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ গদ্যশিল্পী। তাঁদের সাধনায় বাংলা গদ্য প্রথম রূপলাভ করে, সেই নির্মিতি-পর্বের ভাষাবৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের উপযোগিতা অপরিসীম। কারণ এইরকম নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়েই ভাষার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই পর্বের লেখক রামরাম বসুর গদ্যের বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ করে তিনি সেই সম্ভাবনার বিস্তৃত ভাষাবৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন করেছেন তাঁর 'Rāmrām Basu : A Linguistic Study'[১১৭] নামক রচনায়। তাঁর ভাষাজিজ্ঞাসা শুধু ফরাসি, জার্মান, বাংলা প্রভৃতি সমৃদ্ধ ভাষাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, এদেশের উপজাতিদের ভাষার বিশ্লেষণেও প্রসারিত হয়েছে। সাঁওতালি ভাষার তিনি পূর্ণাঙ্গ বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন : 'Linguistic Sketch of a Santali Idiolect'[১১৮]। ভাষা ও সাহিত্যের নিবিষ্ট অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় যে সমস্ত আত্মপ্রচারবিমুখ বিদগ্ধ মনীষী অকৃত্রিম পাণ্ডিত্যের নিদর্শন হয়ে আছেন, অধ্যাপক প্রণবেশ সিংহরায়ের নাম তাঁদের মধ্যে অবিস্মরণীয়।

১১৭। Bulletin of the Department of Comparative Philology and Linguistics, University of Calcutta, No. II, 1977.

১১৮। Bulletin of the Department of Comparative Philology and Linguistics, University of Calcutta, No. 1: 1976.

বাংলা ভাষার বর্ণনামূলক বিশ্লেষণের প্রাথমিক সূত্রপাত করেছিলেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই ধারা অনুসরণ করে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষা গ্রহণ করে বাংলা ভাষার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণের নিদর্শন রেখে গেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের খয়রা অধ্যাপক ড. দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (১৯২৭-১৯৮১) তাঁর 'বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা'র প্রথম খণ্ডে (১৯৭৫)। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর আগ্রহ থাকলেও এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নিজের গবেষণার বিষয়টি ('বৈদিক গোত্র, গণ, গ্রাম') সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বের (Philology) সঙ্গেই সম্পৃক্ত ছিল। ফলে তাঁর রচনায় বর্ণনামূলক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। অকালে দেহত্যাগ করায় তাঁর ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করতে পারেন নি। তাঁর ইংরাজি রচনা 'Indian Linguistic Researches' (১৯৭৬) এবং 'Old Bengali Structure' (১৯৭৬), 'Bengali Formatives' (১৯৭৯), তিনি 'আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান' প্রণয়নের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

বঙ্গদেশে বর্ণনামূলক ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার যে ক্ষীণ ধারা ইতিপূর্বে দু'একজনের রচনায় আংশিকভাবে সূচিত হয়েছিল তা বর্তমান কালে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চলেছে। যাঁদের গবেষণায় ও অনুশীলনে এই নতুন দিগন্ত উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ আব্দুল হাই, ড. সুহাস চট্টোপাধ্যায়, ড. মুনীর চৌধুরী, ড. শিশির কুমার দাশ, ড. পবিত্র সরকার, ড. রফিকুল ইসলাম, ড. ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, ড. মনিরুজ্জমান, ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, ড. হুমায়ুন আজাদ, ড. মনসুর মুসা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের খয়রা অধ্যাপক ড. সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের আধুনিকতার দীক্ষা আমেরিকায়। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি এখন আমেরিকাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিজ্ঞানে অনার্স এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ. পাশ করার পরে ফুলব্রাইট্ এবং স্মিথ্‌মাণ্ট্ স্কলারশিপ্ নিয়ে তিনি আমেরিকা যান এবং হার্টফোর্ড সেমিনারি ফাউণ্ডেশানে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতিতে 'লেখ্য ও কথ্য বাংলার সম্পর্ক' বিষয়ে গবেষণা করে পি-এইচ্. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে সুনীতিকুমার ও শহীদুল্লাহ্ যেমন তৎকালের লণ্ডন ও পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপকবৃন্দের সাহচর্য লাভ করেছিলেন, তেমনি বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে আধুনিক আমেরিকার সর্বজনবিদিত অধ্যাপক গ্লীসনের নির্দেশনায় গবেষণা করার সুযোগ লাভ করেন তিনি। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের দীক্ষা ড. সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে চিরকাল দৃশ্যমান প্রগতিশীলতায় রূপলাভ করেছে। আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের

পদ্ধতি তিনি সম্পূর্ণ অভিনব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। ত্রিপুরার ভোট-বর্মী বংশের উপজাতি-বিশেষের ভাষা থেকে তথ্য আহরণ করে তাকে তিনি আধুনিক ভাষাবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেন 'ত্রিপুরার কগবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ' (১৯৭২) নামক গ্রন্থে। বাংলা ভাষার মাধ্যমে উপজাতি-বিশেষের ভাষার এমন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এই প্রথম। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষাবিশ্লেষণে Franz Boas যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, বাংলা ভাষায় এদেশীয় আদিবাসীদের ভাষাবিশ্লেষণে সেই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে তিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে নতুনতর ক্ষেত্রে গবেষণার পথ-নির্দেশ দিয়েছেন। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে নয়, বাংলা ভাষার মাধ্যমে উপজাতিদের ভাষা বিষয়ে গবেষণার সফল প্রয়াস আরো কেউ-কেউ করেছেন, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রথম পথ-প্রদর্শকের কৃতিত্ব অধ্যপক চট্টোপাধ্যায়ের প্রাপ্য। আমেরিকায় গবেষণা শেষ করে ড. চট্টোপাধ্যায় কিছুকাল শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞানের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসার ছিলেন। আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি অধ্যাপক দীমকের সঙ্গে মিলিতভাবে রচনা করেন 'Introduction to Bengali'। আধুনিক প্রয়োগমুলক ভাষাবিজ্ঞানে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা (Second Language) শিক্ষাদানের নীতিপদ্ধতি একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করে আছে। অবাঙালি ভাষাশিক্ষার্থীদের জন্যে রচিত বাংলা ভাষা সম্পর্কিত এই গ্রন্থটি প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞানের (Applied Linguistics) ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কৃতী ছাত্র এবং একদা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শিশির কুমার দাশ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত 'ভাষাজিজ্ঞাসা' নামে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন 'চতুষ্কোণ'[১১৯] পত্রিকায়। কিন্তু তাঁর বিধিবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ রচনা হল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পি-এইচ্. ডি. ডিগ্রির গবেষণা-নিবন্ধ 'Early Bengali Prose : Carey to Vidyasagar' (১৯৬৬)। এই গ্রন্থে তিনি প্রথম যুগের বাংলা গদ্য-লেখকদের ভাষাশৈলীর পূর্ণাঙ্গ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। একালে ভাষাবিজ্ঞানে আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানের আলোকে সাহিত্যের ভাষার বিশ্লেষণের যে ধারা সূচিত হয়েছে বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে তার প্রথম সূচনা করেন ড. শিশির কুমার দাশ। ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর একটি গবেষণাপূর্ণ নিবন্ধ হল—'Language and Literature'[১২০]। একাধারে ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ড. শিশির কুমার

১১৯। চতুষ্কোণ, জ্যৈষ্ঠ-চৈত্র, ১৩৮০।

১২০। *Indian Literature*, Indian Institute of Advanced Studies, Simla, 1972

দাশ একটি প্রায়-অনালোচিত দ্রাবিড়ীয় ভাষার গঠনগত বিশ্লেষণ করে ভাষাবিজ্ঞানে আরো একটি প্রশংসনীয় অগ্রণী প্রচেষ্টার নিদর্শন রেখেছেন তাঁর 'Structure of Malto : A Dravadian Language' (Annamalai University, 1973) গ্রন্থে। ভাষাবিজ্ঞান-সম্পৃক্ত তাঁর অন্যান্য গবেষণাপূর্ণ নিবন্ধ হল : 'Forms of Address and Terms of Reference in Bengali' (1968), 'Bengali Linguistic Historiography' (1978), 'Development of Vowel / E / in Bengali' (1977-78), 'Standardization of Hindi and Bengali' (1978) ইত্যাদি।

পাশ্চাত্যের শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে যেসব বাঙালি ভাষাবিজ্ঞানী স্বদেশের ভাষা-বিশ্লেষণে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং মুহম্মদ শহীদুল্লাহের পরেই মুহম্মদ আবদুল্ হাই-এর অবদান স্মরণীয়। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিজ্ঞানে এম. এ. পাশ করার পরে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার ধ্বনি সম্পর্কে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে বিস্তৃত গবেষণা করেন তার প্রকাশ দেখতে পাই আমরা তাঁর তিনটি রচনায়--(১) 'A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Nasalization in Bengali' (১৯৬০), (২) 'The Sound Structures of English and Bengali' এবং (৩) 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' (১৯৬৪)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরে বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তা আজ পর্যন্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রচনা হয়ে রয়েছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞানের স্বনামধন্য ইমেরিটাস্ অধ্যাপক জে. আর্. ফার্থ্ (J. R. Firth)-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন তিনি। ফার্থ্ প্রদর্শিত Prosodic Analysis-এর পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি বাংলার নাসিক্যধ্বনি এবং নাসিক্যীভবন সম্পর্কে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ যন্ত্রনির্ভর গবেষণা করেছিলেন তাকে স্বয়ং ফার্থ্ই স্বীকৃতি জানিয়েছেন : "Mr. Hai has made it very clear that the detailed statements of the prosodic systems in nouns and verbs must be different. Indeed these differences are among the criteria for the establishment of the categories noun and verb in Bengali. Though he has realised the importance of keeping the phonetic, phonological and grammatical levels of analysis distinct in approach and separate in treatment, he has also shown the

value of a close association of his findings at the phonological and grammatical levels.[১২১] ভাষাদৃষ্টির দিক থেকে আবদুল্ হাই মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতোই খাঁটি বাঙালি এবং বাংলা ভাষা-প্রেমিক। পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান সরকার যখন বাংলা ভাষাকে মাত্রাতিরিক্ত আরবি-ফারসি-উর্দু-প্রভাবিত করে স্বধর্ম-ভ্রষ্ট করতে চেয়েছিলেন তখন আবদুল্ হাই তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। বাংলা ভাষাকে পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার মধ্যে বিভক্ত করে তার প্রাণশক্তিকে দুর্বল করারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন 'বাংলা ভাষা পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় বাংলারই অন্তরের জিনিস। এখানে ভেদাভেদ সৃষ্টির যে কোন রকম প্রচেষ্টা নিন্দনীয়।"[১২২] মুহম্মদ আবদুল হাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ থাকা-কালে ভাষাবিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ লাভ ও গবেষণার জন্যে যাঁদের আমেরিকা পাঠিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান-চর্চায় বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেছেন মুনীর চৌধুরী এবং রফিকুল ইসলাম। চার্লস্ এ. ফার্গুসন্ (Charles A. Ferguson)-এর সঙ্গে সহযোগিতায় মুনীর চৌধুরী বাংলা স্বনিম সম্পর্কে সম্পূর্ণ আধুনিক বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে আলোচনা করেছেন তাঁর 'Phonemes of Bengali'[১২৩] প্রবন্ধে। আধুনিক রীতিতে বাংলা ভাষার সামগ্রিক আলোচনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম তাঁর 'ভাষাতত্ত্ব' গ্রন্থে (১৯৭০)। সাম্প্রতিক কালে আমেরিকা থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. পবিত্র সরকারের বিভিন্ন রচনায় ভাষাবিজ্ঞান বৃহত্তর জনসমাজে প্রসার লাভ করেছে। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পরেও আমেরিকায় চম্স্কি-প্রবর্তিত রূপান্তরমূলক-সৃজনমূলক ভাষাবিজ্ঞানের যে আধুনিকতম অধ্যায় সূচিত হয়েছে অধ্যাপক সরকার তারই পদ্ধতি অবলম্বন করে এই তত্ত্বের আলোকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর রচনা হল 'সংবর্তনী সঞ্জননী ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষাবিচারে তার প্রয়োগ।'[১২৪] আধুনিক কালে প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞানের (Applied Linguistics) একটি সমৃদ্ধ ধারা হল পার্থক্যমূলক ভাষা-বিশ্লেষণ

১২১। Foreward, *Nasals and Nasalization in Bengali,* The University of Dacca, 1960. p. iv.

১২২। বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৫।

১২৩। *Language,* Journal of the Linguistic Society of America, Vol. 36, Jan.-March. 1960.

১২৪। রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৪।

(Constrastive Analysis)। দু'টি ভাষার মধ্যে বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলনা করে উভয় ভাষার স্বাতন্ত্র্য উদ্‌ঘাটনের দ্বারা প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞানের মূল উপাদান প্রস্তুত হয়। তারপরে এই উপাদান কাজে লাগিয়ে যে কোনো একটি ভাষা (target language) শিক্ষাদান করার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি পরিচিত ভাষার মাধ্যমে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দিলে প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দু'টি ভাষার মধ্যে তুলনা করে উভয় ভাষার স্বাতন্ত্র্য উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে এদেশে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন মুহম্মদ আবদুল্ হাই তাঁর 'The Sound Structures of English and Bengali' (১৯৬১) গ্রন্থে। এক্ষেত্রে অধ্যাপক W. J. Ball-এর সঙ্গে সহযোগিতায় আবদুল হাই ইংরেজি ও বাংলা ভাষার যে ধ্বনিতাত্ত্বিক তুলনা করেছিলেন তাতে প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। এই ধারাকে নতুনতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলাম আমি আমার গবেষণায়—'A Comparative Study in the Phonological Systems of Bengali and German'। বাংলা এবং জার্মান ভাষার তুলনামূলক ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা এই প্রথম। প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞানের আরো একটি সমৃদ্ধ ধারা হল উপভাষা-অধ্যয়ন। বাংলা উপভাষাগুলি সম্পর্কে প্রথম সামগ্রিক আলোচনা করেন জর্জ্ আব্রাহাম্ গ্রীয়ার্সন্ বহু বছর আগে। তারপরে দীর্ঘকালের ব্যবধানে আধুনিক কালে বাংলা উপভাষাগুলি সম্পর্কে গবেষণায় নতুন উদ্যম দেখা যায়। এক্ষেত্রে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের সকলের তালিকা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েক জনের কথা উল্লেখ করতে পারি : ড. অনিমেষ কান্তি পাল (পূর্ববাংলার একটি উপভাষা), ড. শ্যামাপ্রসাদ দত্ত (উলুবেড়িয়ার উপভাষা), ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (কামরূপী উপভাষা), ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক (প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা), ড. ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক (সামাজিক উপভাষা : 'অপরাধ জগতের ভাষা'), ড. শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী (সিলেটী উপভাষা), ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা (ঝাড়খণ্ডী উপভাষা : 'ভাষাতত্ত্ব ও ভারতীয় আর্যভাষা', ১৯৭১), ড. রেখা সিংহ (মানভূমের উপভাষা), ড. নির্মল দাশ (সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ : 'উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ'), ড. অসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (নদীয়া জেলার উপভাষা), ড. শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (মুর্শিদাবাদ জেলার উপভাষা), ড. সত্যনারায়ণ দাশ (বীরভূমের ভাষা ও শব্দকোষ) ইত্যাদি। এরকম গবেষণা যথেষ্টই হচ্ছে। এসব গবেষণার সামগ্রিক তালিকা রচনা করার উপযোগিতা এখানে নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রশংসনীয় গবেষণা হলেও সামগ্রিকভাবে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে সেই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে গবেষণার উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। যে ক'টি গবেষণা হয়েছে, তা

অধিকাংশই ব্যক্তিগত প্রয়াসে, কখনো বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-নিবন্ধ হিসাবে। ফলে গবেষণাগুলি বিচ্ছিন্ন। কেউ জেলাভিত্তিক গবেষণা করেছেন, কেউ বা শুধুই একটি মহকুমার বা একটি শহরের উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এতে বাংলার উপভাষা-সমূহের সামগ্রিক (integrated) চিত্র ফুটে উঠছে না। আগেকার মনীষীরা যে ক'টি প্রধান উপভাষার উল্লেখ করে বাংলা উপভাষার সামগ্রিক চিত্র দেবার চেষ্টা করেছিলেন, সেগুলি নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট আছি। কিন্তু তাঁদের নির্ণীত উপভাষাগুলি পুনরায় যাচাই করার প্রয়োজন আছে। আগেকার নির্ণয় পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত ছিল না বলেই ভাষাতত্ত্ববিদ্ ড. সেনও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, "তন্নতন্ন করিয়া বাঙ্গালা উপভাষার ভৌগোলিক জরিপ (Dialect Geography) এখনও প্রস্তুত হয় নাই।"[১২৫] এতে প্রমাণ হয় বাংলা ভাষা-বিষয়ক গবেষণায় উপভাষাগুলি সম্পর্কে পরিকল্পিত গবেষণার উপযোগিতা এখনো রয়েছে। উপভাষা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে দু'জন তরুণ গবেষকের কাজ উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে : ড. পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য (বাংলা বাগ্‌ধারা বা ইডিয়ম) এবং মানস ঘোষ (বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ)।

॥ ৮ক ॥

কৃত্রিম আন্তর্জাতিক ভাষা : বিশ্বভাষা এস্‌পেরান্তো
(Artificial International Language : Esperanto)

প্রত্যেক জাতির ভাষা যেমন তার নিজস্ব সংস্কৃতির বাহক এবং তার স্বাতন্ত্র্যের দ্যোতক, তেমনি ভাষার পার্থক্য আবার আন্তর্জাতিক যোগাযোগে প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। ভাষাগত ভেদবোধ অনেক ভয়াবহ বীভৎসতার কারণ। মাতৃভাষাকে উপলক্ষ করে এই ভাষাগত ভেদবুদ্ধি আমরা গড়ে তুলি, অথচ যে-কোনো মাতৃভাষাই 'গোরা'র হিন্দুধর্মের মতোই অর্জিত জিনিস। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা শিখে বা অনুবাদের মাধ্যমে আমরা এই ভাষার গণ্ডি অতিক্রম করার চেষ্টা করি। কিন্তু এরকম একটি বা দু'টি ভাষা শিখে সব দেশে সব জাতির সঙ্গে ভাব-বিনিময় করা যায় না। হরিনাথ দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত গুপ্ত বা প্রণবেশ সিংহরায়ের মতো বহু ভাষাবিদ্ (polyglot) হবার ইচ্ছা,

---

১২৫। সেন, ড. সুকুমার : 'ভাষার ইতিবৃত্ত', কলকাতা : ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭১, পৃঃ ১৭৬।

প্রবণতা, মনীষা ও অবকাশ সকলের থাকে না। সে ক্ষেত্রে যদি এমন একটিমাত্র কোনো ভাষা থাকত যা শিখলে সব দেশে সব জাতির সঙ্গে মোটামুটি ভাব-বিনিময় করা যায়, তা হলে আমাদের পরিশ্রম ও সময় অনেক বেঁচে যেত। এককালে ফরাসি ভাষা প্রায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল, পরে ইংরেজি ভাষা আন্তর্জাতিক প্রসার লাভ করে। কিন্তু এখন ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রও অনেকটা সঙ্কুচিত হয়ে আসছে ; এবং জার্মান, ফরাসি, ইতালীয়, রুশীয় প্রভৃতি ভাষার সমৃদ্ধি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় এসব দেশের লোকেরা আত্মমর্যাদার সঙ্গে নিজেদের ভাষাকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। অথচ পৃথিবীর চিরকালের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মনীষীরা আন্তর্জাতিক ভাব-বিনিময় ও বিশ্বমানবতার স্বপ্ন দেখেছেন। এ কালের জড়বাদী দার্শনিকদের মধ্যে কার্ল্ মার্ক্স্ জাতিগতসীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক মানবতার প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর দর্শনকে রাজনৈতিক সক্রিয়তায় রূপায়িত করতে চেয়েছেন। ভাববাদী কবি-দার্শনিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবতার রূপায়ণের জন্যে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ; শ্রীঅরবিন্দ সমগ্র মানবজাতির ক্রমিক দিব্যায়নের জন্যে যে যোগভিত্তিক বিশ্ববিদ্যার মিলনকেন্দ্র গড়েছিলেন তার নাম 'আন্তর্জাতিক' শিক্ষাকেন্দ্র। পৃথিবীর বহু মনীষী বিশ্ব-ঐক্য এবং এক-বিশ্ব (Onc World)-এর কথা চিন্তা করেছেন। এই বিশ্ব-ঐক্য ও আন্তর্জাতিক ভাবনা ভাষাজিজ্ঞাসুদের মনে অনেক আগে থেকেই দানা বেঁধে উঠেছে। তাঁরা জাতিতে-জাতিতে ভাষাগত ব্যবধান দূর করার জন্যে বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক ভাষা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। অথচ প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ভাষা তার স্বাভাবিক বিকাশ, প্রকৃতির দান। প্রকৃতি বিভিন্ন জাতির জন্যে একটিমাত্র ভাষা গড়ে তোলে নি। সুতরাং সব জাতির জন্যে একটিমাত্র ভাষা গড়ে তুললে সেটা হবে মানুষের সচেতন পরিকল্পনায় গড়ে-তোলা কৃত্রিম ভাষা। এ রকমের কৃত্রিম সর্বজনীন ভাষার কথা প্রথম চিন্তা করেছিলেন দার্শনিক দেকার্ত্ (Descartes) খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। তারপরে জার্মান মনীষী শ্লেয়ের্ (Schleyer) একটি আন্তর্জাতিক ভাষার পরিকল্পনা করেন, তার নাম ফোলাপ্যুক্ বা ভোলাপ্যুক (Volapuk)। বিভিন্ন সময়ে মনীষীরা এ রকমের আরো যে-সব আন্তর্জাতিক ভাষার পরিকল্পনা করেন সেগুলি হল Idiom neutral, Ido, Latino sine flexione, Antido, Occidental, Novial ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। সবশেষে যে কৃত্রিম আন্তর্জাতিক ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করে তা হল এস্পেরান্তো (Esperanto)। পোল্যাণ্ডের চক্ষুচিকিৎসক ড. এল্. এল্. জামেনহফ্ (Dr. L. L. Zamenhof, ১৮৫৯-১৯১৭) ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে এস্পেরান্তো বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এস্পেরান্তো ভাষা আন্তর্জাতিক ভাব-বিনিময়ের জন্যে

অতিরিক্ত একটি সহজ ভাষা মাত্র। কোনো দেশের জাতীয় ভাষার স্থান গ্রহণ করার পরিকল্পনা তার নেই। এই ভাষায় বিশেষজ্ঞরা একথা স্পষ্ট করেই স্বীকার করেছেন যে, "Esperanto is intended as a simple second language for all mankind, so that each of us may have it within his power to speak to, and to understand, any of his fellow men throughout the world. It is in no way opposed to the national languages ; on the contrary, it creates in those who learn it an interest in the whole matter, and this very often leads to their learning one or more of the national languages."[১২৬]

এই ভাষাকে খুব সহজ করার চেষ্টা করা হয়েছে নানা দিক থেকে। যেমন, (১) এর বানান খুব বিধিবদ্ধ ও উচ্চারণ-অনুসারী। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখব যে প্রায় সব ভাষারই বানানে ও উচ্চারণে কিছু বৈষম্য থাকে ; বানান লেখা হয় এক রকম, উচ্চারণ করা হয় অন্য রকম। যেমন—'পদ্ম' শব্দের বানানে 'ম্' আছে, কিন্তু আমরা বাংলায় 'ম্' উচ্চারণ করি না। এস্‌পেরান্তো ভাষায় এই বৈষম্য রাখা হয় নি। যেমন, aḿ = আম্ = ভালবাসা, art = আর্ট = শিল্প, knab = ক্নাব্ = বালক, libŕ = লিব্র্ = বই। (২) এই ভাষার ব্যাকরণ অত্যন্ত সোজা। আমরা জানি সংস্কৃতে শব্দরূপ ও ধাতুরূপে, লিঙ্গ ও বচনে কত জটিলতা। কিন্তু এস্‌পেরান্তো ভাষার ব্যাকরণ অতি সংক্ষিপ্ত, মাত্র ১৬টা নিয়মে শেষ। যেমন একটা নিয়ম হল—পুরুষ ও বচন অনুসারে ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হবে না, একই থাকবে। যেমন—

Mi *dormas* noktE = আমি রাত্রে ঘুমাই।

Li *dormas* noktE = সে রাত্রে ঘুমায়।

বাংলায় উত্তম পুরুষের ক্রিয়া হল 'ঘুমাই', কিন্তু প্রথম পুরুষের ক্রিয়া 'ঘুমায়'। কিন্তু এস্‌পেরান্তো ভাষায় সব পুরুষে ক্রিয়ার একই রূপ—যেমন উপরের উদাহরণে dormas। (৩) এই ভাষার শব্দভাণ্ডারও অনেক কম। যে-কোনো সমৃদ্ধ ভাষার শব্দভাণ্ডারের প্রায় এক-দশমাংশের সমান হল এস্‌পেরান্তোর শব্দভাণ্ডার।

১২৬। Cresswell, John and Hatley, John : *Esperanto*, London ; The English Universities Press Ltd., 1970. p. 9.

এইরকম ভাবে এস্‌পেরান্তো ভাষাকে সহজ করা হয়েছে। এবং যথাসাধ্য সব ভাষা থেকে উপাদান নিয়ে একে গড়ে তোলা হয়েছে। এই ভাষার প্রচারের জন্যে বিভিন্ন Esperanto Association-ও গড়ে তোলা হয়েছে।[১২৭] পৃথিবীর ভাষাবিজ্ঞানীরা অনেকেই এই ভাষা শিক্ষা করে থাকেন। কিন্তু এখনো জনসাধারণে এই ভাষা বিশেষ প্রচার লাভ করে নি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এই ভাষাকে ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমরূপে গ্রহণ না করলে এই ভাষার ব্যাপক স্বীকৃতি সম্ভব নয়। অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে যে, শুধু একটি ভাষার সাহায্যে আন্তর্জাতিক ভাব-বিনিময় বর্ধিত করা যায় না। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের চর্চা, তুলনামূলক সাহিত্যপাঠে প্রীতি এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব চর্চায় উৎসাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ না হলে শুধু একটি আন্তর্জাতিক ভাষা মানব-ঐক্য গড়ে তুলতে পারে না।

॥ ৮খ ॥

রোমীয় বর্ণমালা ও আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা
(Roman Alphabet & International Phonetic Alphabet)

রোমীয় বর্ণমালা : ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিপিবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে আমরা বলেছি যে, স্থান ও কালের সীমা অতিক্রম করে যাতে একস্থানে উচ্চারিত মানুষের ভাষা অন্য স্থানে পৌঁছাতে পারে, এক কালের ভাষা যাতে অন্য কালের মানুষের কাছে যেতে পারে, তার জন্যে মানুষ নানা মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে থাকে. লিপি-পদ্ধতি হল তার এই রকমের মাধ্যমগুলির মধ্যে অন্যতম। এই জন্যে মানুষ তার মুখের ভাষাকে লিখে রাখার জন্যে ধাপে ধাপে নানা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। তাই প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব লিখন পদ্ধতি বা লিপি (script) গড়ে উঠেছে। অনেক সময় আবার একাধিক ভাষা প্রায় একই লিপি ব্যবহার করে। যেমন—সংস্কৃত, হিন্দি, মারাঠি ও নেপালি ভাষা দেবনাগরী

১২৭। (১) Universala Esperanto Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando. (২) Federacio Esperanto de Bharato-Kalkato, Hind Apartment, (Room No 216), 545, G. T. Road (S), 2nd Floor, Howrah 711101 (Enquiry : Sj. S. S. Pal).

লিপিতেই লেখা হয়, শুধু দু'একটি বর্ণের (letter) ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। তেমনি বাংলা ও অসমিয়া ভাষাও প্রায় একই লিপিতে লেখা হয়। অন্যদিকে একই ভাষা এক-এক অঞ্চলে এক-এক লিপিতে লেখা হয়। যেমন, সাঁওতালি ভাষা কোথাও বাংলা লিপিতে, কোথাও দেবনাগরী লিপিতে এবং কোথাও রোমীয় লিপিতে লেখা হয়। সম্প্রতি এই ভাষার নিজস্ব লিপি (অলচিকি) প্রবর্তিত হয়েছে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনো ভাষা প্রাচীন কাল থেকে একটি লিপিতে লেখা হত, পরে সে সেই লিপি ছেড়ে অন্য ভাষার লিপিকে গ্রহণ করে। যেমন মারাঠি ভাষা আগে যে লিপিতে লেখা হত, তার নাম ছিল 'মোড়ী' লিপি ; এখন সেই লিপি ত্যাগ করে মারাঠি ভাষা দেবনাগরী (বালবোধ) লিপিতে লেখা হয়। জার্মান ভাষা আগে গথিক লিপিতে লেখা হত, এখন তা লেখা হয় আধুনিক রোমীয় লিপিতে (Roman Script)। এই রোমীয় লিপি আধুনিক কালের ইউরোপের ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি অধিকাংশ ভাষায় গৃহীত হয়েছে এবং আমরা ভারতবর্ষেও এই লিপি মাঝে-মাঝে ব্যবহার করি। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে এই লিপির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। তাই এই সূত্রে রোমীয় লিপি কি রকম তা আমরা মোটামুটি জানি।

লাতিন ভাষা লেখার জন্যে রোমে এই লিপি ব্যবহার করা হত বলে একে রোমীয় বর্ণমালা (Roman Alphabet) বা লাতিন বর্ণমালা (Latin Alphabet) বলে। মূল লাতিন বর্ণমালার জন্ম খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে হয়েছিল। আগেকার পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, গ্রীক বর্ণমালা থেকে লাতিন বর্ণমালার জন্ম। এখনকার পণ্ডিতেরা মনে করে এট্রুস্কান্ (Etruscan) বর্ণমালা থেকে লাতিন বর্ণমালার জন্ম। এই লাতিন বর্ণমালা থেকে নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক রোমীয় লিপির (Roman Script) বিকাশ হয়েছে। এই বর্ণমালা অনেকটা বৈজ্ঞানিক এবং মুদ্রণাদি ব্যাপারে সুবিধাজনক। এই লিপিতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সব পরিষ্কার করে পৃথক্-পৃথক্ লেখা হয় বলে ভাষার ধ্বনিগুলি পৃথক্-পৃথক্ চেনা যায়। যেমন, বাংলায় 'মামা' শব্দটিতে চারটি ধ্বনি আছে—ম্ + আ + ম্ + আ। এখানে 'আ' ধ্বনিটি শুধু আকারের চিহ্ন (া) দিয়ে লেখা হয় বলে সাধারণ লোকে 'আ' ধ্বনিটি পৃথক্ করে ধরতে পারে না। কিন্তু রোমীয় লিপিতে এটি পৃথকভাবে লেখা হয় 'ā' বর্ণ দিয়ে, যেমন—māmā। 'মামা' শব্দে আকার চিহ্ন (া) আছে বলে 'আ' ধ্বনি তবু ধরা যায়। কিন্তু যদি বলি 'মরণ' তা হলে 'ম্'-এর সঙ্গে যে একটি 'অ' উচ্চারিত হচ্ছে তা আমরা লক্ষ্যও করি না। অথচ 'ম'-এর মধ্যে এখানে একটি 'অ' ধ্বনি আছে। রোমীয় লিপিতে এটি স্পষ্ট করে পৃথক্ বর্ণ 'a' দিয়ে লেখা হয়। যেমন—মরণ = maran। এইসব কারণে রোমীয় লিপি অনেকটা বৈজ্ঞানিক। তা ছাড়া আগেকার

অনেক জটিল লিপির চেয়ে এই লিপি মুদ্রণ টাইপ ইত্যাদির ব্যাপারে সুবিধাজনক। তাই আধুনিক কালে ইউরোপে এই লিপি ব্যাপকভাবে গৃহীত হচ্ছে।[১২৮] নানা সুবিধার জন্যে ইংরেজির মাধ্যমে এই লিপি সব দেশে পরিচিতি লাভ করেছে বলে এখন আমরা আমাদের দেশেরও কোনো কোনো ভাষার লেখাকে যখন ব্যাপক পরিচিতি দিতে চাই তখন কোনো কোনো ভারতীয় ভাষাকে রোমীয় লিপিতে লিখে থাকি। তবে আমাদের বিশেষ বিশেষ ধ্বনির উচ্চারণ বোঝাবার জন্যে আমরা রোমীয় বর্ণের সঙ্গে কিছু কিছু বিশেষক ধ্বনিচিহ্ন (diacritical marks) যোগ করি। আমরা যখন ইংরেজিতে বাংলা নাম লিখি তখন আমরা মোটামুটি রোমীয় লিপিই অনুসরণ করি। যেমন—রমেশচন্দ্র = Ramesh Chandra। সুতরাং রোমীয় লিপি লেখায় আমরা প্রায় অভ্যস্ত। তবে সূক্ষ্মভাবে বিশেষক ধ্বনিচিহ্ন ব্যবহার করে আমরা নামগুলি লিখি না। বিশেষক ধ্বনিচিহ্ন (diacritical marks) ব্যবহার করে ঐ নামটি লিখলে লেখাটি হবে এই রকম—রমেশচন্দ্র = Rameścandra। আমাদের প্রচলিত অভ্যাস থেকে সূক্ষ্ম ধ্বনিচিহ্ন-যুক্ত সঠিক রোমীয় লিপি মাত্র কয়েকটি বর্ণের ক্ষেত্রে একটু পৃথক্ হবে। কতকগুলি বর্ণ আমরা রোমীয় লিপিতে নামের বানানে সাধারণত লিখতে অভ্যস্ত এইভাবে :—আ = a, ঈ = i/ee, ঊ = u/oo, ঋ = ri, চ্ = ch, ছ্ = chh, ঞ্ = n, ট্ = t, ঠ্ = th, ড্ = d, ঢ্ = dh, ণ্ = n, য্ = j/y; শ্ = sh, ষ্ = sh ইত্যাদি। কিন্তু এখন সংস্কৃত, প্রাকৃত, বাংলা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা লেখার জন্যে বিশেযক ধ্বনিচিহ্ন (diacritical marks) যোগ করে যে রোমীয় লিপি অনুসরণ করা হয় তাতে উপর্যুক্ত বর্ণগুলি এইভাবে লিখতে হবে। যেমন—আ = ā, ঈ = ī, ঊ = ū, ঋ = ṛ, চ্ = c, ছ = ch, ঞ = ñ, ট্ = ṭ, ঠ্ = ṭh, ড্ = ḍ, ঢ্ = ḍh, ণ্ = ṇ, য্ = y, শ্ = ś, ষ্ = ṣ ইত্যাদি। কেবল ড়্ ও ঢ়্-এর জন্যে কোনো সুনির্দিষ্ট রোমীয় চিহ্ন নেই। কেউ লেখেন ṛ, ṛh, কেউ লেখেন ḍ, ḍh; কিন্তু এতে একদিকে ঋ ও অন্যদিকে ড্ ও ঢ্-এর সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। তাই আমরা ড় ও ঢ়-এর জন্যে যথাক্রমে ṛ ও ṛh চিহ্ন ব্যবহারের প্রস্তাব দিই। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা সম্পর্কে আলোচনার শেষে একসঙ্গে সমস্ত সংস্কৃত ও বাংলা বর্ণের জন্যে অধুনা প্রচলিত

১২৮। "The 'national' scripts of the various European peoples are, with a few exceptions, adaptations of the Latin alphabet to Germanic, Romance, Slavonic and Finno-Ugrian languages."–Diringer, David : *The Alphabet,* Vol. I. London : Hutchinson and Co. (Pub.) Ltd,–1968, p. 427.

রোমীয় বর্ণমালার চিহ্নের পূর্ণাঙ্গ তালিকা এবং সংস্কৃত ও বাংলা ধ্বনির জন্যে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার চিহ্নের পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেওয়া হবে।

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা : মানুষের জীবন্ত ভাষা নিত্য পরিবর্তনশীল। অথচ মানুষের লিপি-পদ্ধতি ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে সব সময় তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয় না ; ভাষা প্রগতিশীল, কিন্তু লিপি-পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল। এই কারণে ভাষা ও লিপির মধ্যে ক্রমশ ব্যবধান গড়ে উঠে। এছাড়া একটি ভাষা থেকে অন্য ভাষার পার্থক্যও অনেক সময় খুব বেশি হয়। এক ভাষার ধ্বনির সঙ্গে অন্য ভাষার ধ্বনি পুরোপুরি মেলে না। ফলে এক ভাষার বর্ণমালা বা লিপি-পদ্ধতি দিয়ে অন্য ভাষার ধ্বনি বা উচ্চারণ সব সময় লেখা যায় না। এই সব কারণে ভাষার লিপি-পদ্ধতিতে সাধারণত নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। যদিও লিপি-পদ্ধতি নানা রকম হতে পারে, তবু লিপি-পদ্ধতির মূল সমস্যাগুলি সহজ করে বুঝে নেবার জন্যে আমরা এখানে মোটামুটিভাবে ধরে নিতে পারি যে, ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে এক-একটা ধ্বনি, আর ধ্বনির লিখিত রূপের নাম বর্ণ (letter)। ধ্বনি হচ্ছে শ্রব্য—তা কানে শোনবার জিনিস, আর বর্ণ হচ্ছে তার দৃশ্য রূপ—তা চোখে দেখে পড়বার জিনিস। এই বর্ণের সাহায্যে ধ্বনিগুলিকে লিখে রেখে তাদের আমরা স্থায়ী রূপ দিই। কিন্তু ধ্বনির সঙ্গে বর্ণের যখন ঠিক-ঠিক মেলে না তখন লিখন-পদ্ধতিতে সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা প্রধানত তিন রকমের—

এক : কখনো কখনো একাধিক ধ্বনি একটাই বর্ণ দিয়ে লিখতে হয়, প্রত্যেকটার জন্যে পৃথক্ বর্ণ পাওয়া যায় না। এরকম হয় যখন দেখা যায়, ভাষায় কোনো একটি ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে, তাকে কানে অন্য ধ্বনি থেকে পৃথক্ করে শোনাও যাচ্ছে, অথচ সেটা লিখে ফেলার জন্যে স্বতন্ত্র বর্ণ নেই। যেমন বাংলা 'অ্যা' (æ) ধ্বনি। অ্যাক্টা (one), অ্যাখন (now), অ্যামন (like this) প্রভৃতি শব্দে এই ধ্বনিটি আমরা পরিষ্কার শুনতে পাই। 'এরা', 'এসব' প্রভৃতি শব্দে যে 'এ' ধ্বনি আছে তা থেকে ঐ 'অ্যা' ধ্বনির উচ্চারণ আলাদা। অথচ এই 'অ্যা' ধ্বনিটি লিখে রাখার জন্যে বাংলা বর্ণমালায় কোনো পৃথক্ বর্ণ নেই। তাই 'এ' বর্ণ দিয়েই লেখা হয়। 'এ' ধ্বনি ও 'অ্যা' ধ্বনি লেখার জন্যে বাংলায় একটাই বর্ণ আছে—'এ'। ফলে আমরা 'অ্যাখন' লিখতে গিয়ে 'এখন' লিখি। এই শব্দ তাই অবাঙালিরা পড়তে গিয়ে 'অ্যা' উচ্চারণ না করে 'এ' উচ্চারণ করলে শব্দটা হাস্যাস্পদ শোনাবে। বাংলায় 'এসব', 'এরা' প্রভৃতি শব্দের 'এ' এবং 'অ্যাখন', 'অ্যামন' প্রভৃতি শব্দের 'অ্যা' দু'টি পৃথক্ ধ্বনি, অথচ এই দু'টি ধ্বনি লেখার জন্যে বাংলায় পৃথক্ বর্ণ নেই। তাই আমরা একটা বর্ণ 'এ' দিয়ে দু'টি ধ্বনিই লিখে থাকি। এটা আমাদের বর্ণমালার ঘাটতি, আমাদের

লিখন-পদ্ধতির ত্রুটি। এরকম ত্রুটি সব ভাষার প্রচলিত বর্ণমালাতেই অল্প-বিস্তর দেখা যায়। ইংরেজিতে 'উ' ধ্বনি এবং 'আ' ধ্বনি অনেক সময় একটাই বর্ণ দিয়ে লেখা হয়। যেমন—'put' শব্দে 'u'-এর উচ্চারণ হল 'উ' এবং 'but' শব্দে 'u'-এর উচ্চারণ হল 'আ'। তার মানে একই 'u' বর্ণ দিয়ে কখনো 'উ' ধ্বনি, কখনো 'আ'-ধ্বনি লেখা হচ্ছে। জার্মান ভাষায় তেমনি 'spiel' [শ্পীল্] (খেলা) শব্দে 's'-এর উচ্চারণ 'শ্'। আবার 'singen' [জিঙন্] (গান করা) শব্দে 's'-এর উচ্চারণ 'জ' [z]। অর্থাৎ একই বর্ণ 's' দিয়ে দু'টো ধ্বনি লেখা হচ্ছে, কখনো 'শ্', কখনো 'জ্' ধ্বনি। ফরাসি এবং ইতালীয় ভাষায় একই 'e' বর্ণ দিয়ে কখনো 'এ' ধ্বনি বোঝান হয়, কখনো 'এ্যা' ধ্বনি বোঝান হয়। যেমন—ফরাসিতে 'elle' [এ্যাল্] (সে [স্ত্রী] = she) শব্দে প্রথম 'e'-এর উচ্চারণ হল 'এ্যা'। আবার 'et' [এ] (এবং) শব্দে 'e'-এর উচ্চারণ হল 'এ'। তেমনি ইতালীয় ভাষায় 'seta' [সেতা] (রেশম) শব্দে 'e'-এর উচ্চারণ 'এ' ; কিন্তু 'bello' [ব্যেল্লো] (সুন্দর) শব্দে 'e'-এর উচ্চারণ 'এ্যা'। তার মানে একই 'e' বর্ণ দিয়ে দু'টো ধ্বনি লেখা হচ্ছে, কখনো 'এ', কখনো 'এ্যা', অর্থাৎ একই বর্ণের দু'জায়গায় দু'রকম উচ্চারণ। কারণ দু'টি ধ্বনি লেখার জন্যে দু'টি পৃথক্ বর্ণ নেই। কিন্তু আদর্শ বর্ণমালা এমন হবে যে তাতে প্রত্যেক ধ্বনি লেখার জন্যে একটি করে পৃথক্ বর্ণ থাকবে।

দুই : অনেক সময় দেখা যায় যে, আমরা বাস্তবে একটাই ধ্বনি উচ্চারণ করি, সেটা কানে শোনায়ও একটাই ধ্বনিরূপে, কিন্তু কানে একই রকম শোনালেও আমরা একটাই ধ্বনিকে কখনো একটা বর্ণ দিয়ে, কখনো অন্য বর্ণ দিয়ে লিখি, অর্থাৎ ধ্বনি একটা কিন্তু তার জন্যে বর্ণ রয়েছে দু'টো বা তারও বেশি। যেমন বাংলায় 'পণ' আর 'মন' শব্দে যে 'ণ' ও 'ন' তা দু'টো আলাদা ধ্বনি নয়, একই ধ্বনি। কারণ বাংলায় দু'টোরই উচ্চারণ এক, দু'টোই কানে একই রকম শোনাচ্ছে। তাই বাংলায় দু'টি এখন একই ধ্বনি। অথচ এই একই ধ্বনিকে বাংলায় কখনো 'ণ' দিয়ে লেখা হয়, কখনো 'ন' দিয়ে। এখানে একই ধ্বনির জন্যে দু'টি বর্ণ রয়েছে। এমনটি হয়েছে এইজন্যে যে বাংলা বর্ণমালায় এখনো সংস্কৃতকেই অনুসরণ করা হয়। সংস্কৃতে এই দু'টি পৃথক্ বর্ণের সার্থকতা ছিল, কারণ এই দু'টি আলাদা ধ্বনি ছিল, এদের উচ্চারণ আলাদা ছিল, ধ্বনি দুটি কানে শোনাতো আলাদা। সংস্কৃতে মূর্ধন্য 'ণ্' (ण्)-এর উচ্চারণ ছিল অনেকটা ড়্-এর মতো ; আর দন্ত্য 'ন্' (न्)-এর উচ্চারণ ছিল বাংলা 'ন্'-এরই মতো। কিন্তু বাংলায় এখন মূর্ধন্য 'ণ্'-এর পৃথক্ উচ্চারণ নেই, এর উচ্চারণ দন্ত্য 'ন্'-এরই মতো, 'পণ' শোনায় 'পন'-এরই মতো। এখন বাংলা উচ্চারণে 'ণ্' ও 'ন্' দু'টো আলাদা ধ্বনি নয়, একটাই ধ্বনি। অথচ একই ধ্বনিকে বানানে লেখা

হচ্ছে কখনো 'ণ' কখনো 'ন্' রূপে। এখানে একই ধ্বনির জন্যে দু'টি বর্ণের ব্যবহার প্রচলিত আছে। ইংরেজিতেও এরকম দেখা যায়। 'Cat' শব্দে 'c'-এর উচ্চারণ হল 'ক্', আবার 'Kill' শব্দে 'k'-এরও উচ্চারণ হল 'ক্'; অর্থাৎ একই ক্-ধ্বনি দু'টি বর্ণ (c ও k) দিয়ে লেখা হয়। জার্মান ভাষায় 'Kaiser' [কাইজর্] (সম্রাট) শব্দে 'ai'-এর উচ্চারণ 'আই', আবার 'rein' [রাইন্] (পবিত্র) শব্দে 'ei'-এরও উচ্চারণ 'আই'। অর্থাৎ একই 'আই' বোঝাতে কখনো 'ai' ও কখনো 'ei' লেখা হয়। অবশ্য জার্মান ভাষায় এরকম বৈষম্য খুবই কম। জার্মান ভাষা অনেকটা সংস্কৃতের মতো খুবই বিধিবদ্ধ। ফরাসি ভাষায় célébrer [selébre] (to celebrate) শব্দে 'c'-এর উচ্চারণ 'স্' [s] আবার sembler [sã ble] (প্রতিভাত হওয়া, মনে হওয়া) শব্দে 's'-এরও উচ্চারণ 'স' [s]; দেখা যাচ্ছে একই স্-ধ্বনি কখনো 'c' দিয়ে, কখনো 's' দিয়ে লেখা হয়। অর্থাৎ একটা ধ্বনির জন্যে দু'টি বিকল্প বর্ণ প্রচলিত আছে। কিন্তু ভাষার ঠিক-ঠিক উচ্চারণ বুঝিয়ে দেবার জন্যে আদর্শ বর্ণমালায় একটি ধ্বনির জন্যে একটাই বর্ণ থাকা উচিত, একের বেশি বর্ণ যেন না থাকে।

ভি : রোমের সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ (Charles V) নাকি একবার বলেছিলেন—"আমি ভগবানের সঙ্গে স্পেনীয় ভাষায় কথা বলি, নারীর সঙ্গে ইতালীয় ভাষায় কথা বলি, পুরুষের সঙ্গে ফরাসি ভাষায় কথা বলি এবং আমার ঘোড়ার সঙ্গে আমি জার্মান ভাষায় কথা বলি।"—

"I speak Spanish to God, Italian to women,
French to men and German to my horse."

রোমের সম্রাট এতগুলি ভাষা জানতেন কিনা, কিংবা তাঁর সময়ে এসব ভাষার এত স্বতন্ত্র রূপ ফুটে উঠেছিল কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু রোম-সম্রাটের নামে প্রচলিত এই উক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি প্রশ্নাতীত : প্রত্যেক ভাষার কিছু নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে। এই স্বাতন্ত্র্য ভাষার ধ্বনি, শব্দ, বাক্য-গঠন প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে ফুটে উঠলেও, সাধারণের কানে যে স্বাতন্ত্র্যটি প্রথমেই ধরা পড়ে তা হল তার ধ্বনিগত স্বাতন্ত্র্য। বিভিন্ন ভাষার ধ্বনি-সম্পদ, ধ্বনির উচ্চারণ-রীতি, শ্বাসাঘাত ও সুরতরঙ্গ এবং ছন্দোগুণ অনেকটা পৃথক্। প্রত্যেক ভাষার ধ্বনিগত স্বাতন্ত্র্য শুধুই তার বাহ্য পার্থক্য নয়, ভাষার ধ্বনিগত স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে জাতির সংস্কৃতি ও সাহিত্য-চেতনার স্বরূপগত অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে। প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব শিল্পগুণ তার ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অনেকখানি যুক্ত। একটি ভাষার কবিতা অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে গেলে মূল কবির মনোরাজ্যের সামগ্রিক উপলব্ধি সঞ্চারিত করা তো সম্ভবই নয়, তাছাড়াও এক ভাষার কবিতা অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে গেলে মূলের ভাষারূপের ধ্বনিশিল্পও অন্যভাষায় আনা যায় না। মূলের

শিল্পসৌন্দর্য অনেকখানিই অনুবাদে হারাতে হয় বলে একটি ইতালীয় প্রবাদে একটি মর্মান্তিক সত্য প্রকাশ করা হয়েছে—"অনুবাদক-মাত্রেই বিশ্বাসঘাতক"— "Traduttore traditore."। প্রত্যেক ভাষার এই যে পৃথক্-পৃথক্ ধ্বনি-সম্পদ ও ধ্বনিশিল্প, তাকে অনুবাদের মাধ্যমে তো রূপায়িত করা যায়ই না, অন্য ভাষার অভ্যস্ত বর্ণমালা দিয়ে উপস্থাপিতও করা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কারণ অনেক সময় আমরা অন্য ভাষার উচ্চারণকে নিজের ভাষার বর্ণ দিয়ে যখন লিখতে যাই তখন ঠিক-ঠিক উচ্চারণটা লিখে ফেলার মতো বর্ণ পাই না। যেমন, ইংরেজি ভাষার 'j'-এর উচ্চারণ বংলায় 'জ্'-বর্ণ দিয়ে লেখা যায়। কিন্তু 'z'-এর উচ্চারণ তো 'জ্' দিয়ে লেখা যায় না। ইংরেজিতে 'j'-এর উচ্চারণ ও 'z'-এর উচ্চারণ এক নয়। ইংরেজিতে Jill আর zeal শব্দে একই রকম 'জ্'—ধ্বনি নেই। অথচ বাংলায় একই 'জ্' দিয়ে লিখতে হয় 'জিল্' ও 'জীল্'। যে-কোনো এক ভাষার ধ্বনি অন্য ভাষায় লিখতে গেলে এই রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তখন আমরা প্রচলিত বর্ণের সঙ্গে নানা রকম চিহ্ন জুড়ে পার্থক্য দেখাতে চাই। যেমন 'জ্'-এর নীচে একটা বিন্দু (.) দিয়ে 'জ়্'-এর সাহায্যে আমরা 'z'-এর উচ্চারণ বোঝাই। এইসব অসুবিধা ও জটিলতা দূর করার জন্যে এমন বর্ণমালা দরকার যাতে সব ভাষার ধ্বনি পৃথক্-পৃথক্ বর্ণ দিয়ে ঠিকঠিক লেখা যায়।

এই সব সমস্যার কথা বিবেচনা করে ভাষাবিজ্ঞানীরা একটি আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা (International Phonetic Alphabet, সংক্ষেপে IPA) রচনা করেছেন। এই বর্ণমালা যে-সব নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে মূল দু'টি নীতি হল—

(a) "When two sounds occurring in a given language are employed for distinguishing one word from another, they should whenever possible be represented by two distinct letters without diacritical marks......

(b) "When two sounds are so near together acoustically that there is no likelihood of their being employed in any language for distinguishing words, they should, as a rule, be represented by the same letter."[১২৯]

আগে (পৃঃ ৩৮-৩৯) আমরা ভাষার মূলধ্বনি (স্বনিম বা ধ্বনিতা = phoneme) এবং তার উচ্চারণ-বৈচিত্র্যের (allophone, free variation)

১২৯। *The Principles of the International Phonetic Association,* London ; University College, Dept. of Phonetics, 1963 reprint; p. 1.

কথা বলেছি। সংক্ষেপে সেকথা এখানে আবার স্মরণ করা দরকার। অনেক সময় ভাষার কোনো একটি মূল ধ্বনির একাধিক উচ্চারণ হয় অর্থাৎ উচ্চারণে অল্পস্বল্প পার্থক্য ঘটে। যেমন বাংলায় একটা মূলধ্বনি হল 'শ্'। কিন্তু আমরা আজকাল যাদের 'মস্তান' বলি তারা অনেক সময় 'শালা' শব্দটি উচ্চারণ করতে গিয়ে তালব্য 'শ্'-এর স্থানে দন্ত্য 'স্' উচ্চারণ করে, 'শালা' হয়ে যায় 'সা-লা'। আবার সব সময়ই যে হয় তা নয়, অনেক সময় তালব্য 'শ্'-ই উচ্চারিত হয়। তাহলে এখানে একই মূলধ্বনি 'শ্'-এর দু'রকম উচ্চারণ পাওয়া গেল—'স্' ও 'শ্' ; অথচ এ রকমটি হবার কোনো কারণ শব্দটির গঠনের মধ্যে নিহিত নেই। অর্থাৎ শব্দের অন্য কোনো পার্শ্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে তালব্য 'শ্'-এর উচ্চারণ দন্ত্য 'স্'-এর মতো হয় নি, তার মানে এই উচ্চারণ-বৈচিত্র্য সর্তাধীন নয়, স্বাধীন ; এইরকমের উচ্চারণ-বৈচিত্র্যকে বলে স্বাধীন বা মুক্ত ধ্বনিবৈচিত্র্য (free variation)। আবার আর এক রকমের ধ্বনিবৈচিত্র্য হয়, সেটা সর্তাধীন, সেটা শব্দের গঠনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেমন 'শ্লীল' শব্দে তালব্য 'শ্'-এর সঙ্গে 'ল্' যুক্ত হয়ে আছে। এই 'ল্'-এর নিজের উচ্চারণ-স্থান হচ্ছে দন্তমূল, এটা দন্তমূলীয় ধ্বনি, সহজ করে আপাতত বলতে পারি এটা দন্ত্য ধ্বনির কাছাকাছি। এই 'ল্'-এর প্রভাবে 'শ্লীল' শব্দের 'শ্'-এর উচ্চারণ-স্থানও দন্তমূল হয়ে গেছে, ফলে এই শব্দে তালব্য 'শ্'-এর উচ্চারণ দন্ত্য 'স্'-এরই মতো। এই যে এখানে 'শ্'-এর উচ্চারণ দন্ত্য 'স্'-এর মতো হল এটা স্বাধীন নয়, সর্তাধীন ; এটা পার্শ্ববর্তী ধ্বনি 'ল্'-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু 'শীল' শব্দে তালব্য 'শ্'-এর সঙ্গে 'ল্' নেই বলে 'শ্'-এর উচ্চারণ তালব্য 'শ্'-ই। সুতরাং একই মূলধ্বনি তালব্য 'শ্'-এর উচ্চারণ দু'টি শব্দে দু'রকম পাচ্ছি—'শ্লীল' শব্দে দন্ত্য 'স্'-এর মতো, এবং 'শীল' শব্দে তালব্য 'শ্'-ই। এইরকম সর্তাধীন বিচিত্র রূপগুলিকে উপধ্বনি বা পূরকধ্বনি (allophones) বলে। আর মূল ধ্বনিটিকে বলে স্বনিম বা ধ্বনিতা (phoneme)। কোনো শব্দে একটি মূল ধ্বনির জায়গায় অন্য মূলধ্বনি বসিয়ে দিলে শব্দটির অর্থই পরিবর্তিত হয়ে যায়। কোনো ধ্বনি মূলধ্বনি না উপধ্বনি সেটা নির্ণয় করার এই হচ্ছে সহজ উপায়। যেমন বাংলা 'ক্' আর 'খ্' দু'টি পৃথক্ মূলধ্বনি। 'কাল' শব্দের 'ক্'-এর স্থানে 'খ্' বসিয়ে দিলে শব্দটি হয়ে যাবে 'খাল', মানে অন্য হয়ে গেল। কিন্তু একই মূলধ্বনির দু'টি উপধ্বনির মধ্যে একটির জায়গায় অন্যটি বসানো যায় না, অর্থাৎ একটির জায়গায় অন্যটি উচ্চারণ করা যায় না, জোর করে উচ্চারণ করলে সমাজে প্রচলিত উচ্চারণের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। 'শ্লীল' শব্দের বানানে যদিও আমরা 'শ্' লিখি; তবু আমাদের সমাজে এই শব্দের সাধারণ প্রচলিত উচ্চারণ হল 'স্লীল্'। এই শব্দে তালব্য 'শ্' উচ্চারণ করলে সেটা স্বাভাবিক হবে না। আর একটা কথা, মূলধ্বনি ও উপধ্বনি নির্ণয়ের সময়ে লিখিত বানানের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না ; উচ্চারণের উপরে অর্থাৎ ধ্বনিটা কানে কি রকম শোনাচ্ছে তার উপরে নির্ভর করা

হয়। 'শব' শব্দের 'শ্'-এর স্থানে 'স্' বসিয়ে দিলে শব্দটা হয়ে যাবে 'সব', সুতরাং অর্থও পাল্টে যাবে। তা হলে কি বলতে পারি বাংলায় 'শ্' ও 'স্' আলাদা মূলধ্বনি? তা বলা যায় না। শুধু বানানে 'শ্'-এর জায়গায় 'স্' বসিয়ে দিলে হবে না। দেখতে হবে উচ্চারণটাও পাল্টে যাচ্ছে কিনা। বাংলায় সাধারণ লোকে 'শব' ও 'সব' শব্দ দু'টি একই রকম উচ্চারণ করে। তার মানে 'শব' শব্দের তালব্য 'শ্'-এর জায়গায় 'স্' বসিয়ে দিলেও উচ্চারণ বদলায় না, ধ্বনিটা কার্যত একই থাকে। বানানে পৃথক্ হলেও উচ্চারণে একই হলে তাকে দু'টি পৃথক্ মূলধ্বনি বলা হবে না। দু'টি ধ্বনিকে পৃথক্ মূলধ্বনি প্রমাণ করতে হলে দু'টি সর্ত পূরণ করা চাই–(১) ধ্বনি দু'টির উচ্চারণ পৃথক্ হওয়া চাই এবং (২) তাদের মধ্যে একটি ধ্বনির জায়গায় অন্যটি বসিয়ে দিলে শব্দের অর্থ পাল্টে যাওয়া চাই।

এবার আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার যে দু'টি মূল নীতি উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে ভাষার শুধু মূলধ্বনিগুলি (phoneme = স্বনিম বা ধ্বনিতা) আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় লিপিবদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে ভাষাবিজ্ঞানীরা ধ্বনির উচ্চারণ-বৈচিত্র্যও (মুক্তবৈচিত্র্য ও পূরকধ্বনি = free variation and allophone) লিপিবদ্ধ করে থাকেন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধ্বনিবৈশিষ্ট্যও চিহ্নিত করেন। তাই দু'রকম ধ্বনিমূলক লিপি-পদ্ধতি প্রচলিত আছে : (১) Broad (Phonemic) Transcription এবং (২) Narrow (Phonetic) Transcription। যখন ভাষার মূলধ্বনি (স্বনিম বা ধ্বনিতা) অনুসরণ করে কোনো ভাষার উক্তিকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় লিপিবদ্ধ করা হয় তখন তাকে স্বনিমভিত্তিক বা প্রশস্ত লিপ্যন্তরণ (Phonemic or Broad Transcription) বলে। আবার যখন ধ্বনির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উচ্চারণ-বৈচিত্র্যকে (মুক্তবৈচিত্র্য ও পূরকধ্বনি) আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় লিপিবদ্ধ করা হয় তখন তাকে উচ্চারণভিত্তিক বা সূক্ষ্ম লিপ্যন্তরণ (Phonetic or Narrow Transcription) বলে। Broad বা Phonemic Transcription লেখা হয় / /–এই চিহ্নের মধ্যে। যেমন–শীল = / ʃil /, শ্লীল = / ʃlil /। Narrow বা Phonetic Transcription লেখা হয় [ ]–এই চিহ্নের মধ্যে। যেমন–শীল = [ʃil] ; শ্লীল = [ʃlil]–এখানে 'শ্লীল' শব্দের উচ্চারণ হল [স্লীল্]। কিন্তু এখানে এত পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার মধ্যে না গিয়ে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার উপর্যুক্ত মূল নীতি দু'টি সংক্ষেপে সহজ করে এইভাবে বলতে পারি–

এই বর্ণমালায়–

(১) প্রত্যেক তাৎপর্যপূর্ণ মূলধ্বনির জন্যে একটি করে বর্ণ থাকবে,

(২) কোনো ধ্বনির জন্যে যেন একের বেশি বর্ণ না থাকে।

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় বিভিন্ন ধ্বনির জন্যে যেসব বর্ণ ব্যবহার করা হয় সেই বর্ণগুলি প্রধানত রোমীয় বর্ণমালা (Roman Alphabet) থেকে গৃহীত। রোমীয় বর্ণমালার কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এখানে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে বলতে পারি, ইংরেজি ভাষা এখন যে লিপিতে লেখা হয় মোটামুটিভাবে সেটাই হল রোমীয় লিপি। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার অধিকাংশ বর্ণ ইংরেজির মাধ্যমে আমাদের পরিচিত। কিন্তু রোমীয় লিপি দিয়ে সব ধ্বনি লেখা যায় না বলে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় কিছু গ্রীক বর্ণও নেওয়া হয়েছে। যেমন A, β ইত্যাদি। তাছাড়া রোমীয় লিপির কোনো-কোনো বর্ণকে একটু পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়েছে। যেমন তালব্য 'শ' = sh বা ś না লিখে লেখা হয় ʃ। অর্থাৎ 's'-বর্ণটিকে যেন একটু টেনে লম্বা করে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া কোনো কোনো বিশেষ ধ্বনিগুণ বা বিশেষ ধ্বনি বোঝাবার জন্যে কতকগুলি বিশেষক ধ্বনিচিহ্ন (diacritical marks) ব্যবহার করা হয়। (যদিও এসব চিহ্ন যথাসাধ্য বাদ দেওয়াই নিয়ম)। যেমন—

ধ্বনির দৈর্ঘ্য (length) = : । যেমন হ্রস্ব ই = i, দীর্ঘ ঈ = i:।
(রোমীয় লিপিতে ছিল হ্রস্ব ই = i, দীর্ঘ ঈ = ī)।

অনুনাসিকতা (nasalisation) = ~ । ই = i, ইঁ = ĩ।

স্বরপথ অবরোধের পরে উচ্চারিত ধ্বনি (sounds produced after glottal closure) = '। যেমন p', t'।

একই সঙ্গে উচ্চারিত দু'টি ধ্বনি (synchronic articulation) = ‿ ।
যেমন = ঐ = ও‿ই = o‿i।

ব্যক্তিনাম, স্থাননাম (proper noun) = *। যেমন—রাম = *ram (এর জন্যে IPA-তে প্রথম বর্ণ Capital letter ব্যবহার করা হয় না)।

ক্ষীণ উচ্চারণ = ‿ । যেমন বড়াই = bɔɽai̯

প্রবল শ্বাসাঘাত (strong or primary stress) = ˈ। যেমন insult
= ˈin sʌlt (অপমান = noun), in ˈsʌlt (অপমান করা = verb)

মধ্যম শ্বাসাঘাত = (medium or secondary stress) = ˌ যেমন Combination = ˌkombɪˈneiʃn.

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় সব ভাষার সব রকমের ধ্বনির চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই বর্ণমালার পূর্ণাঙ্গ তালিকা বোঝবার জন্যে ধ্বনি কত

রকমের হয় সেটি আগে জানা দরকার। তাই ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনার পরে এই বর্ণমালার পূর্ণাঙ্গ তালিকা বোঝা যাবে। এখানে শুধু এইটুকু বলে রাখা যাক যে, এই বর্ণমালার ব্যঞ্জনধ্বনির তালিকার উপরের সারিতে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে সাজানো নামগুলি হল ধ্বনির উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী নির্দিষ্ট শ্রেণীগুলির নাম, এবং বাঁ দিকের স্তম্ভে উপর থেকে নিচের দিকে পর-পর সাজানো নামগুলি হল ধ্বনির উচ্চারণ-প্রকৃতি অনুসারে নির্দিষ্ট নাম। নিম্নে রোমীয় বর্ণমালায় ও আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় (IPA) বাংলা ও সংস্কৃত ধ্বনিগুলির চিহ্ন দেওয়া হল, এতে বোঝা যাবে রোমীয় বর্ণমালা ও আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কতটুকু। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলা প্রয়োজন—সংস্কৃত, প্রাকৃত, বাংলা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষাকে আমরা যখন রোমীয় লিপিতে লিখি তখন সাধারণত উচ্চারণের দিকে অর্থাৎ ধ্বনির বাস্তব ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখি না, শুধু বানানে যা পাই তার সঙ্গে বর্ণ (letter) মিলিয়ে রোমীয় লিপিতে লিখে যাই। সেইজন্যে ভারতীয় লিপি থেকে রোমীয় লিপিতে আমরা যেটা লিখি সেটা বর্ণান্তর (transliteration) মাত্র। যেমন-- বাংলা 'লক্ষ্মী' = Lakṣmī এখানে লক্ষ্মী (ল্ + অ + ক্ + ষ্ + ম্ + ঈ) শব্দে যে কটা বর্ণ আছে সেগুলি ধরে-ধরে একটি-একটি করে রোমীয় বর্ণে লিখে রূপান্তরিত করা হয়েছে মাত্র। এখানে বাংলা 'লক্ষ্মী' শব্দের ধ্বনি কি অর্থাৎ তার উচ্চারণ কি তা লক্ষ্য করা হয় নি। কিন্তু আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় এক-একটি বর্ণ ধরে লেখা হয় না, লিখিত বানানের গুরুত্ব এখানে নেই, এখানে বাস্তব উচ্চারণটা দেখা হয়, অর্থাৎ ধ্বনিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই একে ধ্বনিমূলক লিপ্যন্তর (transcription) বলে। কোনো শব্দকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় লিখতে হলে আগে তার উচ্চারণ নির্ণয় করতে হবে। বাংলায় 'লক্ষ্মী' শব্দের উচ্চারণ হল 'লোক্‌খি' (ল্ + ও + ক্ + খ্ + ই)। সুতরাং 'লক্ষ্মী' শব্দটি আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় হবে = / $\text{lokk}^{\text{h}}\text{i}$ /।

এবারে সংস্কৃত ও বাংলা বর্ণের ও ধ্বনির সমান-সমান রোমীয় বর্ণমালার চিহ্ন ও আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার (IPA) চিহ্ন নিম্নে দেওয়া হল। এতে মনে রাখতে হবে, যে-সব বর্ণ বাংলায় শুধু বানানে বেঁচে আছে কিন্তু তাদের আসল উচ্চারণ বা ধ্বনি বাংলায় প্রচলিত নেই সেগুলি আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার তালিকায় দেওয়া হল না। কারণ আগেই বলেছি আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় ধ্বনির উপরে (অর্থাৎ বাস্তব উচ্চারণের উপরে) গুরুত্ব দেওয়া হয়, লিখিত বানানের উপরে নয়। ধ্বনিরও আবার দুটো রূপ আছে। একটা তার মূলরূপ, যেটাকে বলে স্বনিম বা ধ্বনিতা (phoneme)। আর অন্যটা হল তার উচ্চারণ-বৈচিত্র্য যেটাকে বলে উপধ্বনি বা পূরকধ্বনি (allophone) এবং মুক্ত বৈচিত্র্য

(free variation)। এখানে সংস্কৃত ও বাংলা স্বনিমগুলির সমান-সমান আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার চিহ্ন দেওয়া হল।

সংস্কৃত			বাংলা			
সংস্কৃত বর্ণ ও ধ্বনি	রোমীয় বর্ণমালার চিহ্ন	IPA চিহ্ন	বাংলা বর্ণ	রোমীয় বর্ণমালার চিহ্ন	বাংলা স্বনিম	IPA চিহ্ন
अ/अ (অ)	a	/a/, /ʌ/	অ	a	/ অ /	/ ɔ /
आ/अ (আ)	ā	/ a: /	আ	ā	/ আ /	/ a /
इ (ই)	i	/ i /	ই	i	/ ই /	/ i /
ई (ঈ)	ī	/ i: /	ঈ	ī		
उ (উ)	u	/ u /	উ	u	/ উ /	/ u /
ऊ (ঊ)	ū	/ u: /	ঊ	ū		
ऋ (ঋ)	ṛ	/ ṛ /	ঋ	ṛ	/ রি /	/ri/ = r+
ॠ (ৠ)	ṝ	/ ṛ: /				
ऌ (ঌ)	ḷ	/ ḷ /				
ए (এ)	ē	/ e: /	এ	e	/ এ /	/ e /
ऐ (ঐ)	ai	/a:j/	ঐ	oi/ai	/ ঐ /	/oi/
ओ/ओ (ও)	ō	/o:/	ও	o	/ ও /	/o/
औ/औ (ঔ)	au	/a:u/	ঔ	ou\au	/ ঔ /	/ou/
			এ	e	/ অ্যা /	/æ/, /ɛ/
क् (ক্)	k	/k/	ক্	k	/ ক্ /	/k/
ख् (খ্)	kh	$/k^h/$	খ্	kh	/ খ্ /	$/k^h/$
ग् (গ্)	g	/g/	গ্	g	/ গ্ /	/g/
घ् (ঘ্)	gh	$/g^h/$	ঘ্	gh	/ ঘ্ /	$/g^h/$
ङ् (ঙ্)	n	/ŋ/	ঙ্	ṅ	/ ঙ্ /	/ŋ/
च् (চ্)	c	/c/	চ্	c	/ চ্ /	/c/
छ् (ছ্)	ch	$/c^h/$	ছ্	ch	/ ছ্ /	$/c^h/$
ज् (জ্)	j	/ɟ/	জ্	j	/ জ্ /	/ɟ/
झ/झ् (ঝ্)	jh	$/ɟ^h/$	ঝ্	jh	/ ঝ্ /	$/ɟ^h/$
ञ् (ঞ)	ñ	/ɲ/	ঞ	ñ	/ ন্ /	/n/~/
ट् (ট্)	ṭ	/ʈ/	ট্	ṭ	/ ট্ /	/ʈ/

সংস্কৃত			বাংলা			
সংস্কৃত বর্ণ ও ধ্বনি	রোমীয় বর্ণ-মালার চিহ্ন	IPA চিহ্ন	বাংলা বর্ণ	রোমীয় বর্ণ-মালার চিহ্ন	বাংলা স্বনিম	IPA চিহ্ন
ठ् (ঠ্)	ṭh	/ʈ^{h}/	ঠ্	th	/ঠ্/	/ʈ^{h}/.
ड् (ড্)	ḍ	/ɖ/	ড্	ḍh	/ড্/	/ɖ/
ढ् (ঢ্)	ḍ^{h}	/ɖ^{h}/	ঢ্	ḍh	/ঢ্/	/ɖ^{h}/
ण्/ण् (ণ্)	ṇ	/ŋ/	ণ্	ṇ	/ন্/	/n/
त् (ত্)	t	/t/	ত্	t	/ত্/	/t/
थ् (থ্)	th	/t^{h}/	থ্	th	/থ্/	/t^{h}/
द् (দ্)	d	/d/	দ্	d	/দ্/	/d/
ध् (ধ্)	dh	/d^{h}/	ধ্	dh	/ধ্/	/d^{h}/
न् (ন্)	n	/n/	ন্	n	/ন্/	/n/
प् (প্).	p	/p/	প্	p	/প্/	/p/
फ् (ফ্)	ph	/p^{h}/	ফ্	ph	/ফ্/	/p^{h}/
ब् (ব্)	b	/b/	ব্	b	/ব্/	/b/
भ (ভ্)	bh	/b^{h}/	ভ্	bh	/ভ্/	/b^{h}/
म् (ম্)	m	/m/	ম	m	/ম্/	/m/
य् (য্)	y	/j/	য	y/j	/জ/	/ɟ/
र् (র্)	r	/r/	র্	r	/র্/	/r/
ऌ/ल् (ল্)	l	/l/	ল্	l	/ল্/	/l/
व् (অন্তঃস্থ ব)	w/v	/w/	ব্	w/v	/ব্/	/b/
श्च/श् (শ্)	ś	/ʃ/	শ্	ś	/শ্/	/ʃ/
ष् (ষ্)	ṣ	/ṣ/	ষ্	s	/শ্/	/ʃ/
स् (স্)	s	/s/	স্	s	/শ্/	/ʃ/
ह् (হ্)	h .	/ɦ/	হ্	h	/হ্/	/h/
(ং)	ṅ/ṁ	/ŋ/	ং	ṅ/ṁ	/ঙ্/	/ŋ/
: (ঃ)	ḥ	/ɦ/	ঃ	ḥ	/হ্/	/h/
ँ (ँ)	n\~	~	ँ	n\~		~
			ড়	ṛ\ḍ\ɽ	/ড়/	/ɽ/
			ঢ়	ṛh/ḍh/ɽh	/ঢ়/	ɽh
			য়	y	/য়/	/j//ĕ/
			ওয়	w	/ওয়/	/w/ /ŏ/

নিচে বাংলা থেকে রোমীয় বর্ণমালায় বর্ণান্তর (transliteration) এবং আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় স্বনিমভিত্তিক লিপ্যন্তর (phonemic transcription) করে দেখানো হল। রোমীয় লিপিতে বাংলা শব্দ বর্ণান্তরিত করার সময়, শব্দের শেষে অবস্থিত একক ব্যঞ্জন সাধারণত হসন্ত উচ্চারিত হয় বলে সেগুলির পরে কোনো স্বরধ্বনি দেওয়া হয় নি, কিন্তু সংস্কৃতের নিয়মে সেগুলিতে স্বরধ্বনি দিতে হবে। যেমন—বাংলা সাগর = sāgar, কিন্তু সংস্কৃত সাগর = sāgara।

বাংলা	রোমীয় বর্ণান্তর	আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণ-মালায় স্বনিমভিত্তিক লিপ্যন্তর
	Roman Transliteration	Phonemic Transcription in IPA
রামমোহন রায়	র্+আ+ম্+ম্+ও +হ্+অ+ন্ র্+অ+য়্ = Rāmmohan Rāy	রাম্মোহোন্ রায় = র্+আ+ম্+ম্+ ও+হ্+ও+ন্ র্+আ+য়্ = */rammohan raĕ/
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	ঈ+শ্+ব্+অ+র্ চ্+অ+ন্+দ্+ র্+অ ব্+ই+দ্+য্+আ+ স্+আ+গ্+অ+র্ Iśwarcandra Vidyāsāgar.	ইশ্শরচন্দ্রো বিদ্দাশাগোর = ই+শ্+শ্+অ +র্+চ্+অ+ন্+ দ্+র্+ও ব্+ই+দ্+দ্+আ +শ্+আ+গ্+ও +র্ = */iʃʃɔrcɔndro biddaʃagor/

বাংলা	রোমীয় বর্ণান্তর	আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় স্বনিমভিত্তিক লিপ্যন্তর
	Roman Transliteration	Phonemic Transcription in IPA
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ব্+অ+ঙ্+ক্+ই +ম্+চ্+অ+ন্+দ্ +র্+অ চ্+অ+ট্+ট্+ও+ প্+আ+ধ্+য্+ আ+য়্ = Baṅkimcandra Caṭṭopādhyāy.	বোঙ্কিম্চন্দ্রো চট্টোপাদ্ধায়্ = ব্+ও+ঙ্+ক্+ই +ম্+চ্+অ+ন্+ দ্+র্+ও চ্+অ+ট্+ট্+ও+প্ +আ+দ্+ধ্+আ +য়্ = */boŋkimcɔndro cɔʈʈopadd^{h}aĕ/
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	র্+অ+ব্+ঈ+ন্ +দ্+র্+অ+ন্+ আ+থ্ ঠ্+আ+ক্+উ+র্ = Rabindranāth Ṭhākur.	রোবিন্দ্রোনাথ্ ঠাকুর্ =র্+ও+ব্+ই+ ন্+দ্+র্+ও+ন্+ আ+থ্ ঠ্+আ+ক্+উ+র্ = */robindronat^{h} ʈ^{h}akur/
শ্রীঅরবিন্দ	শ্+র্+ঈ+অ+র্ +অ+ব্+ই+ন্+ দ্+অ = Śriarabinda.	শ্রিঅরোবিন্দো = শ্+র্+ই+অ+ র্+ও+ব্+ই+ন্ +দ্+ও = */ʃriɔrobindo/
মধুসূদন দত্ত	ম্+অ+ধ্+উ+স্ +ঊ+দ্+অ+ন্ দ্+অ+ত্+ত্+অ = Madhusūdan Datta.	মোধুশুদোন্ দত্তো = ম্+ও+ধ্+উ+ শ্+উ+দ্+ও+ন্ দ্+অ+ত্+ত্+ও = */mod^{h}uʃudon dɔtto/

বাংলা :

"কর্ম-অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া সমাজের স্বভাব। সে ভাগ থাকবে, কিন্তু চলে যাবে বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি। সামাজিক জীবনে আমি বিশেষ এক ধরনের কাজ করতে পারি, তুমি অন্য ধরনের কাজ করতে পারো। তুমি না হয় দেশশাসন করো, আমি না হয় জুতো সারি। কিন্তু তাই বলে তুমি আমার চেয়ে বড় হতে পারো না, আমার মাথায় পা দিতে পারো না। তুমি খুন ক'রে প্রশংসা পাবে আর একটা আম চুরি করলে আমাকে ফাঁসি যেতে হবে—এমন হতে পারে না।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

('জনগণের অধিকার', অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল, ১৯৭৭, পৃঃ ২৭)

Roman Transliteration :

"karma-anusāre vibhinna śreṇīte vibhakta haoyā samājer swabhāv. se bhāg thākbe, kintu calė yābe viśeṣ viśeṣ adhikār-guli. sāmājik jivane āmi viśeṣ ek dharaṇer kāj karte pāri, tumi anya dharaner kāj karte pāro. tumi nā hay deśśāsan karo, āmi nā hay juto sāri. kintu tāi bale tumi āmār ceye baṛa hate pāro nā, āmār māthāy pā dite pāro nā, tumi khun kare praśaṅsā pābe ār ekṭa ām curi karle āmāke fạ̄nsi yete habe–eman hate pāre nā."

–Swāmi Vivekānanda

('Janagaṇer Adhikār', Akhil Bhārat Vivekānanda Yuba-Mahāmaṇḍal, 1977, pṛ : 27)

Phonemic Transcription in IPA :

/"kɔrmo-onuʃare bibʰinno ʃrenite bibʰɔkto hɔŏa ʃɔmaɟer ʃɔbʰab ʃe bʰag tʰakbe, kintu cole ɟabe biʃeʃ biʃeʃ odʰikarguli. ʃamaɟik ɟibone ami biʃeʃ æk dʰɔroner kaɟ korte pari, tumi onno dʰɔroner kaɟ korte paro. tumi na hɔĕ deʃʃaʃon kɔro, ami na hɔĕ ɟuto ʃari. kintu taĭ bole tumi amar cee bɔɽo hote paro na, amar matʰaĕ pa dite paro na. tumi kʰun kore proʃoŋʃa pabe ar ækʈa am curi korle amake pʰaʃi ɟete hɔbe—æmon hote pare na."/

–*/ʃami bibekanondo/

('ɟonogɔner odʰikar', okʰil bʰarot bibekanondo ɟubomɔhamɔnɖol, 1977, pri ; 27.)

বাংলা :

"ব্যস্ত হয়ো না। কাউকে অনুকরণ করতে যেও না। অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নয়। সিংহচর্মাবৃত গর্দভ কখনই সিংহ হয় না। হীন কাপুরুষের মত অনুকরণ অধঃপতনের চিহ্ন। মানুষ যখন নিজেকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করে, তখন বুঝতে হবে, তার মরণদশা ধরেছে ; যখন সে পূর্বপুরুষদের স্বীকার করতে লজ্জিত হয়, তখন বুঝতে হবে, তার বিনাশ আসন্ন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ।

('জনগণের অধিকার', ১৯৭৭, পৃঃ ৩৯)

Roman Transliteration :

"vyasta hayo nā. kāuke anukaraṇ karte yeo nā. aparer anukaraṇ sabhyatā vā unnatir lakṣaṇ nay. siṅhacarmāvṛta gardabh kakhanai siṅha hay nā, hīn kāpuruṣer mata anukaraṇ adhaḥpataner cihna. mānuṣ yakhan nijeke ghṛṇā karte ārambha kare, takhan bujhte habe, tār maraṇdaśā dhareche ; yakhan se pūrvapuruṣder swīkār karte lajjita hay, takhan bujhte habe, tār vināś āsanna".

–Swāmī Vivekānanda.

(Janagaṇer Adhikār, 1977, pṛ : 39)

Phonemic Transcription in IPA :

"bæʃto hoĕo na. kaŭke onukɔron korte ɟeo na. ɔporer onukɔron ʃobbʰota ba unnotir lokkʰon nɔĕ. ʃiŋhocɔrmabrito gɔrdɔbʰ kɔkʰonoĭ ʃiŋho hɔĕ na. hin kapuruʃer mɔto onukɔron ɔdʰoppɔtoner cinnʰo. manuʃ ɟɔkʰon niɟeke gʰrina korte arɔmbʰo kɔre, tɔkʰon buɟʰte hɔbe, tar mɔrondɔʃa dʰorecʰe ; ɟɔkʰon ʃe purbopuruʃder ʃikar korte loɟɟito hɔĕ, tɔkʰon buɟʰte hɔbe, tar binaʃ aʃɔnno."/

*/ʃami bibekanɔndo./

(ɟɔnogɔner odʰikar, 1977, pri ; 39)

বাংলা :

"অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম, ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েওছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে : ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালবেন। কথা বেশী বলবার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারই মধ্যে মনে হল, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত।......তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা।...আমি তাঁকে বলে এলুম, আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকব।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩৩৫।

Roman Transliteration :

"Arabinda Ghoṣer saṅge dekhā hayeche. pratham dṛṣtitei bujhlum, ini ātmākei sabceye satya kare ceyechen, satya kare peyeochen. sei tā̃r dīrgha tapasyār caoyā o pāoyār dwārā tā̃r sattā otaprota. āmār man balle : ini ẽr antarer ālo diyei bāhire ālo jwālben. katha beśī balbār samay hāte chila nā. ati alpakṣaṇ chilum. tārai madhye mane hala, tā̃r madhye sahaj preraṇāśakti puñjita...tāi tā̃r mukhaśrīte eman saundaryamay śāntir ujjwal ābhā....āmi tāke bale elum, ātmār bāṇī bahan kare āpni āmāder madhye beriye āsben ei apekṣāy thākba."

–Rabīndranāth Ṭhākur : 'Prabāsī', śrābaṇ, 1335.

Phonemic Transcription in IPA :

/"ɔrobindo g^{h}oʃe ʃɔŋge dæk^{h}a hoec^{h}e. prot^{h}om driʃṭiteĭ buɟ^{h}lum, ini ãttakeĭ ʃɔbœe ʃotto kore ceec^{h}en, ʃotto kore peeoc^{h}en. ʃeĭ tãr dirg^{h}o tɔpoʃʃar caŏa o paŏar dara tãr ʃɔtta otoproto. amar mon bolle : ini ẽr ɔntorer alo diei bahire alo ɟalben, kɔtha beʃi bɔlbar ʃɔmɔĕ hate c^{h}ilo na. oti ɔlpokk^{h}on c^{h}ilum. tari modd^{h}e mone holo, tãr modd^{h}e ʃɔhoɟ preronaʃokti punɟito...tai tãr muk^{h}oʃʃrite æmon ʃoundɔrɟomoĕ ʃantir uɟɟɔl ab^{h}a....ami tãke bole elum, ãttar bani bɔhon kore apni amader modd^{h}e berie aʃben eĭ apekk^{h}aĕ t^{h}akbo."/

–*/robindronat^{h} ṭ^{h}akur : 'probaʃi', ʃrabon, 1335./

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা (International Phonetic Alphabet=IPA) প্রবর্তন করেন আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানী-সংস্থা (International Phonetic Association)। তাই এই সংস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ইতিহাস এই প্রসঙ্গে জানা দরকার। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে ফরাসি দেশে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তার নাম ছিল ধ্বনিবিজ্ঞান-শিক্ষক-সংস্থা (The Phonetic Teachers' Association)। পরে এই সংস্থা আন্তর্জাতিক সংস্থায় পরিণত হয় এবং ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে তার নাম পরিবর্তিত করে রাখা হয় 'লাসসিয়াসিয়ঁ ফোনেতিক্ দে প্রফেস্যর্ দ্য লাঁগ্ ভিভাঁৎ' (L' Association Phonétique des Professeurs de Langues Vivantes অর্থাৎ The Phonetic Association of the Professors of Living Languages)। সবশেষে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে এই সংস্থার নাম দেওয়া হয় 'লাসসিয়াসিয়ঁ ফোনেতিক্ এঁ্যাত্যার্নাস্যওনাল্' (L' Association Phonétique Internationale অর্থাৎ The International Phonetic Association, জার্মান ভাষায় বলা হত Weltlautschriftverein)। পরে এই সংস্থার মূলকেন্দ্র ফ্রান্স থেকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বনিবিজ্ঞান বিভাগে চলে আসে এবং ধ্বনিবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডানিয়েল্ জোন্স্ (Daniel Jones) তার প্রধান সংগঠক হয়ে উঠেন। এই সংস্থা আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করার পর ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে তার পত্রিকার নাম পরিবর্তিত করে রাখা হয় 'ল্য ম্যাত্র্ ফনেতিক্' (Le Maître Phonétique অর্থাৎ The Phonetic Teacher)। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে এই সংস্থার পত্রিকা 'দ্য ফনেটিক টিচার্' (ðə fonetik titcər = Dhi Fonètik Tîtcer)-এ প্রথম ধ্বনিমূলক লিখন-পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় এবং তা করেছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক পল্ পাসি (Paul Passy) নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে। কিন্তু ধ্বনিমূলক বর্ণমালাকে সব ভাষার ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য আন্তর্জাতিক রূপ দেবার প্রথম প্রস্তাব করেন ভাষাবিজ্ঞানী ওটো য়েস্পারসেন্ (Otto Jespersen) পল্ পাসির কাছে লিখিত একটি চিঠিতে। সংস্থার পত্রিকায় ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে চিঠিটি প্রকাশিত হবার পর ভাষাবিজ্ঞানীরা ব্যাপকভাবে এর প্রয়োজন অনুভব করেন। ফলে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে সংস্থার পত্রিকায় আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশ করা হয়। তারপর থেকে ধ্বনিবিজ্ঞানে যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে চলেছে, এই বর্ণমালাতে ততই সংশোধন ও পরিমার্জন হয়ে চলেছে। শেষ সংশোধন হয় ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দে। এই আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালাকে এখন লণ্ডন-গোষ্ঠীর ধ্বনিবিজ্ঞানীদের

(London School of Phonetics) বর্ণমালা ধরা হয়। কারণ এখন মার্কিন-গোষ্ঠীর ধ্বনিবিজ্ঞানীরা আরো একটি আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা প্রবর্তন করেছেন। মার্কিন গোষ্ঠীর ধ্বনিবিজ্ঞানীদের (American School of Phonetics) প্রবর্তিত আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালাও এখন ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে ; এই বর্ণমালার চিহ্নগুলি অপেক্ষাকৃত সরল এবং অনেকটা রোমীয় লিপির অনুরূপ। কিন্তু লণ্ডনগোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালাই অধিকতর ঐতিহ্যসম্পন্ন। এখানে (পৃষ্ঠা ২০২ ও ২০৩ দ্রষ্টব্য) তাই লণ্ডনের আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানী সংস্থা (International Phonetic Association) কর্তৃক প্রবর্তিত আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালারই পূর্ণাঙ্গ তালিকার ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সংশোধিত রূপটি দেওয়া হল। বর্তমান গ্রন্থে এই বর্ণমালার চিহ্নই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথাসাধ্য অনুসরণ করা হয়েছে।

রোমীয় হরফে লিপ্যন্তর এবং সূক্ষ্ম-ধ্বনিভিত্তিক ও স্বনিমভিত্তিক লিপ্যন্তর (Roman Transliteration. Phonetic and Phonemic Transcription) : এই অধ্যায়ে বাংলা থেকে রোমীয় হরফে বর্ণান্তরের মূলনীতি ব্যাখ্যা করা হল এবং তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। কিন্তু রোমীয় হরফে এই বর্ণান্তর-বিধি বেশি প্রয়োগ করা হয় গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা থেকে লিপ্যন্তরের ক্ষেত্রেই। কারণ ঐসব প্রাচীন ভাষার বর্ণগুলির ধ্বনিমূল্য (phonetic value) বা বাস্তব উচ্চারণ প্রাচীন কালে ঠিক কি রকম ছিল তা রেকর্ডে বিধৃত নেই বলে সঠিকভাবে জানা যায় না। এই জন্যে সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি ভাষা থেকে সূক্ষ্ম ধ্বনিভিত্তিক (উচ্চারণ-ভিত্তিক) বা স্বনিমভিত্তিক লিপ্যন্তর সম্ভব নয়।

INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET [revised to 1979]
CONSONANTS

		Bilabral	Labiodental	Dental Alveolar, or Post-alveolar	Retroflex	Palato-alveolar	Palatal	Velar	Uvular	Labral-Palatal	Labral Velar	Pharyngeal	Glottal
(pulmonic air-stream mechanism)	Nasal	m	ɱ	n	ɳ		ɲ	ŋ	ɴ				
	Plosive	p b		t d	ʈ ɖ		c ɟ	k g	q ɢ		k͡p g͡b		ʔ
	[Median] Fricative	ɸ β	f v	θ ð s z	β &	ʃ ʒ	ç ʝ	x y	χ ʁ		ʍ	h ʕ	h g
	[Median] Approxmant		ʋ	ɹ	ɖ		j	ɰ		ɥ	w		
	Lateral Fricative			ɬ ɮ									
	Lateral [Approxmant]			l	ɭ		ʎ						
	Trill			r					ʀ				
	Tap or Flap			ɾ	ɽ				ʀ				
(non-pulmonic air-stream)	Eyective	p'		t'				k'					
	Implosive	ɓ		ɗ				ɠ					
	[Median] Click	ʘ		ʇ	t								
	Lateral Click				s								

চিত্র নং ৮—আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা (ব্যঞ্জনধ্বনি)

INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET [revised to 1979]

VOWELS

	Front (Unrounded)		*Back* (Unrounded)		*Front* (Rounded)		*Back* (Rounded)
	j	ʄ	ɯ	*Close*	y	ʉ	u
	ɩ					ʏ	
	c		ɣ	*Half-close*	ɸ		o
		e				θ	
	ɛ		ʌ	*Half-open*	œ		ɔ
	æ	ɐ					
	a		ɑ	*Open*	Œ		ɒ
	Unrounded				*Rounded*		

DIACRITICS

o Voiceless n̥ d̥	. or. Raised e, ç, ẹ w̝
v Voiced s̬ t̬	v or. Lowered ev, ȩ, ę ɥ
ʰ Aspirated tʰ	+ Advanced u+, ụ
.. Breathy-voiced b̤ ə̤	or- Retracted i̠, i-, t̠
^ Dental t̪	·· Centralized ë
~ Labialized t̫	˜ Nasalized ã
ʲ Palatalized tʲ	ɹ ɖ b́ r-coloured a´
- Velarized or Pharyngealized ‡, ɫ	: Long a:
	· Half-long a·
ˌ Syllabic n̩ l̩	˘ Non-syllabis ŭ
or Simultaneous s͡f (but see also under the heading Affricates)	, More rounded ɔ˒
	‹ Less rounded y˓

চিত্র নং ৯—আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা (স্বরধ্বনি ও বিশেষক ধ্বনিচিহ্ন)

॥ ৯ ॥

বাগ্‌যন্ত্র

(Organs of Speech / Vocal Organs)

ভাষার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, ভাষা হচ্ছে মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির সমষ্টি। সেই সংজ্ঞায় ভাষায় ব্যবহৃত বা ব্যবহারযোগ্য ধ্বনিকে এইভাবে স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত করা হয়েছে যে, এই ধ্বনি হচ্ছে মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে সৃষ্ট ; তাই অন্যভাবে সৃষ্ট যে ধ্বনি, তাকে ভাষার ধ্বনির মধ্যে আমরা ধরি না। অর্থাৎ মানুষের বাগ্‌যন্ত্রই ভাষার ধ্বনিকে স্বাতন্ত্র্য দান করে। ভাষার ধ্বনির এই স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নের উপরে গুরুত্ব দেবার জন্যেই ধ্বনিবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডানিয়েল্ জোন্‌স্ (Daniel Jones) বলেছেন যে, ভাষা হচ্ছে 'succession of sounds emitted by the organs of speech'[১৩০]। সুতরাং ভাষা-প্রক্রিয়ায় বাগ্‌যন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই কারণে ভাষা-প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্যে বাগ্‌যন্ত্রের গঠন এবং কার্যাবলীর আলোচনা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

মুখ, নাসিকা, কণ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন অংশের সাহায্যে ভাষায় ব্যবহৃত বা ব্যবহারযোগ্য ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয় বলে এগুলিকে একত্রে বাগ্‌যন্ত্র (Organs of Speech or Vocal Organs) বলে। এ প্রসঙ্গে অবশ্য প্রথমেই একজন ভাষাবিজ্ঞানীর কথা মনে আসে। তিনি একটি মূল প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে আমরা বাগ্‌যন্ত্র বলি সেগুলি কি আসলে বাগ্‌যন্ত্রই? অর্থাৎ সেগুলি কি মূলত কথা বলার জন্যেই সৃষ্ট? যেগুলিকে আমরা বাগ্‌যন্ত্র বলি, ধ্বনি-উচ্চারণ তাদের প্রাথমিক কাজ (primary function) নয় ; খাদ্য গ্রহণ, শ্বাস-প্রশ্বাস চালানো ইত্যাদিই হল তাদের প্রাথমিক কাজ। সুতরাং যে-সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আমরা বাগ্‌যন্ত্র বলি, জীবন-প্রক্রিয়ার আপেক্ষিক গুরুত্ব বিচারে সেগুলিকে মূলত বাগ্‌যন্ত্র বলা যায় না, গৌণ ক্রিয়ার (secondary function) দিক থেকেই সেগুলিকে বাগ্‌যন্ত্র বলা উচিত।

এরপর আমরা যখন বাগ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে আলোচনা করতে যাই তখন দেখতে পাই, অনেকে দন্ত, মুখ, নাসিকা ও কণ্ঠের বিভিন্ন অংশকেই বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যে ধরেছেন[১৩১] ; কিন্তু মানুষের শরীরের আর একটি অঙ্গ নেপথ্যে

১৩০। Jones, Prof. Daniel : *An Outline of English Phonetics*, Cambridge : W Haffer & Sons Ltd., Ninth ed., 1969, p. 1.

১৩১। Taraporewala, I. J. S., : *Elements of the Science of Language*, Calcutta University. 1962, p. 108.

থেকে ধ্বনি-উচ্চারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে ; সেটি হল ফুসফুস (lungs)। ফুসফুস যদিও নিজে কোনো ধ্বনি উচ্চারণ করে না, তবু ধ্বনিসৃষ্টিতে ফুসফুসের ভূমিকা অপরিহার্য। নোয়েল্-আর্মফিল্ড্ তাই ফুসফুসকেও বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যেই গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন : "Strictly speaking, one should add to the list of the organs of speech the lungs, (the) breath-producing organs. The lungs are organs without which speech...could not exist. Breath is the life of human speech as it is of human existence."[১৩২]

যাঁরা মুখ, নাসিকা ও কণ্ঠের মধ্যে বাগ্‌যন্ত্রকে সীমাবদ্ধ রাখতে চান তাঁরাও ফুসফুসের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করেছেন। ধ্বনি-উচ্চারণে ফুসফুসের ভূমিকাটি আমরা উপলব্ধি করতে পারব যদি ধ্বনি-সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি আমরা বিশ্লেষণ করি। ভাষার ধ্বনি সৃষ্টি হয় কি ভাবে? আমাদের বক্ষ-পঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত ফুসফুস মূলত প্রাণ ধারণের প্রয়োজনে শ্বাসকার্য চালাবার জন্যে বাইরে থেকে বাতাস টেনে নেয় আবার ভেতর থেকে বাতাসকে যেন পাম্প করে বের করে দেয়। এই অন্তর্গামী (in-coming) এবং বহির্গামী (out-going) বাতাসের গতিপথে আমরা ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত ইত্যাদির সাহায্যে মুখের গহ্বরে বা কণ্ঠে বা নাসিকায় ক্ষণকালের জন্যে পূর্ণ বা আংশিক বাধা দিই অথবা মুখগহ্বর বা নাসিকা-গহ্বরের আকৃতি পরিবর্তিত করে বাতাসের গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করি। এর ফলে বাতাসে নানা মাপের নানা ধরনের ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। এই ঢেউগুলিই বাতাসে ভাসতে-ভাসতে যখন শ্রোতার কানে গিয়ে বাজে তখন এগুলিকে আমরা শব্দতরঙ্গ (sound-waves) বলি। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, যে বাতাসের গতিপথে আমরা ঢেউগুলি সৃষ্টি করি সেই বাতাসকে ভেতরে টেনে বা বাইরে বের করে তাতে গতি-সঞ্চার করে প্রধানত ফুসফুসই। ফুসফুস যদি এই গতি-সঞ্চার না করত তাহলে আমরা ওষ্ঠ, দন্ত, জিহ্বা ইত্যাদির সাহায্যে বাতাসে ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারতাম না। সুতরাং ধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুস মূল কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। এই কারণে ফুসফুসও বাগ্‌যন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ। বাগ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ১০ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

১৩২। Noel-Armfield, G. : *General Phonetics,* Cambridge. : W. Heffer & Sons Ltd., 1931, Ch. II, p. 5.
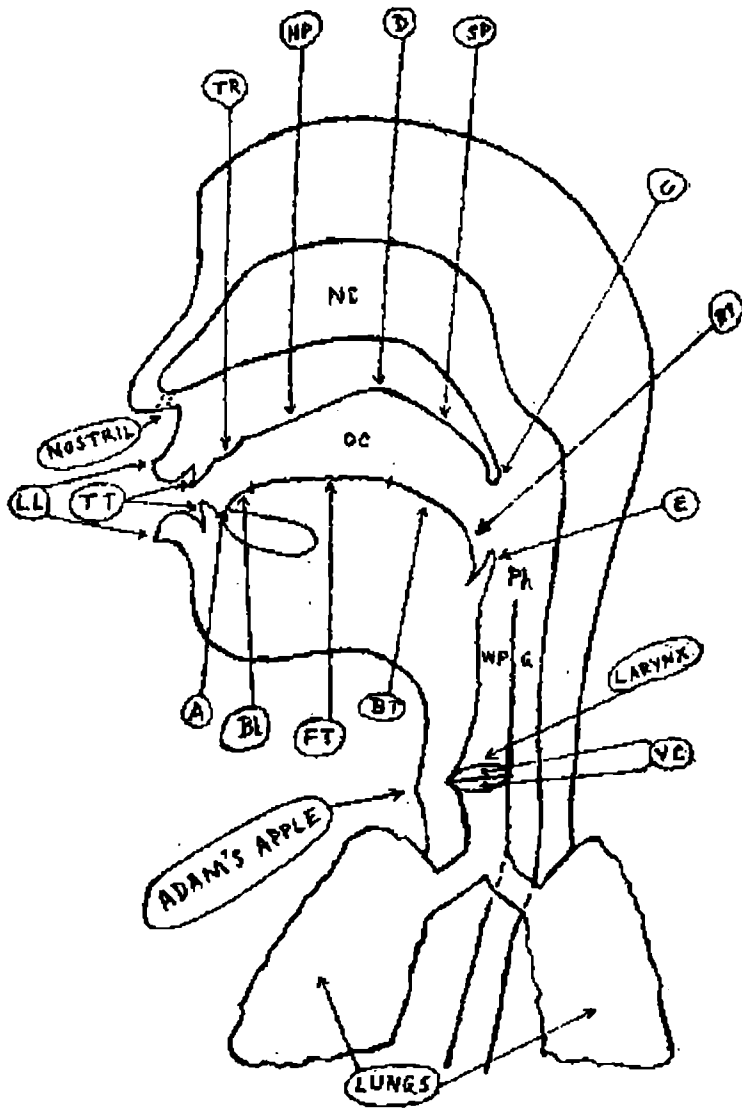
চিত্র নং ১০

বাগ্‌যন্ত্র

বাগ্‌যন্ত্রের চিত্রের বিভিন্ন অংশের পরিচিতি :

NC = Nasal cavity = নাসিকা-গহ্বর ;

OC = Oral cavity = মুখ-গহ্বর ;

LL = Lips = ওষ্ঠ ও অধর ;

TT = Teeth = দন্ত ;

TR = Teeth-ridge = Alveolae = দন্তমূল = মাড়ি ;

HP = Hard palate = শক্ত তালু = অগ্র তালু ;

D = Dome = মূর্ধা = সর্বোচ্চ তালু ;

SP = Soft palate = Velum = নরম তালু = স্নিগ্ধ তালু = পশ্চাৎ তালু ;

U = Uvula = আলজিভ = শুণ্ডিকা ;

A = Apex = Tip of the tongue = জিহ্বাপ্রান্ত = জিহ্বাশিখর ;

Bl = Blade of the tongue = অগ্রজিহ্বা = জিহ্বার পাতলা অংশ ;

FT = Front of the tongue = জিহ্বার সম্মুখ ভাগ ;

BT = Back of the tongue = জিহ্বার পশ্চাৎ ভাগ ;

Ph = Pharynx = কণ্ঠনালী = ঊর্ধ্বকণ্ঠ = গলমুখ ;

WP = Wind-pipe = Trachæa = শ্বাসনালী ;

G = Gullet = aesophagus = খাদ্যনালী ;

E = Epiglottis = উপজিহ্বা = অধিজিহ্বা ;

VC = Vocal chords = স্বরতন্ত্রী = কণ্ঠতন্ত্রী ;

Larynx = স্বরযন্ত্র = স্বরকক্ষ ;

Nostril = নাসারন্ধ্র = নাসাপথ ;

Adam's apple = আদমের আপেল (?) ;

Lungs = ফুসফুস।

RT = Root of the tongue = জিহ্বামূল।

আমাদের ফুসফুস থেকে একটি নলের সাহায্যে শ্বাসবায়ু মুখ-গহ্বরে (Oral cavity = OC) ও নাসিকা-গহ্বরে (Nasal cavity = NC) এসে পৌঁছায়। এই নলটির নিচের প্রান্ত ফুসফুসের সঙ্গে যুক্ত এবং উপরের প্রান্ত মুখগহ্বর ও নাসিকার দিকে খুলে আছে। এই নলটির মধ্যে দিয়ে ফুসফুস থেকে শ্বাসবায়ু যাতায়াত করে। এই নলটিকে শ্বাসনালী (wind-pipe = WP বা trachaea). বলে। এই শ্বাসনালীর সঙ্গে সমান্তরাল আর একটি নালী গলা থেকে নেমে নিচের দিকে চলে গেছে ; এরও উপরের প্রান্ত মুখ-গহ্বর ও নাসিকা-গহ্বরের দিকে খুলে আছে, এর নিচের প্রান্ত পাকস্থলীর (stomach) সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। এই নালীটির সাহায্যে খাদ্যসামগ্রী আমাদের মুখ থেকে পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁছায়। একে বলে খাদ্যনালী বা গলনালী (Gullet = G or æsophagus)। খাদ্যনালী ধ্বনিসৃষ্টিতে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করে না। ধ্বনিসৃষ্টিতে শুধু শ্বাসনালীর ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। এই শ্বাসনালীর উপরের অংশে গলগণ্ডের কাছে এক স্থানে একটু ফুলে আছে ; অনেকের গলার এই ফোলা অংশটি বাইরের দিক থেকেও দেখা যায় একটু উঁচু হয়ে আছে। বাইরে থেকে এই যে উঁচু অংশটি দেখা যায়, একে 'আদমের আপেল' (?) (Adam's apple) বলে। শ্বাসনালীর অন্য অংশের চেয়ে ফোলা অংশের ভেতরে একটু বেশি জায়গা আছে। এই জায়গাটুকুকে অনেকে স্বরযন্ত্র (larynx) বলেছেন। শ্বাসনালীর ভেতরে এই জায়গাটুকুকে ঠিক স্বরযন্ত্র না বলে স্বরকক্ষ বলা উচিত। এই স্বরকক্ষের চারপাশে নরম মাংসপেশী দিয়ে তৈরি নানা গ্রন্থি আছে। ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসার পথে শ্বাসবায়ু এই স্বরযন্ত্র বা স্বরকক্ষের মধ্যেই প্রথম বাধা পায়। এই স্বরযন্ত্রের মধ্যে দু'টি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি বা জিভের মতো পাতলা দু'টি নমনীয় পর্দা আছে। এই দু'টিকে কণ্ঠতন্ত্রী বা স্বরতন্ত্রী (Vocal chords = VC) বলে। এই পর্দা দু'টি স্বরযন্ত্রের মধ্যে পাশাপাশি শোয়ানো অবস্থায় (horizontal) রয়েছে। পর্দা দু'টি গলার সামনের দিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, পেছন দিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। এই পর্দা দু'টি দু'পাশে সরে গিয়ে এদের মাঝখানে দিয়ে বাতাসের যাতায়াতের যে পথ করে দেয় তাকে স্বরপথ (Glottis) বলে। অনেকে Vocal chords ও Glottis দু'টিকেই কণ্ঠতন্ত্রী বলেছেন, কিন্তু আসলে শুধু Vocal chords-কেই কণ্ঠতন্ত্রী বলে, Glottis-কে স্বরপথ বলা উচিত। ঘরের দরজায় ঝোলানো মাঝখানে-কাটা পর্দার দুই অংশ দু'দিকে তুলে বেঁধে দিলে তাদের মাঝখান দিয়ে যাতায়াতের যে পথ হয়, স্বরপথটি সেই রকম দুই স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী পথ। দরজার পর্দার সঙ্গে স্বরতন্ত্রী দু'টির তফাৎ এই যে, দরজার পর্দা উপর থেকে নিচের দিকে ঝোলানো, কিন্তু স্বরতন্ত্রী পেছন থেকে সামনের দিকে শোয়ানো অবস্থায় রয়েছে। এই স্বরতন্ত্রী

দু'টি প্রধানত চার রকম অবস্থানে থাকতে পারে : (১) পূর্ণ বিচ্ছেদের অবস্থান, (২) পূর্ণ সংযোগের অবস্থান, (৩) প্রায়-পূর্ণ সংযোগের অবস্থান, (৪) প্রায়-পূর্ণ বিচ্ছেদের অবস্থান। স্বরতন্ত্রী দু'টি যখন ১নং অবস্থানে থাকে অর্থাৎ যখন পরস্পর থেকে সবচেয়ে বেশি দূরত্বে থাকে তখন তাদের মাঝখানকার স্বরপথ (Glottis) দিয়ে শ্বাসবায়ু বিনা বাধায় যাতায়াত করে। ফলে পর্দা দু'টি কাঁপে না, কম্পনজাত কোনো সুরও (voice) সৃষ্টি হয় না। এই অবস্থায় আমরা যে সব ধ্বনি উচ্চারণ করি সেগুলি অঘোষ ধ্বনি (voiceless or breathed sound) বলে পরিচিত। যেমন, বাংলার বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি (ক্, খ্, চ্ ছ্ ইত্যাদি) এবং শ্, স্ ইত্যাদি। আর যখন পর্দা দু'টিকে (২নং অবস্থানে) পরস্পরের কাছে এনে আমরা পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংযুক্ত করে দিই তখন তাদের মধ্যবর্তী স্বরপথটি (Glottis) সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। তখন সেখান দিয়ে শ্বাসবায়ু যাতায়াত করতে পারে না। পর্দা দু'টি স্থির হয়ে থাকে বলে তখন কোনো সুর বা ঘোষও শোনা যায় না। স্বরতন্ত্রী দু'টি সম্পূর্ণ যুক্ত করে হঠাৎ খুলে দিলে একরকম ধ্বনি সৃষ্টি হয়, তাকে আমরা রুদ্ধ-স্বরপথ-ধ্বনি, (glottal stop) বলি। ভাষাবিজ্ঞানে এই ধ্বনির চিহ্ন হল [ʔ] ; জার্মান ভাষায় এই ধ্বনি শোনা যায়। এটি একটি ঘোষহীন ধ্বনি। কিন্তু স্বরতন্ত্রী দু'টিকে যখন আমরা পরস্পরের খুব কাছাকাছি এনে (৩নং অবস্থানে) তাদের পরস্পরের সঙ্গে প্রায়-পূর্ণ সংযুক্ত করে দিই, অথচ পুরোপুরি মিলিয়ে দিই না, তখন তাদের মধ্যবর্তী স্বরপথটি অতি অল্প একটু খোলা থাকে। এই অবস্থায় তাদের মধ্যবর্তী স্বরপথ দিয়ে শ্বাসবায়ু যাতায়াত করার সময় পর্দা দু'টিকে বার-বার ঠেলে দিয়ে পথ আরো প্রশস্ত করে নিতে চায়। তাতে পর্দা দু'টি কাঁপতে থাকে এবং এই কম্পনের ফলে একটি সুর শোনা যায়। এই সুরই হল নাদ বা ঘোষ (voice)। এই সুর যেসব ধ্বনির সঙ্গে মিশে থাকে তাদের ঘোষধ্বনি (voiced sound) বলে। কিন্তু স্বরতন্ত্রী দু'টিকে যদি পরস্পর থেকে আরো দূরে সরিয়ে আনা যায় (৪নং অবস্থান), অথচ তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবধান না থাকে, তাহলেও শ্বাসবায়ু আর তাদের কাঁপায় না, তখন আর ঘোষ সৃষ্টি হয় না। এ হল ঘোষ সৃষ্টির অবস্থান এবং চরম বিচ্ছেদের অবস্থানের মধ্যবর্তী এক অবস্থান। যখন আমরা ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলি তখন স্বরতন্ত্রী দু'টি এই অবস্থানে থাকে। অর্থাৎ, এই অবস্থানে স্বরতন্ত্রী থাকার সময় আমরা ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলার ধ্বনিগুলি (whispered sounds) উচ্চারণ করি।

ফুসফুস থেকে সোজাসুজি শ্বাসবায়ু মুখ, নাসিকা ইত্যাদি অংশে এসে যখন বাগ্‌ধ্বনি সৃষ্টি করে তখন আমরা সেই উচ্চারণ-প্রক্রিয়াকে pulmonic air-stream mechanism বলি, বাংলায় বলতে পারি ফুসফুসের সঙ্গে যুক্ত

বায়ুপ্রবাহের প্রক্রিয়া। কিন্তু, আমরা যদি শ্বাসনালীর মধ্যবর্তী স্বরতন্ত্রী দু'টিকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত করে দিই তাহলে শ্বাসবায়ুর প্রবাহ মাঝপথে কেটে যায়, তখন স্বরতন্ত্রীর উপরে শ্বাসনালী, মুখ ও নাসিকার যেটুকু শ্বাসবায়ু থাকে তার সঙ্গে ফুসফুসের সরাসরি যোগ থাকে না। স্বরতন্ত্রীর ঊর্ধ্বস্থ এই যে বায়ুস্তম্ভ (supra-glottal air column) এই বায়ুটুকুকে কাজে লাগিয়ে আমরা যদি ধ্বনি উচ্চারণ করি তা হলে সেই প্রক্রিয়াকে বলে non-pulmonic air-stream mechanism বা ফুসফুস থেকে বিচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহের প্রক্রিয়া। স্বরতন্ত্রী থেকে সামান্য দূরত্বে স্বরকক্ষের মধ্যেই একটু উপর দিকে স্বরতন্ত্রীরই মতো আরো দু'টি পর্দা আছে। এই দু'টিকে কৃত্রিম স্বরতন্ত্রী (false vocal chords) বলা হয়। ধ্বনিতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক জোন্‌সের মতে এই কৃত্রিম স্বরতন্ত্রী দু'টিকেও আমরা যদি পরস্পরের দিকে এমন টেনে আনি যে তাদের মধ্যে দিয়ে শ্বাসবায়ু যাতায়াতের পথ থাকে তা হলেও এক রকমের ফিস্‌ফিস্ ধ্বনি (whispered sound) শোনা যায়।

আমরা আগে বলেছি যে, ফুসফুস থেকে শ্বাসনালী ও পাকস্থলী থেকে খাদ্যনালী বেরিয়ে গলার মধ্যে দিয়ে সমান্তরালভাবে এসে মুখ-গহ্বরে যুক্ত হয়েছে। মুখ-গহ্বরে যুক্ত হবার আগে গলার মধ্যে উপর দিকে এই নালী দু'টির মোহনায় এরা মিলে একটিই নালী হয়ে গেছে। এই মোহনা বা মিলনস্থলকে ঊর্ধ্বকণ্ঠ বা কণ্ঠনালী বা গলমুখ (Pharynx = Ph) বলে। মুখগহ্বরের এলাকা শেষ হলে আলজিভের পেছনে দিকে যে গর্তটি দেখা যায় সেটাই হচ্ছে কণ্ঠনালী বা গলমুখ (Pharynx)। এই গলমুখ বা কণ্ঠনালী থেকে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে কণ্ঠনালীর ধ্বনি (pharyngeal sound) বলা হয়। এই ধ্বনির ব্যবহার বাংলায় নেই। এই কণ্ঠনালীর মুখ বা গলমুখ উপর দিকে মুখ-গহ্বর ও নাসিকা-গহ্বরের সঙ্গে যুক্ত। আবার নিচের দিকে এটি শ্বাসনালী ও খাদ্যনালী দু'য়েরই সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং মুখ বা নাসিকা থেকে খাদ্যপানীয় বা বাতাস যা কিছুই এসে এই কণ্ঠনালীয় মুখে পৌঁছায় তা এখান থেকে দু'দিকে চলে যেতে পারে—খাদ্যনালীতে ও শ্বাসনালীতে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে সাধারণত এখান থেকে খাদ্য ও পানীয় খাদ্যনালীর দিকে এবং শ্বাসবায়ু শ্বাসনালীর দিকে ঘুরে যায়। খাদ্য বা পানীয় যাতে শ্বাসনালীতে ঢুকে না পড়ে তার জন্যে শ্বাসনালীর উপর-প্রান্তে একটি ছোট্ট জিভের মতো ঢাকনি আছে। এর একপ্রান্ত জিহ্বামূলে গলার পেশীর সঙ্গে যুক্ত ; অন্য প্রান্তটি যখন উপরে খাড়া হয়ে থাকে তখন শ্বাসনালীর মুখ খোলা থাকে। যখন আমরা খাদ্যগ্রহণ করি তখন এই ঢাকনিটি শ্বাসনালীর মুখে শুয়ে পড়ে ও শ্বাসনালীর মুখ ঢেকে দেয়, তাতে খাদ্য বা পানীয় তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। অসাবধান ভাবে খাবার খেলে বা

খাবার সময় খুব বেশি কথা বললে এই ঢাকনিটি শ্বাসনালীর মুখ ঢেকে দিতে পারে না, তখন খাদ্য বা পানীয় শ্বাসনালীর মধ্যে ঢুকে পড়ে। এই ছোট্ট ঢাকনিটিকে অধিজিহ্বা বা উপজিহ্বা (Epiglottis = E) বলে। ধ্বনি-সৃষ্টিতে এই উপজিহ্বার কোনো ভূমিকা নেই, যদিও ধ্বনিবিজ্ঞানীরা একেও বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যেই ধরে থাকেন।

স্বরযন্ত্রের পরে বাগ্‌যন্ত্রের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হল নাসিকা, মুখ, জিভ ইত্যাদি। নাসিকা-গহ্বর (NC = Nasal cavity) এবং মুখ-গহ্বর (Oral cavity = OC) মিলিয়ে যেন একটি দোতলা কক্ষ—উপরের কক্ষটি নাসিকা-গহ্বর এবং নীচের কক্ষটি মুখ-গহ্বর। কণ্ঠনালী বা গলমুখ (pharynx = Ph) থেকে একটি পথ নাসিকা-গহ্বরে এবং একটি পথ মুখ-গহ্বরে চলে গিয়েছে। ফুসফুস থেকে শ্বাসনালী দিয়ে চলে আসার পর শ্বাসবায়ু মুখ-গহ্বর ও নাসিকা-গহ্বর উভয় পথে বেরোতে পারে অথবা যে-কোনো একটি পথ দিয়ে বেরোতে পারে। যেভাবেই হোক, নাসিকা-গহ্বর দিয়ে বেরোবার সময় শ্বাসবায়ু নাসিকা-গহ্বরের চারদিকের দেওয়ালে যদি জোরে ঘর্ষিত হয় তাহলে একটা অনুনাসিক অনুরণন (nasal resonance) শোনা যায়। এই অনুরণনের ফলে নাসিকা ধ্বনি বা অনুনাসিক ধ্বনি (nasal sound) শোনা যায়। যেমন—বাংলা ম্, ন্, ঙ্ ; ইংরেজি m, n, ŋ ; জার্মান m, n, ŋ ; হিন্দি ম্, ন্, ঙ্, ণ ইত্যাদি।

নাসিকা-গহ্বর ও মুখ-গহ্বরকে পৃথক্ করেছে যে শক্ত খিলেনের মতো অংশটি, যাকে আমরা শিথিলভাবে তালু বলে থাকি, তা যেন মুখের গহ্বরের উপরের ছাদ। বাস্তবিক একে ভাষাবিজ্ঞানেও মুখের ছাদই (roof of the mouth) বলা হয়। এই ছাদের নিচে মুখ-গহ্বর, উপরে নাসিকা-গহ্বর। এই মুখ-গহ্বরের মধ্যে এবং সামনে-পেছনে রয়েছে প্রধান বাগ্‌যন্ত্রগুলি। মুখ-গহ্বরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই সব বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যে প্রধান হল ওষ্ঠ, দন্ত, মুখের ছাদ ও জিহ্বা। উপরে ওষ্ঠ, উপরের দন্ত ও তালু উপরে রয়েছে বলে এদের ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারক (upper articulator) বলে, আর জিহ্বা নিচে রয়েছে বলে একে নিম্নস্থ উচ্চারক (lower articulator) বলে। ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারকগুলি অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় (passive), কিন্তু নিম্নস্থ উচ্চারক জিহ্বা সবচেয়ে সক্রিয় (active) যন্ত্র। ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারকের গায়েই বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ-স্থান (places or points of articulation) চিহ্নিত করা হয়। আমাদের দু'টি ওষ্ঠের (Lips = LL) মধ্যে উপরেরটিকে ওষ্ঠ এবং নিচেরটিকে অধর বলেছেন ড. সুকুমার সেন। ভাষাবিজ্ঞানে সাধারণভাবে আমরা দু'টিকেই ওষ্ঠ বলে থাকি। দুই ওষ্ঠ মিলিত হলে বিশুদ্ধ ঔষ্ঠ্যধ্বনি (bi-labial sounds) উচ্চারিত হয়। যেমন—বাংলা প্, ফ্, ব্, ভ্ ; হিন্দি প্, ফ্, ব্ ; ভ্, ইংরেজি p, b জার্মান p, b ইত্যাদি। উপরের

দাঁতের সঙ্গে নিচের ওষ্ঠ (অধর) মিলিত হলে দন্তৌষ্ঠ্য (denti-labial) ধ্বনির সৃষ্টি হয়। যেমন—ইংরেজি f, v। ওষ্ঠের পরে ভেতর দিকে এগিয়ে গেলে আমরা দু'পাটি দাঁত পাই। নিচের পাটির দাঁত ধ্বনি-উচ্চারণে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করে না। উপরের পাটিরও সব দাঁত কাজে লাগে না, শুধু সামনের দাঁতগুলি কাজে লাগে। এই দাঁত থেকে জিহ্বার সাহায্যে বাংলা ত, থ, দ, ধ, ফরাসি t, d ইতালীয় t, d ধ্বনি উচ্চারিত হয়।

দাঁতের পরে বাগ্‌যন্ত্রের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হল মুখের ছাদ (roof of the mouth)। এই ছাদেরই সামনের দিকে, অনেকটা যেন কার্নিসের মতো ঝুলে আছে উপরের দাঁতের পাটি। দাঁতের পাটি থেকে ভিতর দিকে গেলে মুখের ছাদের যে অংশটি প্রথমে পাই সেটি হচ্ছে দাঁতের মাড়ি। এই উপরের সারির সামনের দাঁতের ভেতরের মাড়ি থেকে শুরু করে আলজিভ পর্যন্ত মুখের ছাদের যে বিস্তৃত অংশ তাকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা হয়—দাঁতের মাড়ি বা দন্তমূল (Teeth-ridge = TR), শক্ততালু বা অগ্রতালু (hard palate = HP), নরমতালু বা পশ্চাৎতালু বা স্নিগ্ধতালু (soft palate = Velum = SP), এবং আলজিভ বা অলিজিহ্বা বা শুণ্ডিকা (uvula = U)। বর্ণনার সাহায্যে মুখের ছাদের এই অংশগুলি বুঝিয়ে দেবার জন্যে দু'টি বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সাহায্য নেওয়া হয়—Convex (উত্তল) ও Concave (অবতল)। একটি বৃত্তার্ধের কেন্দ্রবিন্দুটি যেদিকে, সেদিকে বৃত্তার্ধটি ঝুঁকে আছে মনে হয়। বৃত্তার্ধের এই অবস্থাটি বোঝাবার জন্যে বলা হয় বৃত্তার্ধটি কেন্দ্রবিন্দুর দিকে অবতল (Concave) হয়ে আছে। আবার কেন্দ্রবিন্দুটি বৃত্তার্ধের যেদিকে আছে তার উল্টো দিকে বৃত্তার্ধটি যেন বিমুখ হয়ে আছে। বৃত্তার্ধটি যেদিকে বিমুখ হয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে সেদিকে বৃত্তার্ধটি উত্তল (Convex) হয়ে আছে, বলা হয়।

চিত্র নং ১১

আমরা বলতে পারি উপরের চিত্রে বৃত্তার্ধটি রামের দিকে অবতল (Concave) ও হরির দিকে উত্তল (Convex) হয়ে আছে।

উত্তল ও অবতল সম্পর্কে ধারণাটি স্পষ্ট হবার পর এবার আমরা মুখের ছাদের বিভিন্ন অংশের পরিচয় দিতে পারি। মুখের ছাদের যতটুকু অংশ উপরের পাটির সামনের দিকের দাঁতের কাছাকাছি এবং আমাদের জিভের দিকে উঁচু হয়ে উত্তল (convex) অবস্থায় আছে ততটুকু অংশকে দন্তমূল (teeth-ridge = TR or alveolae) বলে ; মোটামুটিভাবে উপরের পাটির সামনের দিকের দাঁতের ভিতরের মাড়ি হল দন্তমূল (teeth-ridge = alveolae)। দন্তমূল থেকে জিভের সাহায্যে বাংলা ন্, র্, ল্, ইংরেজি t, d জার্মান t, d ইত্যাদি ধ্বনি উচ্চারিত হয়। দন্তমূলের পরে মুখের ছাদের খানিকটা অংশ সোজা এবং শক্ত। এই শক্ত অংশটুকুকে শক্ত তালু বা অগ্র তালু (Hard palate) বলে। এইটুকু অংশ জিভের দিকে অবতলও নয়, উত্তলও নয় ; প্রায় সমান। এই শক্ত তালুকে আবার কেউ-কেউ তিনভাগে ভাগ করেছেন : সম্মুখ ভাগ = প্রাক্-শক্ততালু (pre-palate) ; মধ্য ভাগ = মধ্য-শক্ততালু (mid-palate) এবং পশ্চাৎ ভাগ = উত্তর-শক্ততালু (post-palate)। প্রাক্-শক্ততালু (pre-palate) থেকে জিভের সাহায্যে বাংলা ট্, ঠ্, ড়্, ঢ় ধ্বনি উচ্চারিত হয়। শক্ত তালুর পরে মুখের ছাদটি জিভের দিকে অবতল (Concave) হয়ে আছে। উপর-তালুর এই অংশটুকুকে সর্বোচ্চ তালু (Dome = D) বা মূর্ধা বলা যায়। এই আসল সর্বোচ্চ তালুর থেকে জিভ দ্রাবিড়ীয় ট্, ড্ ইত্যাদি ধ্বনি উচ্চারণ করে। সর্বোচ্চ তালু থেকে পেছনে গলার দিকে এগিয়ে গেলে মুখের ছাদের পশ্চাৎ অংশ অনেকটা নরম অনুভূত হয়। এই অংশটুকুকে স্নিগ্ধতালু বা পশ্চাৎ তালু (soft palate = SP বা Velum) বলে। এখান থেকে জিভের সাহায্যে উচ্চারিত হয় বাংলা ক্, খ্, গ্, ঘ্ ইত্যাদি ধ্বনি। স্নিগ্ধ তালুটি কণ্ঠের কাছাকাছি বলে এখান থেকে উচ্চারিত ধ্বনিকে আগে কণ্ঠ্য ধ্বনি বলা হত। স্নিগ্ধ তালুর শেষ নিম্ন প্রান্ত থেকে যে ছোট্ট কোমল মাংসপিণ্ডটি ঝুলছে তাকে আমরা আলজিভ বা অলিজিহ্বা (Uvula = U) বলি। একে কেউ-কেউ শুণ্ডিকা বলেছেন। আলজিভ থেকে উচ্চারিত ধ্বনি হল জার্মান ভাষার এক রকমের 'র্' [R]। এই ধ্বনির ব্যবহার বাংলা ভাষায় নেই। প্রয়োজন অনুসারে উপজিহ্বা যেমন শ্বাসনালীর মুখটি ঢেকে দিলে খাদ্য শুধু খাদ্যনালীতে প্রবেশ করে তেমনি প্রয়োজন মতো যখন আলজিভটি নাসিকা-গহ্বরের গলার দিকের পথটি বন্ধ করে দেয় তখন শ্বাসবায়ু ভিতর থেকে এসে শুধু মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করে। নরম বা স্নিগ্ধ তালুকে কেউ-কেউ তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন—সম্মুখ ভাগ = প্রাক্-স্নিগ্ধতালু (pre-velum), মধ্যভাগ = মধ্য-স্নিগ্ধতালু (mid-velum) এবং উত্তর-স্নিগ্ধতালু (post-velum)। মুখের ছাদের যে-সব অংশের কথা উল্লেখ করা হল সেই সব অংশকে স্পর্শ করে জিভ নানা ধ্বনি উচ্চারণ করে ; ঐ অংশগুলি হল প্রধান উচ্চারণ-স্থান (places or points of articulation)। এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হয়েছে

তাতে বোঝা গেছে, এই উর্ধ্বস্থ উচ্চারক একা কোনো ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারে না ; এর সঙ্গে অধিকাংশ সময় নিচে থেকে জিভ গিয়ে সহযোগিতা করে বলেই ধ্বনিসৃষ্টি হয়। ভাষার ধ্বনিসৃষ্টিতে জিভের ভূমিকা সবচেয়ে সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজিতে Language (ভাষা) কথাটির ব্যুৎপত্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে জিহ্বার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি (English *Language,* French *langue* / langage < Lat. *lingua* = tongue)। জিভের পেছন দিকের যে শেষ প্রান্ত কণ্ঠনালীর (pharynx) কাছে গলার সঙ্গে যুক্ত তাকে জিহ্বামূল (root of tongue) বলে। বিভিন্ন শ্রেণীর ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভের এক-এক অংশ দাঁত বা মুখের ছাদের এক-এক অংশ স্পর্শ করে। ধ্বনিবিজ্ঞানীরা জিভের তিনটি প্রধান অংশ নির্ণয় করেছেন—(১) জিহ্বার পাতলা অংশ বা জিহ্বাফলক (Blade = Bl), (২) সম্মুখ জিহ্বা (Front of the Tongue = FT) এবং (৩) পশ্চাৎ জিহ্বা (Back of the Tongue = BT)। জিভের এই সব অংশের মধ্যে সীমারেখা খুব স্পষ্ট-চিহ্নিত নয় বলে অধ্যাপক জোন্‌স মুখের ছাদের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে মিলিয়ে জিভের অংশগুলি চিহ্নিত করেছেন। সাধারণভাবে মুখ বন্ধ করে রাখলে জিভের যেটুকু অংশ দন্তমূলের তলায় পড়ে তাকে জিভের পাতলা অংশ বা অগ্রজিহ্বা (Blade of the Tongue) বলে। এই পাতলা অংশের একেবারে সামনের ধারটিকে বলে জিহ্বাপ্রান্ত বা জিহ্বাশিখর (tip of the tongue or apex = A)। জিভের যেটুকু অংশ শক্ত তালুর (hard palate) তলায় পড়ে সেটুকু অংশকে সম্মুখ জিহ্বা (front of the tongue) বলে। আর যেটুকু অংশ স্নিগ্ধ তালু বা পশ্চাৎ তালুর (Soft palate) তলায় থাকে তাকে পশ্চাৎ জিহ্বা (back of the tongue) বলে। কখনো-কখনো পশ্চাৎ জিহ্বাকে dorsumও বলে। বিভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বা বিভিন্ন অবস্থানে থাকে অথবা জিহ্বার বিভিন্ন অংশ উচ্চারণস্থানের বিভিন্ন বিন্দু স্পর্শ করে। ভাষার ধ্বনি-উচ্চারণ ও ধ্বনি-বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে জিহ্বার ভূমিকাই প্রধান।

॥ ১০ ॥

পরিভাষা (Technical terms)

বাগ্‌যন্ত্র সম্পর্কে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানের উপক্রমণিকা-পর্ব শেষ হল। এর পর ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের আলোচনায় প্রবেশ করা যাবে। কিন্তু তার আগে ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান-প্রধান বিভাগের পারিভাষিক নামগুলি নিম্নে দেওয়া হল। অন্যান্য পারিভাষিক শব্দগুলি ইংরেজি প্রতিশব্দ সহ

গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে পাওয়া যাবে।

Acoustics = ধ্বনিতরঙ্গ-বিজ্ঞান / স্বনবিজ্ঞান

Articulatory Phonetics = উচ্চারণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান

Auditory Phonetics = শ্রবণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান

Bilingualism = দ্বিভাষিকতা

Borrowing = ভাষাঋণ

Comparative Method = তুলনামূলক পদ্ধতি

Comparative Philology= তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব/তুলনামূলক বাঙ্মীমাংসা

Descriptive Grammar = বর্ণনামূলক ব্যাকরণ

Descriptive Linguistics = বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান

Diachronic Linguistics = কালক্রমিক / কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান

Dialect Geography = উপভাষাগত ভূগোল

Dialect Survey = উপভাষা জরিপ

Dialectology = উপভাষা-বিজ্ঞান / উপভাষাতত্ত্ব

Esperanto = এস্‌পেরান্তো (বিশ্বভাষা)

External Reconstruction = বাহ্য পুনর্গঠন

Geolinguistics = ভৌগোলিক ভাষাবিজ্ঞান

Glottochronology = শব্দভাণ্ডারের অবক্ষয় ও নতুন শব্দসৃষ্টিতত্ত্ব / শব্দ-কালক্রম-বিজ্ঞান

Grammar = ব্যাকরণ

Graphics = লিপিবিজ্ঞান

Historical Linguistics = ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান

Internal Reconstruction = আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন

International Phonetic Alphabet = আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা

Language family = ভাষাবংশ / ভাষাপরিবার

Language Planning = ভাষা-পরিকল্পনা

Lexicography = অভিধান-বিজ্ঞান

Lexico-Statistics = শব্দসমূহের অবক্ষয়ের পরিসংখ্যান / শব্দ-পরিসংখ্যান

Linguistic Ontology = ব্যক্তিবৃত্তীয় ভাষাতত্ত্ব

Linguistic Phylogeny = জাতিবৃত্তীয় ভাষাতত্ত্ব

Linguistics = ভাষাবিজ্ঞান, বিশুদ্ধ ভাষাতত্ত্ব

Morphology = রূপতত্ত্ব

Multilingualism = বহুভাষিকতা

Normative Grammar = নির্দেশমূলক ব্যাকরণ

Philology = বাঙ্‌মীমাংসা / সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব / পুঁথিনির্ভর ভাষাতত্ত্ব

Phonemic or Broad Transcription = প্রশস্ত / স্বনিমভিত্তিক / মূলধ্বনিভিত্তিক লিপ্যন্তরণ

Phonemics = ধ্বনিবিচার / স্বনিমবিজ্ঞান

Phonetic or Narrow Transcription = সূক্ষ্ম ধ্বনিভিত্তিক / সূক্ষ্ম উচ্চারণভিত্তিক / সঙ্কীর্ণ লিপ্যন্তরণ

Phonetics = ধ্বনিবিজ্ঞান

Phonology = ধ্বনিতত্ত্ব / স্বনিমপ্রক্রিয়া-বিজ্ঞান

Polyglottism = বহুভাষিকতা

Positive Grammar = বাস্তবধর্মী ব্যাকরণ

Prescriptive Grammar = বিধিনিষেধমূলক ব্যাকরণ

Semantics = শব্দার্থতত্ত্ব

Sociolinguistics = সমাজ-ভাষাবিজ্ঞান / সমাজভিত্তিক ভাষাবিজ্ঞান

Structural Linguistics = গঠনকেন্দ্রিক / অবয়ববাদী ভাষাবিজ্ঞান

Stylistics = শৈলীবিজ্ঞান / রীতিবিজ্ঞান

Synchronic Linguistics = এককালিক / এককালীন ভাষাবিজ্ঞান

Syntax = বাক্যতত্ত্ব

Traditional Grammar = প্রথাগত / ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণ

Transformational Generative Grammar = রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণ / সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

॥ ১১ ॥

ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ বা বর্গীকরণ

(Classification of Sounds)

বর্তমান প্রসঙ্গের সূচনায় প্রথমেই মনে পড়ে একালের একজন ধ্বনিবিজ্ঞানী অধ্যাপক জে. ডি. ও' কোনোর্ (J. D. O' Connor)-এর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি : পৃথিবীর সব ভাষার সব ধ্বনির বর্ণনা তো আমরা দিতেই পারি না, এমন কি কোনো একটি ধ্বনিরও সবদিকের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়।[১] ভাষাবিশেষ-নিরপেক্ষভাবে সর্ববিধ বাগ্‌ধ্বনির বর্ণনা করতে গেলে আমরা দেখতে পাই যে, বাগ্‌ধ্বনির এত সব জটিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র্য রয়েছে যে তাদের সবগুলির বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব ; তাদের কয়েকটি মোটামুটি শ্রেণীতে ভাগ করে শুধু সেই সব শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা করাই সম্ভব। দ্বিতীয়ত, কোনো ধ্বনির বিভিন্ন দিকের (aspects) বৈজ্ঞানিক বর্ণনাও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দিতে গেলে তা অতি বিস্তৃত হয়ে যায়, অথচ তাতেও নিজের মনে একটা অপূর্ণতার অসন্তোষ জেগেই থাকে। ধ্বনিবিজ্ঞানীরা যখন ধ্বনির উচ্চারণ-প্রক্রিয়াগত (articulatory) বর্ণনা দেন তখনো তার সব দিক বর্ণনা করেন না, শুধু কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিকেরই উল্লেখ করেন। যেমন ধ্বনিবিজ্ঞানীরা যখন ইংরেজি ভাষার / d /-ধ্বনির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এটা হল দন্তমূলীয় (alveolar) ধ্বনি, তখন এর উচ্চারণে শ্বাসবায়ু মুখের মধ্যে ঠিক কোন্ জায়গায় বাধা পায় সেই দিকটার ইঙ্গিত দেন ; যখন তাঁরা একে ঘোষধ্বনি (voiced sound) বলেন তখন বোঝাতে চান যে এর উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রীর (vocal cords) কম্পনজাত সুর শোনা যায় ; তেমনি একে যখন অল্পপ্রাণ (unaspirated) ধ্বনি বলা হয় তখন এর উচ্চারণ-প্রক্রিয়ার আর একটা দিক লক্ষ্য করা হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত ধ্বনিবিজ্ঞানী প্রশ্ন তুলেছেন, এত বলেও কি / d /-ধ্বনির উচ্চারণ-প্রক্রিয়ার সব দিকের বর্ণনা পূর্ণাঙ্গ হল? এই ধ্বনিটি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুখের মধ্যে যখন ক্ষণকালের

১। "......Complete description is beyond our powers since it would mean mentioning an infinite number of features."- J. D. O' Connor : *Phonetics,* Penguin Book, 1974, p. 125.

জন্যে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে তখন ঐ শ্বাসবায়ু কতটা ঘনীভূত (compressed) হয়, তাতে মুখগহ্বরের চার-দেয়ালে কতটা চাপ সৃষ্টি হয়?--এদিক থেকে তো / d /-ধ্বনির বর্ণনা দেওয়া হল না। আর এদিক থেকে আমরা ধ্বনিটির শ্রেণীনির্ণয়ও করিনি। ধ্বনিবিজ্ঞানী পাইকের (Kenneth Lee Pike) অনুসরণে আমরা ইংরেজি / d /-কে যদি চাপযুক্ত (Compressive) ধ্বনি বলি, তাহলেও তাতে চাপের উল্লেখমাত্র পাওয়া যায়, চাপের পরিমাণের ধারণা তাতে হয় না। অথচ সব চাপযুক্ত ধ্বনিতে তো চাপের পরিমাণ সমান হয় না। সুতরাং ধ্বনির বর্ণনা ও শ্রেণীবিভাগে মনে রাখতে হবে, ধ্বনির কোনো বর্ণনাই পূর্ণাঙ্গ (exhaustive) নয়, আর ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ ধ্বনির সবদিক অবলম্বন করে নির্ণয় করাও সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্যে তার প্রয়োজনও নেই। ধ্বনির শুধু তাৎপর্যপূর্ণ দিকের বর্ণনা দেওয়াই সম্ভব এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনায় তার আলোকে শ্রেণীবিভাগই বাঞ্ছিত।

এই সীমাবদ্ধতার কথা মেনে নিয়ে ধ্বনির শ্রেণীবিভাগে এসে প্রথমেই একথা বলা দরকার যে, শ্বাসবায়ুর গতিপথে বাগ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে বাধা সৃষ্টি করে বা তার গতিপথ নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে আমরা তাতে নানা মাপের ও নানা ধরনের যেসব ঢেউ সৃষ্টি করি সেই ঢেউগুলিই যখন বাতাসে ভাসতে-ভাসতে শ্রোতার কানে গিয়ে বাজে তখন আমরা তাদের বাগ্‌ধ্বনি (Speech-sound / Phone) বলি। সুতরাং এই শ্বাসবায়ুর গতিপথ এবং তাতে বাধার স্থান, পরিমাণ ও প্রকৃতির উপরে ধ্বনির বৈচিত্র্য নির্ভর করে। তাই শ্বাসবায়ুর এই গতিপথ এবং তাতে বাধার স্থান, পরিমাণ ও প্রকৃতিকে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করে ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ বা বর্গীকরণ (Classification of Sounds) করা হয়।

অন্তর্গামী ও বহির্গামী ধ্বনি (Ingressive and Egressive Sounds) :

সর্বপ্রথমে শ্বাসবায়ুর গতিমুখ লক্ষ্য করে ধ্বনির একেবারে মূলীভূত দু'টি শ্রেণী নির্ণয় করা হয়েছে—অন্তর্গামী (Ingressive) ও বহির্গামী (Egressive) ধ্বনি। ফুসফুস (Lungs), ঊর্ধ্বকণ্ঠ (Pharynx), মুখগহ্বর (Oral Cavity) প্রভৃতির মধ্যে যে শূন্যস্থান আছে তার ফাঁকা জায়গাটুকু কোনো দিক দিয়ে চাপসৃষ্টির ফলে কমে এলে তার মধ্যস্থ শ্বাসবায়ুর উপরেও চাপ পড়ে এবং সেই চাপের জন্য শ্বাসবায়ু ঘনীভূত (compressed) হয়। তার ফলে, শ্বাসবায়ু মুখ বা নাসিকা দিয়ে যখন খোলা পথ পায় তখন বাইরে বেরিয়ে আসে। এই বহির্গামী (Egressive) বায়ুতে ঢেউ সৃষ্টি করার ফলে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে বহির্গামী বা ঘনীভূত বায়ুজাত ধ্বনি (Egressive or Compressive

Sound) বলে। যেমন, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি অ, আ, ক্, খ্, চ্, ছ্, ট্, ঠ্, প্, ম্, ন্ ইত্যাদি এবং ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি / p /, / m /, / n /, / ʃ /, / s / ইত্যাদি। আবার, ফুসফুস, ঊর্ধ্বকণ্ঠ, মুখগহ্বরের মধ্যে যে শূন্যস্থান আছে তার ফাঁকা জায়গাটুকু কোনো কারণে প্রসারিত হয়ে গেলে তার মধ্যস্থ শ্বাসবায়ু অ-ঘনীভূত বা পাতলা (rarefied) হয়ে যায়। তখন বাইরের বাতাস এইসব শূন্যস্থানে ঢুকে পড়ে। এই অন্তর্গামী (Ingressive) বায়ুর গতিপথে যে ধ্বনি সৃষ্টি করা হয় তাকে অন্তর্গামী বা অ-ঘনীভূত (Ingressive or Rarefactive) ধ্বনি বলে। লাঙলের গোরুকে পিছন থেকে তাড়া দেবার সময় চাষিরা মুখ দিয়ে যে চু-চু শব্দ করে তাকে এই রকম অন্তর্গামী ধ্বনির মধ্যে ধরা হয়। কারণ এ রকম শব্দ করার সময় জিভের দু'পাশ দিয়ে শ্বাসবায়ুকে ভিতরে আকর্ষণ করা হয়। সংস্কৃত , বাংলা, হিন্দি, জার্মান, ইংরেজি, ফরাসি, প্রভৃতি ভাষায় সাধারণত যেসব ধ্বনি ব্যবহার করা হয়, সেগুলি সবই বহির্গামী ধ্বনি। অন্তর্গামী ধ্বনি আমাদের ভাষায় সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। আফ্রিকার ব্যুশ্‌ম্যান্, হটেন্‌টট্ প্রভৃতি কোনো-কোনো ভাষায় এই ধ্বনির প্রচলন আছে। ভাষাবিজ্ঞানী তারাপুরওয়ালা উল্লেখ করেছেন, সিন্ধী ও গুজরাটি ভাষায় এরকম দু'একটি ধ্বনি শোনা যায়। গুজরাটি ভাষায় কোনো কোনো অঞ্চলের উচ্চারণে 'দ্বেন' (বোন) শব্দে তিনি এই ধ্বনি লক্ষ্য করেছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ সমৃদ্ধ ভাষার প্রায় সব স্বাভাবিক ধ্বনিই হল বহির্গামী ধ্বনি। তাই এর উল্টো প্রক্রিয়ায় উচ্চারিত অন্তর্গামী ধ্বনিকে বিপরীত ধ্বনি (Inverse Sound) বলে।

বিভাজ্য ও অবিভাজ্য ধ্বনি (Segmental and Supra-segmental Sounds) :

ধ্বনিসত্তার স্বরূপ (Nature of phonetic entity) বিচার করে ধ্বনিকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : বিভাজ্য ধ্বনি (বা বিভাজিত ধ্বনি বা খণ্ডাত্মক ধ্বনি) (Segmental Sound) এবং অবিভাজ্য (বা বিভাজনাতিরিক্ত বা অবিভাজিত বা অখণ্ডাত্মক) ধ্বনি (Supra-segmental Sound)। আমাদের বাক্‌প্রবাহকে বিশ্লেষণ করলে তার অংশস্বরূপ যেসব ধ্বনিগত উপাদান পাই সেগুলি দু'রকমের। কতকগুলিকে সুস্পষ্ট (discrete) পৃথক্-পৃথক্ (separate) এককে (units) ভাগ করা যায়। এগুলিকে বিভাজ্য ধ্বনি (বা বিভাজিত বা খণ্ডাত্মক ধ্বনি) বলে। যেমন, 'রাম যায়?'—এই বাক্যটি বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই—র্ + আ + ম্ য্ + আ + য়্? এই যে ছোট-ছোট ধ্বনিগত উপাদান, এগুলির প্রত্যেকটিকে পৃথক্ করে স্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র এককরূপে ভাগ করা সম্ভব হল। কিন্তু আমাদের বাক্‌প্রবাহে এমন ধ্বনিও শোনা যায় যাকে

এরকম সুস্পষ্ট ছোট-ছোট পৃথক্-পৃথক্ একক (units) রূপে ভাগ করা যায় না ; এগুলিকে অবিভাজ্য ধ্বনি (বা অবিভাজিত বা বিভাজনাতিরিক্ত বা অখণ্ডাত্মক ধ্বনি) (Supra-segmental Sound) বলে। ঐ বাক্যে র্ + আ + ম্ য্ + আ + য়্—এইসব ধ্বনি ছাড়া আর একটা ধ্বনি আছে, সেটা হল সূক্ষ্ম সুরের প্রবাহ। সেই প্রবাহকে লেখায় উপস্থাপিত করা হয় নি, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের বাক্য পর-পর সতর্কভাবে শুনলে কানে ধরা পড়ে। উপরের ঐ বাক্যটিতে সেই সুরের প্রবাহটা বাক্যের গোড়ায় ক্ষীণ, কিন্তু বাক্যের শেষের দিকে তীব্র। অর্থাৎ সুরটা যেন এই রকম নিচু থেকে উপরে উঠে গেছে :

রাম যায়?

বাক্যের শেষের দিকে সুরটা উপরে উঠে গেছে বলেই বাক্যটা প্রশ্নের অর্থ বহন করে। কিন্তু শেষের দিকে সুরটা নিচে নেমে গেলে বাক্যটা সাধারণ বিবৃতিমূলক ইতিবাচক বাক্য হয়ে যেত। যেমন :

রাম যায়।

এই যে সুর (tone), একে আমরা বিভাজ্য ধ্বনির মতো ছোট-ছোট স্পষ্টচিহ্নিত এককরূপে ভাগ করতে পারি না। এইজন্যে একে অবিভাজ্য ধ্বনি বলে। বিভাজ্য ধ্বনিকে বাক্যের ধারায় পর-পর বিন্যস্ত করা যায় বলে এগুলিকে সারিবদ্ধ ধ্বনিও (linear sounds) বলে। আর, অবিভাজ্য ধ্বনিকে সারিবদ্ধভাবে সাজানো যায় না, এগুলি ভাষায় ছন্দের ধর্ম সঞ্চার করে বলে এগুলিকে ছন্দোগুণ (prosodeme বা prosodic feature) বলে। বিভাজ্য ধ্বনি হল ভাষার মূল বা প্রাথমিক ধ্বনি (primary sound), আর অবিভাজ্য ধ্বনি হল ভাষার গৌণ ধ্বনি (secondary sound)। বিভাজ্য ধ্বনিকে স্বর

(Vowel), ব্যঞ্জন (Consonant) প্রভৃতি বিভাগে ভাগ করা হয়। তেমনি অবিভাজ্য ধ্বনির বিভাগ হল—স্বরাঘাত বা সুর (tone / pitch accent), শ্বাসাঘাত (বা ঝোঁক বা বল বা প্রস্বন) (stress accent), সংযোগ (বা যতি বা সন্ধান বা সংহিতা) (juncture), দৈর্ঘ্য (length), অনুনাসিকতা (nasalization)।

স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনি : বিভাজ্য ধ্বনির (Segmental Sounds) দু'টি প্রধান শ্রেণী হল : ব্যঞ্জন (Consonant) ও স্বর (Vowel)। এই দুই শ্রেণীর প্রচলিত পরিচিত সংজ্ঞা হল : "যে ধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং পূর্ণ ও পরিস্ফুট-ভাবে উচ্চারিত হয়, এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়া অন্য ধ্বনি প্রকাশিত হয়, তাহাকে স্বর-ধ্বনি (Vowel Sound) বলে ; যেমন, আ, অ্যা, এ, ও।" এবং

"যে ধ্বনি স্বর-ধ্বনির সাহায্য ব্যতীত স্পষ্ট-রূপে উচ্চারিত হইতে পারে না, এবং সাধারণতঃ যে ধ্বনি অপর ধ্বনিকে আশ্রয় করিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহাকে ব্যঞ্জন-ধ্বনি (Consonant Sound) বলে ; যেমন, ক্, চ্ ড়্, শ্ ইত্যাদি। এগুলিকে শ্রুতিযোগ্য করিয়া প্রকৃষ্ট-রূপে উচ্চারণ করিতে হইলে, স্বর-ধ্বনির আশ্রয় লইতে হয় ; যেমন, ক (ক্ + অ), কা (ক্ + আ), অক্ (অ + ক্), কি (ক্ + ই), চি (চ্ + ই)...ইত্যাদি।"[২] ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া এই সংজ্ঞাটি প্রাথমিক জিজ্ঞাসুকে স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনি সনাক্তকরণে পথ-নির্দেশ দেবে সন্দেহ নেই, কিন্তু আধুনিক বিচারে সংজ্ঞাটিতে স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যে বাগ্‌যন্ত্রের প্রক্রিয়াগত (articulatory) পার্থক্যটিই স্পষ্ট হয় নি, ফলে স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যে মূল বৈজ্ঞানিক পার্থক্যের স্বরূপটিই উদ্‌ঘাটিত হয় নি। বস্তুত এ সংজ্ঞাটি ধ্বনিবৈজ্ঞানিক (phonetic) সংজ্ঞাই নয়, এটি ধ্বনির ভূমিকাগত (functional) সংজ্ঞা ; এর উপযোগিতা অনস্বীকার্য ; কিন্তু এর ক্ষেত্র স্বতন্ত্র।

উচ্চারণ-প্রক্রিয়ার দিক্ থেকে স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পার্থক্য নির্দেশ করে কেউ কেউ সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন এইভাবে :

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুখবিবরে কোনো রকম বাধা পায় না, তাকে স্বরধ্বনি বলে ; আর যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুখবিবরে কোথাও বাধা পায় তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথে বাধাই স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যে পার্থক্যের মূল কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বর ও ব্যঞ্জনের এই সংজ্ঞাটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নয়। কারণ, এই সংজ্ঞায় দেখা যাচ্ছে যে, শুধু মুখবিবরেই শ্বাসবায়ুর বাধাকে স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যে পার্থক্যের মানদণ্ড

২। চট্টোপাধ্যায়, ড. সুনীতিকুমার : 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২, পৃঃ ২৮।

হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু মুখবিবর ছাড়া অন্যত্র শ্বাসবায়ু বাধা পেলেও ব্যঞ্জনধ্বনি সৃষ্ট হয়। ভাষাবিজ্ঞানে যাকে স্বরপথ-অবরোধ-জাত স্পর্শধ্বনি (glottal stop = [?]) বলে, সেই ধ্বনিটি মুখবিবরে বাধার ফলে সৃষ্ট হয় না, স্বরতন্ত্রী দুটিতে (Vocal Cords) বাধার ফলে সৃষ্ট হয়। অথচ এই ধ্বনিকে ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যেই ধরা হয়। উপর্যুক্ত সংজ্ঞার ব্যতিক্রমের আরো কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। একজন আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানী একটি মূলীভূত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন : শ্বাসবায়ু মুখবিবরে বাধা পায় কিভাবে? জিহ্বা, নিচের ওষ্ঠ ইত্যাদি নিম্নস্থ উচ্চারক (Lower Articulator) যখন উপরে উঠে তালু, উপরের ওষ্ঠ ইত্যাদি ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারককে পুরোপুরি বা আংশিক স্পর্শ করে বা নিম্নস্থ ও ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারক যখন পরস্পরের কাছাকাছি আসে তখন মুখের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করার সময় শ্বাসবায়ু তাতে পুরোপুরি বা আংশিক বাধা পায়। এই বাধাকে যদি মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তা হলে দেখা যায় দীর্ঘ 'ঈ' [i:] উচ্চারণের সময় জিহ্বার দু'পাশের দু'টি প্রান্ত উপরে উঠে তালুর অনেকখানি অংশ স্পর্শ করে এবং তাতে জিহ্বার দু'পাশ দিয়ে শ্বাসবায়ুর বেরোবার পথে বাধা সৃষ্টি করে, তখন শুধু জিহ্বার সামনের দিকে শ্বাসবায়ু বেরোবার পথ খোলা থাকে। আবার 'ল্' [l] উচ্চারণের সময় জিহ্বার সামনের প্রান্ত উঠে গিয়ে দন্তমূল স্পর্শ করে, তখন সামনের পথটি বন্ধ হয়ে যায় এবং জিহ্বার দু'পাশ দিয়ে শ্বাসবায়ু বেরিয়ে যায়। তা হলে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ 'ঈ' ও 'ল্' [i: এবং l] দু'য়ের উচ্চারণেই শ্বাসবায়ু একদিকে-না-একদিকে বাধা পায়। পাইক্ তাই বলেছেন, শ্বাসবায়ু বাধা পেলেই যদি কোনো ধ্বনিকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলতে হয় তবে 'ল্'-এর মতো দীর্ঘ 'ঈ'-কেও ব্যঞ্জনধ্বনি বলতে হবে। ধ্বনিবিজ্ঞানী কেনীয়ন্ (Kenyon) তো লক্ষ্য করেছেন, 'ল্'-এর চেয়ে বরং দীর্ঘ 'ঈ' উচ্চারণের সময় বাধার পরিমাণ অনেক বেশি। এছাড়া অনুনাসিক স্বরধ্বনি (ইঁ, এঁ, অ্যাঁ ইত্যাদি) উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুখবিবরে প্রবেশের পথে অংশিক বাধা পায় বলেই শ্বাসবায়ু নাসাপথে প্রবেশ করে এবং নাসিকাগহ্বরে অনুরণন সৃষ্টি করে ; তেমনি বিশুদ্ধ মৌখিক স্বরধ্বনি (ই, এ, অ্যা ইত্যাদি) উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর নাসিকায় প্রবেশের পথে আমরা পূর্ণ বাধা (যাকে বলে velic closure) দিই বলেই সবটা শ্বাসবায়ু মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। অনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ঐ আংশিক বাধা আর মৌখিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় এই পূর্ণ বাধা সৃষ্ট হলেও স্বরধ্বনিকে তো ব্যঞ্জনধ্বনি বলা হয় না ; ওগুলি স্বরধ্বনি বলেই পরিচিত। সুতরাং মুখবিবরে শ্বাসবায়ুর গতিপথে কোনো বাধা সৃষ্টি হয় কি হয় না, শুধু এইটুকু বিবেচনার উপরে নির্ভর করে স্বর ও ব্যঞ্জনের সংজ্ঞা রচনা করা যায় না। শুধু বাধা সৃষ্টি হলেই কোনো ধ্বনিকে ব্যঞ্জনধ্বনি

বলা যায় না, সেই ধ্বনিটি সেই বাধারই ফলে সৃষ্ট ধ্বনি কিনা সেটাও দেখা দরকার। বাধার সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও সেই বাধার ফলে যদি কোনো ধ্বনি সৃষ্ট না হয়, অন্য কোনো কারণে ধ্বনি সৃষ্ট হয়, তবে তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলা যায় না। পূর্বোক্ত উদাহরণে জিভের দু'পাশে বাধার সৃষ্টি হলেও 'ঈ' সেই বাধাজনিত ধ্বনি নয়, তেমনি মৌখিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় যে Velic Closure হয়, স্বরধ্বনি সেই বাধাজাত ধ্বনি নয়। তাছাড়া বাধার মাত্রাও এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য। কোনো কোনো স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ও শ্বাসবায়ু মুখবিবরে আংশিক বাধা পায়। ধ্বনিবিজ্ঞানী পাইক্ যখন বলেন, 'The oral stricture in all fricatives and vowels are partial', তখন বোঝা যায়, স্বরধ্বনি উচ্চারণেও মুখবিবরে শ্বাসবায়ুর গতিপথে যে আংশিক বাধার সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে তিনি অবহিত। আবার পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে, ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে যাকে উষ্মধ্বনি (fricative) বলে, সেই ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণেও মুখবিবরে শ্বাসবায়ু আংশিক বাধা পায়। তাহলে যেসব স্বরধ্বনি উচ্চারণে শ্বাসবায়ু মুখবিবরে আংশিক বাধা পায়, সেইসব স্বরধ্বনির সঙ্গে উষ্ম ব্যঞ্জনের পার্থক্য হয় কেন? পার্থক্য হয় এইজন্যে যে, উষ্ম ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথে একটা ঘর্ষণধ্বনির (frictional sound) সৃষ্টি হয়, কিন্তু স্বরধ্বনির সময় এই ঘর্ষণধ্বনির সৃষ্টি হয় না। তার কারণ, উষ্ম ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় বাধার পরিমাণটা একটু বেশি থাকে এবং শ্বাসবায়ুকে সেই বাধা ঠেলে যাতায়াত করতে হয় বলে ঘর্ষণধ্বনির সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় বাধার পরিমাণ এত কম যে, শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথে কোনো ঘর্ষণধ্বনির সৃষ্টি হয় না, বা সৃষ্টি হলেও সেই ঘর্ষণধ্বনি এত ক্ষীণ যে খালি কানে শোনা যায় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, স্বর ও ব্যঞ্জন উভয়ের উচ্চারণেই মুখবিবরে কখনো কখনো বাধা সৃষ্টি হয়, তবে উভয় ক্ষেত্রে মাত্রার পার্থক্য আছে। সুতরাং স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যে পার্থক্য শ্রেণীগত নয়, মাত্রাগত। বাধার মাত্রা যখন বেশি হয় ও সেই বাধার ফলে অবরোধ (closure), বিস্ফোরণ (explosion) বা ঘর্ষণ (friction)-জনিত ধ্বনি শোনা যায়, তখন সেই ধ্বনিকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে, যখন সেই মাত্রা খুবই কম হয় ও বাধাজনিত কোনো ধ্বনির সৃষ্টি হয় না, তখন স্বরধ্বনি হয়। সব দিক বিবেচনা করে স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে এই উভয় প্রকার ধ্বনির মোটামুটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা রচনা করেছেন দু'জন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী বার্নার্ড ব্লক্ এবং জর্জ্ এল্. ট্রেগার্ (Bernard Bloch and George L. Trager)। তাঁদের মতে :

" A VOWEL is a sound for whose production the oral passage is unobstructed, so that the air current can

flow from the lungs to the lips and beyond without being stopped, without having to squeeze through a narrow constriction, without being deflected from the median line of its channel, and without causing any of the supraglottal organs to vibrate; it is typically but not necessarily voiced." এবং

"A CONSONANT...is a sound for whose production the air current is completely stopped by an occlusion of the larynx or the oral passage, or is forced to squeeze through a narrow constriction, or is deflected from the median line of its channel through a lateral opening, or causes one of the supraglottal organs to vibrate."[৩]

প্রতিষ্ঠিত ভাষাবিজ্ঞানীদ্বয়ের রচিত এই সংজ্ঞা দু'টি অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি, যে ধ্বনির উচ্চারণে মুখবিবরের পথটি এমন বাধামুক্ত থাকে যে, শ্বাসবায়ু ফুসফুস থেকে প্রবাহিত হতে গিয়ে কোথাও বাধা পেয়ে আটকে যায় না, অথবা কোথাও সঙ্কীর্ণ পথের মধ্যে দিয়ে জোর করে বেরোতে গিয়ে ঘর্ষণধ্বনি (friction) সৃষ্টি করে না, অথবা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসার সোজা পথে বাধা পেয়ে সামনের পথ ছেড়ে পাশ দিয়ে যাতায়াত করে না, অথবা স্বরযন্ত্রের উপরের কোনো বাগযন্ত্রকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায় না, তাকেই স্বরধ্বনি (Vowel) বলে।

পক্ষান্তরে, যে ধ্বনি উচ্চারণে শ্বাসবায়ু স্বরপথে (glottis) অথবা মুখবিবরের কোনো অংশে বাধা পেয়ে কিছুক্ষণের জন্যে পুরোপুরি আটকে যায়, অথবা সঙ্কীর্ণ পথে জোর করে বেরিয়ে আসতে গিয়ে ঘর্ষণধ্বনি (friction) সৃষ্টি করে, অথবা মুখ দিয়ে বেরোতে গিয়ে সামনে বাধা পেয়ে সোজা পথে না গিয়ে পাশ দিয়ে যাতায়াত করে, অথবা স্বরযন্ত্রের ঊর্ধ্বস্থ (supraglottal) কোনো বাগ্‌যন্ত্রকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant) বলে।

স্বর ও ব্যঞ্জনের স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যে পার্থক্যের একমাত্র মানদণ্ড না হলেও প্রধান মানদণ্ড হল শ্বাসবায়ুর গতিপথে বাধা ; এই বাধারও নানা স্থানভেদ, মাত্রাভেদ ও প্রকৃতি-ভেদ আছে। এই মাত্রাভেদের সূক্ষ্মবিচার করে আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানীরা একদিকে

৩। Bloch, Bernard and Trager George L. : *Outlines of Linguistic Analysis,* New Delhi : Oriental Books Reprint Corpn., 1972, p. 18.

বাধা (closed passage) এবং অন্যদিকে বাধাহীনতা (open passage)-এর মধ্যবর্তী কিছু অবস্থার উল্লেখ করেছেন এবং সেই অনুসারে ব্যঞ্জন ও স্বরের মধ্যবর্তী ধ্বনির আরো শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন। এই শ্রেণীর আধুনিক নাম 'নৈকট্য-ধ্বনি' (Approximant)। আগেকার ধ্বনিবিজ্ঞানীরা যেগুলিকে অর্ধস্বর (Semi-vowel) এবং ঘর্ষণহীন অবিরাম ব্যঞ্জন (Frictionless Continuant) বলতেন, মোটামুটিভাবে সেই ধ্বনিগুলি এই নৈকট্য-ধ্বনির শ্রেণীতে পড়ে। উচ্চারণ-প্রকৃতি (Manner of Articulation) অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে এই শ্রেণীর ধ্বনিগুলি সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

উপরে স্বর ও ব্যঞ্জনের যে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞাটি দেওয়া হয়েছে সেই সংজ্ঞাটি ধ্বনির উচ্চারণ-প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। এতে স্বর ও ব্যঞ্জনের যেসব বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যের সূত্র পাই সেগুলি ছাড়া আরো কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যের সূত্র ধ্বনিতত্ত্ববিদেরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখ করেছেন। যেমন, ধ্বনির স্বরূপ বিচার করে বলা হয়েছে, স্বরধ্বনি হল ব্যঞ্জনধ্বনির চেয়ে বেশি শ্রুতিগম্য ও মধুর (sonorous)। আবার, ভাষায় ধ্বনির প্রসঙ্গগত ভূমিকার (contextual function) দিক থেকে বলা হয়, স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যে পার্থক্য হল—স্বর একা অথবা অন্য ধ্বনির সাহচর্যে 'অক্ষর' বা 'দল' (syllable) গঠন করতে পারে। কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনি একা কখনো অক্ষর গঠন করতে পারে না। স্বরধ্বনি হল অক্ষরের মূল বা কেন্দ্র (nucleus)। এই সূত্রের আলোকে গঠনগত (structural) ও ভূমিকাগত (functional) দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে পারি, যে ধ্বনি একা অথবা অন্য ধ্বনির সহযোগে অক্ষর (syllable) গঠন করতে পারে, সেই ধ্বনি হল স্বরধ্বনি ; আর যে ধ্বনি একা অক্ষর (syllable) গঠন করতে পারে না, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। এই সংজ্ঞাটি অক্ষর-গঠনের আলোকে রচিত বলে একে ধ্বনিবৈজ্ঞানিক (phonetic) সংজ্ঞা না বলে স্বনিমীয় (phonemic) ভূমিকাগত সংজ্ঞা বলা উচিত। স্বর ও ব্যঞ্জন প্রসঙ্গের সূচনায় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের যে সংজ্ঞাটি আমরা উদ্ধৃত করেছি, সেই সংজ্ঞাটিও এই সংজ্ঞারই মতো ; কারণ তাতে ভাষাচার্য যদিও 'উচ্চারণ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তবু তাতে স্বর ও ব্যঞ্জনের উচ্চারণে বাগ্‌যন্ত্রের প্রক্রিয়াগত (articulatory process) পার্থক্যটি ব্যাখ্যা করা হয় নি, তাতে স্বর ও ব্যঞ্জনের পার্থক্য নির্ণয়ে ধ্বনির পারস্পরিক সহযোগিতার মানদণ্ডই গৃহীত হয়েছে। সুতরাং তলিয়ে দেখলে সেই সংজ্ঞাটিও মূলত ধ্বনির ভূমিকাগত দিক থেকেই রচিত।

উচ্চারণ-প্রক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে অক্ষর-গঠনে (syllable formation) ভূমিকার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে উচ্চারণ-প্রক্রিয়ার

দিক থেকে যেগুলি ব্যঞ্জনধ্বনি তাদের মধ্যেও কিছু-কিছু ধ্বনি স্বরের ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ স্বরধ্বনির মতো অক্ষর গঠন করতে পারে। প্রায়ই চারটি ব্যঞ্জন র্, ল্, ম্, ন্ [r l m n] এরকম স্বরধ্বনির ভূমিকা পালন করে। এগুলিকে অর্ধব্যঞ্জন (sonant or syllabic consonant) বলে। যেমন—ইংরেজি little [litl̥], spasm [spasm̥] শব্দের [l̥ m̥]। ধ্বনিবৈজ্ঞানিক্ বিচারে বৈদিক ভাষার ঋ [r̥] ঌ [l̥] ছিল এই রকম অর্ধব্যঞ্জন (sonant), যদিও এগুলিকে সাধারণত স্বরধ্বনির তালিকায় ফেলা হয়। বাংলা ভাষায় 'ঋ'-এর মূল বৈদিক উচ্চারণ এখন আর বজায় নেই, আর 'ঌ'-এর তো কোনো ব্যব্হারই নেই।

ভাষার ধ্বনিসমূহকে এই যে স্বর (Vowel) ও ব্যঞ্জন (Consonant) দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, এই বিভাগ আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানী কেনেথ্ লি পাইক্ (Kenneth Lee Pike) পছন্দ করেন নি। কারণ, এই যে দু'টি বিভাগ ঠিক করা হয়েছে তা ধ্বনির শুধু নিজস্ব বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির ভিত্তিতে করা হয় নি; বিশেষ বিশেষ অক্ষরের (syllable) মধ্যে তাদের প্রসঙ্গগত ভূমিকাও বিবেচনা করে এই শ্রেণীবিভাগ স্থির করা হয়েছে। স্বর ও ব্যঞ্জনের বিভাগ নির্ণয় করে এদের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তা চরম কোনো সংজ্ঞা নয়, তা আপেক্ষিক। তার নানা ব্যতিক্রমও দেখা যায়, ব্যতিক্রমগুলিকে সূত্রবদ্ধ করে সংজ্ঞা রচনা করতে গিয়ে ক্রমশ জটিল ও মিশ্র ধরনের হয়ে যায়। স্বর ও ব্যঞ্জনের যে পার্থক্য দেখানো হয় তা কখনো ধ্বনির উচ্চারণ, কখনো ধ্বনিসত্তার প্রকৃতি, কখনো বা ভাষাবিশেষে ধ্বনির প্রসঙ্গগত ভূমিকার উপরে নির্ভর করে করা হয়। এই যুক্তিতে পাইক্ এই মিশ্র ও জটিল বিভাজন-রীতি ত্যাগ করে বিশুদ্ধ ধ্বনিবৈজ্ঞানিক (phonetic) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধ্বনিকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করে তাদের নতুন নাম দিয়েছেন—Vocoid ও Contoid ; বাংলায় বলতে পারি যথাক্রমে 'স্বরক' ও 'ব্যঞ্জনক'। এই নতুন বিভাজন-রীতির পিছনে পাইকের মূল যুক্তি হল :

> "*Vocoid* and *contoid* groups are strictly delineated by the articulatory and acoustic nature of sounds, without reference to phonemic contextual function."[8]

কিন্তু একথা লক্ষ্য করা দরকার যে, পাইক নিজেই পরে Vocoid ও Contoid-এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে অক্ষর (syllable)-গঠনে তাদের

৪। Pike, Kinneth L. : *Phonetics,* Ann Arbor : The University of Michigan Press, 1955, p. 78.

ভূমিকার কথা পুরোপুরি বাদ দিতে পারেন নি। তাঁর নিজের ভাষায় তাঁর দেওয়া সংজ্ঞাগুলি উদ্ধৃত করলে তাঁর স্ব-বিরোধ সহজেই ধরা পড়বে :

> "The sounds which as a group function most frequently as syllabics are *vocoids.* Phonetically they comprise the central resonant orals as already defined. Vocoids include practically all sounds which are usually called "vowels" (whether voiced, voiceless, or whispered) except that "fricative vowels" are excluded, while "vowel glides" such as [r], [w] and [y] are included.
>
> All non-vocoids are *contoids.* This term more closely approximates the general term "consonant" than any other used by me. Contoids include stops, fricative nasals, lateral resonant orals, and central fricative orals..."[৭]

পাইকের আলোচনায় কিছু কিছু স্ব-বিরোধ এবং আরো বেশি জটিলতা থাকায় তা ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করে নি। তাই আমরা প্রচলিত স্বর-ব্যঞ্জন বিভাগ অনুসরণ করেই ধ্বনির আরো বিস্তৃত শ্রেণীবিভাগ ও বর্ণনায় অগ্রসর হতে চাই। ধ্বনির প্রাথমিক শ্রেণীবিভাগে স্বর-ব্যঞ্জন বিভাগের পরেই সঘোষ-অঘোষ বিভাগের কথা বলা প্রয়োজন।

সঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি (Voiced and Voiceless Sounds) : শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথে স্বরতন্ত্রীতে বাধার মাত্রাভেদ অনুযায়ী ধ্বনির চারটি শ্রেণীবৈচিত্র্য সাধিত হতে পারে : স্বরপথের পূর্ণ অবরোধজনিত স্পর্শধ্বনি (Glottal Stop), সঘোষ ধ্বনি বা ঘোষবৎ ধ্বনি (Voiced Sound), ফিসফিসে ধ্বনি (Whispered Sound) এবং অঘোষধ্বনি (Voiceless or Breathed Sound)। শ্বাসনালীর মধ্যে অবস্থিত স্বরযন্ত্রের (larynx) অন্তর্গত স্বরতন্ত্রী (vocal cords / chords) দু'টি ক্ষণকালের জন্যে পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত হয়ে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তার ফলে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় তাকে স্বরপথ-অবরোধজনিত স্পর্শধ্বনি (Glottal Stop) বলে। এই ধ্বনির চিহ্ন হল [?]। আগেই বলা হয়েছে, জার্মান ভাষায় এই ধ্বনি আছে, বাংলা ভাষায় এই ধ্বনি শোনা যায় না। স্বরতন্ত্রী (vocal cords) দু'টি পরস্পরের সঙ্গে আংশিক

৭। Pike, Kenneth L. : *Phonetics,* Ann Arbor : The University of Michigan Press, 1955, p. 143.

যুক্ত হয়ে শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথে যখন আংশিক বাধা দেয় তখন শ্বাসবায়ু সেই বাধা ঠেলে যাতায়াত করার চেষ্টা করে ; তাতে স্বরতন্ত্রী দু'টি কাঁপতে থাকে এবং তাদের কম্পনের (vibration) ফলে একটি সুর সৃষ্টি হয়, এই সুরকে ঘোষ বা নাদ (Voice) বলে। অন্য যে-কোনো উচ্চারণ-স্থান থেকে উচ্চারিত ধ্বনির সঙ্গে এই সুর মিশে থাকতে পারে। যে ধ্বনির সঙ্গে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত এই সুর মিশে থাকে তাকে সঘোষ বা ঘোষবৎ ধ্বনি (Voiced Sound) বলে ; আর যে ধ্বনির সঙ্গে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত এই সুর মিশে থাকে না তাকে অঘোষ ধ্বনি (Voiceless / Unvoiced / Breathed Sound) বলে। যখন স্বরতন্ত্রী দু'টি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে তখন তাদের মধ্যবর্তী পথ দিয়ে শ্বাসবায়ু অবাধে যাতায়াত করে, তখন তারা কম্পিত হয় না, ফলে তাদের কম্পনজাত কোনো সুরও সৃষ্ট হয় না ; তখনই অঘোষ ধ্বনির সৃষ্টি হয়। সঘোষ ধ্বনির উদাহরণ হচ্ছে বাংলা বর্গীয় ধ্বনির মধ্যে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্বনি (অর্থাৎ গ্, ঘ্, ঙ্, জ্, ঝ্, ড্, ঢ্, দ্, ধ্, ন্, ব্, ভ্, ম্) এবং র্, ল্, হ্, ড়্, ঢ়্, ওয়্, য় এবং সমস্ত স্বরধ্বনি (অর্থাৎ ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ) / g g^{h} ŋ ɟ ɟ^{h} ɖ ɖ^{h} d d^{h} n b b^{h} m r l h ɽ ɽ^{h} ŏ ĕ i e æ a ɔ o u / ; হিন্দী গ্, ঘ্, ঙ্, জ্, ঝ্, ড্, ঢ্, ণ্, দ্, ধ্, ন্, ব্, ভ্, ম্, ল্, র্, ড়্, ঢ়্, হ্, (অন্তঃস্থ) ব্, য়্, এবং সব স্বরধ্বনি (অর্থাৎ ঈ, ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ, ঊ, হ্রস্ব অ) g g^{h} ŋ ɟ ɟ^{h} ɖ ɖ^{h} ɳ d d^{h} n b b^{h} m l r h w j í: i e: æ: a: ɔ: o: u u: ə / ; সংস্কৃত গ্, ঘ্, ঙ্, জ্, ঝ্, ঞ্, ড্, ঢ্, ণ্, দ্, ধ্, ন্, ব্, ভ্, ম্, ল্, র্, হ্, ব্, য্, সব স্বরধ্বনি / g g^{h} ŋ ɟ ɟ^{h} ɲ ɖ ɖ^{h} ɳ d d^{h} n b b^{h} m l r h w j i i: e: a a: o: u u: /, ইংরেজী / b d g ʤ m n ŋ l r v ð ʒ z w j i: i e æ a: ɔ ɔ: u u: ʌ ə: ə/ ; জার্মান / b d g m n ŋ l r v z ʒ j i e y ø a o u í: e: y: ø: a: o: u: ɛ; / ; ফরাসী / b d g m n ɲ v z ʒ r l j w ɥ i ɛ a ɑ ɔ o u y ø ɛ̃ ɔ̃ æ æ̃ ə / ইত্যাদি। অঘোষ ধ্বনি হল বাংলা বর্গীয় ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি (অর্থাৎ প্, ফ্, ত্, থ্, ট্, ঠ্, চ্, ছ্, ক্, খ্,), (স্), শ্ /, p p^{h} t t^{h} ʈ ʈ^{h} c c^{h} k k^{h} (s) ʃ / ; হিন্দী প্, ফ্, ত্, থ্, ট, ঠ্, চ্, ছ্, ক্, খ্, স্, (শ্) / p p^{h} t t^{h} ʈ ʈ^{h} c c^{h} k k^{h} s (ʃ) /; সংস্কৃত প্, ফ্, ত্, থ্, ট্ ঠ্, চ্ ছ্, ক্, খ্, স্, ষ্,

শ্‌ / p p^h t t^h ʈ $ʈ^h$ c c^h k k^h s ʂ ʃ / ; ইংরেজী / p t k tʃ f θ s ʃ h / ; জার্মান / p t k f x h s ʃ /, ফরাসী / p t k f ʃ s / ইত্যাদি।

যখন স্বরতন্ত্রী দু'টি ঘোষ ধ্বনি ও অঘোষ ধ্বনি উচ্চারণের মাঝামাঝি অবস্থানে আসে এবং তাদের মাঝখান দিয়ে শ্বাসবায়ু যাতায়াতের সময় তাদের কাঁপিয়ে দিয়ে যায় না, তখন এমন এক রকমের ধ্বনি সৃষ্টি হয় যেগুলিকে আমরা ফিসফিস করে কথা বলার সময় ব্যবহার করি। যে ধ্বনি স্বাভাবিক উচ্চারণে সঘোষ ধ্বনি, ফিসফিস করে কথা বলার সময় সেই ধ্বনিও অঘোষ হয়ে যায়। ফলে তখন স্বরধ্বনিও অঘোষ ধ্বনি। এই রকমের স্বরধ্বনিকে ফিসফিসে স্বরধ্বনি (Whispered Vowel) বলে। এই রকমের স্বরধ্বনি উচ্চারণে মুখবিবরে শ্বাসবায়ু আংশিক বাধা পেয়ে একটা ক্ষীণ ঘর্ষণধ্বনি সৃষ্টি করে বলে সূক্ষ্মবিচারে এগুলিকে স্বরধ্বনি না বলে ব্যঞ্জনধ্বনি বলা উচিত।

ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ (Classification of Consonants) : আগে ব্যঞ্জনধ্বনির যে সংজ্ঞাটি আমরা দিয়েছি (পৃ. ২২৪) তা বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথে স্বরতন্ত্রীতে (Vocal Cords) বা মুখবিবরে বা তৎসংলগ্ন স্থানে বাধার ফলেই যদি কোনো ধ্বনির সৃষ্টি হয় তবে সেই বাধাজনিত ধ্বনিকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। এই শ্বাসবায়ু যে-যে স্থানে বাধা পায় সেই-সেই স্থানকে উচ্চারণ-স্থান (Points / Places of Articulation) বলে। এই শ্বাসবায়ুর গতিপথ ও তাতে বাধা আবার নানা ধরনের হতে পারে : কখনো বাইরে থেকে শ্বাসবায়ু ভিতরে যায়, কখনো ভিতর থেকে বাইরে আসে, কখনো শ্বাসবায়ুতে বাধা আংশিক হয়, কখনো পূর্ণ হয়, কখনো সামনের দিক দিয়ে বাধা সৃষ্টি হয়, দু'পাশ দিয়ে বায়ু বেরিয়ে যায়, কখনো এই শ্বাসবায়ুকে বাধা দিতে গিয়ে জিভ কাঁপতে থাকে, কখনো বা একবার বাধা দিয়ে জিভ সরে যায়—বাধার এই সব নানা ধরনকে বলে উচ্চারণ-প্রকৃতি (Manner / Nature of Articulation)। ব্যঞ্জনধ্বনির বোঝা নির্ভর করে এই উচ্চারণ-স্থান ও উচ্চারণ-প্রকৃতি দু'য়েরই উপরে। তাই ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগের দু'টি মানদণ্ড—(ক) উচ্চারণ-স্থান (Points /

Places of Articulation), এবং (খ) উচ্চারণ-প্রকৃতি (Manner / Nature of Articulation)।

উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ : উচ্চারণ-স্থানগুলি উপরের ওষ্ঠ, উপরের দাঁত, তালু প্রভৃতি ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারকের অংশ। প্রচলিত রীতিতে ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারকের এই বিভিন্ন অংশ অনুসারে ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ করা হয়। কিন্তু আমরা জানি, ধ্বনি উচ্চারণে ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারকের ভূমিকা প্রায় নিষ্ক্রিয়। এইজন্য ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারককে নিষ্ক্রিয় উচ্চারক (passive articulator) বলে। এ ব্যাপারে যথার্থ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে নিম্নস্থ উচ্চারক, অর্থাৎ নিচের ওষ্ঠ, জিহ্বা ইত্যাদি। এইজন্য নিম্নস্থ উচ্চারককে সক্রিয় উচ্চারক (active articulator) বলে। নিম্নস্থ উচ্চারকের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় যে জিহ্বা, তাকে আমরা চারটি অংশে ভাগ করেছি—জিহ্বাশিখর বা জিহ্বাপ্রান্ত (tip / apex), জিহ্বাফলক বা জিহ্বার পাতলা অংশ (blade / lamina), জিহ্বার সম্মুখভাগ (front) এবং জিহ্বার পশ্চাৎভাগ (back / dorsum)। এর মধ্যে জিহ্বার শেষ পশ্চাৎ অংশকে জিহ্বামূল (Root of the tongue) বলে নির্ণয় করা হয়েছে। লক্ষণীয় এই যে, ধ্বনির শ্রেণীগত পার্থক্য শুধু ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারকের বিভিন্ন অংশের অর্থাৎ শুধু উচ্চারণ-স্থানের উপরে নির্ভর করে না, ধ্বনির শ্রেণীগত পার্থক্য সৃষ্টিতে নিম্নস্থ উচ্চারকের বিভিন্ন অংশের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। জিহ্বার সম্মুখভাগ দিয়ে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় সে ধ্বনি জিহ্বার পশ্চাৎভাগ দিয়ে উচ্চারিত হতে পারে না। সুতরাং ধ্বনির পূর্ণ উচ্চারণ-প্রক্রিয়া বোঝাতে হলে উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ করার সময় বিভিন্ন ধরনের ধ্বনির উচ্চারণে নিম্নস্থ উচ্চারকের কোন্ অংশ ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারকের কোন্ অংশকে স্পর্শ করে তাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই বিষয়টি ১২ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে :

নীচের ওষ্ঠ
দ্বি-ওষ্ঠ্য
উপরের ওষ্ঠ
জিহ্বাপ্রান্ত
দন্ত্য
উপরের দন্ত
দন্তমূলীয়
দন্তমূল
জিহ্বা-ফলক
উত্তর-দন্তমূল
সম্মুখ জিহ্বা
তালব্য
শক্ত তালু
পশ্চাৎ জিহ্বা
আলজিভ
জিহ্বামূল
স্বরতন্ত্রী
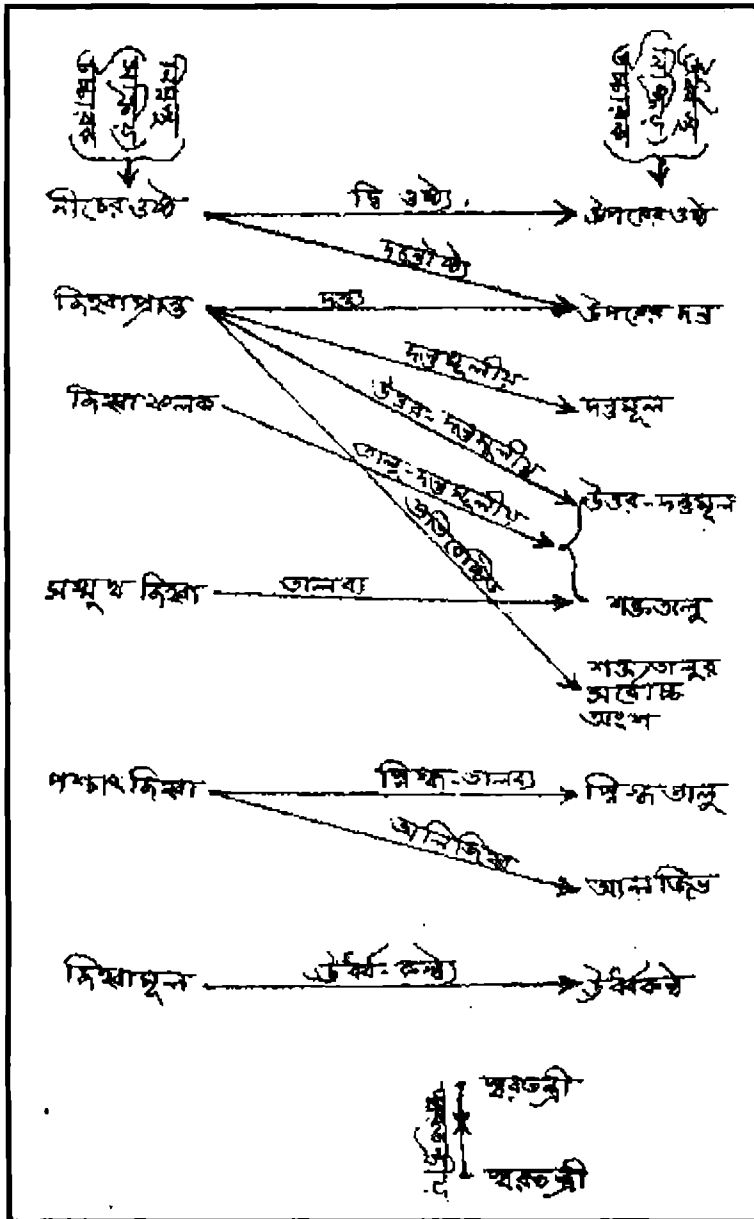
চিত্র নং ১২

১২নং চিত্রের আলোকে উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণী-পরিচয় সংক্ষেপে এইভাবে দেওয়া যেতে পারে :

ওষ্ঠ্য ধ্বনি (Labial Sound) : নিচের ওষ্ঠ দ্বারা উপরের ওষ্ঠে বা দন্তে শ্বাসবায়ু বাধাপ্রাপ্ত হলে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে ওষ্ঠ্য (Labial) ধ্বনি বলে। ওষ্ঠ্য ধ্বনি দু'রকমের : দ্বি-ওষ্ঠ্য বা বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য (Bi-labial or Labio-labial) এবং দন্তৌষ্ঠ্য (Denti-labial or Labio-dental) ধ্বনি। নিচের ওষ্ঠ (অধর) ও উপরের ওষ্ঠ শ্বাসবায়ুর গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে যে ধ্বনি উচ্চারণ করে তাকে **দ্বি-ওষ্ঠ্য বা বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য** (Bi-labial or Labio-labial) ধ্বনি বলে। যেমন :—বাংলা প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্, / p p^h b b^h m / ; এইভাবে হিন্দি ও সংস্কৃত প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্ / p b^h b b m / , ইংরেজি / p b m / ; জার্মান / p b m / ; ফরাসি p b m / ইত্যাদি। আবার নিচের ওষ্ঠ (অধর) উপরের দাঁতে শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি উচ্চারণ করে তাকে **দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি** (Denti-labial or Labio-dental Sound) বলে। এই ধ্বনি বাংলায় নেই। ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষার / f v / ধ্বনি এই শ্রেণীতে পড়ে।

জিহ্বাপ্রান্ত বা জিহ্বাশিখরের (Apex / Tip of the tongue) সাহায্যে শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তাকে **জিহ্বাপ্রান্তীয় বা জিহ্বাশিখরীয় (Apical)** ধ্বনি বলে। শ্বাসবায়ুর বাধার স্থান অনুসারে জিহ্বাপ্রান্তীয় ধ্বনির চারটি প্রকারভেদ নির্ণয় করা হয় :—দন্ত্য, দন্তমূলীয়, উত্তর-দন্তমূলীয় ও প্রতিবেষ্টিত।

দন্ত্য ধ্বনি (Dental Sound) : জিহ্বাশিখর বা জিহ্বাপ্রান্ত (Apex / Tip of the tongue) উপরের দাঁতে শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি করে তাকে দন্ত্য ধ্বনি (Dental Sound) বা জিহ্বাপ্রান্তীয়-দন্ত্য বা জিহ্বা-শিখরীয়-দন্ত্য ধ্বনি (Apico-Dental Sound) বলে। বাংলা ভাষার ত্, থ্, দ্, ধ্, (স্) / t t^h d d^h (s) / ; হিন্দি ভাষার ত্, থ্, দ্, ধ্, স্ / t t^h d d^h s / ; সংস্কৃত ভাষার ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্, স্ / t t^h d d^h n s / ; ইংরেজি ভাষার / θ ð / ; ফরাসি ভাষার / t d n s z / ধ্বনি এই শ্রেণীর নিদর্শন।

দন্তমূলীয় ধ্বনি (Alveolar Sound) : জিহ্বাশিখর বা জিহ্বাপ্রান্ত (Apex) দন্তমূলে শ্বাসবায়ুকে বাধা দেওয়ার ফলে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় সেই ধ্বনিকে বলে দন্তমূলীয় ধ্বনি (Alveolar or Gingival Sound) বা জিহ্বাপ্রান্তীয়-দন্তমূলীয় ধ্বনি (Apico-alveolar Sound)। যেমন—বাংলা ও হিন্দি ভাষার র্, ল্, ন্, / r I n / ; ইংরেজি ভাষার / t d I n / ; জার্মান

ভাষার / t d I n r s z /। জিহ্বাপ্রান্ত যদি দন্তমূলের পশ্চাৎদিকের শেষ অংশ অর্থাৎ শক্ততালুর (Hard Palate) কাছাকাছি অংশ স্পর্শ করে তবে **উত্তর-দন্তমূলীয় (Post-alveolar)** বা জিহ্বাপ্রান্তীয় উত্তর-দন্তমূলীয় (Apico-post-alveolar) ধ্বনি উচ্চারিত হয়। ইংরেজি ভাষার / r / ধ্বনি এই শ্রেণীতে পড়ে। এছাড়া ইংরেজি / t / যখন / r /-এর পূর্বে উচ্চারিত হয় তখন তা উত্তর-দন্তমূলীয় ধ্বনি হয়ে যায়। যেমন—fast running বা mistrust-এর / t / ধ্বনি। কোনো কোনো ভাষায় জিহ্বার পাতলা অংশ বা জিহ্বাফলক (Lamina / Blade of the tongue) দিয়ে দন্তমূলে শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে দন্তমূলীয় ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। এগুলিকে জিহ্বাফলকীয়-দন্তমূলীয় বা সহজ কথায় জিহ্বার পাতলা অংশ ও দন্তমূল থেকে উচ্চারিত ধ্বনি (Blade-alveolar or Lamino – alveolar Sound) বলে। উদাহরণ—ইংরেজি / s z /। জার্মান ভাষায় / t d / ধ্বনি যখন জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হয় এবং বাংলার ট্ ড্ ধ্বনির মতো শোনায়, তখন এগুলি উত্তর-দন্তমূলীয় (Post-alveolar) ধ্বনি হয়ে যায়।

প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি / মূর্ধন্য ধ্বনি (Retroflex / Cerebral Sound) : জিহ্বার সম্মুখপ্রান্ত অর্থাৎ জিহ্বাশিখর (Apex / tip of the tongue) শক্ততালুতে (Hard Palate) শ্বাসবায়ুকে বাধ্য দিলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে সাধারণত প্রতিবেষ্টিত (Retroflex) ধ্বনি বলা হয়। Retroflexion-এর অর্থ পশ্চাৎদিকে বেঁকে যাওয়া। এই ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভের অগ্রভাগ গোল হয়ে বেঁকে যায় এবং জিভের সম্মুখপ্রান্ত উপরে উঠে পিছন দিকে অর্থাৎ গলার দিকে ঘুরে যায় বলে একে Retroflex or Inverted ধ্বনি বলে। জিহ্বার এই রকম অবস্থানের ফলে শ্বাসবায়ু জিহ্বার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে যায় বলে বাংলায় একে প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি বলে। পাশ্চাত্য ধ্বনিবিজ্ঞানীরা উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী ধ্বনির শ্রেণীবিভাগের মধ্যেই Retroflex নামটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী : "Phonetically 'retroflex' or 'retroverted' more adequately describes these sounds which are distinguished from the dentals in that the tip of the tongue is turned back to the roof of the mouth."[৬] কিন্তু Retroflexion ও প্রতিবেষ্টন বলতে শ্বাসবায়ুর বাধার স্থান বোঝায় না, বাধার প্রকৃতিই বোঝায়। সুতরাং Retroflex ও প্রতিবেষ্টিত নামটি উচ্চারণ স্থান-অনুযায়ী ধ্বনির যে শ্রেণীবিভাগ তাতে

৬। Burrow T. : *The Sanskrit Language,* London, 2nd. ed. p. 95.

ব্যবহার করা সঙ্গতিপূর্ণ নয় ; উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগে শ্বাসবায়ুর বাধার স্থানটি লক্ষ্য করে সেই স্থান অনুযায়ী নামকরণই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। সেদিক থেকে এই শ্রেণীর আগেকার নাম 'মূর্ধন্য ধ্বনি'ই (Cerebral / Cacuminal Sound) গ্রহণীয়। আসল মূর্ধন্য ধ্বনির উচ্চারণ-স্থান হল শক্ততালুর (Hard palate) পিছন দিকের শেষপ্রান্ত বা শক্ততালু ও নরমতালুর (Soft Palate) মধ্যবর্তী অংশ। এটি শক্ততালুর সর্বোচ্চ অংশ, অংশটি খিলেনের মতো গোল, একে Dome বলে ; এইজন্যে এখান থেকে উচ্চারিত ধ্বনিকে Domal Sound-ও বলে ; সংস্কৃতে তালুর এই সর্বোচ্চ অংশটিকেই 'মূর্ধা' বলা হত। এইজন্যে ঠিক এখান থেকে উচ্চারিত ধ্বনিকেই মূর্ধন্য ধ্বনি বলা উচিত। জিহ্বাশিখর বা জিহ্বাপ্রান্তের (Apex / tip of the tongue) সাহায্যে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয় বলে একে জিহ্বাপ্রান্তীয় মূর্ধন্য (Apico-Cerebral / Apico-Cacuminal / Apico-Domal) ধ্বনি বলে। ঠিক মূর্ধা থেকে উচ্চারিত বিশুদ্ধ মূর্ধন্য ধ্বনি দ্রাবিড়ীয় ভাষায় শোনা যায়। সংস্কৃত ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্, ষ্ / ʈ ʈ^{h} ɖ ɖ^{h} ɳ ʂ / ধ্বনিও মূর্ধন্য ধ্বনি। কিন্তু বাংলা ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ড়্, ঢ়্ / ʈ ʈ^{h} ɖ ɖ^{h} ɽ ɽ^{h} / সাধারণত মূর্ধন্য ধ্বনি বলে পরিচিত হলেও, সূক্ষ্ম বিচারে এগুলি তালুর সর্বোচ্চ স্থান Dome বা মূর্ধা থেকে উচ্চারিত হয় না, শক্ততালুর অগ্রভাগ প্রাক্-শক্ততালু (Pre-Palate) থেকে উচ্চারিত হয়। এইজন্য ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এগুলিকে উত্তর-দন্তমূলীয় ('Supra-alveolar') বা অগ্রবর্তী প্রতিবেষ্টিত ('Forward or Pre-retroflex') ধ্বনি বলেছেন।[৭] সুতরাং বাংলার এই ধ্বনিগুলিকে প্রাক্-শক্ততালব্য (Apico-Prepalatal) ধ্বনি বলা উচিত। বাংলার এই ধ্বনিগুলি তালুর সামনে থেকে উচ্চারিত হয় বলে এগুলির উচ্চারণের সময় জিভ গোল হয়ে পিছন দিকে বেশি উল্টেও যায় না, অর্থাৎ জিভের retroflexion তেমন হয় না ; তাই বাংলার এই ধ্বনিগুলিকে ঠিক Retroflex Sound বলা যায় না। সংস্কৃত মূর্ধন্য ধ্বনিগুলির মধ্যে মূর্ধন্য ণ (ণ/ণ) / ɳ /-এর উচ্চারণ বাংলায় নেই, এটি বাংলায় দন্ত্য 'ন' / n /-এর মতোই উচ্চারিত হয়। তবে বাংলার দু'টি নিজস্ব প্রাক্-শক্ততালব্য ধ্বনি আছে, যা সংস্কৃতে ছিল না। সে দু'টি হল ড়্ / ɽ /, ঢ়্ / ɽ^{h} /। অবশ্য বাংলা ঢ়্-এর উচ্চারণ অধিকাংশ সময় ড়্-এরই মতো। হিন্দি ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্, (ষ্), ড়্, ঢ়্ / ʈ ʈ^{h} ɖ ɖ^{h} ɳ ʂ ɽ ɽ^{h} / ধ্বনিও শক্ততালুর সম্মুখ-ভাগ থেকে উচ্চারিত হয়। ফরাসি ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনি নেই। জার্মান ও ইংরেজি

৭। Chatterji, Dr. Suniti kumar : *A Brief Sketch of Bengali Phonetics*, London, 1921, § 14.

ভাষাতেও মূর্ধন্য ধ্বনি নেই। তবে ঐ দুই ভাষার দন্তমূলীয় (Alveolar) ধ্বনি / t d /-এর উচ্চারণ অনেকটা বাংলার প্রাক্-শক্ততালব্য ধ্বনি ট্, ড্ ধ্বনির মতো।

তালুদন্তমূলীয় ধ্বনি (Palato-Alveolar Sound) : সম্মুখ-জিহ্বার পাতলা অংশ (জিহ্বা-ফলক = Lamina / Blade of the tongue) যখন শক্ততালু (Hard Palate) ও দন্তমূল (Alveolae/Teeth-ridge) দুই-ই স্পর্শ করে অথবা দু'য়ের সংযোগস্থল স্পর্শ করে তখন যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে তালু-দন্তমূলীয় (Palato-Alveolar) বা জিহ্বাফলকীয়-তালুদন্তমূলীয় (Laminal Palato-Alveolar) ধ্বনি বলে। বাংলা চ্, ছ্, জ্, ঝ্, শ্, য়্ /cʃ cʃ^h ɟʒ ɟʒ^h ʃ ĕ/ ; হিন্দি চ্, ছ্, জ্, ঝ্, (শ্), য়্ / cʃ cʃ^h ɟ ɟʒ^h (ʃ) j / ; ইংরেজি / tʃ dʒ ʃ ʒ / ; জার্মান / ʃ ʒ / ; ফরাসি / ʃ ʒ ɲ j / ধ্বনি এই শ্রেণীতে পড়ে।

তালব্য ধ্বনি (Palatal Sound) : জিহ্বার সম্মুখভাগ (Front of the tongue) যখন শক্ততালুতে (Hard Palate) শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে কোনো ধ্বনি সৃষ্টি করে তখন সেই ধ্বনিকে তালব্য ধ্বনি (Palatal Sound) বা সম্মুখজিহ্ব-তালব্য ধ্বনি (Front-lingual-Palatal Sound) বলে। সংস্কৃত চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ঞ্, য়্ / cʃ cʃ^h ɟʒ ɟʒ^h ɲ j / এবং ইংরেজি ও জার্মান ভাষার / j / ধ্বনি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

স্নিগ্ধতালব্য / কণ্ঠ্য ধ্বনি (Velar / Guttural Sound) : জিহ্বার পশ্চাৎভাগ (Dorsum / Back of the tongue) দিয়ে দু'প্রকার ধ্বনি উচ্চারিত হয় : স্নিগ্ধতালব্য (Velar) ও অলিজিহ্ব (Uvular)। জিহ্বার পশ্চাৎ-ভাগ (Back of the Tongue or Dorsum) তালুর পশ্চাৎদিকের নরম অংশ বা স্নিগ্ধতালুতে (Velum / Soft Palate) শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি করে তাকে স্নিগ্ধতালব্য (Velar) ধ্বনি বা পশ্চজিহ্ব-স্নিগ্ধতালব্য (Dorso-Velar) ধ্বনি বলা হয়। বাংলা, হিন্দি ও সংস্কৃত ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্ / k k^h g g^h ŋ / ; হিন্দির অপ্রধান ধ্বনি (x), (ɣ) ; ইংরেজি ভাষার / k g ŋ / ; জার্মান ভাষার / k g ŋ x /; ফরাসি ভাষার / k g / ধ্বনি এই শ্রেণীর উদাহরণ। বাংলায় সাধারণত এগুলিকে কণ্ঠ্য (guttural) ধ্বনি বলা হলেও এগুলি সূক্ষ্মবিচারে ঠিক কণ্ঠ্যধ্বনি নয়, কারণ এগুলি কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয় না, এগুলি স্নিগ্ধতালু অর্থাৎ তালুর পশ্চাৎভাগ থেকে উচ্চারিত হয়।

অলিজিহ্ব ধ্বনি (Uvular Sound) : জিহ্বার পশ্চাৎভাগের (Back of the tongue) শেষ প্রান্তকে জিহ্বামূল (Root of the tongue) বলে। এই

জিহ্বামূল যখন স্নিগ্ধতালুর শেষপ্রান্তস্থ অলিজিহ্বাতে অর্থাৎ আলজিভে (Uvula) শ্বাসবায়ুকে বাধা দেয় তখন অলিজিহ্ব বা কণ্ঠমূলীয় ধ্বনি (Uvular sound) বা জিহ্বামূলীয়-অলিজিহ্ব ধ্বনি (Radico-uvular sound) সৃষ্টি হয়। আরবি ভাষার / q / এবং / R / ধ্বনি এই শ্রেণীতে পড়ে। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় এই শ্রেণীর ধ্বনি পাওয়া যায় না। মূল হিন্দি (Core Hindi) ভাষাতেও এই ধ্বনি নেই। তবে আরবি-ফারসি থেকে গৃহীত শব্দের মূলানুগ উচ্চারণে হিন্দিতেও এই শ্রেণীর ধ্বনি শোনা যায়। জার্মান ভাষার উপধ্বনি [R] এই শ্রেণীতে পড়ে।

ওষ্ঠ্য-স্নিগ্ধতালব্য ও ওষ্ঠ্য-তালব্য ধ্বনি (Labio-Velar and Labio-Palatal Sound) : কোনো কোনো ধ্বনির দু'টি করে উচ্চারণ-স্থান থাকে অর্থাৎ ধ্বনিটি উচ্চারণের সময় একই সঙ্গে শ্বাসবায়ু দু'টি জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই জাতীয় উচ্চারণকে দ্বৈত-উচ্চারণ (double articulation) বলে। এই রকমের দ্বৈত-উচ্চারণজাত দু'টি প্রধান শ্রেণী হল : ওষ্ঠ্য-স্নিগ্ধতালব্য (Labial-velar বা Labio-velar) এবং ওষ্ঠ্য-তালব্য (Labial-Palatal বা Labial-Palatal) ধ্বনি। নিচের ওষ্ঠ (অধর) এবং জিহ্বার পশ্চাৎভাগ যখন উপরে উঠে প্রায় একই সঙ্গে যথাক্রমে উপরের ওষ্ঠ ও স্নিগ্ধ-তালুতে শ্বাসবায়ুকে বাধা দেয় তখন ওষ্ঠ্য-স্নিগ্ধতালব্য (Labio-velar) বা কণ্ঠৌষ্ঠ্য ধ্বনির সৃষ্টি হয়। বাংলা ওয়্ / ŏ /, হিন্দি ও সংস্কৃত অন্তঃস্থ ব্ (व्) / w /, ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার / w / এই শ্রেণীতে পড়ে ; এগুলি অর্ধস্বর (semi-vowel)। জার্মান ভাষায় এই ধ্বনির ব্যবহার নেই। নিচের ওষ্ঠ ও জিহ্বার সম্মুখভাগ যখন উপরে উঠে উপরের ওষ্ঠ ও শক্ততালুতে শ্বাসবায়ুকে বাধা দেয় তখন ওষ্ঠ্য-তালব্য ধ্বনির (Labio-Palatal) সৃষ্টি হয়। ভাষাবিজ্ঞানে এই ধ্বনির চিহ্ন হল [ɥ]। বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরেজি, জার্মান ভাষায় এই ধ্বনি নেই। ফরাসি ভাষায় এই ধ্বনি আছে।

উধ্বর্ কণ্ঠ্য ধ্বনি (Pharyngeal Sound) : জিহ্বামূল (root of the togue) উধ্বর্কণ্ঠের (pharynx) পশ্চাৎদিকের দেওয়ালে শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি করে তাকে উধ্বর্কণ্ঠ্য ধ্বনি (Pharyngeal Sound) বা জিহ্বামূলীয়-উধ্বর্কণ্ঠ্য (Radio-pharyngeal) ধ্বনি বলে। এই শ্রেণীর ধ্বনি বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরেজি, জার্মান বা ফরাসি ভাষায় নেই।

স্বরতন্ত্রীয় বা কণ্ঠনালীয় ধ্বনি (Glottal or Laryngeal Sound) : স্বরতন্ত্রী দু'টি (Vocal cords / chords) পরস্পরের দিকে এগিয়ে এসে

তাদের মধ্যবর্তী স্বরপথকে (glottis) সঙ্কীর্ণ করে বা ক্ষণকালের জন্যে একেবারে রুদ্ধ করে যে ধ্বনি সৃষ্টি করে তাকে স্বরপথের ধ্বনি বা কণ্ঠনালীয় ধ্বনি (Glottal or Laryngeal Sound) বলে। স্বরপথ সঙ্কীর্ণ করে আংশিক বাধা সৃষ্টি করলে উষ্ম ধ্বনি হয়। যেমন—বাংলা, হিন্দি ও সংস্কৃত হ্ / h / ; ইংরেজি ও জার্মান / h / এই শ্রেণীর ধ্বনি। ফরাসি ভাষায় এটি স্বনিম হিসাবে নেই। স্বরপথ ক্ষণকালের জন্যে পুরো অবরুদ্ধ হয়ে খুলে গেলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে স্বরপথজাত স্পর্শধ্বনি (glottal stop) বলে। এই ধ্বনির চিহ্ন হল = [?]। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি ভাষায় সাধারণত এই ধ্বনি শোনা যায় না। জার্মান ভাষায় সচেতন উচ্চারণে এই ধ্বনি শোনা যায়। যেমন— Verein / Fɛrʔain/.

উচ্চারণ-প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ : উচ্চারণ-প্রকৃতি (Manner/Nature of Articulation) অনুসারে ধ্বনির শ্রেণীবিভাগে প্রথমেই ধ্বনির উচ্চারণে বায়ুপ্রবাহের প্রক্রিয়ার (Airstream Mechanism) দিকে লক্ষ্য রেখে ধ্বনিকে আমরা দু'টি ব্যাপক শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি :— (১) ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনি (Pulmonic Airstream Sounds) এবং (২) ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনি (Non-pulmonic Airstream Sounds)। দ্বিতীয়টির আবার দু'টি উপবিভাগ : (ক) রুদ্ধস্বরপথ-চালিত বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনি (Glottalic Airstream Sounds) এবং (খ) স্নিগ্ধতালু-চালিত বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনি (Velaric Airstream Sounds)।

ফুসফুসের চাপের ফলে সেখান থেকে শ্বাসবায়ু যখন শ্বাসনালী, মুখ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে বা ফুসফুসের আকর্ষণের ফলে শ্বাসবায়ু বাইরে থেকে যখন মুখ, শ্বাসনালী ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ফুসফুসে গিয়ে পৌঁছায় তখন তাকে ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহ (Pulmonic Airstream) (pulmonic < Lat. *pulmones*, pl. < *pulmōnis* = ফুসফুস) বলে। এই ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহের গতিপথে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি করা হয় তাকে ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনি (Pulmonic Airstream Sound) বলে। বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরেজি, জার্মান এবং ফরাসি ভাষার সব স্বাভাবিক ধ্বনিই হল এই শ্রেণীর ধ্বনি। মুখবিবরস্থ বা ঊর্ধ্বকণ্ঠস্থ বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে যখন ফুসফুসের বায়ুপ্রবাহের যোগ কেটে যায় তখন মুখবিবরস্থ বা ঊর্ধ্বকণ্ঠস্থ বায়ুপ্রবাহকে ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহ (Non-pulmonic Airstream) বলে। ফুসফুসের সঙ্গে ঊর্ধ্বস্থ বায়ুপ্রবাহের যোগটি দু'ভাবে দু'জায়গায় কেটে যেতে পারে : স্বরতন্ত্রীতে (vocal cords) এবং স্নিগ্ধতালুতে (velum)। যখন

স্বরযন্ত্রের অন্তর্গত স্বরতন্ত্রী (vocal cords) দু'টি পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত হয়ে তাদের মধ্যবর্তী স্বরপথটি (glottis) সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয় তখন স্বরতন্ত্রীর উপরের শ্বাসনালী, ঊর্ধ্বকণ্ঠ (pharynx), মুখবিবর প্রভৃতির অন্তর্গত বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে ফুসফুসের বায়ুপ্রবাহের যোগটি কেটে যায় ; এই অবস্থায় স্বরতন্ত্রীর ঊর্ধ্বস্থ বায়ুপ্রবাহকে ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহ (Non-pulmonic airstream) বলে। স্বরতন্ত্রী দু'টির মধ্যবর্তী স্বরপথ (glottis) বন্ধ হবার ফলে তার ঊর্ধ্বস্থ এলাকায় ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন যে বায়ুস্তম্ভ সৃষ্টি হয় তাকে স্বরপথের উপরের বায়ুস্তম্ভ (Supra-glottal Air-column) বলে। এই সময় ঊর্ধ্বকণ্ঠের (pharynx) মধ্যে অবস্থিত ফুসফুস থেকে বিচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় তাকে স্বরতন্ত্রী-চালিত (Glottalic) বায়ুপ্রবাহের ধ্বনি বলে। পাইক্-প্রমুখ মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানীরা একে ঊর্ধ্বকণ্ঠস্থ (Phayngeal) বায়ুপ্রবাহ-জনিত ধ্বনি বলেছেন। আবার, যখন জিহ্বার পশ্চাৎভাগ স্নিগ্ধতালুতে সম্পূর্ণ যুক্ত হয়ে মুখ থেকে কণ্ঠনালী দিয়ে শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয় তখন মুখগহ্বরের অন্তর্গত বায়ুর সঙ্গে ফুসফুসের বায়ুর যোগ কেটে যায়। তখন মুখবিবরের সেই বায়ুকে ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন মুখবিবরস্থ বায়ুপ্রবাহ (Velaric Airstream) বলে। এই ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন মুখবিবরস্থ বায়ুকে অল্পস্বল্প চালিত করে যে ধ্বনি সৃষ্টি করা হয় তাকে স্নিগ্ধতালু-চালিত শ্বাসবায়ুর ধ্বনি (Velaric Airstream Sound) বলে। মার্কিন গোষ্ঠীর ভাষাতত্ত্ববিদেরা একে Oral Sound বলেন। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। কারণ Oral Sound কথাটি সাধারণত অন্য এক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহজাত ধ্বনি প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত : **প্রতিহত বা স্পর্শ (Stop) ধ্বনি এবং প্রবাহিত বা প্রবাহী (Continuant) ধ্বনি।** শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথে বাধার মাত্রাভেদ (degree of stricture / constriction) অনুসারে এই দু'টি শ্রেণী নির্ণয় করা হয়েছে—প্রতিহত (বা স্পর্শ বা স্পৃষ্ট) ধ্বনি (Stop / Plosive / Explosive / Mute / Occlusive) এবং প্রবাহিত বা প্রবাহী (Continuant) ধ্বনি। নিচের ওষ্ঠ, জিহ্বা ইত্যাদি নিম্নস্থ উচ্চারক এবং উপরের ওষ্ঠ, উপরের দাঁত ইত্যাদি ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারক পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে অথবা স্বরতন্ত্রী দু'টি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্বাসবায়ুর গতিপথে যদি ক্ষণকালের জন্যে সম্পূর্ণ বাধা দেয় তাহলে বায়ুপ্রবাহ ক্ষণকালের জন্যে একেবারে থেমে যায় ; এইভাবে বাধাপ্রাপ্তির ফলে উৎপন্ন ধ্বনিকে বলে প্রতিহত (Stop) ধ্বনি ; এই ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাধাসৃষ্টিকারী বাগ্‌যন্ত্র দু'টি ক্ষণকালের জন্যে হলেও পরস্পরকে সম্পূর্ণ স্পর্শ করে বলে এইভাবে সৃষ্ট ধ্বনিকে স্পর্শধ্বনি বা স্পৃষ্টধ্বনিও বলে। কিন্তু শ্বাসবায়ুর গতিপথে দু'টি বাগ্‌যন্ত্র

মিলিয়ে আমরা যে বাধা দিই সেই বাধাটি যদি সম্পূর্ণ বাধা না হয়, অল্প একটু শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের জন্যে সঙ্কীর্ণ পথ যদি সব সময়ই খোলা থেকে যায় অথবা বাধাসৃষ্টিকারী বাগ্‌যন্ত্র দু'টি পরস্পরের কাছাকাছি এসে বাধাসৃষ্টি না করে শুধু বাধার ভাবটি সৃষ্টি করে অর্থাৎ প্রায় বাধাহীন অবস্থার সৃষ্টি করে, তাহলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তার উচ্চারণ কিছুক্ষণ ধরে চলতেই থাকে, এই রকম ধ্বনিকে প্রবাহিত বা প্রবাহী (Continuant) ধ্বনি বলে। প্রতিহত (স্পর্শ) ধ্বনি শুধু মৌখিকই হয়। কিন্তু প্রবাহিত ধ্বনি দু'রকম : নাসিক্য ও মৌখিক। প্রতিহত ধ্বনি—বাংলা প্, ফ্, ব্, ভ্, ত্, থ্, দ্, ধ্, ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ক্, খ্, গ্, ঘ্ / p p^h b b^h t̪ $t̪^h$ d d^h ṭ $ṭ^h$ ḍ $ḍ^h$ k k^h g g^h /

নাসিক্য ও মৌখিক ধ্বনি (Nasal and Oral Sounds) : ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহের (Pulmonic Airstream) সাহায্যে যেসব ধ্বনির সৃষ্টি হয় সেগুলিকে বায়ুপ্রবাহের গতিপথ অনুসারে প্রথমেই দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : নাসিক্য ধ্বনি (Nasal Sound) এবং মৌখিক ধ্বনি (Oral Sound)। ফুসফুস থেকে যাতায়াতের পথে শ্বাসবায়ু মুখের কোনো স্থানে বাধা পেয়ে যখন নাসাপথে বেরিয়ে যায় এবং যাবার পথে নাসিক্য-গহ্বরের দেয়ালে ঘর্ষিত হয়ে অনুনাসিক অনুরণন (Nasal Resonance) সৃষ্টি করে তখন যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে নাসিক্য ব্যঞ্জন বলে। এই প্রকার ধ্বনির সঙ্গে একটি অনুনাসিক অনুরণন মিশে থাকে বলে এই প্রকার ধ্বনিকে বলে নাসিক্য রণিত ধ্বনি (Nasal Resonan sound)। অনুরণন শুধু মুখবিবরে সৃষ্ট হলে মৌখিক রণিত ধ্বনির (Oral Resonant Sound) সৃষ্টি হয়। যেমন র্, ল্ / r l /। কিন্তু শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের সময় যদি স্নিগ্ধতালুর পিছন দিকের আলজিভের সংলগ্ন অংশটি উপরে উঠে ঊর্ধ্বকণ্ঠের পিছন দিকের দেয়ালে সংলগ্ন হয়ে যায় তাহলে নাসাপথে বায়ুর প্রবেশের দ্বারটি বন্ধ হয়ে যায়, এই অবরোধকে পশ্চাৎ-স্নিগ্ধতালব্য অবরোধ (Velic Closure) বলে। এই অবরোধের ফলে শ্বাসবায়ু যদি নাসাপথে প্রবেশ করতে না পেরে শুধু মুখগহ্বর দিয়ে যাতায়াত করে তবে সেই বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে সৃষ্ট ধ্বনিকে মৌখিক ধ্বনি (Oral Sound) বলে। সুতরাং মৌখিক ধ্বনি কথাটি সাধারণত এই ব্যাপক অর্থেই প্রচলিত। জিহ্বার পশ্চাৎভাগ স্নিগ্ধতালুতে সম্পূর্ণ অবরোধ সৃষ্টি করে মুখবিবরস্থ বায়ুকে ফুসফুসের বায়ুপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পর শুধু মুখবিবরস্থ বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে সৃষ্ট ধ্বনিকে পাইক্-প্রমুখ মার্কিন ধ্বনিবিজ্ঞানীরা যে Oral Sound বলেছেন, সেটা অকারণ জটিলতা সৃষ্টি করে মাত্র ; তাকে Oral Sound না বলে Velaric Sound বলাই ভাল। যাই হোক্, নাসিক্য রণিত ধ্বনির দৃষ্টান্ত হল

আমাদের বর্গের পঞ্চম বর্ণ (অর্থাৎ বাংলা ম্, ন্, ঙ্ / m n ŋ / ; হিন্দি ম্, ন্, ণ্, ঙ্ / m n ɳ ŋ / ; সংস্কৃত ম্, ন্, ণ্, ঞ্, ঙ্ / m n ɳ ɲ ŋ / ; ইংরেজি ও জার্মান ভাষার / m n ŋ / ; ফরাসি ভাষার / m n ɲ / ইত্যাদি। বাকি সব প্রবাহিত ব্যঞ্জন ধ্বনি মৌখিক ব্যঞ্জন।

মৌখিক প্রবাহিত ব্যঞ্জন (Oral Continuant) দু'রকম হয় : আংশিক বাধাযুক্ত (With Partial Stricture) ও প্রায় বাধাহীন নৈকট্যযুক্ত (Approximants without Stricture)। আংশিক বাধাযুক্ত প্রবাহিত ব্যঞ্জন প্রধানত তিন রকম–কম্পিত (Rolled / Trill), তাড়িত (Flapped / Tap) ও উষ্মধ্বনি (Fricative / Spirant)। উষ্মধ্বনি দু'রকমের হয় : মধ্যগামী (Median) ও পার্শ্বিক (Lateral)। মধ্যগামী উষ্মধ্বনি আবার দু'রকমের হয় : সঙ্কীর্ণ বা নালীবৎ (Groove) এবং প্রশস্ত বা ফালিবৎ বা ফাটলাকার (slit)। অন্যদিকে নৈকট্য-ধ্বনিও দু'ভাগে বিভক্ত : মধ্যগামী (Median) ও পার্শ্বিক (Lateral)।

কম্পিত ধ্বনি (Trill / Rolled) : শ্বাসবায়ু যাতায়াতের পথে জিহ্বা যদি বারবার বাধা দেয় এবং শ্বাসবায়ু যদি সেই বাধা বারবার সরিয়ে দেয় তবে জিহ্বা তাতে কম্পিত হয় ; এইভাবে জিহ্বার কম্পনের ফলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে কম্পিত ধ্বনি (Trill / Rolled Sound) বলে। যেমন বাংলা, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার র্, / r /, ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার / r /, জার্মান ভাষার / r /, [R] ধ্বনি।

তাড়িত ধ্বনি (Flapped / Tap) : শ্বাসবায়ুর গতিপথে জিহ্বার সম্মুখ-প্রান্ত যদি তালুকে বারবার নয়, মাত্র একবারই, টোকা দেবার মতো শুধু একটু ছুঁয়ে যায়, এবং শ্বাসবায়ু তাকে জোরে সরিয়ে দেয়–এত জোরে যে মনে হয় যেন জিভটিকে তাড়না করছে–তবে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তাকে তাড়িত ধ্বনি (Flapped/Tap) বলে। বাংলা ও হিন্দি ভাষার ড়্, ঢ়্ / ɽ ɽʰ / ধ্বনি এই শ্রেণীতে পড়ে।

উষ্ম ধ্বনি (Fricative/Spirant) : ঊর্ধ্বস্থ ও নিম্নস্থ উচ্চারক বা স্বরতন্ত্রী দু'টি পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসার ফলে যদি শ্বাসবায়ুর যাতায়াতে আংশিক বাধার সৃষ্টি হয় এবং সেই বাধা ঠেলে যাতায়াত করার ফলে একটি ঘর্ষণ-ধ্বনির সৃষ্টি হয় তবে সেইভাবে উচ্চারিত ধ্বনিকে বলে উষ্মধ্বনি (Fricative/ Spirant)। শ্বাসবায়ুর গতিমুখ লক্ষ্য করে উষ্মধ্বনিকে আবার দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে : মধ্যগামী (Median) এবং পার্শ্বিক (Lateral) উষ্মধ্বনি। মুখ

দিয়ে যাতায়াত করার সময় শ্বাসবায়ু যদি গলা থেকে ওষ্ঠ পর্যন্ত সোজা পথে জিভের মধ্যরেখা (median line) ধরে যাতায়াত করে তবে সেই বায়ুতে সৃষ্ট ধ্বনিকে মধ্যগামী (Median) ধ্বনি বলে। কিন্তু যদি জিভের সম্মুখপ্রান্ত শ্বাসবায়ুকে সামনের পথে বাধা দেয় এবং শ্বাসবায়ু মুখ দিয়ে জিভের মধ্যবর্তী রেখা ধরে সোজা পথে যাতায়াত না করে জিভের বাঁ পাশে বা ডান পাশে বা দু'পাশেই বেঁকে যাতায়াত করে তবে সেই পার্শ্বগামী বায়ুতে সৃষ্ট ধ্বনিকে পার্শ্বিক (Lateral) ধ্বনি বলে। সব প্রতিহত বা স্পর্শধ্বনিই শুধু মধ্যগামী ধ্বনি বলে স্পর্শধ্বনিকে এভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায় না। কিন্তু উষ্মধ্বনি পার্শ্বিক ও মধ্যগামী দু'রকম হতে পারে। পার্শ্বিক উষ্মধ্বনি সংখ্যায় খুবই বিরল। মধ্যগামী উষ্মধ্বনি অপেক্ষাকৃত বেশি পাওয়া যায়। মধ্যগামী উষ্মধ্বনি দ্বিবিধ : সঙ্কীর্ণ বা নালীবৎ উষ্মধ্বনি বা শিস্‌ধ্বনি (Groove Fricative / Sibilant) এবং প্রশস্ত বা ফালিবৎ উষ্মধ্বনি (Slit Fricative)। শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথে জিভ যদি উপরে উঠে আংশিক বাধা সৃষ্টি করে এবং জিভের দু'ধার উঠে তার মধ্যরেখা বরাবর গোল নালীর মতো (Groove) সঙ্কীর্ণ সোজা পথ রেখে দেয়, তবে শ্বাসবায়ু সেই পথে ঘর্ষণ সৃষ্টির দ্বারা যে ধ্বনি সৃষ্টি করে তাকে সঙ্কীর্ণ বা নালীবৎ উষ্মধ্বনি বা শিস্‌ধ্বনি (Groove Fricative / Sibilant) বলে। বাংলা শ্, (স্) / ʃ /, (s) ; হিন্দি স্, (শ্), / s /, (ʃ) ; সংস্কৃত শ্, ষ্, স্ / ʃ ṣ s / ; ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান / s ʃ z ʒ / ইত্যাদি হল এই শ্রেণীর উষ্মধ্বনি। আর যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা, নিচের ওষ্ঠ ইত্যাদি নিম্নস্থ উচ্চারক উপরের দাঁত, উপরের ওষ্ঠ ইত্যাদি ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারকের খুব কাছাকাছি গিয়ে অথবা স্বরতন্ত্রী দু'টি পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে এমন আংশিক বাধার সৃষ্টি করে যে, দুই উচ্চারকের মাঝখানে একটি পাতলা ফালির মতো (Slit) পথ খোলা থেকে যায় সেই ধ্বনিকে প্রশস্ত বা ফালিবৎ বা ফাটলাকার উষ্মধ্বনি (Slit Fricative) বলে। বাংলা, হিন্দি ও সংস্কৃত হ্ / h /; ইংরেজি / θ ∂ f v h / ; জার্মান / f v x h / ও ফরাসি / f v / ধ্বনি এই শ্রেণীতে পড়ে।

নৈকট্য-ধ্বনি (Approximant) : ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারক ও নিম্নস্থ উচ্চারক কাছাকাছি আসার (approximation) ফলে যদি তাদের মধ্যবর্তী পথটি বেশি সঙ্কীর্ণ না হয়, তবে শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথে ঠিক বাধা সৃষ্টি হয় না, শুধু একটু বাধার ভাব থাকে, এ অবস্থায় শ্বাসবায়ুর যাতায়াতে কোনো ঘর্ষণধ্বনির সৃষ্টি হয় না ; এইভাবে সৃষ্ট ধ্বনিকে ঘর্ষণহীন প্রবাহিত ধ্বনি (Frictionless Continuant) বলে। এই প্রকার ধ্বনিকে আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানীরা নাম

দিয়েছেন Approximant। বাংলায় একে বলতে পারি 'নৈকট্য-ধ্বনি'। এই নতুন অভিধাটি যিনি প্রবর্তন করেন তাঁর নিজের ভাষায় এই ধরনের ধ্বনির উচ্চারণ-প্রক্রিয়া হল : 'Approximation of two articulators without producing a turbulent airstream'[৮], অর্থাৎ নিম্নস্থ উচ্চারক ও ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারক (উচ্চারণ-স্থান) পরস্পরের কাছাকাছি আসার (approximation) ফলে যখন এমন হয় যে তারা পরস্পরকে ছুঁই-ছুঁই করছে অথচ স্পর্শ করছে না, তখন তাদের মাঝখান দিয়ে শ্বাসবায়ু কোনো ঘর্ষণ-ধ্বনি সৃষ্টি না করে যাতায়াত করে, বায়ুপ্রবাহের স্বাভাবিক গতি বিক্ষুব্ধ (turbulent) হয় না, তখনই নৈকট্য-ধ্বনির (Approximant Sound) সৃষ্টি হয়। তা হলে সূক্ষ্ম পার্থক্যটা এইভাবে বুঝে নেওয়া যায়—শ্বাসবায়ুর গতিপথে সম্পূর্ণ বাধা হলে স্পর্শধ্বনি, আংশিক বাধার ফলে ঘর্ষণধ্বনি শোনা গেলে উষ্মধ্বনি, আর বাধা যদি এত কম হয় যে কোনো ঘর্ষণধ্বনি শোনা যায় না অথচ মনে হয় বাধার ভাবটি রয়েছে তবে নৈকট্য-ধ্বনি (Approximant) হয়। এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেওয়া যায় যে, একদমই যদি বাধা না থাকে অথবা বাধা থাকলেও ধ্বনিটি সেই বাধাজনিত ধ্বনি যদি না হয়, তবে সেইভাবে উচ্চারিত ধ্বনি হল স্বরধ্বনি। আসলে নৈকট্যধ্বনি হল উষ্ম ব্যঞ্জন ও স্বরধ্বনির মাঝামাঝি এক রকমের ধ্বনি। আগেকার ধ্বনিবিজ্ঞানীরা যাকে 'অর্ধস্বর' বলতেন তা নৈকট্য-ধ্বনির মধ্যে পড়ে। নৈকট্য-ধ্বনি আবার দু'রকমের হয়—মধ্যগামী (Median) ও পার্শ্বিক (Lateral)। নিম্নস্থ উচ্চারকের সঙ্গে ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারকের নৈকট্য (approximation) যখন গলা থেকে ওষ্ঠের দিকে সোজাপথে হয় এবং শ্বাসবায়ু জিহ্বার মধ্যরেখা বরাবর সোজা-পথে যাতায়াত করে তখন মধ্যগামী নৈকট্য-ধ্বনির (Median Approximant) সৃষ্টি হয়। আগেকার পরিভাষায় এই মধ্যগামী নৈকট্য-ধ্বনিকেই (Median Approximant) অর্ধস্বর (Semi-vowel) বলা হত। তাহলে, যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা, নিচের ওষ্ঠ ইত্যাদি নিম্নস্থ উচ্চারক স্বরধ্বনির এলাকা ছাড়িয়ে আরো উপরে উঠে যায় অথচ উপরের ওষ্ঠ, তালু প্রভৃতি ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারককে স্পর্শ করে শ্বাসবায়ুর গতিপথে পুরো বাধা সৃষ্টি করে না বা ঘর্ষণধ্বনি শোনা যাবার মতো আংশিক বাধাও সৃষ্টি করে না, অথচ শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথটি স্বরধ্বনির মতো পুরো বাধাহীনও নয়, অল্প একটু আংশিক বাধা থাকে, তাকেই **অর্ধস্বর (Semi-vowel)** বলে। দু'টি উচ্চ স্বরধ্বনি (High Vowel) হল ই, উ / i u /। এই দু'টি স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়

৮। Ladefoged, Peter : *Preliminaries to Linguistic Phonetics,* The University of Chicago, 1971, p. 46.

জিভ স্বভাবত যত উপরে উঠে তার চেয়েও উপরে উঠে গেলে এই স্বরধ্বনি দু'টি অর্ধস্বর হয়ে যায়—যথাক্রমে য় / j বা ĕ / এবং / ওয় / w বা ŏ /। মধ্যগামী নৈকট্যধ্বনির উদাহরণ হল বাংলা ওয়্, য় / ŏ ĕ / ; হিন্দি ও সংস্কৃত অন্তঃস্থ ব্ (व), য় / w j / ; ইংরেজি / w j / ; জার্মান / j / ; ফরাসি / w j ɥ / ইত্যাদি। উর্ধ্বস্থ উচ্চারকের সঙ্গে নিম্নস্থ উচ্চারকের নৈকট্য যদি কণ্ঠ থেকে ওষ্ঠের দিকে সামনের পথে না হয়, সামনের পথে যদি সম্পূর্ণ বাধাই সৃষ্টি হয় এবং ঐ নৈকট্য যদি নিম্নস্থ উচ্চারক জিহ্বার বাঁ পাশে অথবা ডান পাশে অথবা দুই পাশেই হয় এবং ঐ পাশ দিয়ে যদি শ্বাসবায়ু যাতায়াত করে তবে পার্শ্বিক নৈকট্য-ধ্বনির (Lateral Approximant) সৃষ্টি হয়। বাংলা, হিন্দি ও সংস্কৃত ল্ / l / ; ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান / l / ধ্বনি এই শ্রেণীতে পড়ে।

তরল ধ্বনি : র্ [r] ও ল্ [l]-কে একত্রে একটি পৃথক শ্রেণীতে ফেলা হয়। সেই শ্রেণীর নাম তরল ধ্বনি (Liquid)। কিন্তু ধ্বনিবিজ্ঞানী জোন্‌স্ এই রকম একটি শ্রেণী নির্ণয়ের কোনো সন্তোষজনক কারণ আছে বলে মনে করেন না।[৯]

ঘৃষ্টধ্বনি (Affricate) : যদি কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর গতিপথে প্রথমে স্পর্শধ্বনির মতো পূর্ণ বাধার সৃষ্টি হয় এবং ক্ষণকাল পরেই সেই বাধা কমে উষ্মধ্বনির মতো আংশিক বাধায় পরিণত হয় তবে সেই ধ্বনিকে ঘৃষ্টধ্বনি (Affricate Sound) বলে। সহজ কথায় ঘৃষ্টধ্বনি হল স্পর্শধ্বনি ও উষ্মধ্বনির যৌগিক রূপ। ঘৃষ্টধ্বনি নানা শ্রেণীর হতে পারে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর যৌগিক উপাদানের মধ্যে দ্বিতীয়টির উচ্চারণ-স্থান অনুসারে সেই শ্রেণীর নামকরণ হয়। যেমন—তালু-দন্তমূলীয় (Palato-alveolar) : বাংলা ও হিন্দি চ্, ছ্, জ্, ঝ্, / cʃ cʃʰ ɟʒ ɟʒʰ / ; ইংরেজি / tʃ dʒ /। দন্তমূলীয় (Alveolar) : জার্মান / ts /। বাংলা ও হিন্দি ভাষার চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ধ্বনিগুলি সূক্ষ্ম-বিচারে তালুদন্তমূলীয় ধ্বনি হলেও সাধারণত এগুলিকেও তালব্য ধ্বনির মধ্যেই ধরা হয় এবং এগুলির জন্যে স্বনীমীয় প্রতিলিখনে যথাক্রমে / c cʰ ɟ ɟʰ / চিহ্নই ব্যবহার করা হয়।

উপরে মহাপ্রাণ ধ্বনি ও ঘৃষ্টধ্বনির যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে বোঝা যাবে যে, এই ধ্বনিগুলি বিশুদ্ধ ধ্বনি নয়, মিশ্রধ্বনি। একটি মহাপ্রাণ-ধ্বনি =

৯। Jones, D. : *An Outline of English Phonetics*, Cambridge, 1969, p. 48.

একটি অল্পপ্রাণ ধ্বনি + হ্। তেমনি একটি ঘৃষ্ট ধ্বনি = একটি স্পর্শধ্বনি + একটি উষ্মধ্বনি। এই রকম একটি ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ের মধ্যে দু'টি ব্যঞ্জনধ্বনি মিশ্রিত হয়ে উচ্চারিত হলে সেই ধ্বনিকে **দ্বিব্যঞ্জনধ্বনি (double consonant)** বলে। মহাপ্রাণ ধ্বনি ও ঘৃষ্ট ধ্বনি হল তার দুটি প্রধান শাখা। উদাহরণ : মহাপ্রাণ খ্ = ক্ + হ্ ইত্যাদি। ঘৃষ্টধ্বনি চ্ = চ্ + শ্ ইত্যাদি।

এ পর্যন্ত ফুসফুস-সংযুক্ত বায়ুপ্রবাহ (pulmonic airstream)-জাত ধ্বনির প্রধান-প্রধান শ্রেণীর কথা আলোচনা করা হল। এর পর ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহ (non-pulmonic airstream)-জাত ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। আগে বলা হয়েছে ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহ দু'রকমের হয় : স্বরতন্ত্রী-চালিত (Glottalic) এবং স্নিগ্ধতালু-চালিত (Velaric)। এই দু'রকমের বায়ুপ্রবাহের প্রত্যেকটিই আবার বহির্গামী (Egressive) এবং অন্তর্গামী (Ingressive) হতে পারে এবং সেই অনুসারে ধ্বনির প্রকারভেদ হয়।

বহিঃস্ফোটক বা হিক্কিত (Ejective) ব্যঞ্জন : স্বরতন্ত্রী (Vocal Cords) দু'টিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে দিলে স্বরতন্ত্রীর নিচের ফুসফুস-আগত বায়ুপ্রবাহ থেকে স্বরতন্ত্রীর উপরের শ্বাসনালীস্থ বা উর্ধ্বকণ্ঠস্থ (Pharyngeal) বায়ুর যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এইভাবে স্বরতন্ত্রী দু'টিকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত করে স্বরপথ (glottis) সম্পূর্ণ বন্ধ করে স্বরযন্ত্রকে (larynx) একটু উপরে ঠেলে দিলে উর্ধ্বকণ্ঠের (Pharynx) ভিতরের জায়গাটুকু কমে যায় এবং তাতে উর্ধ্বকণ্ঠের আভ্যন্তরীণ বায়ুপ্রবাহে চাপ সৃষ্টি হয় ; তখন সেই চাপে ঐ বায়ু খানিকটা ঘনীভূত হয়ে মুখ বা নাসিকা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। স্বরতন্ত্রী-চালিত উর্ধ্বকণ্ঠের এই বহির্গামী বায়ুপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে যে ধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তাকে হিক্কিত ব্যঞ্জন বা বহিঃস্ফোটক ব্যঞ্জন (Ejective Consonant / Glottalised Stop) ধ্বনি বলে। বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি ভাষার পরিশীলিত উচ্চারণে এই ধ্বনি সাধারণত শোনা যায় না। ধ্বনিবিজ্ঞানে এই রকমের ধ্বনির চিহ্ন হল [p' t' k'] ইত্যাদি।

অবরুদ্ধ বা অন্তঃস্ফোটক (Implosive / Recursive) ব্যঞ্জন : স্বরতন্ত্রী দু'টিকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত করে স্বরপথ (glottis) সম্পূর্ণ বন্ধ করে স্বরযন্ত্রকে (larynx) একটু নিচে নামিয়ে দিলে উর্ধ্বকণ্ঠের ভিতরের ফাঁকা জায়গাটুকু একটু বেড়ে যায়, ফলে তার ভিতরের বায়ু পাতলা হয়ে যায় এবং ভিতরের শূন্যস্থান পূরণের জন্যে বাইরের বাতাস মুখ বা নাসিকা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। স্বরপথ অবরোধের পরে এই অন্তর্গামী বায়ুর গতিপথে বাধা সৃষ্টি

করে যে ধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তাকে অবরুদ্ধ বা অন্তঃস্ফোটক ধ্বনি (Implosive / Recursive Sound / Ingressive Glottalic Click) ধ্বনি বলে। ড. সুকুমার সেনের মতে এই রকমের ধ্বনি উচ্চারণের সময় 'একটু ঢোক গেলার মতো প্রযত্ন' হয়। পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো স্থানে ঘ্, ধ্, ভ্ প্রভৃতি মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ হয়ে যায় এবং একটু অন্তর্গামী বায়ুর সাহায্যে উচ্চারিত হয়। বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষার আদর্শ (Standard) উচ্চারণে এই ধ্বনির প্রচলন নেই।

ক্লিক্ বা শীৎকার বা কাকু ধ্বনি (Click) : জিহ্বার পশ্চাৎভাগ (Back of the Tongue) যদি স্নিগ্ধতালুতে (Velum) সম্পূর্ণ অবরোধ সৃষ্টি করে তবে মুখগহ্বরস্থ শ্বাসবায়ু ফুসফুস-আগত বায়ুপ্রবাহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এইভাবে স্নিগ্ধতালুতে অবরোধ সৃষ্টির পরে স্নিগ্ধতালুর সঙ্গে সংলগ্ন অবস্থাতেই জিহ্বার পশ্চাৎভাগ একটু উপর দিকে ঠেলে তুললে মুখগহ্বরের বায়ুপ্রবাহে চাপ সৃষ্টি হয় এবং মুখ দিয়ে বায়ু বেরিয়ে আসে ; এই বায়ুপ্রবাহ হল স্নিগ্ধতালু-চালিত বহির্গামী বায়ুপ্রবাহ (Egressive Velaric Airstream)। আবার স্নিগ্ধতালুতে সংলগ্ন অবস্থাতেই জিহ্বার পশ্চাৎভাগ একটু নিচে গলার দিকে নামিয়ে দিলে মুখের ভিতরের ফাঁকা জায়গাটুকু একটু বেড়ে যায়, মুখের ভিতরের বাতাস একটু পাতলা হয়ে যায় এবং মুখের ভিতরের শূন্যস্থান পূরণের জন্যে বাইরে থেকে শ্বাসবায়ু ভিতরে প্রবেশ করে। স্নিগ্ধতালুতে অবরোধ সৃষ্টির পর মুখ দিয়ে এই যে অন্তর্গামী (Ingressive) বায়ু মুখের ভিতরে আসে, তাতে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় তাকে ক্লিক্ বা কাকুধ্বনি বা শীৎকার ধ্বনি (Click / Ingressive Velaric Click) বলে। বাংলায় একে সহজ করে চুমকুড়ি ধ্বনি বলতে পারি। যদিও বহির্গামী বায়ুপ্রবাহেও ক্লিক্ ধ্বনি সৃষ্টি হতে পারে, তবু ক্লিক্ বলতে সাধারণত অন্তর্গামী ক্লিক্ই বোঝায়। চুমু খাবার সময় দু'টি ওষ্ঠ দিয়ে বা গরুর গাড়ির গরুকে পিছন থেকে তাড়া লাগাবার সময় জিহ্বার দু'পাশ দিয়ে আমরা এই রকম ধ্বনি সৃষ্টি করি। ক্লিক্ ধ্বনি আবার দু'রকমের হয়—মধ্যগামী (Median) ও পার্শ্বিক (Lateral)। শ্বাসবায়ু জিহ্বার মধ্যভাগ দিয়ে সোজাসুজি প্রবেশ করলে মধ্যগামী ক্লিক এবং জিহ্বার পাশ দিয়ে প্রবেশ করলে পার্শ্বিক ক্লিক্ হয়। কুকুর-ছানাকে চু-চু করে ডাকার সময় আমরা মধ্যগামী ক্লিক্ ও লাঙল টানার গরুকে পিছন থেকে তাড়া লাগাবার সময় আমরা পার্শ্বিক ক্লিক্ ধ্বনি সৃষ্টি করি।

সঘোষ-অঘোষ : ধ্বনির প্রাথমিক দু'টি বিভাগ সঘোষ ও অঘোষ ধ্বনির কথা আমরা আগেই সবিস্তারে আলোচনা করেছি (পৃঃ ২২৭-২২৯)। উচ্চারণ-প্রকৃতি

(Manner of Articulation) অনুযায়ী ধ্বনির শ্রেণীবিভাগে সেই সঘোষ-অঘোষ বিভাগটির উল্লেখ ভাষাতত্ত্ববিদেরা সাধারণত করেন না ; কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে সেটিও উল্লেখনীয়। যে ব্যঞ্জনধ্বনি, উচ্চারণের সময় আমরা সেই ধ্বনিটির সঙ্গে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত সুর বা ঘোষ (Voice) মিশিয়ে ধ্বনিটিকে উচ্চারণ করি সেই ব্যঞ্জনধ্বনিকে সঘোষ বা ঘোষবৎ ব্যঞ্জন (Voiced Consonant) বলে। আর, যে ব্যঞ্জনধ্বনি, উচ্চারণের সময় আমরা সেই ধ্বনিটির সঙ্গে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত সুর বা ঘোষ মিশিয়ে দিই না তাকে অঘোষ ব্যঞ্জন (Voiceless or Breathed Consonant) বলে। পূর্বে উল্লিখিত আলোচনায় আমরা এই উভয় প্রকার ধ্বনির দৃষ্টান্ত বিভিন্ন ভাষা থেকে দিয়েছি। এখানে এইটুকু আবার উল্লেখ করতে পারি যে, আমাদের বর্গীয় বর্ণের ধ্বনিগুলির মধ্যে বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি (অর্থাৎ প্, ফ্, ত্, থ্, ট্, ঠ্, চ্, ছ্, ক্, খ্) এবং (স্) শ্ / p b^h t t^h ʈ ʈ^h c c^h k k^h (s) ʃ / হল অঘোষ ধ্বনি ; আর বর্গীয় বর্ণের ধ্বনিগুলির মধ্যে বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ (অর্থাৎ ব্, ভ্, ম্, দ্, ধ্, ন্, ড্, ঢ্, জ্, ঝ্, গ্, ঘ্, ঙ্) এবং র্, ল্, হ্, ড়্, ঢ়্, ওয়্, য়্ / b b^h m d d^h n ɖ ɖ^h ɟ ɟ^h g g^h ŋ r l h ɽ ɽh ŏ ĕ/ হল সঘোষ ধ্বনি।

মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণ : উচ্চারণ-প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণীবিভাগে সর্বশেষে উল্লেখ করা যায় মহাপ্রাণ ও অল্পপ্রাণ ধ্বনির কথা। স্বরতন্ত্রী দুটির মধ্যবর্তী স্বরপথ দিয়ে শ্বাসবায়ু যাতায়াত করার সময় স্বরতন্ত্রী দু'টি পরস্পরের কাছাকাছি এসে বেশ জোরে আংশিক বাধার সৃষ্টি করলে একটি হ্ [h] ধ্বনি শোনা যায়। এই হ্ [h]-কে মহাপ্রাণতা (Aspiration) বলে। যে-কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় কণ্ঠনালী সঙ্কুচিত করে স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী স্বরপথে আংশিক অবরোধ সৃষ্টি করে যদি সেই মূল ধ্বনির সঙ্গে একটি হ্ [h]-ধ্বনি মিশিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেই মূলধ্বনিটিকে মহাপ্রাণ ধ্বনি (Aspirated Sound) বলে। যেমন ক্ + হ্ = খ্ [k^h], গ্ + হ্ = ঘ্ [g^h] ইত্যাদি। কিন্তু যে ধ্বনির সঙ্গে এরকম হ্-ধ্বনি মিশে থাকে না সে ধ্বনি হল অল্পপ্রাণ ধ্বনি (Unaspirated Sound)। যেমন—ক্, গ্ ইত্যাদি। শ্বাসবায়ুকেই আমরা প্রাণ বলি। মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু বেশি পরিমাণে ও জোরে নির্গত হয়, এইজন্যে একে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। আর অল্পপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে নির্গত হয়। বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় বর্গীয় বর্ণের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি (অর্থাৎ ক্, গ্, চ্, জ্, ট্, ড্, ত্, দ্, প্, ব্ / k g c ɟ ʈ ɖ t d p b /) অল্পপ্রাণ ধ্বনি ; আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি (অর্থাৎ খ্, ঘ্, ছ্, ঝ্, ঠ্, ঢ্, থ্, ধ্, ফ্, ভ্ / k^h g^h c^h ɟ^h ʈ^h ɖ^h t^h d^h p^h b^h / মহাপ্রাণ ধ্বনি। এছাড়া ড় / ɽ / হল অল্পপ্রাণ ও ঢ় / ɽ^h / হল মহাপ্রাণ ধ্বনি।

সাধারণভাবে ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির যে শ্রেণীবিভাগ সবিস্তারে উপরে আলোচনা করা হল তার মূল রূপরেখাটি নিম্নে ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬নং চিত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা হচ্ছে :

চিত্র নং ১৩

ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonants)

উচ্চারণ-প্রকৃতি (Manner of Articulation) অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

- ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহ (Pulmonic) (Airstream)-জাত ধ্বনি
- ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহ (Non-Pulmonic Air-stream)—জাত ধ্বনি
  - রুদ্ধ-স্বরপথ-চালিত বায়ুপ্রবাহ (Glottalic Airstream) -জাত ধ্বনি
    - বহির্গামী (Egressive): বহিঃস্ফোটক (Ejective)
    - অন্তর্গামী (Ingressive): অন্তঃস্ফোটক (Implosive)
  - স্নিগ্ধতালু-চালিত বায়ুপ্রবাহ (Velaric Airstream) —জাত ধ্বনি
    - অন্তর্গামী (Ingressive) ক্লিক (Click)
      - মধ্যগামী (Median)
      - পার্শ্বিক (Lateral)

ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনি:

- প্রতিহত / স্পর্শ (Stop/Occlusive)
  - মৌখিক (Oral) : মধ্যগামী (Median)
- প্রবাহিত / প্রবাহী (Continuant)
  - নাসিক্য (Nasal) : রণিত (Resonant)
  - মৌখিক (Oral)
    - আংশিক বাধাযুক্ত (With Partial Stricture)
      - উষ্ম (Fricative/Spirant)
        - সঙ্কীর্ণ (Groove)
        - প্রশস্ত (Slit)
      - কম্পিত (Trill/Rolled)
      - তাড়িত (Tap/Flap)
    - প্রায় বাধাহীন (Almost without Stricture) : নৈকট্যধ্বনি (Approximant)
      - মধ্যগামী (Median)
      - পার্শ্বিক (Lateral)

চিত্র নং ১৪

চিত্র নং ১৫

চিত্র নং ১৬

উচ্চারণ-স্থান ও উচ্চারণ-প্রকৃতি অনুযায়ী অর্থাৎ শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথে বাধার স্থান ও বাধার প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা উপর্যুক্ত এই কয়েকটি প্রধান শ্রেণীর কথাই বলে থাকেন। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার (International Phonetic Alphabet = IPA) যে সর্বশেষ সংশোধিত তালিকা প্রচলিত আছে তার উপরের সারিতে বাঁদিক থেকে ডানদিকে উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী নির্ধারিত এই শ্রেণীগুলির নামই সাজানো আছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর ধ্বনির উদাহরণ সেই শ্রেণীর নামের নিচে স্তম্ভাকারে (perpendicularly) দেওয়া আছে। উপর থেকে নিচের দিকে সাজানো প্রত্যেকটি স্তম্ভে আবার দু'টি করে উপস্তম্ভ (Sub-columns) আছে—প্রথমটি অঘোষধ্বনির জন্যে, দ্বিতীয়টি সঘোষ ধ্বনির জন্যে। যেমন প্রথম স্তম্ভটি হল দ্বি-ওষ্ঠ্য বা বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য (Bi-labial) ধ্বনির জন্যে। এতে সোজাসুজি দু'টি উপস্তম্ভ আছে, দু'টি উপস্তম্ভে দু'টি উপবিভাগের ধ্বনিগুলি সাজানো আছে। প্রথমটিতে অঘোষ ধ্বনিগুলি আছে--/ p ɸ p' ʘ /, আর দ্বিতীয়টিতে আছে সঘোষ ধ্বনিগুলি—/ m b β / ইত্যাদি। এমনি করে ঐ চিত্রের প্রতি স্তম্ভে অঘোষ-সঘোষ ধ্বনি উপস্থাপিত হয়েছে। ঐ চিত্রে একেবারে বাঁদিকে উপর থেকে নিচে ক্রমান্বয়ে উচ্চারণ-প্রকৃতি অনুযায়ী নির্ধারিত শ্রেণীগুলির নাম দেওয়া আছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর উদাহরণ সেই শ্রেণীর সামনা-সামনি শোয়ানো (horizontal) সারিতে পরপর বাঁদিক থেকে ডানদিকে সাজানো আছে। সুতরাং উচ্চারণ-স্থান ও উচ্চারণ-প্রকৃতি অনুযায়ী ধ্বনির শ্রেণীবিভাগের মোটামুটি সামগ্রিক চিত্র আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালাতেও পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির সামগ্রিক শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত নিষ্কর্ষ যথাসম্ভব আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার কাঠামো অনুসরণে নীচে ১৭ ও ১৮নং চিত্রে দেওয়া হল :

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ (প্রথমাংশ) : প্রতিহত (স্পর্শ) ও ঘৃষ্ট ধ্বনি (Bengali Stops & Affricates) :

						দ্বি-ওষ্ঠ্য/বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য (Bi-labial/Labio-Labial)	জিহ্বাগ্রীয় দন্ত্য (Apico-Dental)	জিহ্বাগ্রীয় দন্তমূলীয় (Apico-alveolar)	জিহ্বাগ্রীয় প্রাক্-তালব্য/প্রতিবেষ্টিত (Apico-Prepalatal/Retroflex)	জিহ্বাফলকীয় তালু-দন্তমূলীয় (Laminal Palato-alveolar)	পশ্চ-জিহ্ব শিষ্কতালব্য (Dorso-Velar)	স্বরতন্ত্রীয় (Glottal/Laryngeal)	দ্বি-ওষ্ঠ্য পশ্চ-জিহ্ব-শিষ্কতালব্য (Bilabial Dorso-Velar or Labio-Velar)
প্রতিহত/স্পর্শ (Occlusive/Stop)	মৌখিক (Oral)	সম্পূর্ণ বাধাযুক্ত With Complete Stricture	মধ্যগামী (Median)	অঘোষ Voiceless	অল্পপ্রাণ Non-aspirate	প্ p	ত্ t		ট্ ṭ		ক্ k		
					মহাপ্রাণ Aspirate	ফ্ pʰ	থ্ tʰ		ঠ্ ṭʰ		খ্ kʰ		
				সঘোষ Voiced	অল্পপ্রাণ Non-aspirate	ব্ b	দ্ d		ড্ ḍ		গ্ g		
					মহাপ্রাণ Aspirate	ভ্ bʰ	ধ্ dʰ		ঢ্ ḍʰ		ঘ্ gʰ		
ঘৃষ্ট (Affricate)	মৌখিক (Oral)	সূচনায় সম্পূর্ণ বাধাযুক্ত, সমাপ্তিতে আংশিক বাধাযুক্ত With complete stricture at the beginneng, and partial stricture at the end	মধ্যগামী (Median)	অঘোষ Voiceless	অল্পপ্রাণ Non-aspirate					চ্ cʃ			
					মহাপ্রাণ Aspirate					ছ্ cʃʰ			
				সঘোষ Voiced	অল্পপ্রাণ Non-aspirate					জ্ ɟʒ			
					মহাপ্রাণ Aspirate					ঝ্ ɟʒʰ			

চিত্র নং ১৭

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ (দ্বিতীয়াংশ) : প্রবাহিত / প্রবাহী ধ্বনি (Bengali Continuants) :

						দ্বি-ওষ্ঠ্য/বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য (Bi-labial/Labio-Labial)	জিহ্বাগ্রীয় দন্ত্য (Apico-Dental)	জিহ্বাগ্রীয় দন্তমূলীয় (Apico-alveolar)	জিহ্বাগ্রীয় প্রাক-তালব্য/প্রতিবেষ্টিত (Apico-Prepalatal/Retroflex)	জিহ্বাফলকীয় তালু-দন্তমূলীয় (Laminal Palato-alveolar)	পশ্চ-জিহ্ব স্তিমিততালব্য (Dorso-Velar)	স্বরতন্ত্রীয় (Glottal/Laryngeal)	দ্বি-ওষ্ঠ্য পশ্চ-জিহ্ব-স্তিমিততালব্য (Bilabial Dorso-Velar or Labio-Velar)
প্রবাহিত / প্রবাহী (Continuants)	নাসিক্য Nasal					ম্ m		ন্ n			ঙ ŋ		
	মৌখিক Oral	আংশিক বাধাযুক্ত (With Partial Stricture)	উষ্ম Fricative/ Spirant	মধ্যগামী (Median)	সঙ্কীর্ণ (Groove)		(স্) (s)			শ ʃ			
					প্রশস্ত (Slit)							হ্ h	
			কম্পিত Trill/Rolled					র্ r					
			তাড়িত Tap/Flap	অল্পপ্রাণ (Non-Aspirate)					ড় ɽ				
				মহাপ্রাণ (Aspirate)					ঢ় ɽʰ				
		প্রায় বাধাহীন (Almost without Stricture)	নৈকট্যধ্বনি Approximant	মধ্যগামী (Median)						য় e̯/j			ওয় e̯/w
				পার্শ্বিক (Latural)				ল্ l					

চিত্র নং ১৮

মৌলিক স্বরধ্বনি এবং স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ বা বর্গীকরণ (Cardinal Vowels & Classification of Vowels) : ব্যঞ্জনধ্বনি হল মুখবিবরে বা স্বরতন্ত্রীতে শ্বাসবায়ুর গতিপথে বাধাজনিত ধ্বনি। তাই এই বাধার স্থান ও প্রকৃতিকে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করে ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ বা বর্গীকরণ করা হয়। কিন্তু স্বরধ্বনির উচ্চারণে শ্বাসবায়ুর গতিপথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হলেও স্বরধ্বনি সেরকমের কোনো সুস্পষ্ট বাধাজনিত ধ্বনি নয়। তাই বাধার স্থান ও বাধার প্রকৃতিকে এখানে স্বরধ্বনির বর্গীকরণের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। স্বরধ্বনির বৈচিত্র্য নির্ভর করে মূলত দু'টি বিষয়ের উপরে : এক, স্বরধ্বনি উচ্চারণের কাল-পরিমাপের উপরে ; এবং দুই, স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথের আকৃতির উপরে। প্রথমটির উপরে নির্ভর করে যে শ্রেণীবিভাগ করা হয় তাকে পরিমাপগত বা মাত্রাগত শ্রেণীবিভাগ (Quntitative Classification) বলে। আর দ্বিতীয়টির উপরে নির্ভর করে যে শ্রেণীবিভাগ করা হয় তাকে বলে গুণগত বা প্রকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ (Qualitative Classification)। কারণ মুখের মধ্যে দিয়ে শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথের আকৃতিগত পরিবর্তনের ফলে শ্বাসবায়ুর গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তারই জন্যে স্বরধ্বনিতে মূল গুণগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্বরধ্বনি উচ্চারণে সময়ের পরিমাপের যে পার্থক্য হয়, তাতে স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে আমূল কোনো গুণগত পার্থক্য হয় না ; তাতে যে পার্থক্য হয়, আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, সেটা শুধু উচ্চারণের সময়ের পার্থক্য—একই স্বরধ্বনি বেশি সময় ধরে উচ্চারিত হলে দীর্ঘস্বর এবং অল্প সময়ের মধ্যে উচ্চারিত হলে হ্রস্বস্বর হয়। উচ্চারণের সময়ের পরিমাপের উপরেই নির্ভর করে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয় বলে একে পরিমাপগত বা মাত্রাগত শ্রেণীবিভাগ বলা হয়েছে। সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় কোনো কোনো স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য (length) তাৎপর্যপূর্ণ (phonemic) ; অর্থাৎ হ্রস্ব স্বরধ্বনির স্থানে দীর্ঘ স্বরধ্বনি উচ্চারণ করলে বা দীর্ঘস্বরের স্থানে হ্রস্বস্বর উচ্চারণ করলে শব্দের অর্থের পরিবর্তন হয়। কিন্তু বাংলা, ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় তা হয় না। ফলে এসব ভাষায় স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য তাৎপর্যপূর্ণ (phonemic) নয়। বানানে যাই লেখা থাক না কেন, হ্রস্বস্বরের জায়গায় দীর্ঘস্বর বা দীর্ঘস্বরের স্থানে হ্রস্বস্বর উচ্চারণ করলে বাংলায় তাতে অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না। তাছাড়া অর্থ-পরিবর্তনের দিকটি ছেড়ে দিলেও, বাংলায় উচ্চারণের দিক থেকেও (phonetically) সুনির্দিষ্টভাবে

কোনো একক স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ নেই। বানানে যা হ্রস্ব তাও বাংলায় কখনো-কখনো দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। যেমন—'দিন' শব্দে 'ই'-এর উচ্চারণ দীর্ঘ, আবার 'দূরের' শব্দে 'ঊ'-এর উচ্চারণ হ্রস্ব। এইজন্যে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা বাংলা স্বরধ্বনিকে হ্রস্ব ও দীর্ঘ এই দু'ভাগে ভাগ করেন না। কিন্তু অন্য কয়েকটি ভাষায় স্বরের ক্ষেত্রে হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ আছে। স্বনিমীয় বিচারে (phonemically) না গিয়ে যদি শুধু উচ্চারণের দিক থেকে (phonetically) দেখি তাহলে সাধারণত দীর্ঘস্বর হল হিন্দি ঈ, এ, অ্যা, আ, ঔ, ও, ঊ [iː eː æː aː ɔː oː uː]; সংস্কৃত ঈ, এ, আ, ও, ঊ [iː eː aː oː uː]; ইংরেজি [iː aː ɔː uː əː]; জার্মান [iː eː ɛː aː dː uː yː ɸː] ইত্যাদি। আর হ্রস্ব স্বর হল হিন্দি ই, উ, অ [i u ə]; ইংরেজি [i e æ ɔ u ʌ ə]; জার্মান [i e a o u y ɸ ə] ইত্যাদি।

এরপর আমরা যখন স্বরধ্বনির গুণগত বা প্রকৃতিগত শ্রেণীবিভাগে অগ্রসর হই তখন আমরা দেখতে পাই যে, এই রকমের শ্রেণীবিভাগ মুখগহ্বরে শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের গতিপথের আকৃতির উপরে নির্ভর করে ; সেই আকৃতি আবার নির্ভর করে জিহ্বার অবস্থানের উপর, মুখবিবরে শূন্যস্থানের পরিমাপের উপর এবং ওষ্ঠের আকৃতির উপর। জিহ্বা মুখের মধ্যে উপরে, নিচে, সামনে, পিছনে প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থানে থেকে এবং ওষ্ঠ নানারকম আকৃতি ধারণ করে শ্বাসবায়ুর গতিপথকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তার ফলেই প্রধানত স্বরধ্বনিতে গুণগত বৈচিত্র্য সৃষ্ট হয়, ফলে আমরা নানা ধরনের স্বরধ্বনি শুনতে পাই। সুতরাং স্বরধ্বনির গুণগত শ্রেণীবিভাগের মানদণ্ড হল তিনটি : (১) জিহ্বার অবস্থান, (২) মুখবিবরের শূন্যতার পরিমাপ এবং (৩) ওষ্ঠের আকৃতি।

জিহ্বার অবস্থান বলতে বোঝায় মুখের মধ্যে জিভ কতটা উপরে উঠেছে, কতটা নিচে নেমেছে, কতটা সামনের দিকে (দাঁতের দিকে) এগিয়ে গেছে, কতটা পিছন দিকে (গলার দিকে) গুটিয়ে এসেছে, সেইটা। কিন্তু জিহ্বার এই অবস্থান মাপার জন্যে বা বোঝাবার জন্যে মুখের ভিতরের ফাঁকা জায়গায় কোনো স্থানচিহ্ন (location point) নেই। তাই মুখের ভিতরের শূন্যস্থানে জিহ্বার অবস্থান চিহ্নিত করার জন্যে ভাষাবিজ্ঞানীরা একটি কাল্পনিক মাপকাঠি খাড়া করেছেন। বন্যার জলের উঠা-নামা পরিমাপ করার জন্যে যেমন নদীর ধারে একটি মাপচিহ্নিত কাঠি পোঁতা থাকে, তেমনি ধ্বনিবিজ্ঞানীরা মুখের ভিতরের শূন্যস্থানে দু'টি মাপকাঠি কল্পনা করে নিয়েছেন—এদের মধ্যে সামনের মাপকাঠিটি

একটু সামনের দিকে হেলানো, আর পিছনের মাপকাঠিটি একদম সোজাভাবে খাড়া (perpendicular)। দুটি মাপকাঠিকেই সমান-সমান তিন ভাগে ভাগ করে দু'টি কাঠির ভাগ-নির্দেশক বিন্দুগুলি শোয়ানো (horizontal) সমান্তরাল রেখা দিয়ে যোগ করা হয়েছে। ২৫৬ পৃষ্ঠার ১৯ নং চিত্রে মুখগহ্বরের মধ্যে কল্পিত এই মাপকাঠিটি এঁকে দেখানো হয়েছে। তারপর ২০ নং চিত্রে সেই মাপকাঠিটিই মুখের বাইরে এনে বড় করে দেখানো হয়েছে। ঐ চিত্রে দাঁড়ানো রেখাগুলির সঙ্গে শোয়ানো রেখাগুলির মিলন-বিন্দুর (joining points) সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮ (আট)। আন্তর্জাতিকভাবে ভাষাবিজ্ঞানীদের দ্বারা স্বীকৃত এই আটটি বিন্দুর ক্রমিক সংখ্যাও ১৯ নং ও ২০ নং চিত্রে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, এই বিন্দুগুলির মধ্যে ১, ২, ৩, ও ৪ নং বিন্দু মুখের সামনের অংশে অর্থাৎ দাঁতের দিকে রয়েছে ; আর ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং বিন্দু মুখের পিছন অংশে অর্থাৎ গলার দিকে রয়েছে। এই আটটি বিন্দুর মধ্যে সামনের দিকের বিন্দুগুলিতে (অর্থাৎ ১, ২, ৩ ও ৪ নং বিন্দুতে) জিহ্বাকে ক্রমান্বয়ে অবস্থিত করে এবং এইগুলির বেলায় ওষ্ঠকে কানের দিকে প্রসারিত করে আমরা যদি স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি তাহলে যে চারটি স্বরধ্বনি শোনা যাবে তাদের চিহ্ন হল যথাক্রমে [i e ɛ a]। তেমনি মুখের পিছন অংশের বিন্দুগুলিতে (অর্থাৎ ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং বিন্দুতে) জিভকে ক্রমান্বয়ে অবস্থিত করে এবং প্রায় সবগুলির ক্ষেত্রে ওষ্ঠকে ফুঁ দেওয়ার মতো গোল করে কুঞ্চিত করে আমরা যদি স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি তাহলে যেসব স্বরধ্বনি শোনা যাবে সেগুলির চিহ্ন হল যথাক্রমে [ɑ ɔ o u]। এইভাবে আমরা আটটি বিন্দু থেকে উচ্চারিত আটটি সুস্পষ্টভাবে পৃথক্ স্বরধ্বনি পেলাম। [i e ɛ a ɑ ɔ o u]। বাংলায় এদের মোটামুটি উচ্চারণ হল : i = ই e = এ, ɛ = এ্যা, a = আ' (জিভকে ওষ্ঠের দিকে এগিয়ে রেখে), ɑ = আ (জিভকে গলার দিকে গুটিয়ে রেখে), ɔ = অ°, o = ও, u = উ। সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত এই আটটি স্বরধ্বনির ক্রমিক সংখ্যা হল : ১নং = i, ২নং = e, ৩ নং = ɛ, ৪ নং = a, ৫ নং = ɑ, ৬ নং = ɔ, ৭ নং = o, ৮ নং = u। এই আটটি স্বরধ্বনিকে **প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনি (Primary Cardinal Vowels)** বলে। এই প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, মুখের সামনের অংশ থেকে উৎপন্ন স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় আমাদের ওষ্ঠ কানের দিকে প্রসারিত থাকে, আর মুখের পিছনের অংশ থেকে উৎপন্ন স্বরধ্বনিগুলি
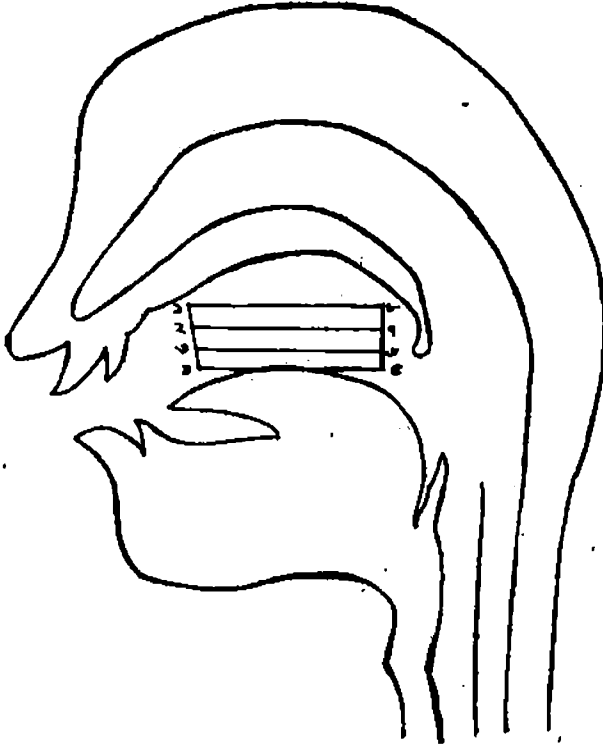
চিত্র নং ১৯ : মুখগহ্বরে মৌলিক স্বরধ্বনিরূপ মাপকাঠি।
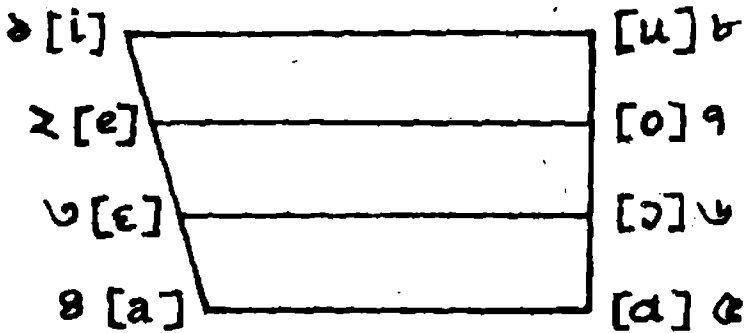
চিত্র নং ২০ : প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনি (Primary Cardinal Vowels)।

উচ্চারণের সময় ওষ্ঠ গোল হয়ে কুঞ্চিত হয়ে থাকে। বাংলা ভাষাভাষীর অভ্যাস অনুসারে এইটিই স্বাভাবিক উচ্চারণ। কিন্তু কোনো কোনো ভাষায় এমন স্বরধ্বনি আছে যেগুলি মুখের সামনের অংশ থেকে উচ্চারিত হয় অথচ যেগুলি উচ্চারণের সময় ওষ্ঠ কুঞ্চিত থাকে ; আবার মুখের পিছন অংশ থেকে উচ্চারিত স্বরধ্বনি সৃষ্টির সময় ওষ্ঠ প্রসারিত থাকে। এছাড়া এইসব ভাষায় আরো কিছু স্বরধ্বনি আছে যা প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনির সঙ্গে মেলে না। এইসব ভাষার এইসব স্বরধ্বনির উচ্চারণ-স্থান নির্ণয়ের জন্যে আরো এক গুচ্ছ মৌলিক স্বরধ্বনি-সম্বলিত মাপকাঠি কল্পনা করা হয়েছে। সেগুলিকে **গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনি (Secondary Cardinal Vowels)** বলে। প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনির মধ্যে সামনের স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ওষ্ঠ প্রসারিত এবং পিছনের স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ওষ্ঠ প্রায়ই কুঞ্চিত থাকে। কিন্তু গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনিতে ওষ্ঠের আকৃতি উল্টো হয় অর্থাৎ সামনের স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ওষ্ঠ কুঞ্চিত হয় এবং পিছনের স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ওষ্ঠ প্রসারিত হয়। এছাড়া গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনির মধ্যে আরো কয়েকটি ধ্বনি আছে যেগুলি উচ্চারণের সময় ওষ্ঠ প্রসারিতও হয় না, কুঞ্চিতও হয় না, মোটামুটি স্বাভাবিক (Neutral) থাকে। প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা হল আট। কিন্তু গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা আরো বেশি। ধ্বনিবিজ্ঞানী অ্যাবারক্রম্বি (Abercrombie) ১৪টি গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনি নির্ণয় করেছেন, এগুলির মধ্যে অবশ্য ১১টিই প্রধান। প্রধান প্রধান গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনির অবস্থান ও স্বীকৃত ক্রমিক সংখ্যা ২১ নং চিত্রে দেখানো হল।
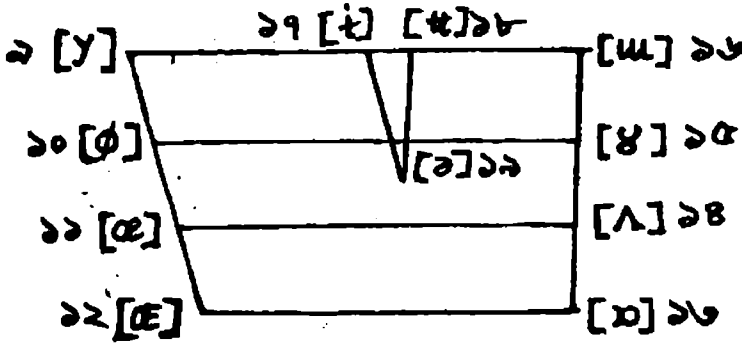
চিত্র নং ২১ : গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনি (Secondary Cardinal Vowels)

গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনিগুলির ক্রমিক সংখ্যা প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনির পর থেকে গোনা হয়।

ওষ্ঠের আকৃতির দিক থেকে বাংলা ও ইতালীয় ভাষার স্বরধ্বনি প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনির কাছাকাছি ; ইংরেজি ও হিন্দি ভাষারও প্রায় সব স্বরধ্বনি প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনির অনুরূপ, কেবল ইংরেজি ভাষার ৩টি স্বরধ্বনি / ɔ: ɔ ʌ / এবং হিন্দি ভাষার / ɔ / স্বরধ্বনি গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনির মতো। জার্মান ও ফরাসি ভাষার অধিকাংশ স্বরধ্বনি প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনির মতো ; তবে গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনির অনুরূপ ধ্বনিও এই দুই ভাষায় কম নেই। এই ধরনের ৫টি স্বরধ্বনি জার্মান ভাষায় আছে : / y: y ø: ø ɔ /। Goethe (গ্যেটে) শব্দে 'গ্'-এর সঙ্গে যে 'এ'—ধ্বনিটি উচ্চারিত হয় সেটি এই ধরনের ধ্বনি, এটি সম্মুখ স্বরধ্বনি হলেও একে ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে উচ্চারণ করতে হয়। এর চিহ্ন হল ø, আগেকার বানানে হবে ö ; এখন সহজ করে লেখা হয় 'oe'। ফরাসি ভাষায় গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনির অনুরূপ ধ্বনি হল / y ø œ œ̃ ɔ / ; যেমন mule / myl / শব্দের / y / ধ্বনিটি আসলে ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে ই [i] ধ্বনি উচ্চারণের ফলে সৃষ্ট হয়। লক্ষণীয় যে, এই ধ্বনিটি সম্মুখ স্বরধ্বনি অথচ এটি ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে উচ্চারণ করতে হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল—মৌলিক স্বরধ্বনির উপযোগিতা এই যে, মৌলিক স্বরধ্বনির সঙ্গে তুলনা করেই বিভিন্ন ভাষার স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার অবস্থান ও ওষ্ঠের আকৃতি কি রকম থাকে তা বোঝানো হয়। যেমন বাংলা ভাষার 'ই' ধ্বনির উচ্চারণ-স্থান বুঝিয়ে দেবার জন্য আমরা যদি বলি যে, ১নং মৌলিক স্বরধ্বনি বা মৌলিক স্বরধ্বনি [i]-এর চেয়ে বাংলা 'ই'-ধ্বনি একটু নিচে থেকে উচ্চারিত হয়, তাহলে সব দেশের ভাষাবিজ্ঞানীরা বাংলা 'ই'-এর উচ্চারণ ঠিক-ঠিক বুঝে নেবেন। কারণ ১নং মৌলিক স্বরধ্বনির উচ্চারণ-স্থান সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। তাহলে মৌলিক স্বরধ্বনি কোনো একটি ভাষার স্বরধ্বনি নয়, এমন কি সব ভাষার মোট স্বরধ্বনিও নয়। মৌলিক স্বরধ্বনি হল বিভিন্ন ভাষার স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার অবস্থান ও ওষ্ঠের আকৃতি বুঝিয়ে দেবার মানদণ্ড। তাই অধ্যাপক জোন্স মৌলিক স্বরধ্বনিকে 'Scales of Cardinal Vowels' বলেছেন। ধ্বনিবিজ্ঞানী অ্যাবারক্রম্বে আরো সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন :

> "A Cardinal Vowel is a fixed and unchanging reference-point, established within the total range of

vowel quality, to which any other vowel sound can be directly related."[১০]

অর্থাৎ বিভিন্ন ভাষার স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার অবস্থান চিহ্নিত করার জন্যে মুখের ভিতরের শূন্যস্থানে ভাষাবিজ্ঞানীরা যে-সব কাল্পনিক মাপকাঠি নির্ণয় করেছেন তাদের বিভিন্ন পরিমাপ-নির্দেশক বিন্দু থেকে উচ্চারিত স্বরধ্বনিগুলিকে মৌলিক স্বরধ্বনি বলে।

মৌলিক স্বরধ্বনির মানদণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে বিভিন্ন ভাষার স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান এবং ওষ্ঠের আকৃতি যেমন নির্দেশ করা যায়, তেমনি মৌলিক স্বরধ্বনির সঙ্গে তুলনায় বিভিন্ন ভাষার স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ বা বর্গীকরণও (classification) করা যায়। ২৬০ পৃষ্ঠায় প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনির চিত্রে (চিত্র নং ২২) বাংলা স্বরধ্বনিগুলিকে বসিয়ে তাদের উচ্চারণস্থান চিহ্নিত করা হল এবং মৌলিক স্বরধ্বনি ও বাংলা স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ করা হল। প্রসঙ্গত অন্য কয়েকটি প্রধান ভাষার স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগও তুলনামূলকভাবে উল্লেখ করা হল :

জিহ্বার অবস্থান (ক = সম্মুখ অবস্থান ও পশ্চাৎ অবস্থান ; খ = উচ্চ অবস্থান ও নিম্ন অবস্থান) অনুসারে স্বরধ্বনিকে এইভাবে ভাগ করা হয় :

যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা সামনের দিকে (অর্থাৎ ওষ্ঠের দিকে) এগিয়ে আসে সেই স্বরধ্বনিকে **সম্মুখ স্বরধ্বনি (Front Vowel)** বলে। যেমন—প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনি [i e ɛ a] ; গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনি [y ø œ ɶ] ; বাংলা স্বরধ্বনি ই, এ, অ্যা / i e æ / ; হিন্দি ঈ, ই, এ, অ্যা / i: i e: æ: / ; সংস্কৃত ঈ, ই, এ / i: i e: / ; ইংরেজি / i: i e æ / ; জার্মান / i: i e: e ɛ: y: y ø: o / ; ফরাসি / i e ɛ ɛ̃ a y ø œ œ̃ / ইত্যাদি। আবার যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ পিছন দিকে (অর্থাৎ গলার দিকে) গুটিয়ে (retracted হয়ে) যায় তাকে **পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (Back Vowel)** বলে। প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনি [a ɔ o u], গৌণ মৌলিক স্বরধ্নি [ɒ ʌ ɤ ɯ] ; বাংলা অ, ও, উ / ɔ o u / ; হিন্দি ঔ, ও, উ, ঊ /ɔ: o: u u:/, ইংরেজি / a ɔ ɔ: u u: ʌ /; জার্মান / o o: u u: /, ফরাসি /a ã ɔ ɔ õ u /; সংস্কৃত ও, উ, ঊ / o: u u: / ইত্যাদি পশ্চাৎ স্বরধ্বনি।

১০। Abercrombie, David : *Elements of General Phonetics*, Edinburgh University Press, 1980, p. 151.
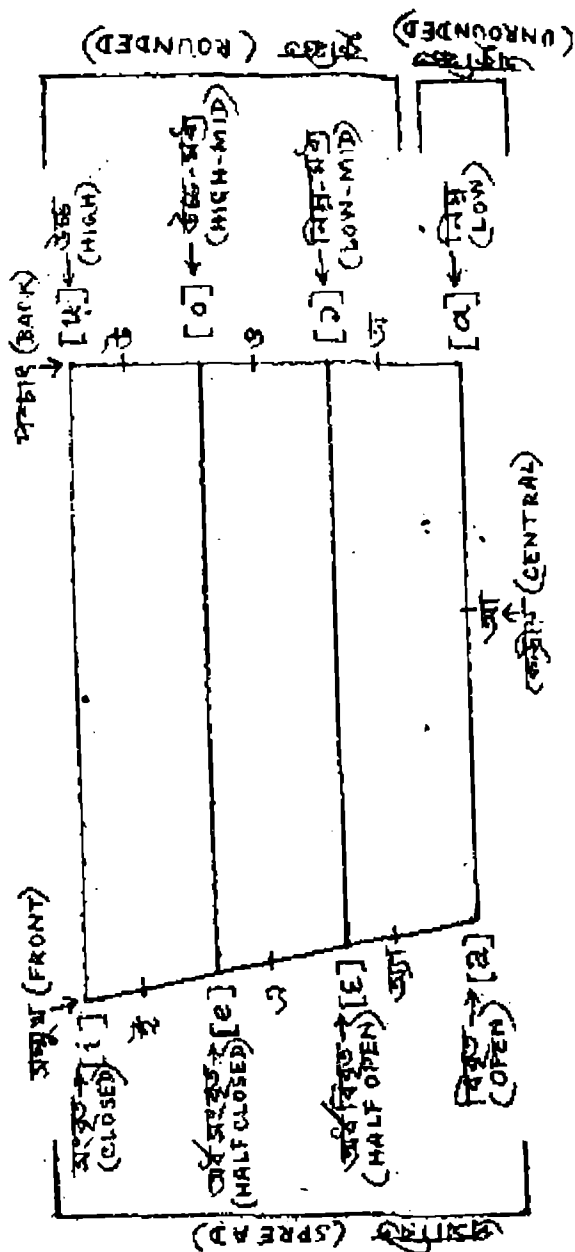
চিত্র নং ২২ : মৌলিক স্বরধ্বনির চিত্রে বাংলা স্বরধ্বনি।

সম্মুখ স্বর ও পশ্চাৎ স্বরের মাঝামাঝি অবস্থানে জিভকে রেখে যে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তাকে **কেন্দ্রীয় (Central) স্বরধ্বনি** বলে। যেমন গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনি [ɘ] ; বাংলা আ / a / ; হিন্দি অ (হ্রস্ব), আ / ə a: /; ইংরেজি / ɜ: ə / ; জার্মান / ə a a: / ; ফরাসি / ə /। অবশ্য ফরাসি ভাষায় / ə / ধ্বনির ব্যবহার খুবই কম।

যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা স্বরধ্বনির এলাকার মধ্যেই সর্ব্বোচ্চ অবস্থানে বা তার কাছাকাছি অবস্থানে থাকে তাকে **উচ্চ স্বরধ্বনি (High Vowel)** বলে। এখানে 'স্বরধ্বনির এলাকা' বলার তাৎপর্য এই যে, জিভ যদি উপরে উঠতে-উঠতে শেষে গিয়ে মুখের ছাদে (তালুতে) এমন ভাবে লেগে যায় যে তার ফলে শ্বাসবায়ুর গতিপথে বাধা সৃষ্টি হয় এবং বাধার ফলে অবরোধ বা ঘর্ষণ-জনিত ধ্বনি সৃষ্টি হয় তা হলে তো সেই ধ্বনি আর স্বরধ্বনিই থাকে না, সেটা ব্যঞ্জনধ্বনি হয়ে যায়। সুতরাং জিভ উপরে উঠে যাবার এমন একটা সীমা আছে যে সীমার মধ্যে থাকলেই স্বরধ্বনি হয়, তার উপরে গেলে ব্যঞ্জন ধ্বনি হয়ে যায়। এই সীমার মধ্যেই সর্ব্বোচ্চ যে বিন্দু, সেখান থেকে বা তার কাছাকাছি স্থান থেকে উচ্চারিত ধ্বনিকে বলা হয় **উচ্চ স্বরধ্বনি (High Vowel)**। উচ্চ স্বরধ্বনি হল প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনি [i u] ; গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনি [y ɯ] ; বাংলা ই, উ / i u / ; হিন্দি ও সংস্কৃত ঈ, ঊ, ই, উ / i: u: i u / ; ইংরেজি / i: u: i u / ; জার্মান / i: u: y: i u y / ; ফরাসি / i u y / ইত্যাদি। আবার জিভকে যদি একদম নীচে নামিয়ে কোনো স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তবে সেটা হবে **নিম্ন স্বরধ্বনি (Low Vowel)**। যেমন প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনি [a *a*] ; গৌণ মৌলিক [Œ ɒ] ; বাংলা আ / a / ; হিন্দি আ / a: / ; সংস্কৃত আ [a:] ইংরেজি / *a:* / ; জার্মান / a: a / ; ফরাসি / a *a* *ã* / ইত্যাদি।

উচ্চ ও নিম্ন স্বরধ্বনির মাঝামাঝি হল উচ্চ-মধ্য বা মধ্যোচ্চ (High-mid) ও নিম্ন-মধ্য বা মধ্য-নিম্ন (Low-mid) স্বরধ্বনি। উচ্চ স্বরধ্বনির উচ্চারণ-স্থান থেকে নিচে মুখের ভিতরে যে শূন্যস্থান থাকে তার সর্ব্বোচ্চ বিন্দু থেকে তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে জিভকে নিচে নামিয়ে এনে যদি আমরা কোনো স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি তবে সেইটাই হবে **উচ্চ-মধ্য বা মধ্যোচ্চ (High-mid) স্বরধ্বনি**। উদাহরণ—প্রাথমিক মৌলিক / e o /; গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনি [ø ɘ ɤ] ; বাংলা এ, ও / e o / ; হিন্দি এ, অ (হ্রস্ব), ও / e ɔ o / ; সংস্কৃত

এ, ও / e: o: / ; ইংরেজি / e ɜ: ə / ; জার্মান / e: e o: o ə ø: ø / ; ফরাসি / e o ə ø / ইত্যাদি। উচ্চ স্বরধ্বনির উচ্চারণ-স্থান থেকে নিচে মুখের ভিতরে যে শূন্যস্থান থাকে তার মধ্যে নিচে থেকে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে আমরা জিভকে যদি উপরে তুলে ধরে কোনো স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি তবে সেইটা হবে **নিম্ন-মধ্য বা মধ্যনিম্ন (Low-mid)** স্বরধ্বনি। যেমন, প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনি [ɛ ɔ] ; গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনি [œ ʌ] ; বাংলা অ্যা, অ / æ ɔ / ; হিন্দি অ্যা, ঔ / æ: ɔ: / ; ইংরেজি / æ ɔ ɔ: ʌ / ; জার্মান / ɛ: / ; ফরাসি / ɛ ɛ̃, ɔ ɔ̃ œ œ̃ / ইত্যাদি।

মুখবিবরের ভিতরের শূন্যস্থানের পরিমাপ অনুসারে স্বরধ্বনিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : সংবৃত, বিবৃত, অর্ধসংবৃত ও অর্ধবিবৃত। যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ স্বরধ্বনির এলাকার মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে থাকে এবং জিভ ও নিচের চোয়াল যতদূর সম্ভব মুখের ছাদের দিকে এগিয়ে থাকায় মুখের ভিতরের শূন্যস্থান প্রায় ভরে থাকে তাকে **সংবৃত স্বরধ্বনি (Closed Vowel)** বলে। সব উচ্চ স্বরধ্বনি সংবৃত স্বরধ্বনি। যেমন—প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনি [i u] ; গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনি [y ɯ] ; বাংলা ই, উ / i u / ; হিন্দি ও সংস্কৃত ঈ, ই, ঊ, উ / i: i u: u / ; ইংরেজি / i: u: i u / ; জার্মান / i: u: y: i u y / ; ফরাসি / i u y / ইত্যাদি। আর জিভকে একদম নিচে নামিয়ে স্বাভাবিকতা বজায় রেখে নীচের চোয়ালকে মুখের ছাদ থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে আনলে মুখের ভিতরের শূন্যস্থান একদম ফাঁকা থাকে, এই অবস্থায় যে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তাকেই **বিবৃত (Open) স্বরধ্বনি** বলে। সব নিম্ন স্বরধ্বনি হল বিবৃত স্বরধ্বনি। যেমন—প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনি [a ɑ], গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনি [Œ ɒ] ; বাংলা আ / a / ; হিন্দি ও সংস্কৃত আ / a: / ; ইংরেজি / ɑ: / ; জার্মান / a: a / ; ফরাসি / a ɑ ɑ̃ / ইত্যাদি।

সংবৃত স্বরধ্বনি ও বিবৃত স্বরধ্বনির মাঝামাঝি হল অর্ধসংবৃত আর অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি। সংবৃত স্বরধ্বনির অবস্থান থেকে বিবৃত স্বরধ্বনির অবস্থান পর্যন্ত যে শূন্যস্থান, জিভ ও নিচের চোয়ালের দ্বারা যদি তার দুই-তৃতীয়াংশ ভরে থাকে তবে সেই অবস্থায় উচ্চারিত স্বরধ্বনিকে **অর্ধসংবৃত (Half-closed) স্বরধ্বনি** বলে। উচ্চমধ্য (High-mid) স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি হল প্রাথমিক মৌলিক স্বর [e o], গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনি [ø ɤ ə] ; বাংলা এ, ও / e o / ; সংস্কৃত এ, ও / e: o: / ; হিন্দি এ, অ

(হ্রস্ব), ও / eː ə oː / ; ইংরেজি / e əː ə / ; জার্মান / eː e oː o øː ø ə / ; ফরাসি / e o ø ə / ইত্যাদি। তেমনি সংবৃত স্বরধ্বনির অবস্থান থেকে বিবৃত স্বরধ্বনির অবস্থান পর্যন্ত যে শূন্যস্থান, নিচে থেকে তার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ যদি জিভ ও নিচের চোয়ালের দ্বারা ভরে থাকে, আর উপর থেকে দুই-তৃতীয়াংশ যদি ফাঁকা থাকে তবে সেই অবস্থা থেকে উচ্চারিত স্বরধ্বনিকে **অর্ধবিবৃত (Half-open) স্বরধ্বনি** বলে। সব নিম্ন-মধ্য (Low-mid) স্বরধ্বনি এই শ্রেণীতে পড়ে। যেমন—প্রাথমিক মৌলিক স্বর [ɛ ɔ] ; গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনি [œ ʌ] ; বাংলা অ্যা, অ / æ ɔ / ; হিন্দি অ্যা, ঔ / æː ɔː / ; ইংরেজি / æ ɔː ɔ ʌ /; জার্মান / ɛː / ; ফরাসি / ɛ ɔ œ ɛ̃ ɔ̃ œ̃ / ইত্যাদি।

ওষ্ঠের আকৃতি অনুসারে স্বরধ্বনির দুটি শ্রেণী নির্ণয় করা হয় : প্রসারিত (Spread / Unrounded) এবং কুঞ্চিত বা বর্তুল (Rounded)। ওষ্ঠকে দু'দিকে (অর্থাৎ দুই কানের দিকে) প্রসারিত করে আমরা যে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি তাকে **প্রসারিত (Spread / Unrounded) স্বরধ্বনি** বলে। যেমন, প্রাথমিক স্বরধ্বনি—[i e ɛ a] ; গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনি [ɯ ɤ ʌ ɒ] ; বাংলা ই, এ, অ্যা / i e æ / ; হিন্দি ঈ, ই, এ অ্যা / iː i eː æː / ; সংস্কৃত ঈ, ই, এ / iː i eː /; ইংরেজি / iː i e æ ʌ / ; জার্মান / iː i eː e ɛː /; ফরাসি / i e ɛ a ɛ̃ /; ইত্যাদি। কিন্তু ওষ্ঠ যদি দু'দিকে প্রসারিত না হয়ে ফুঁ দেওয়ার মতো গোল হয়ে কুঞ্চিত আকার ধারণ করে তবে সেই অবস্থায় আমরা যে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি তাকে **কুঞ্চিত (Rounded) স্বরধ্বনি** বলে। যেমন —প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনি [ɔ o u] ; গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনি [y ø œ Œ] ; বাংলা স্বরধ্বনি অ, ও, উ / ɔ o u / ; হিন্দি ঔ, ও, উ, ঊ / ɔ oː u uː / ; সংস্কৃত ও, ঊ, উ / oː uː u / ; ইংরেজি / ɔː ɔ uː u / ; জার্মান / oː o uː u yː y øː ø / ; ফরাসি / ɔ o u ɔ̃ y ø œ œ̃ /। [ɑ] পশ্চাৎ স্বর হওয়া সত্ত্বেও এটি উচ্চারণের সময় ওষ্ঠ কুঞ্চিত হয় না। এইজন্যে একে **অকুঞ্চিত পশ্চাৎ স্বর (Unrounded Back Vowel)** বলে।[১১]

কোনো-কোনো স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ওষ্ঠ প্রসারিতও হয় না, কুঞ্চিতও হয় না, স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। এই রকম স্বরধ্বনিকে **স্বাভাবিক বা মধ্যস্থ**

১১। Jones, Prof, Daniel : *An Outline of English Phonetics*, Cambridge ; W. Heffer & Sons Ltd., 1969, p. 31

স্বরধ্বনি (Neutral Vowel) বলে। আগে যেসব স্বরধ্বনিকে কেন্দ্রীয় (Central) স্বরধ্বনি বলা হয়েছে সেইসব স্বরধ্বনির উচ্চারণে ওষ্ঠ এই রকম স্বাভাবিক আকৃতিতে থাকে। উদাহরণ :—গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনি [ə] ইত্যাদি ; বাংলা আ / a / ; হিন্দি আ, অ (হ্রস্ব) / a ə / ; ইংরেজি / aː əː ə / ; জার্মান / a aː ə / ও ফরাসি / ə /। বাংলা স্বরধ্বনির সূক্ষ্মবিচারে বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন যে, বাংলায় সম্মুখ স্বরধ্বনি / ই, এ, অ্যা /-র মতো 'আ-ধ্বনিও অকুঞ্চিত অর্থাৎ মোটামুটি প্রসারিত ; আর পশ্চাৎ স্বরধ্বনি /অ, ও, উ/ মোটামুটি কুঞ্চিত।'[১২]

উপরে স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হল, ২৩ নং চিত্রে (পৃঃ ২৬৫) তারই আলোকে বাংলা স্বরধ্বনিগুলির শ্রেণীবিভাগ সংক্ষেপে দেখানো হয়েছে।

উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ ছাড়া শ্বাসবায়ুর গতিপথ অনুসারে স্বরধ্বনিকে আরো দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সে দু'টি শ্রেণী হল : মৌখিক (Oral) ও অনুনাসিক (Nasalised) স্বরধ্বনি। স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু শুধু মুখ দিয়ে যাতায়াত করলে স্বরধ্বনি **মৌখিক (Oral)** হয় ; আর শ্বাসবায়ু একই সঙ্গে মুখ ও নাসিকা দিয়ে যাতায়াত করলে স্বরধ্বনি **অনুনাসিক (Nasalised)** হয়। বাংলায় স্বরধ্বনির নাসিক্যীভবন স্বনিমীয় (phonemic) তাৎপর্যপূর্ণ অর্থাৎ বাংলায় মৌখিক স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক করে দিলে শব্দের অর্থই পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন—/ বাধা / (obstacle) ও / বাঁধা / (to bind) ; এখানে দ্বিতীয় শব্দে শুধু 'আ'-ধ্বনিকে অনুনাসিক করার ফলে শব্দের অর্থই পৃথক্ হয়ে গেল। এরকম স্বনিমীয় স্তরে মৌখিক-অনুনাসিক ভেদ বাংলা ও হিন্দি ভাষায় সব স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে আছে ; ফরাসিতে কোনো কোনো স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে আছে ; কিন্তু ইংরেজি, জার্মান ও সংস্কৃত ভাষায় একেবারেই নেই। বাংলায় যতগুলি মৌখিক স্বর আছে ততগুলি অনুনাসিক স্বরও আছে। তাই উপরে বিভিন্ন শ্রেণীতে যতগুলি বাংলা ও হিন্দি মৌখিক স্বরধ্বনির উল্লেখ করা হয়েছে, ঐসব শ্রেণীতে সেই-সেই স্বরধ্বনির অনুনাসিক রূপও দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরে নিতে হবে।

১২। In Bengali "the front vowels and /a/ are unrounded and the back vowels are moderately rounded."–Ghatage, A. M.: *Historical Linguistics and Indo-Aryan Languages,* Bombay : The University of Bombay, 1962, p. 135

জিহ্বার উচ্চতা (Height of the tongue)	মুখগহ্বরে শূন্যতার পরিমাপ (Space in the Oral Cavity)	সম্মুখ (Front) / প্রসারিত (Spread)	কেন্দ্রীয় (Central) / মধ্যস্থ (Neutral)	পশ্চাৎ (Back) / কুঞ্চিত (Rounded)
উচ্চ (High)	সংবৃত (Close)	ই i		উ u
উচ্চ-মধ্য (High-mid)	অর্ধসংবৃত (Half-close)	এ e		ও o
নিম্ন-মধ্য (Low-mid)	অর্ধ-বিবৃত (Half-open)	অ্যা æ		অ° ɔ
নিম্ন (Low)	বিবৃত (Open)		আ a	

চিত্র নং ২৩ : বাংলা স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ।

॥ ১২ ॥

মূলধ্বনি বা স্বনিম : সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ
(Phoneme : Its Definition and Analysis)

সংজ্ঞা ও স্বরূপ : আগে 'ভাষা-শাস্ত্রের প্রকার-ভেদ ও ভাষা-বিজ্ঞানের বিভাগ'-এ ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে (পৃঃ ৩৬-৩৮) আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইংরেজিতে 'Sound' এবং বাংলায় 'ধ্বনি' কথাটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। যন্ত্রের সাহায্যে সৃষ্ট ধ্বনি, হাততালির ধ্বনি, মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি প্রভৃতি সব রকমের ধ্বনিকেই আমরা Sound বা ধ্বনি বলে থাকি। এত রকমের ধ্বনির মধ্যে শুধু মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত যে ধ্বনি তাকে বলে **স্বন বা বাগ্‌ধ্বনি (Phone/Speech-sound)**। মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত সব ধ্বনি আবার ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। যেমন—পাগলের অর্থহীন প্রলাপ বা শিশুর অস্ফুট ধ্বনি। শুধু মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অথচ ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিই ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পড়ে। আবার ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনির মধ্যেও কিছু ধ্বনি হল মূলধ্বনি, আর কিছু হল মূলধ্বনির উচ্চারণ-বৈচিত্র্য। যেমন—আমাদের আগের উদাহরণটা আবার স্মরণ করিয়ে দিই : আধুনিক বাংলা ভাষায় 'শ্লীল' শব্দে 'শ্'-এর উচ্চারণ দন্ত্য 'স্' [s]-এর মতো, কিন্তু 'শীল' শব্দে 'শ্'-এর উচ্চারণ তালব্য 'শ্' [ʃ]-ই। মূলধ্বনি একটাই—'শ্' ; কিন্তু বাংলায় তার দু'টো উচ্চারণ-বৈচিত্র্য—কখনো দন্ত্য স্ [s]-এর মতো, কখনো তালব্য শ্ [ʃ]-ই। তাহলে ভাষায় কিছু মূলধ্বনি থাকে এবং তাদের মধ্যে কোনো-কোনোটির একাধিক উচ্চারণ-বৈচিত্র্য (Variations) থাকে। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে উচ্চারণ-বৈচিত্র্যসহ প্রত্যেকটি মূলধ্বনিকে বলে স্বনিম (বা ধ্বনিতা বা ধ্বনিমান বা ধ্বনিমূল) (Phoneme)। মূলধ্বনির উচ্চারণ-বৈচিত্র্য দু'রকম হতে পারে—একটিকে বলে উপধ্বনি (বা পূরকধ্বনি বা সহধ্বনি বা বিস্বন) (Allophone), অন্যটিকে বলে মুক্ত বৈচিত্র্য বা স্বচ্ছন্দ বৈচিত্র্য (Free Variation)।

মূলধ্বনি বা স্বনিমই হল ভাষার মূল উপাদান। এই মূলধ্বনি বা স্বনিমের (Phoneme) ধারণাটি আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানেই বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশ্য এর আগে ব্রিটিশ ধ্বনিবিজ্ঞানী হেন্‌রি সুইটের (Henry Sweet) প্রশস্ত লিপ্যন্তরণের (Broad Transcription) পদ্ধতিতে মূলধ্বনির ধারণাটি প্রচ্ছন্ন আকারে ধরা পড়েছিল, কিন্তু 'Phoneme' শব্দটি তিনি ব্যবহার করেন নি। 'Phoneme' শব্দটি আবিষ্কার করেন (১৮৭৬ খ্রীঃ) ফরাসি

ভাষাতত্ত্ববিদ্ লুই আভে (Louis Havet)। কিন্তু তিনি এই শব্দটির আধুনিক অর্থ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, সাধারণভাবে বাগ্‌ধ্বনি অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তিনি। সুস্পষ্টভাবে, স্বনিমের তত্ত্ব প্রথম ব্যাখ্যা করেন পোলিশ ভাষাবিজ্ঞানী বোদুঅ্যাঁ দ্য কুর্ত্যনে (Jan Baudouin de Courtenay, ১৮৪৫—১৯২৯)। তিনিই বাগ্‌ধ্বনি (ZVUK) ও স্বনিমের (Fonema) মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে রুশীয় ভাষায় 'Fonema' শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন (১৮৯৪)। বস্তুত শব্দটি তাঁরও নিজের সৃষ্টি নয়, তাঁর একটি ছাত্র Kruszewski 'Fonema' শব্দটি প্রবর্তন করেছিলেন। মহানুভব ভাষাবিজ্ঞানী কুর্ত্যনে তাঁর ছাত্রের প্রবর্তিত শুধু এই 'Fonema' শব্দটি গ্রহণ করেছিলেন বলে ছাত্রের এই ঋণ স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি।[১৩] কুর্ত্যনের প্রয়োগের পর আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের জনক ফের্দিনাঁ দ্য সোস্যুর্ 'Phoneme' শব্দটি প্রয়োগ করেন এবং তখন থেকেই পাশ্চাত্যে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে Phoneme-এর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে আসছেন।

স্বনিমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি সবচেয়ে সহজ ও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে 'প্রাগ্'গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ভাষাবিজ্ঞানী প্রিন্স্ ত্রুবেৎস্কয়ের লেখায়। তিনি বলেছেন :

> "A *phoneme* is a phonological unit which cannot be broken down into any smaller phonological units. By *phonemic units* should be understood each member of a phonemic contrast. A phonemic contrast is any sound contrast which, in the language in question, can be used as a means of differentiating intellectual meaning."[১৪]

অর্থাৎ, যেসব ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগত এককের মধ্যে পারস্পরিক স্বনিমীয় বা মূলধ্বনিগত বিরোধ (phonemic contrast) থাকে সেই ধ্বনিগত এককগুলির প্রত্যেকটিকে ধ্বনিতা বা স্বনিম (Phoneme) বলে। এই ধ্বনিতাগত বা

১৩। "The formulation of the theory was his, though he stated more than once that the word *fonema* was the invention of a student of his named Kruszewski."—Vide : Jones, D. : "The History and Meaning of the term 'Phoneme'," in *Phonology,* ed. by Fudge, Erik C., Penguin ed., 1973, p. 18.

১৪। Trubetzkoy, N. S. ; *Anleitung zu phonologischen Beschreibungen,* 1935, Section I, (trans, From German).

স্বনিমীয় বিরোধটি কি? যখন দু'টি শব্দের মধ্যে অন্যান্য ধ্বনির ক্ষেত্রে হুবহু মিল থাকে, তাদের মধ্যে কেবল একটি শব্দের একটিমাত্র ধ্বনির সঙ্গে অন্য শব্দটির একটিমাত্র ধ্বনির এমন পার্থক্য থাকে যে তার ফলে কোনো নির্দিষ্ট ভাষায় শব্দ দু'টির অর্থ পৃথক হয়ে যায়, তখন সেই ধ্বনি দু'টিতে মূলধ্বনিগত বা স্বনিমীয় বিরোধ (phonemic Contrast) আছে, বলা হয়। যেমন 'কাল' শব্দের 'ক্' এবং 'খাল' শব্দের 'খ্'-এর মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যের জন্যেই শব্দ দু'টি পৃথক্ হয়ে গেছে, তাদের অর্থও পৃথক্ হয়ে গেছে। 'ক্' ও 'খ্' ছাড়া শব্দ দু'টিতে আর কোনো ধ্বনির ক্ষেত্রে পার্থক্য নেই। 'ক্' ও 'খ্'-কে বাদ দিলে শব্দ দু'টিতে যে অবশিষ্ট ধ্বনি থাকে তা হুবহু এক। যেমন–

কাল = ক্ + আ + ল্ = [ক্] + [আ + ল্]
খাল = খ্ + আ + ল্ = [খ্] + [আ + ল্]

↑ পার্থক্য ↑ সাদৃশ্য

তাহলে 'ক্' ও 'খ্'–এর জন্যেই শব্দদু'টির মধ্যে অর্থের পার্থক্য হচ্ছে। এরকম যেসব ন্যূনতম ধ্বনির পার্থক্যের জন্যে একাধিক শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্য হয় সেই ধ্বনিগুলিকে স্বনিম বা মূলধ্বনি (Phoneme) বলে। যেমন উপরের উদাহরণে বাংলায় /ক্/ ও /খ্/ হল দু'টি স্বনিম বা মূলধ্বনি। মূলত এই সহজ কথাটিই গ্লীসন্ অনেক জটিল করে বলেছেন :

> "The **phoneme** is the minimum feature if the expression system of a spoken language by which one thing that may be said is distinguished from any other thing which might have been said. We will find that *bill* and *pill* differ in only one phoneme. They are therefore a **minimal pair.**"[১৫]

আসল কথা, স্বনিম হল একাধিক শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্য সৃষ্টিকারী ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগত একক। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, এইরকম একটি একক সবসময় একটিমাত্র ধ্বনি নিয়ে গঠিত হবে বা এইরকম একটি এককের সর্বদা হুবহু একই রকম উচ্চারণ হবে। এইরকম এক-একটি স্বনিমীয় এককের একাধিক

১৫। Gleason, H. A., Jr, : *An Introduction to Descriptive Linguistics,* Oxford and IBH Publishing Co., 1968, p. 16.

উচ্চারণ-বৈচিত্র্য শোনা যেতে পারে। এই উচ্চারণ-বৈচিত্র্যগুলি পৃথক্ ধ্বনি হলেও অনেক সময় এইরকম প্রায়-সমোচ্চারিত একাধিক ধ্বনিকে একটিমাত্র মূলধ্বনিগত এককের মধ্যেই ধরা হয় অর্থাৎ এই রকমের একাধিক ধ্বনি নিয়ে গঠিত একটি একককে একটিমাত্র স্বনিম বা মূলধ্বনিরূপে গণ্য করা হয়। এইজন্যে একটি স্বনিমকে একটিমাত্র ধ্বনি না বলে ধ্বনিগুচ্ছ, 'Class of sounds' (Gleason) বা 'Class of phonetically similar sounds' (Bloch and Trager) বা 'Family of sounds' (Jones) বলা হয়। যেমন—'শ্লীল' শব্দে তালব্য 'শ্'-এর উচ্চারণ যে দন্ত্য 'স্' [s] এবং 'শীল' শব্দে 'শ্'-এর উচ্চারণ যে তালব্য 'শ্' [ʃ]—এই দু'টোকে নিয়ে বাংলায় মূলধ্বনি বা স্বনিম একটাই—'শ্'। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, এই মূলধ্বনি বা স্বনিমের দু'টো উচ্চারণ-বৈচিত্র্য—কখনো দন্ত্য স্ [s], কখনো তালব্য শ্ [ʃ]। কিন্তু দু'টো মিলিয়ে স্বনিম একটাই—'শ' / ʃ /।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে : দু'টি প্রায়-সমোচ্চারিত ধ্বনিকে কখন একই স্বনিমের অন্তর্গত ধরা হবে, এবং কখনই বা দু'টিকে সম্পূর্ণ পৃথক্ স্বনিম ধরা হবে? যেমন—তালব্য 'শ্' [ʃ] ও দন্ত্য 'স্' [s]-কে কি একটাই স্বনিমের অন্তর্গত ধরা হবে, নাকি ঐ দু'টিকে দু'টি পৃথক্ স্বনিম বলা হবে? দু'টি ধ্বনিকে কখন পৃথক্ স্বনিম ধরা হবে তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি এবং বলেছি যে, যখন তাদের মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ থাকবে অর্থাৎ তারা যে শব্দের মধ্যে আছে সেই দু'টি শব্দের মধ্যে যখন সম্পূর্ণ মিল থাকবে, শুধু সেই দু'টি ধ্বনির পার্থক্য থাকবে এবং শুধু তাদের পার্থক্যের জন্যেই শব্দ দু'টির মধ্যে অর্থের পার্থক্য হবে, তখন ধ্বনি দু'টিকে পৃথক মূলধ্বনি বা স্বনিম ধরা হবে। কিন্তু কখন দুটি ধ্বনিকে পৃথক স্বনিম রূপে গ্রহণ না করে একই স্বনিমের দুটি উচ্চারণ-বৈচিত্র্যরূপে গ্রহণ করা হবে সেই প্রশ্নের সমাধান দিয়ে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী এইচ্. এ. গ্লীসন্ (H. A. Gleason, Jr.) স্বনিমের একটি সংজ্ঞা রচনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন :

> "A **phoneme** is a class of sounds which : (1) are phonetically similar and (2) show certain characteristic patterns of distribution in the language or dialect under consideration. Note that this definition is restricted in its application to a single language or dialect"[১৬]

১৬। Gleason, H. A., Jr. : *An Introduction to Descriptive Linguistics,* Oxford and IBH Publishing Co., 1968, p. 261

অর্থাৎ দু'টি ধ্বনি যদি উচ্চারণের দিক থেকে প্রায় একই রকম (phonetically similar) হয় এবং তাদের প্রত্যেকের অবস্থান (distribution) সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সর্ত থাকে, যদি একটির জায়গায় অন্যটি বসতে না পারে, তবে সেই ধ্বনি দু'টিকে একই স্বনিমের অন্তর্গত ধরা হবে, সেই ধ্বনি দু'টি বিবেচিত হবে একই মূলধ্বনির দু'টি উপধ্বনি বা একই স্বনিমের দু'টি উচ্চারণ-বৈচিত্র্যরূপে। যেমন, আদর্শ চলিত বাংলায় (Standard Colloquial Bengali) লিখিত বানানের দিকে নজর না দিয়ে আমরা যদি বাস্তব উচ্চারণের দিকে কান দিই, তাহলে দেখা যাবে বাংলায় তালব্য 'শ্' [ʃ] ও দন্ত্য 'স্' [s] হল এই রকম প্রায়-সমোচ্চারিত ধ্বনি এবং খাঁটি বাংলা উচ্চারণে এদের অবস্থানের সুনির্দিষ্ট সর্ত আছে। 'শ্' যখন ত্, থ্, ন্, র্, ল্ প্রভৃতি দন্ত্য বা দন্তমূলীয় ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের প্রথমাংশ রূপে উচ্চারিত হয় তখন দন্ত্য 'স্' [s] রূপে উচ্চারিত হয়, এমন কি বানানে 'শ' লেখা থাকলেও দন্ত্য 'স্' [s] রূপেই উচ্চারিত হয়। যেমন 'শ্রী' শব্দে 'শ্'-এর উচ্চারণ বাংলায় 'স্রী' [sri]। আর অন্য ক্ষেত্রে 'শ্' তালব্য 'শ্' [ʃ] রূপেই উচ্চারিত হয়, এমন কি বানানে দন্ত্য 'স্' থাকলেও 'শ্' রূপেই উচ্চারিত হয়। যেমন বাংলায় 'সব' (all) শব্দের উচ্চারণ 'শব' শব্দেরই মতো। তাহলে বাংলায় তালব্য শ্ [ʃ] ও দন্ত্য স্ [s]-এর উচ্চারণের সুনির্দিষ্ট সর্ত আছে। একটির জায়গায় অন্যটি উচ্চারিত হয় না, জোর করে উচ্চারণ করলে বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। বাংলায় 'শ্রী' শব্দে আমরা যদি সংস্কৃতের মতো তালব্য শ্ [ʃ] উচ্চারণ করি তাহলে খাঁটি বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতি ক্ষুণ্ণ হবে। তাই বাংলায় 'শ' [ʃ] ও 'স্' [s] একই স্বনিমের দু'টি উচ্চারণ-বৈচিত্র্য। এখানে একই স্বনিমের দু'টি বৈচিত্র্য শ্ [ʃ] ও স্ [s]-কে নিয়ে একটি স্বনিম শ [ʃ] গঠিত। এই দু'টি উচ্চারণ-বৈচিত্র্যের মধ্যে কোন্‌টার নামে স্বনিমটার নাম হবে? অধ্যাপক জোন্‌স বলেছেন সাধারণত যেটা ভাষায় বেশি প্রচলিত ('generally the most frequently used member'[১৭]) সেটার নামেই স্বনিমটির নাম হবে। যেমন বাংলায় 'শ্' ও 'স্' মিলিয়ে একটাই স্বনিম, কিন্তু এটা পরিচিত হবে 'শ্' [ʃ] নামেই ; কারণ 'শ্' [ʃ]-ই বাংলায় বেশি উচ্চারিত হয়।

এখানে দেখা গেল যে, খাঁটি বাংলায় তালব্য 'শ্' [ʃ] ও দন্ত্য 'স্' [s] দু'টি স্বতন্ত্র স্বনিম নয়, একই স্বনিমের অন্তর্গত দু'টি উচ্চারণ-বৈচিত্র্য। কারণ, এই

১৭। Jones, Prof. Daniel : *An Outline of English Phonetics*, Cambridge, 1969. p. 49

প্রায়-সমোচ্চারিত ধ্বনি দু'টির অবস্থান বাংলা ভাষায় সর্তাধীন, একটির জায়গায় অন্যটি বসতে পারে না, অর্থাৎ একটির জায়গায় অন্যটি উচ্চারিত হতে পারে না। কিন্তু অন্য যেসব ভাষায় এই দুই ধ্বনির অবস্থান সম্পর্কে এরকম সর্ত নেই, সেই সব ভাষায় ধ্বনি দু'টি যদি স্বনিমীয় বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে, তবে ধ্বনি দু'টি সেইসব ভাষায় একই স্বনিমের দু'টি উচ্চারণ-বৈচিত্র্য রূপে বিবেচিত হবে না, সেখানে তারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বনিমের মর্যাদা পাবে। এই জন্যে সংস্কৃত, ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় তালব্য 'শ্' [ʃ] ও দন্ত্য 'স্' [s] হল দু'টি স্বতন্ত্র স্বনিম। যেমন—

ইংরেজি : / ʃɔːt / short = ছোট
/ sɔːt / sort = রকম, ধরন
জার্মান : / viʃən / wischen = মোছা, মুছিয়ে দেওয়া
/ visən / wissen = জ্ঞান, জানা
ফরাসি : / ʃã / chant = গান, champ = মাঠ
/ sã / sang = রক্ত, বংশগতি
সংস্কৃত : / ʃʌmʌ / শম = মনঃসংযম, শান্তি, নিবৃত্তি
/ Sʌmʌ / সম = সমান, তুল্য, সদৃশ।

তাহলে, এরকম হতেই পারে যে, যে দুটি ধ্বনি একটি ভাষায় একই স্বনিমের অন্তর্গত দু'টি উচ্চারণ-বৈচিত্র্য, সেই দু'টি ধ্বনিই অন্য ভাষায় আবার দু'টি স্বতন্ত্র স্বনিম। কারণ ধ্বনির অবস্থান সম্পর্কে প্রত্যেক ভাষার নিয়ম সেই ভাষারই নিজস্ব বিধি। যেমন আমরা দেখেছি তালব্য 'শ্' ও দন্ত্য 'স্'-এর অবস্থান সম্পর্কে বাংলা ভাষার যে সর্ত তা বাংলাতেই প্রযোজ্য, তা সংস্কৃত, ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি ভাষায় প্রযোজ্য নয়।

স্বনিম বিশ্লেষণের রীতি-পদ্ধতি (Method of Phonemic Analysis) : ভাষায় আমরা নানা বিচিত্র ধ্বনি উচ্চারণ করি। কিন্তু এইসব বহু বিচিত্র ধ্বনির মধ্যে কোন্ ধ্বনিটি একটি ভাষায় তাৎপর্যপূর্ণ (significant) মূলধ্বনি বা স্বনিম (phoneme), আর কোন্ ধ্বনিটি মূলধ্বনির শুধু উচ্চারণ-বৈচিত্র্য, তা বিশ্লেষণ করার বিশেষ পদ্ধতি আছে। ভাষার বর্ণমালা থেকে বা লিখিত বানান থেকে ভাষার মূলধ্বনি ও তার উচ্চারণ-বৈচিত্র্য সর্বদা নির্ণয় করা যায় না। ধ্বনি হল কথ্য ভাষার উপাদান ; বর্ণমালা যদিও কথ্য ভাষার এই ধ্বনিগুলিকেই লিখিত রূপ দেবার জন্যে গড়ে উঠেছিল, তবু কালক্রমে ভাষার ধ্বনি ও বর্ণমালার মধ্যে ব্যবধান গড়ে উঠে। যেমন বাংলায় মূর্ধন্য 'ণ' ধ্বনির স্বতন্ত্র উচ্চারণ নেই, অথচ

বর্ণমালায় এই বর্ণটি আছে। আবার অন্য দিকে বাংলায় 'অ্যা' ধ্বনির উচ্চারণ আছে (যেমন এখন = অ্যাখন), কিন্তু এই ধ্বনিটি লিখে ফেলার জন্যে কোনো স্বতন্ত্র বর্ণ বাংলায় নেই। তাই আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার প্রচলিত বর্ণমালার উপর নির্ভর না করে জীবন্ত কথ্য ভাষা শুনে তা থেকে সেই ভাষার তাৎপর্যপূর্ণ মূলধ্বনি বা স্বনিম নির্ণয় করেন এবং তার উচ্চারণ-বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করে থাকেন। স্বনিম বিশ্লেষণের পদ্ধতি সংক্ষেপে এই রকম :

আগে স্বনিমের সংজ্ঞা সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে, স্বনিম বিশ্লেষণের দু'টি দিক আছে। একটি ইতিমূলক দিক, অন্যটি নেতিমূলক। ইতিমূলক দিকে ভাষায় উচ্চারিত কোন্ কোন্ ধ্বনি স্বনিম তা নির্ণয় করা হয়। নেতিমূলক দিকে দেখা হয় কোন্ কোন্ ধ্বনি স্বনিম নয়, শুধুই স্বনিমের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য।

প্রথমে জীবন্ত কথ্য ভাষা থেকে শোনা ধ্বনিগুলিকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার (IPA) সাহায্যে লিখে আনা হয় অথবা আগে 'টেপ'-এ তুলে পরে সেই টেপ বাজিয়ে তা থেকে শোনা ধ্বনিগুলিকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার সাহায্যে লিখে তালিকাবদ্ধ করা হয়। তারপরে তার ইতিমূলক ও নেতিমূলক দিক পরীক্ষা করা হয়। কোনো দু'টি বা ততোধিক ধ্বনিকে স্বতন্ত্র স্বনিম প্রমাণ করতে হলে দু'টি সর্ত পূরণ করা হয়েছে কিনা তা দেখা দরকার :

প্রথমত, ধ্বনি দু'টি সত্যি-সত্যি পৃথক্ ধ্বনি কিনা অর্থাৎ ধ্বনি দু'টির উচ্চারণ কানে পৃথক্ শোনাচ্ছে কিনা সেইটা সকলের আগে লক্ষ্য করে দেখা হয়। এক্ষেত্রে শুধু প্রচলিত বানানে পৃথক্ হলে কোনো দু'টি ধ্বনিকে পৃথক্ স্বনিম বলা যায় না। যেমন খাঁটি বাংলা উচ্চারণে 'শব' (dead body) ও 'সব' (all) শব্দের যথাক্রমে 'শ্' ও 'স্' বানানে পৃথক্ হলেও, যে বাঙালি সংস্কৃত জানে না তার খাঁটি বাংলা উচ্চারণে এই দু'টি ধ্বনি পৃথক্ নয়। বাঙালিরা এই দু'টি শব্দ একই রকম উচ্চারণ করে। সুতরাং এখানে 'শ্' ও 'স্' পৃথক্ স্বনিম হবার প্রথম সর্তটি পূরণ করছে না। কিন্তু 'কাল' ও 'খাল্' শব্দের 'ক্' ও 'খ্'-এর উচ্চারণ পৃথক্, সুতরাং স্বনিম হবার প্রথম সর্তটি এরা পূরণ করছে।

দ্বিতীয়ত দেখা হয়, যে দু'টি ধ্বনি প্রথম সর্তটি পূরণ করে সেই দু'টি ধ্বনি কোনো ন্যূনতম শব্দজোড়ের (Minimal Pair) মধ্যে অর্থ-পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে কিনা। যখন তা পারে তখনই তাদের স্বতন্ত্র স্বনিমের মর্যাদা দেওয়া হয়। যখন দু'টি শব্দ যথাসাধ্য ছোট শব্দ হয় এবং তাদের মধ্যে সব দিক দিয়ে মিল

থাকে, শুধু প্রত্যেক শব্দের একটি করে ধ্বনির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে এবং শব্দ দু'টির অর্থ পৃথক্ হয়, তখন সেই শব্দ দু'টিকে **ন্যূনতম শব্দজোড়** বা স্বল্পপ্রভেদক শব্দযুগ্ম (Minimal Pair) বলে। যেমন, আমরা দেখেছি 'কাল' ও 'খাল' দু'টি শব্দেই 'আ' ও 'ল্' ধ্বনি আছে। কিন্তু পার্থক্য শুধু প্রত্যেক শব্দের একটি করে ধ্বনির ক্ষেত্রে—প্রথম শব্দের 'ক্' ও দ্বিতীয় শব্দের 'খ্' ধ্বনির ক্ষেত্রে। এরকম শব্দজোড়কেই ন্যূনতম শব্দজোড় বলে। এখানে যে একটি করে ধ্বনির ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়ে গেছে, বুঝতে হবে সেই ধ্বনির জন্যেই শব্দ দু'টি পৃথক্, তাদের অর্থও পৃথক্। এই রকম অর্থ-নিয়ন্ত্রণকারী ধ্বনিকেই মূলধ্বনি, স্বনিম বা ধ্বনিতা (Phoneme) রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। উপরের উদাহরণে 'ক্' ও 'খ্' হল স্বতন্ত্র স্বনিম এবং 'কাল' ও 'খাল' হল ন্যূনতম শব্দজোড় (Minimal Pair)। যখন এরকম একসঙ্গে দু'য়েরও বেশি শব্দে সব ধ্বনির মধ্যে মিল থাকে, প্রত্যেক শব্দের মাত্র একটি করে ধ্বনির পার্থক্য থাকে এবং তাতে সেই শব্দগুলির পৃথক্ ধ্বনিসমূহের স্বতন্ত্র স্বনিমীয় সত্তা প্রমাণিত হয় তখন সেই দুয়ের অধিক শব্দকে একত্রে প্রলম্বিত ন্যূনতম শব্দজোড় (Chained Minimal Pair) বলে। যেমন—কাল, খাল, গাল একসঙ্গে প্রলম্বিত ন্যূনতম শব্দজোড়।

স্বনিমের ইতিমূলক বিশ্লেষণে কতকগুলি সতর্কতার সূত্র মনে রাখা দরকার। যেমন—

(ক) উপর্যুক্ত দু'টি সর্ত পূরণ করে দু'টি ধ্বনি যদি কোনো ভাষায় স্বতন্ত্র স্বনিমের মর্যাদা পায় তবে সেই ধ্বনি দু'টি সেই বিশেষ ভাষারই স্বনিম বলে বিবেচিত হবে। একটি ভাষায় যেসব ধ্বনি স্বতন্ত্র স্বনিমরূপে স্বীকৃতি পাবে, সেইসব ধ্বনি অন্য ভাষায় স্বতন্ত্র স্বনিম নাও হতে পারে। কোনো ভাষার স্বনিম-সম্পদ (phonemic stock) তার নিজস্ব ধ্বনিবিধির উপরে নির্ভর করে। যেমন—আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, সংস্কৃত, ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষায় তালব্য 'শ্' [ʃ] ও দন্ত্য 'স্' [s] পৃথক স্বনিম হবার জন্যে পূর্বোক্ত দু'টি সর্তই পূরণ করে, কিন্তু বাংলা ভাষায় এরা প্রথম সর্তটিই পূরণ করে না। তাই সংস্কৃত, ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষায় এরা স্বতন্ত্র স্বনিম ; কিন্তু বাংলায় এরা স্বতন্ত্র স্বনিম নয়, একই স্বনিমের দু'টি উপধ্বনি। এখন বাংলা ভাষার ধ্বনি-বিধি অনুসারে আমরা সংস্কৃত, ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষার তালব্য 'শ্' [ʃ] ও দন্ত্য 'স্' [s]-কে যদি স্বতন্ত্র স্বনিম রূপে স্বীকার না করে

একই স্বনিমের দু'টি উপধ্বনি মনে করি তা হলে ভুল হবে। এই ধরনের ভুলকে ঊন-পৃথকীকরণ (Under-differentiation) বলে।

(খ) যে ধ্বনি দু'টিকে আমরা স্বতন্ত্র স্বনিম রূপে প্রমাণ করতে চাই, আগেই দেখতে হবে তারা প্রথম সর্তটি পূরণ করছে কিনা। সেটি পূরণ করলে তবেই দ্বিতীয় সর্তটি পূরণ করছে কিনা তা বিচারের প্রয়োজন আছে। প্রথম সর্তটি পূরণ না করলে সেই তথাকথিত ধ্বনি দু'টিকে গোড়াতেই স্বতন্ত্র স্বনিমের তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। যেমন, বাংলায় 'শব' ও 'সব' শুধু আপাতদৃষ্টিতেই ন্যূনতম শব্দজোড় ; মনে হতে পারে 'শ্' ও 'স্' হল পৃথক্ স্বনিম। কিন্তু এখানে গোড়াতেই ভুল হয়েছে। প্রথম সর্তটিই পূরণ হয় নি, কারণ 'শব' ও 'সব' শব্দের 'শ্' ও 'স্'-এর উচ্চারণ খাঁটি বাংলায় পৃথক্ নয়। খাঁটি বাংলায় তালব্য 'শ্' ও দন্ত্য 'স্' পৃথক স্বনিম নয়। কিন্তু সংস্কৃত, ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষায় তালব্য 'শ্' [ʃ] ও দন্ত্য [s] স্বনিম হওয়ার দু'টি সর্তই পূরণ করে বলে এরা পৃথক্ স্বনিম। এখন সংস্কৃত, ইংরেজি, জার্মান বা ফরাসি ভাষার অভ্যাস অনুসারে আমরা যদি বাংলায়ও 'শ্' ও 'স্'-কে স্বতন্ত্র স্বনিম রূপে গ্রহণ করি, তবে যে ভুল হবে তাকে অতি-পৃথকীকরণ (Over-differentiation) বলে।

(গ) ন্যূনতম শব্দজোড়ের প্রত্যেক শব্দে মাত্র একটি করে ধ্বনির ক্ষেত্রে পার্থক্য হওয়া চাই, একাধিক ধ্বনির পার্থক্য হলে সেটা সার্থক ন্যূনতম শব্দ জোড়ই হবে না. যেমন—'কাম' (ক্ + আ + ম্) ও 'খাল' (খ্ + আ + ল্) শব্দ দু'টিতে মিল আছে শুধু 'আ' -ধ্বনিতে ; পার্থক্যই বরং বেশি, পার্থক্য হয়ে গেছে দু'টি করে ধ্বনির ক্ষেত্রে—প্রথম শব্দের 'ক্' ও 'ম্'-এর সঙ্গে দ্বিতীয় শব্দের 'খ্' ও 'ল্'-এর পার্থক্য। প্রত্যেক শব্দের একের বেশি ধ্বনির ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়েছে বলে 'কাম' ও 'খাল' সার্থক ন্যূনতম শব্দজোড় নয়। দু'টি শব্দের মধ্যে একের বেশি ধ্বনির ক্ষেত্রে পার্থক্য হলে বোঝা যাবে না যে ঠিক কোন্ ধ্বনিটা তাৎপর্যপূর্ণ (significant), ঠিক কোন্ ধ্বনিটার জন্যে শব্দ দু'টি পৃথক্। যেমন, একটি ঘর থেকে একই সঙ্গে দু'টি লোক চলে গেল এবং দেখা গেল একটি কলম চুরি গেছে। এক্ষেত্রে বোঝা যাবে না কলম চুরির জন্যে ঠিক কোন্ লোকটি দায়ী। তেমনি 'কাম' ও 'খাল' শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্য হল, কিন্তু বোঝা গেল না ঠিক কোন্ ধ্বনিটা তার জন্যে দায়ী। কারণ শব্দ দু'টির মধ্যে দু'টি করে ধ্বনির পার্থক্য আছে। কিন্তু দু'টি শব্দের মধ্যে যদি মাত্র একটি করে ধ্বনির ক্ষেত্রে পার্থক্য হয় তবে সার্থক ন্যূনতম শব্দজোড় হবে। যেমন—'কাল' ও 'খাল' শব্দে বোঝা যাচ্ছে 'ক্' ও 'খ' ধ্বনির যে পার্থক্য সেই পার্থক্যের জন্যেই

শব্দ দু'টির মধ্যে অর্থের পার্থক্য।

(ঘ) ন্যূনতম শব্দজোড়ের শব্দ দু'টি যে-কোনো একটি ভাষারই নিজস্ব শব্দ হওয়া চাই। একটি ভাষার নিজস্ব শব্দের সঙ্গে অন্য ভাষার শব্দের শব্দজোড় হয় না। যেমন বাংলা 'কান' শব্দের সঙ্গে ইংরেজি 'ফান' (fun) শব্দের শব্দজোড় হয় না। তবে বিদেশি শব্দ যদি কোনো ভাষায় গৃহীত ও বহু-প্রচলিত শব্দ হয়, তবে সেটাকে নিজস্ব শব্দই মনে করতে হবে। যেমন বাংলায় 'রেডিও', 'স্কুল', 'সাইকেল' প্রভৃতি শব্দ। এগুলির তুলনায় বরং 'বেতার', বিদ্যালয়', 'দ্বিচক্র-যান' প্রভৃতি তথাকথিত বাংলা শব্দ নিত্যন্তই অল্প-প্রচলিত বা অপ্রচলিত।

(ঙ) ন্যূনতম শব্দজোড় কোনো ভাষার বহু-সংখ্যক লোকের অবিমিশ্র খাঁটি দেশীয় উচ্চারণ (native pronunciation) থেকে গ্রহণ করা উচিত। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকেরা অনেক সময় বৈদগ্ধ্য প্রদর্শনের জন্যে বিদেশি শব্দের বিশুদ্ধ বিদেশি উচ্চারণ বজায় রাখেন, এতে ভাষার বৃহত্তর জনসাধারণের উচ্চারণ-প্রবণতা ধরা পড়ে না। যেমন—শিক্ষিত ব্যক্তি, 'শোল' (শোল মাছ) ও 'সোল' (জুতার সোল) শব্দে যথাক্রমে তালব্য 'শ্' ও দন্ত্য 'স্'-এর পৃথক্ উচ্চারণ করলেও এই শব্দ দু'টিকে খাঁটি বাংলার শব্দজোড় রূপে গ্রহণ করে তা থেকে বাংলায় তালব্য 'শ্' ও দন্ত্য 'স্'-কে পৃথক্ স্বনিম প্রমাণ করা যায় না। বাংলার যেসব অঞ্চলে বিদেশি প্রভাব বিশেষ পড়ে নি, সেখানে সাধারণ অশিক্ষিত বৃহত্তর জনসাধারণ ঐ শব্দ দু'টি একই রকম উচ্চারণ করে। তবে আমরা যদি বিশেষ শ্রেণীরই বা বিশেষ অঞ্চলেরই ভাষার স্বনিম নির্ণয় করতে চাই তাহলে অবশ্য সেই শ্রেণীর বা সেই অঞ্চলের ভাষার উচ্চারণ থেকেই ন্যূনতম শব্দজোড় সংগ্রহ করতে হবে। আর একটি কথা, জাতির উচ্চারণও পরিবর্তনশীল এবং আপেক্ষিক। সুতরাং স্বনিম নির্ণয়ও পরিবর্তনশীল ও আপেক্ষিক হতে বাধ্য। যেমন এখন খাঁটি দেশীয় উচ্চারণে বাংলায় তালব্য 'শ্' ও দন্ত্য 'স্' স্বতন্ত্র স্বনিম নয়, কিন্তু পরে বাংলা ভাষার পরিবর্তন হলে এ দু'টি স্বতন্ত্র স্বনিমরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কারো কারো মতে পূর্ব বাংলায় ('বাংলা দেশে') ইতিমধ্যেই 'শ্' ও 'স্' স্বতন্ত্র স্বনিমরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

উপরে ন্যূনতম শব্দজোড়ের সাহায্যে স্বনিম নির্ণয়ের যে পদ্ধতির কথা বলা হল, সেইটাই হল সবচেয়ে প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি ; কিন্তু সেইটাই একমাত্র পদ্ধতি নয়। অনেক সময় দু'টি ধ্বনির মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ প্রতিপন্ন করার জন্যে ন্যূনতম শব্দজোড় ভাষার শব্দভাণ্ডারে পাওয়াই যায় না। অথচ শব্দজোড়ের শব্দগুলি ভাষার প্রচলিত অর্থপূর্ণ শব্দও হওয়া চাই, একটি অর্থহীন

শব্দ তৈরি করে শব্দজোড় মিলিয়ে দেওয়া যায় না। যেমন, একসঙ্গে ট্, ঠ্, ড্, ঢ্-এর মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ দেখাবার জন্যে আমরা যদি প্রলম্বিত ন্যূনতম শব্দজোড় (Chained Minimal Pair) রচনা করি,

/ ṭak / টাক – / ṭ / ট্
/ ṭ^{h}ak / ঠাক – / ṭ^h / ঠ্
/ ḍak / ডাক – / ḍ / ড্
/ ḍ^{h}ak / ঢাক – / ḍ^h / ঢ্

তাহলে এটা সার্থক ন্যূনতম শব্দজোড়েই হল না। কারণ 'ঠাক' বাংলায় প্রচলিত কোনো শব্দই নয়।[১৮] আসলে এক্ষেত্রে একসঙ্গে এই চারটি ধ্বনির মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য দেখাবার মতো প্রলম্বিত ন্যূনতম শব্দজোড় (Chained Minimal pair) বাংলায় পাওয়াই শক্ত। চারটি শব্দের প্রলম্বিত ন্যূনতম শব্দজোড় কেন, দু'টি শব্দের সাধারণ ন্যূনতম শব্দজোড়ও অনেক সময় ভাষায় পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে ন্যূনতম শব্দজোড়ের উপরে নির্ভর করে থাকলে চলে না। তখন কাছাকাছি ন্যূনতম শব্দজোড়ের উপর (Near Minimal Pair) নির্ভর করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা :

> "In the analysis of a language, the discovery of minimal pairs constitutes the most decisive way to determine what the phonemes of a language are. Often, near-minimal pairs present enough proof for phonemic status."[১৯]

যেমন—একসঙ্গে চারটি বাংলা মূর্ধন্য ধ্বনির মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ যদি দেখাতে চাই তাহলে এই রকম কাছাকাছি ন্যূনতম শব্দজোড়ের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে—

১৮। এই রকমের ভুল করেছেন চার্লস্ ফার্গুস্‌ন্ এবং মুনীর চৌধুরী। তাঁরা / ট্ ড্ ঠ্ ঢ্ / এই চারটি ধ্বনির মধ্যে একসঙ্গে স্বনিমীয় পার্থক্য দেখাবার জন্যে প্রলম্বিত ন্যূনতম শব্দজোড় উপস্থাপিত করেছেন—টালা, ডালা, ঠালা, ঢালা। ('The Phonemes of Bengali' in Language, Vol 36, Jan-March, 1960). এখানে লক্ষণীয় যে 'ঠালা' বলে বাংলায় কোনো শব্দই নেই। সুতরাং শব্দ জোড়ের মধ্যে এটি গ্রহণ করাই ভুল।

১৯। Agard Frederick B, and D iPietro, Rober J. : *The Sounds of English and Italian,* Chicago : The University of Chicago Press, 1973. Ch 2.

/ ṭɔk / টক	– / ṭ / ট্
/ ṭʰɔk / ঠক	– / ṭʰ / ঠ্
/ ḍɔk / ডক	– / ḍ / ড্
/ ḍʰɔkḍʰɔk / ঢকঢক	– / ḍʰ / ঢ্

আবার যেখানে এরকম কাছাকাছি ন্যূনতম শব্দজোড়ও পাওয়া যায় না সেখানে দেখা হয়, যে দু'টি ধ্বনিকে স্বনিম হিসাবে বিচার করতে চাই সেই ধ্বনি দু'টির অবস্থান সর্তাধীন কিনা, যদি সর্তাধীন না হয় তবে ধ্বনি দু'টিকে স্বতন্ত্র স্বনিম রূপে গ্রহণ করা যায়। বিশেষজ্ঞরা ক্ষেত্র-বিশেষে এই পদ্ধতির উপযোগিতাও স্বীকার করেছেন :

> "...even though minimal pairs are a simple and elegant device for proving that two phones stand in contrast with one another, they are by no means necessary. It is sufficient if we can show the difference between two phones is not automatically determined by the different environments in which they stand."[২০]

আগে বাংলায় 'ড্' ও 'ড়'কে দুটি স্বতন্ত্র স্বনিম বলা হত না, একই স্বনিমের দু'টি উপধ্বনি মনে করা হত। কারণ এই দু'য়ের অবস্থান সর্তাধীন ছিল, একটির স্থানে অন্যটি উচ্চারিত হতে পারত না। সর্তটা ছিল এই রকম : 'ড্' বসবে শব্দের গোড়ায় (যেমন—'ডাব' = ড্ + আ + ব্) অথবা কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির পরে (যেমন—'ঠাণ্ডা' = ঠ্ + আ + ণ্ + ড্ + আ অথবা 'বড্ড' = ব্ + অ + ড্ + ড্ + অ) ; আর 'ড়্' বসবে শব্দের শেষে (যেমন—'হাড়্ = হ্ + আ + ড়্) অথবা দু'টি স্বরধ্বনির মাঝখানে (যেমন—তাড়া = ত্ + আ + ড়্ + আ)। 'ড্'-কে কখনো শব্দের শেষে বা দু'টি স্বরধ্বনির মাঝখানে বসতে দেখা যেত না ; কারণ এটা হল 'ড়্'-এর স্থান। কিন্তু এখন বাংলায় কিছু বিদেশি শব্দ বহু-প্রচলিত হয়ে যাওয়ার ফলে এই সর্ত ভেঙে গেছে। এখন দু'টি স্বরধ্বনির মাঝখানেও 'ড্' বসতে পারে (যেমন—'সোডা' = স্ + ও্ + ড্ + আ), রেডিও' = র্ + এ + ড্ + ই + ও) ; শব্দের শেষেও 'ড্' বসতে পারে (যেমন—রড্ = র্ + আ + ড্)। 'ড্' ও 'ড়্'-এর অবস্থান এখন সর্তাধীন নয় বলে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা এ দু'টিকে একই স্বনিমের দু'টি উপধ্বনি না বলে দু'টিকেই স্বতন্ত্র স্বনিমের মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

২০। Moulton, William G. : *The Sounds of English and German*, Chicago, 1968, p. 21-22.

স্বনিম বিশ্লেষণের নেতিমূলক দিকে দেখতে হয়—কোন্ ধ্বনি কখন্ স্বনিম হতে পারে না, শুধুই স্বনিমের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য রূপে বিবেচিত হয়। স্বনিমের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য দু'রকমের হয় : মুক্ত বৈচিত্র্য (Free Variation) ও উপধ্বনি বা পূরক-ধ্বনি (Allophone)। যখন দু'টি যথাসাধ্য ছোট শব্দের মধ্যে সবদিকে, মিল থাকে, কেবল প্রত্যেক শব্দের একটি করে ধ্বনির ক্ষেত্রে শব্দ দু'টি পৃথক্ হয়, অথচ এই ধ্বনির পার্থক্যের জন্যে শব্দ দু'টির মধ্যে অর্থের পার্থক্য হয় না, তখন বুঝতে হবে, যে ধ্বনির ক্ষেত্রে পার্থক্য সেই ধ্বনি দু'টি পৃথক্ স্বনিম নয়, একই স্বনিমের মুক্ত বৈচিত্র্য (Free Variation)। যেমন 'শবদাহ করা হিন্দু সৎকার সমিতির পবিত্র কর্তব্য।' এই বাক্যে 'শব' শব্দের 'শ্'-এর স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণ হল তালব্য 'শ'-ই। এখানে বানানে আমরা যা-ই লিখি না কেন, 'শ্'-এর জায়গায় দন্ত্য 'স্' উচ্চারণ করলেও বাক্যের অর্থের পরিবর্তন হবে না। তালব্য 'শ্' স্থানে দন্ত্য 'স্' উচ্চারণ করে বক্তা যদি বাক্যটি কোনো শ্রোতাকে শোনায়, এবং শ্রোতা যদি বানান না দেখে শুধু বাক্যটি কানে শোনে, তাহলে কি সে মনে করবে যে, 'সব অর্থাৎ সব কিছু পুড়িয়ে ফেলাই হিন্দু সৎকার সমিতির পবিত্র কর্তব্য?' সে যদি বাঙালি হয় তো ঠিকই বুঝবে যে, মৃতদেহ দাহ করাই হিন্দু সৎকার সমিতির পবিত্র কর্তব্য। শ্রোতার কাছে 'শ্'-এর উচ্চারণই স্বাভাবিক, তবে সে যদি দন্ত্য 'স্' শোনে তবে তার কাছে শুধু উচ্চারণটা অস্বাভাবিক মনে হবে, কিন্তু অর্থটা পাল্টে যাবে না। এখানে তালব্য 'শ্' ও দন্ত্য 'স্' হচ্ছে একই 'শ্'—স্বনিমের দু'টি মুক্ত বৈচিত্র্য (Free Variation) ; এরকম দু'টি ধ্বনিকে পৃথক্ স্বনিম ধরা হবে না। একটি ধ্বনির একাধিক উচ্চারণ-বৈচিত্র্য যখন ব্যক্তির খেয়াল-খুশি অনুযায়ী সাধিত হয়, যখন তা ধ্বনিটার অবস্থান বা ধ্বনিটার সঙ্গে অন্য ধ্বনির সংযোগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, অর্থাৎ যখন কোনো উচ্চারণ-বৈচিত্র্য সর্তাধীন নয়, স্বাধীন, তখন সেই উচ্চারণ-বৈচিত্র্যকে মুক্ত বৈচিত্র্য (Free Variation) বলে। মুক্ত বৈচিত্র্য নানা কারণে সাধিত হয়। গ্লীসন্ উল্লেখ করেছেন একই 'Key' শব্দ যদি কেউ এক শ' বার উচ্চারণ করে তবে প্রত্যেকবারই তার উচ্চারণে k-ধ্বনির একটু-আধটু পার্থক্য হবে, সাধারণভাবে আমাদের কানে এই পার্থক্য ধরা না পড়লেও যন্ত্রের সাহায্যে তা ধরা পড়বেই। এই যে k-ধ্বনির উচ্চারণ-বৈচিত্র্য তা পাশাপাশি ধ্বনির সংযোগের জন্যে হচ্ছে না বা শব্দ-মধ্যে k ধ্বনিটির অবস্থানের উপরেও নির্ভর করছে না। কারণ প্রত্যেকবারের উচ্চারণে ধ্বনি-সংযোগ বা অবস্থান পরিবর্তিত

হচ্ছে না, একই থাকছে ; তবু k-ধ্বনিটির উচ্চারণ প্রতিবারে যে একটু-আধটু পাল্টে যাচ্ছে এটা ধ্বনি-সংযোগ বা ধ্বনি-অবস্থানের সর্তাধীন নয়, স্বাধীন। তাই একে মুক্ত বৈচিত্র্য (Free Variation) বলা হয়েছে। অন্যপক্ষে, একটি মূল ধ্বনির যে-সব উচ্চারণ-বৈচিত্র্য হয় তা যখন তার অবস্থান (distribution) দিয়ে নিয়ন্ত্রিত (controlled) হয়, কোথায় ধ্বনিটির কি রকম উচ্চারণ হবে তা যখন তার অবস্থান বা ধ্বনি-সংযোগের সর্তের অধীন হয়, বক্তার খেয়াল-খুশির উপর নির্ভর করে না, তখন তার উচ্চারণ-বৈচিত্র্যগুলিকে উপধ্বনি বা পূরক ধ্বনি (Allophone) বলে। অথবা অন্যভাবে বলা যায় : যদি দু'টি বা ততোধিক ধ্বনির অবস্থান এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যে, একটির জায়গায় অন্যটি বসতে পারে না, অথচ ধ্বনিগুলির উচ্চারণে কোনো-না-কোনো দিকে সাদৃশ্য থাকে, তবে সেই ধ্বনিগুলিকে একই মূলধ্বনি বা স্বনিমের (Phoneme) উপধ্বনি বা পূরকধ্বনি (Allophone) রূপে গ্রহণ করতে হবে। ভাষাবিজ্ঞানীরা এইভাবেই পূরকধ্বনির (Allophone) সংজ্ঞা দিয়েছেন :

> "If two or more sounds are so distributed among the forms of a language that none of them ever occurs in exactly the same position as any of the others, and if all the sounds in question are phonetically similar in the sense of sharing a feature of articulation absent from all other sounds, than they are to be classified together as allophones of the same phoneme."[২১]

এই ধরনের উচ্চারণ-বৈচিত্র্যগুলির প্রত্যেকটি তার নিজস্ব বিশিষ্ট অবস্থান বা ধ্বনি-সংযোগের দ্বারা এমনই নিয়ন্ত্রিত হয় যে একটির পরিবেশে অন্যটি বসতে পারে না, অর্থাৎ একটির জায়গায় অন্যটি উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন— আগে আমরা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছি যে, বাংলায় 'শ্রী' শব্দের বানানে তালব্য 'শ্' লেখা থাকলেও 'র্'-এর সঙ্গে সংযোগের ফলে এখানে 'শ্'-এর স্থানে দন্ত্য 'স্' উচ্চারিত হয়, কিন্তু 'শীল' শব্দে তালব্য 'শ্'-ই উচ্চারিত হয়। 'শ্রী' শব্দে তালব্য 'শ্' ও 'শীল' শব্দে দন্ত্য 'স্' উচ্চারিত হতে পারে না। জোর করে

২১। Bloch, Bernard and Trager, George L. : *Outlines of Linguistic Analysis*, New Delhi : Oriental Books Reprint Corpn., 1972, p. 42.

উচ্চারণ করলে সেটা খাঁটি বাংলা উচ্চারণই হয় না। একই মূলধ্বনির উচ্চারণ-বৈচিত্র্যগুলিকে পৃথক্ স্বনিম রূপে নয়, পৃথক্ ধ্বনি রূপে গ্রহণ করে ভাষাবিজ্ঞানী গ্লীসন্ এই কথাটি অন্যভাবে বলেছেন—একাধিক ধ্বনির মধ্যে একটি যখন অন্যটির অবস্থানে বা পরিবেশে বসতে না পারে তখন ধ্বনিগুলি পরিপূরক অবস্থানে বা প্রতিযোগী অবস্থানে (Complementary Distribution) রয়েছে বলা হয় :

> "Sounds are said to be in complementary distribution when each occurs in a fixed set of contexts in which none of the others occur."[২২]

এই পরিপূরক অবস্থানের আলোকে তিনি আবার পূরকধ্বনি (Allophone) বা উপধ্বনির সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে : যে ধ্বনি অন্য ধ্বনির সঙ্গে এমন পরিপূরক অবস্থানে থাকে যে, ধ্বনি দু'টি মিলিয়ে একটি ধ্বনিতা বা স্বনিম গঠিত হয় সেই ধ্বনি দু'টিকে **উপধ্বনি** বা **পূরকধ্বনি** (Allophone) বলে। এক-একটি স্বনিম বা ধ্বনিতা হল কখনো কখনো একাধিক উপধ্বনি বা পূরক ধ্বনির সমষ্টি। গ্লীসনের ভাষায়—

> "Any sound or subclass of sounds which is in complementary distribution with another so that the two together constitute a single phoneme is called an allophone of that phoneme. A phoneme is, therefore, a class of allophones."[২৩]

তাহলে উপধ্বনি নির্ণয়ের উপায় হল ধ্বনিসমূহের অবস্থান সর্তাধীন কিনা, ধ্বনিগুলি পরিপূরক অবস্থানে (Complementary Distribution) আছে কিনা, সেটা বিচার করা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে : এরকম বিচার আমরা করতে যাব কোন্ ধ্বনির ক্ষেত্রে? সাধারণত যেসব ধ্বনি উচ্চারণের দিক থেকে কাছাকাছি অর্থাৎ প্রায়-সমোচ্চরিত (phonetically similar), শুধু সেইসব ধ্বনি

২২। Gleason, H. A. (Jr.) : *An Introduction to Descriptive Linguistics*, Oxford & IBH Publishing Co., 1966, p. 263.

২৩। Gleason, H. A. (Jr.) : *An Introduction to Descriptive Linguistics*, Oxford and IBH Publishing Co., 1966, p. 263.

সম্পর্কে এই রকম বিচার করে দেখা হয়। উচ্চারণের দিক থেকে কাছাকাছি ধ্বনি অর্থাৎ উচ্চারণ-স্থান, উচ্চারণ-প্রকৃতি, জিহ্বার অবস্থান ইত্যাদি যে-কোনো দিক থেকে সাদৃশ্য যেসব ধ্বনির মধ্যে রয়েছে সেইগুলি একই স্বনিমের উপধ্বনি হতে পারে বলে সন্দেহ করা হয়। এই রকম ভাবে প্রায়-সমোচ্চারিত যে-সব ধ্বনিকে একই স্বনিমের উপধ্বনি বলে সন্দেহ করে শব্দমধ্যে তাদের অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে বিচার করা হয় তাদের সন্দেহভাজন জোড় (Suspicious Pair) বলা হয়। যেমন—

'শ্' ও 'স্'-কে একটি সন্দেহভাজন জোড় মনে করা হয়। কারণ এদের মধ্যে উচ্চারণ-প্রকৃতির দিক থেকে সাদৃশ্য আছে : দু'টিই উষ্মধ্বনি, দু'টিই শিস্ ধ্বনি। তেমনি 'ক্' ও 'খ্' একটি সন্দেহভাজন জোড়। কারণ দু'টির মধ্যে উচ্চারণ-স্থানের সাদৃশ্য আছে : দু'টিই স্নিগ্ধ-তালু থেকে উচ্চারিত। তবে সন্দেহভাজন জোড়ের ধ্বনিগুলি সব ভাষায় উপধ্বনি হবেই, এমন নয়। পরীক্ষার পরে এমনও প্রমাণিত হতে পারে যে, ধ্বনি দু'টি কোনো ভাষায় একই স্বনিমের দু'টি উপধ্বনি নয়, পৃথক স্বনিম। পরীক্ষার আগে পর্যন্ত যে দু'টি প্রায়-সমোচ্চারিত ধ্বনিকে আমরা উপধ্বনি সন্দেহ করে পরীক্ষায় অগ্রসর হই, তারাই সন্দেহভাজন জোড় বলে সাময়িকভাবে গৃহীত হয়। ভাষাবিজ্ঞানী গ্লীসন্ (Gleason) এরকম সম্ভাব্য সন্দেহভাজন জোড়ের একটি তালিকা রচনা করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে প্রায়-সমোচ্চারিত ধ্বনি এত রকমের হতে পারে যে, এরকম কোনো তালিকাই পূর্ণাঙ্গ বা চরম হতে পারে না।

যাই হোক, প্রায়-সমোচ্চারিত যে দু'টি ধ্বনি নিয়ে সন্দেহভাজন জোড় গঠিত হয়, সেই ধ্বনিগুলি যখন স্বনিম (Phoneme) হবার পূর্ব-কথিত সর্ত দু'টি পূরণ করে তখন তাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র স্বনিমের মর্যাদা দেওয়া হয়। যখন তারা সর্ত দুটি পূরণ করে না তখন দেখতে হয় তারা পরিপূরক অবস্থানে (Complementary Distribution) আছে কিনা ; যদি পরিপূরক অবস্থানে থাকে তখন তাদের একই স্বনিমের দু'টি উপধ্বনি (Allophones) ধরা হয়। আর যখন প্রায়-সমোচ্চারিত ধ্বনি দু'টি স্বনিম হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় সর্ত দু'টি পূরণ করে না, পরিপূরক অবস্থানেও থাকে না, একটির স্থানে অন্যটি বক্তার খেয়াল-খুশি অনুসারে উচ্চারিত হয়, তখন তাদের একই স্বনিমের মুক্ত বৈচিত্র্য (Free Variation) রূপে গ্রহণ করা হয়।

॥ ১৩ ॥

বাংলা ভাষার বিভাজ্য স্বনিম

(Segmental Phonemes of Bengali)

ধ্বনির দু'টি প্রধান বিভাগ হল—বিভাজ্য ধ্বনি (Segmental Sound) ও অবিভাজ্য ধ্বনি (Supra-segmental Sound)। এই দ্বিবিধ ধ্বনির মধ্যে ভাষাবিশেষে যেগুলি হল শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ মূলধ্বনি সেগুলিকে সেই ভাষার স্বনিম বা ধ্বনিতা (Phoneme) বলে। সুতরাং স্বনিমও দু'ভাগে বিভক্ত হতে পারে : বিভাজ্য স্বনিম (Segmental Phoneme) ও অবিভাজ্য স্বনিম (Supra-segmental Phoneme)। এই অধ্যায়ে আমরা বাংলা ভাষার বিভাজ্য স্বনিমগুলি নির্ণয় করে সেগুলির বিভিন্ন দিক পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে আলোচনা করব। এবং তারপরে আমরা বাংলা ভাষার অবিভাজ্য স্বনিম সম্পর্কে আলোচনা করব।

কোনো ভাষার স্বনিম নির্ণয়ের প্রধান কৌশল হল ন্যূনতম শব্দজোড়ের (Minimal Pair) শব্দ-দু'টির মধ্যে অর্থের পার্থক্য সৃষ্টিকারী ধ্বনিগুলিকে বেছে বের করা। এই ধ্বনিগুলিই হল আলোচ্য ভাষার স্বনিম। কিন্তু এক্ষেত্রে দু'টি সীমা মেনে নিয়ে চলা হয়। প্রথমত, একটি ভাষার প্রত্যেক ধ্বনির সঙ্গে সেই ভাষার অন্য সব ধ্বনির স্বনিমীয় বিরোধ ঐরকমভাবে ন্যূনতম শব্দজোড়ের সাহায্যে প্রমাণ করার জন্যে সুবিস্তৃত স্থান ও অবকাশ প্রয়োজন বলে সাধারণত তা করা হয় না। যে ধ্বনিগুলি আদৌ সমোচ্চারিত নয়, যেগুলির মধ্যে উচ্চারণে কোনো দিক থেকে কোনো সাধর্ম্য নেই, সেগুলিকে একই স্বনিমের উপধ্বনি না বলে সেই ধ্বনিগুলিকে বিনা প্রমাণে পৃথক্ স্বনিমরূপে মোটামুটিভাবে ধরেই নেওয়া হয়। শুধু যেসব ধ্বনি প্রায়-সমোচ্চারিত অর্থাৎ যাদের উচ্চারণ কোনো-না-কোনো দিক থেকে প্রায় একই রকম সেগুলিকে সন্দেহভাজন জোড়রূপে (Suspicious Pair) গ্রহণ করে শুধু সেই ধ্বনিগুলিকেই ন্যূনতম শব্দজোড়ে ফেলে তাদের মধ্যে অর্থ-পার্থক্য (phonemic contrast) সৃষ্টির ক্ষমতা যাচাই করা হয়। আর যেসব ক্ষেত্রে ন্যূনতম শব্দজোড় পাওয়া যায় না সেসব ক্ষেত্রে কাছাকাছি শব্দজোড় দিয়ে বিচার করা হয়। অথবা সাধারণত শুধু এইটুকু দেখা হয় যে, ধ্বনি দু'টি পরিপূরক অবস্থানে আছে কিনা, তাদের অবস্থান সর্তাধীন কিনা।

দ্বিতীয়ত, শব্দের মধ্যে ধ্বনির তিন রকম অবস্থান (distribution) হতে

পারে : আদি (initial), মধ্য (medial) ও অন্ত্য (final)। দু'টি ধ্বনির মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ ধ্বনির তিন রকম অবস্থানেই বিচার করে দেখানোর চেষ্টা করা যায়। যেমন—

আদি	মধ্য	অন্ত্য	নির্ণীত স্বনিম
/kal/ কাল	/paka/ পাকা	/muk/মূক /মুক/	/k/ ক্
/k^hal/ খাল	/pak^ha/ পাখা	/muk^h/ মুখ	/k^h/ খ্

ধ্বনির অবস্থান নির্দেশের জন্যে এরকম আলোচনার উপযোগিতা আছে বটে, কিন্তু শুধু স্বনিম নির্ণয়ের জন্যে তিনটি অবস্থানেই স্বনিমীয় বিরোধ খোঁজার অপরিহার্যতা নেই। কারণ তিনটি অবস্থানেই স্বনিমীয় বিরোধ না থাকলেও মাত্র একটি বা দু'টি অবস্থানে স্বনিমীয় বিরোধ থাকলেই দু'টি ধ্বনি স্বনিমের মর্যাদা পেতে পারে। কোনো কোনো ধ্বনি তো সব অবস্থানে বসেই না। যেমন—বাংলা, ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় 'ঙ্' /ŋ/ শব্দের আদিতে বসে না। শব্দের আদিতে 'ঙ্' /ŋ/ ধ্বনির সঙ্গে অন্য ধ্বনির স্বনিমীয় বিরোধ খোঁজা অর্থহীন। তেমনি ইংরেজি ভাষায় শব্দের অন্তে হ্ /h/, জার্মান ভাষায় শব্দের আদিতে স্ /s/, ফরাসি ভাষায় শব্দের আদিতে ঞ /ɲ/ বসে না। তাই এই সব অবস্থানে এই সব ধ্বনির সঙ্গে অন্য ধ্বনির স্বনিমীয় বিরোধ পাওয়াই যাবে না। আবার, দু'টি ধ্বনির মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ কোনো এক বা দু'টি অবস্থানে থাকতে পারে, তৃতীয় অবস্থানে সেই বিরোধ নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে—যাকে স্বনিমীয় বিরোধের নিষ্ক্রিয় হওয়া (Neutralization) বলে। যেমন জার্মান ভাষায় সঘোষ ও অঘোষ ব্যঞ্জনের বিরোধ শব্দের অন্তে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, কারণ শব্দের অন্তে বানানে সঘোষ ব্যঞ্জন লেখা থাকলেও উচ্চারণে সেটা অঘোষ হয়ে যায়। যেমন—জার্মান ভাষায় lieb (= প্রিয়) শব্দের b আছে শব্দের অন্তে, তাই এর উচ্চারণ হবে [p]। অর্থাৎ ঘোষধ্বনি অঘোষ উচ্চারিত হবে।

সুতরাং শব্দের মধ্যে একটি বা দুটি অবস্থানে স্বনিমীয় বিরোধ প্রতিপন্ন হলেই দু'টি ধ্বনি পৃথক্ স্বনিমরূপে স্বীকৃত হতে পারে। এবং কোনো ভাষায় যে ধ্বনি একবার স্বনিমরূপে স্বীকৃত হয়, তা সেই ভাষায় সর্বক্ষেত্রেই স্বনিমরূপে মর্যাদা পাবে—once a phoneme always a phoneme.

মোটামুটিভাবে উপর্যুক্ত নীতিগুলি অনুসরণ করে বাংলা ভাষার বিভাজ্য স্বনিমগুলি নির্ণয় করা যেতে পারে।

বাংলা ব্যঞ্জন স্বনিম

ন্যূনতম শব্দজোড়ের (Minimal Pair) সাহায্যে আদর্শ চলিত বাংলার (Standard Colloquial Bengali) ব্যঞ্জনস্বনিমগুলি এইভাবে নির্ণীত হতে পারে :

স্পর্শধ্বনি ও ঘৃষ্টধ্বনি :

পাল /pal/	প্ /p/	(১)
ফাল /pʰal/	ফ্ /pʰ/	(২)
বাল /bal/	ব্ /b/	(৩)
ভাল /bʰal/	ভ্ /bʰ/	(৪)
তান /tan/	ত্ /t/	(৫)
থান /tʰan/	থ্ /tʰ/	(৬)
দান /dan/	দ্ /d/	(৭)
ধান /dʰan/	ধ্ /dʰ/	(৮)
টক /ʈɔk/	ট্ /ʈ/	(৯)
ঠক /ʈʰɔk/	ঠ্ /ʈʰ/	(১০)
ডক /ɖɔk/	ড্ /ɖ/	(১১)
ঢক-ঢক /ɖʰɔk ɖʰɔk/	ঢ্ /ɖʰ/	(১২)
চাল /cal/	চ্ /c/	(১৩)
ছাল /cʰal/	ছ্ /cʰ/	(১৪)
জাল /ɟal/	জ্ /ɟ/	(১৫)
ঝাল /ɟʰal/	ঝ্ /ɟʰ/	(১৬)
কোল /kol/	ক্ /k/	(১৭)
খোল /kʰol/	খ্ /kʰ/	(১৮)
গোল /gol/	গ্ /g/	(১৯)
ঘোল /gʰol/	ঘ্ /gʰ/	(২০)

নাসিক্য ধ্বনি

হিম /him/	ম্ /m/	(২১)
হীন / হিন /hin/	ন্ /n/	(২২)
হিং / হিঙ্ /hiŋ/	ঙ্ /ŋ/	(২৩)

কম্পিত ও পার্শ্বিক ধ্বনি

রাশ /raʃ/	র্ /r/	(২৪)
লাশ /laʃ/	ল্ /l/	(২৫)

উষ্ম ধ্বনি

শাল /ʃal/	শ্ /ʃ/	(২৬)
হাল /ɦal/	হ্ /ɦ/	(২৭)

কম্পিত ও তাড়িত

হার /har/	র্ /r/	
হাড় /haɽ/	ড় /ɽ/	(২৮)

নৈকট্য ধ্বনি : অর্ধস্বর

ছায়া = /c^haja/	বা /c^haĕa/	য় /j/ বা /e̯/	(২৯)
ছাওয়া = /c^hawa/	বা /c^haŏa/	ওয়্ /w/ বা /ŏ/	(৩০)

উপরে যে-সব ন্যূনতম শব্দজোড় দেওয়া হল তাতে বাংলার ৩০টি ব্যঞ্জন ধ্বনিকে (২টি অর্ধস্বর সহ) স্বতন্ত্র স্বনিমরূপে মোটামুটিভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হল। 'মোটামুটিভাবে' বলছি এই জন্য যে প্রত্যেক ধ্বনির সঙ্গে অন্য সব ধ্বনির স্বনিমীয় বিরোধ দেখাতে পারলে তবেই প্রমাণ নিঃসংশয়িত হয়। কিন্তু তার জন্যে অনেক ন্যূনতম শব্দজোড় দেখানো দরকার। সেটা এখানে স্থানাভাব বশত সম্ভব নয়। তবে মোটামুটিভাবে যে ক'টা স্বনিম নির্ণীত হল তাতে স্পষ্টত দেখা যায় যে, বাংলার প্রচলিত বর্ণমালায় যতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে, ততগুলি ব্যঞ্জন স্বনিম বাংলায় নেই। প্রচলিত বাংলা বর্ণমালার ঞ, ণ্, য্, (অন্তঃস্থ) ব্, ষ্, স্-কে বাংলায় স্বতন্ত্র স্বনিমের মর্যাদা দেওয়া হয় নি। আধুনিক আদর্শ চলিত বাংলায় (Standard Colloquial Bengali = SCB) যে উচ্চারণ এখন শোনা যায়, তাতে এইসব বর্ণের নিজস্ব স্বতন্ত্র উচ্চারণ আর বজায় নেই। স্বনিম হবার দু'টি সর্ত হল—(১) সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র উচ্চারণ এবং (২) দু'টি শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্য সৃষ্টির ক্ষমতা। এই দু'টি সর্তের মধ্যে প্রথম সর্তটিই এই ক'টি বর্ণ পূরণ করছে না অর্থাৎ এদের নিজস্ব পৃথক্ উচ্চারণ আধুনিক বাংলায় নেই। যেমন—ঞ-এর ব্যবহার তো খুবই কম, মাত্র 'মিঞা' প্রভৃতি দু'একটি শব্দে দেখা যায়, তা ছাড়া এসব ক্ষেত্রেও 'ঞ'-এর উচ্চারণ 'য়্ঁ'-এর মতো : যেমন—মিঞা-র

উচ্চারণ [মিয়াঁ = miẽã বা mijã]। 'ণ্'-এর উচ্চারণও বাংলায় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে নি। সংস্কৃতে 'ণ্'-এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ ছিল—অনেকটা 'ড়্'-এর মতো। কিন্তু বাংলায় মূর্ধন্য 'ণ্'-এর উচ্চারণ দন্ত্য 'ন্'-এরই [n] মতো। তাই 'ণ্'-কে পৃথক্ স্বনিম ধরা হবে না। বাংলায় 'ণ্' ও 'ন্'-মিলে একটাই স্বনিম। তেমনি বাংলা বর্ণমালার তিনটি বর্ণ শ্, ষ্, স্ বাংলা উচ্চারণে প্রায় একই রকম হয়ে গেছে। বানানে যা-ই লেখা থাক না কেন, দু'-একটি ক্ষেত্র ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তালব্য শ্-ই / ʃ / উচ্চারিত হয়। তাই বাংলায় এগুলি আলাদা স্বনিম নয়, একটাই স্বনিম—শ্ / ʃ /। খাঁটি বাংলায় মূর্ধন্য 'ষ্' [ʂ]-এর উচ্চারণ প্রায় নেই-ই, আর দন্ত্য 'স্' [s] শুধু সুনির্দিষ্ট ধ্বনি-পরিবেশে (environment) উচ্চারিত হতে শোনা যায় ; কিন্তু সেটাও হল মূলধ্বনি তালব্য 'শ্' [ʃ]–এরই উচ্চারণ-বৈচিত্র্য। অতএব সেইসব ক্ষেত্রে দন্ত্য 'স্' [s] স্বতন্ত্র স্বনিম নয়, উপধ্বনি বা পূরক ধ্বনি মাত্র। আগে একাধিকবার বলেছি, বানানে যা-ই লেখা থাক না কেন, দন্ত্য বা দন্তমূলীয় ধ্বনির (ত্, থ্, ন্, র্, ল্) সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকলে শ্ / ʃ / -এর উচ্চারণ দন্ত্য বা দন্তমূলীয় হয়ে যায়। যেমন—শ্রী (শ্ + র্ + ঈ) = [sri] শব্দে হয়েছে। কিন্তু এরকম ধ্বনিসংযোগ না থাকলে বানানে 'শ্' বা 'স্' যা-ই লেখা থাক না কেন, খাঁটি বাংলায় তালব্য শ্ / ʃ /-ই উচ্চারিত হবে। সুতরাং বাংলায় তালব্য শ্ [ʃ] ও দন্ত্য স্ [s]-এর অবস্থান সর্তাধীন, এ দু'টির মধ্যে একটি অন্যটির স্থানে উচ্চারিত হতে পারে না। এই রকম পরিপূরক অবস্থানে (Complementary Distribution) আছে বলে এ দু'টিকে একই স্বনিমের উপধ্বনি বা পূরক ধ্বনি বলা হয়। বিদেশি ভাষার প্রভাবমুক্ত বৃহত্তর বাঙালির খাঁটি উচ্চারণে (Native pronunciation) তাই শ্, ষ্, স্—তিনটি আলাদা স্বনিম নয়, একটাই স্বনিম—শ্ / ʃ /। শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বাঙালির বিদেশি শব্দের বিশুদ্ধ বিদেশি উচ্চারণে দন্ত্য স্ [s]-এর পৃথক্ উচ্চারণ শোনা যায় এবং তালব্য শ্ / ʃ /-এর সঙ্গে তার স্বনিমীয় বিরোধ দেখা যায়। যেমন—

সোল / sol / = জুতার সোল।
শোল / ʃol / = শোল মাছ।

'সিনেমা', 'সার্কাস্' প্রভৃতি ইংরেজি শব্দে এবং কিছু আরবি-ফারসি শব্দে শিক্ষিত বাঙালিরা অনেকে দন্ত্য স্ [s] উচ্চারণ করে থাকে. দন্ত্য 'স্'-এর উচ্চারণ পূর্ব বাংলার ভাষায় আরও ব্যাপক। দন্ত্য 'স্' [s]-এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ এভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং কিছুকিছু ক্ষেত্রে তালব্য শ্ / ʃ / থেকে স্বনিমীয়

স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করতে পেরেছে। তাই আধুনিক কালে জনৈক পরিচিত ভাষাতত্ত্ববিদ্ দন্ত্য স্ / s /-কে স্বতন্ত্র স্বনিমরূপেই গ্রহণ করেছেন : "দন্ত্য /s/ এবং তালব্য / ʃ / ধ্বনি দুটি আমরা স্বতন্ত্র ধ্বনিমূলরূপে ধরেছি।......বাংলাদেশে আধুনিক কথ্য ভাষায় / s / এবং / ʃ / দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনিমূল ; কারণ শব্দ আদি, মধ্য ও অন্ত্য সর্ব অবস্থানেই দুটি ধ্বনির উপস্থিতি পাওয়া যায়।......সব অবস্থানেই / s / ও / ʃ /-এর বৈপরীত্য দেখা যায়।"[২৪]

তথাকথিত খণ্ড 'ৎ'-এর উচ্চারণ হল [ত্]। তেমনি অনুস্বরের (ং-এর) উচ্চারণ হল (ঙ্) এবং বিসর্গের ('ঃ'-এর) উচ্চারণ [হ্]। সুতরাং এগুলি স্বনিম হিসাবে যথাক্রমে /ত্/, /ঙ্/, /হ্/। আর চন্দ্রবিন্দু (ँ) হল অনুনাসিকতার চিহ্ন। বাংলায় স্বরধ্বনির সঙ্গে অনুনাসিকতা যুক্ত হলে তার স্বনিমীয় সত্তা পরিবর্তিত হয়ে যায়। মৌখিক স্বর ও অনুনাসিক স্বর বাংলায় পৃথক্ স্বনিম। স্বরধ্বনির প্রসঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করা হবে।

বাংলা স্বর স্বনিম

ন্যূনতম শব্দজোড়ের (Minimal Pair) সাহায্যে আদর্শ চলিত বাংলার (Standard Colloquial Bengali) স্বরস্বনিমগুলি এইভাবে নির্ণীত হতে পারে :

খিল /kʰil/ = দরজার খিল	ই /i/	(১)
খেল /kʰel/ = 'খেলা' ক্রিয়ার ধাতু	এ /e/	(২)
খ্যাল /kʰæl/ = (তুই) খ্যাল	অ্যা /æ/	(৩)
খাল /kʰal/ = জলের খাল	আ /a/	(৪)
খল /kʰɔl/ = চতুর	অ /ɔ/	(৫)
খোল /kʰol/ = বাজনা বিশেষ	ও /o/	(৬)
খুল /kʰul/ = 'খোলা' ক্রিয়ার ধাতু	উ /u/	(৭)

এইভাবে বাংলায় ৭টি স্বরস্বনিম পাওয়া গেল—ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ । / i e æ a ɔ o u /।

২৪। ইসলাম, অধ্যাপক ড. রফিকুল : 'ভাষাতত্ত্ব', ঢাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ৯১-৯২।

আগেই বলা হয়েছে, বাংলায় অনুনাসিকতার স্বনিমীয় গুরুত্ব রয়েছে। বাংলা মৌখিক স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক স্বরধ্বনিতে পরিবর্তিত করে দিলে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

বাংলায় মৌখিক স্বরধ্বনির সঙ্গে অনুনাসিক স্বরধ্বনির স্বনিমীয় বিরোধ রয়েছে। নিম্নোক্ত ন্যূনতম শব্দজোড়ের সাহায্যে এ সত্য প্রমাণিত হয় :

বিধি /bid^{h}i/ = নিয়তি	ই /i/
বিঁধি /bĩd^{h}i/ = বিঁধিয়ে দিই ফুটিয়ে দিই,	ইঁ /ĩ/
এরা /era/ = এই সব লোকেরা	এ /e/
এঁরা /ẽra/ = এই সব (সম্মানিত) লোকেরা	এঁ /ẽ/
ট্যাক /ṭæk/ = (তুই) টিকে থাক	অ্যা /æ/
ট্যাঁক /ṭæ̃k/ = কোমরের কাপড়ে টাকা রাখার জায়গা	অ্যাঁ /æ̃/
বাধা /bad^{h}a/ = প্রতিরোধ	আ /a/
বাঁধা /bãd^{h}a/ = বেঁধে দেওয়া	আঁ /ã/
গদ /gɔd/ = অতি ভোজনে পেটে অস্বস্তি	অ /ɔ/
গঁদ /gɔ̃d/ = আটা (adhesive gum)	অঁ /ɔ̃/
ওরা /ora/ = তারা (they)	ও /o/
ওঁরা /õra/ = তাঁরা (সম্মানার্থে)	ওঁ /õ/
কুড়ি /kuṛi/ = বিশ	উ /u/
কুঁড়ি /kũṛi/ = ফুলের কুঁড়ি	উঁ /ũ/

এইভাবে বাংলায় সাতটি অনুনাসিক স্বরস্বনিম (Nasal Vowel Phoneme) পাওয়া যায়—ইঁ, এঁ, অ্যাঁ, আঁ, ওঁ, উঁ / ĩ ẽ æ̃ ã ɔ̃ õ ũ/।

বাংলা মৌখিক ও অনুনাসিক স্বরস্বনিমের যে তালিকা নির্ণীত হল তাতে দেখা যায় যে প্রচলিত বাংলা বর্ণমালার স্বরবর্ণগুলির মধ্যে সবক'টি বাংলা স্বনিম রূপে স্বীকৃতি লাভ করে নি। হ্রস্ব 'ই' ও দীর্ঘ 'ঈ' বাংলায় পৃথক স্বনিম নয়। কারণ লিখিত বানানে এদের পার্থক্য পাওয়া গেলেও খাঁটি বাংলা উচ্চারণে

এদের পার্থক্য ন্যূনতম শব্দজোড় রচনা করে না। মনে হতে পারে 'দিন' ও 'দীন' একটি ন্যূনতম শব্দজোড় রচনা করেছে এবং এতে হ্রস্ব 'ই' ও দীর্ঘ 'ঈ'-এর পার্থক্যের জন্যে শব্দ দু'টিতে অর্থের পার্থক্য সাধিত হচ্ছে। কিন্তু আগেই বলেছি, স্বনিম নির্ণয়ে লিখিত বানানের দিকে লক্ষ্য করা হয় না, খাঁটি দেশীয় উচ্চারণ শুনে ধ্বনিকে লিখে ফেলা হয়। খাঁটি বাংলা উচ্চারণে কিন্তু এই ধ্বনি দু'টির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যে বাঙালি সংস্কৃত জানে না এবং বানান জানে না, তার সহজ স্বাভাবিক উচ্চারণে 'দিন' ও 'দীন' শব্দের উচ্চারণ একই রকম। 'দীন-দরিদ্রের সহায় ভগবান' আর 'দিনরাত রাজনীতি করো না'—এই দু'টি বাক্যে 'দীন' ও 'দিন' শব্দের উচ্চারণ একই রকম। যে দু'টি বর্ণ উচ্চারণে পৃথক্ নয়, শুধু বানানে পৃথক্, তাদের পৃথক্ স্বনিমীয় সত্তা স্বীকৃত হতে পারে না। বাংলায় হ্রস্ব 'ই' ও দীর্ঘ 'ঈ' ন্যূনতম শব্দজোড় রচনা করে না। বরং হ্রস্ব 'ই' ও দীর্ঘ' 'ঈ'-এর উচ্চারণ পরিপূরক অবস্থানে পাওয়া যায়। একটির স্থানে অন্যটি উচ্চারিত হয় না, জোর করে উচ্চারণ করলে স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। এই উচ্চারণের নিয়মটি হল—একাক্ষরী শব্দে (monosyllabic words) যে-কোনো স্বরধ্বনিই দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। যেমন ঝি = [ঝী $ɟ^h$i:] দিন = [দীন di:n], দীন = দীন di:n] ইত্যাদি। অবশ্য এই সব একাক্ষরী শব্দ যখন অন্য শব্দের সঙ্গে সমাসে পূর্বপদ রূপে যুক্ত হয় তখন তাদের ঐ স্বরধ্বনিগুলি হ্রস্ব উচ্চারিত হয়। যেমন দীন-দরিদ্র = [দিন দরিদ্রো dindoridro], দিনরাত = [দিনরাত dinrat]। সুতরাং বাংলায় হ্রস্ব 'ই' ও 'দীর্ঘ' ঈ একই স্বনিমের দু'টি উপধ্বনি বা পূরকধ্বনি। তেমনি হ্রস্ব 'উ' ও দীর্ঘ 'ঊ' বাংলায় দু'টি পৃথক্ স্বনিম নয়, একই স্বনিমের দু'টি পূরকধ্বনি।

বাংলায় 'ঌ'-এর ব্যবহার তো নেই-ই। আর 'ঋ' বাংলায় স্বরস্বনিমই নয়। কারণ 'ঋ'-এর উচ্চারণ হল-রি [ri] ; আর রি [ri] হল দু'টি স্বনিম র্ + ই [r + i]। সুতরাং 'ঋ'-কে স্বরস্বনিমের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায়। বস্তুত ঋ ও ঌ বৈদিক সংস্কৃতে ছিল অর্ধব্যঞ্জন (sonant), বাংলায় এই দুই ধ্বনির সংস্কৃতের উচ্চারণ বজায় নেই। 'ঐ' এবং 'ঔ'-কেও স্বরস্বনিমের তালিকায় ধরা হয় নি। কারণ এ-দু'টির কোনোটিই একক স্বরধ্বনি নয়, প্রত্যেকটি হল দু'টি করে স্বরধ্বনির মিলিত রূপ। যেমন—ঐ = ও + ই, ঔ = ও + উ। এগুলিকে বলে যৌগিক স্বর। এগুলির স্থান একক স্বরধ্বনির (monophthong) তালিকায় নয়, যৌগিক স্বরধ্বনির (diphthongs) তালিকায়। যৌগিক স্বরধ্বনি সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

উপরে যে আলোচনা করা হল তা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, পশ্চিম বাংলার আধুনিক আদর্শ চলিত ভাষায় (Standard Colloquial Bengali) মোট স্বনিম-সংখ্যা নিম্নরূপ :

ব্যঞ্জন স্বনিম	২৮
অর্ধস্বর স্বনিম	২
মৌখিক স্বর স্বনিম	৭
অনুনাসিক স্বর স্বনিম	৭
	মোট ৪৪

॥ ১৪ ॥

বাংলা বিভাজ্য স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য (Distinctive Features of Bengali Segmental Phonemes)

স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের তত্ত্ব (Theory of Distinctive Features of Phonemes) : অনেক সময় দেখা যায় যে, দু'টি ধ্বনির উচ্চারণে সব দিক থেকে মিল আছে, কেবল একটি কোনো দিকে পার্থক্য আছে। ঐ পার্থক্যটি ঐ ধ্বনি দু'টিকে পৃথক্ করেছে। যেমন—বাংলায় 'প্' /p/ ধ্বনিটির সঙ্গে 'ব্' /b/ ধ্বনিটির প্রায় সব দিক থেকেই মিল আছে : 'প্' ও 'ব্' দু'টি ধ্বনিই স্পর্শধ্বনি, দু'টিই ওষ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয় এবং দু'টিই অল্পপ্রাণ ধ্বনি, ইত্যাদি। কিন্তু একটি দিকে এদের মধ্যে পার্থক্য আছে : 'প্' হচ্ছে অঘোষ ধ্বনি, কিন্তু 'ব্' হচ্ছে সঘোষ ধ্বনি। এই ঘোষ থাকা বা না-থাকা হচ্ছে এই ধ্বনি দু'টির মধ্যে পার্থক্যের কারণ। সুতরাং ঘোষই হচ্ছে 'প্' থেকে 'ব্'-এর স্বাতন্ত্র্যসূচক একটি বৈশিষ্ট্য। তেমনি 'ব্' ও 'ভ্' এর মধ্যে যদি পার্থক্য বিচার করি তাহলে দেখব যে, 'ব্' ও 'ভ্' এর মধ্যে সব দিক থেকে মিল আছে, পার্থক্য শুধু এই যে, 'ব্' হচ্ছে অল্পপ্রাণ (unaspirated), আর 'ভ্' হচ্ছে মহাপ্রাণ (aspirated) ধ্বনি। এখানে মহাপ্রাণতা হল 'ব্' থেকে 'ভ্'-এর স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য, তেমনি অন্যদিকে অল্পপ্রাণতা (অর্থাৎ মহাপ্রাণতার অভাব) হল 'ভ্' থেকে 'ব্'-ধ্বনির স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য। আবার 'ব্' ও 'ম্' ধ্বনির মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে 'ব্' মৌখিক (oral) ধ্বনি ও 'ম্' হচ্ছে নাসিক্য (nasal) ধ্বনি। এ ক্ষেত্রে মৌখিকতা (orality) হচ্ছে 'ব্'-এর একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য যার জন্যে 'ব্' হল 'ম্' থেকে পৃথক। তাহলে এখানে আমরা 'ব্'-ধ্বনির তিনটি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য পেলাম। যেমন—ঘোষ, অল্পপ্রাণতা ও মৌখিকতা। এমনি করে এক-একটি ধ্বনি হল

একাধিক স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি অর্থাৎ এক-একটি ধ্বনির একাধিক স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, এবং এক-একটি বৈশিষ্ট্যের জন্যে ধ্বনিটি অন্যান্য ধ্বনি থেকে পৃথক্ হয়ে যেতে পারে। ধ্বনির স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য অনেক সময় দু'টি ধ্বনিকে শুধু স্বতন্ত্র ধ্বনি (phone) রূপেই প্রতিষ্ঠিত করে না ; উপরন্তু তাদের স্বতন্ত্র স্বনিম (phoneme) রূপেই প্রতিষ্ঠা দান করে। তখন এক-একটি ধ্বনির এই যে স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য তা অন্য ধ্বনির সঙ্গে তার স্বনিমীয় বিরোধ (Phonemic contrast) সৃষ্টি করে। যেমন 'প্' ও 'ব্'-এর মধ্যে পার্থক্যের কারণ হল ঘোষ এবং এই পার্থক্যই ধ্বনি দু'টির মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ সৃষ্টি করে ধ্বনি দু'টিকে পৃথক্ স্বনিমরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। যেমন—

/ পাল্ /

/ বাল্ /

এই ন্যূনতম শব্দজোড়ে আমরা দেখতে পাই যে ঘোষ (Voice)-এর অনস্তিত্ব ও অস্তিত্ব যথাক্রমে 'প্' 'ব্' ধ্বনির এমন স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য যে বৈশিষ্ট্যটির জন্যে এই দু'টি ধ্বনি দু'টি শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং স্বতন্ত্র স্বনিমীয় সত্তা লাভ করে। এমনি করে যে ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের জন্যে একটি ধ্বনির সঙ্গে অন্য ধ্বনির স্বনিমীয় বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং ওই ধ্বনিটির স্বতন্ত্র সত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় সেই বৈশিষ্ট্যকে ঐ ধ্বনির স্বনিমীয় স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য (Distinctive Feature) বলে।

প্রাগ্-গোষ্ঠীর (Prague School) ভাষাবিজ্ঞানীদের পুরোধা অধ্যাপক ত্রুবেৎস্কয়-এর (Prof. Nikolai Trubetzkoy) রচনায় স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের ধারণাটির উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি যে স্বনিমীয় বিরোধের (phonemic contrast) কথা বলেছিলেন তার মধ্যেই স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ভাষাবিজ্ঞানী রোমান্ যাকব্সন্ (Roman Jakobson) স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের তত্ত্বটি উচ্চারণ-প্রক্রিয়ার পার্থক্যের উপরে ভিত্তি করে গড়ে তোলেন এবং ধ্বনিতরঙ্গের প্রমাণাদির (acoustic evidence) উপরে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মতে ধ্বনির এই রকম এক-একটি বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব-বনাম-অনস্তিত্বের দ্বিমুখী বিরোধিতার (binary opposition) জন্যে দু'টি স্বনিমের মধ্যে পার্থক্য গড়ে উঠে। যেমন—ঘোষ (voice)-এর অস্তিত্ব বনাম অনস্তিত্বের জন্যে যথাক্রমে 'ব্' ও 'প্' ধ্বনির মধ্যে পার্থক্য গড়ে উঠেছে। রোমান্ যাকব্সনের এই স্বনিমীয় স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের তত্ত্বটি এক সময় ভাষাবিজ্ঞানে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। আধুনিক কালে কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী তার সমালোচনা করলেও এই তত্ত্বের প্রভাব বিশেষ কমেনি এবং এখনো ভাষায় স্বনিম বিশ্লেষণ ও স্বনিমের বিধিবিধান আলোচনার

ক্ষেত্রে মূলত রোমান্ যাকব্‌সনের ছকটিই অল্পবিস্তর সংশোধিত আকারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুসরণ করা হয়।[২৫] যাকব্‌সন্ স্বনিমের ১২টি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং সেগুলিকে ৩টি ভাগে ভাগ করেছিলেন :

(A) SONORITY FEATURES :

(1) Vocalic vs. Non-vocalic,
(2) Consonantal vs. Non-consonantal,
(3) Oral vs. Nasal,
(4) Compact vs. Diffuse,
(5) Abrupt vs. Continuant,
(6) Strindent vs. Non-strindent (mellow)
(7) Checked vs. Unchecked,
(8) Voice vs. Voiceless,

(B) PROTENSITY FEATURES :

(9) Tense vs. Lax,

(C) TONALITY FEATURES :

(10) Grave vs. Acute,
(11) Flat vs. Non-flat এবং
(12) Sharp vs. Non-sharp.

যাকব্‌সন্ যদিও ১২টি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছিলেন, তবু তিনি একথা দাবি করেননি যে, এগুলির মধ্যে সব ক'টি সব ভাষার ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য। তিনি যে বলেছিলেন, 'each language makes its own selection'[২৬], তাতেই স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, তিনি প্রত্যেক ভাষার স্বধর্মকে স্বীকার করেছিলেন, এবং একথা অনুভব করেছিলেন যে, প্রত্যেক ভাষার স্বধর্ম

২৫। আধুনিক ধ্বনিতত্ত্ববিদেরা যাকব্‌সনের তত্ত্বের গুরুত্ব স্বীকার করেন : "How much progress has been made towards the goal of establishing universal frameworks of these types? In the perceptual field the Jakobsonian framework seems to have no significant rivals, and is, arguably, adequate, given minor modifications"–Fudge, E. C. : 'On the Notion of Universal Phonetic Framework' in *Phonology*. ed., by Fudge, E. C. 1973, p. 174.

২৬। Jakobson, R. and Halle, M. : 'Phonology in Relation to Phonetics' in *Manual of Phonetics*, ed. by Malmberg, Bertil: Amsterdam, London, 1974, p. 428.

অনুসারে পূর্বোক্ত স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটিই ভাষাবিশেষে প্রযোজ্য হতে পারে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাব যে, পূর্বোক্ত ১২টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মাত্র কয়েকটিই প্রযোজ্য। অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও এরকম নির্বাচন দেখা যায়। জার্মান ভাষায় এগুলির মাত্র ৭টি বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ যাকপ্‌সন্‌-কথিত ১২টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবগুলি প্রায় কোনো ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় ; তেমনি কোনো কোনো ভাষার স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য ঐ ১২টির মধ্যেই সীমাবদ্ধও নয়। অর্থাৎ কোনো কোনো ভাষায় স্বনিমের এমন সব নতুন নতুন স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যা যাকব্‌সনের তালিকার মধ্যে পড়ে না। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন, স্বাভাবিক জীবন্ত ভাষার প্রক্রিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল, তাকে ন্যায়শাস্ত্রের কতকগুলি বাঁধা সূত্রে সীমাবদ্ধ করা যায় না। স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। ভাষার ধ্বনিবিধির বর্ণনার জন্যে সাধারণত যে ক'টি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়, কোনো কোনো ভাষায় তার অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রয়োজন হতে পারে।[২৭] যেমন ওষ্ঠের আকুঞ্চনকে (lip-rounding) যাকব্‌সন্‌-কথিত স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের তালিকায় পাই না ; কিন্তু জার্মান ও ফরাসি ভাষায় কোনো কোনো স্বরস্বনিমের ক্ষেত্রে ওষ্ঠের আকুঞ্চন একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য। সম্মুখ স্বরধ্বনি (i e ɛ) সাধারণত ওষ্ঠকে প্রসারিত করে উচ্চারণ করা হয় ; কিন্তু জার্মান ও ফরাসি ভাষায় কোনো কোনো সম্মুখ স্বরস্বনিম ওষ্ঠ কুঞ্চিত করেও উচ্চারণ করা যায় এবং তখন এগুলি সম্পূর্ণ পৃথক্‌ স্বনিম (যথাক্রমেঃ y ø œ) হয়ে যায়, তাতে শব্দের অর্থও পরিবর্তিত হয়। যেমন—

জার্মান ভাষায়

/ˈbe:zən/ Besen = ঝাড়ু, ঝাড়ন /e:/

/ˈbø:zən/ böesen = böse (খারাপ, দুষ্ট) শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন, পুং /ø:/

এখানে প্রথম শব্দের /e:/ স্বনিমটি প্রসারিত ধ্বনি, দ্বিতীয় শব্দে সেইটি কুঞ্চিত হওয়াতে স্বতন্ত্র স্বনিম / ø: / হয়ে গেছে এবং তাতে শব্দের অর্থও

২৭। "...the number of features necessary for the description of a sound system cannot simply be reduced to the theoretical minimum formulated above,...a larger number of featuesars are needed...the structure of a natural language is more complex than the most simple logical form would suggest."–Bierwisch, Manfred : *Modern Linguistics.* Mouton, 1971. pp. 25-26.

পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তেমনি ফরাসি ভাষায়—

/ mil / mille = মাইল, হাজার / i /
/ myl / mule = খচ্চর (প্রাণী), পা-ফাটা / y /

এখানে প্রথম শব্দের প্রসারিত ধ্বনি / i / দ্বিতীয় শব্দে কুঞ্চিত /y/-তে পরিবর্তিত হওয়ায় পৃথক্ স্বনিম হয়ে গেছে। অর্থাৎ দু'টি ভাষায় দেখা যাচ্ছে ওষ্ঠ কুঞ্চিত হওয়ার ফলে একটি স্বরস্বনিম অন্য স্বরস্বনিমে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ওষ্ঠের আকুঞ্চন এখানে কোনো কোনো স্বরস্বনিমের একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য। অথচ এই বৈশিষ্ট্যটির কথা যাকব্‌সন্ উল্লেখ করেন নি। সুতরাং স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য যাকব্‌সন্-কথিত ১২টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। তেমনি তাঁর উল্লিখিত ১২টি বৈশিষ্ট্যের সবক'টি সব ভাষার স্বনিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। বাংলা স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করলেই আমরা দেখতে পাব, সেই ১২টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মাত্র কয়েকটিই বাংলায় প্রযোজ্য।

বাংলা স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য (Distinctive Features of Bengali Phonemes) : যাকব্‌সনের সূত্র প্রয়োগ করে বাংলা স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য (Distinctive Features) সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন চার্লস্ এ, ফার্গুসন্ ও মুনীর চৌধুরী।[২৮] পরে এ বিষয়ে আরো কেউ কেউ আলোচনা করেন। কিন্তু যেখানে ধ্বনির স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য স্বনিমীয় পার্থক্য সৃষ্টি করে সেখানে স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি স্বনিমীয় বিরোধের (Phonemic Contrast) দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রতিপন্ন করা প্রয়োজন। সে কাজটি বর্তমান লেখকই প্রথম করেন তাঁর একটি প্রবন্ধে।[২৯] নিচে বাংলা স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে :

২৮। Ferguson, Charles A. and Choudhury, Munier : 'Phonemes of Bengali', in *Language,* Journal of the Linguistic Society of America, Jan-March, 1960. Vol. 36.

২৯। Shaw, Rameswar : 'Distinctive Features of Bengali Phonemes' in *Bulletin of the Dept. of Comparative Philology and Linguistics,* Calcutta University, Suniti Kumar Chatterji Memorial Vol., 1978

(১) স্বর বনাম ব্যঞ্জন (Vocalic vs. Consonantal) : আমরা জানি, স্বরধ্বনির মোটামুটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এগুলি মুখগহ্বরে বা কণ্ঠের পথে (buccal tract) শ্বাসবায়ুর বাধার ফলে সৃষ্ট হয় না, এগুলি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু শুধু স্বরতন্ত্রীতে অতি সামান্য একটু বাধা পায় এবং তার ফলে স্বরতন্ত্রী (Vocal Cords) দু'টি কম্পিত হয়। কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনি মুখগহ্বরে বা কণ্ঠের পথে (buccal tract) কোনো-না-কোনো স্থানে পূর্ণ বা আংশিক বাধার ফলে সৃষ্ট হয়। বাংলায় স্বরস্বনিম হল : ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ, ইঁ, এঁ, অ্যাঁ, আঁ, অঁ, ওঁ, উঁ / i e æ a ɔ o u ĩ ẽ æ̃ ã ɔ̃ õ ũ /। বাংলায় ব্যঞ্জন স্বনিম হল : প্, ফ্, ব্, ভ্, ত্, থ্, দ্, ধ্, ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ক্, খ্, গ্, ঘ্, ম্, ন্, ঙ্, র্, ল্, শ্, হ্ / p p^{h} b b^{h} t t^{h} d d^{h} ʈ $ʈ^{h}$ ɖ $ɖ^{h}$ c c^{h} ɟ $ɟ^{h}$ k k^{h} g g^{h} m n ŋ r ʃ h /। বাংলায় স্বর বনাম ব্যঞ্জন বিরোধটি ব্যাপক স্বনিমীয় পার্থক্য সৃষ্টি করে। যেমন—

/pa-o/ পা-ও (অর্থাৎ leg also) ...../o/ ও (স্বর)

/pap/ পাপ (অর্থাৎ he gets) ...../p/ প্ (ব্যঞ্জন) ইত্যাদি।

রোমান্ যাকব্‌সন্ স্বর বনাম ব্যঞ্জন বিরোধটিকে সূক্ষ্ম বিচারে ভাগ করে দু'টি বিরোধ রূপে দাঁড় করিয়েছেন : স্বর বনাম অ-স্বর (Vocalic vs. Non-Vocalic) এবং ব্যঞ্জন বনাম অ-ব্যঞ্জন (Consonantal vs, Non-Consonantal)। এবং কেউ কেউ আরো সূক্ষ্ম বিচার করে বাংলা স্বনিমকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—(ক) স্বরধর্মী অ-ব্যঞ্জন (Vocalic non-Consonantal), (খ) স্বরধর্মী ব্যঞ্জন (Vocalic Consonantal), (গ) অ-স্বরধর্মী ব্যঞ্জন (Non-Vocalic Consonantal), (ঘ) অ-স্বরধর্মী অ-ব্যঞ্জনধর্মী (Non-Vocalic non-Consonantal)। কিন্তু এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার অহেতুক তত্ত্বলোলুপতা (theory mongering) ছাড়া আর কিছুই নয়। মোটামুটিভাবে স্বর ও ব্যঞ্জন এই দুটি বিভাগে বাংলা ভাষার স্বনিমগুলিকে ভাগ করলেই এই স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যটি পরিস্ফুট হয়। বর্তমান প্রসঙ্গে এর চেয়ে সূক্ষ্ম বিভাগের প্রয়োজন নেই।

(২) নাসিক্য বনাম মৌখিক (Nasal vs. Oral) : মৌখিক ধ্বনি উচ্চারণের সময় শুধু মুখ দিয়ে শ্বাসবায়ু যাতায়াত করে। কিন্তু নাসিক্য ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু শুধু নাসিকা দিয়ে বা মুখ ও নাসিকা উভয় পথে যাতায়াত করে ; তার ফলে নাসিক্য-ধ্বনির সঙ্গে একটি অনুনাসিক অনুরণন (nasal resonance)

শোনা যায়। শুধু উচ্চারণগত দিক থেকে (phonetically) বাংলায় নাসিক্য ধ্বনি হল ইঁ, এঁ, অ্যাঁ, আঁ, অঁ, ওঁ, উঁ, ম্, ন্, ঙ্ / ĩ ẽ æ̃ ã ɔ̃ õ ũ m n ŋ /, আর বাকি ধ্বনিগুলি সবই হল মৌখিক ধ্বনি। কিন্তু স্বনিমীয় বিরোধ (phonemic contrast) সৃষ্টির দিক থেকে বাংলায় নাসিক্যতা বা অনুনাসিকতা (nasality) হল ইঁ, এঁ, অ্যাঁ, অঁ, ওঁ, উঁ, ম্, ন্, ঙ্ / ĩ ẽ æ̃ ã ɔ̃ õ ũ m n ŋ / ধ্বনির স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য ; আর মৌখিকতা (orality) হল শুধু ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ, প্, ফ্, ব্, ভ্, ত্, থ্, দ্, ধ্, ক্, খ্, গ্, ঘ্ / i e æ a ɔ o u p p^h b b^h t t^h d d^h k k^h g g^h / ধ্বনির স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য। বাকি ধ্বনির ক্ষেত্রে স্বনিমীয় পার্থক্য সৃষ্টির ব্যাপারে 'নাসিক্য-বনাম-মৌখিক' বিরোধটি তাৎপর্যহীন (redundant)। স্বনিমীয় স্তরে বাংলায় 'নাসিক্য-বনাম-মৌখিক' বিরোধের দৃষ্টান্ত হল :

/ bap/ বাপ | ...../ b / ব্ (মৌখিক)
/map/ মাপ | ..../ ম্ / (নাসিক্য) ;

/ãʃ / আঁষ [আঁশ] | /ã/ আঁ (নাসিক্য)
/aʃ/ আশ..... | / a/ আ (মৌখিক) ইত্যাদি।

(৩) ঘনীভূত বনাম বিক্ষিপ্ত (Compact vs. Diffuse) : মূলত উচ্চারণ-প্রক্রিয়ার উপরে নয়, উচ্চারিত ধ্বনির তরঙ্গজাত ফলশ্রুতির (acoustic result) উপরে ভিত্তি করে এই বৈশিষ্ট্য নির্ণীত হয়েছে। ঘনীভূত ধ্বনির ক্ষেত্রে সামগ্রিক শক্তি অনেকটা বেড়ে যায় এবং অনেকটা ক্ষণস্থায়ী থাকে। কিন্তু বিক্ষিপ্ত ধ্বনির ক্ষেত্রে এই শক্তি অনেক কম থাকে। এছাড়া ঘনীভূত ধ্বনি উচ্চারিত হলে তার শ্রুতিচ্ছত্রের (auditory spectrum) কেন্দ্রীয় এলাকায় তার মূল শক্তিটুকু ঘনীভূত হয়ে থাকে, কিন্তু বিক্ষিপ্ত ধ্বনির ক্ষেত্রে এই শক্তিটুকু কেন্দ্রীয় এলাকার চারপাশে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। উচ্চারণ-প্রক্রিয়ার দিক থেকে পার্থক্য এই যে, ঘনীভূত ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর অবরোধের ক্ষেত্র বা জিহ্বার সামনের দিকে বা উপরে বেশি জায়গা ফাঁকা থাকে, কিন্তু বিক্ষিপ্ত ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর অবরোধের ক্ষেত্রে বা জিহ্বার সামনের দিকে বা উপরে বেশি জায়গা ফাঁকা থাকে না। বাংলায় ঘনীভূত স্বনিম হল অ্যা, আ, অ, আঁ, অঁ, চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্ / æ a ɔ æ̃ ã ɔ̃ k k^h g g^h c c^h ɟ $ɟ^h$ ŋ/। আর বিক্ষিপ্ত স্বনিম হল ই, এ, ও, উ, ইঁ, এঁ, ওঁ, উঁ, প্, ফ্,

ব্, ভ্, ত্, থ্, দ্, ধ্, ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ম্, ন্ / i e o u ĩ ẽ õ ũ p p^h b b^h t t^h d d^h ṭ $ṭ^h$ ḍ $ḍ^h$ m n /। ঘনীভূত বনাম বিক্ষিপ্ত বিরোধটি বাংলায় যে স্বনিমীয় তাৎপর্যপূর্ণ তা নিম্নোক্ত ন্যূনতম শব্দজোড়ের সাহায্যে প্রমাণিত হয় :

/dan/ দান ....|a/ আ (ঘনীভূত)
/din/ দিন ....|i/ ই (বিক্ষিপ্ত)

/kal/ কাল ....|k/ ক্ (ঘনীভূত)
/pal/ পাল ....|p/ প্ (বিক্ষিপ্ত)

/gaŋ/ গাঙ্ ....|ŋ/ ঙ্ (ঘনীভূত)
/gan/ গান ....|n/ ন্ (বিক্ষিপ্ত), ইত্যাদি।

নিম্নোক্ত ধ্বনির ক্ষেত্রে এই বিরোধটি স্বনিমীয় তাৎপর্যহীন (redundand) :-- র্, ল্, শ্, হ্, ড়্, য়্, ওয়্ / r l ʃ h ṛ ĕ ŏ /

(৪) আকস্মিক বনাম বিলম্বিত (Abrupt vs. Continuant) : আকস্মিক ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হয় বা হঠাৎ উন্মুক্ত হয়ে যায়, এবং তার ফলে এই ধ্বনির উচ্চারণ-ক্রিয়া আকস্মিকভাবে সমাপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু বিলম্বিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু ক্রমে-ক্রমে বাধাপ্রাপ্ত হয় বা উন্মুক্ত হয় এবং তার উচ্চারণে ধ্বনির প্রবাহ হঠাৎ শেষ হয়ে যায় না, কিছুক্ষণ ধরে চলতেই থাকে। উচ্চারণের দিক থেকে (phonetically) বাংলায় আকস্মিক ধ্বনি হল প্, ত্, ট্, চ্, ক্, ফ্, থ্, ঠ্, ছ্, খ্, ব্, দ্, ড্, জ্, গ্, ভ্, ধ্, ঢ্, ঝ্, ঘ্, র্, ড় / p t ṭ c k p^h t^h $ṭ^h$ c^h k^h b d ḍ ɟ g b^h d^h $ḍ^h$ g^h r ṛ /। বিলম্বিত ধ্বনি হল শ্, ল্, / ʃ l /, কিন্তু এই আকস্মিক বনাম বিলম্বিত বিরোধের মানদণ্ডে স্বনিমীয় পার্থক্য সৃষ্টি হয় শুধু আকস্মিক ধ্বনি (তাও এরা ঘৃষ্ট ধ্বনি বলে পুরোপুরি আকস্মিক নয়) চ্, ছ্, জ্, ঝ্, / c c^h ɟ $ɟ^h$ /-এর সঙ্গে বিলম্বিত ধ্বনি শ্ / ʃ /-এর। অন্যান্য ধ্বনির ক্ষেত্রে এই বিরোধ স্বনিমীয় তাৎপর্যহীন। আকস্মিক বনাম বিলম্বিত বিরোধ বাংলা ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে স্বনিমীয় পার্থক্য সৃষ্টি করে। যেমন—

/cal/ চাল ......|c/ চ্ (আকস্মিক)
/ʃal/ শাল ...... /ʃ/ শ্ (বিলম্বিত)।

(৫) সঘোষ বনাম অঘোষ (Voiced vs. Voiceless) : সঘোষ ধ্বনি উচ্চারণের সময় মূল ধ্বনির সঙ্গে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত সুর মিশে থাকে ; কিন্তু অঘোষ ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয় না, ফলে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত কোনো সুর মূল ধ্বনির সঙ্গে মিশে থাকে না। ফিস্‌ফিসে স্বরধ্বনি ছাড়া সব স্বাভাবিক স্বরধ্বনিই উচ্চারণগত দিক থেকে (phonetically) সঘোষ, সুতরাং স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে সঘোষ বনাম অঘোষ বিভেদের প্রশ্ন উঠে না। শুধু ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে এই বিভেদ লক্ষণীয়। বাংলায় ব্যঞ্জনের মধ্যে আবার শুধু স্পর্শধ্বনির (plosive) ক্ষেত্রে এই বিরোধ স্বনিমীয় তাৎপর্যপূর্ণ। স্বনিমীয় তাৎপর্যের দিক থেকে (phonemically) সঘোষ স্বনিম হল ব্, দ্, ড্, জ্, গ্, ভ্, ধ্, ঢ্, ঝ্, ঘ্, / b d ḍ ɟ g b^h d^h $ḍ^h$ $ɟ^h$ g^h /। আর অঘোষ স্বনিম হল প্, ত্, ট্, চ্, ক্, ফ্, থ্, ঠ্, ছ্, খ্ / p t ṭ c k p^h t^h $ṭ^h$ c^h k^h /। স্বনিমীয় বিরোধের দৃষ্টান্ত হল—

/gal/ গাল ..../g/ গ্ (সঘোষ)
/kal/ কাল ..../k/ ক্ (অঘোষ)

/dɔl/ দল ..../d/ দ্ (সঘোষ)
/tɔl/ তল ..../t/ ত্ (অঘোষ), ইত্যাদি।

শুধু উচ্চারণের দিক থেকে ম্, ন্ ঙ্, র্, ল্, হ্, ড়্, য়্, ওয়্ / m n ŋ r l h ṛ ĕ ŏ / সঘোষ এবং শ্ / ʃ / হল অঘোষ ধ্বনি। কিন্তু এগুলির ক্ষেত্রে সঘোষ-অঘোষ বিরোধ স্বনিমীয় তাৎপর্যহীন (redundant)।

(৬) অনুদাত্ত বনাম উদাত্ত (Grave vs. Acute) : স্বরের বা সুরের তীব্রতর মাত্রাভেদই এই বিভেদের মূল ভিত্তি বলে একে স্বরজনিত বৈশিষ্ট্য (tonality feature) বলা হয়। উদাত্ত (Acute) ধ্বনি উচ্চারিত হয় মুখের মাঝামাঝি জায়গা থেকে এবং এগুলি উচ্চারণের সময় স্বর বা সুর অপেক্ষাকৃত তীব্র থাকে ; কিন্তু অনুদাত্ত (Grave) ধ্বনি উচ্চারিত হয় মুখগহ্বরের সামনের প্রান্ত (যেমন ওষ্ঠ ইত্যাদি) বা পিছনের প্রান্ত (যেমন কণ্ঠ ইত্যাদি) থেকে এবং এগুলিতে স্বর বা সুরের তীব্রতা থাকে না। বাংলায় অনুদাত্ত স্বনিম হল অ, ও, উ, অঁ, ওঁ, উঁ, প্, ফ্, ব্, ভ্, ক্, খ্, গ্, ঘ্, ম্ ঙ্, ওয়্ / ɔ o u ɔ̃ õ ũ p p^h b b^h k k^h g g^h m ŋ ŏ / এবং উদাত্ত স্বনিম হল ই, এ, অ্যা, ইঁ, এঁ, অ্যাঁ, ত্, থ্, দ্, ধ্, ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ন্, র্, য়্, হ্ ড়্ / i e æ ĩ ẽ æ̃ t t^h d d^h ṭ $ṭ^h$ ḍ $ḍ^h$ c c^h ɟ $ɟ^h$ n r ĕ h ṛ /। বাংলায় উদাত্ত-অনুদাত্ত যে স্বনিমীয় বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে তার উদাহরণ—

/ pal / পাল ..../ p / প্ (অনুদাত্ত)
/ tal / তাল ..../ t / ত্ (উদাত্ত)

/ bɔl / বল ..../ b / ব্......(অনুদাত্ত)
/ dɔl / দল ..../ d / দ্ ......(উদাত্ত)

বাংলা আ, আঁ / a ã / কেন্দ্রীয় (central) ধ্বনি বলে এ দু'টি উদাত্ত-অনুদাত্তের মধ্যবর্তী ধ্বনি। এদের ক্ষেত্রে এবং র্, ল্, / ɽ /-এর ক্ষেত্রে এ বিরোধটি প্রযোজ্য নয়।

(৭) দৃঢ় বনাম শিথিল (Tense vs, Lax) : দৃঢ় ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখ কণ্ঠ প্রভৃতি বাগঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অধিকতর বিকৃতি লাভ করে, মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয় এবং শ্বাসবায়ুর চাপ (air pressure) বেড়ে যায়; কিন্তু শিথিল ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখ গলা প্রভৃতি বাগঙ্গ শিথিলভাবে আরামের অবস্থায় থাকে, মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয় না, ফলে শ্বাসবায়ুর কোনো অতিরিক্ত চাপ থাকে না। বাংলায় দৃঢ় স্বনিম হল ফ্, ভ্, থ্, ধ্, ঠ্, ঢ্, ছ্, ঝ্, খ্, ঘ্, / p^h b^h t^h d^h $ṭ^h$ $ḍ^h$ c^h $ɟ^h$ k^h g^h / ; আর শিথিল স্বনিম হল প্, ব্, ত্, দ্; ট্, ড্, চ্, জ্ ক্, গ্ / p b t d ṭ ḍ c ɟ k g /। ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে মহাপ্রাণ ধ্বনি হল দৃঢ় এবং অল্পপ্রাণ ধ্বনি হল শিথিল ধ্বনি। এই বিরোধ বাংলায় সুপরিচিত স্বনিমীয় পার্থক্য সৃষ্টি করে। যেমন—

/ pãk / পাঁক ..../ p / প্ (শিথিল)
/ p^hãk / ফাঁক ..../ p^h / ফ্ (দৃঢ়)

/ kal / কাল ..../ k / ক্ (শিথিল)
/ k^hal / খাল ..../ k^h / খ্ (দৃঢ়) ইত্যাদি।

বাংলায় ম্, ন্, ঙ্, র্, ল্, শ্, হ্ এবং সমস্ত স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরের ক্ষেত্রে এই বিরোধটি তাৎপর্যহীন।

যাকব্‌সনের পরিকল্পিত অন্য বৈশিষ্ট্যগুলি বাংলা স্বনিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। স্বনিমীয় পার্থক্য সৃষ্টির ব্যাপারে বাংলায় বিভিন্ন স্বনিমের ক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি তাৎপর্যপূর্ণ তা নিম্নোক্ত তালিকার (matrix) (চিত্র নং ২৪ ও ২৫) সাহায্যে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। এই তালিকায় নিম্নোক্ত চিহ্নগুলি ব্যবহার করা হয়েছে :

\+ স্বনিমীয় বৈশিষ্ট্যসূচক (phonemically distinctive) উপস্থিতি,

— স্বনিমীয় বৈশিষ্ট্যসূচক (phonemically distinctive) অনুপস্থিতি,

0 স্বনিমীয় তাৎপর্যহীনতা (redundancy)।

বাংলা স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের তালিকা—১ (ব্যঞ্জন) :

Matrix of Distinctive Features of Bengali Phonemes–1 (Consonants) :

	প্ p	ফ্ pʰ	ব্ b	ভ্ bʰ	ত্ t	থ্ tʰ	দ্ d	ধ্ dʰ	ট্ ʈ	ঠ্ ʈʰ	ড্ ɖ	ঢ্ ɖʰ	চ্ c	ছ্ cʰ	জ্ ɟ	ঝ্ ɟʰ	ক্ k	খ্ kʰ	গ্ g	ঘ্ gʰ	ম্ m	ন্ n	ঙ্ ŋ	র r	ল্ l	শ্ ʃ	হ্ h	ড় ɽ
স্বর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ব্যঞ্জন	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
নাসিক্য	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	+	+	+	o	o	o	o	o
মৌখিক	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o	o	o	o	o	o	+	+	+	+	-	-	-	o	o	o	o	o
ঘনীভূত	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	o	o	o	o	o
বিক্ষিপ্ত	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	o	o	o	o	o
আকস্মিক	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	+	+	[illegible]	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o
বিলম্বিত	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	o	o
সঘোষ	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	o	o	o	o	o	o	o	o
অঘোষ	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o
অনুদাত্ত	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	+	-	o	o	-	-
উদাত্ত	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+	o	o	+	+
দৃঢ়	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	o	o	o	o	o	o	o	o
শিথিল	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	o	o	o	o	o	o	o	o

চিত্র নং ২৪

বাংলা স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের তালিকা–২ (স্বর ও অর্ধস্বর) :

Matrix of Distinctive Features of Bengali Phonemes–2 (Vowels & Semi-vowels) :

	ই i	এ e	অ্যা æ	আ a	অ ɔ	ও o	উ u	ইঁ ĩ	এঁ ẽ	অ্যাঁ æ̃	আঁ ã	অঁ ɔ̃	ওঁ õ	উঁ ũ	য়্ ĕ	ওয়্ ŏ
স্বর	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
ব্যঞ্জন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
নাসিক্য	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	o	o
মৌখিক	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	o	o
ঘনীভূত	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	o	o
বিক্ষিপ্ত	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	o	o
আকস্মিক	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
বিলম্বিত	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
সঘোষ	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
অঘোষ	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
অনুদাত্ত	-	-	-	o	+	+	+	-	-	-	o	+	+	+	-	+
উদাত্ত	+	+	+	o	-	-	-	+	+	+	o	-	-	-	+	-
দৃঢ়	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
শিথিল	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

চিত্র নং ২৫

॥ ১৫ ॥

বাংলা ধ্বনির বৈশিষ্ট্য : তুলনামূলক দৃষ্টিতে

(Features of Bengali Sounds ; A Comparative Approach)

আগে আমরা বাংলা স্বনিমের যে স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছি (পৃঃ ২৯০-৩০১)। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি একই ভাষার অন্তর্গত একটি ধ্বনি থেকে অন্য ধ্বনির স্বাতন্ত্র্যের কারণ বা চিহ্ন। কিন্তু প্রত্যেক ভাষার ধ্বনির এমন কিছু বৈশিষ্ট্যও থাকে যে বৈশিষ্ট্যগুলি সেই ভাষার ধ্বনিসমূহকে অন্য ভাষার ধ্বনিসমূহ থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করে। ব্যক্তির যেমন ব্যক্তিত্ব আছে, তেমনি প্রত্যেক ভাষারও একটি ব্যক্তিত্ব আছে। এই ব্যক্তিত্বের প্রধান পরিচয় হল অন্য ভাষা থেকে তার স্বাতন্ত্র্য। আর এই স্বাতন্ত্র্যের প্রথম ও প্রধান অভিজ্ঞান হল তার ধ্বনিগুলির নিজস্ব উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য। বর্তমান অধ্যায়ে বাংলা ধ্বনির এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে যে বৈশিষ্ট্যগুলি সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান ভাষার ধ্বনি থেকে বাংলা ভাষার ধ্বনিকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

অন্য ভাষার ধ্বনির সঙ্গে তুলনা করলেই একটি ভাষার ধ্বনির স্বাতন্ত্র্য সবচেয়ে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। আর তুলনামূলক দৃষ্টিতে বাংলা ধ্বনির স্বাতন্ত্র্য সন্ধানে অগ্রসর হলে প্রথমেই চোখে পড়ে সংস্কৃত ধ্বনি থেকে বাংলা ধ্বনির স্বাতন্ত্র্য। যদিও ব্যাপক অর্থে সাধারণত বলা হয় যে, সংস্কৃত থেকেই নানা ধাপ পেরিয়ে বাংলা ভাষার জন্ম তবু সংস্কৃতের ধ্বনিসম্পদের সামগ্রিক উত্তরাধিকার বাংলায় বর্তায় নি। সংস্কৃতের অনেক ধ্বনিই বাংলায় এখন আর প্রচলিত নেই, উপরন্তু বাংলায় এমন কিছু নতুন ধ্বনির উদ্ভব হয়েছে যা সংস্কৃতে ছিল না। ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, সংস্কৃতের ঞ্, ণ, (অন্তস্থ) য্, (য়), (অন্তস্থ) ব্ (ব়), ষ্, স্ ধ্বনি বাংলায় নেই। আমরা আগেই বলেছি, 'ঞ্'-এর ব্যবহার বাংলায় খুবই কম, শুধু 'মিঞা' প্রভৃতি দু'একটি শব্দে পাওয়া যায়। সেখানেও এর নিজস্ব সংস্কৃত উচ্চারণ বজায় নেই, সেখানে এর উচ্চারণ হয়েছে অন্য রকম। 'ঞ' সংস্কৃতে ছিল নাসিক্য ব্যঞ্জন, বাংলায় একক উচ্চারণে অনেকটা অনুনাসিকতাযুক্ত অর্ধস্বরের মতো হয়েছে (মিঞা = [মিয়াঁ] = [mie̯ã বা mijã])। আর যেখানে এটি সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে আছে সেখানেও এর উচ্চারণগত নানা রূপান্তর সাধিত হয়েছে। যেমন— 'পঞ্চ' অর্থাৎ পঞ্ চ = [পন্‌চ] = [pɔnco]; এখানে 'ঞ'-এর উচ্চারণ হয়েছে [ন্]। আবার 'প্রজ্ঞা' অর্থাৎ 'প্রজ্ঞা' হয়েছে [প্রোগ্‌গাঁ] = [proggã] বা [প্রগ্‌গাঁ] = [prɔggã]। সংস্কৃতের মূর্ধন্য 'ণ্'-এরও মূল উচ্চারণ বাংলায়

বাংলায় নেই। এটি এখন বাংলা লিখিত বানানে বেঁচে থাকলেও বাংলা উচ্চারণে এটি দন্ত্য 'ন্'-এর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। মূল সংস্কৃত মূর্ধন্য 'ণ্'-এর উচ্চারণ অনেকটা 'ড়্'-এর মতো, কিন্তু এখন বাংলায় এর উচ্চারণ দন্ত্য 'ন্' হয়ে গেছে। যেমন প্রাণ = [প্রান] = [pran]। তেমনি সংস্কৃতের অন্তঃস্থ য্ (য়্) এবং অন্তঃস্থ ব্ (ৱ্)-এর উচ্চারণ ছিল যথাক্রমে [য়্] = [j] এবং [ওয়্] = [w], অর্থাৎ দু'টিই ছিল অর্ধস্বর। সংস্কৃতের 'য্' (য়্) বাংলায় শব্দের গোড়ায় অথবা অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় উচ্চারিত হয় বর্গীয় জ্-[ɟ]-এর মতো ; যেমন সংস্কৃত যমুনা [jamuna] : বাংলায় যমুনা = [জোমুনা] = [ɟomuna], সংস্কৃত কার্য [ka:rja] : বাংলায় [কার্জো] [karɟo]। সংস্কৃতের অন্তঃস্থ 'ব্' (ৱ্) বাংলায় উচ্চারিত হয় বর্গীয় 'ব্' (ব্)-এরই মতো। যেমন— সংস্কৃত অবসান [awasa:n] : বাংলা অবসান = [অবোসান] = [ɔboʃan] ইত্যাদি। সংস্কৃতে তিনটি শিস্ধ্বনি (Sibilants) ছিল : 'শ্' 'ষ্' ও 'স্'। সংস্কৃতে এই ধ্বনি তিনটি স্বতন্ত্র স্বনিম (Phoneme) রূপেই স্বীকৃত ছিল। পশ্চিমবাংলার দেশীয় উচ্চারণে (native pronunciation) এখন এই তিনটির জায়গায় একটি মাত্র শিস্ধ্বনি স্বতন্ত্র স্বনিম রূপে স্বীকৃত। সেটি হল 'শ্' / ʃ /। আর দন্ত্য 'স্' শোনা যায় শুধু এই মূলধ্বনির উচ্চারণ-বৈচিত্র্যরূপে বা উপধ্বনি রূপে। যেমন—শ্রী = [স্রী] = [sri:] ইত্যাদি।

এছাড়া সংস্কৃতের দন্ত্য 'স্' বাংলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তালব্য 'শ্' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন সংস্কৃত 'শাসন' বাংলা উচ্চারণে [শাশোন্] = [ʃaʃo:n]। সংস্কৃতের দন্ত্য 'স্' বাংলায় যেখানে দন্ত্য 'স্' [s]-রূপেই উচ্চারিত হয় সেখানেও তা মূলধ্বনি তালব্য 'শ্'-এরই উপধ্বনি রূপে বিবেচিত হয়, যেমন—সংস্কৃত 'স্ত্রী' : বাংলা 'স্ত্রী' = [স্ত্রী = stri:]। পশ্চিমবাংলার শিক্ষিত লোকের উচ্চারণে কখনো কখনো দন্ত্য 'স্'-এর উচ্চারণ শোনা যায় বটে, কিন্তু সেটা সংস্কৃত শব্দের নয়, বিদেশি শব্দের উচ্চারণে। যেমন সিনেমা = cinema [sinema] ইত্যাদি। মূর্ধন্য 'ষ্'-ও বাংলায় স্বতন্ত্র স্বনিম নয়। মূর্ধন্য 'ষ' লিখিত বানানে প্রচলিত থাকলেও বাংলায় তার উচ্চারণ অধিকংশ ক্ষেত্রে তালব্য 'শ্' [ʃ] ই। যেমন 'বিষ' বাঙালির খাঁটি দেশীয় উচ্চারণে 'বিশ্' = [bi:ʃ]-রূপেই শোনায়। কেবল মূর্ধন্য ধ্বনির সংস্পর্শে থাকলে তার প্রভাবে যেকোনো শিস্ ধ্বনিই মূর্ধন্য উচ্চারিত হতে পারে, সেটা পরিবেশ-প্রভাবিত উচ্চারণগত বৈচিত্র্য বা উপধ্বনি। যেমন, কেষ্টা = [কেষ্‌টা] = [keṣṭa], তেমনি দেশ্‌টা = [দেষ্‌টা] = [deṣṭa]।

সংস্কৃতের অনেকগুলি ব্যঞ্জনধ্বনি বাংলায় যেমন তাদের স্বনিমীয় সত্তা হারিয়েছে তেমনি বাংলায় একটি নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি স্বনিমীয় স্বীকৃতি লাভ করেছে। সেটি হল 'ড়্' / ɽ / আগে একে 'ড' /d/-এর উপধ্বনি মনে করা

হত। কিন্তু আজকাল 'রেডিও', 'রড্' প্রভৃতি বিদেশি শব্দ বাংলায় বহুপ্রচলিত হওয়ায় 'ড্'-এর সঙ্গে 'ড়্'-এখন আর পরিপূরক অবস্থানে (Complementary Distribution) নেই। ফলে 'ড়্' ধ্বনিটি এখন আধুনিক বাংলার স্বতন্ত্র স্বনিম রূপে স্বীকৃত। এ ছাড়া 'ঢ়্' [ɽ^{h}]-কেও কেউ কেউ বাংলা স্বনিম রূপে গ্রহণ করতে চান। কারণ 'রাঢ়ী' প্রভৃতি শব্দে এর উচ্চারণ রয়েছে।

বাংলায় সংস্কৃতের যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি মোটামুটিভাবে রয়ে গেছে, সেসব ধ্বনির মধ্যে কোনো-কোনোটি মূল উচ্চারণ বজায় রেখেছে, কোনো-কোনোটি মূল উচ্চারণ থেকে অনেকটা সরে এসেছে। বাংলায় প-বর্গীয় ধ্বনি [প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্] ও ক-বর্গীয় ধ্বনি [ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্] সংস্কৃতের মূল স্বরূপেই বিদ্যমান। কিন্তু চ-বর্গীয় ধ্বনি [চ্, ছ্, জ্, ঝ্] বাংলায় তাদের আদি স্বরূপ বজায় রাখতে পারে নি। সংস্কৃতে এগুলি ছিল তালব্য ধ্বনি—এগুলি শক্তভালুর (Hard Palate) মধ্যভাগ থেকে উচ্চারিত হত। বাংলায় এগুলি হয়েছে তালু-দন্তমূলীয় (Palato-Alveolar) ধ্বনি। এদের উচ্চারণ-স্থান একটু এগিয়ে এসেছে; বাংলায় এগুলির উচ্চারণ-স্থান হল শক্তভালুর (Hard Palate) সম্মুখভাগ ও দন্তমূলের (Alveolae) সংযোগ-স্থল। তাছাড়া মূল বৈদিক সংস্কৃতে চ্, ছ্, জ্, ঝ্ ছিল স্পর্শ ধ্বনি, লৌকিক সংস্কৃতে (Classical Sanskrit) এগুলি ঘৃষ্টধ্বনি (Affricate Sound) হল। এগুলির সঠিক ধ্বনিবৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা হল যথাক্রমে [cʃ cʃ^{h} ɟʒ ɟʒ^{h}]। ট-বর্গীয় ধ্বনি সংস্কৃতে উচ্চারিত হত তালুর সর্বোচ্চ স্থান মূর্ধা (dome) থেকে ; তাই এগুলি ছিল যথার্থ মূর্ধন্য ধ্বনি। কিন্তু বাংলায় যে ক'টি ট-বর্গীয় ধ্বনি আছে [ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ড়্, ঢ়্] তাদের উচ্চারণ-স্থান শক্তভালুর সম্মুখভাগ প্রাক্-শক্তভালু (pre-palate)। এইজন্যে সংস্কৃতের ট-বর্গীয় ধ্বনি থেকে বাংলার ট-বর্গীয় ধ্বনির স্বাতন্ত্র্য আছে। সংস্কৃতে এগুলি ছিল যথার্থ মূর্ধন্য (domal / cerebral) ধ্বনি ; বাংলায় এগুলি হয়েছে প্রাক্-শক্তভালুর ধ্বনি (pre-palatal)। এইজন্যে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এগুলিকে উত্তর-দন্তমূলীয় ('Supra-alveolar') বা অগ্রবর্তী প্রতিবেষ্টিত ('Forward or Pre-retroflex') ধ্বনি বলেছেন। বাংলায় এগুলি তালুর একেবারে সামনের অংশ থেকে উচ্চারিত হয় বলে এগুলি উচ্চারণ করার সময় জিভের অগ্রভাগকে পিছন দিকে খুব বেশি উল্টে দিতে হয় না, সেইজন্যে বাংলায় এগুলি পুরোপুরি প্রতিবেষ্টিত (retroflex) ধ্বনিও নয়। সংস্কৃতে 'র্'-এর উচ্চারণ-স্থান ছিল ট-বর্গীয় ধ্বনির মতো মূর্ধা ('ঋ-টু-র-ষাণাং মূর্ধা'), কিন্তু বাংলায় 'র্'-এর উচ্চারণ স্থান দন্তমূল (Alveolae)। অন্যদিকে সংস্কৃতে 'ল্'-কে ত-বর্গীয় ধ্বনির মতো দন্ত্য ধ্বনি ('ঌ-তু-ল-সানাং দন্তাঃ') বলা হত, কিন্তু বাংলায় এই 'ল্'-এরও উচ্চারণ-স্থান হয়েছে দন্তমূল।

সংস্কৃতে ত-বর্গীয় সব ক'টি ধ্বনি (ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্)-কে সাধারণত দন্ত্য (dental) ধ্বনি বলা হলেও সূক্ষ্ম বিচারে শুধু 'ত্' 'থ্' 'দ্' ও 'ধ্' ছিল দন্ত্য (dental) ধ্বনি, আর 'ন্' ছিল দন্তমূলীয় (alveolar) ধ্বনি। আসলে তখনকার দিনে দন্ত্য ও দন্তমূলীয় ধ্বনিকে পৃথক্-রূপে ধরা হত না। সংস্কৃতের এই পাঁচটি ত-বর্গীয় ধ্বনিই বাংলায় মূল সংস্কৃত রূপেই থেকে গেছে।

স্বরধ্বনির ক্ষেত্রেও সংস্কৃত থেকে বাংলার কিছু স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। সংস্কৃতের স্বরধ্বনির তুলনায় বাংলায় একক স্বরধ্বনির (Monophthongs) সংখ্যা অনেক কম। সংস্কৃতে একক স্বরধ্বনি ছিল ৮টি / অ আ ই ঈ উ ঊ এ ও /। / ঋ ৠ ঌ / ছিল অর্ধব্যঞ্জন (Sonant)। বাংলায় একক স্বরধ্বনি মাত্র ৭টি— / ই এ অ্যা আ অ ও উ /। ঌ-কারের ব্যবহার লৌকিক সংস্কৃতেই (Classical Sanskrit) লোপ পেয়েছিল, বাংলাতেও নেই। আর ঋ-কারের ব্যবহার বাংলা বানানে থাকলেও তার উচ্চারণ হল 'রি' [= র্ + ই] অর্থাৎ একটি ব্যঞ্জন + একটি স্বর। সুতরাং বাংলায় 'ঋ' এখন একটি একক ধ্বনি নয়। সংস্কৃতের কিছু ধ্বনি যেমন বাংলায় লোপ পেয়েছে, বাংলায় তেমনি কিছু নতুন ধ্বনির সৃষ্টি হয়েছে। এরকম একটি ধ্বনি হল 'অ্যা' /æ/ বাংলায় 'এমন', 'এখন' প্রভৃতি শব্দে এই ধ্বনি শোনা যায়। যেমন—অ্যামন /æmon/, অ্যাখন /$æk^{h}on$/ ইত্যাদি।

সংস্কৃত 'অ'-ধ্বনি থেকে বাংলা 'অ'-ধ্বনির উচ্চারণও অনেকটা পৃথক্। সংস্কৃত 'অ'-ধ্বনিটি ছিল প্রসারিত (spread) এবং এর উচ্চারণ ছিল অনেকটা ইংরেজির পশ্চাৎ প্রসারিত 'অ'-এর মতো [ʌ]। সংস্কৃত 'অ' ছিল পশ্চাৎ স্বর 'আ' [*a*]-এর হ্রস্ব রূপ। কিন্তু বাংলা 'অ' ধ্বনিটি কুঞ্চিত (rounded)। তাছাড়া সংস্কৃত 'অ'-ধ্বনি নিম্ন (low) স্বর, বাংলা 'অ'-ধ্বনি হল মধ্যনিম্ন (low-mid) স্বর।

সংস্কৃতে উচ্চারণের দিক থেকে (phonetically) স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য সুনির্দিষ্ট। সেখানে হ্রস্বস্বর ছিল অ, ই, উ / a i u / এবং দীর্ঘস্বর ছিল আ, ঈ, ঊ, এ, ও / a: i: u: e: o: /। হ্রস্বস্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হত না এবং দীর্ঘস্বর হ্রস্ব উচ্চারিত হত না। স্বনিমীয় স্তরে (phonemically) হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, হ্রস্বস্বরের স্থানে দীর্ঘস্বর বসালে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হত। যেমন— সংস্কৃতে কুল / kul / 'বংশ, পরিবার' ; কিন্তু কূল / ku:l / 'নদীর তীর'। বাংলায় লিখিত বানানে সংস্কৃতের উত্তরাধিকার অনুসারে হ্রস্ব-দীর্ঘ পার্থক্য বজায় রাখা হয় বটে ; কিন্তু বাংলা উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ বানান অনুসারে হয় না। বাংলায় বানানে হ্রস্ব স্বরধ্বনি লিখিত থাকলেও সেটি দীর্ঘ উচ্চারিত হতে পারে, যেমন—কুল = [ku:l] 'বংশ'। আবার বানানে দীর্ঘস্বর লিখিত থাকলেও তার উচ্চারণ হ্রস্ব হতে পারে। যেমন কূলের = [kule·r] 'নদীর তীরের'। সুতরাং বাংলায় কোনো স্বরই সুনির্দিষ্টভাবে হ্রস্ব বা দীর্ঘ নয়। পরিবেশ-পরিস্থিতির বিশেষ

নিয়ম অনুসারে বাংলায় একই স্বরের উচ্চারণ কখনো হ্রস্ব, কখনো দীর্ঘ। বাংলায় এক অক্ষরের শব্দ (monosyllabic word) যদি পৃথক্ শব্দ রূপেই উচ্চারিত হয়, তা হলে তার স্বরধ্বনি দীর্ঘ উচ্চারিত হয় (যেমন—মা = [ma], কুল = [ku:l])। কিন্তু এক অক্ষরের শব্দ অন্য শব্দের সঙ্গে যদি যুক্ত হয়ে পূর্বপদ রূপে থাকে তাহলে তার স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয় না (যেমন—কুলশীল [kulʃi:l])। আবার একের বেশি অক্ষরে গঠিত শব্দে শেষ অক্ষরের স্বরটি অর্ধ-দীর্ঘ হয়। যেমন—কুলের = [kule·r]। বাংলায় স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ স্বরের অবস্থান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ; তা স্বনিমীয় পার্থক্য (phonemic contrast) সৃষ্টি করে না।

সংস্কৃতে যৌগিক স্বর মাত্র দু'টি—'ঐ' এবং 'ঔ'। বাংলায় কারো মতে আঠারোটি, কারো মতে আরো বেশি।

এইভাবে সংস্কৃত ধ্বনির সঙ্গে তুলনায় বাংলা ধ্বনির অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটিত হয়। তেমনি ইউরোপের প্রধান ভাষা ইংরেজি, জার্মান, ফরাসির সঙ্গে তুলনা করলেও বাংলা ধ্বনিবিধির আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। যেমন—বাংলায় মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (ফ্, ভ্, থ্, ধ্, ঠ্, ঢ্, ছ্, ঝ্, খ্, ঘ্) স্বতন্ত্র স্বনিমরূপে স্বীকৃত। কিন্তু ঐ সব ইউরোপীয় ভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনি স্বতন্ত্র স্বনিম নয়, কোনো কোনো ভাষায় অল্পপ্রাণ ধ্বনিরই উপধ্বনি মাত্র। যেমন, ইংরেজিতে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি হল একই স্পর্শধ্বনির দু'টি উপধ্বনি। স্পর্শধ্বনিটি শব্দের আদিতে থাকলে মহাপ্রাণ উচ্চারিত হয় (যেমন—kill = [kʰil]) ; কিন্তু /s/-এর পরে থাকলে অল্পপ্রাণ উচ্চারিত হয় (যেমন—skill = [skil])। এইখানে ইংরেজির সঙ্গে বাংলার একটি মূল পার্থক্য। ইংরেজির মতো বাংলায় অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ একই স্বনিমের দু'টি উপধ্বনি নয়, বাংলায় অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন হল স্বতন্ত্র স্বনিম। ইংরেজির /θ f v/-কে (think, fever, voice) আমরা সাধারণত যথাক্রমে থ্, ফ্, ভ্-রূপে লিখে থাকি ; কিন্তু এগুলি ইংরেজিতে মহাপ্রাণ স্বনিম হিসাবে স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত হয়নি, কারণ এগুলির অল্পপ্রাণ রূপ ইংরেজিতে প্রচলিত নেই ; এক্ষেত্রে অল্পপ্রাণ বনাম মহাপ্রাণ স্বনিমীয় বিরোধ সৃষ্টি হয় না। ইংরেজির /θ f v / ইত্যাদি থেকে বাংলায় /থ্, ফ্, ভ্/ ইত্যাদি ধ্বনির উচ্চারণগত (phonetic) স্বাতন্ত্র্যও আছে। ইংরেজিতে ধ্বনি হল উষ্মধ্বনি, কিন্তু বাংলা /থ্ ফ্, ভ্/ হল স্পর্শধ্বনি। তাছাড়া ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি /f v/ হল দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি, কিন্তু বাংলা /ফ্ ভ্/ হল দ্বি-ওষ্ঠ্য বা বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য ধ্বনি। বাংলা ধ্বনির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, বাংলায় উষ্মধ্বনির সংখ্যা খুবই কম। ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষায় যে দন্তৌষ্ঠ্য উষ্মধ্বনি /f v/ আছে তা বাংলায় নেই। ঐ তিন ভাষায় শিস্ ধ্বনি /s ʃ/-এর যে সঘোষ রূপ /z ʒ/ পাওয়া যায় ; বাংলায় তাও বিদেশি শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ বা উপভাষাগত

বৈচিত্র্য ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় না। ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান ভাষায় উষ্মধ্বনি অনেক বেশি। যেমন—জার্মান /f v ʃ ʒ s z/, এছাড়া আছে [X] ; ইংরেজি /f v ʃ ʒ s z/ ইত্যাদি ; এবং ফরাসি /f v ʃ ʒ s z/ ; কিন্তু আদর্শ চলিত বাংলায় (SCB) আছে মাত্র দু'টি উষ্ম /ʃ h /। বড় জোর আর একটি উষ্মধ্বনি 'স্' [s] শোনা যায় তৎসম বা বিদেশি শব্দের মূলানুগ উচ্চারণে (সিনেমা, Cinema, সার্কাস Circus ইত্যাদি) এবং 'শ্'-এর উপধ্বনিরূপে (যেমন শ্রী = [স্রী = sri])। ঘৃষ্টধ্বনির ক্ষেত্রেও বাংলা ধ্বনির কিছু স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। সূক্ষ্ম ধ্বনি-বৈজ্ঞানিক বিচারে বাংলার ঘৃষ্টধ্বনি চ্, জ্, ইংরেজির ঘৃষ্টধ্বনি চ্, জ্, থেকে পৃথক্। বাংলার /চ্ জ্/ হল [cʃ ɟʒ] অর্থাৎ যথাক্রমে চ্ + শ্ ও জ্ + শ্ ; কিন্তু ইংরেজির /cɟ/ হল [tʃ dʒ] অর্থাৎ যথাক্রমে /t+ʃ/ ও /d+ʒ/। অন্য দিকে লক্ষণীয় যে, ফরাসিতে 'চ্' 'জ্' [c ɟ] ধ্বনিই নেই। বাংলার ঘৃষ্টধ্বনিতে যে দু'টি করে ধ্বনি মিশে আছে সেই দু'টি ধ্বনির উচ্চারণ-স্থান হল তালু (Hard Palate) ও দন্তমূলের (Alveolae) সংযোগ-স্থল। কিন্তু ইংরেজি ঘৃষ্টধ্বনিতে যে দু'টি করে ধ্বনি মিশে আছে তাদের মধ্যে প্রথমটির উচ্চারণ-স্থান হল দন্তমূল আর দ্বিতীয়টির উচ্চারণস্থান হল তালু ও দন্তমূলের সংযোগ-স্থল। আবার জার্মান ভাষার ঘৃষ্টধ্বনি থেকে বাংলার ঘৃষ্টধ্বনি আরো পৃথক্। জার্মানে দু'টি ঘৃষ্টধ্বনি /pf/ ও /ts/ (Pferd = [pfe:rt] 'ঘোড়া', Zeitgeist = [tsaitgaist] 'কালপুরুষ'। প্রথমটির [pf] দু'টি উপাদানের উচ্চারণ-স্থান যথাক্রমে ওষ্ঠ ও দন্তৌষ্ঠ, আর দ্বিতীয়টির [ts] দু'টি উপাদানেরই উচ্চারণ-স্থান দন্তমূল। এরকমের উপাদানে গঠিত ঘৃষ্টধ্বনি বাংলায় নেই।

বাংলায় ট্, ড্, /ṭ ḍ/-এর সঙ্গে সাধারণত ইংরেজি ও জার্মান ভাষার /t d/-কে আমরা উচ্চারণের দিক থেকে এক মনে করি। কারণ বাংলা ট্, ড্ ইত্যাদির উচ্চারণ-স্থান হল শক্ততালুর সম্মুখ-ভাগ প্রাক্-শক্ততালু (pre-palate), কিন্তু ইংরেজি ও জার্মানের ঐ দু'টি ধ্বনির উচ্চারণ-স্থান হল দন্তমূল (alveolae)। অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি ও জার্মানের মধ্যে এক্ষেত্রে উচ্চারণগত পূর্ণ সাদৃশ্য না থাকলেও নৈকট্য আছে।

অর্ধস্বর বাংলা, ইতালীয় ও ইংরেজিতে অনেকটা একই। বাংলায় য়্, ওয়্ / ĕ ŏ / ; ইতালীয় ও ইংরেজিতে /w j/ ; জার্মান ভাষায় মাত্র একটি—/j/; কিন্তু ফরাসি ভাষায় আবার তিনটি /w j ɥ/।

নাসিক্য ব্যঞ্জনে বাংলা ধ্বনির সঙ্গে ইংরেজি ও জার্মান ভাষার ধ্বনির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বাংলা, ইংরেজি ও জার্মান তিনটে ভাষাতেই নাসিক্য ব্যঞ্জন হল ম্, ন্, ঙ্ /m n ŋ/ , কিন্তু এক্ষেত্রে ফরাসি ভাষা থেকে বাংলার পার্থক্য চোখে পড়ে। এই ভাষায় ঙ্ /ŋ/ ধ্বনি নেই। অন্যদিকে বাংলা, ইংরেজি ও জার্মান

ভাষায় ঞ্ /ɲ/ নেই। কিন্তু ফরাসি ভাষায় ঞ্ /ɲ/ ধ্বনির প্রাধান্যের কথা অনেকেই জানেন। অথচ ঞ্ /ɲ/ ধ্বনি সংস্কৃতে থাকলেও বাংলায় নেই।

ইংরেজি স্বরধ্বনির সঙ্গে বাংলা স্বরধ্বনির তুলনা করলে বাংলা স্বরধ্বনিরও একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। বাংলা একক স্বর একক ধ্বনি (monophthong) রূপেই উচ্চারিত হয়। জার্মান ও ফরাসি ভাষাতেও তা-ই। কিন্তু আমেরিকার ইংরেজিতে তা দ্বিস্বরের (diphthongised) রূপ নেয়। এক্ষেত্রে জার্মান ও ফরাসি ভাষার সঙ্গে বাংলার যেমন সাদৃশ্য আছে, ইংরেজি থেকে তেমনি পার্থক্য রয়েছে।

ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষার সঙ্গে তুলনায় বাংলা স্বরধ্বনির আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ইংরেজি ও জার্মানে কোনো কোনো স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ স্বনিমীয় পার্থক্য সৃষ্টি করে। যেমন—ইংরেজি sit /sit/ ও seat /si:t/, জার্মান Lamm/lam/ 'ভেড়া' ও lahm /la:m/ 'খোঁড়া'। কিন্তু বাংলায় স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ এরকম স্বনিমীয় পার্থক্য সৃষ্টি করে না। এ ব্যাপারে বাংলার সঙ্গে বরং ফরাসি ভাষার সাদৃশ্য আছে। ফরাসি ভাষাতেও স্বনিমীয় স্তরে স্বরধ্বনির হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ নেই। বাংলা ভাষার সঙ্গে ফরাসি ভাষার স্বরধ্বনির আরো একটি দিকে মিল আছে। বাংলার স্বরধ্বনির অনুনাসিক রূপ পৃথক্ স্বনিমরূপে স্বীকৃত (যেমন বিধি ও বিঁধি, এরা ও এঁরা)। ফরাসিতে বাংলার মতো সব স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে না হলেও অনেকগুলি স্বরধ্বনির ক্ষেত্রেই এই মৌখিক অনুনাসিক ভেদ স্বনিমীয় পার্থক্য সৃষ্টি করে (যেমন—/gã:ʒ/ gage 'বন্ধক' ও /gã:ʒ/ Gange 'গঙ্গা নদী')। অন্য দিকে সংস্কৃত ভাষায় স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে স্বনিমীয় স্তরে মৌখিক-অনুনাসিক ভেদ নেই। সংস্কৃত থেকে বাংলার এই স্বাতন্ত্র্যটি লক্ষণীয়।

জিহ্বার অবস্থান ও ওষ্ঠের আকৃতির কথাটি ছেড়ে দিয়ে আমরা যদি শুধু মৌখিক-অনুনাসিক ভেদের দিক থেকে স্বরধ্বনির বিচার করি তাহলে আমরা আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করব যে বাংলার সঙ্গে ফরাসি ভাষার অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। ইংরেজি ও জার্মানে স্বনিমীয় স্তরে কয়েকটি স্বরধ্বনিতে হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদ আছে, বাংলায় নেই, ফরাসিতেও নেই। বাংলা স্বরধ্বনির একটি বৈশিষ্ট্য হল এখানে প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনির (Primary Cardinal Vowels) মতো সম্মুখ স্বর প্রসারিত (spread) ও পশ্চাৎ স্বর কুঞ্চিত (rounded)। কিন্তু ফরাসি ও জার্মান ভাষায় প্রসারিত সম্মুখ স্বর ও কুঞ্চিত পশ্চাৎ স্বর ছাড়াও গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনির (Secondary Cardinal Vowels) মতো কিছু কুঞ্চিত সম্মুখ স্বর পাওয়া যায়। যেমন—ফরাসি /y ø œ œ̃/, জার্মান /ø ø: y y:/। ইংরেজিতে আছে প্রসারিত পশ্চাৎস্বর /ʌ/। মৌলিক স্বরধ্বনি কাঠামো অনুসারে বাংলার স্বরধ্বনির সঙ্গে একদিকে ফরাসি ভাষার, অন্যদিকে ইংরেজি ও জার্মান ভাষার স্বরধ্বনির তুলনা করলে বাংলা স্বরধ্বনির স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্যটি সহজেই ধরা পড়বে (চিত্র নং ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ দ্রষ্টব্য)।
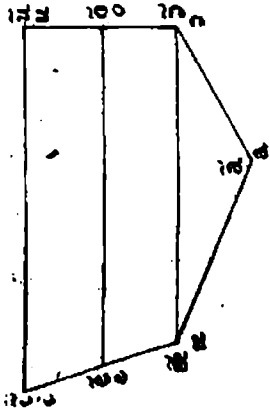
চিত্র নং ২৬ : বাংলা স্বরধ্বনি
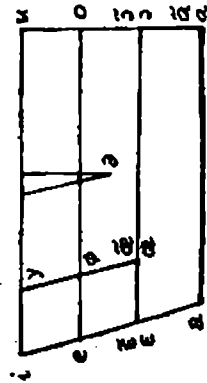
চিত্র নং ২৭ : ফরাসি স্বরধ্বনি
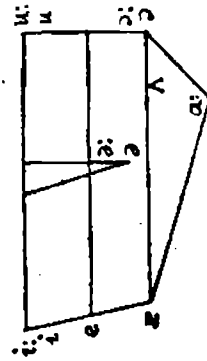
চিত্র নং ২৮ : ইংরেজি স্বরধ্বনি
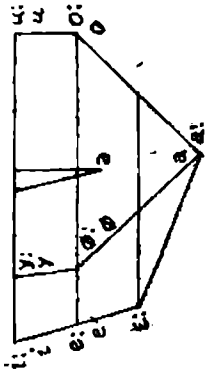
চিত্র নং ২৯ : জার্মান স্বরধ্বনি

॥ ১৬ ॥

ধ্বনির অবস্থান ও ধ্বনি-সমাবেশ : বাংলা ভাষার ধ্বনি
(Distribution and Combination of Sounds : Sounds of Bengali)

ব্যক্তির পরিচয় যেমন তার শুধু ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ নয়, তার সামাজিক সম্পর্কের রীতিনীতিও তার ব্যক্তিত্বের পরিচিতিকে পূর্ণাঙ্গ করে, তেমনি কোনো ভাষার ধ্বনির শুধু একক স্বরূপের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যই তার সামগ্রিক রূপকে উদ্‌ঘাটিত করে না, তার জন্যে ভাষার ধ্বনিসমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্কের বিবৃতিও প্রয়োজন। কারণ, ভাষার বিচারে বিচ্ছিন্ন ধ্বনির কোনো উপযোগিতা নেই, ধ্বনিগুলি পরস্পরের সঙ্গে নানাভাবে সম্মিলিত হয়েই ভাষার সামগ্রিক রূপ রচনা করে। তাই কোনো ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় একক ধ্বনির বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটন করে তাদের তালিকা (inventory) প্রণয়নের যেমন উপযোগিতা আছে, তেমনি ধ্বনিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও সম্পর্কের (combination) রূপরীতি-বিশ্লেষণেরও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বরং বলা হয়, এই একক ও সমষ্টিগত দু'টি দিকই ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের পরস্পর-নির্ভরশীল এবং পরিপূরক অঙ্গ[৩০]। বাংলা ভাষার ধ্বনির একক স্বরূপের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আমরা ইতিমধ্যে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এবারে ধ্বনিসমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্মিলনের দিকটি আলোচনা করা হবে।

ভাষার ধ্বনি-সমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্কেরও আবার দু'টি দিক আছে : শব্দমধ্যে ধ্বনিগুলির অবস্থান (Distribution) এবং একটি ধ্বনির সঙ্গে অন্যধ্বনির সংযোগ-সম্মিলন (Combination)। এদের মধ্যে দ্বিতীয়টির আলোচনা এত সমৃদ্ধ যে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে সেটি নিয়ে ধ্বনিতত্ত্বের একটি শাখাই গড়ে উঠেছে, তাকে বলা হয় ধ্বনিসংযোগবিধি (Phonotactics)।

অবস্থান (Distribution) :

শব্দের মধ্যে ধ্বনির অবস্থান (Distribution) তিন জায়গায় হতে পারে— শব্দের আদিতে, মধ্যে ও অন্ত্যে। এই আদি (initial), মধ্য (medial) ও অন্ত্য

৩০। "Inventar and Kombinationsregein sind also unmittelber von einander abhängig ; sie bilden ein Zusammenhängendes komplementäres System"–Werner, Otmar : *Phonemik des Deutschen.* Stuttgart, MCMLXXII, p. 75.

(Final)—ত্রিবিধ অবস্থানের সব ক'টিতেই সব ভাষার সব ধ্বনি বসে না। এ বিষয়ে সব ভাষারই কোনো কোনো ধ্বনি সম্পর্কে বাঁধা-ধরা বিধিনিষেধ আছে। আবার এই নিয়ম প্রত্যেক ভাষায় খানিকটা পৃথক্। বাংলা ভাষারও ধ্বনি-অবস্থানের কিছু কিছু বিধিনিষেধ আছে ; তবে সেটা অন্যান্য ভাষার মতো তেমন জটিল নয়। কারণ বাংলায় প্রায় সব ধ্বনি আদি, মধ্য ও অন্ত্য ত্রিবিধ অবস্থানেই বসে, কেবল দু'একটির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু প্রায় সব ধ্বনি সব অবস্থানে বসে, সেহেতু তার বিস্তৃত তালিকা দেবার প্রয়োজন নেই, কেবল তার বিধিনিষেধগুলির কথা উল্লেখ করা যাক। যেমন : বাংলায় ঙ্ /ŋ/ ধ্বনিটি শব্দের মধ্যস্থানে (রাঙ্তা) ও অন্তে (রং = রঙ্) বসে, কিন্তু শব্দের আদিতে বসে না। 'ঙ্' /ŋ/ ধ্বনির অবস্থানের এই বৈশিষ্ট্য অধিকাংশ ভাষায় লক্ষ্য করা যায়। হিন্দিতে তো এই বিধি রয়েছেই, ইংরেজি ও জার্মান ভাষাতেও এই বিধি লক্ষ্য করা যায়। 'হ্' /h/ ধ্বনিটিকে বাংলায় শব্দের আদিতে ও মধ্যে পাওয়া যায়। (যেমন—হোম /hom/, মহন্ /mɔhan/ ইত্যাদি)। কিন্তু শব্দের শেষে 'হ্'-ধ্বনির অবস্থান খুবই কম, শুধু দু'একটি বিস্ময়সূচক শব্দের শেষে 'হ্'-ধ্বনি ক্ষীণভাবে শোনা যায় (যেমন বাঃ = বাহ্ /bah/ ইত্যাদি)। সে ক্ষেত্রে এর ধ্বনিচরিত্রও একটু পরিবর্তিত হয়ে যায়। সাধারণত বাংলায় 'হ্' হচ্ছে সঘোষ ধ্বনি। কিন্তু শব্দের অন্তে এটি যখন উচ্চারিত হয় তখন এটি অঘোষ হয়ে যায়। ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় h শব্দের আদিতে থাকলে উচ্চারিত হয়। (যেমন—ইংরেজি house /haus/, জার্মান haus /haus/ ; ব্যতিক্রম ইংরেজি honour) ; কিন্তু স্বরধ্বনির পরে থাকলে উচ্চারিত হয় না (যেমন—ইংরেজি ah! /a:/, জার্মান nehmen/ne:men/)। ফরাসি ভাষায় 'হ্' [h] ধ্বনির উচ্চারণই হয় না।

বাংলায় 'ড্' /ḍ/ ধ্বনিটি শব্দের আদিতে বসে (যেমন—ডাব) ; মধ্য অবস্থানে এই ধ্বনিটিকে অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় (যেমন—বড্ড /bɔḍḍo/, মণ্ডল /mɔnḍol/ ইত্যাদি), কিন্তু শব্দের মধ্য অবস্থানে দুই স্বরের মাঝখানে এই ধ্বনিকে এককরূপে পাওয়া যায় খুবই কম ; শুধু রেডিও /reḍio/, সোডা /ʃoḍa/ প্রভৃতি বিদেশি শব্দে এবং সুডৌল /ʃudoul/ প্রভৃতি দু'-একটি বাংলা শব্দে 'ড্' ধ্বনিটিকে এরকম অবস্থানে পাওয়া যায়। শব্দের অন্তে 'ড্'-এর অবস্থান আরো কম। কেবল রড্ /rɔḍ/ প্রভৃতি দু'-একটি বিদেশি শব্দে অন্ত্য অবস্থানে 'ড্' ধ্বনিকে পাওয়া যায়। বাংলায় 'ড়্' /ɽ/ ধ্বনিকে শব্দের মধ্যে দুই স্বরের মাঝখানে পাওয়া যায় (যেমন—বাড়ি /baɽi/, তাড়া /taɽa/ ইত্যাদি), শব্দের অন্তেও পাওয়া যায় (যেমন—ঘাড় /gʰaɽ/ ইত্যাদি) ; কিন্তু শব্দের আদিতে 'ড়্' ধ্বনিটিকে কখনো পাওয়া যায় না। 'ড়্'

/ḍʰ/ ধ্বনিটি বাংলায় শব্দের আদিতে বসে (যেমন—ঢাকা /ḍʰaka/ ইত্যাদি), কিন্তু মধ্যে ও অন্তে প্রায়ই বসে না। 'ঢ়' /ṛʰ/ ধ্বনিটি শব্দের আদিতে কখনো বসে না, মধ্যে ('মাঢ়ী') ও অন্তে ('আষাঢ়') লিখিত বানানে পাওয়া গেলেও বাংলা উচ্চারণে এটি প্রায়ই অল্পপ্রাণ ('ড়') হয়ে যায় (যেমন—মাঢ়ী = [maṛi], আষাঢ় [aʃaṛ]; বাংলায় 'ঢ়'-এর উচ্চারণ প্রায় নেই বললেই চলে (ব্যতিক্রম—রাঢ়ী raṛʰi)। বাংলায় একক মহাপ্রাণ ধ্বনি প্রায়ই শব্দের শেষে অল্পপ্রাণ রূপে উচ্চারিত হয় (যেমন—দুধ = দুদ্ [dud] ইত্যাদি)। হিন্দিতে এমনটি হয় না, সেখানে শব্দের শেষে মহাপ্রাণ ধ্বনির উচ্চারণ বজায় আছে (যেমন—দুধ = দুধ্ [dudʰ])। বাংলায় কখনো-কখনো আবার শব্দের অন্তে অঘোষ ধ্বনি সঘোষ উচ্চারিত হয়। (যেমন—কাক্ = কাগ্ [kag] ইত্যাদি), যদিও এমনটি সব সময় হয় না (যেমন—লোক = [lok], টাক = [ṭak] ইত্যাদি)। জার্মান ভাষায় আবার উল্টো প্রক্রিয়া ঘটে, সেখানে শব্দের শেষে সঘোষ ধ্বনি সর্বদা অঘোষ হয়ে যায়, বা বলতে পারি শব্দের শেষে সঘোষ ধ্বনি লিখিত বানানে থাকলেও সেটি অঘোষ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয় অর্থাৎ কার্যত শব্দের শেষে সঘোষ ধ্বনি বসেই না। যেমন—lieb-এর উচ্চারণ [lip]। বাংলায় কিন্তু শব্দের শেষে সঘোষ ধ্বনি প্রায়ই উচ্চারিত হয় (যেমন—রোগ = [rog], যোগ = [ɟog])।

শব্দের মধ্যে এই ভাবে ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান ও উচ্চারণের ব্যাপারে বাংলায় কিছু বিশেষ নিয়ম আছে। স্বরধ্বনির অবস্থানের বিষয়ে বাংলায় বিধিনিষেধ খুবই কম। বাংলায় প্রায় সব স্বরধ্বনি শব্দের মধ্যে সব অবস্থানে বসে ; কেবল অ /ɔ/ ধ্বনিটি বাংলায় জার্মান ও ফরাসির মতো শব্দের আদি ও মধ্য অবস্থানে বসে ; (যেমন—অল্প / ɔlpo /, সৎ / ʃɔt / ইত্যাদি) ; কিন্তু অন্ত্য অবস্থানে বসে না। শব্দের অন্ত্যে বাংলায় প্রায়ই 'অ' /ɔ/-এর জায়গায় 'ও' /o/ উচ্চারিত হয় ; যেমন—বড় = বড়ো /boṛo/, নিহত = নিহতো /nihɔto/, বন্ধ = বন্ধো /bɔndʰo/। শব্দের আদিতে ও মধ্যে অ / ɔ / এবং ও / o / ধ্বনির অবস্থানের এসব নিয়ম অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বরসঙ্গতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যেমন—অতি > ওতি, অমিয় > ওমিয়, গতি > গোতি, অপু > ওপু, মধু > মোধু। অনুনাসিক স্বর অঁ / ɔ̃ / বাংলায় শব্দের আদিতে ও অন্ত্যে বসে না, একে মধ্য অবস্থানে পাওয়া যায় (যেমন—গঁদ /gɔ̃d/)। বাংলায় ইংরেজি ও জার্মানের মতো এ /e/ ধ্বনিটি আদি, মধ্য ও অন্ত্য তিন অবস্থানেই বসে। এখানে ফরাসি ভাষা থেকে বাংলার স্বাতন্ত্র্য আছে। ফরাসিতে /e/ ধ্বনিটি শুধু আদিতে ও অন্ত্যে বসে (যেমন—etal = /ete/ 'অবস্থা', pré /pre/ 'ভূমি. ক্ষেত্র'), কিন্তু মধ্যস্থানে উচ্চারিত হয় না। বানানে যদি 'e' মধ্যস্থানে থাকে

তা হলে তার উচ্চারণ হয় / ɛ /। যেমন—belles-lettres =/bɛl lɛtr/, 'রম্যরচনা'। 'অ্যা' / æ / ধ্বনিটি বাংলার একটি অভিনব ধ্বনি ; এই ধ্বনিটি সংস্কৃতে ছিল না। এই ধ্বনিটির অবস্থানের ব্যাপারে আবদুল হাই দেখাতে চেয়েছেন যে, এটি শুধু আদি ও মধ্য স্থানে বসে, অন্তে বসে না। তাঁর মতে শব্দের অন্তে যেখানে 'অ্যা' আছে মনে হয়, সেখানে তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয় এবং 'অ্যা'-এর উচ্চারণ হয় 'আ' /a/, যেমন—কন্যা = কোন্না / konna/। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন নি, অন্য দৃষ্টান্তে এর নিজস্ব উচ্চারণ বজায় আছে। 'জ্যা' (= ধনুকের ছিলা) শব্দের অন্তে আদর্শ চলিত বাংলায় 'অ্যা' / æ/ উচ্চারণ শোনা যায়, 'জ্যা'-এর উচ্চারণ বাংলায় 'জ্জা' [ɟɟa] নয়। সুতরাং বাংলায় 'অ্যা' /æ/ ধ্বনিটিকে শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত্য তিন অবস্থানেই পাওয়া যায়। এখানে ইংরেজি থেকে বাংলার স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। ইংরেজিতে /æ/ ধ্বনিটিকে আমরা শুধু আদি ও মধ্য অবস্থানে পাই (যেমন—ass/æs/, sat / sæt/) ; কিন্তু অন্ত্য অবস্থানে পাই না। জার্মানে এর কাছাকাছি ধ্বনি হল / ɛ: / ; সেটি শুধু শব্দের আদিতে ও মধ্যে বসে (যেমন—ähnlic/ɛ:nliç/ = 'সদৃশ', Bar /bɛ:r/ = 'ভল্লুক') ; কিন্তু অন্তে বসে না।

বাংলায় দু'টি অর্ধস্বর রয়েছে—'য়্', 'ওয়্' /ĕ ŏ/ বা / j w /। এদের মধ্যে 'য়্' / ĕ / শব্দের মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে বসে (যেমন—পেয়ারা /peĕara/ বা /pejara/, বিজয় /biɟoĕ/ বা /biɟoj / ইত্যাদি) ; ঠিক আদি অবস্থানে একে পাওয়া যায় না, কারণ যেসব শব্দে আদি অবস্থানে এর থাকার কথা, সেসব শব্দেও এই ধ্বনির আগে একটি 'ই'-এর উচ্চারণ এসে যায় ; যেমন—ফার্সি য়ার' (বন্ধু) > বাংলা ইয়ার। সংস্কৃতের অন্তঃস্থ 'য়' /j/ যদিও অর্ধস্বর তবু বাংলায় শব্দের আদিতে এটি বর্গীয় 'জ্' /ɟ/-এর মতোই উচ্চারিত হয়। (যেমন —যশ ≐ জশ /ɟɔʃ/)। সুতরাং এখানেও 'য়্' /j/-কে বাংলায় শব্দের আদিতে পাই না। বাংলা 'য়্' /ĕ/ যেমন শব্দের আদিতে বসে না, তেমনি 'ওয়্' /ŏ/ শব্দের শেষে বসে না, শুধু শব্দের মধ্য ও আদি অবস্থানে বসে। যেমন—ওয়াড় /ŏaɽ /, ওয়ারিস /ŏariʃ/, হাওয়া /haŏa/, দাওয়া /daŏa/। ইংরেজির দু'টি অর্ধস্বর /; w/ শব্দের মধ্যে শুধু আদি ও মধ্য অবস্থানে বসে, (যেমন— yes/jes/, word /wə:d/, beyond /bijɔnd/, await /əweit/) ; কিন্তু অন্তে বসে না। জার্মান ভাষায় একটিমাত্র অর্ধস্বর /j/ ইংরেজির /j/-এর মতো শুধু আদি ও মধ্য অবস্থানে বসে, (যেমন—Jacket = /jakə/ 'জ্যাকেট', Boje = /bo:jə/ 'বন্যা')। ফরাসির তিন অর্ধস্বরের মধ্যে /j/-কে তিন অবস্থানেই পাই (যেমন—hiérarchie /jerarʃi/ 'পুরোহিততন্ত্র', 'পদমর্যাদার ক্রম', noyade /nwajad/ 'ডুবে যাওয়া', seuil /sœ:j/, 'কিনারা', 'ধার' ;

/w/ ও /ɥ/-কে আদি ও মধ্য অবস্থানে পাওয়া যায় (যেমন– oui /wi/ 'হ্যাঁ', soyeux /swajø/ 'রেশমী', huile/ɥil/ 'তেল', nuage/nɥaːʒ/ 'মেঘ', 'কুয়াসা') ; কিন্তু অন্তে পাই না।

উপরের তুলনামূলক আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, ধ্বনির অবস্থানের ব্যাপারে প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব নিয়ম আছে এবং এটা প্রত্যেক ভাষার স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন।

ধ্বনি-সংযোগ ও ধ্বনি–সমাবেশ (Combination of sounds) : প্রত্যেক ভাষার যেমন ধ্বনি-অবস্থানের নিজস্ব বিধিনিষেধ আছে, তেমনি ধ্বনি-সমন্বয়েরও নিজস্ব নিয়ম আছে। এই নিয়মাবলী ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচিত হয় তাকে ধ্বনি-সমাবেশ-তত্ত্ব (Phonotactics) বলে। আর, প্রত্যেক ভাষার ধ্বনি-সমাবেশ-বিধির মূল স্বাতন্ত্র্য নিহিত রয়েছে তার অক্ষর' (Syllable) গঠনের মূলনীতির মধ্যে। শব্দমধ্যে বিন্যস্ত সব ধ্বনিকে একটানা একসঙ্গে আমরা উচ্চারণ করতে পারি না, কয়েকটি ছোট ছোট ধ্বনিগুচ্ছে ভাগ করে উচ্চারণ করি। শ্বাসবায়ুর এক-এক ধাক্কায় আমরা যে ক'টি ধ্বনি একসঙ্গে উচ্চারণ করি সেই ক'টি ধ্বনি এক-একটি ধ্বনিগুচ্ছ রূপে সংবদ্ধ হয়ে যায় ; ছন্দোবিজ্ঞানে এই রকমের এক-একটি ধ্বনিগুচ্ছকে 'অক্ষর' বা 'দল' (Syllable) বলা হয়। Syllable শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'অক্ষর' না 'দল' হবে—এ নিয়ে ছান্দসিকদের মধ্যে দলাদলির অন্ত নেই, কিন্তু ঠিক ধ্বনি-বৈজ্ঞানিক বিচারে syllable-কে অক্ষর বা দল না বলে 'ধ্বনিগুচ্ছ' বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত। যাই হোক, অক্ষর-গঠনের নিয়ম হল—প্রত্যেক অক্ষরে এক বা একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি থাকতে পারে, কিংবা কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি না-ও থাকতে পারে ; কিন্তু তাতে একটি স্বরধ্বনি অবশ্যই থাকবে। আবার একটি অক্ষরে কখনো একের বেশি স্বরধ্বনি থাকতে পারে না। স্বরধ্বনিই হল অক্ষরের প্রাণ ; তাই একে অক্ষরকেন্দ্র (Syllable Nucleus) বলে। ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনি বেশি মধুর (sonorous) এবং বেশি অনুরণনশীল (resonant)। স্বরধ্বনির এই অধিক অনুরণন তরঙ্গশীর্ষ এবং ব্যঞ্জনধ্বনির স্বল্প অনুরণন নিম্নদেশ রচনা করে। এই জন্যে স্বরধ্বনিকে অক্ষরের শীর্ষ (Peak) ও ব্যঞ্জনধ্বনিকে নিম্নদেশ (Valley) বলে। একটি অক্ষরে তার স্বরধ্বনির আগে যে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে তাকে 'অক্ষরারম্ভ' (Onset) এবং স্বরধ্বনির পরে যে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে তাকে 'অক্ষরান্ত' (Coda) বলে। সব অক্ষরে অক্ষরারম্ভ ও অক্ষরান্ত থাকবেই এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু সব অক্ষরে অক্ষরকেন্দ্র বা 'কেন্দ্রক' (Nucleus) অবশ্যই থাকবে।

শব্দের মধ্যে ধ্বনিসমাবেশ হয় প্রথমে কতকগুলি ধ্বনিগুচ্ছ বা অক্ষর (Syllable) রূপে, তারপরে সেই অক্ষরগুলি মিলিয়ে এক-একটি শব্দ গড়ে

উঠে। সুতরাং প্রত্যেক ভাষার ধ্বনি-সমাবেশের রীতিনীতির স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে মূলত তার অক্ষর-গঠনের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই। কারণ প্রত্যেক ভাষার অক্ষরের গঠন কতকটা স্বতন্ত্র। সুতরাং ভাষার অক্ষর-গঠন (Syllable-structure) বিশ্লেষণ করেই সেই ভাষার ধ্বনি-সমাবেশের প্রাথমিক মূলনীতি উদ্‌ঘাটিত করা যায়।[৩১] সংক্ষেপে স্বরধ্বনিকে (Vowel) 'V' এবং ব্যঞ্জনধ্বনিকে (Consonant) 'C' ধরে বাংলা অক্ষর-গঠনের (Syllable-structure) রূপবৈচিত্র্য এইভাবে উপস্থাপিত করা যায় :

V = ও /o/, এ /e/

VC = আম /am/, আট /aṭ/

CV = মা /ma/, টা /ṭa/, না /na/

CCV = শ্রী /ʃri/, নৃ /nri/

CCCV = স্ত্রী /ʃtri/

CVC = কান /kan/, দান /dan/, বল /bɔl/

CCVC = প্রাণ /pran/, ঘ্রাণ /gʰran/

CCVCC = শুধু দু'একটি বিদেশি শব্দে পাওয়া যায়, যেমন—গ্রান্ট্ /grant/, স্টান্ট /sṭanṭ/.

উপরে বাংলা অক্ষর-গঠনের যে বিভিন্ন রূপবৈচিত্র্য তুলে ধরা হল তাতে দেখা যায় যে, বাংলায় শুধু স্বরধ্বনি বা অক্ষর-কেন্দ্র (Nucleus) নিয়ে একটি অক্ষর গঠিত হতে পারে। যেমন—ও, এ। শুধু অক্ষরারম্ভ ও অক্ষরকেন্দ্র নিয়ে, অক্ষরান্ত বাদ দিয়ে (অর্থাৎ শূন্য o অক্ষরান্ত নিয়ে) অক্ষর গঠন হতে পারে। যেমন—মা (ম্ + আ = C + V)। অন্যদিকে শুধু অক্ষরকেন্দ্র ও অক্ষরান্ত নিয়ে এবং অক্ষরারম্ভ বাদ দিয়ে (অর্থাৎ শূন্য o অক্ষরারম্ভ নিয়ে) অক্ষর গঠিত হতে পারে। যেমন—আম (আ + ম্ = V + C)। আবার অক্ষরারম্ভ (onset), অক্ষরকেন্দ্র (nucleus) ও অক্ষরান্ত (coda) তিনটি অংশ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ অক্ষরও বাংলায় গঠিত হতে পারে। যেমন—দান = (দ্ + আ + ন্ = CVC)। বাংলায়

৩১। "These rules can be summed up by stating the syllable structure of a language, and all longer stretches can be explained as a succession of syllables, since in principle no sequences occur in these longer stretches which cannot be accounted for in this way."–O'Connor, J. D. : *Phonetics*, Penguin book. 1974. p. 229.

এই যে চার রকম অক্ষর গঠন পাওয়া যায় :

(১) Nucleus

(২) Onset + nucleus,

(৩) Nucleus + Coda,

(৪) Onset + Nucleus + Coda,

এরকমের গঠন তো প্রায় সব ভাষাতেই পাওয়া যায়। এখানে বাংলা ভাষার কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। আসল স্বাতন্ত্র্য রয়েছে অক্ষরারম্ভে ও অক্ষরান্তে যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে তার সংখ্যা ও সংযোগের রীতিতে। যেমন খাঁটি বাংলায় অক্ষরান্ত অংশে একের বেশি ব্যঞ্জন পাওয়া যায় না অর্থাৎ অক্ষরান্ত অংশে বাংলায় যথার্থ সংযুক্ত ব্যঞ্জন পাওয়া যায় না। যেখানে অক্ষরান্ত অংশে সংযুক্ত ব্যঞ্জন আছে মনে হয় সেখানে আসলে তথাকথিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের প্রথম ধ্বনিটি একটি অক্ষরের অক্ষরান্ত এবং বাকি ধ্বনি বা ধ্বনিগুলি পরবর্তী অক্ষরের আরম্ভ অংশ। যেমন 'গন্ধ' শব্দে মনে হতে পারে 'ন্ধ' একটি সংযুক্ত ব্যঞ্জন এবং এটি অক্ষরান্ত অংশে আছে। কিন্তু আসলে তা নয়। এখানে শব্দটি দু'ধাক্কায় উচ্চারিত হচ্ছে—গন্ + ধ। এখানে দু'টি অক্ষর আছে। 'ন্ধ'-এর 'ন্' অংশটুকু প্রথম অক্ষরের অন্ত ও 'ধ্' অংশটুকু দ্বিতীয় অক্ষরের আরম্ভ। বাংলায় তা হলে যথার্থ সংযুক্ত ব্যঞ্জন অক্ষরান্ত অংশে পাওয়া যায় না, শুধু আরম্ভ অংশেই পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দি ও ইংরেজিতে অক্ষরান্ত অংশেও সংযুক্ত ব্যঞ্জন পাওয়া যায়। যেমন হিন্দিতে 'বন্ধ্'। জার্মানে চারটি পর্যন্ত ব্যঞ্জন পাওয়া যায়। যেমন Herbst= 'শরৎকাল'। অক্ষরারম্ভে ও অক্ষরান্তে ব্যঞ্জনধ্বনির সংযোগ এবং অক্ষরকেন্দ্রের স্বরধ্বনির স্বরূপে ভাষাবিশেষের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এইসব অংশে যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে তাদের পারস্পরিক সংযোগের রীতিতেও প্রত্যেক ভাষার স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। সব ভাষায় সব ধ্বনি সব ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না, কেবল বিশেষ ধ্বনিই বিশেষ ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয় এবং এই মিলনের স্বরূপেরও বৈশিষ্ট্য আছে। কোনো ভাষায় ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির সম্মিলন দু'রকম হতে পারে—অক্ষরারম্ভে বা অক্ষরান্তে ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সম্মিলন এবং অক্ষরকেন্দ্রে অবস্থিত একটি স্বরের সঙ্গে অন্য স্বরের যোগ। প্রথমটি সংযুক্ত ব্যঞ্জন ও দ্বিতীয়টি যৌগিক স্বর রূপে পরিচিত। কোনো ভাষায় অক্ষরের (Syllable) প্রারম্ভে (Onset) অথবা অন্তে (Coda) অবস্থিত যে ক'টি ব্যঞ্জন অক্ষরকেন্দ্রিক স্বরধ্বনির সঙ্গে এক ধাক্কায় উচ্চারিত হয় সে ক'টি ব্যঞ্জনকে যথার্থ সংযুক্ত ব্যঞ্জন (Consonant cluster) বলে। সাধারণত ধারণা হল যে, বানানে দু'টি ব্যঞ্জন এক সঙ্গে যুক্ত থাকলে (যেমন—'অন্তর' শব্দের 'ন্ত') তা হল সংযুক্ত ব্যঞ্জন অথবা দু'টি ব্যঞ্জনের মাঝখানে কোনো স্বরধ্বনি না থাকলে সেই ব্যঞ্জন দু'টি হল সংযুক্ত ব্যঞ্জন

(যেমন—'আল্‌তা' শব্দের 'ল্‌ + ত্‌')। কিন্তু এখানে 'ন্ত' বা 'ল্‌ত্‌' সংযুক্ত ব্যঞ্জন নয়। কারণ এগুলি এক ধাক্কায় উচ্চারিত হচ্ছে না ; 'ন্ত'-এর 'ন্‌' উচ্চারিত হচ্ছে 'অ'-এর সঙ্গে (অন্‌), আর 'ত্‌' উচ্চারিত হচ্ছে শব্দ-শেষের 'র্‌'-এর সঙ্গে (তর)। 'অন্তর' শব্দটির ধ্বনিগুলি এইভাবে দু' ধাক্কায় উচ্চারিত হচ্ছে—অন্‌ + তর্‌। তেমনি 'আল্‌তা' উচ্চারিত হচ্ছে আল্‌ + তা রূপে। তাই ঠিক-ঠিক সংযুক্ত উচ্চারণ হচ্ছে না বলে ধ্বনিবৈজ্ঞানিক বিচারে 'ন্ত' বা 'ল্‌ত্‌' এখানে সংযুক্ত ব্যঞ্জন নয়। কিন্তু 'স্ত্রী' শব্দে 'স্‌ + ত্‌ + র্‌'—এই তিনটি ব্যঞ্জন এক ধাক্কায় উচ্চারিত হচ্ছে, তাই 'স্ত্র্‌' হল খাঁটি সংযুক্ত ব্যঞ্জন। এ প্রসঙ্গে বাংলার প্রতিষ্ঠিত ধ্বনিবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সংজ্ঞাটি মনে রাখা দরকার—

'বিভিন্নস্থানজাত একাধিক ধ্বনি নিশ্বাসের এক প্রয়াসে উচ্চারিত হ'য়ে যদি একাত্মতা লাভ করে তা হ'লেই তা যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনি বা consonant cluster নামে অভিহিত হবার যোগ্যতা অর্জন করে।"[৩২]

এখানে ব্যঞ্জন-সমাবেশ (Consonant Combination) ও সংযুক্ত ব্যঞ্জনের (Consonant Cluster/Conjunct Consonant) মধ্যে পার্থক্যটি বোঝা দরকার। একাধিক ব্যঞ্জনের মাঝখানে কোনো স্বরধ্বনি যদি না থাকে এবং সেই ব্যঞ্জনগুলি যদি নিকট সন্নিবিষ্ট হয় তবে তাদের ব্যঞ্জন-সমাবেশ (Consonant Combination) বলতে পারি। যেমন—'অন্তর' শব্দের ন্‌ + ত্‌। কিন্তু একাধিক ব্যঞ্জনের মধ্যে যদি স্বরধ্বনি না থাকে, সেই ব্যঞ্জনগুলি যদি নিকট সন্নিবিষ্ট হয় এবং নিশ্বাসের এক ধাক্কায় উচ্চারিত হয় তবে তাদের সংযুক্ত ব্যঞ্জন (Consonant Cluster) বলে। যেমন—'স্ত্রী' শব্দের স্‌ + ত্‌ + র্‌। সব সংযুক্ত ব্যঞ্জনই ব্যঞ্জন-সমাবেশ, কিন্তু সব ব্যঞ্জন-সমাবেশ যথার্থ সংযুক্ত ব্যঞ্জন নয়। বাংলায় ব্যঞ্জন-সমাবেশের সংখ্যা দু'শ'য়েরও বেশি, কিন্তু খাঁটি সংযুক্ত ব্যঞ্জন খুব কম, মুহম্মদ আবদুল হাই-এর মতে মাত্র ৩৬টি। হাই-এর এই হিসাবে বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের সংযুক্ত ব্যঞ্জনও সঙ্গত কারণেই গৃহীত। আমরা যদি বিদেশি শব্দের সংযুক্ত ব্যঞ্জনগুলি আলাদা করে ধরি তা হলে খাঁটি বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জন হল ২৮টি। যেমন—

/ʃp/ স্প্‌ (স্পর্শ), /ʃpʰ/ স্ফ্‌ (স্ফটিক), /ʃpr/ স্প্র্‌ (স্পৃহা), /ʃt/ স্ত্‌ (স্তর), /ʃtr/ স্ত্র্‌ (স্ত্রণ), /ʃtʰ/ স্থ্‌ (স্থূল), /ʃk/ স্ক্‌ (স্কন্ধ), /ʃkʰ/ স্খ্‌ (স্খলন), /ʃn/ স্ন্‌ (স্নায়ু), /ʃr/ শ্র্‌ (শ্রী), /ʃl/ শ্ল্‌ (শ্লীল), /pr/ প্র্‌ (প্রাণ, /br/ ব্র্‌ (ব্রণ), /bʰr/ ভ্র্‌ (ভ্রাতা), /tr/ ত্র্‌ (ত্রাস), /dr/ দ্র্‌ (দৃষ্টি), /dʰr/ ধ্র্‌ (ধ্রুপদ), /cʰr/ ছ্র্‌ (কৃচ্ছ্র), /ɟr/ জ্র্‌ (জৃম্ভণ), /kr/ ক্র্‌ (ক্রোধ), /gr/

৩২। হাই, মুহম্মদ আবদুল : 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব', ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ. ১২৪।

গ্র্ (গৃহ), /gʰr/ ঘ্র্ (ঘ্রাণ), /mr/ ম্র্ (মৃদু), /nr/ ন্র্ (নৃশংস), /pl/ প্ল্ (প্লীহা), /kl/ ক্ল্ (ক্লেশ), /gl/ গ্ল্ (গ্লানি, /ml/ ম্ল্ ম্লান)। এগুলি ছাড়া ভিন্ন ভাষা থেকে আগত বিদেশি শব্দের ৮টি সংযুক্ত ব্যঞ্জন বাংলায় অল্পবিস্তর প্রচলিত আছে। যেমন—/ʃt/ স্ট্ (স্টেশন), /pʰr/ ফ্র্ (ফ্রেম frame) /tʰr/ থ্র্ (থ্রো = throw), /tr/ ট্র্ (ট্রাম, ট্রেন), /dr/ ড্র্ (ড্রাম, ড্রেন), /kʰr/ খ্র্ (খ্রীস্টাব্দ, খ্রীস্ট), /pʰl/ ফ্ল্ (ফ্ল্যাট), /bl/ ব্ল্ (ব্লাউজ) ইত্যাদি। এগুলি ছাড়া তৎসম শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণে বাংলায় যে আরো দু'টি সংযুক্ত ব্যঞ্জন পাওয়া যায় তা অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সে দু'টি হল—/hr/ হ্র্ (হ্রাস), /hl/ হ্ল্ (হ্লাদিনী)

বাংলা সংযুক্ত ব্যঞ্জনগুলি নির্ণয়ের পরে এই প্রসঙ্গে বাংলায় সংযুক্ত ব্যঞ্জন রচনার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—বাংলায় শ্ + ঘোষধ্বনি প্রায় বিরল। অনেক ইউরোপীয় আর্য ভাষায় শব্দের আদিতে নাসিক্য ব্যঞ্জন + মৌখিক ব্যঞ্জন প্রায়ই পাওয়া যায় না, কিন্তু বাংলায় পাওয়া যায়। যেমন—নৃত্য [নৃিত্তো] । অবশ্য /ŋ/ (ঙ্) আদি ধ্বনিরূপে বাংলায় বসে না। বাংলায় উষ্ম ব্যঞ্জন + ন পাওয়া যায়, যেমন স্নান। শব্দের আদিতে যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রথম ধ্বনিরূপে 'ল্' বা 'র্' বাংলায় পাওয়া যায় না।

বাংলা সংযুক্ত ব্যঞ্জনের একটি বৈশিষ্ট্য হল—এখানে সমস্থানজাত একাধিক স্পর্শ ব্যঞ্জনের সংযোগ চোখে পড়ে না। সংযুক্ত উপাদানগুলির মধ্যে একটি স্পর্শ ব্যঞ্জন থাকলেও থাকতে পারে, অন্যটি হয় উষ্ম ব্যঞ্জন, নয় নাসিক্য, নয় কম্পিত বা তরল ব্যঞ্জন। অধিকাংশ ভাষারই সংযুক্ত ব্যঞ্জনে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

ধ্বনি-সংযোগের অন্যদিক হল স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির সংযোগ। যখন একাধিক স্বরধ্বনি একসঙ্গে একটি স্বরধ্বনির উচ্চারণকালের মধ্যে নিশ্বাসের এক ধাক্কায় (one breath impulse) উচ্চারিত হয় তখন তাদের যৌগিক স্বর বা সন্ধ্যক্ষর বলে। দু'টি স্বর যদি পাশাপাশি অবস্থিত হয়েও নিশ্বাসের এক ধাক্কায় উচ্চারিত না হয় তবে সেই দু'টি স্বরকে একত্রে একটা যৌগিক স্বর বলা যাবে না। যেমন 'ওই বইটা দাও' এখানে 'ওই' হল যৌগিক স্বর। কিন্তু 'ও-ই আমায় মেরেছিল, অন্য কেউ মারে নি'—এখানে 'ও-ই'—যৌগিক স্বর নয়। যথার্থ যৌগিক স্বরের অংশস্থানীয় ধ্বনিগুলি এক অক্ষরের অন্তর্গত। স্বনিম হিসাবেও যৌগিক স্বর হল একটি অখণ্ড একক।

উচ্চারণ-প্রক্রিয়ার দিক থেকে বলা যায়—যে স্বরধ্বনির উচ্চারণের সময় তার গুণগত চরিত্র (quality) অপরিবর্তিত থাকে তা হল একক স্বর (Monophthong), আর যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় তার গুণগত চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে যায় তা হল যৌগিক স্বর। স্বরধ্বনির গুণগত স্বরূপ (quality)

নির্ভর করে জিহ্বার অবস্থানের উপরে। সুতরাং যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা একরকম অবস্থানে থাকে তাকে একক স্বর বলে। যেমন—'ই' /i/। এর উচ্চারণে জিহ্বা শুধু উপরে সামনের দিকে থাকে, নানাস্থানে যায় না। আর যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা প্রথমে এক রকম অবস্থানে এবং একটু পরেই অন্য অবস্থানে সরে যায়, অথচ সমস্ত উচ্চারণ-প্রক্রিয়াটা একটি স্বরধ্বনির উচ্চারণকালের মধ্যে সংঘটিত হয়, সেই স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বর বলে। যেমন—বাংলা ঐ = ওই [oi]। এর উচ্চারণের সময় জিহ্বা প্রথমে 'ও'-ধ্বনি উচ্চারণের জন্যে পশ্চাৎ দিকে উচ্চমধ্য (high-mid) অবস্থানে তাকে, তার একটু পরেই 'ই'-ধ্বনি উচ্চারণের জন্যে সামনের দিকে উচ্চ (high) অবস্থানে চলে যায়—এই দু'টি অবস্থান থেকে বাংলা 'ঐ' [ওই] স্বরধ্বনিটি উচ্চারিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে যৌগিক স্বরে দু'টি স্বর যুক্ত হয়ে থাকে, কিন্তু দু'টি স্বরই স্বতন্ত্র একক স্বরের মতো পূর্ণাঙ্গ নয়, দ্বিতীয় স্বরটি অর্ধোচ্চারিত, এই দ্বিতীয় স্বরটিকে বিশেষজ্ঞরা ঠিক স্বরধ্বনি না বলে অর্ধস্বর বলতে চান। 'ঐ' [= ওই = oi] — এই যৌগিক স্বরের দ্বিতীয় স্বর 'ই' হল অর্ধোচ্চারিত এবং এটি অর্ধস্বর।

যৌগিক স্বরধ্বনির মধ্যে যে স্বরধ্বনিগুলি যুক্ত হয়ে থাকে তাদের সংখ্যা অনুসারে যৌগিক স্বরের নামকরণ করা হয়। যেমন—দু'টি স্বরের মিলনে গঠিত হলে দ্বিস্বর (Diphthong), তিনটি স্বরের মিলনে ত্রিস্বর (Triphthong), এমনি করে চতুঃস্বর (Tetraphthong), পঞ্চস্বর (Pentaphthong) ইত্যাদি নামকরণ করা হয়।

সাধারণত ধারণা হল, বাংলায় যৌগিক স্বর মাত্র দু'টি—'ঐ' এবং 'ঔ'। এগুলি প্রত্যেকটি দু'টি করে স্বরের মিলনে গঠিত বাংলার দ্বিস্বর ধ্বনি। যেমন—ঐ = ওই = ও + ই ; ঔ = ওউ = ও + উ। কিন্তু বাংলায় এগুলি ছাড়া আরো দ্বিস্বর ধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন—এই = এ + ই। এখানে 'এ + ই' দু'টি স্বতন্ত্র একক স্বর রূপে উচ্চারিত হচ্ছে না, দু'টি মিলিয়ে একসঙ্গে যৌগিক স্বররূপেই উচ্চারিত হচ্ছে। আসলে বাংলায় শুধু দু'টি যৌগিক স্বর লেখার জন্যে নির্দিষ্ট বর্ণচিহ্ন (ঐ, ঔ) আছে, অন্য যৌগিক স্বরগুলি লেখার জন্যে নির্দিষ্ট বর্ণচিহ্ন নেই, কিন্তু ঠিক উচ্চারণ বিচার করলে বাংলায় দ্বিস্বর (Diphthong) ধ্বনি হল ২৫টি। এগুলি হল—

(১) ইআ /ia/ (দিয়া), (২) ইও /io/ (নিও), (৩) ইউ /iu/ (বিউলি), (৪) এই /ei/ (এই, নেই), (৫) এআ /ea/ (খেয়া), (৬) এও /eo/ (খেও), (৭) এউ /eu/ (ফেউ), (৮) অ্যাএ /æe/ (দেয় = দ্যায়), (৯) অ্যাও /æo/ (দেওর = দ্যাএর), (১০) আই /ai/ (খাই), (১১) আএ /ae/ (খায়), (১২) আও /ao/ (নাও, দাও), (১৩) আউ /au/ (লাউ),

(১৪) অএ /ɔe/ (ছয়), (১৫) অআ /ɔa/ (সয়া), (১৬) অও /ɔo/ (কও), (১৭) ঐ = ওই /oi/ (ওই, পোই-পোই), (১৮) ওএ /oe/ (দোয়), (১৯) ওআ /oa/ (শোয়া), (২০) ঔ = ওউ /ou/ (মৌ), (২১) উই /ui/ (উই), (২২) উএ /ue/ (ধুয়ে, শুয়ে), (২৩) উআ /ua/ (গুয়া), (২৪) উও /ou/ (কুয়ো), (২৫) ইএ /ie/ (দিয়ে)। বাংলার দ্বিস্বর ধ্বনির এই সংখ্যা ইউরোপের দু'টি প্রধান ভাষা ইংরেজি ও জার্মানের তুলনায় অনেক বেশি। আদর্শ ইংরেজিতে দ্বিস্বরধ্বনি মাত্র ৮টি : (১) /ei/ (main/mein), (২) /ou/ (boat/bout), (৩) /ai/ (nine/nain), (৪) /au/ (how/hau), (৫) /ɔi/ (voice/vɔis), (৬) /iə/ (fear/fiə/), (৭) /ɛə/ (care/kɛə/), (৮) /uə/ (poor/puə/)। জার্মান ভাষায় দ্বিস্বরধ্বনি আরো কম, মাত্র ৩টি : (১) /ai/ (Bein/bain/ 'পা'), (২) /ɔy/ (Leute/lɔytə/ 'লোক'), (৩) /au/ (kaufen/kaufən/ 'ক্রয় করা')। আবার ফরাসি ভাষায় কোনো দ্বিস্বর ধ্বনিই নেই।

বাংলা দ্বিস্বর ধ্বনিগুলির গুণগত পরিবর্তন অর্থাৎ একই দ্বিস্বর ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার অবস্থানের পরিবর্তন ৩০নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

চিত্র নং ৩০ : বাংলা দ্বিস্বরধ্বনি

এইসব দ্বিস্বর (Diphthong) ছাড়া বাংলায় কয়েকটি ত্রিস্বর (Triphthong), চতুঃস্বর (Tetraphthong) ও পঞ্চস্বর (Pentaphthong) পাওয়া যায়। যেমন—ত্রিস্বর : (১) ইঁআও /ĩao/ (মিঁয়াও), (২) ইএই /iei/

(দিয়েই), (৩) এঁইও /ẽio/ (হেঁইও), (৪) এইএ /eie/ (ধেইয়ে), (৫) আউই /aui/ (হাউই), (৬) আইও /aio/ (খাইও), (৭) ওইএ /oie/ (কোইয়ে), (৮) ওউই /oui/ (ছ'উই = ছোউই = 6th), (৯) ওআও /oao/ (নোয়াও), (১০) উইও /uie/ (ধুইয়ে), (১১) উইও /uio/ (ধুইও) ইত্যাদি।

চতুঃস্বর : (১) অওআই /ɔoai/ (হওয়াই), (২) আওআই /aoai/ (দাওয়াই), (৩) এওআই /eoai/ (নেওয়াই) ইত্যাদি।

পঞ্চস্বর : আওআইও /aoaio/ (খাওয়াইও) ইত্যাদি।

উপরে যেসব ত্রিস্বর, চতুঃস্বর ও পঞ্চস্বরের উল্লেখ করা হল সেগুলি ঠিক যৌগিক স্বর নয়, কারণ সেগুলির কোনোটি ঠিক শ্বাসবায়ুর এক ধাক্কায় উচ্চারিত হয় না। অর্থাৎ একটি অক্ষরের অন্তর্গত নয়।

॥ ১৭ ॥

বাংলা অবিভাজ্য স্বনিম

(Supra-segmental Phonemes of Bengali)

ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ থেকে বোঝা যাবে যে, অবিভাজ্য স্বনিম (Supra-segmental Phoneme / Prosodic Feature Sound Attribute) পাঁচ প্রকার হতে পারে : (ক) শ্বাসাঘাত (বা প্রস্বন বা বল বা ঝোঁক) (Stress), (খ) স্বরাঘাত (বা সুরাঘাত) (Pitch), (গ) যতি (বা সন্ধান) (juncture), (ঘ) দৈর্ঘ্য (Length) এবং (ঙ) নাসিক্যীভবন (Nasalisation)। এগুলির মধ্যে প্রথম দু'টি হল বাক্যমধ্যে বিশেষ ধ্বনিতে বা বিশেষ পদে জোর দেবার প্রকরণ।

জীবন্ত ভাষা শুনলেই আমরা বুঝতে পারব যে, বাক্যের সব ধ্বনি বা সব শব্দে আমরা সমান গুরুত্ব দিই না এবং সবগুলিকে সমান জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করি না, কোনো কোনো বিশেষ ধ্বনি বা শব্দের উপরে আমরা বেশি গুরুত্ব (emphasis) দিই এবং সেটাকে আমরা বেশি জোর (accent) দিয়ে উচ্চারণ করি। এই জোর (accent = অক্ষর-পরিবৃঢ়ি) দেবার কৌশল দু' রকমের : (ক) শ্বাসাঘাত (বা প্রস্বন বা বল বা ঝোঁক) (Stress accent) এবং (খ) স্বরাঘাত (বা সুরাঘাত) (Pitch accent)। যখন আমরা গলার ভিতর দিয়ে বেশি পরিমাণে এবং জোরে শ্বাসবায়ু বের করে গলার পেশীকে শক্ত করে গলার আওয়াজ বাড়িয়ে জোর দিই তখন সেটাকে বলে শ্বাসাঘাত (Stress)। আর যখন স্বরতন্ত্রী (Vocal Cords) দু'টির কম্পনের দ্রুততা বাড়িয়ে সুর বা

স্বরকে তীব্র করে জোর দিই তখন তাকে বলে স্বরাঘাত বা সুরাঘাত (Pitch)। প্রথমটি নির্ভর করে গলার আওয়াজের (Volume) উপরে, দ্বিতীয়টি নির্ভর করে সুরের (Tone) উপরে। প্রথমটি বাড়ালে আওয়াজের জোর (loudness) বাড়ে, দ্বিতীয়টি বাড়ালে সুরের তীব্রতা (pitch) বাড়ে। প্রথমটিতে শব্দতরঙ্গের বিস্তার (amplitude) বড় হয়, দ্বিতীয়টিতে শব্দতরঙ্গের দ্রুততা (frequency) বাড়ে। প্রতিষ্ঠিত ধ্বনিবিজ্ঞানীর ভাষায় স্বরাঘাত (pitch) এবং শ্বাসাঘাতের (stress) মধ্যে বৈজ্ঞানিক পার্থক্যটি এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় :

> ".......the pitch of a sound depends primarily on the fundamental frequency of the sound-waves whereas the loudness is largely dependent on the amplitude"[৩৩]

স্বরাঘাতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় প্রাচীন ভাষার মধ্যে হোমরের গ্রীকভাষায় এবং আমাদের বৈদিক ভাষায়, আর আধুনিক ভাষার মধ্যে চীনা প্রভৃতি ভাষায়। আর শ্বাসাঘাতের প্রাধান্য রয়েছে আধুনিক ভাষা ইংরেজি, জার্মান প্রভৃতিতে। বাংলা ভাষায় শ্বাসাঘাত ও সুরাঘাতের ভূমিকা ক্রমান্বয়ে আলোচ্য।

(ক) বাংলায় শ্বাসাঘাত (প্রস্বন/বল/ঝোঁক) (Stress in Bengali) :

আগের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে, শ্বাসাঘাত (Stress) হল একপ্রকার অবিভাজ্য ধ্বনি (Supra-segmental Sound)। এই অবিভাজ্য ধ্বনি যখন কোনো ভাষায় অর্থ-নিয়ন্ত্রণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তখন আমরা তাকে সেই ভাষার অবিভাজ্য স্বনিমের (Supra-segmental Phoneme) মর্যাদা দিই। শ্বাসাঘাতের উচ্চারণ-প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করে তার যে বর্ণনা দিয়েছেন ধ্বনিবিজ্ঞানী অধ্যাপক জোন্‌স্‌, তা সর্বজনগ্রাহ্য বলে এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> "*Stress* may be described as the degree of force with which a sound or syllable is uttered. ...it involves a strong 'push' from the chest wall and consequently strong force of exhalation; this generally gives the objective impression of *loudness*."[৩৪]

অর্থাৎ, বাক্যের অন্তর্গত কোনো বিশেষ ধ্বনি (sound) বা অক্ষরের (syllable) উপরে আমরা যদি জোর দিয়ে সেই ধ্বনি বা অক্ষরটিকে উচ্চারণ

৩৩। Ladefoged, Peter : *Three Areas of Experimental Phonetics*, London : Oxford University Press, 1967. p. 56.

৩৪। Jones, Prof. Daniel : *An Outline of English Phonetics*, Cambridge, 1969, p. 245.

করি তবে সেই জোরের মাত্রাকে শ্বাসাঘাত (Stress) বলে। ...এই জোর দেবার সময় আমাদের বুকের পাঁজর সঙ্কুচিত হয়ে ভিতর থেকে চাপ দিয়ে শ্বাসবায়ুকে ঠেলে বের করে দেয় এবং তাতে শ্বাসবায়ু খুব জোরে বেরিয়ে আসার ফলে একটা শব্দ হয়। এতেই আমাদের মনে হয় যে, বিশেষ ধ্বনি বা অক্ষরটিকে যেন একটু বেশি গলার আওয়াজ বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। এইভাবে শ্বাসবায়ুর ধাক্কায় গলার আওয়াজ বাড়িয়ে উচ্চারণ করাকেই বলে শ্বাসাঘাত (Stress/ Respiratory Accent)।

আলোচনার সুবিধার জন্যে সর্বপ্রথমে শ্বাসাঘাতকে আমরা দু'টি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি : (১) শব্দ-শ্বাসাঘাত (Word-stress) এবং (২) বাক্য-শ্বাসাঘাত (Sentence-stress)। যখন কোনো শব্দের অন্তর্গত কোনো বিশেষ ধ্বনি বা অক্ষরের উপরে আমরা শ্বাসাঘাত দিই এবং তার ক্রিয়া সেই শব্দ-বিশেষে সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাকে শব্দ-শ্বাসাঘাত (Word-stress) বলা হয় ; আবার যখন কোনো বাক্যের অন্তর্গত কোনো বিশেষ শব্দের (word) উপরে জোর দেবার জন্যে ঐ শব্দের কোনো অক্ষরকে জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করা হয় এবং তার ক্রিয়া সেই বাক্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাকে বাক্য-শ্বাসাঘাত (Sentence-stress) বলে।

শব্দ-শ্বাসাঘাত (Word-Stress)

শব্দ-শ্বাসাঘাতে কোনো বিশেষ ধ্বনি বা অক্ষরের উপরে যে জোর দেওয়া হয় তার মাত্রাভেদ অনুসারে তাকে মোটামুটিভাবে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় :

(অ) প্রবল বা মুখ্য শ্বাসাঘাত (Strong / Primary Stress)

= [ˈ]....................

(আ) মধ্যম বা গৌণ শ্বাসাঘাত (Medium / Secondary Stress)

= [ˌ]....................

(ই) দুর্বল বা ক্ষীণ শ্বাসাঘাত (Weak Stress)

= [_]....................

এখানে লক্ষণীয় যে, ছন্দোবিশ্লেষণে যেভাবে শ্বাসাঘাত চিহ্নিত করা হয়, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে সেভাবে চিহ্নিত করা হয় না। ছন্দোবিশ্লেষণে শ্বাসাঘাত চিহ্নিত করা হয় শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষরের উপরে বাংলা রেফ্-চিহ্নের মতো হেলানো একটি ছোট বিচ্ছিন্ন রেখা দিয়ে। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানে শ্বাসাঘাত চিহ্নিত করা হয় হেলানো নয়, বাংলা পূর্ণচ্ছেদের মতো খাড়া (Vertical) ছোট্ট রেখা দিয়ে। তা ছাড়া এখানে চিহ্নটি শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষরের উপরে বসে না, শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষরের আগে বসে। শ্বাসাঘাত প্রবল (মুখ্য) হলে চিহ্নটি লাইনের একটু উপরে উঠে থাকে, আর শ্বাসাঘাত মধ্যম বা গৌণ হলে চিহ্নটি লাইনের একটু নিচে নেমে থাকে। আর শ্বাসাঘাত ক্ষীণ হলে অক্ষরের আগে একটা ছোট হাইফেন একটু নিচে নামিয়ে বসানো হয়।

বাংলা শব্দ-শ্বাসাঘাতের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে অধ্যাপক আবদুল হাই-এর গুরুত্বপূর্ণ উক্তি :

"ইংরেজীর মতো বাংলা Stress বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ভাষা নয়।"[৩৫]

এই উক্তির তাৎপর্য দ্বিবিধ : প্রথমত উচ্চারণের দিক থেকে (phonetically) বাংলা শ্বাসাঘাত ইংরেজি বা জার্মান ভাষার শ্বাসাঘাতের মতো প্রবল নয়। দ্বিতীয়ত বাংলায় শব্দ-শ্বাসাঘাত ইংরেজি বা জার্মান ভাষার শ্বাসাঘাতের মতো স্বনিমীয় তাৎপর্যপূর্ণ (phonemically significant) নয়, অর্থাৎ শব্দের অর্থনিয়ন্ত্রণে ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় শ্বাসাঘাতের যেমন ভূমিকা আছে, বাংলায় তেমন নেই। ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় একটি শব্দে শ্বাসাঘাত একটি অক্ষর (syllable) থেকে অন্য অক্ষরে সরে গেলে তাতে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন—

ইংরেজি : ˈin_sult / ˈin_sʌlt 'অপমান' (noun)। (এখানে প্রথম অক্ষরে মুখ্য শ্বাসাঘাত, দ্বিতীয় অক্ষরে দুর্বল শ্বাসাঘাত)

_inˈsult / _inˈsʌlt / 'অপমান করা' (verb)। (এখানে মুখ্য শ্বাসাঘাত দ্বিতীয় অক্ষরে সরে এসেছে, আর দুর্বল শ্বাসাঘাত প্রথম অক্ষরে চলে গেছে)

জার্মান : ˈunter ˌbreiten / ˈuntər ˌbraitən / 'নিচে ছড়ানো'। (এখানে মুখ্য শ্বাসাঘাত প্রথম অক্ষরে ও গৌণ শ্বাসাঘাত তৃতীয় অক্ষরে)

৩৫। হাই, মুহম্মদ আবদুল : 'ধ্বনি-বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব', ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ. ২৯৩।

ˌunter ˈbreiten / ˌuntər ˈbraitən / 'নতি স্বীকার করা, জমা দেওয়া, সম্মুখে রাখা'। (এখানে মুখ্য শ্বাসাঘাত তৃতীয় অক্ষরে সরে এসেছে এবং গৌণ শ্বাসাঘাত প্রথম অক্ষরে চলে গেছে)

বাংলায় এভাবে একটি শব্দে শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তন করাই যায় না ; জোর করে করলে ভাষার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। আর একই শব্দে শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তন করলেও তাতে অর্থের পরিবর্তন হয় না। এদিক থেকে বাংলার সঙ্গে বরং হিন্দি ভাষার শ্বাসাঘাত-বিধির মিল আছে।[৩৬] হিন্দিতেও শব্দমধ্যে শ্বাসাঘাতের স্থান সুনির্দিষ্ট। আর বাংলা ও হিন্দি উভয় ভাষাতেই শব্দ-শ্বাসাঘাত উচ্চারণগত (phonetic) ব্যাপার ; বাংলা বা হিন্দি কোনো ভাষাতেই শব্দ-শ্বাসাঘাত স্বনিমীয় তাৎপর্যপূর্ণ (phonemic) নয়, অর্থাৎ শব্দমধ্যে শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তিত করলে তাতে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায় না, সুতরাং শব্দের অর্থনিয়ন্ত্রণে শ্বাসাঘাতের কোনো ভূমিকা নেই। শুধু একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় :

/ ˈɔ_tul / ˈঅ-তুল = ব্যক্তির নাম ;

/ _ɔˈtul / _অˈতুল = অতুলনীয়।

কিন্তু এই দুই শব্দে শ্বাসাঘাতের যে পার্থক্য তা সাধারণ অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত বাঙালির মধ্যে পাওয়া যায় না, কেবল সংস্কৃতানুগ উচ্চারণে—আবৃত্তিতে বা বক্তৃতায়—লক্ষ্য করা যেতে পারে। এরকম কিছু কিছু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিন্দিতেও লক্ষ্য করেছেন ভাষাবিজ্ঞানীরা।[৩৭] কিন্তু দু'একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত বাদ দিলে সাধারণভাবে বলা যায়, বাংলায় বা হিন্দিতে শব্দ-শ্বাসাঘাত

৩৬। (ক) In Bengali "stress is not significant, i. e. presence or absence of it does not alter the sense of a word."–Chatterji, Dr. Suniti Kumar : *A Brief Sketch of Bengali Phonetics,* London, 1921, p. 58.

(খ) ......"the stress in Hindi is non-phonemic in contrast with that in English."–Chaturvedi, Dr. M. G. : *A Contrastive Study of Hindi-English Phonology,* Delhi, 1973, p. 111.

৩৭। (ক) Arun, Dr. V. B. : *A Comparative Phonology of Hindi and Panjabi,* Ludhiana, 1961, p. 45.

(খ) महरोत्रा, डॉ. रमेश चन्द्र: 'हिन्दी ध्वनिकी और ध्वनिमी', नई दिल्ली, १९७०, पृ. २५२।

শব্দের অর্থনিয়ন্ত্রণে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে না এবং শব্দমধ্যে শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তনযোগ্যও নয়। বাংলায় শ্বাসাঘাতের স্থান শব্দমধ্যে সুনির্দিষ্ট এবং শব্দের অক্ষর-গঠন (syllabic structure) অনুসারে তার স্থান নিয়ন্ত্রিত হয়। অক্ষরের সংজ্ঞা, গঠন ও তার বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে ইতিমধ্যে ষোড়শ অধ্যায়ে (পৃ. ৩১৪-৩১৭) আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন প্রকারের অক্ষর-যুক্ত শব্দে শ্বাসাঘাতের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

এক অক্ষরের শব্দ (Monosyllabic Words) : এক অক্ষরের শব্দে (যেমন—ও, মা, কান) কোন্ অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়বে তা নির্ণয়ের প্রশ্নই উঠে না, কারণ তাতে একটিমাত্র অক্ষরই আছে। সেই একটিমাত্র অক্ষরযুক্ত শব্দে সামগ্রিকভাবে জোর দিতে চাই কিনা, তা বাক্যের তাৎপর্য বুঝে শব্দটির অর্থের গুরুত্ব অনুসারে নির্ণয় করতে হয়। সুতরাং সেটা শব্দ-শ্বাসাঘাতের নয়, বাক্য-শ্বাসাঘাতের এলাকায় পড়ে।

একাধিক অক্ষরের শব্দ : যে শব্দে একাধিক অক্ষর আছে সেই শব্দে বাংলায় শ্বাসাঘাতের স্থান বাঙালির উচ্চারণগত অভ্যাস অনুসারে সুনির্দিষ্ট (phonetically determined)। কিন্তু হিন্দি ভাষায় একের বেশি অক্ষরে গঠিত শব্দে শ্বাসাঘাত সাধারণত দীর্ঘ অক্ষরের (syllable) উপরে পড়ে থাকে। দীর্ঘস্বরান্ত অক্ষর ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর হল দীর্ঘ অক্ষর। হিন্দিতে আবার দু'টি দীর্ঘ অক্ষরের মধ্যে যদি একটি হ্রস্ব স্বর ও একটি দীর্ঘ স্বরযুক্ত হয় তবে দীর্ঘ স্বরযুক্ত অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে। কিন্তু বাংলায় এই নীতি সর্বদা অনুসৃত হয় না। বাংলায় এসব ক্ষেত্রে শ্বাসাঘাত পড়ে হ্রস্ব-দীর্ঘ অক্ষর বিবেচনা না করে বাঙালির অভ্যাস অনুসারে। যেমন—

বাংলা—উ'পকার /u'pokar/
হিন্দি—উপ্'কার /up'kar/[৩৮]

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলায় প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র শব্দে আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে। কিন্তু এই সূত্রও সর্বক্ষেত্রে গ্রহণীয় নয়। কারণ 'উপকার' শব্দেই আমরা দেখি, 'উ'-এর উপরে জোর নেই, 'প'-এর উপরে জোর আছে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, শব্দের আদিতে যদি উপসর্গ (প্র,পরা, সম, অপ ইত্যাদি) গৌণ অর্থবাচক শব্দাংশ থাকে তবে সেটিতে গৌণ শ্বাসাঘাত

৩৮। Shaw, Rameswar : 'Stress-patterns in Bengali and Hindi : A Comparative Study' in *'Papers in Phonetics and Phonology.'* (General Editor : Professor D. P. Pattanayak Central Institute of Indian Languages, 1984.

(secondary stress) পড়ে এবং শব্দের বাকি অংশে মুখ্য শ্বাসাঘাত পড়ে, যেমন--ˌউপ'কার /ˌupo'kar/। কিন্তু এরকম উপসর্গ বিবেচনা করে অর্থসচেতন থেকে বাঙালি শ্বাসাঘাতের ব্যবহার করে না। বাস্তব উচ্চারণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বাংলায় শ্বাসাঘাত অভ্যাস-নিয়ন্ত্রিত। এবং অভ্যাস অনুসারে 'উপকার' শব্দের শ্বাসাঘাত পড়ে এই রকম–

উ'পকার /u'pokar/

বিভিন্ন প্রকারের অক্ষর-গঠনযুক্ত শব্দে বাঙালির উচ্চারণগত অভ্যাস অনুসারে সুনির্দিষ্ট (phonetically determined) শ্বাসাঘাতের বিন্যাস পরীক্ষা করে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়েছে (এখানে প্রথা অনুসারে, C = Consonant = ব্যঞ্জন, V = Vowel = স্বর, ধরা হয়েছে) :

দুই অক্ষরের শব্দ (Disyllabic / Bi-syllabic Words) : (ক) VCV, CVCV, VCVC ও CVCVC : এই রকমের অক্ষরযুক্ত শব্দে দ্বিতীয় অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে। যেমন—আ'ছে /a'cʰe/, রা'জা /ra'ɟa/, আ'কাশ /a'kaʃ/, ক'মল /kɔ'mal/ ইত্যাদি।

(খ) CVCCVC, VCCVC, CVCCV, CVCCCV ও VCCCVC : এই রকমের অক্ষরযুক্ত শব্দে প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে। যেমন—'চঞ্চল /'cɔncɔl/, 'উৎসব /'utʃɔb/, 'বস্তি /'boʃti/, 'গামছা /'gamcʰa/, 'মন্ত্র /'mɔntro/, 'উদগ্রীব /'udgrib/ ইত্যাদি।

তিন অক্ষরের শব্দ (Tri-syllabic Words) : CVCVCV, CCVCVCCV, VCVCV, VCVCVC, CVCVCCVC ও VCVCCVC—এই রকমের গঠনযুক্ত শব্দে সব ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে। যেমন--ক'বিতা /ko'bita/, প্র'চণ্ড /prɔ'cɔndo/, অ'বলা /a'bola/, উ'পকার /u'pokar/, ই'তিহাস /i'tihaʃ/, নি'রীক্ষক /ni'rikkʰɔk/, আ'হাম্মক /a'hammɔk/ ইত্যাদি।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে, বিভিন্ন প্রকারের গঠনযুক্ত শব্দে শ্বাসাঘাতের অবস্থান বাংলায় বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। তবে বাংলায় শব্দ-শ্বাসাঘাতের অবস্থান যেখানেই হয়ে থাকুক, তা পরিবর্তনযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে ফরাসির সঙ্গে বাংলার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ফরাসিতেও শব্দ-শ্বাসাঘাতের স্থান সুনির্দিষ্ট। দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া ফরাসিতে শব্দ-শ্বাসাঘাত পড়ে সুনির্দিষ্টভাবে শব্দের শেষ অক্ষরেই। অন্য দিকে এ ব্যাপারে ইংরেজি ও জার্মান ভাষা থেকে বাংলার পার্থক্যের কথা আগেই বলেছি। ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় শব্দ-শ্বাসাঘাতের অবস্থান পরিবর্তনযোগ্য। এই দুই ভাষাতেই শব্দের মধ্যে শ্বাসাঘাত এক অক্ষর থেকে অন্য অক্ষরে সরিয়ে আনা যায় এবং তাতে শব্দের অর্থও পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে একটা বিষয় চোখে পড়ে, ইংরেজি ও জার্মান ভাষায়

শব্দ যত বড় হয়, শেষ অক্ষরে শ্বাসাঘাতের প্রবণতা তত কমে যায়। কিন্তু ফরাসিতে শব্দ যতই বড় হোক, শ্বাসাঘাতের স্থান প্রায় সর্বদাই শেষ অক্ষরে। যেমন— restau'rant/rɛstɔ'rã/ 'রেস্তরাঁ', por'ter/pɔr'te/ 'বহন করা'।

বাক্য-শ্বাসাঘাত (Sentence-Stress)

শব্দ-শ্বাসাঘাতে (word-stress) একটি শব্দের কোনো একটি অক্ষরকে (syllable) বেছে নিয়ে তার উপরে জোর দেওয়া হয়, কিন্তু বাক্য-শ্বাসাঘাতে (sentence-stress) একটি বাক্যের কোনো একটি অক্ষরকে নয়, একটি শব্দকে বেছে নিয়ে সেই শব্দটার উপরেই জোর দেওয়া হয় এবং এইভাবে বাক্যের অন্যান্য শব্দের চেয়ে সেই বিশেষ শব্দটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। যেসব ভাষায় শব্দ-শ্বাসাঘাত অর্থকে নিয়ন্ত্রিত করে সেসব ভাষাতেও তা শুধু শব্দেরই অর্থকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু বাক্য-শ্বাসাঘাত অর্থ নিয়ন্ত্রিত করলে তা সমগ্র বাক্যেরই অর্থকে নিয়ন্ত্রিত করে। অর্থ নিয়ন্ত্রণের পরিধির উপরে ভিত্তি করেই প্রথমটিকে শব্দ-শ্বাসাঘাত ও দ্বিতীয়টিকে বাক্য-শ্বাসাঘাত নাম দেবার উপযোগিতা খুঁজে পাওয়া যায়।

ধ্বনিবিজ্ঞানে শব্দ-শ্বাসাঘাত চিহ্নিত করার সুপ্রচলিত রীতি আছে, কিন্তু বাক্য-শ্বাসাঘাত চিহ্নিত করার কোনো সুপ্রচলিত রীতি নেই। কেউ কেউ বাক্য-শ্বাসাঘাত চিহ্নিত করার জন্যে শ্বাসাঘাতপ্রাপ্ত শব্দটির আগে লাইনের একটু উপর দিকে একটি ছোট বৃত্ত (°) বসিয়ে থাকেন। আমরা এখানে সেই রীতি অনুসরণ করে বিভিন্ন শ্রেণীর বাক্যে বাক্য-শ্বাসাঘাতের অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করছি :

একটি বাক্য অনেক সময় কতকগুলি পদগুচ্ছে বা পর্বে (phrase) বিভক্ত থাকে। মোটামুটিভাবে স্বাভাবিকতা বজায় রেখে বাক্যের যতটুকু অংশ এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করা যায় এবং যাতে একটা অর্থগত একক গড়ে উঠে, সেই অংশকে পদগুচ্ছ বা পর্ব (phrase/sense-group/breath-group) বলে। বাংলায় এরকম এক-একটি পদগুচ্ছে শ্বাসাঘাত সাধারণত তার গোড়াতেই পড়ে।[৩৯] আবার বাক্যের বাইরে বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যেক শব্দ ভাষার নিজস্ব রীতি ও জাতীয় অভ্যাস অনুসারে স্বতন্ত্র শ্বাসাঘাত বহন করে ; আর বাক্য-মধ্যে ব্যবহৃত হলে পদগুচ্ছের শ্বাসাঘাতের কাছে শব্দ-শ্বাসাঘাত তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ইংরেজিতে বাক্য-মধ্যে ব্যবহৃত হলেও শব্দ-শ্বাসাঘাত তার নিজস্ব স্থানে বজায় থাকে।

৩৯। "Bengali accent is initial, and a Bengali phrase, or breath-group, or sense-group, has only one stress, an initial one".– Chatterji, Dr. Suniti Kumar : *The Origin and Development of the,*

পদগুচ্ছে শ্বাসাঘাতের অবস্থানেও বাংলার কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। বাংলায় সাধারণ বাক্যে প্রত্যেক পদগুচ্ছের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে। যেমন—

°রামের সঙ্গে / °আরো অনেক লোক / °কলকাতায় / °কাজ করে।

এ ক্ষেত্রে বাংলার রীতি ফরাসির বিপরীত। কারণ ফরাসিতে সর্বদা পদগুচ্ছের শেষ অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে। যেমন—

L'expéri°ence / est le pa°ssé / qui °parle au pré°sent।

(অর্থাৎ, অতীত বর্তমানের কানে-কানে যে কথা বলে তারই নাম অভিজ্ঞতা।)
ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় অবশ্য এ ব্যাপারে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই, পদগুচ্ছে শ্বাসাঘাত অধিকাংশ সময় শেষের দিকের অক্ষরে পড়ে।

বিশেষ গুরুত্বহীন বা সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্য (Neutral or Statement Sentence) : যে-সব বাক্যে আমরা কোনো বিশেষ শব্দের উপরে গুরুত্ব দিতে চাই না, শুধু সাধারণভাবে কোনো কথা বিবৃত করতে চাই, সেইসব বাক্যকে বিশেষ গুরুত্বহীন বা সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্য (Neutral or Statement Sentence) বলে। এই ধরনের বাক্যে বক্তব্যের পরিসমাপ্তি (finality/completion) বোঝালে বাংলায় সাধারণত বাক্যের গোড়ার দিকে শ্বাসাঘাত পড়ে। যেমন—

°রাম কলকাতায় কাজ করে।

এ বিষয়ে হিন্দি ভাষার সঙ্গে বাংলার মিল আছে। যেমন—

হিন্দি—°রাম্ কল্‌কত্তে মেঁ কাম্ কর্তা হ্যায়্।

কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলার পার্থক্য লক্ষণীয়ভাবে চোখে পড়ে জার্মান ও ফরাসি ভাষার সঙ্গে। এসব ভাষায় সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্যে শ্বাসাঘাত পড়ে বাক্যের শেষের দিকে। যেমন—

জার্মান—Ram arbeitet in °Kalkutta

ফরাসি—Ram travaille à Calcut°ta.

ইংরেজিতে অবশ্য সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্যে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক শব্দে শ্বাসাঘাত পড়ে। আর সাধারণ ক্ষেত্রে বাক্যের গুরুত্বপূর্ণ শব্দ মনে করা হয় বিশেষ্য, মুখ্য ক্রিয়া, প্রশ্নবোধক ও নির্দেশক সর্বনাম ইত্যাদিকে। যেমন—

°Ram °works in °Calcutta.

অবশ্য সাধারণ বাক্যে ইংরেজিতেও শেষের দিকে শ্বাসাঘাতের প্রবণতা থাকে।

বিশেষ বাক্য-শ্বাসাঘাত : যুক্তিমূলক ও আবেগপ্রধান বাক্য (Special Sentence Stress : Logical and Emotional Sentence) : যেসব বাক্যে অন্য কোনো জিনিসের থেকে একটি জিনিষের পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্য দেখিয়ে

সেই জিনিসটির উপর আমরা জোর দিই সেইসব বাক্যকে যুক্তিমূলক বা পার্থক্যমূলক বাক্য (Logical or Contrast Sentence) বলে। এই ধরনের বাক্যে আমরা যে জিনিসটির উপরে জোর দিতে চাই সেই জিনিসটির অর্থজ্ঞাপক শব্দের উপরে শ্বাসাঘাত পড়ে। আমাদের গুরুত্ব দেবার ইচ্ছা অনুসারে আপাতদৃষ্টিতে একই বাক্যে শুধু শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তন করলে বাক্যের অর্থও সূক্ষ্ম পরিবর্তন লাভ করে। যেমন—

"°আমি বই পড়ি।"

—এখানে 'আমি' শব্দটি জোরের সঙ্গে বলায় অর্থ দাঁড়াচ্ছে : 'অন্য লোকে বই পড়ে না ; কিন্তু আমি পড়ি।' অর্থাৎ অন্য লোকের বই পড়ার নেশা নেই, কিন্তু আমার আছে। এখানে অন্য লোক থেকে আমার স্বাতন্ত্র্য দেখানো হয়েছে।

'আমি °বই পড়ি।'

—'বই' শব্দে জোর দেওয়ায় বক্তব্য হচ্ছে : 'আমি নোট পড়ি না, বই পড়ি।' এখানে পড়ার বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য দেখানো হয়েছে।

'আমি বই °পড়ি।'

—এখানে বক্তব্য হল : 'আমি বই শুধু কিনি না, নিয়মিত পড়ি।' এখানে আমার স্বভাবের বৈশিষ্ট্যের উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে।

বিস্ময়, আনন্দ, উত্তেজনা, ক্রোধ ইত্যাদি আবেগ যে বাক্যে প্রকাশ করা হয়, সেই বাক্যকে আবেগপ্রধান বাক্য (Emotional Sentence) বলে। এই রকমের বাক্যে গুরুত্ব অনুসারে বিশেষ শব্দে শ্বাসাঘাত পড়ে, এবং তার ফলে সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্য থেকে আবেগপ্রধান বাক্যের অর্থপার্থক্য সাধিত হয়। যেমন—

সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্য :

'°তুমি যাও।'

—অর্থাৎ তোমার যাবার অভ্যাস আছে।

আবেগপ্রধান বাক্য :

'তুমি °যাও!'

—এখানে ক্রোধের সঙ্গে তোমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তনের ফলে এইভাবে বাংলা বাক্যে অর্থের পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ শ্বাসাঘাত সূক্ষ্মভাবে বাক্যের অর্থ নিয়ন্ত্রিত করে। এই জন্যে বাংলায় বাক্য-শ্বাসাঘাতের স্বনিমীয় তাৎপর্য (phonemic significance) স্বীকৃত। প্রায় সব ভাষাতেই বাক্য-শ্বাসাঘাতের স্বনিমীয় গুরুত্ব রয়েছে।

(খ) বাংলায় সুরাঘাত ও সুরতরঙ্গ (Pitch and Intonation in Bengali) :

স্বরতন্ত্রীর (Vocal Cords) কম্পনের দ্রুততা বাড়িয়ে সুরকে তীব্র করা যায়। এই সুরের তীব্রতা বাড়িয়ে কোনো ধ্বনি বা শব্দের উপরে জোর দিলে তাকে সুরাঘাত বা স্বরাঘাত (Pitch Accent) বলে। যখন কোনো শব্দের অন্তর্গত কোনো বিশেষ ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের উপর সুরাঘাত দেওয়ার ফলে তার দ্বারা শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রিত হয় তখন তাকে শব্দ-সুরাঘাত (Tone) বলে। আবার যখন বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন শব্দে সুরাঘাতের হ্রাসবৃদ্ধি অর্থাৎ সুরের তীব্রতার ওঠা-নামার দ্বারা সমগ্র বাক্যের অর্থ নিয়ন্ত্রিত হয় তখন সেই সুরের ওঠা-নামাকে সুরতরঙ্গ বা স্বরতরঙ্গ (Intonation) বলে। প্রাচীন বৈদিক ভাষায় ও হোমরের ব্যবহৃত গ্রীক ভাষায় এবং আধুনিক চীনা ভাষায় শব্দ-সুরাঘাত (Tone) স্বনিমীয় (phonemic) তাৎপর্যপূণ, অর্থাৎ এই সব ভাষায় শব্দের মধ্যে একটি ধ্বনি থেকে অন্য ধ্বনিতে সুরাঘাতের (চিহ্ন = ´) স্থান বা প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটলে তার ফলে শব্দের অর্থও পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন :

হোমরীয় গ্রীকে—

múria (μύρια) = অনেক 'many' ;
muriá (μυριά) = দশ লক্ষ, 'million'।

কিংবা— eimí (εἰμί) = হওয়া, 'to be' ;
eîmi (εἶμι) = চলে যাওয়া, ছেড়ে যাওয়া, 'to depart'।

তেমনি, বৈদিক ভাষায়—

রা́জপুত্র = রাজা যার পুত্র (বহুব্রীহি সমাস) ;
(এখানে পিতাকে বোঝাচ্ছে, পুত্রকে নয় ; এবং সেই পিতা নিজে রাজা নাও হতে পারেন, পুত্র রাজা হলেই হবে)।

রাজপু́ত্র = রাজার পুত্র (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস) ;
(এখানে পুত্রকে বোঝাচ্ছে, পিতাকে নয়। তবে পিতাই রাজা, পুত্র রাজা নাও হতে পারে)।

বৈদিক ভাষায় স্বরাঘাতের (pitch accent) এই রকম স্বনিমীয় তাৎপর্য (phonemic significance) ছিল এবং স্বরাঘাতের তিনটি শ্রেণী নির্ণীত হয়েছিল : **উদাত্ত** (High or Acute tone), **অনুদাত্ত** (Low or Grave tone) এবং **স্বরিত** (Combined/Circumflex tone)।[৪০]

৪০। "উচ্চৈরুদাত্তঃ। নীচৈরনুদাত্তঃ। সমাহারঃ স্বরিতঃ।"
—পাণিনি : 'অষ্টাধ্যায়ী' ১/২/২৯-৩১।

আধুনিক ভাষার মধ্যে চীনা ভাষায় শব্দের অর্থ-নিয়ন্ত্রণে সুরাঘাতের ভূমিকা এত গুরুত্বপূর্ণ যে একই শব্দ একটু ভিন্ন সুরে উচ্চারণ করলে অর্থের দারুণ বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। কেউ যদি বলতে চান 'সৈন্যরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধে যায়' অথচ ঘোড়া-বাচক শব্দটি তিনি যদি ভুল সুরে উচ্চারণ করে ফেলেন, তাহলে বাক্যটির অর্থই উল্টে যাবে এবং বাক্যটির অর্থ দাঁড়িয়ে যেতে পারে 'সৈন্যরা মায়ের পিঠে চড়ে যুদ্ধে যায়'। কি অদ্ভুত অর্থ-বিপর্যয়! মায়ের পিঠে চড়ে শিশুরা খেলা করতে পারে, কিন্তু মায়ের পিঠে চড়ে সৈন্যরা যুদ্ধে যায় এমন তো শোনা যায় না! এরকম গোলযোগ হবার কারণ হল—ঐ বক্তা জানেন না যে, চীনা ভাষায় 'মা' (ma) শব্দটি এক রকম সুরে বললে তার মানে হবে 'ঘোড়া', আবার অন্যরকম সুরে বললে তার মানে হয়ে যাবে 'মাতা'। শুধু তাই নয়, এই 'মা' শব্দটি চীনা ভাষায় চার রকম সুরে উচ্চারণ করা যায়, এবং তাতে শব্দটির চার রকম মানে হয়ে যায়। যেমন—

১নং সুরে অর্থাৎ উঁচু সমান্তরাল (high level) সুরে

'mā' (মা̄) = মাতা = mother।

২নং সুরে অর্থাৎ উঁচু থেকে আরো ঊর্ধ্বগামী (high rising) সুরে

'má' (মা́) = শণ, পাট = hemp।

৩নং সুরে অর্থাৎ উঁচু থেকে নিচু হয়ে আবার ঊর্ধ্বগামী (high falling to low rising) সুরে

'mǎ' (মা̆) = ঘোড়া = horse।

৪নং সুরে অর্থাৎ নীচু থেকে আরো নিম্নগামী (low falling) সুরে

'mà' (মা̀) = বকা, তিরস্কার করা = to scold।

যেসব ভাষায় সুর (Tone) এতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তাদের সুরনির্ভর ভাষা (Tonal Language) বলে। যেমন—চীনা ভাষা, তিব্বতী ভাষা ইত্যাদি।

চীনা ভাষায় ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, একই শব্দ বিভিন্ন সুরে উচ্চারণ করলে তার বিভিন্ন প্রকার অর্থ হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকমটি সাধারণত ঘটে না। শুধু দু'একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়। এরকম একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নিজেই উল্লেখ করেছেন— "দুই-একটি অব্যয়-শব্দে সুর যোগ করিয়া, বাক্যের সুরের মত সার্থকতা আনা হয় ; যথা—অব্যয় শব্দ [ম্], ইহাকে [উঁ] রূপে লেখা হয় ; সুর-অনুসারে ইহার অর্থ পরিবর্তিত হয় ; যথা—

[ˈউঁ] উচ্চ হইতে উন্নীয়মান সুর = প্রশ্নে ;

[ˋউঁ] উচ্চ হইতে অবনীয়মান সুর = 'তা বটে' এই অর্থে ;

[ˎউঁ] নিম্ন হইতে অবনীয়মান ও প্রলম্বিত সুর = 'বেশ, দেখা যাবে', বা 'বটে, দেখে নেবো' এই অর্থে ;

[˘উঁ] উচ্চ হইতে ঈষৎ অবনমন ও পুনরায় উন্নয়ন='বটে, কিন্তু'—এই অর্থে ;

[উঁ্ (বা উঁ—ঃ)] আকস্মিক দ্রুত উচ্চারণ = আপত্তি-বা বিরক্তি-ব্যঞ্জক।"[৪১]

—এখানে ভাষাচার্য দেখাতে চেয়েছেন যে, বাংলায় একটি শব্দই বিভিন্ন সুরে উচ্চারণ করলে তার অর্থ পৃথক্ হয়ে যায়। কিন্তু এখানেও শব্দটি একক শব্দ হিসাবে গ্রহণীয় নয়, অর্থ বিচার করলে এই একটি শব্দই অনেকটা গোটা বাক্যের তাৎপর্য বহন করে। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যায় শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রণে সুরের (tone) এই রকম বিস্ময়কর ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় চীনা ভাষায় ; কিন্তু বাংলা ভাষায় শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রণে সুরের এ রকম ব্যাপক প্রভাব নেই। এই কথাটি বোঝাবার জন্যে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নিজেই অন্যত্র বলেছিলেন :

> "Intonation or pitch of voice is not a significant element of speech in Bengali"[৪২]

ভাষাচার্যের সমগ্র বক্তব্যটি অনুধাবন না করে কেউ কেউ তাঁর উক্তিটিকে ভুল বুঝেছেন, "Particularly puzzling is Chatterji's assertion that intonation has no distinctive significance in Bengali"[৪৩]

বাংলায় শব্দের অর্থ-নিয়ন্ত্রণে সুরের কোনো ভূমিকা নেই ঠিকই, কিন্তু এ কথার তাৎপর্য এ নয় যে, বাক্যের অর্থ-নিয়ন্ত্রণেও তার কোনো ভূমিকা নেই। বাংলায় একই শব্দ বিভিন্ন সুরে উচ্চারণ করলে তার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয় না। কিন্তু একই বাক্য বিভিন্ন প্রকার সুরতরঙ্গ দিয়ে উচ্চারণ করলে তার অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। একথা ভাষাচার্য নিজেই স্বীকার করেছেন এবং তাঁর লেখায় পরবর্তী অংশে একথা উল্লেখও করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন :

> "...in a sentence intonation is a highly expressive speech attribute in the language [i, e. Bengali] possibly to a greater extent than in English."[৪৪]

৪১। চট্টোপাধ্যায়, ড. সুনীতিকুমার : 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২, পৃ. ৮৬।

৪২। Chatterji, Prof. Suniti Kumar : *A Brief Sketch of Bengali Phonetics*, London. 1921, p. 62.

৪৩। Ferguson,. Charles A. and Chowdhury, Munier : 'The Phonemes of Bengali' in *Language*, Journal of the Linguistic Society of America, Vol. 36, Jan.-March, 1960. p. 25.

৪৪। Chatterji, Prof. Suniti Kumar : *A Brief Sketch of Bengali Phonetics*, London 1921, p. 63.

বাংলায় শ্বাসাঘাতের (stress accent) মতোই সুরাঘাতও (pitch accent/tone) শব্দের ক্ষেত্র স্বনিমীয় তাৎপর্যপূর্ণ (phonemic) নয়। কিন্তু বাক্যের ক্ষেত্রে তার তৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। বাক্যের মধ্যে সুরের উঠা-নামা (modulation) বিভিন্ন প্রকার হতে পারে এবং সেই অনুসারে বাক্যের অর্থও পৃথক পৃথক রূপ লাভ করে। বাংলা বাক্যের সুরতরঙ্গের (Intonation) প্রকারভেদ সম্পর্কে ইতিপূর্বে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ আবদুল হাই প্রমুখ কেউ কেউ আলোচনা করলেও তাকে প্রথম সূত্রবদ্ধ রূপ দান করেন চার্লস্ এ. ফার্গুসন্ ও মুনীর চৌধুরী। তাঁদের সূত্র অনুসরণে এবং অধ্যাপক ড্যানিয়েল জোন্সের প্রদর্শিত সুরতরঙ্গের রৈখিক রূপায়ণের (contour) পদ্ধতি অবলম্বন করে এখানে বাংলা বাক্যের সুরতরঙ্গের মূল প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

সুরতরঙ্গের মূল প্রকারভেদ (kinds) তিন রকম হতে পারে :

(১) ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নগামী বা অবরোহী
(High Falling or Fade) = ↘

(২) নিম্ন থেকে ঊর্ধ্বগামী বা আরোহী
(Low Rising or Rise) = ↗

(৩) সমান্তরাল (Level/Sustained) = →

সুরের তীব্রতারও মাত্রাভেদ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হতে পারে। কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্যে মোটামুটিভাবে সুরের তীব্রতার তিনটি প্রধান গ্রাম বা মাত্রাভেদ (degree) নির্ণয় করা হয়–উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন (High tone, Middle tone, Low tone) ; এবং এই তিনটি মাত্রাভেদকে অধ্যাপক জোন্স্ এই ভাবে তিনটি স্তরে উপস্থাপিত করার রীতি দেখিয়ে গেছেন :–
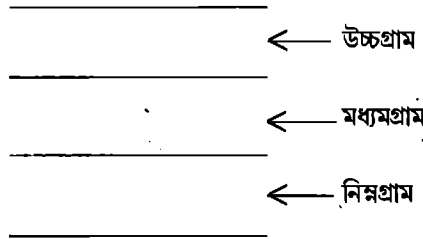
চিত্র নং ৩১ : সুরের মাত্রাভেদ

বিভিন্ন শ্রেণীর বাক্যের সাহায্যে বাংলা সুরতরঙ্গের রেখাচিত্র (contour) নিম্নে উপস্থাপিত করা হল :

সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্য (Statement Sentence/Neutral Sentence) : এই ধরনের বাক্যে—যেখানে বক্তব্যের নিঃসংশয় পরিসমাপ্তি (finality/completion) বোঝায় এবং কোনো বিশেষ শব্দের উপরে জোর না দিয়ে অত্যন্ত সাধারণভাবে কোনো বিবৃতি দেওয়া হয় সেখানে বাংলায় বাক্যের গোড়ার দিকে সুর উচ্চগ্রামে থাকে এবং বাক্যের শেষের দিকে সুর ক্রমশ নিচে নেমে আসে অর্থাৎ এখানে সুরতরঙ্গ ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নগামী (High falling) হয়। যেমন :
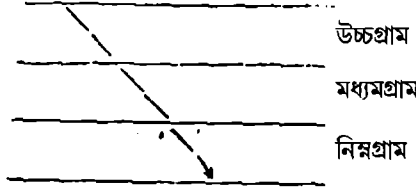
সুমন বলে।
Suman says.

চিত্র নং ৩২ : বিবৃতিমূলক বাক্যের সুরতরঙ্গ

এই ধরনের বাক্যে বাংলার সুরতরঙ্গ মোটামুটি ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষারই মতো। কারণ সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য থাকলেও ভাবের সমাপ্তিসূচক সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্যে ঐ সব ভাষাতেও সুরতরঙ্গ মূলত ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নগামীই হয়।

প্রশ্নবোধক বাক্য (Interrogative Sentence) : প্রশ্নবোধক বাক্য দু'রকমের হয়—কখনো কখনো আমরা এমনভাবে প্রশ্ন করি যে তাতে শুধু 'হাঁ' বা 'না' উত্তর প্রত্যাশা করি, বিশেষ করে বিস্তৃত করে কিছু জানতে চাই না। আবার কখনো কখনো আমরা এমন করে প্রশ্ন করি যে তাতে শুধু 'হাঁ' বা 'না' উত্তর পেলে চলে না। তখন আমরা বিশেষ করে কোনো বিষয় বা কোনো কিছুর নাম জানতে চাই। এই দু'রকমের প্রশ্নবোধক বাক্যে সুরতরঙ্গ দু'রকমের হয়ে থাকে। প্রথম শ্রেণীর প্রশ্নে সুরতরঙ্গ নিম্ন থেকে ঊর্ধ্বগামী (Low rising) হয়। যেমন :
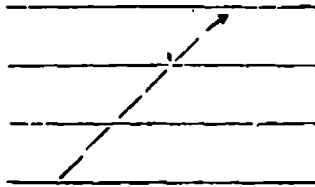
সুমন কি বলে?
(Does Suman say?)

চিত্র নং ৩৩ : প্রশ্নবোধক বাক্যের সুরতরঙ্গ

এখানে বক্তব্য : সুমন কিছু বলে, নাকি সব কথা চেপে যায়, আমরা শুধু এইটুকু জানতে চাইছি ; এখানে শুধু 'হাঁ' বা 'না' উত্তর পেলেই আমরা সন্তুষ্ট। এখানে ক্রিয়ার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে।

কখনো কখনো আবার ক্রিয়ার উপরে জোর না দিয়ে কর্তার উপরেই জোর দেওয়া হয়। ভাবটা এই যে, অন্য লোকেরা তো বলেই থাকে, আমরা জানি, কিন্তু সুমনও কি একথা বলে? এ রকমের বাক্যে সুরতরঙ্গ প্রথমে উচ্চগ্রামে থাকে, তার পরে নিচে নেমে যায়, এবং শেষে আবার একটু উপরে উঠে যায়। যেমন—
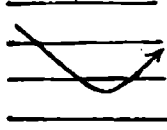
সুমন কি বলে?
(Does even Suman say?)

চিত্র নং ৩৪ : প্রশ্নবোধক বাক্যের সুরতরঙ্গ

—এখানেও আমরা শুধু 'হাঁ' বা 'না' উত্তর প্রত্যাশা করি।

কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রশ্নে সুরতরঙ্গ সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্যের মতোই অনেকটা উচ্চ থেকে নিম্নগামী (High falling)। যেমন :
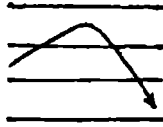
সুমন কী বলে?
(What does Suman say?)

চিত্র নং ৩৫ : প্রশ্নবোধক বাক্যের সুরতরঙ্গ

এখানে বক্তব্য : সুমন কিছু বলে কিনা আমরা শুধু এইটুকু জানতে চাই না, আমরা বিশেষীকৃত (specific) উত্তর প্রত্যাশা করি। আমরা সঠিকভাবে তার বক্তব্য বিষয়টাই জানতে চাই।

এই ধরনের বাক্যে 'কী'-এর বদলে 'কখন', 'কে', 'কেন' ইত্যাদি প্রশ্নবোধক শব্দও থাকতে পারে। কিন্তু উত্তরে আমরা বিশেষ তথ্য জানতে চাই বলে সুরতরঙ্গ এক্ষেত্রে মূলত উচ্চ থেকে নিম্নগামীই হবে।

অনেক সময় 'কি' শব্দে আমরা প্রশ্ন বোঝাই না, তুচ্ছার্থে নেতিমূলক কিছু বোঝাতে চাই। এসব ক্ষেত্রেও সুরতরঙ্গ উচ্চ থেকে নিম্নগামী হয়।
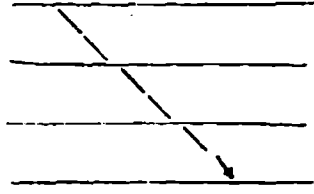
সে কি জানে!

চিত্র নং ৩৬ : তুচ্ছার্থে নেতিবাচক বাক্যের সুরতরঙ্গ

এখানে বক্তব্য হচ্ছে—সে কিছুই জানে না, যা জানার আমিই তো সব জানি। এখানে তার জ্ঞানকে তুচ্ছ করা হচ্ছে।

সংশয় ও দ্বিধামূলক বাক্য (Suspicion/Hesitation Sentence) : যখন আমরা সঠিকভাবে কোনো বিষয় জানি না, অথচ অন্য কেউ বললে বিশ্বাসও করতে পারি না, তখন আমরা পরের উক্তিতে সংশয় প্রকাশ করি। তখন বাক্যে সুরতরঙ্গ ওঠা-নামা না করে সারা বাক্যে একই রকম থাকে।

যেমন—
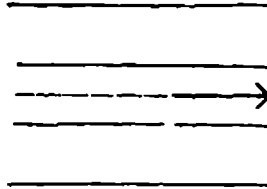
সুমন মিথ্যা কথা বলে।

চিত্র নং ৩৭ : সংশয়মূলক বাক্যের সুরতরঙ্গ

এখানে বক্তব্য : আমি প্রত্যাশা করি না যে, সুমন মিথ্যা কথা বলতে পারে! তবু কেউ বলছে যে, সুমন মিথ্যা কথা বলে। তাতেই আমার মনে সংশয় দেখা দিয়েছে।

নির্দেশমূলক বাক্য (Imperative Sentence) : আদেশ, নির্দেশ ও অনুরোধ বোঝালে বাক্যের সুরতরঙ্গ হয় উচ্চ থেকে নিম্নগামী। যেমন—
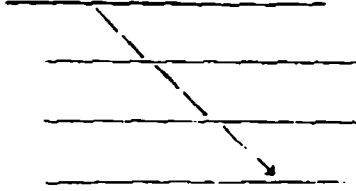
আপনারা এবার খেতে বসুন।

চিত্র নং ৩৮ : নির্দেশমূলক বাক্যের সুরতরঙ্গ

উপরে কয়েকটি ছোট ছোট সরল বাক্যে বাংলায় সুরতরঙ্গের মূল প্রকারভেদ দেখানো হল। বড় বড় মিশ্র বা যৌগিক বাক্যে বিভিন্ন বাক্যাংশের (clause) অর্থ অনুসারে পূর্বোক্ত সরল বাক্যেরই বিভিন্ন প্রকার সুরতরঙ্গের সমন্বয় (combination) সংঘটিত হয়।

প্রত্যক্ষ উক্তি (Direct Narration)-যুক্ত একটি বাক্য ধরা যাক—"সীতা বললেন, 'রাম আমায় সন্দেহ করেন"—এই বাক্যের প্রথমাংশ 'সীতা বললেন' সাধারণ বিবৃতিমূলক। সুতরাং এই অংশের সুরতরঙ্গ উচ্চ থেকে নিম্নগামী। কিন্তু এই বাক্যের দ্বিতীয়াংশ 'রাম আমায় সন্দেহ করেন'—এর বক্তব্য অনুসারে এর সুরতরঙ্গ পৃথক্ হবে। সীতা যদি নিঃসংশয় হন, এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন যে, রাম তাঁকে সন্দেহ করেন, তা'হলে দ্বিতীয়াংশেরও সুরতরঙ্গ হবে বিবৃতিমূলক বাক্যেরই মতো উচ্চ থেকে নিম্নগামী। তাহলে সমগ্র বাক্যটির সুরতরঙ্গ হবে এই রকম—

সীতা বললেন, 'রাম আমায় সন্দেহ করেন'।

চিত্র নং ৩৯ : দীর্ঘবাক্যের সুরতরঙ্গ (ক)

কিন্তু দ্বিতীয়াংশটি যদি প্রশ্নবোধক বাক্য হয়, এবং সীতা যদি দূতকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চান যে, রাম তাঁকে সন্দেহ করেন কিনা, তাহলে এই বাক্যাংশের সুরতরঙ্গ হবে নিম্ন থেকে উর্ধ্বগামী। যেমন—
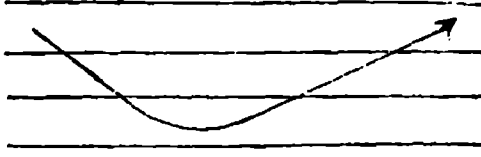
সীতা বললেন, 'রাম আমায় সন্দেহ করেন?'

চিত্র নং ৪০ : দীর্ঘ বাক্যের সুরতরঙ্গ (খ)

আবার দ্বিতীয়াংশটি যদি সংশয়মূলক হয়, সীতার নিজের মনেই যদি দ্বন্দ্ব থাকে যে রাম তাঁকে সন্দেহ করেন কি করেন না, তাহলে দ্বিতীয়াংশের সুরতরঙ্গ সমান্তরাল হবে। যেমন—
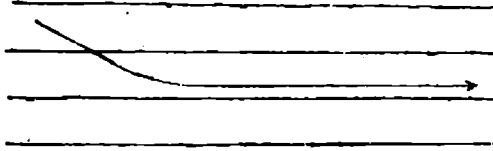
সীতা বললেন, 'রাম আমায় সন্দেহ করেন!'

চিত্র নং ৪১ : দীর্ঘ বাক্যের সুরতরঙ্গ (গ)

এসব নিয়ম ছাড়া বিস্ময়, আনন্দ, আবেগ ইত্যাদি প্রকাশ করার জন্যে বা কোনো বিশেষ শব্দে জোর দিতে হলে সেই বিশেষ শব্দে যেমন শ্বাসাঘাত পড়ে, তেমনি বাংলায় সুরও সেই শব্দে তীব্র হয়ে উচ্চগ্রামে উঠে যায়। যেমন—
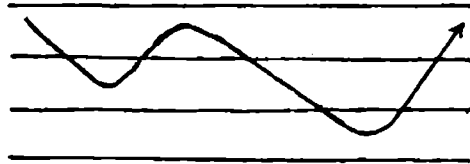
তিনি কী অপূর্ব আবৃত্তি করলেন কী বলব!

চিত্র নং ৪২ : দীর্ঘ বাক্যের সুরতরঙ্গ (ঘ)

(গ) বাংলায় যতি (Juncture in Bengali) :

আমাদের বাক্‌প্রবাহের ধারায় দু'টি স্বনিমের (Phoneme) মধ্যবর্তী বিরতিকে বা দু'টি স্বনিমের পারস্পরিক সংযোগকে যতি বা সন্ধান বা ধ্বনিসংযোগ (Juncture) বলে। বিশেষজ্ঞের সংজ্ঞা অনুসারে—যতি (Juncture) হল 'the way in which phonemes follow each other or are 'joined' in the stream of speech'.[৪৫] এই যতিকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

(১) বাহ্য উন্মুক্ত যতি (External Open Juncture),

(২) আভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি (Internal Open Juncture) এবং

(৩) ঘনিষ্ঠ বা সংবদ্ধ যতি (Close Juncture)।

বাহ্য উন্মুক্ত যতি (External Open Juncture) : ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিপ্রবাহে দু'টি ধ্বনির মধ্যে যদি এমন বিরতি (pause) বা বিরাম থাকে যে সেটা কানে শুনেই বোঝা যায় তা হলে সেই বিরতিকে বা দু'টি ধ্বনির সেই সংযোগের রীতিকে বাহ্য উন্মুক্ত যতি (External Open Juncture) বলে। উচ্চারণের দিক থেকে (phonetically) ঠিক ঠিক বিচার করলে এক্ষেত্রে ধ্বনি দু'টির মধ্যে বিরতি থাকে বলে এখানে ধ্বনি দু'টি যুক্ত হয় না, অর্থাৎ ধ্বনিসংযোগ সাধিত হয় না। এটা আসলে নেতিমূলক তাপের (minus temperature) মতো নেতিমূলক সংযোগ (minus juncture) মাত্র। এই ভাবটা বোঝাবার জন্যেই একে উন্মুক্ত সংযোগ (Open Juncture) বলে। কোনো কোনো ভাষায় বাহ্য উন্মুক্ত যতির ঠিক পরবর্তী অক্ষরটিতে (syllable) সাধারণত প্রবল শ্বাসাঘাত (strong stress) পড়ে আর এই রকমের যতির ঠিক আগের ও পরের, বিভাজ্য স্বনিমের উপধ্বনিগত উচ্চারণ-বৈচিত্র্য (allophonic variation) ঘটে। যেমন—ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় বাহ্য উন্মুক্ত যতির পরবর্তী অল্পপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি মহাপ্রাণ উচ্চারিত হয়। (জার্মান : kitzeln = [kʰitsɔln], ইংরেজি : kill = [kʰil])। সাধারণত বাক্যের পদগুচ্ছ (phrase), বাক্যাংশ (clause) এবং বাক্যের দুই প্রান্তে এই ধরনের যতি থাকে বলে একে বাহ্য যতি (External Juncture) বলে। অবশ্য একটি পদের পরেও যদি শ্রবণযোগ্য বিরতি থাকে তবে তাকেও বাহ্য উন্মুক্ত যতি বলে। দু'জন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী বাহ্য উন্মুক্ত যতির দু'টি প্রধান শ্রেণীর পৃথক্-পৃথক্ নাম দিয়েছেন। তাঁরা বাক্যের শেষে যে, বিরতি পড়ে তাকে বাক্য-প্রান্তিক যতি

৪৫। Hall, Robert A. [Jr] ; *'Introductory Linguistics'*, Delhi, 1969. p. 111.

(Terminal Juncture : চিহ্ন = [।।] : এবং বাক্যের অন্তর্গত দুই পদগুচ্ছ (phrase) বা দুই বাক্যাংশের (clause) মধ্যে যে বিরতি পড়ে তাকে পদগুচ্ছ-প্রান্তিক যতি (Phrase Juncture : চিহ্ন = [।] বলেছেন[৪৬]।

পদের শেষে যে বিরতি পড়ে তাকে পদান্তিক যতি (Word Juncture : চিহ্ন = [—]) বলতে পারি। যে পদান্তিক যতিতে অন্তত ক্ষণকালের জন্যে বিরতি (pause) ঘটে শুধু সেই পদান্তিক যতিকে বাহ্য উন্মুক্ত যতির মধ্যে ফেলতে পারি ; কিন্তু যে পদান্তিক যতিতে ক্ষণকালের জন্যেও উচ্চারণের বিরাম নেই, বিনা বিরামেই ধ্বনিপ্রবাহ উচ্চারিত হয়ে চলেছে, সেই পদান্তিক যতি কিন্তু বাহ্য উন্মুক্ত যতির মধ্যে পড়ে না, তাকে অন্য শ্রেণীর যতিতে ফেলা হয়।

যাই হোক এখানে বিরতিযুক্ত পদান্তিক যতি (Word Juncture with pause) সহ বাহ্য উন্মুক্ত যতির বিভিন্ন শ্রেণীর উদাহরণ বিভিন্ন প্রকার যতির চিহ্নের সাহায্যে দেওয়া হল :

"একথা-সত্য-যে, | জাতীয়-জীবনের সর্বস্তরে | প্রতিরোধ-গড়ে-তোলবার জন্য | আমাদের-অনেক-বেশী-সচেষ্ট-হওয়া-প্রয়োজন | ।। কেবলমাত্র-অতীতের-গৌরববোধ-নয়, | মহিমান্বিত-বর্তমান | এবং মহত্তর-ভবিষ্যৎ | গড়ে-তোলার-গুরুদায়িত্ব | আমাদের-প্রত্যেকটি-ভারতবাসীর |"।।

—অধ্যাপক ড. প্রণবরঞ্জন ঘোষ :
'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য'।

আভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি (Internal Open Juncture) : যখন দু'টি ধ্বনির মধ্যে কোনো উচ্চারণগত বিরতি (pause) থাকে না, অথচ বাহ্য উন্মুক্ত যতির (External Open Juncture) অন্যান্য বৈশিষ্ট্য (যেমন—যতির পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বনিমের উপধ্বনিগত বৈচিত্র্য ইত্যাদি) লক্ষ্য করা যায়, তখন তাকে আভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি (চিহ্ন = [—]) বলে। বাংলায় এই উন্মুক্ত যতির ক্ষেত্রে বাহ্য উন্মুক্ত যতির বৈশিষ্ট্য (যতির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্বনিমের উপধ্বনিগত বৈচিত্র্য) সর্বদা দেখা যায় না। বাংলায় সাধারণত দুই শব্দের মাঝখানে যখন কোনো ধ্বনিগত বিরতি শোনা যায় না, অথচ শব্দ দু'টির মিলন-রেখাটি চেনা যায়, তখন শব্দ দু'টির মাঝখানে আভ্যন্তরীণ উন্মুখ যতি রয়েছে, বলা হয়। সমাসবদ্ধ শব্দের অন্তর্গত শব্দগুলির মাঝখানে এই যতি থাকে। যেমন বাংলা : রেল-গাড়ি, রাত-দিন, ইংরেজি : sin-tax [sin-t^{h}æks], জার্মান :

৪৬। Ferguson, Charles A. and Chowdhury, Munier : "The Phonemes of Bengali" in *Language,* Journal of the Linguistic Society of America ; Vol, 36, Jan-March, 1960.

Eisen-bahn [aizən-ba:n] ইত্যাদি। বাংলা : 'হাত ধরে মোরে নিয়ে চলো সখা'-তে 'হাত' ও 'ধরে' শব্দ দু'টি সমাসবদ্ধ না হলেও যেহেতু 'হাত'-এর পরে কোনো বিরতি নেই, সেহেতু 'হাত' ও 'ধরে'র মাঝখানে আভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি আছে বলা যায়।

ঘনিষ্ঠ বা সংবদ্ধ যতি (Close Juncture) : দুই ধ্বনির মাঝখানে যদি বাহ্য উন্মুক্ত যতি বা আভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি না থাকে, অথবা সেখানে তার কোনো বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা না যায়, তাহলে ধ্বনি দু'টির মধ্যে সংবদ্ধ যতি (Close Juncture) (চিহ্ন = [+]) রয়েছে বলে ধরা হয়। সংবদ্ধ যতির ক্ষেত্রে একটি ধ্বনির পরে অন্য ধ্বনি কোনো বিরতি না দিয়েই উচ্চারিত হয়। আভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতির ক্ষেত্রেও দুই ধ্বনির মাঝখানে বিরতি থাকে না। কিন্তু সংবদ্ধ যতির ধ্বনিগুলি একই শব্দের অন্তর্গত ধ্বনি হয়, আর আভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতির ক্ষেত্রে ধ্বনিগুলি দুটি পৃথক্ শব্দের ধ্বনি হয়। সাধারণত সংবদ্ধ যতি একই শব্দের দুই অক্ষরের (syllable) মাঝখানে পড়ে আর আভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি বিরতিহীন দুই শব্দের মাঝখানে পড়ে। বাংলা এবং ইংরেজিতে এই দ্বিবিধ যতি স্বনিমীয় তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন—

'মন্ত্র' চলিত বাংলায় সাধারণ উচ্চারণে 'মন্তোর' = [mɔn + tor] (সংবদ্ধ যতি) ;

মন তোর = [mɔn – tor]/ (আভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি)।
জলপাই = [ɟɔl + pai] (সংবদ্ধ যতি) ;
জল পাই = [ɟɔl – pai] (আভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি)।

ইংরেজিতে—

syntax = [sin + tæks] (সংবদ্ধ যতি) ;
sin - tax = [sin – tʰæks] (আভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি)।

(দ্বিতীয় শব্দে / t / স্বনিমটির উপধ্বনিগত বৈচিত্র্য [tʰ] সাধিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রচলিত বানানে না হলেও বাস্তব উচ্চারণে এখানে ট্ / t / একটু ঠ্ [tʰ]-এর মতো উচ্চারিত হয়। এরকম উপধ্বনিগত বৈচিত্র্য আগের শব্দ syntax-এ হয় নি, কারণ সেখানে সংবদ্ধ যতি রয়েছে।)

(ঘ) বাংলায় নাসিক্যীভবন (Nasalisation in Bengali) : আগেই বলা হয়েছে যে, কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু যদি শুধু নাসিকা দিয়ে বা একই সঙ্গে মুখ ও নাসিকা দিয়ে নির্গত হয় এবং তার ফলে নাসাগহ্বরে একটি অনুরণন সৃষ্টি হয়, তা হলে সেই ধ্বনিকে নাসিক্য ধ্বনি (Nasal Sound) বা

অনুনাসিক ধ্বনি (Nasalised Sound) বলে। বাংলা ভাষায় নাসিক্যীভবন স্বনিমীয় তাৎপর্য বহন করে, কারণ এর ফলে ধ্বনির মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ সৃষ্টি হয় ও অর্থের পার্থক্য ঘটে। এদিক থেকে হিন্দি ও ফরাসি ভাষার সঙ্গে বাংলার মিল রয়েছে। যেমন—

বাংলা— বাধা /badʰa/ = obstacle,
বাঁধা /bãdʰa/ = to bind.
হিন্দি— আধী /adʰi:/ = অর্ধেক (স্ত্রীলিঙ্গ),
আঁধী /ãdʰi:/ = ঝড়।
ফরাসি— essai/ɛsɛ/ = চেষ্টা, প্রয়াস,
essaim/ɛsɛ̃/ = ভিড়, ঝাঁক।

আবার সংস্কৃত, ইংরেজি ও জার্মান ভাষা থেকে বাংলার স্বাতন্ত্র্য এখানে চোখে পড়ে। কারণ সংস্কৃত, ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় নাসিক্যধ্বনি থাকলেও নাসিক্যীভবন স্বনিমীয় (phonemic) তাৎপর্য বহন করে না।

(ঙ) বাংলায় ধ্বনির দৈর্ঘ্য (Sound Length in Bengali) : একই ধ্বনিকে দীর্ঘ উচ্চারণ করলে কোনো কোনো ভাষায় শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়, অর্থাৎ সেই ভাষায় ধ্বনির দৈর্ঘ্য স্বনিমীয় তাৎপর্য বহন করে। হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরেজি, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় কোনো কোনো স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য স্বনিমীয় তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন--

সংস্কৃত ও হিন্দি--
দিন /din/ = দিবস,
দীন /di:n/ = দরিদ্র ;
ইংরেজি--
sit/sit/ = বসা (ক্রিয়া),
seat/si:t/ = আসন (বিশেষ্য) ;
জার্মান--
Lamm/lam/ = ভেড়া,
lahm/la:m/ = খোঁড়া।

কিন্তু বাংলায় ধ্বনির দৈর্ঘ্য স্বনিমীয় তাৎপর্য বহন করে না। এ ব্যাপারেও বাংলার সঙ্গে ফরাসির সাদৃশ্য আছে। কারণ বাংলা ও ফরাসি ভাষায় হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘ স্বর স্বনিমীয় বিরোধ (phonemic contrast) সৃষ্টি করে না। তাই হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘ স্বর স্বতন্ত্র নয়। বাংলায় লিখিত বানানে আমরা হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ দেখি, যেমন--কুল (বংশ) : কূল (নদীর তীর); দিন (দিবস) : দীন (দরিদ্র), ঠিকই ; কিন্তু বাঙালির বাস্তব উচ্চারণে এই হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ বজায় থাকে না। তাই

বানানের এই হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ জীবন্ত বাংলা ভাষার উচ্চারণের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, এটা বাংলায় সংস্কৃতের গতানুগতিক উত্তরাধিকার মাত্র। বরং অনেক সময় বাংলায় হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ বানানে লিখিত রূপের উপর নির্ভর করে না। যেমন— 'যখন আকাশে সূর্যকে দেখা যায় তখন দিন'—এখানে 'দিন' শব্দের উচ্চারণে 'ই' স্বরধ্বনিটি দীর্ঘ শোনায়, আবার 'দিনের বেলায় সূর্যকে আকাশে দেখা যায়'— এখানে 'দিনের' শব্দে 'ই'-এর উচ্চারণ হ্রস্ব। এখানে দুই বাক্যেই 'ই' লিখিত আছে হ্রস্ব, কিন্তু এর উচ্চারণ কোথাও হ্রস্ব, কোথাও দীর্ঘ। বস্তুত বাংলায় স্বরধ্বনির উচ্চারণ নির্ভর করে তার অবস্থানের উপর : এক অক্ষরের শব্দে বা শব্দের শেষে অবস্থিত অক্ষরে বাংলায় স্বরধ্বনির উচ্চারণ হয় দীর্ঘ, আর একের বেশি অক্ষরে গঠিত শব্দে শেষ অক্ষরের আগের অক্ষরে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় হ্রস্ব। যেমন প্রথম বাক্যে 'দিন' শব্দের 'ই' দীর্ঘ, দ্বিতীয় বাক্যে 'দিনের' শব্দের (দু'টি অক্ষর = দিন্ + এর) 'ই' হল হ্রস্ব। এই রকম বাংলায় স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ সর্তাধীন বলে তা একই মূলধ্বনির উপধ্বনিরূপে বিবেচিত হয়, স্বতন্ত্র স্বনিমের মর্যাদা পায় না।

কেউ কেউ অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখাতে চেয়েছেন। যেমন—

'তুমি কি খাবে?' (অর্থাৎ তুমি খাবে কিনা শুধু এইটুকু জানতে চাওয়া হচ্ছে) ;

'তুমি কী খাবে?' (অর্থাৎ তুমি কোন্ বস্তু খাবে?—ভাত, না রুটি, না অন্য কিছু?)

তাঁদের মতে উপরে উদ্ধৃত প্রথম বাক্যে 'কি' শব্দে 'ই'-কারের উচ্চারণ হ্রস্ব ও দ্বিতীয় বাক্যে 'কী' শব্দে 'ঈ'-কারের উচ্চারণ দীর্ঘ। এই হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ হওয়ার জন্যে অর্থেরও পার্থক্য ঘটছে, এই যুক্তিতে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন বাংলায় স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য স্বনিমীয় তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু এই দুই বাক্যে অর্থের পার্থক্য ঘটছে মূলত স্বরের দৈর্ঘ্যভেদ হওয়ার জন্যে নয়, সুরতরঙ্গ ও শ্বাসাঘাতের পার্থক্যের জন্যে। সুরতরঙ্গ ও শ্বাসাঘাতের প্রভাবেই দ্বিতীয় বাক্যে 'কী'-এর উচ্চারণ দীর্ঘ হয়েছে। এই দৈর্ঘ্য শ্বাসাঘাতের সর্তাধীন। দ্বিতীয় বাক্যের 'কী' সুরতরঙ্গ ও শ্বাসাঘাতের প্রভাবমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রথম বাক্যের 'কি'-এর সঙ্গে তার ন্যূনতম শব্দজোড় রচিতই হয় না। সুতরাং বাংলা স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্যকে স্বনিমীয় মর্যাদা দিতে পারি না।

উপরি-উক্ত 'তুমি কী খাবে?' বাক্যটিতে সুরতরঙ্গ ও শ্বাসাঘাতের জন্যেই অর্থের পার্থক্য ঘটেছে, স্বরদৈর্ঘ্যের জন্যে নয়। যদি বলি 'তুমি কি খাবে আমি জানি, কিন্তু তোমার স্ত্রী কি খাবে তা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়', তা হলে 'তুমি' শব্দে শ্বাসাঘাত পড়ছে, এবং 'কি' প্রথম বাক্যের মতোই উচ্চারিত হচ্ছে।

সুতরাং 'কি'-এর উচ্চারণ এই রকম করলেও 'কোন্ বস্তু' (what) এই অর্থটি বোঝানো যায়, তার জন্যে 'কী'-এর উচ্চারণ সব সময় পৃথক্ হবেই এমন নয়।

স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রেও কেউ কেউ দৈর্ঘ্যকে স্বনিমীয় তাৎপর্য দিতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে বাংলায় দ্বিত্বপ্রাপ্ত (geminated) ব্যঞ্জন হল দীর্ঘ ব্যঞ্জন ; হ্রস্ব ব্যঞ্জন (অর্থাৎ একক ব্যঞ্জন) ও দীর্ঘ ব্যঞ্জন (অর্থাৎ দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জন)-এর মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ আছে : যেমন—

'**সবাই** মিথ্যা কথা বলে' ;

'**সব্বাই** মিথ্যা কথা বলে' ;

এই দু'টি বাক্যের মধ্যে প্রথম বাক্যটি সাধারণ, কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটিতে জোর একটু বেশি। অর্থাৎ দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জন 'ব্ব'-এর জন্যে অর্থের সূক্ষ্ম পার্থক্য ঘটেছে। কিন্তু এখানেও অর্থের পার্থক্য ঘটেছে মূলত 'সব্বাই' শব্দে শ্বাসাঘাতের জন্যে, ধ্বনির দ্বিত্বপ্রাপ্তির জন্যে নয় ; ধ্বনির দ্বিত্বপ্রাপ্তি শ্বাসাঘাতের প্রতিক্রিয়া মাত্র। তা ছাড়া দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনকে একক দীর্ঘ ব্যঞ্জন বলাও যায় না। আধুনিক বিশেষজ্ঞরা ঠিকই ধরেছেন এসব ক্ষেত্রে দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনের দু'টি ব্যঞ্জনের মাঝখানে একটি অক্ষরগত ব্যবধান (syllable break) সংঘটিত হয়। যেমন 'সব্বাই'-এর উচ্চারণ ['সব্বাই'] = সব্ + বাই = দু'টি অক্ষর। দু'টি অক্ষরের দু'টি ধ্বনিকে একসঙ্গে নিয়ে একটি দীর্ঘ ধ্বনির মর্যাদা দেওয়া যায় না। কারণ, বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন, "দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ...একাত্মতাপ্রাপ্ত হয় না"।[৪৭] সুতরাং বাংলায় ঠিক ধ্বনিবৈজ্ঞানিক বিচারে দীর্ঘ ব্যঞ্জন বলে কিছু নেই, তাই ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য স্বনিমীয় তাৎপর্যপূর্ণ কিনা সে প্রশ্নই অবাস্তব।

॥ ১৮ ॥

রূপিম বা মূলরূপ ও রূপতত্ত্ব

(Morpheme and Morphology)

সাধারণত ব্যাকরণ (Grammar) কথাটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে এর দু'টি বিভাগ নির্ণয় করা হয় : রূপতত্ত্ব (Morphology) এবং বাক্যতত্ত্ব (Syntax)। বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। তার আগে রূপতত্ত্বের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। ভাষার সবচেয়ে মৌলিক ও ক্ষুদ্রতম একক হল ধ্বনি। পূর্ববর্তী একাধিক অধ্যায়ে আমরা এই ধ্বনির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে

৪৭। হাই, মুহম্মদ আবদুল : 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব', ঢাকা, ১৯৬৪ পৃ. ১৩৪

আলোচনা করেছি। সাধারণভাবে আমরা জানি যে, একাধিক ধ্বনি মিলিত হয়ে ধ্বনির চেয়ে বৃহত্তর যে এক-একটি অর্থপূর্ণ একক গড়ে তোলে তা হল শব্দ (word)। এই শব্দের নানা দিক—তার গঠন, শ্রেণীবিভাগ, রূপবৈচিত্র্য, রূপবৈচিত্র্য সাধনের বিভিন্ন উপকরণ (প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি)—হল রূপতত্ত্বের (Morphology) আলোচ্য বিষয়।

রূপিম বা মূলরূপ, শব্দ, অক্ষর (Morpheme, Word, Syllable) : রূপতত্ত্বের প্রাথমিক পরিচয়ের জন্যে আমরা যদিও বলি, ধ্বনির চেয়ে বৃহত্তর একক হল শব্দ (word) এবং মোটামুটিভাবে শব্দেরই বিভিন্ন দিক রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়, তবু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, ধ্বনির ঠিক পরবর্তী বৃহত্তর এককটি শব্দ (word) নয়, সেটি হল রূপিম বা মূলরূপ বা রূপমূল (Morpheme)।[৪৮]

এই প্রসঙ্গে তা হলে রূপিম বা মূলরূপ (Morpheme) কাকে বলে এবং শব্দ (Word) ও অক্ষরের (Syllable) সঙ্গে তার পার্থক্য কি সেইটা আগে বোঝা দরকার। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী গ্লীসন্ মূলরূপ বা রূপিমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"Morphemes are generally short sequences of phonemes. These sequences are recurrent—but not all

৪৮। ইংরেজি 'Morpheme' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে কেউ কেউ 'রূপমূল' কথাটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শব্দবিভক্তি ও ক্রিয়াবিভক্তি-যুক্ত পদকে আমরা যথাক্রমে শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপ বলে থাকি। অর্থাৎ 'রূপ' বলতে বিভক্তিযুক্ত পদের রূপটিই আমাদের মনে ভেসে উঠে। তাই রূপমূল বললে এই বিভক্তিযুক্ত শব্দরূপ-ক্রিয়ারূপের মূলটিকে বোঝাতে পারে, অর্থাৎ প্রাতিপদিক (Stem) ও ধাতুকে (Root) বোঝাতে পারে। কিন্তু Morpheme বলতে শুধু এই মূলকে বোঝায় না, বিভক্তিও Morpheme-এর মধ্যেই পড়ে এবং Morpheme কথাটি আরো ব্যাপক অর্থবহ। তাই Morpheme-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'রূপমূল' কথাটি গ্রহণ না করাই ভাল। 'রূপ' কথাটি সাধারণভাবে ধ্বনি-গঠিত রূপ (form) অর্থে গ্রহণ করে morpheme-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'মূলরূপ' কথাটি গ্রহণ করা যায়। ভারত-সরকার কর্তৃক গঠিত Standing Commission for Scientific and Technical Terminology-র উদ্যোগে ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক বাবুরাম সক্সেনার অধ্যক্ষতায় ভাষাবিজ্ঞান-বিষয়ক যে পরিভাষা নির্ণীত হয়েছে তাতে Morpheme-এর প্রতিশব্দ হল 'রূপিম'। এই প্রতিশব্দটিও গ্রহণীয় মনে হয়। 'Phoneme'-এর প্রতিশব্দ যেমন 'মূলধ্বনি' বা 'স্বনিম', তেমনি Morpheme-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'মূলরূপ' বা 'রূপিম' গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে হয়।

recurrent sequences are morphemes...Morphemes can be usefully described as the smallest meaningful units in the structure of the language."[৪৯] রূপতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ নিদা সংক্ষেপে বলেছেন—'minimal meaningful unit'-ই হল মূলরূপ বা রূপিম (Morpheme)[৫০]। এই দু'জন ভাষাবিজ্ঞানী মোটামুটি একই কথা বলেছেন। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুমফিল্ড্ আবার রূপিমের আর একটা দিক উল্লেখ করেছেন। তাঁর সংজ্ঞায়—"A linguistic form, which bears no partial phonetic-semantic resemblance to any other form, is a *simple* form or *morpheme.*"[৫১] বলা বাহুল্য এই সংজ্ঞাগুলি কোনোটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, এক-একটি সংজ্ঞায় রূপিমের এক-একটি দিকের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রূপিমের সব দিক মিলিয়ে আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি : রূপিম বা মূলরূপ (Morpheme) হল এক বা একাধিক স্বনিমের সমন্বয়ে গঠিত এমন অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক যা পৌনঃপুনিক এবং যার অংশবিশেষের সঙ্গে অন্য শব্দের ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য নেই। কোনো ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে রূপিম বা মূলরূপ হতে হলে তাকে চারটি সর্ত একই সঙ্গে পূরণ করতে হবে :

(১) সেটি এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত ক্ষুদ্রতম একক (unit) হওয়া চাই ;

(২) সেই এককটির একটি অর্থ থাকা চাই ;

(৩) সেই এককটি ভাষার মধ্যে বারবার ফিরে আসা চাই ; এবং

(৪) সেই এককটির অংশবিশেষের সঙ্গে অন্য এককের ধ্বনিগত ও অর্থগত মিল থাকবে না। যেমন—"মাতৃচরণে করি প্রণাম" এবং "আমি মায়ের চরণ দর্শন করতে এসেছি।" এখানে প্রথম বাক্যের 'মাতৃচরণ' শব্দের 'চরণ' অংশের সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যের 'চরণ' শব্দের ধ্বনিগত ও অর্থগত মিল আছে। যেহেতু প্রথম বাক্যের 'মাতৃচরণ' শব্দের অংশবিশেষের সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যের 'চরণ' শব্দের মিল আছে সেহেতু 'মাতৃচরণ' শব্দটি সবটা একটা রূপিম নয়। অর্থাৎ সহজ করে বলতে পারি, যদি কোনো শব্দের অংশবিশেষেরই একটি অর্থ থাকে অর্থাৎ

৪৯। Gleason, H. A. (Jr.) : *An Introduction to Descriptive Linguistics.* Calcutta : Oxford & IBH Publishing Co., 1966, pp. 51-53.

৫০। Nida, Eugene A. : *Morphology,* Ann Arbor : The University of Michigan, 1965. p. 6.

৫১। Bloomfield, Leonard : *Language,* Delhi : Motilal Banarasi dass, 1963, p. 161.

অংশবিশেষই যদি একটি রূপিম হয় তবে গোটা শব্দটিকে একটিমাত্র রূপিম বলা যায় না। কারণ রূপিম হল অর্থযুক্ত অথচ ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি।

কোনো ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি উপরের চারটি সর্তই যদি পূরণ করে তবেই তাকে রূপিম বলা যাবে। কিন্তু কোনো ধ্বনিসমষ্টিকে 'শব্দ' (word) হতে হলে সর্বদা উপরি-উক্ত চারটি সর্তই পূরণ করতে হবে এমন নয়। প্রথম সর্তটি পূরণ না করলেও চলে। অর্থাৎ শব্দ হল এমন ধ্বনি-সমষ্টি যা অর্থপূর্ণ ও পৌনঃপুনিক, কিন্তু তা ক্ষুদ্রতম একক নাও হতে পারে। কিছু কিছু রূপিম আছে যা সর্বদা অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, একা ব্যবহৃত হতে পারে না। যেমন—'মানুষকে' শব্দের 'মানুষ' এবং '-কে' দুটি অংশই দু'টি রূপিম, কিন্তু '-কে' অংশটুকু একা ব্যবহৃত হতে পারে না। অন্য দিকে সব শব্দই একা ব্যবহৃত হতে পারে ; যে ধ্বনিসমষ্টি একা ব্যবহৃত হতে পারে না তা শব্দই নয়, যেমন—'মানুষ' একটি শব্দ, কিন্তু '—কে' একটি শব্দ নয় ; কারণ '-কে' একা ব্যবহৃত হতে পারে না।

বাংলায় 'আম' এই ধ্বনিসমষ্টি হচ্ছে এমন একটি অর্থপূর্ণ একক যাকে আর ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ এককে ভাগ করা যায় না, যদি জোর করে ভাগ করা হয় (যেমন—আ + ম) তাহলে এর যে দু'টি অংশ পাওয়া যাবে, তার কোনোটিরই কোনো মানে হবে না, অর্থাৎ একই সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় সর্তটি পূরণ হবে না। এই জন্যে Bloch ও Trager-এর বক্তব্য হচ্ছে—

"Any form, whether free or bound, which cannot be divided into smaller meaningful parts is a MORPHEME".[৫২]

অতএব 'আ' বা 'ম' একা-একা কোনো রূপিম নয়, কিন্তু 'আম' হচ্ছে রূপিম। আবার 'আমসত্ত্ব' একটিমাত্র রূপিম নয়। কারণ এটি ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি নয়। একে ক্ষুদ্রতর দু'টি অর্থপূর্ণ ধ্বনিসমষ্টিতে ভাগ করা যায়—'আম' ও 'সত্ত্ব'। এখানে দু'টি একক পাচ্ছি এবং দু'টিরই স্বতন্ত্র অর্থ আছে। এখানে 'আম' ও 'সত্ত্ব' হল দুটি রূপিম। তাহলে রূপিম হচ্ছে অর্থপূর্ণ এমন ধ্বনিসমষ্টি যা ক্ষুদ্রতম। কিন্তু শব্দ অর্থপূর্ণ ধ্বনিসমষ্টি হলেও তা সব সময় ক্ষুদ্রতম নয়, তা কখনো ক্ষুদ্রতম একক, কখনো বা ক্ষুদ্রতম নয়। যেমন—'আমসত্ত্ব' একটি রূপিম নয়, কিন্তু একটি শব্দ ; আবার বাংলায় 'আম'-ও একটি শব্দ, 'সত্ত্ব'-ও একটি শব্দ। অর্থাৎ শব্দ কখনো একটিমাত্র রূপিম নিয়ে গঠিত হয়, কখনো বা একাধিক রূপিম নিয়েও গঠিত হয়।

৫২। Bloch, Bernard and Trager, George L : *Outlines of Linguistic Analysis,* New Delhi : Oriental Books Reprint Corporation, 1972, p. 54.

আবার 'আমের' শব্দটির দু'টি অংশ—'আম' এবং '-এর'। এই দু'টিই হল দু'টি রূপিম। কারণ দু'টিই ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি ও দু'টিরই কিছু-না-কিছু অর্থ আছে ; যদিও '-এর' রূপিমটির অর্থ আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারি না, কিন্তু এটা নিজেরা মনে-মনে ঠিকই বুঝতে পারি যে, '-এর' অংশটিরও একটি অর্থ আছে, এই অংশটি সম্বন্ধপদের অর্থ বহন করে। তাহলে 'আমের' শব্দটিও দু'টি রূপিম নিয়ে গঠিত—'আম' এবং '-এর'। এই দু'টি রূপিমের মধ্যে 'আম' একা একা ব্যবহৃত হতে পারে ; কিন্তু '-এর' কখনো একা একা ব্যবহৃত হতে পারে না, এটি সর্বদা অন্য রূপিমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, যেমন এখানে 'আম' শব্দের সঙ্গে '-এর' অংশটি যুক্ত হয়ে আছে। তেমনি ইংরেজিতে 'kindly' শব্দে দু'টি রূপিম—'kind' ও '-ly'। এখানে 'kind' একা একা ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু -'ly' কখনো একা একা ব্যবহৃত হতে পারে না। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, কিছু কিছু রূপিম একা একা ব্যবহৃত হতে পারে, কিছু কিছু রূপিম তা পারে না। এখানেও 'শব্দে'র (Word) সঙ্গে 'রূপিমে'র (Morpheme) একটা পার্থক্যের সূত্র পাওয়া যায় : সব শব্দই একা একা ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু সব রূপিম একা-একা ব্যবহৃত হতে পারে না। যেসব রূপিম একা একা ব্যবহৃত হতে পারে সেসব রূপিম শব্দ বলে গৃহীত হতে পারে (যেমন—আম, kind ইত্যাদি) ; কিন্তু যেসব রূপিম একা একা ব্যবহৃত হতে পারে না সেগুলি একা একা শব্দ বলে গৃহীতও হয় না (যেমন, বাংলা -এর ইংরেজি -ly ইত্যাদি)।

রূপিম হল ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগুচ্ছ, কিন্তু তাই বলে তাকে অক্ষর (syllable)-এর সঙ্গে এক করে ফেললে ভুল হবে। রূপিম হচ্ছে ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগুচ্ছ ঠিকই, কিন্তু তার একটি মোটামুটি অর্থ থাকা চাই। অন্যদিকে অক্ষরও ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগুচ্ছ, কিন্তু সব সময় তার অর্থ থাকবেই, এমন নয়। কোনো কোনো অক্ষরের (syllable) অর্থ থাকে, কোনো কোনো অক্ষরের থাকে না ; যে অক্ষরের একটি অর্থ হয়, তা অবশ্যই রূপিমের মর্যাদা পাবে ; তা অক্ষরও বটে, রূপিমও বটে। কিন্তু যে অক্ষরের কোনো অর্থ নেই, তা শুধুই অক্ষর, কিন্তু রূপিম নয়। যেমন—'ধাক্কা' শব্দে দু'টি অক্ষর—'ধাক্' এবং 'কা', দু'টিই অক্ষর, কিন্তু কোনোটিই রূপিম নয়। কারণ কোনোটিরই কোনো অর্থ নেই। কিন্তু 'হালচাল' শব্দেও দু'টি অক্ষর—'হাল' ও 'চাল'। দু'য়েরই কিছু-না-কিছু অর্থ আছে। রূপিম ও অক্ষরের মধ্যে আর একটা পার্থক্যের কথা মনে রাখা দরকার। অক্ষর (syllable) হল সর্বদা এমন ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগুচ্ছ যা নিশ্বাসের এক ধাক্কায় উচ্চারিত হতে পারে এবং যাতে মাত্র একটি স্বরধ্বনি থাকে। কিন্তু রূপিম ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগুচ্ছ হলেও সর্বদা তা এমন ক্ষুদ্রতম নয় যে নিশ্বাসের এক ধাক্কাতেই উচ্চারিত হবে এবং তাতে একটিমাত্র স্বরধ্বনি থাকবে। রূপিম কখনো

অক্ষরের মতো ক্ষুদ্রতম হতেও পারে, কখনো নাও হতে পারে। আসল কথা রূপিম ক্ষুদ্রতম একক হবে ঠিকই, কিন্তু দেখতে হবে ক্ষুদ্রতম একক হতে গিয়ে সেটা যেন একেবারে অর্থহীন না হয়ে যায়। অর্থাৎ রূপিম নির্ণয়ে ক্রমশ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর এককের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, কিন্তু এগোতে গিয়ে যখন দেখা যাবে যে আরো ক্ষুদ্র একক নির্ণয় করলে তার কোনো অর্থ হয় না তখন সেইখানে থেমে যেতে হবে। শেষ ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক হল রূপিম। এরকম একটা রূপিম সর্বদা এক অক্ষরে গঠিত হবেই এমন নয়। কখনো কখনো একাধিক অক্ষরে গঠিত ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক অর্থাৎ রূপিম পাওয়া যায়। যেমন—'হাল্‌কা' একটি রূপিম, এটি দু'টি অক্ষরে গঠিত (হাল্‌ + কা)। আবার কখনো একটি অক্ষরেই একটি রূপিম গঠিত হতে পারে। যেমন—'মা'।

উপরে গ্লীসন-প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে রূপিম হল পৌনঃপুনিক (recurrent) ধ্বনিসমষ্টি। এর অর্থ হল ভাষার মধ্যে তার ব্যবহার বারবার ফিরে আসে, একই রূপিম একা একা বা অন্য বিভিন্ন রূপিমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বারবার ব্যবহৃত হয়। যেমন—'আমের' শব্দের 'আম' ও '-এর' কিংবা 'Kindly' শব্দের 'Kind' ও '-ly'। 'আম' ও 'Kind' তো ভাষার মধ্যে একটা বাক্য কিংবা একটা প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য বাক্য বা অন্য প্রসঙ্গেও খুবই ব্যবহৃত হয়। তেমনি— '-এর' এবং '-ly'ও অন্যান্য শব্দের সঙ্গেও ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন—'জামের' (জাম + এর), frankly (frank + ly)। কিন্তু এমন কিছু কিছু শব্দাংশ পাওয়া যায় যা ক্ষুদ্রতম এবং অর্থপূর্ণ কিন্তু পৌনঃপুনিক নয়, অর্থাৎ যাকে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় কখনো ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। এ রকমের রূপিমকে অনন্যসাধারণ রূপিম (Unique Morpheme) বলে। যেমন—ভাষাবিজ্ঞানী হকেট্‌ একটি মজার উদাহরণ দিয়েছেন—ইংরেজি 'cranberry' শব্দের দু'টি অংশ 'cran' ও 'berry'। এদের মধ্যে 'berry'-কে 'cran' ছাড়া অন্য শব্দাংশের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, যেমন—'blackberry' শব্দে। কিন্তু 'cran' অংশটিকে কখনো অন্য শব্দাংশের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। অথচ এই শব্দাংশটির একটি অস্পষ্ট অর্থও আমাদের মনে উঁকি দেয়, এটি অর্থহীন ধ্বনিসমষ্টি নয়। কারণ, blackberry অর্থ কালোজাম, cranberry অর্থ লালজাম। এখানে বোঝা যাচ্ছে berry অর্থ জাম, তাহলে 'cran'—অর্থ 'লাল' হতে পারে। অথচ এই 'cran'-শব্দাংশটি অন্য শব্দের সঙ্গে কখনো ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না, এটি শুধু berry শব্দের সঙ্গেই যুক্ত হয়। কখনো আমরা 'লালবাতি' অর্থে cranlight ব্যবহার করি না। 'cran'-এর মতো যেসব শব্দের ব্যবহার মাত্র একটি সমন্বয়ে সীমাবদ্ধ তাদেরই অনন্যসাধারণ রূপিম বা Unique Morpheme বলে।

॥ ১৯ ॥

রূপিম বা মূলরূপ সনাক্তকরণ

(Identification of Morphemes)

আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে যে-কোনো ভাষার আসল রূপ হল সেই ভাষাভাষী জনসমাজে প্রচলিত জীবন্ত ভাষা। তাই লিখিত ভাষার রূপ নয়, লোকমুখে প্রচলিত বাস্তব ব্যবহারের ভাষার রূপ নিয়ে তা থেকে যেমন কোনো ভাষার মূলধ্বনি বা স্বনিম (Phoneme) বিশ্লেষণ করা হয়, তেমনি তার শব্দগঠন বিশ্লেষণ করা হয় এবং তার রূপিম (Morpheme) নির্ণয় করা হয়। তাই কোনো ভাষার রূপিম সনাক্তকরণের প্রথম ধাপ হল সেই ভাষায় ব্যবহৃত বাস্তব রূপের নমুনা তুলে আনা।

কথ্য ভাষার নমুনা সংগ্রহ করে এনে তা-ই থেকে সেই ভাষার ক্ষুদ্রতম মূল উপাদান স্বনিম (phoneme) নির্ণয় করা হয়, তেমনি ভাষার পরবর্তী বৃহত্তর উপাদান রূপিমও (morpheme) নির্ণয় করা হয়। তবে স্বনিম নির্ণয় ও রূপিম নির্ণয়ের পদ্ধতির মধ্যে যেমন কিছু সাদৃশ্য আছে তেমনি কিছু পার্থক্যও আছে। উভয় ক্ষেত্রেই ভাষার সংগৃহীত নমুনা থেকে দুই বা ততোধিক শব্দ বেছে নিয়ে তাদের মধ্যে তুলনা করা হয়। স্বনিম নির্ণয়ের সময় পারস্পরিক তুলনার জন্যে এমন একাধিক শব্দ বাছা হয় যেগুলি হল যথাসাধ্য ছোট শব্দ এবং যাদের মধ্যে সব দিক থেকে মিল আছে, কেবল একটি ধ্বনির ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। এ রকমের শব্দের মধ্যে যে ধ্বনির পার্থক্য হয় সেই ধ্বনিটিকেই স্বতন্ত্র স্বনিম রূপে গ্রহণ করা হয়। কারণ সেই ধ্বনিটির জন্যে শব্দগুলির অর্থ পৃথক্ হয়, কিন্তু এককভাবে সেই ধ্বনিগুলির নিজস্ব অর্থ থাকে না। যেমন—'কাল' ও 'খাল' শব্দের মধ্যে তুলনা করে দেখা গেল শব্দ দুটির মধ্যে শুধু 'ক্' ও 'খ্'-এর পার্থক্য। এই পার্থক্যের জন্যেই শব্দ দু'টি পৃথক্ শব্দ হয়ে গেছে এবং শব্দ দু'টির অর্থ পৃথক্ হয়ে গেছে। কিন্তু 'ক্' বা 'খ্'-এর কোনো স্বতন্ত্র অর্থ নেই। অন্যদিকে রূপিম-নির্ণয়ের সময় যে শব্দগুলির মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করা হয়, সেগুলিকে যথাসাধ্য ছোট শব্দ হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তার পরে শব্দ দু'টির মধ্যে তুলনা করে এখানে পার্থক্যটা খুঁজে বের করা হয় না, সাদৃশ্য কতটুকু সেইটা খুঁজে বের করা হয়। তারপরে দেখা হয়, শব্দ দু'টির সদৃশ অংশের মধ্যে যে পারস্পরিক সাদৃশ্য সেই সাদৃশ্য একই সঙ্গে ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য কি না। যদি উভয়বিধ সাদৃশ্য থাকে তা হলে সেই সাদৃশ্যযুক্ত অংশটিকেই একটি রূপিম বলে গ্রহণ করা হয়। তবে যে শব্দ দু'টির মধ্যে তুলনা

করে সাদৃশ্যযুক্ত অংশটুকু বের করা হল সেই শব্দ দু'টি ক্ষুদ্রতম শব্দ না হলেও চলবে, তবে সাদৃশ্যযুক্ত যে অংশটুকু বের করা হয় সেই অংশটুকু অর্থপূর্ণ অথচ ক্ষুদ্রতম অংশ হওয়া চাই। 'কাচের' (কাচ্ + এর) ও 'খালের' (খাল্ + এর) এই দু'টি শব্দের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করে দেখা গেল যে, দু'টি শব্দের মধ্যে শুধু '-এর' অংশটুকুতে সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যের অংশটুকুই বেছে নেওয়া হল এবং দেখা গেল দু'ই শব্দেই '-এর' অংশটুকুর অর্থ একই : দুই শব্দেই একটা সম্বন্ধ পদের অর্থ প্রকাশ করছে। সুতরাং '-এর' হল একটি রূপিম। স্বনিম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে স্বনিমটি পাওয়া যায় তার একার নিজস্ব কোনো অর্থ থাকে না, কিন্তু রূপিম নির্ণয়ের সময় বরং দেখা হয় যে তার যেন একটা নিজস্ব অর্থ থাকে। স্বনিম হল ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান, কিন্তু রূপিম ক্ষুদ্রতম উপাদান নাও হতে পারে। স্বনিম ও রূপিমের স্বরূপ ও তাদের নির্ণয়-পদ্ধতির এই মূল পার্থক্যের কথা মনে রেখে আমরা এবার রূপিম নির্ণয়ের পদ্ধতির কয়েকটি প্রধান সূত্রের কথা আলোচনা করতে পারি।

কথ্য ভাষার নমুনা সংগ্রহ করে আনার পর তা থেকে তার রূপিম বা মূলরূপ নির্ণয় করার জন্যে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা কতকগুলি পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। এইসব পদ্ধতির মধ্যে যেটি প্রধান তা হল গ্লীসনের ভাষায় :

> "Morphemes can be identified only by comparing various samples of a language. If two or more samples can be found in which there is some feature of expression which all share and some feature of content which all hold in common, then one requirement is met, and these samples may be tentatively identified as a morpheme."[৫৩]

এইটি নিদা আরো স্পষ্ট করে বলেছেন রূপিম সনাক্তকরণের প্রথম সূত্রে :

> "Forms which have a common semantic distinctiveness and an identical phonemic form in all their occurrences constitute a single morpheme."[৫৪]

৫৩। Gleason, H. A. [Jr.] *An Introduction to Descriptive Linguistics*, Oxford and IBH Publishing Co., 1966. p. 56,

৫৪। Nida, Eugene A. : *Morphology*, Ann Arbor : The University of Michigan, 1965, p. 7

অর্থাৎ, ভাষার সংগৃহীত উপাদানের দু'টি ধ্বনিসমষ্টির মধ্যে যদি ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য থাকে তবে তাদের একটি রূপিম বলে চিহ্নিত করা যায়। যেসব রূপের (ধ্বনিসমষ্টি দ্বারা গঠিত রূপের) অর্থ সুস্পষ্টভাবে এক এবং যাদের মধ্যে স্বনিমগত সাদৃশ্য আছে তারা একই রূপিম (Morpheme) বলে বিবেচিত হবে। ভাষায় তারা যতবার ব্যবহৃত হোক না কেন, তাদের মধ্যে উপধ্বনিগত অল্পস্বল্প পার্থক্য থাকলেও মূলধ্বনি তাদের একই রকম থাকতে হবে। যেমন —'জ্ঞাতা', 'দাতা', 'কর্তা' শব্দে '-তা' ব্যবহৃত হয়েছে। এই তিনটি শব্দের তুলনা করে বোঝা যায় তিন '-তা'-এর অর্থ সুস্পষ্টভাবে এক। কারণ তিনটি ক্ষেত্রেই এতে ক্রিয়ার কর্তাকে বোঝাচ্ছে--জ্ঞাতা = যে জানে, দাতা = যে দান করে, কর্তা = যে কাজ করে। এই তিনটি ক্রিয়ার অর্থ পৃথক্। কিন্তু '-তা'-এর দ্বারা তিনটি ক্ষেত্রেই কর্তৃত্বের যে বোধ জাগছে সেই কর্তৃত্বের বোধে সাদৃশ্য আছে। সেটা অর্থগত সাদৃশ্য। আর তিনটি শব্দের '-তা' অংশের মধ্যে ধ্বনিগত অভিন্নতা তো দেখাই যাচ্ছে। সুতরাং '-তা' হল একটি রূপিম। তেমনি ইংরেজি doing, running, working শব্দে যে তিনটি '-ing' আছে তাদের মধ্যে অর্থগত ও ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে ; সুতরাং '-ing' হল ইংরেজিতে একটি রূপিম।

কিন্তু যদি একাধিক রূপের মধ্যে শুধু ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকে এবং অর্থগত সাদৃশ্য না থাকে তা হলে তারা একই রূপিম নয়। যেমন 'আতা', 'দাতা', 'লতা' শব্দের তিনটি '-তা'-এর মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তিনটি--'-তা' এখানে একই তাৎপর্য বহন করছে না, সুতরাং '-তা' এখানে একটি রূপিম নয়। তেমনি ইংরেজি darkling, sing ও spring শব্দের তিনটি--'-ing'-এর মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে, কিন্তু এদের মধ্যে সুস্পষ্ট অর্থগত কোনো সাদৃশ্য নেই, সুতরাং '-ing' এখানে একটি রূপিম নয়।

আবার 'হরিশ্চন্দ্র দাতা ছিলেন', 'কর্ণও দাতা ছিলেন'—এই দুই বাক্যে যে দু'টি 'দাতা' শব্দ, সেই দু'টিকে একটা রূপিম মনে হতে পারে, কারণ দুই বাক্যের 'দাতা' শব্দে ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু 'দাতা'-কে এখানে একটিমাত্র রূপিম বলা যাবে না। কারণ রূপিমের সংজ্ঞাতেই বলা হয়েছে যে রূপিম হল অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগুচ্ছ। 'দাতা'-কে ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগুচ্ছ বলা যায় না। কারণ একে ক্ষুদ্রতম অথচ অর্থপূর্ণ দুটি ধ্বনিগুচ্ছে ভাগ করা যায়—'দা' ধাতু (অর্থ 'দেওয়া') এবং 'তা' প্রত্যয় (অর্থ 'দেওয়া কাজটি যে করে, সে', অর্থাৎ কর্তা, 'agentive suffix')। সুতরাং রূপিম নির্ণয়ের সময় শব্দকে যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্র অথচ অর্থপূর্ণ এককে ভাগ করে নিতে হবে। যে শব্দকে এরকম ছোট ছোট এককে ভাগ করা যাবে, বুঝতে হবে সে শব্দটি একাধিক রূপিম নিয়ে গঠিত। কিন্তু যে শব্দকে আর তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর এককে ভাগ করা যাবে না, সে শব্দটি

একটিমাত্র রূপিম নিয়ে গঠিত, যেমন—না, যা।

রূপিম নির্ণয়ের সময় ক্রমশ অধিক-সংখ্যক শব্দের মধ্যে তুলনা করতে হয়। এভাবে তুলনা করতে করতে বিভিন্ন শব্দের মধ্যে পার্থক্যসূচক অংশের আয়তন বাড়তে থাকে এবং সাদৃশ্যযুক্ত অংশটি ক্রমশ ছোট হতে থাকে। এইভাবে যথাসম্ভব অধিক-সংখ্যক শব্দের মধ্যে তুলনা করে শব্দগুলির মধ্যে সাদৃশ্যযুক্ত যে অংশটি পাওয়া যায় সেইটাই হল একটা রূপিম (Morpheme)। যেমন—প্রথমে আমরা শুধু তিনটি শব্দের মধ্যে তুলনা করি—

করদাতা

অন্নদাতা

বস্ত্রদাতা

এখানে দেখা যাচ্ছে তিনটি শব্দের মধ্যে সাদৃশ্যযুক্ত অংশ হল 'দাতা'। সুতরাং মনে হতে পারে 'দাতা' একটা রূপিম বা মূলরূপ। কিন্তু যদি এই শব্দগুলির সঙ্গে আরো বেশি শব্দ মিলিয়ে নিয়ে তুলনা করি—

করদাতা

অন্নদাতা

বস্ত্রদাতা

গৃহকর্তা

তাহলে দেখা যাবে শব্দগুলির মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ বেড়েছে। পার্থক্যের অংশগুলি বাদ দিলে সাদৃশ্যযুক্ত ধ্বনিগুচ্ছ পাওয়া যাচ্ছে শুধু '-তা'। এইভাবে ক্রমশ অধিকতর শব্দের মধ্যে তুলনা করে অর্থগত ও ধ্বনিগত সাদৃশ্যযুক্ত যে অংশটি পাওয়া যায় তাই হল রূপিম। যেমন--উপরের উদাহরণে '-তা' হল একটি রূপিম। যত বেশি শব্দের মধ্যে তুলনা করা হবে রূপিম নির্ণয় ততই নির্ভুল হবে।

নিদার দ্বিতীয় সূত্র :

> "Forms which have a common semantic distinctiveness but which differ in phonemic form (i. e. the phonemes or order of the phonemes) may constitute a morpheme provided the distribution of formal differences is phonologically definable."[৫৫]

যেসব ধ্বনিসংগঠনের মধ্যে সুস্পষ্ট অর্থগত সাদৃশ্য আছে কিন্তু যাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ ধ্বনিগত পার্থক্য আছে সেসব ধ্বনিসংগঠনকেও একই রূপিম ধরা হবে

৫৫। Ibid., p. 14.

যদি তাদের পারস্পরিক ধ্বনিগত পার্থক্যকে ধ্বনি-পরিবর্তনের সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করে দেখানো যায় যে, যে দু'টি ধ্বনির ক্ষেত্রে পার্থক্য চোখে পড়ছে, সে ধ্বনি দু'টি মূলত একই ধ্বনি ছিল, সুনির্দিষ্ট কারণে পরিবর্তিত হয়ে তারা পৃথক্ রূপ ধারণ করেছে। যেমন—'সন্ত্রাস', 'সম্পূর্ণ' ও 'সঙ্কোচন' শব্দে একটা অর্থগত মিল আছে, সেই মিলটা পরিপূর্ণতার মিল, তিনটি শব্দেই একটি পরিপূর্ণতার ভাব আছে। 'সন্ত্রাস' শব্দে বোঝাচ্ছে 'ত্রাস', যেন একটু-আধটু ত্রাস (ভয়) নয়, ব্যাপক ত্রাস। তেমনি 'সম্পূর্ণ' শব্দে যেন কোনো-রকমে পূর্ণ বোঝাচ্ছে না, একেবারে পূর্ণ বোঝাচ্ছে। তেমনি আবার 'সঙ্কোচন' শব্দে একটু কুঞ্চন নয়, সম্পূর্ণ কুঞ্চন বোঝাচ্ছে। এই তিনটি শব্দের প্রথমাংশ যথাক্রমে 'সন্', 'সম্' ও 'সঙ্'-এ এই পরিপূর্ণতার ভাবটি রয়েছে। এদের মধ্যে এই অর্থগত মিল আছে। কিন্তু ধ্বনিগত মিল তো পুরোপুরি নেই। তাহলে 'সন্', 'সম্' ও 'সঙ্'কে কি একই রূপিম বলা যাবে? এখানে পার্থক্য হচ্ছে 'ন্', 'ম্', এবং 'ঙ্' ধ্বনিতে। একটু তলিয়ে দেখলে অনুমান করতে কষ্ট হবে না যে, এগুলি মূলে একই ধ্বনি ছিল—মূল রূপটি ছিল 'সম্'। এর 'ম্' পৃথক্ হয়েছে পরবর্তী কোনো ধ্বনির প্রভাবে। এই 'ম্' 'সন্ত্রাস'-এ দন্ত্য ধ্বনি 'ত'-এর প্রভাবে দন্ত্য 'ন' হয়েছে ; 'সম্পূর্ণ'-এর ওষ্ঠ্য ধ্বনি 'প্'-এর প্রভাবে ওষ্ঠ্য ধ্বনি 'ম্'-তে পরিণত হয়েছে, 'সঙ্কোচনে' তেমনি স্নিগ্ধ-তালব্য ধ্বনি 'ক্'-এর প্রভাবে স্নিগ্ধ-তালব্য নাসিক্য ধ্বনি 'ঙ্'-কে পরিবর্তিত হয়েছে। এখানে 'সম্' উপসর্গটি তিনটি শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে তিনরকম রূপ লাভ করেছে—'সন্' 'সম্' ও 'সঙ্'। সুতরাং সন্, সম্ ও সঙ্-এর মধ্যে যে ধ্বনিগত পার্থক্য আছে তা ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রে ব্যাখ্যা করে দেখানো যাচ্ছে যে এই পার্থক্য বাহ্য পার্থক্য, গভীরতর ক্ষেত্রে এই তিনটি একই স্বনিম। সুতরাং এই তিনটি (সন্, সম্, সঙ্) হল একই রূপিমের উপরূপ (Allomorph)। কারণ এদের মধ্যে অর্থগত সাদৃশ্য আছে, আর মোটামুটি ধ্বনিগত সাদৃশ্যও আছে। যেটুকু ধ্বনিগত পার্থক্য আছে, সেটুকু সূত্রদ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। তেমনি ইংরেজি intolerable ও impractical শব্দের 'in-' ও 'im-' হল একই রূপিম।

নিদার তৃতীয় সূত্র :

> "Forms which have a common semantic distinctiveness but which differ in phonemic form in such a way that their distribution cannot be phonologically defined constitute a single morpheme if the forms are in complementary distribution...."[৫৬]

---

৫৬ Ibid., p. 41.

যেসব ধ্বনিসংগঠনের মধ্যে পারস্পরিক অর্থগত সাদৃশ্য আছে অথচ স্বনিমগত বৈসাদৃশ্য রয়েছে এবং সেটা ধ্বনি-পরিবর্তনের সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করে তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত মূলীভূত সাদৃশ্য দেখানো যায় না, তারাও একই রূপিম হতে পারে যদি দেখা যায় যে তারা পরিপূরক অবস্থানে (Complimentary distribution) রয়েছে, অর্থাৎ একটির স্থানে অন্যটি বসতে পারে না। যেমন— বাংলায় কোকিলা, সাধিকা, ময়ূরী, রুদ্রাণী শব্দগুলিতে স্ত্রীলিঙ্গ-প্রত্যয় যথাক্রমে -আ, -ইকা, -ঈ, -আনী। এদের মধ্যে স্বনিমগত বা ধ্বনিতাগত সাদৃশ্য নেই। তবু এরা একই রূপিম। কারণ এদের মধ্যে অর্থগত সাদৃশ্য আছে। এরা সবাই একই অর্থ বহন করে—স্ত্রীবাচক অর্থ। এদের একটি অন্যটির জায়গায় বসতে পারে না ; যেমন ময়ূরের সঙ্গে '-আনী' প্রত্যয় যোগ হবে না, তেমনি রুদ্রের সঙ্গে '-ঈ' প্রত্যয় যোগ হবে না। এবার ইংরেজিতে বহুবচনাত্মক চারটি পদ দেখা যাক— Cats, Crosses, Toys, Oxen, Deer—এইসব পদে বহুবচন-প্রত্যয় হল— যথাক্রমে -s/s/, -es/es, -s/z/, -en/en/ এবং শূন্য (Zero) প্রত্যয়। তাহলে এই চারটি প্রত্যয়ই এক অর্থ বহন করে—বহুবচনের অর্থ। কিন্তু এদের মধ্যে স্বনিম বা ধ্বনিতাগত মিল নেই। তা সত্ত্বেও এরা একই রূপিম। কারণ এদের অর্থ এক এবং এরা পরস্পরের সঙ্গে পরিপূরক অবস্থানে রয়েছে, অর্থাৎ একের জায়গায় অন্যটি বসতে পারে না। Cat-এর সঙ্গে -en যোগ হতে পারে না, তেমনি Ox-এর সঙ্গে -s বা -es যোগ হতে পারে না। এদের অবস্থান সর্তাধীন। এরা একই রূপিমের অবস্থানগত বৈচিত্র্য। বিশেষজ্ঞরা এই রকমের বৈচিত্র্যকেই উপরূপ (allomorph) বলেছেন :

"An **allomorph** is a variant of a morpheme which occurs in certain definable environments. A **morpheme** is a group of one or more allomorphs..."[৫৭] এবং

"Two elements can be considered as allomorphs of the same morpheme if : (1) they have a common meaning, (2) they are in complementary distribution, AND (3) they occur in parallel formations. Note that there are three requirements. All three must be met."[৫৮]

দু'টি উপরূপের (allomorph) মধ্যে অর্থগত সাদৃশ্য থাকে কিন্তু ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকে না। এক-একটি রূপিমের কখনো কখনো একাধিক উপরূপ থাকে,

---

৫৭। Gleason, H. A. (Jr.) : *An Introduction to Descriptive Linguistics*, 1968, p. 61.

৫৮। Ibid. : p. 88.

সব উপরূপগুলিকে নিয়েই একটি রূপিম গঠিত হয়। কখনো বা কোনো রূপিমের একটিই রূপ থাকে, কোনো উপরূপ থাকে না। একই রূপিমের উপরূপগুলিকে '~' চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন—ইংরেজিতে বহুবচন-প্রত্যয় /s~es~z~en/, বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ-প্রত্যয় আ ~ ইকা ~ আনী ইত্যাদি। সব উপরূপ একটি রূপিমের দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এইভাবে $\{-z_1\}$। যখন রূপতাত্ত্বিক কারণে (অর্থাৎ শব্দরূপ ধাতুরূপ ইত্যাদিতে) একটি রূপিম বিভিন্ন পরিবেশে (distribution) অল্পস্বল্প ধ্বনি-পরিবর্তন লাভ করে তখন সেই ধ্বনি-পরিবর্তনকে রূপগত বা রূপতত্ত্ব-প্রভাবিত ধ্বনি-পরিবর্তন (Morphophonemic change) বলে। যেমন—ইংরেজি বহুবচন-প্রত্যয় /s/ তিন রকম পরিবর্তন লাভ করে।

(১) অঘোষ ধ্বনির পরে /s/ ; যেমন—cats/kæts/

(২) সঘোষ ধ্বনির পরে /z/ ; যেমন—bees/bi:z/

(৩) /s z ʃ ʒ c ɟ/-এর পরে /iz/ ; যেমন—fishes/fiʃiz/

বাংলা 'কর্' ধাতু স্বরসঙ্গতির ফলে কখনো 'কোর্' হয়, কখনও 'কর'-ই থাকে। যেমন—

আমি করি = [কোরি]
তুমি করো
তুই কর্
সে করে।

এখানে 'কর্' থেকে যে 'কোর্' হয়েছে, এটা হল 'কর্' ধাতুর রূপতত্ত্ব প্রভাবিত ধ্বনি-পরিবর্তন (Morphophonemic change)।

অন্যদিকে যদি এমন হয় যে, দু'টি ধ্বনিগুচ্ছের অর্থাৎ শব্দ বা শব্দাংশের মধ্যে শুধু ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে, কিন্তু অর্থগত সাদৃশ্য নেই, তবে সেই শব্দ বা শব্দাংশগুলিকে একই রূপিম বলা হয় না, এরকমের শব্দ বা শব্দাংশকে 'সমধ্বনি রূপ' (Homophonous Forms) বলে। যেমন—বাংলায় 'সে বই পড়ে' এবং 'গাছ থেকে পাতা পড়ে'—এই দুই বাক্যের 'পড়্' ধাতুর মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে, কিন্তু অর্থগত সাদৃশ্য নেই। সুতরাং দুই বাক্যের 'পড়্' ধাতু একই রূপিম নয়। তেমনি ইংরেজিতে cats শব্দের '-s' এবং runs শব্দের '-s' ধ্বনিগত দিক থেকে একই রকম, কিন্তু এদের অর্থ পৃথক্। cats শব্দে '-s' বহুবচনের অর্থ বহন করে। 'runs' শব্দের '-s' প্রথম পুরুষের একবচনের ক্রিয়া-বিভক্তি। সুতরাং দু'টির অর্থ পৃথক্। এই দুই '-s' তাই একই রূপিম নয়, পৃথক্ রূপিম। এরা হল সমধ্বনি রূপ (Homophonous Forms)।

এই হল রূপিম সনাক্ত করার প্রধান কয়েকটি সূত্র ও পদ্ধতি। এইসব সূত্রের

শুধু মোটামুটি ব্যাখ্যাই এখানে দেওয়া হল। এদের আরো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও উপসূত্র আছে। এছাড়া আরো কিছু সূত্র ও পদ্ধতিগত ধাপ আছে। কিন্তু সেগুলির বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। উপরে যে ক'টি প্রধান সূত্রের উল্লেখ করা হল তাতে আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে রূপিম-বিশ্লেষণের মূল পদ্ধতি বোঝা যাবে। অপরিচিত ভাষার শব্দের গঠন বিশ্লেষণে এই পদ্ধতি বিশেষ কাজে লাগে। মাতৃভাষা ও যেসব ভাষা আমাদের বিশেষ পরিচিত তাদের গঠন আমরা অল্পবিস্তর জানি। সেইজন্যে পরিচিত ভাষার শব্দগঠন বিশ্লেষণে এর উপযোগিতা ঠিক বোঝা যাবে না, কিন্তু অপরিচিত ভাষা ও উপভাষা এবং উপজাতিদের অজ্ঞাত ভাষা বিশ্লেষণে রূপিম সনাক্তকরণের পদ্ধতিটি বিশেষ সহায়ক।

রূপিম নির্ণয়ের এইসব বিধিবিধান জানার সঙ্গে সঙ্গে আরো দু'টি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমত, আমরা যে ভাষার উপাদান থেকে রূপিম (Morpheme) নির্ণয় করি, নির্ণীত রূপিমগুলি সেই বিশেষ ভাষারই সম্পদ। এক ভাষার রূপিম সব ভাষার রূপিম নয়, অর্থাৎ সার্বভাষিক রূপিম বলে কিছু নেই।

দ্বিতীয়ত, রূপিম হল ভাষার সামগ্রিক গঠনের একটি অঙ্গ। ভাষাদেহে প্রত্যেক অঙ্গের বিন্যাসের নিজস্ব স্থান ও রীতি আছে। কোনো কোনো ভাষার গঠনে প্রত্যেক রূপিমের ব্যবহারের স্থান নির্দিষ্ট। ভাষার গঠনে একটি রূপিম বা তার উপরূপ যে-যে স্থানে বসে সেই-সেই স্থানকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে সেই রূপিমের অবস্থান (Distribution) বলে। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী গ্লীসন্ রূপিমের অবস্থান সম্পর্কে বলেছেন—

"The *distribution* of the morpheme is the sum of all the contexts in which it can occur in contrast to all those in which it cannot occur."[৫৯]

যেমন—'কলমগুলি টেবিলে রয়েছে' এবং 'দেবতারা স্বর্গে থাকেন' এই দুই বাক্যে '-গুলি' এবং '-রা' হল বহুবচন-প্রত্যয়। দু'য়ের অর্থ একই, কিন্তু বিশেষ সাহিত্যিক প্রয়োগ ছাড়া 'দেবতা-র সঙ্গে '-গুলি' এবং 'কলম'-এর সঙ্গে '-রা' ব্যবহৃত হতে পারে না। এই যে '-গুলি' ও '-রা'-এর সুনির্দিষ্ট স্থান এই স্থানকে বলে অবস্থান (Distribution)।

৫৯। Ibid., p. 56.

॥ ২০ ॥

মূলরূপ বা রূপিমের শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Morphemes)

রূপিম বা মূলরূপ দু'রকমের হতে পারে—মুক্ত বা স্বচ্ছন্দ রূপিম (Free Morpheme) এবং বদ্ধ রূপিম (Bound Morpheme)। যে অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি ভাষায় অন্য ধ্বনিসমষ্টির সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত না হয়েও স্বাধীন ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে তাকে মুক্ত রূপিম (Free Morpheme) বলে। যেমন—'আম আমাদের প্রিয় ফল'। এখানে 'আম' হল মুক্ত রূপিম। কিন্তু যে অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি সর্বদা অন্য ধ্বনিসমষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, কখনো স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না, তাকে বদ্ধ রূপিম (Bound Morpheme) বলে। যেমন—'সুপক্ক আমের রস আমার প্রিয় খাবার।' এখানে 'আমের' শব্দের '-এর' বিভক্তিটি বদ্ধ রূপিম। 'এই ছেলেটি ভারি মিষ্টি' এবং 'ঐ ছেলেটা বকাটে'—এই দু'টি বাক্যে '-টি' ও '-টা' হল বদ্ধ রূপিম। '-টি' ও '-টা' দু'টিরই অর্থ আছে, আছে বলেই 'ছেলেটি' বললে একটা আদরের ভাব এবং 'ছেলেটা' বললে একটা ঘৃণার বা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠে। '-টি' ও '-টা' দু'য়েরই সূক্ষ্ম অর্থ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও '-টি' বা '-টা'র আলাদাভাবে ব্যবহৃত হবার স্বাধীনতা নেই। সব সময় অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েই এগুলি ব্যবহৃত হয়। এই রকমের রূপিমকেই বদ্ধ রূপিম (Bound Morpheme) বলে। 'ছেলেটি' শব্দে 'ছেলে' হল মুক্ত রূপিম আর '-টি' হল বদ্ধ রূপিম। তেমনি 'ছেলেটা' শব্দে 'ছেলে' হল মুক্ত রূপিম আর '-টা' হল বদ্ধ রূপিম। ইংরেজিতে 'Kindly' শব্দে 'Kind' হল মুক্ত রূপিম এবং 'ly' হল বদ্ধ রূপিম।

আবার আর এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহের মধ্যে কিছু কিছু শব্দ এমন আছে যেগুলিকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না। যেমন—'না', 'হ্যাঁ' ইত্যাদি। এছাড়া অধিকাংশ শব্দই এমন যে, সেগুলিকে আরো ছোট অংশে ভাগ করা যায়। এই ধরনের এক-একটি শব্দকে ভাগ করে আমরা তাতে দু'রকমের রূপিম পাই : ধাতু (root) এবং প্রত্যয় (affix)। যেমন 'গমন' শব্দ = গম্ (ধাতু) + অন (অনট্) (প্রত্যয়)। ধাতু কথাটি সাধারণত ক্রিয়ার মূল অর্থে প্রচলিত। কিন্তু এখানে আমরা শুধু ক্রিয়ার মূল নয়, নাম-পদেরও মূল অংশ বোঝাতে ধাতু কথাটি একটু ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছি। এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, পাণিনি যখন বলেছিলেন শুধু ক্রিয়া-শব্দ নয়, নাম-শব্দের মূলেও একটি করে ধাতু রয়েছে,

তখন তিনিও ধাতু কথাটি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করেছিলেন। যেমন–'রাম' শব্দ = রম্ (ধাতু) + ঘঞ (প্রত্যয়) ; 'রাম' হল নাম-শব্দ, ক্রিয়া নয়।

সাধারণত ক্রিয়ামূল বা শব্দের পরে যা যোগ হয় তাকে আমরা প্রত্যয় বলি। কিন্তু ব্যাপক অর্থে শব্দ বা ধাতুর আদিতে, মধ্যে বা অন্তে যা যোগ হয়, তা-ই হল প্রত্যয় (affix)। এই প্রত্যয় (affix) তিন শ্রেণীর : উপসর্গ (ব্যাপক অর্থে Prefix), পরসর্গ (Suffix) ও মধ্যসর্গ (Infix)। শব্দ বা ধাতুর আদিতে যা যোগ হয় তাকে বলে উপসর্গ (Prefix), অন্তে যা যোগ হয় তাকে বলে পরসর্গ (Suffix) এবং শব্দের মধ্যে যা যোগ হয় তা হল মধ্যসর্গ (Infix)। যেমন 'অনুচর' শব্দে 'অনু-' হল উপসর্গ। 'চরণ' (√ চর্ + অন ~ অনট্) শব্দে '-অন (অনট্)' হল পরসর্গ। ইংরেজিতে abnormal (ab+normal) শব্দে 'ab' হল উপসর্গ, 'normally' শব্দে '-ly' হল পরসর্গ। 'intake' শব্দে 'in-' হল উপসর্গ, 'taking' শব্দে 'ing' হল পরসর্গ। মধ্যসর্গ (infix) যোগের উদাহরণ বিরল হলেও পাওয়া যায়। ইন্দোনেশিয়ার ভাষায় মধ্যসর্গ যোগের প্রবণতা লক্ষ্য করেছিলেন ম্যাক্স্‌ম্যূলর্ : তগল (Tagala) ভাষায় 'Sulat' শব্দের অর্থ 'লিপি'। এতে '-un-' মধ্যসর্গ যোগ করে হবে S-un-ulat = 'লেখা', 'u-ng-m'-মধ্যসর্গ যোগ করে হবে (S-u-ng-m-ulat) = 'লিখেছিল'।

শুধু ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে শব্দ গঠন করা হয়, আবার অনেক সময় ধাতুর সঙ্গে আগে একটা ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ-গঠিত রূপিম যোগ করে তারপরে তার সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করা হয়। এই রকম অতিরিক্ত রূপিমহীন ধাতু বা অতিরিক্ত রূপিমযুক্ত ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগে যা গঠন করা হয় তাকে প্রাতিপদিক (Stem) ও ক্রিয়ামূল বলে।

প্রত্যয় যোগের আগে ধাতুর সঙ্গে অনেক সময় যে ধ্বনি বা রূপিমটি যোগ করে নেওয়া হয় তাকে বিকরণ (stem formative) বলে। যেমন (১) ভাঙ্ (ধাতু) + ছি (প্রত্যয়) = ভাঙছি। (২) ভাঙ্ (ধাতু) + আ (বিকরণ stem formative) + ছি (প্রত্যয়) = ভাঙাচ্ছি। প্রথম উদাহরণের 'ভাঙ্' ও দ্বিতীয় উদাহরণের 'ভাঙা' দু'টিই হল stem। কোনো কোনো শব্দ একটিমাত্র রূপিম নিয়ে গঠিত হয়। একে সিদ্ধ বা মৌলিক শব্দ (Simple or Root Word) বলে। যেমন–মা, ভাই, আম। আবার কোনো কোনো শব্দ একাধিক রূপিমের সংযোগে গঠিত হয়। ওরকম একাধিক রূপিমের সংযোগে গঠিত শব্দাবলী আবার দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই দুই শ্রেণীর নাম হল–জটিল শব্দ (Complex Word) এবং সমাসবদ্ধ শব্দ (Compound Word)। একটি মুক্ত রূপিমের সঙ্গে এক বা একাধিক বদ্ধ রূপিম যুক্ত করে যে শব্দ গঠিত হয় তাকে জটিল শব্দ (Complex Word) বলে। যেমন–রাত (মুক্ত রূপিম) +

এর (ষষ্ঠী বিভক্তি, বদ্ধ রূপিম) = রাতের (জটিল শব্দ)। একটি মুক্ত রূপিমের সঙ্গে এক বা একাধিক মুক্ত রূপিম যোগ করে যে শব্দ গঠিত হয় তাকে সমাসবদ্ধ শব্দ বলে। যেমন—রাত (মুক্ত রূপিম) + দিন (মুক্ত রূপিম) = রাতদিন (সমাসবদ্ধ শব্দ)। জটিল শব্দ বা সমাসবদ্ধ শব্দের যে গঠন তাকে রূপগত গঠন (Morphological Construction) বলে। এই রূপগত গঠন রূপতত্ত্বের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। এর মধ্যে জটিল শব্দের গঠন অর্থাৎ মুক্ত রূপিমের সঙ্গে বদ্ধ রূপিমের সংযোগ-সম্মিলন এবং তার দ্বারা ভাষার শব্দরূপ ধাতুরূপ ইত্যাদির বৈচিত্র্য সংঘটনই রূপতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই কথা মনে রেখে এর পর বাংলা রূপতত্ত্বের মূলসূত্র সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

॥ ২১ ॥

বাংলা রূপতত্ত্বের মূলসূত্র
(Fundamental Principles of Bengali Morphology)

রূপিম বা মূলরূপের (Morpheme) ধারণাটি আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অবদান। এই ধারণাটি গড়ে উঠার আগে ঐতিহ্যগত ব্যাকরণেও—বিশেষত পাণিনি-প্রবর্তিত সংস্কৃত ব্যাকরণের ধারায়—রূপতত্ত্বের আলোচনা বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। রূপতত্ত্ব হল প্রাচীন ও আধুনিক উভয়বিধ ভাষাবিজ্ঞানেরই একটি সমৃদ্ধ অংশ। আগেই বলেছি শব্দের গঠন ও রূপবৈচিত্র্যই এই রূপতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য ছিল।

বাংলা ভাষার রূপতত্ত্বে প্রথম আলোচ্য হল বাংলা শব্দ কিভাবে গঠিত হয়, তারপরে আলোচ্য হল এই গঠিত শব্দ ভাষায় যখন ব্যবহৃত হয় তখন কিভাবে তার রূপবৈচিত্র্য সাধিত হয়।

বাংলা শব্দের গঠন ও গঠনগত শ্রেণীবিভাগ (Structure of Bengali Words and their Structural Classification) : আমরা আগে রূপিমের (Morpheme) সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছি যে, রূপিম হল এক বা একাধিক ধ্বনির সমবায়ে গঠিত অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক (Minimal meaningful unit)। এই রূপিমই হল শব্দ-গঠনের উপাদান। বাংলা শব্দ তিনভাগে গঠিত হয়--

(১) কখনো একটিমাত্র রূপিমের সাহায্যে। যেমন—মা, ভাই, ও।

(২) কখনো একাধিক রূপিমের সমবায়ে। একাধিক রূপিমের সাহায্যে

শব্দের গঠন আবার দু'ভাবে হয় :

(ক) কখনো এক বা একাধিক বদ্ধ রূপিমের সঙ্গে এক বা একাধিক বদ্ধ রূপিমের সংযোগে—যেমন—গম্ + অন (অনট্) = গমন।

(খ) কখনো এক বা একাধিক মুক্ত রূপিমের সঙ্গে এক বা একাধিক বদ্ধ রূপিমের সংযোগে। যেমন—মাষ্টার + ঈ = মাষ্টারী।

(৩) কখনো একটি শব্দের সঙ্গে এক বা একাধিক শব্দের সংযোগে। যেমন—ভাই + বোন = ভাইবোন।

বাংলা শব্দের গঠনের এই মূলসূত্রের আলোকে বাংলা শব্দের গঠনগত শ্রেণীবিভাগ এইভাবে করা হয় :

যে শব্দ একটি মাত্র রূপিম নিয়ে গঠিত সেই শব্দকে সরল বা মৌলিক বা সিদ্ধ শব্দ (Simple or Root word) বলে। যে শব্দ এক বা একাধিক মুক্ত রূপিমের সঙ্গে এক বা একাধিক বদ্ধ রূপিমের সংযোগে অথবা শুধুই একাধিক বদ্ধ রূপিমের সংযোগে গঠিত হয় তাকে জটিল শব্দ (Complex word) বলে। এটাই হল প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ। যেমন—'গড়ন' = গড় + অন। এখানে 'গড়' ধাতু (বদ্ধ রূপিম), অন প্রত্যয় (বদ্ধ রূপিম)। আর যে শব্দ একাধিক মুক্ত রূপিম বা একাধিক শব্দ নিয়ে গঠিত তাকে সমাসবদ্ধ শব্দ বা সমস্ত পদ (Compound word) বলে। যেমন—ভাইবোন = ভাই + বোন (দু'টিই মুক্ত রূপিম)। গড়ন-পেটন = গড়ন + পেটন (দু'টিই শব্দ)।

ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণে শব্দের যে গঠনগত শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে তা অনেকটা আধুনিক শ্রেণী বিভাগেরই মতো। ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণে গঠনগত দিক থেকে শব্দকে দু'টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এই দু'টি শ্রেণী হল—মৌলিক বা স্বয়ংসিদ্ধ শব্দ (Simple or Root Word) এবং সাধিত শব্দ (Derived or Composed Word)। যে শব্দকে অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না, ভাগ করলেও তার ভগ্ন অংশগুলির এমন কোনো অর্থ হয় না যে অর্থের সঙ্গে মূল শব্দের অর্থের কোনো সঙ্গতি আছে, তাকে মৌলিক বা স্বয়ংসিদ্ধ শব্দ (Simple or Root Word) বলা হয়। যেমন—মা, কাকা, গাছ ইত্যাদি। এদের মধ্যে যে-কোনো একটি শব্দকে আমরা আরো ছোট-ছোট অংশে ভাগ করে দেখতে পারি তার অংশগুলির কোনো অর্থ হয় কিনা। যেমন—'মা' শব্দটিকে আমরা 'ম্ + আ'—এইভাবে দুই অংশে ভাগ করতে পারি, কিন্তু 'ম্' বা 'আ' কোনো অংশেরই কোনো অর্থ হয় না। 'গাছ' শব্দটিকে অবশ্য 'গা + ছ' দুই অংশে ভাগ করা যায়, কিন্তু এই অংশগুলির মধ্যে 'ছ'-এর কোনো অর্থ হয় না, কিন্তু 'গা' অংশের একটা স্বতন্ত্র অর্থ বাংলায় হয়—'শরীর', 'দেহ'। কিন্তু এই অর্থের সঙ্গে 'গাছ' শব্দের অর্থের কোনো যোগ থাকে না। সুতরাং 'মা', 'গাছ' ইত্যাদি হল মৌলিক শব্দ।

অন্যদিকে যে শব্দকে ক্ষুদ্রতর অর্থপূর্ণ অংশে ভাগ করা যায় এবং মূল শব্দের অর্থের সঙ্গে অংশগুলির অর্থের সঙ্গতি বা যোগ থাকে তাকে সাধিত শব্দ বলে। যে সাধিত শব্দকে বিশ্লেষণ করলে তার অংশগুলির মধ্যে একাধিক অর্থযুক্ত প্রধান অংশ পাওয়া যায় এবং অন্য অংশগুলিকে তার সঙ্গে যুক্ত প্রধান অংশের অর্থের পরিবর্ধন বা পরিবর্তনকারী অংশ বলে উপলব্ধি করা যায় সেই শব্দকে প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বলে। যেমন—আমূল, নির্মূল ইত্যাদি। এই শব্দ দু'টি বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই—আ + মূল এবং নির্ + মূল। এই দু'টি শব্দে প্রধান অংশ হল 'মূল'। আমরা বুঝতে পারছি প্রধান অংশেই শব্দের আসল অর্থের উৎস নিহিত আছে। এই শব্দ দু'টিতে প্রধান অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যথাক্রমে 'আ-' এবং নির্-'। এই দু'টি হচ্ছে অপ্রধান অংশ। অথচ এই অপ্রধান অংশগুলি প্রধান অংশের অর্থের এমন পরিবর্তন সাধন করেছে যে, শব্দ দু'টির সম্পূর্ণ পৃথক্ অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে।

যে সাধিত শব্দকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে একাধিক মৌলিক বা প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ পাওয়া যায় তাকে সমাসবদ্ধ শব্দ বা সমস্ত শব্দ (Compound word) বলে। যেমন—ভাই-বোন (ভাই + বোন = একাধিক মৌলিক শব্দ)। শ্রবণ-মনন (শ্রবণ + মনন = একাধিক প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ)।

রূপবৈচিত্র্য ও ব্যাকরণিক সংবর্গ (Morphological Variations and Grammatical Categories) : উপরে সংক্ষেপে বাংলা শব্দের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হল। কিন্তু শুধু শব্দের গঠনই রূপতত্ত্বের আলোচনার শেষ কথা নয়। বাক্য-মধ্যে শব্দ কি ভূমিকা গ্রহণ করে এবং তার সেই ভূমিকা কিভাবে চিহ্নিত হয়, তা-ই রূপতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়। শব্দকে বাক্যে ব্যবহার করলে শব্দের এই ভূমিকা শুরু হয়। বাক্যে ব্যবহৃত হলে শব্দকে পদ (Part of Speech) বলে। বাংলা বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন পদের ভূমিকা এবং পদগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করে পদকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—নামপদ বা বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া এবং অব্যয় (ও অব্যয় জাতীয় পদ)। বিশেষ্যের বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণকেও (adverbs) বাংলায় বিশেষণের মধ্যেই ধরা হয়। বাক্যের পদগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশ করার জন্যে অথবা বাক্যের মধ্যে পদগুলির ভূমিকা চিহ্নিত করার জন্যে শব্দের অঙ্গ হিসাবে যেসব রূপিম যোগ করা হয় সেগুলিকে বিভক্তি বলে। এই রূপিমগুলি যুক্ত হয়ে থাকার ফলে শব্দের রূপবৈচিত্র্য সাধিত হয়।

অব্যয়ের কোনো রূপবৈচিত্র্য নেই, অব্যয়ের সঙ্গে কোনো বিভক্তি যোগ হয় না ; শুধু বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ার রূপবৈচিত্র্য সাধিত হয়। তার মধ্যে বিশেষ্য

(বা নামপদ) ও সর্বনামের বিভক্তি একই বিভাগে আলোচ্য। সে বিভাগটি হল কারক-বিভক্তি। বিশেষণ যখন বিশেষ্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় তখন তার সঙ্গে সাধারণত কোনো কারক-বিভক্তিই যোগ হয় না। সুতরাং বিভক্তি যোগে রূপবৈচিত্র্য সাধিত হয় প্রধানত নাম বা বিশেষ্যের ও ক্রিয়ার। তাই বিভক্তি হল দু' প্রকার। যথা—নাম-বিভক্তি (সুপ্) ও ক্রিয়া-বিভক্তি (তিঙ্)। এই বিভক্তি যোগে যে রূপবৈচিত্র্যই সাধিত হয় তা-ই হল রূপতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়। বিশেষ্য এবং ক্রিয়ার রূপবৈচিত্র্যই বাংলা রূপতত্ত্বে প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। একে যথাক্রমে শব্দরূপ (Declension) ও ক্রিয়ারূপ (Conjugation) বলে। বচন (Number), লিঙ্গ (Gender), পুরুষ (Person), কারক (Case), কাল (Tense), ভাব-প্রকার (Mood) প্রভৃতি রূপ-বৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রিত করে। এগুলিকে ব্যাকরণিক সংবর্গ বা ব্যাকরণিক কোটি (Grammatical Category) বলে। এইসব ব্যাকরণিক সংবর্গ সব ভাষার রূপতত্ত্বকে সমান নিয়ন্ত্রিত করে না, এক-এক ভাষায় এদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা এক-এক রকম, এবং তার উপরেই ভাষাবিশেষের রূপতত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যও নির্ভর করে।

শব্দরূপ (Declension) :

লিঙ্গ (Gender) : বাংলার লিঙ্গ-বিধির কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা অন্য ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে সহজেই ধরা পড়ে। আমরা জানি বাংলায় লিঙ্গ তিন প্রকার—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ। কিন্তু ইংরেজিতে এই তিনটি ছাড়া আছে—উভয়লিঙ্গ (Common Gender)। আজকাল ইংরেজির অনুসরণে বাংলাতেও কেউ কেউ উভয়লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাঁদের মতে সন্তান, কবি, শিশু ইত্যাদি হল উভয়লিঙ্গ। সংস্কৃত ও জার্মানেও লিঙ্গ তিন প্রকার—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। আবার হিন্দি ও ফরাসিতে লিঙ্গ শুধু দু'প্রকার—পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ। ফলে যেসব শব্দকে আমরা ক্লীবলিঙ্গ মনে করি সেগুলি এইসব ভাষায় হয় পুংলিঙ্গ, নয় স্ত্রীলিঙ্গ।

বাংলায় লিঙ্গ অর্থনির্ভর, অর্থাৎ শব্দের দ্বারা পুরুষ-জাতীয় প্রাণীকে বোঝালে পুংলিঙ্গ, স্ত্রী-জাতীয় প্রাণীকে বোঝালে স্ত্রীলিঙ্গ, আর অপ্রাণীবাচক বস্তুকে বোঝালে ক্লীবলিঙ্গ হয়। যেমন—বাংলায় ঘোড়া = পুংলিঙ্গ, মেয়ে = স্ত্রীলিঙ্গ, লতা = ক্লীবলিঙ্গ। এই লিঙ্গ-নির্ণয়-বিধিতে ইংরেজির সঙ্গে বাংলার সাদৃশ্য আছে। অন্যদিকে সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসি ও হিন্দি ভাষা থেকে বাংলার পার্থক্য আছে। এইসব ভাষায় লিঙ্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনির্ভর হলেও সর্বদা অর্থনির্ভর নয়, কতকটা শব্দের গঠননির্ভর এবং কতকটা প্রথানির্ভর ; ফলে অনেক সময় অর্থের সঙ্গে লিঙ্গের সম্বন্ধ থাকে না। যেমন—সংস্কৃতে সূর্য = পুংলিঙ্গ, নদী =

স্ত্রীলিঙ্গ, লতা = স্ত্রীলিঙ্গ, উদ্যান = ক্লীবলিঙ্গ, কলত্র (ভার্যা) = ক্লীবলিঙ্গ ; জার্মানে Garten (উদ্যান) = পুংলিঙ্গ, Fluss (নদী) = পুংলিঙ্গ, Sonne (সূর্য) = স্ত্রীলিঙ্গ, Mädchen (মেয়ে) = ক্লীবলিঙ্গ, Pferd (ঘোড়া) = ক্লীবলিঙ্গ ; ফরাসিতে livre (বই) = পুংলিঙ্গ, soleil (সূর্য) = পুংলিঙ্গ, fleuve (সমুদ্রগামী নদী) = পুংলিঙ্গ, jardin (উদ্যান) = পুংলিঙ্গ ; হিন্দিতে কপড়া (কাপড়) = পুংলিঙ্গ, কিতাব (বই) ও গুড়িয়া (পুতুল) = স্ত্রীলিঙ্গ ইত্যাদি। এইসব ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় বাংলায় লিঙ্গবিধি অর্থনির্ভর বলে লিঙ্গ-নির্ণয় অনেক সহজ। ফরাসি ভাষায় লিঙ্গ পুরোপুরি অর্থনির্ভর নয়, অনেকটা গঠননির্ভর। গঠননির্ভর বলেই সে ভাষায় লিঙ্গবিধিতে খেয়ালখুশির বিশেষ স্থান নেই। বরং গঠনগত বিধিনির্ভরতায় মোটামুটি সঙ্গতি আছে। সেখানে সাধারণত '-e' অন্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, বাকি প্রায় সব শব্দ পুংলিঙ্গ। যেমন—ami (ছেলেবন্ধু) = পুংলিঙ্গ, amie (বান্ধবী) = স্ত্রীলিঙ্গ, voisin (পুরুষ প্রতিবেশি) = পুংলিঙ্গ, voisine (প্রতিবেশিনী) = স্ত্রীলিঙ্গ।

বাংলা ভাষার রূপতত্ত্বে লিঙ্গের প্রভাব খুব বেশি নেই। বিশেষ্য পদের সঙ্গে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যয় যোগ হয় এবং তার ফলে তাদের পৃথক্ পৃথক্ রূপ দাঁড়িয়ে যায় ; যেমন : বৃদ্ধ—বৃদ্ধা, পাঠক—পাঠিকা, সাধক—সাধিকা, কাকা—কাকি, বেটা—বেটি, বেদে—বেদেনী। বাংলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে বিশেষ্যের রূপভেদ হলেও সর্বনামের রূপভেদ হয় না। যেমন—আমি, তুমি, সে প্রভৃতি শব্দ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে একই রূপে থাকে। বাংলায় বিশেষণের ক্ষেত্রেও লিঙ্গের প্রভাব ক্রমশ ক্ষীয়মাণ। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে আমরা কখনো কখনো বিশেষণের রূপ পৃথক্ হতে দেখি বটে, তবে অনেক ক্ষেত্রে আবার পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে বিশেষণের একই রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : ছোট ছেলে—ছোট মেয়ে ; বড় ভাই—বড় বোন। কিন্তু সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসি ও হিন্দি ভাষায় বিশেষণের লিঙ্গভেদ বিশেষ্য অনুযায়ী হয়। সংস্কৃতে বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে বিশেষণেরও লিঙ্গ নির্দিষ্ট হয় সে কথা আমাদের সকলের জানা। যেমন : পুংলিঙ্গ—সুন্দরঃ নরঃ, স্ত্রীলিঙ্গ—সুন্দরী নারী, ক্লীবলিঙ্গ—সুন্দরম্ ফলম্। লিঙ্গভেদ অনুসারে বিশেষণের রূপভেদ জার্মান ও ফরাসি ভাষাতেও লক্ষণীয়। যেমন—জার্মানে : পুংলিঙ্গ—der *guter* Mann (ভালো লোকটি), স্ত্রীলিঙ্গ—de *gute* Frau (ভালো ভদ্রমহিলাটি)। ফরাসি ভাষায় : পুংলিঙ্গ—*bon* homme (ভালো লোক), স্ত্রীলিঙ্গ—*bonne* femme (ভালো মহিলা)। বাংলায় তৎসম বিশেষণের রূপ লিঙ্গভেদে পৃথক্ হয় (যেমন—সুন্দর পুরুষ, সুন্দরী নারী), কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে বিশেষণের রূপভেদ হয় না। (যেমন : পুংলিঙ্গে—ভালো কাকা, স্ত্রীলিঙ্গে—ভালো কাকিমা)। ইংরেজিতে লিঙ্গভেদে বিশেষণের রূপভেদ একেবারেই হয় না (যেমন : পুংলিঙ্গ-

-the *good* boy, স্ত্রীলিঙ্গ—the *good* girl। সংস্কৃত, জার্মান ও ফরাসি ভাষা থেকে বাংলার পার্থক্যটি লক্ষণীয়। বাংলা এক্ষেত্রে ক্রমশ ইংরেজি ভাষার মতো বিশ্লেষণাত্মক গঠনবৈশিষ্ট্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

বিশেষণের রূপনিয়ন্ত্রণে বাংলায় লিঙ্গের প্রভাব ক্ষীয়মাণ, আর ক্রিয়ার রূপনিয়ন্ত্রণে বাংলায় লিঙ্গের প্রভাব একেবারেই নেই, কিন্তু হিন্দিতে আছে। ক্রিয়ারূপের প্রসঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করা হবে। হিন্দিতে কখনো কখনো আবার সম্বন্ধ পদের বিভক্তি পরিবর্তিত হয় সম্বন্ধিত পদের লিঙ্গ অনুসারে। যেমন : হিন্দিতে—রামের রুটি = রাম কী রোটী (স্ত্রী) ; রামের ভাত = রাম কা ভাত (পুং)। ফরাসিতে আবার অধিকারী সর্বনামের (possessive pronoun) লিঙ্গ তার অর্থ অনুসারে হয় না, অধিকৃত শব্দের লিঙ্গ অনুসারে হয়। ফরাসিতে কলম = prote-plume (স্ত্রী)। কলমের মালিক পুংলিঙ্গ হলেও 'তার কলম' = sa porte-plume (এখানে sa = সে = স্ত্রীলিঙ্গ)। কিন্তু livre = বই = পুংলিঙ্গ। বইয়ের মালিক স্ত্রীলিঙ্গ হলেও 'তার বই' = son livre (এখানে son = সে = পুংলিঙ্গ)।

বচন (Number) : বাংলা রূপতত্ত্বে লিঙ্গের প্রভাব বিশেষ নেই ; কিন্তু বচনের প্রভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়। সংস্কৃত বা গ্রীকের মতো বাংলায় দ্বিবচন নেই ; হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষার মতো বাংলায় বচন মাত্র দু'টি—একবচন (Singular) ও বহুবচন (Plural)। বাংলায় একবচন ও বহুবচনে বিশেষ্যের পৃথক্ রূপই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত। যেমন : একবচন—ছেলে, বহুবচন—ছেলেরা, একবচন—বই, বহুবচন—বইগুলি। তবে বিশেষ্যের আগে যেখানে বহুত্ববোধক কোনো বিশেষণ থাকে সেখানে বহুবচনে বিশেষ্যের পৃথক্ রূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলে না। কিন্তু অন্যান্য অনেক ভাষায় এক্ষেত্রেও বিশেষ্যের সঙ্গে বহুবচন-প্রত্যয় যোগ করে তার পৃথক্ রূপ দেওয়া হয়। সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষায় একবচন ও বহুবচনের রূপ পৃথক্। এসব ভাষা থেকে বাংলার স্বাতন্ত্র্যটি চোখে পড়ে। যেমন—

	একবচন	বহুবচন
হিন্দিতে	এক কিতাব	বহুৎ কিতাবেঁ
সংস্কৃতে	একম্ পুস্তকম্	বহুনি পুস্তকানি
ইংরেজিতে	One book	Many books
জার্মানে	Ein Buch	Viele Bücher
ফরাসিতে	un livre	beaucoup de livres
কিন্তু বাংলায়	একটি বই	অনেক বই

এখানে একবচন ও বহুবচনে 'বই' শব্দের একই রূপ।

সর্বনামের রূপে বাংলায় ফরাসি ভাষার মতো বচনের অব্যর্থ প্রভাব রয়েছে। একবচন ও বহুবচনে সর্বনামের রূপ পৃথক্ হয়ে থাকে। যেমন : আমি—আমরা, তুমি--তোমরা ইত্যাদি। ফরাসি je (আমি)—nous (আমরা)। এ বিষয়ে অন্যান্য ভাষা থেকে বাংলার বিশেষ কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। বরং ইংরেজি, জার্মান প্রভৃতি ভাষাতে দেখা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বচনভেদে সর্বনামের রূপভেদ হয় না। ইংরেজিতে you (তুমি, তোমরা) এবং জার্মানে Sie (তুমি, তোমরা) একবচন ও বহুবচন উভয়ক্ষেত্রে একই রূপ। হিন্দিতে 'আপ' (= 'আপনি', কখনো-কখনো 'তিনি') একবচন অর্থে ব্যবহৃত হলেও বহুবচনের ক্রিয়া গ্রহণ করে। যেমন--আপ যাতে হ্যাঁয়্।

বাংলায় সর্বনামের রূপতত্ত্বে বচনের প্রভাব থাকলেও আবার বিশেষণের ক্ষেত্রে এর বিশেষ প্রভাব নেই। একবচন ও বহুবচনে বিশেষণের রূপ একই রকম হয়ে থাকে। যেমন—ভাল ছেলে, ভাল ছেলেরা। শুধু বিশেষণের দ্বিত্ব সাধন করে কখনো কখনো তার দ্বারা বহুবচনের কাজ করা হয়, সেক্ষেত্রে বিশেষ্যের সঙ্গে বহুবচন-প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয় না। যেমন : একবচন—পাকা কথা, বহুবচন--পাকা-পাকা কথা। বিশেষণের রূপনিয়ন্ত্রণে বচনের ভূমিকায় বাংলার সঙ্গে ইংরেজির সাদৃশ্য আছে, অন্য দিকে সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসি থেকে বাংলার পার্থক্য লক্ষণীয়। বাংলার মতো ইংরেজিতেও একবচন ও বহুবচনে বিশেষণের রূপ একই থাকে। যেমন : একবচন—good boy, বহুবচন—good boys। কিন্তু সংস্কৃত, জার্মান ও ফরাসি ভাষায় বচনভেদে বিশেষণেরও রূপভেদ হয়। যেমন : সংস্কৃত—সুশীল নরঃ, সুশীলাঃ নরাঃ ; জার্মান—guter Mann, gute Männer ; ফরাসি—bon homme, bons hommes।

কারক (Case) : বাংলায় 'কারক' শব্দটি সংস্কৃত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইংরেজি 'Case' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলায় এখন 'কারক' শব্দের ব্যবহার প্রচলিত আছে। অথচ সংস্কৃত ব্যাকরণের 'কারক' এবং ইংরেজি ব্যাকরণের 'Case'-এর তাৎপর্য ঠিক এক নয়। পাণিনির মতে 'ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্' --ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের অন্তর্গত বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের যে সম্পর্ক থাকে তা-ই হল কারক। এই সম্পর্কের প্রকারভেদ অনুসারে সংস্কৃতে কারক হল—কর্তৃ কারক, কর্ম কারক, করণ কারক, সম্প্রদান কারক, অপাদান কারক ও অধিকরণ কারক। কিন্তু ইংরেজি মতে শুধু ক্রিয়ার সঙ্গে নয়, বাক্যের অন্তর্গত যে-কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সঙ্গে অন্য যে-কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের যে সম্পর্ক থাকে তাকেই Case বলে। এই সম্পর্কের প্রকৃতি অনুসারে Case আট রকম—Nominative (কর্তৃকারক), Accusative (কর্মকারক), Instrumental (করণকারক), Dative (সম্প্রদান কারক), Ablative (অপাদান কারক),

Genitive or Possessive (সম্বন্ধ পদ), Locative (অধিকরণ কারক) এবং Vocative (সম্বোধন পদ)। সংস্কৃতের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে পাশ্চাত্য মতে Genitive ও Vocative-কে কারক বলা হয়, কিন্তু সংস্কৃত মতে এগুলি কারক নয়, এগুলিকে বলা যায় যথাক্রমে সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ। কারণ এদের সঙ্গে ক্রিয়ার সোজাসুজি কোনো সম্পর্ক থাকে না, অথচ সংস্কৃত মতে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কই হল কারকের মূল কথা। যেমন—রামের ভাই লক্ষ্মণ পঞ্চবটী বনে সীতাকে রক্ষা করার জন্যে থেকে গেলেন। এখানে ক্রিয়া হল 'থেকে গেলেন'। এই বাক্যে 'থেকে যাওয়া'র কাজটি রাম করেন নি, লক্ষ্মণই করেছিলেন। সুতরাং এই বাক্যের 'রামের' শব্দের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্বন্ধ নেই, তাই সংস্কৃত মতে 'রামের' শব্দটি কারক নয়, সম্বন্ধ পদ। অন্যদিকে 'রামের ভাই' এই পদগুচ্ছে 'রামের' সঙ্গে 'ভাই' শব্দের সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ক হল সম্বন্ধের সম্পর্ক। ইংরেজি সংজ্ঞা অনুসারে এটাও কারক। যাই হোক ইংরেজির সঙ্গে সংস্কৃতের এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাধারণত ইংরেজি 'Case' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে 'কারক' শব্দই এখন প্রচলিত। এবং আধুনিক ভাষাতত্ত্বে কারক শব্দ Case শব্দের প্রতিশব্দ রূপেই সাধারণত ব্যবহৃত হয়।

বাংলায় বিভিন্ন প্রকার কারকের রূপ প্রকাশিত হয় শব্দের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রকার বদ্ধ রূপিম বা অতিরিক্ত স্বতন্ত্র শব্দের দ্বারা। এই বদ্ধ রূপিম ও স্বতন্ত্র শব্দকে যথাক্রমে বিভক্তি (Inflexion/case termination/case ending) ও অনুসর্গ (postposition) বলে। বিভক্তি ও অনুসর্গের কাজ একই, কিন্তু এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। বিভক্তি মূল শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে, কিন্তু অনুসর্গ মূল শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে না, তার পাশে অবস্থান করে। যেমন—'রামকে' শব্দে '-কে' হল বিভক্তি এবং 'রামের দ্বারা' শব্দগুচ্ছে 'দ্বারা' হল অনুসর্গ।

বাংলা শব্দরূপের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, বাংলায় সাধারণত কারকের চিহ্নরূপে কিছু বিভক্তি ও কিছু অনুসর্গ যুক্ত হয়, কিন্তু ফরাসি ও ইংরেজিতে বিভক্তি নেই, অনুসর্গও নেই, কিছু পুরঃসর্গ (preposition) দিয়ে বিভক্তির কাজ চলে। যেমন—'প্রতিদিনের' = ফরাসি ভাষায় de tous les jours, ইংরেজিতে of everyday. এখানে ফরাসিতে de এবং ইংরেজিতে of হল preposition। এগুলি বাংলার ষষ্ঠী বিভক্তি '-এর' বদলে বসেছে। এরাই বিভক্তির কাজ করছে। এরা বাংলা বিভক্তির মতো মূল শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় না, আবার বাংলা অনুসর্গের মতো শব্দের পরেও বসে না, শব্দের আগে বসে।

মূল শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন কারকের বিভক্তিচিহ্ন যোগ করে মূল শব্দটির যে রূপবৈচিত্র্য সাধিত হয় তাকে আমরা শব্দরূপ (Declension) বলি। প্রচলিত ব্যাকরণে কারকের নিয়মাবলী ও শব্দরূপের জটিলতা খুব বেশি, বিশেষত

সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন সংশ্লেষণমূলক (Synthetic) ভাষায় এবং জার্মান প্রভৃতি আধুনিক ভাষায়। এই বিভক্তি এবং পুরোনো কারকবিধির ত্রুটি লক্ষ্য করে এর জটিলতা বাদ দিয়ে কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী এ বিষয়ে নতুন তত্ত্ব প্রতিপন্ন করেছেন এবং বাংলাতেও একজন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী এই রকম একটি মৌলিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।[৬০] এই তত্ত্ব ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করলে ব্যাকরণের অনেক অহেতুক জটিলতা দূর হবে।

পূর্বেই আটটি কারকের (Case) কথা বলা হয়েছে, কিন্তু গঠনগত রূপবৈচিত্র্য বিচার করলে আধুনিক বাংলায় আটটি কারক পাওয়া যায় না। বাংলায় কর্তৃকারক ও সম্বোধন পদের রূপ একই রকম, কর্মকারক ও সম্প্রদান কারকের একই বিভক্তি, তেমনি করণ ও অধিকরণের রূপের মধ্যে পার্থক্য প্রায়ই থাকে না। সুতরাং রূপগত বিচারে বাংলায় কারক মাত্র চারটি। এই চারটি কারকের সাধারণত প্রচলিত বিভক্তি-চিহ্ন হল এইরকম—

কর্তৃকারক : —০ (শূন্য বিভক্তি)— **রাম** যায়।

কর্ম-সম্প্রদান কারক : —'কে'— **রামকে** টাকা ধার দাও।
দরিদ্রকে অর্থ দান করো।

করণ-অধিকরণ কারক : —'তে',—'এ'—এই **টাকাতে** সংসার চলে?
এক **চড়ে** গাল ঘুরিয়ে দেবো।
ঘরের ছেলে **ঘরে** ফিরে এসো।

সম্বন্ধপদ : —'র', 'এর'— **ছেলের** জামা, **মেয়ের** ফ্রক।
একের লাঠি **দশের** বোঝা।

বিভিন্ন কারকে বাংলায় সাধারণত এইসব বিভক্তি ব্যবহৃত হলেও বাংলায় কোনো কারকেরই কোনো সুনির্দিষ্ট বিভক্তি নেই। এর ফলে বাংলা রূপতত্ত্বে শব্দরূপের দু'টি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। প্রথমত, যে বিভক্তি সাধারণত একটি কারকে প্রচলিত অন্য কারকেও তার তির্যক্ প্রয়োগ কখনো কখনো দেখা যায়। যেমন—কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি :

লোকে আজকাল বিশ্বাস করতে চায় না যে, দেশের কোনো নেতা কোনো সমস্যার আমূল সমাধান চান।

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে?
গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল।

৬০। দাশগুপ্ত, ড. প্রবাল : 'কারক : দুঃস্বপ্নের আসান' (শিবনারায়ণ রায় সম্পাদিত 'জিজ্ঞাসা', ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।)

কর্ম কারকে সপ্তমী বিভক্তি :

"**আমারে** করো তোমার বীণা
লহ গো লহ তুলে।"

আমায় দু'টি পয়সা দিন, বাবুরা।

করণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি :

শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না।

চোখে কি দেখতেও পাও না?

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করছি।

সম্প্রদান কারকে সপ্তমী বিভক্তি :

অন্ধজনে দেহ আলো,
মৃতজনে দেহ প্রাণ।

অপাদান কারকে সপ্তমী বিভক্তি :

কালো মেঘে বৃষ্টি হয়।

এখন পড়ায় ওকে বিরত করা যাবে না।

চোরের ভয়ে রাস্তায় বেরোতে পারি না।

আপাদান কারকে তৃতীয়া বিভক্তি (অনুসর্গ) :

আমার চোখ **দিয়ে** জল গড়িয়ে পড়ল।

অধিকরণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি (অনুসর্গ) :

রাস্তা **দিয়ে** যেতে যেতে আমি সাইন বোর্ডগুলো দেখছিলাম।

উপরের উদাহরণগুলিতে দেখা যাচ্ছে বাংলায় একই বিভক্তি বা অনুসর্গ একাধিক কারকের অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেসব আধুনিক ভাষায় বিভক্তি ও অনুসর্গের বদলে পুরঃসর্গ (preposition) ব্যবহৃত হয় সেসব ভাষায়ও পুরঃসর্গের ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নয়, একই পুরঃসর্গ একাধিক কারকে ও একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—জার্মান ভাষায় একই 'von' পুরঃসর্গটি একাধিক কারকের অর্থে ব্যবহৃত :

'থেকে' অর্থে :

von Kalkutta = কলকাতা থেকে।

'দ্বারা' অর্থে :

von Rilke = রিল্‌কের দ্বারা (রচিত)।

সম্বন্ধ অর্থে :

von Ram = রামের

তেমনি ফরাসি ভাষায় একই 'de' পুরঃসর্গের একাধিক অর্থে প্রয়োগ লক্ষণীয়।

সম্বন্ধ অর্থে :

d' (de) homme = মানুষের।

অধিকরণ অর্থে :

de rue en rue = পথে পথে।

করণ অর্থে :

de l' obstination = জেদের দ্বারা, জেদের বশে।

অপাদান অর্থে :

de chez vous = তোমার বাড়ি থেকে।

de Calcutta à Kalyani = কলকাতা থেকে কল্যাণী।

দ্বিতীয়ত, বাংলায় বিভক্তি লোপের প্রবণতা এবং তার ফলে সব কারকেই শূন্য বিভক্তি প্রায়ই দেখা যায়। যেমন—

কর্তৃকারকে : **রাম** যায়।

কর্মকারকে : আমি **বই** পড়ি। আমি **মানুষ** চিনি। **গোরু** মেরে কি লাভ?

সম্প্রদান কারকে : এই উৎসবে প্রথমেই আমি **ব্রাহ্মণ** ভোজন করাতে চাই।

করণ কারকে : কথায়-কথায় ছাত্রকে **বেত** মারা ভাল নয়।
এক চড় মারবো।

অধিকরণ কারক : **কলকাতা** যাচ্ছি। **গাড়ি** চড়ো।

সম্বন্ধ পদ : **মাইনে** বাবদ (মাইনের বাবদ) ৪৫০০ টাকা পেয়েছি।

বাংলা শব্দরূপের যে আলোচনা করা হল তাতে দেখা যাচ্ছে বাংলায় সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি ভাষার মতো সব কারকের সুনির্দিষ্ট বিভক্তি-চিহ্ন নেই, আবার অন্য দিকে বাংলায় ইংরেজি, ফরাসি প্রভৃতি ভাষার মতো পুরোপুরি বিভক্তিহীনতাও প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। কিছু বিভক্তি লোপ পেয়েছে এবং কিছু বিভক্তির তির্যক প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলা পুরোপুরি সংশ্লেষণাত্মক বা পুরোপুরি বিশ্লেষণাত্মক ভাষা নয়। এদিক থেকে জার্মান ভাষার সঙ্গে বাংলার কিছুটা সাদৃশ্য আছে। জার্মান ভাষায় সংস্কৃত ও গ্রীকের মতো কারকের সংখ্যা এত বেশি নয়। বিভক্তি-চিহ্নের বিচারে বাংলায় কারক যেমন চারটি মাত্র, জার্মান ভাষাতেও কারক তেমনি চারটি মাত্র। বাংলার চারটি কারক হল—(১) কর্তা, (২) কর্ম-সম্প্রদান, (৩) করণ-অধিকরণ ও (৪) সম্বন্ধ। বিভক্তিচিহ্নের বিচারে জার্মানেও কারক চারটি। তবে সে চারটি বাংলা থেকে একটু স্বতন্ত্র। জার্মানের কারক চারটি হল—(১) কর্তা (Nominative), (২) কর্ম (Accusative), (৩)

সম্প্রদান (Dative) এবং (৪) **সম্বন্ধ** (Genitive)। জার্মানের কারকের সঙ্গে বাংলা কারকগুলির পুরোপুরি মিল নেই। শুধু লক্ষণীয় এই যে, একদিকে সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার কারক-বিভক্তির সুনির্দিষ্ট ব্যবহার, অন্যদিকে ইংরেজি, ফরাসি প্রভৃতি ভাষার বিভক্তিহীনতা ও পুরঃসর্গের ব্যবহারে শৈথিল্য-প্রবণতা—এই দুই চরম বিন্দুর মধ্যবর্তী স্তরে রয়েছে বাংলা ভাষা এবং এ ক্ষেত্রে জার্মান ভাষার সঙ্গে বাংলার আংশিক সাদৃশ্য আছে, যদিও জার্মান বাংলার চেয়ে আরো দৃঢ়বদ্ধ ভাষা।

ক্রিয়ারূপ (Conjugation) : ক্রিয়ার মূলকে ক্রিয়া-প্রকৃতি বা ধাতু (Root) বলে। শব্দের মতো ধাতুকেও গঠনগত বিচারে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : (১) **সিদ্ধ ধাতু** বা **মৌলিক ধাতু** (Primary Root), (২) **সাধিত ধাতু** (Secondary / Derivative Root) এবং (৩) **যৌগিক** বা **সংযোগমূলক ধাতু** (Compounded Root)।

যে ধাতু মূলত ধাতুই এবং যা একটি মাত্র রূপিম (Morpheme) নিয়ে গঠিত, অর্থাৎ যে ধাতুকে একাধিক ক্ষুদ্রতর অর্থপূর্ণ এককে বিভক্ত করা যায় না, তাকে মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু বলে। যেমন—কর্, খা ইত্যাদি। যে ধাতু একাধিক রূপিম (Morpheme) নিয়ে গঠিত এবং যার অন্তর্গত রূপিমগুলির মধ্যে একটি হল ধাতু বা নামশব্দ বা অনুকারশব্দ আর অন্যটি বা অন্যগুলি হল প্রত্যয় তাকে সাধিত ধাতু বলে। ণিজন্ত বা প্রযোজক ধাতু (Causative verb root), নামধাতু, ধ্বন্যাত্মক ধাতু প্রভৃতি সাধিত ধাতুর মধ্যে পড়ে। যেমন—খেল্ + আ = খেলা (ণিজন্ত ধাতু) > খেলাচ্ছি, খেলাচ্ছো, খেলাচ্ছে ; হাত (নামশব্দ) + আ (প্রত্যয়) = হাতা (নামধাতু) > হাতাচ্ছি, হাতাচ্ছো, হাতাচ্ছে। ধুঁক্ (অনুকার শব্দ) + শূন্য প্রত্যয় > ধুঁকছি, ধুঁকছে ইত্যাদি। বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দকে পূর্বপদ রূপে গ্রহণ করে তার সঙ্গে কর্, হ প্রভৃতি ধাতু ব্যবহার করে যে ক্রিয়ামূল গঠিত হয় তাকে সংযোগমূলক ধাতু (Compounded Root) বলে। যেমন—গান (বিশেষ্য) = কর্ ধাতু + গান কর্ (যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু) > গান করছি, গান করছো, গান করছে। এসব ক্ষেত্রে একাধিক শব্দের সংযোগে একটিমাত্র ধাতু গঠিত হয় বলে সাধারণত একে সংযোগমূলক ধাতু বলে। যে সংযোগমূলক ধাতুর মূলে দু'টি ধাতু থাকে, সেই সংযোগমূলক ধাতুর দ্বারা গঠিত ক্রিয়াকে যৌগিক বা যুক্ত ক্রিয়া (Compound Verb) বলে। এগুলিতে একাধিক ক্রিয়ার ধাতু থাকে, কিন্তু তাতে একটিমাত্র কাজই বোঝায়। যেমন—'গান করা'-তে 'গা' (to sing) ও 'কর্' (to do) দু'টি ধাতু আছে, কিন্তু একটিমাত্র কাজ বোঝাচ্ছে—গান গাওয়া (to sing)। সংযোগমূলক ধাতু

একাধিক স্বতন্ত্র শব্দে গঠিত হয় বলে তাকে ঠিক একটি ধাতু বলা যায় কিনা সন্দেহ। সংযোগমূলক ধাতুকে ছেড়ে দিলে বাংলার আসল ধাতুসম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু এবং সাধিত ধাতু। আধুনিক কালের জনৈক স্বনামধন্য ভাষাবিজ্ঞানীর অনুসরণে আমরা বাংলার এই দ্বিবিধ ধাতুর ধ্বনিসংগঠন এইভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি :

"সিদ্ধ ধাতুমাত্রেই একাক্ষর (monosyllabic), কিন্তু সাধিত ধাতুমাত্রেই বহ্বক্ষর (polysyllabic)। বহ্বক্ষর হলেও ণিজন্ত (Causative) ধাতু মূলত দ্ব্যক্ষর (bisyllabic), কারণ তার উপাদানদুটিকে বিশ্লিষ্ট করলে একদিকে পাই একাক্ষর সিদ্ধধাতু, অন্যদিকে পাই ঐ বিস্তার-বিভক্তি 'আ'—সেটিও একটিমাত্র সিলেব্‌ল্।"[৬১] যেমন মৌলিক ধাতু 'কর্' একটি অক্ষরে (Syllable) গঠিত ; সাধিত ধাতু 'হাতা' দুটি অক্ষরে (Syllable) গঠিত—হাত্ + আ।

ধাতু হল ক্রিয়ার মূল। এই মূলের সঙ্গে নানা বিভক্তি যোগ করে ক্রিয়ার রূপবৈচিত্র্য সাধিত হয়। বাংলায় ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রিত করে যেসব ব্যাকরণিক সংবর্গ (Grammatical Category) সেগুলির মধ্যে প্রধান হল ভাব (Mood), পুরুষ (Person), কাল (Tense)। এই প্রসঙ্গে ক্রিয়ারূপের ক্ষেত্রে বাংলার স্বাতন্ত্র্য অন্য ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যাবে।

ভাব (Mood) : ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে ভাব বা ভাবপ্রকার (Mood)। ক্রিয়ার বর্ণিত কাজটি কিভাবে বা কি প্রকারে ঘটে তা যে উপায়ে বোঝা যায় তাকেই ভাব বা ভাবপ্রকার (Mood) বলে। এর দ্বারা কাজটি সম্বন্ধে বক্তার মনোভাবটি বোঝা যায় বলে একে সহজ কথায় 'ভাব'ও (Mood) বলে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলায় ভাব বা ভাবপ্রকার (Mood) হল তিনটি :

(১) **বিবৃতিমূলক** (বা **নির্দেশক**) **ভাব** (Indicative Mood),

(২) **অনুজ্ঞা** (বা **নিয়োজক ভাব**) (Imperative Mood) এবং

(৩) **অপেক্ষিত** (বা **সম্ভাবক** বা **অভিপ্রায়** বা **সংযোজক**) ভাব (Subjunctive Mood)।[৬২]

৬১। সরকার, ড. পবিত্র : 'বাংলা ক্রিয়াপদ : ধাতু শরীর' (অধ্যাপক ড. চিত্তরঞ্জন লাহা সম্পাদিত 'রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা' ১৯৮৪, পৃঃ ১১৪।)

৬২। চট্টোপাধ্যায়, ড. সুনীতিকুমার : 'সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', ১৯৭১, পৃঃ ১৩৯।

ঘটনার সাধারণ বিবৃতি বোঝালে বা ঘটনা নির্দেশ করা (to indicate) বোঝালে বিবৃতিমূলক বা নির্দেশক ভাব হয়। আদেশ, অনুরোধ ইত্যাদি বোঝালে অনুজ্ঞা ভাব (Imperative Mood) হয়। আর ক্রিয়ার কাজটি ঘটা যদি অন্য ক্রিয়ার উপরে নির্ভর করে বা অন্য ক্রিয়ার অপেক্ষায় থাকে বা ক্রিয়ার দ্বারা যদি ইচ্ছা বা অভিপ্রায় বোঝায় তবে অপেক্ষিত বা অভিপ্রায় ভাব (Subjunctive Mood) হয়।

দেখা যাক এইসব ভাবপ্রকার বাংলায় কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ক্রিয়ার রূপবৈচিত্র্য সাধন করে, অর্থাৎ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কর্তা একই থাকা সত্ত্বেও ভাবপ্রকার পৃথক হওয়ার জন্যে ক্রিয়ার রূপে পার্থক্য ঘটে—

বিবৃতিমূলক : সে পড়ে।

অনুজ্ঞামূলক : সে পড়ুক।

অপেক্ষিত : যদি সে পড়ে, তবে আমি পড়ব।
সে পড়লে, আমি পড়ব।

বাংলায় বিবৃতিমূলক ও অপেক্ষিত ভাবপ্রকারে ক্রিয়ার রূপ একই থাকে। যেমন—বিবৃতিমূলক—সে পড়ে। অপেক্ষিত—যদি সে পড়ে তবে আমি পড়ব। দেখা যাচ্ছে উভয় ক্ষেত্রে ক্রিয়ার রূপ একই—'পড়ে'। বাংলায় নির্দেশক ও অপেক্ষিত ভাবে ক্রিয়ার রূপগত পার্থক্য হয় না বলে বাংলায় গঠনগত দিক থেকে অপেক্ষিত ভাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকারের উপযোগিতা নেই। এইজন্যে অপেক্ষিত ভাবটি বাদ দিয়ে বাংলা ক্রিয়ার মাত্র দু'টি ভাব নির্ণয় করা যায় : নির্দেশক ও অনুজ্ঞা। এখানে বৈদিক, সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি ভাষা থেকে বাংলার স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। বৈদিকের সঙ্গে তুলনায় ভাবপ্রকার (Mood)-এর ক্ষেত্রে বাংলার স্বাতন্ত্র্য সহজেই চোখে পড়ে। বৈদিকে ভাব ছিল পাঁচটি। যথা—

(১) **নির্দেশক** (Indicative),

(২) **অনুজ্ঞা** (Imperative),

(৩) **নির্বন্ধ** (Injunctive),

(৪) **সম্ভাবক বা অভিপ্রায়** (Subjunctive) ও

(৫) **বিধিলিঙ্** (Obtative)

এখন বাংলায় রূপগত বিচারে ভাবপ্রকার কমে দাঁড়িয়েছে দু'টি। জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি আধুনিক ভাষাতে ক্রিয়ার ভাবপ্রকার হল তিনটি : নির্দেশক, অনুজ্ঞা ও অপেক্ষিত। জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় অধিকাংশ সময় বিবৃতিমূলক ভাবের ক্রিয়ারূপ অপেক্ষিত ভাবের ক্রিয়ারূপ থেকে পৃথক্। জার্মান ভাষায় এই দুই ভাবপ্রকারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রিয়ারূপ একই হয় (যেমন—বিবৃতিমূলক—Ich lobe = আমি প্রশংসা করি ; অপেক্ষিত—Wenn Ich lobe

যদি আমি প্রশংসা করি) ; আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পৃথক্ (যেমন—বিবৃতিমূলক—Er lobt = সে প্রশংসা করে, অপেক্ষিত—Wenn er lobe = যদি সে প্রশংসা করে)। দু'টি বিখ্যাত উক্তি থেকে অপেক্ষিত ভাবের উদাহরণ জার্মান ভাষায় দেওয়া যাক :

"Gut ist der Schlaf, der Tod ist besser freilich,
Das Beste Wäre nie geboren sein!"

--Heinrich Heine

—ঘুমিয়ে থাকা ভাল, মৃত্যু নিশ্চয়ই আরো ভাল,
আর সবচেয়ে ভাল হত যদি আদৌ জন্মানো না যেত!

"Wenn alle Berge Bücher wären und alle Seen Tinte,
und alle Bäume Schreibfedern, noch wäre es nicht
genug, all den Schmerz in der Welt zu beschreiben"

—Baruch Spinoza

—যদি সব পর্বতগুলো বই হত, এবং যদি সব সমুদ্র হত কালি, আর সব গাছগুলো যদি কলম হত, তবু পৃথিবীর সব দুঃখ বর্ণনা করার পক্ষে তা যথেষ্ট হত না।

এসব উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, যদিও জার্মান ভাষায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপেক্ষিত ও বিবৃতিমূলক ভাবের ক্রিয়ার রূপ একই, তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জার্মান ভাষায় এই দুই ভাবের ক্রিয়ারূপ পৃথক্। ফরাসি ভাষায়ও অপেক্ষিত (বা অভিপ্রায়) ভাবের ক্রিয়ারূপ ও বিবৃতিমূলক ভাবের ক্রিয়ারূপ প্রায়ই পৃথক্।

জার্মান ও ফরাসি ভাষায় অপেক্ষিত বা অভিপ্রায় ভাবের ক্রিয়ারূপের স্বাতন্ত্র্য যেমন রক্ষিত আছে, ইংরেজিতে তেমনটি নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপেক্ষিত ও বিবৃতিমূলক ভাবের ক্রিয়ারূপ একই, মাত্র দু'ই-একটি ক্ষেত্রে দুই ভাবের ক্রিয়ারূপ পৃথক্ (যেমন--বিবৃতিমূলক :---I was = আমি ছিলাম ; অপেক্ষিত :--If I were = আমি যদি হতাম...)। এখানে জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে বাংলার বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়ে। বাংলায় এই দুই ভাবের ক্রিয়ারূপের পার্থক্য নেই বললেই চলে।

তবে বাংলায় বিবৃতিমূলক ও অনুজ্ঞার ক্রিয়ারূপ অধিকাংশ সময়ই পৃথক্। যেমন—বিবৃতিমূলক :--সে চলে যায়। অনুজ্ঞা :--সে চলে যাক। অবশ্য বাংলায় কখনো কখনো বিবৃতিমূলক ক্রিয়ারূপই অনুজ্ঞাতেও ব্যবহৃত হয়। যেমন :

বিবৃতিমূলক : তুমি কলকাতা **যাও**, আমি যাই না।
অনুজ্ঞা : তুমি চলে **যাও**, বলছি।
বিবৃতিমূলক : তুমি কাল **যাবে**, শুনেছি।
অনুজ্ঞা : তুমি কাল **যাবে**, না **গেলে** আমি দেখে নেবো।

বিবৃতিমূলক ও অনুজ্ঞার ক্রিয়ারূপের মধ্যে পার্থক্য বাংলায় যেমন কোনো কোনো ক্ষেত্রে আছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেই, জার্মান ভাষাতেও তেমনি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আছে। যেমন—বিবৃতিমূলক : du bist, অনুজ্ঞা : du sei। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্থক্য নেই। যেমন—বিবৃতিমূলক : ihr seid, অনুজ্ঞা : ihr seid। ইংরেজিতে বিবৃতিমূলক ও অনুজ্ঞার ক্রিয়ারূপ একই। ফরাসিতে ভাবপ্রকার জার্মানের মতোই তিনটি। তিনটি ভাবপ্রকারে ক্রিয়ার রূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পৃথক। যেমন—বিবৃতিমূলক : tu as = you have। অপেক্ষিত : tu aies = If you have। অনুজ্ঞা : aie। ফরাসিতে অনুজ্ঞার ক্ষেত্রে কর্তা সর্বদা উহ্য থাকে—যেমন—Allez = চলে যাও। কিন্তু জার্মানে কর্তা উহ্য থাকে না, তবে কর্তার স্থান ক্রিয়ার পরে। যেমন— Gehen Sie! = চলে যাও!

বচন (Number) : বাংলায় ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে বচনের কোনো ভূমিকা নেই, কারণ বাংলায় একবচন ও বহুবচনে ক্রিয়ার রূপ একই। যেমন—একবচন—আমি **যাই**, বহুবচন—আমরা **যাই**। এক্ষেত্রে প্রথমেই বাংলার স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসি ও হিন্দি ভাষা থেকে। সংস্কৃত, হিন্দি, জার্মান ও ফরাসিতে বচন-ভেদে ক্রিয়ার রূপ পৃথক্ হয়। যেমন—সংস্কৃতে : একবচন—নরঃ গচ্ছতি = একজন লোক যায় ; দ্বিবচন—নরৌ গচ্ছত = দু'জন লোক যায় ; বহুবচন—নরাঃ গচ্ছন্তি = বহুলোক যায়। হিন্দিতে : একবচন—এক আদমি যাতা হ্যায় = একজন লোক যায় ; বহুচন—দশ আদমি যাতে হ্যাঁয় = দশজন লোক যায়। জার্মানে : Ich gehe = আমি যাই ; Wir gehen = আমরা যাই। ফরাসিতে : Je vais = আমি যাই, Nous allous = আমরা যাই।

এ ক্ষেত্রে বরং বাংলার সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্য রয়েছে ইংরেজির। ইংরেজিতে কখনো কখনো শুধু প্রথম পুরুষে একবচন ও বহুবচনের ক্রিয়ারূপ পৃথক্। যেমন : একবচন—He goes। বহুবচন—They go। অন্য ক্ষেত্রে একবচন ও বহুবচনের রূপ একই। যেমন—I go, We go.

লিঙ্গ (Gender) : বাংলায় ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে লিঙ্গেরও (Gender) কোনো প্রভাব একই। বাংলায় সংস্কৃত, ইংরেজি ও জার্মান ভাষার মতো পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে ক্রিয়ার রূপ নেই। যেমন—ছেলেরা যায়, মেয়েরা যায়। এখানে ক্রিয়ার রূপ 'যায়', উভয় ক্ষেত্রে একই রকম। কিন্তু হিন্দিতে ক্রিয়ার রূপে লিঙ্গের ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। হিন্দিতে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে ক্রিয়ার রূপ পৃথক্ হয়। যেমন—রাম পঢ়তা হ্যায় (পুং) ; সীতা পঢ়তী হ্যায় (স্ত্রী)। ফরাসিতে সর্বক্ষেত্রে নয়, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে লিঙ্গের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে : সাধারণ কথাবার্তায় গতিবোধক ক্রিয়ার পুরাঘটিত বর্তমান ও সামান্য অতীত কালে

(simple past) পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে ক্রিয়ার রূপ পৃথক্ হয়। যেমন—Je suis allé = আমি (পুং) গিয়েছি। Je suis allée = আমি (স্ত্রী) গিয়েছি। এখানে হিন্দি ও ফরাসি থেকে বাংলা ভাষার ক্রিয়ার রূপের স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়।

পুরুষ (Person) : বাংলায় ক্রিয়ার রূপ-নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে পুরুষ (Person)। উত্তম পুরুষ (First Person), মধ্যম পুরুষ (Second Person) ও প্রথম পুরুষে (Third Person) ক্রিয়ার রূপ সম্পূর্ণ পৃথক্। যেমন : উত্তম পুরুষ—আমি **যাই**, মধ্যম পুরুষ—তুমি **যাও**, প্রথম পুরুষ—সে **যায়**। এক্ষেত্রে বাংলায় সংস্কৃতের উত্তরাধিকারই বর্তেছে। সংস্কৃতে তিন পুরুষের ক্রিয়ার রূপ স্বতন্ত্র। আধুনিক ভাষা হিন্দি, ফরাসি ও জার্মানেও তিন পুরুষের ক্রিয়ারূপে পার্থক্য আছে। এই মূল নীতিতে সংস্কৃত, হিন্দি, জার্মান ও ফরাসি ভাষার সঙ্গে বাংলার সাদৃশ্য লক্ষণীয় :

পুরুষ	বাংলা	সংস্কৃত	হিন্দি	জার্মান	ফরাসি
উত্তম	(আমি) যাই	গচ্ছামি	যাতা হুঁ	gehe	vais
মধ্যম	(তুমি) যাও	গচ্ছসি	যাতে হো	gehen	allez
প্রথম	(সে) যায়	গচ্ছতি	যাতা হায়	geht	va

অন্য দিকে লক্ষণীয় পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপের এত পার্থক্য ইংরেজিতে হয় না। সব পুরুষে সেখানে ক্রিয়ার রূপ প্রায়ই এক। যেমন—I go, You go, I went, You went, He went। কেবল দু'একটি ক্ষেত্রে পুরুষভেদে ক্রিয়ারূপের স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। যেমন—I go, কিন্তু He goes ; I am going, কিন্তু He is going ইত্যাদি। ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে পুরুষের (person) যে প্রভাব সে ক্ষেত্রে সংস্কৃত, হিন্দি, জার্মান ও ফরাসি ভাষার সঙ্গেই বাংলার সাদৃশ্য আছে ; ইংরেজির সঙ্গে বাংলার সাদৃশ্য খুবই কম।

কাল (Tense) : বাংলায় ক্রিয়ার রূপ-নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল ভূমিকা রয়েছে কালের (Tense)। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা ক্রিয়ার কাল গঠনগত ও অর্থগত দিক থেকে দু'ভাগে বিভক্ত—সরল বা মৌলিক কাল (Simple/Primary Tense) এবং মিশ্র বা যৌগিক কাল (Compound Tense)। তাঁর মতে একটিমাত্র ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যোগ করে যে কালের রূপ রচিত হয় তাকে সরল বা মৌলিক কাল বলা হয়। যেমন—আমি যাই। এখানে 'যাই' এই ক্রিয়া-রূপটিতে একটিমাত্র ধাতু আছে—'যা' ধাতু, এবং এই ধাতুর সঙ্গে 'ই' বিভক্তি যোগ করে এই ক্রিয়ারূপটি গঠন করা হয়েছে। বাংলা ক্রিয়ার সরল বা মৌলিক কাল চার প্রকার :

(১) সাধারণ (বা নিত্য বা অনির্দিষ্ট) বর্তমান (Present Indefinite Tense)। যেমন—আমি করি।

(২) সাধারণ (বা অনির্দিষ্ট) অতীত (Past Indefinite Tense)। যেমন--আমি করলাম।

(৩) অভ্যাসগত বা নিত্যবৃত্ত অতীত (Habitual Past)। যেমন--আমি করতাম।

(৪) সাধারণ (বা অনির্দিষ্ট) ভবিষ্যৎ (Future Indefinite Tense)। যেমন--আমি করব। ইত্যাদি।

আর যখন একাধিক ধাতুর সংযোগে একটিমাত্র ক্রিয়া গঠিত হয় তখন তাকে যৌগিক কাল (Compound Tense) বলে। যৌগিক কালে প্রথম ধাতুটির সঙ্গে '-তে' (~ ইতে) বা 'এ' (~ ইয়া) যোগ করে তার সঙ্গে 'আছ্' ধাতু বা 'থাক্' ধাতু যোগ করা হয় এবং সেই 'আছ্' ধাতু বা 'থাক্' ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়ার কালবাচক ও পুরুষবাচক বিভক্তি যোগ করা হয়। অনেক সময় মূল ক্রিয়ার সঙ্গে '-তে' (ইতে) বা '-এ' (ইয়া) যোগ করা হয় না।

বাংলা ক্রিয়ার যৌগিক বা মিশ্রকালের রূপকে দশ ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই ক্রিয়ারূপগুলি হল এই রকম :

(১) ঘটমান বর্তমান—আমি করছি (< করিতেছি)।

(২) ঘটমান অতীত—আমি করছিলাম (< করিতেছিলাম)।

(৩) ঘটমান ভবিষ্যৎ—আমি করতে থাকবো (< করিতে থাকিব)।

(৪) পুরাঘটিত বর্তমান—আমি করেছি (< করিয়াছি)।

(৫) পুরাঘটিত অতীত—আমি করেছিলাম (< করিয়াছিলাম)

(৬) পুরাঘটিত ভবিষ্যত বা সম্ভাব্য অতীত—আমি করে থাকব (< করিয়া থাকিব)।

(৭) নিত্যবৃত্ত বর্তমান—আমি করে থাকি (< করিয়া থাকি)।

(৮) নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান—আমি করতে থাকি (< করিতে থাকি)।

(৯) ঘটমান পুরা নিত্যবৃত্ত অথবা নিত্যবৃত্ত ঘটমান অতীত—আমি করতে থাকতাম (< করিতে থাকিতাম)।

(১০) পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত বা পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত অতীত—আমি করে থাকতাম (< করিয়া থাকিতাম)।

ভাষাচার্য শুধু উপর্যুক্ত চারটি সরল ও দশটি যৌগিক কালের উল্লেখ করেছেন কিন্তু বাংলায় আরো দু'টি যৌগিক কালের ব্যবহার দেখা যায়--

(১) পুরাঘটিত ঘটমান বর্তমান--আমি করে আসছি বা যাচ্ছি।

(২) পুরাঘটিত ঘটমান অতীত—আমি করে আসছিলাম বা যাচ্ছিলাম।

এই দুটি কাল 'আস্' ধাতু বা 'যা' ধাতু যোগে গঠিত।

যৌগিক ক্রিয়া ও যৌগিক কাল : আগে বাংলা ধাতুর গঠন প্রসঙ্গে যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতুর (Compounded Root) গঠন ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সেখানে যৌগিক ক্রিয়ার প্রসঙ্গও আলোচিত হয়েছে। আর উপরে ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে যে আলোচনা করা হল তাতে প্রচলিত ধারা অনুসারে যৌগিক কালের (Compound Tense) সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণে যৌগিক ক্রিয়া ও যৌগিক কালের মধ্যে যে পার্থক্য দেখানো হয় তা প্রতিষ্ঠিত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ড. সুকুমার সেনের উদ্ধৃতির সাহায্যে আগে তুলে ধরা যাক—

"যৌগিক ক্রিয়াপদের সঙ্গে যৌগিক কালের পার্থক্য সুস্পষ্ট। যৌগিক কাল এবং যৌগিক ক্রিয়া দুই-ই দ্বিপদময় তবে পার্থক্য আছে, দুইটি বিষয়ে—(১) দুই অংশের যোগের মাত্রায় এবং (২) 'আছ' ধাতুর অর্থপ্রাধান্যে। যৌগিক ক্রিয়ার অংশ দুইটির মধ্যে ফাঁক (Juncture) অনুভূত হয়, এবং সেখানে 'আছ' ধাতুর অর্থই প্রধান। যেমন—গাছটা রাস্তার উপর পড়িয়া আছে (= পতিতঃ বর্ততে, ইংরেজি lies fallen)। যৌগিক কালে দুই অংশ বেমালুম জুড়িয়া যায়, এবং সেখানে 'আছ' ধাতুর অর্থ নিতান্তই অস্পষ্ট, ইহা উদ্দেশ্য-বিধেয়ের সংযোজক (Copula) মাত্র। যেমন—গাছটা রাস্তার উপর পড়িয়াছে (= পতিতঃ বৈদিক 'পপাত'—ইংরেজি has fallen।"[৬৩] এখানে যৌগিক কাল ও যৌগিক ক্রিয়ার মধ্যে যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে তা কতদূর গ্রহণীয় সেই বিষয়ে নানা কারণে প্রশ্ন জাগে। প্রথমত এখানে বলা হয়েছে যে, যৌগিক ক্রিয়ায় 'আছ' ধাতুর অর্থই প্রধান। কিন্তু ড. সেনই যৌগিক ক্রিয়ার যে প্রকারভেদ আলোচনা করেছেন তাতে এমন সব ক্রিয়ার উদাহরণ দিয়েছেন যাতে 'আছ্' ধাতুই নেই, সুতরাং তার অর্থ-প্রাধান্যও নেই। যেমন—মানা করে, বুঝান যায় না, খাইয়া লইল। এখানে ড. সেন নিজেই স্বীকার করেছেন—"দ্বিতীয় পদ সমাপিকা তবে "আছ্" ধাতুর নহে।"[৬৪] তাহলে এক্ষেত্রে যৌগিক কাল ও যৌগিক ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্যের পূর্বোক্ত মানদণ্ডটি প্রযোজ্য হয় কি করে? দ্বিতীয়ত অধ্যাপক সেন আরো বলেছেন, "যৌগিক ক্রিয়ার অংশ দুইটির মধ্যে ফাঁক (Juncture[৬৫]) অনুভূত হয়,"...(কিন্তু) "যৌগিক কালে দুই অংশ বেমালুম জুড়িয়া যায়।" আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যৌগিক কালের যেসব উদাহরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় সর্বক্ষেত্রে এই অংশ দু'টি জুড়ে যায় না। যেমন—'সে যখন

৬৩। সেন, ডঃ সুকুমার : 'ভাষার ইতিবৃত্ত', কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ৩১৪।

৬৪। তদেব, ৩১৬।

৬৫। এখানে আরো লক্ষণীয়, Juncture বলতে ভাষাবিজ্ঞানে সর্বদা ফাঁক বোঝায় না।

নিজের কথা বলিতে থাকিবে, তাহাকে বাধা দিও না' (ঘটমান ভবিষ্যৎ), 'বোধ হয় অন্তঃপুরে রাজকন্যা অপরাজিতাও মঞ্জরীকে লইয়া মাঝে মাঝে উপহাস করিয়া থাকিবে'—রবীন্দ্রনাথ। (পুরাঘটিত সম্ভাব্য বা সম্ভাব্য অতীত) ইত্যাদি।[৬৬]

বস্তুত ড. সুকুমার সেন যৌগিক কাল ও যৌগিক ক্রিয়ার মধ্যে যে পার্থক্য দেখাতে চেয়েছেন সেই পার্থক্যটি দেখানোই নিষ্প্রয়োজন। যৌগিক কাল ও যৌগিক ক্রিয়ার ধারণাটি দু'টি স্বতন্ত্র মানদণ্ডের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে পার্থক্য করাই অবান্তর। যেমন—ফর্সা মানুষ ও লম্বা মানুষ—এই দু'টি শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না, কারণ ফর্সার বোধটি 'বর্ণ' বা 'রঙে'র মানদণ্ডের উপরে প্রতিষ্ঠিত আর 'লম্বা'র বোধটি দৈর্ঘ্যের মানদণ্ডের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যে কোনো একটি মানদণ্ডের উপরে প্রতিষ্ঠিত দু'টি শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করাই তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন—রঙের মানদণ্ডে ফর্সা ও কালো লোকের মধ্যে পার্থক্য দেখানো যায়। আবার দৈর্ঘ্যের মানদণ্ডে লম্বা ও বেঁটে লোকের মধ্যে পার্থক্য দেখানো যায়। তেমনি ক্রিয়ার ধাতুগত গঠনের মানদণ্ডে পার্থক্য দেখানো যায় মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়ার মধ্যে, আবার কালগত চেতনার মানদণ্ডে পার্থক্য দেখানো যায় মৌলিক কাল ও যৌগিক কালের মধ্যে। কিন্তু যৌগিক কালের সঙ্গে যৌগিক ক্রিয়ার পার্থক্য দেখানোর উপযোগিতা নেই। কারণ এতে পার্থক্যের দু'টি পৃথক্ মানদণ্ড—গঠন ও কাল—একসঙ্গে গুলিয়ে যায়। যেমন একই লোক লম্বা ও ফর্সা দুই-ই হতে পারে, তেমনি একই উদাহরণ যৌগিক কাল ও যৌগিক ক্রিয়া উভয় ক্ষেত্রে পড়তে পারে।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বিবেচ্য। ধাতুগত গঠনের দিক থেকে বাংলা ক্রিয়াকে মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়া এই দু' শ্রেণীতে ভাগ করার যৌক্তিকতা আছে। যে ক্রিয়া একটি মাত্র ধাতুতে গঠিত তাকে মৌলিক ক্রিয়া এবং যে ক্রিয়া একাধিক ধাতুতে গঠিত অথচ একটিমাত্র কাজের অর্থ প্রকাশ করে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলা যায়। কিন্তু মৌলিক কাল ও যৌগিক কালের মধ্যে পার্থক্যটা কি? যে ক্রিয়ায় একটিমাত্র ক্রিয়ারূপ থাকে ও একটিমাত্র কালের অর্থ প্রকাশ পায় তাকে সরল কাল বলা হয়। কিন্তু যৌগিক কাল? তাহলে কি যে ক্রিয়ায় একাধিক কালের ক্রিয়ারূপ থাকে এবং একটিমাত্র কালের অর্থ প্রকাশ করে তাকে যৌগিক কাল বলে? কিন্তু সে রকম তো কোনো রূপই নেই। 'সে করছে' (কিংবা সে করিতেছে)--বাক্যের 'করছে' (বা করিতেছে) ক্রিয়ায় কি দু'টি কালের ক্রিয়ারূপ যুক্ত আকারে পাওয়া যায়? যদি না পাওয়া যায় তো যৌগিক

৬৬। চট্টোপাধ্যায়, ড. সুনীতিকুমার : 'সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' ১৯৭১, পৃঃ ১৪৮-১৪৯।

কাল নামকরণের তাৎপর্য কি? বর্ণনামূলক দৃষ্টিতে মৌলিক কাল ও যৌগিক কাল—এই দু'টি বিভাগের উপযোগিতা আধুনিক বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে বিশেষ আছে বলে মনে হয় না। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে আমরা প্রথমে বাংলা ক্রিয়াকেই দু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি—একপদী ক্রিয়া ও বহুপদী ক্রিয়া। যে ক্রিয়া একপদে গঠিত তাকে একপদী ক্রিয়া ও যে ক্রিয়া একাধিক পদে গঠিত তাকে বহুপদী ক্রিয়া বলতে পারি। বলা বাহুল্য, মৌলিক ক্রিয়া একপদী ক্রিয়া। আর যাকে যৌগিক কালের ক্রিয়ারূপ বলা হয়েছে (যেমন—পড়েছে, করেছে) তাও একপদী ক্রিয়ারূপই। আর যাকে আগে যৌগিক ক্রিয়া বলা হয়েছে তা বহুপদী ক্রিয়ারূপ। যেমন—গান করে, মানা করে, খেয়ে ফেলল, পড়ে আছে ইত্যাদি। এখানে লক্ষ্য করার আছে যে, যে দু'টি পদে একটি যৌগিক ক্রিয়া গঠিত তার পূর্বপদটির রূপ কালভেদে পুরুষভেদে পরিবর্তিত হচ্ছে না, সুতরাং তার রূপভেদ বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য শুধু দ্বিতীয় পদের রূপভেদ। সেই দ্বিতীয় পদটি একটি স্বতন্ত্র ধাতুর সঙ্গে নিষ্পন্ন এবং তার যে রূপভেদ হচ্ছে তা মৌলিক ক্রিয়ারই মতো।

যেমন—

যৌগিক ক্রিয়া	**মৌলিক ক্রিয়া**
দিয়ে দিল	দিল
খেয়ে ফেলল	খেল

এখানে মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়ার মধ্যে সূক্ষ্ম অর্থগত পার্থক্য আছে, কিন্তু ক্রিয়ারূপের অর্থাৎ বিভক্তির কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং বাংলা ক্রিয়ার রূপবিচারে একপদী ক্রিয়া ও বহুপদী ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য নেই। বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে দেখা যায় একপদী ক্রিয়ার রূপবৈচিত্র্য অর্থাৎ বিভক্তিভেদ অনুসারে বাংলা ক্রিয়ার কাল হল দশটি :

(১) সাধারণ বা অনির্দিষ্ট বর্তমান (Present Indefinite Tense)—
সে করে (কর্ + এ)

(২) ঘটমান বর্তমান (Present Continuous Tense)—
সে কোরেছে (কর্ ~ কোর্ + ছে)

(৩) পুরাঘটিত বর্তমান (Present Perfect Tense)—
সে কোরছে (কর্ ~ কোর্ + এছে)

(৪) সাধারণ বা অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ (Future Indefinite Tense)—
সে কোরবে (কর্ ~ কোর্ + বে)

(৫) সদ্য অতীত (Simple Past)—
সে কোরলো (কর্ ~ কোর্ + লো)

(৬) নিত্যবৃত্ত অতীত (Habitual Past)—
সে কোরতো (কর্ ~ কোর্ + তো)

(৭) ঘটমান অতীত (Past Continuous)—
সে কোরছিলো (কর্ ~ কোর্ + ছিলো)

(৮) পুরাঘটিত অতীত (Past Perfect)—
সে কোরেছিলো। (কর্ ~ কোর্ + এছিলো)।

আরো দু'টি রূপ আছে। সে দু'টি অনুজ্ঞা ভাবের (Imperative Mood) :

(৯) বর্তমান অনুজ্ঞা (Present Imperative)—
সে কোরুক (কর্ ~ কোর্ + উক), তুমি করো (কর্ + ও)।

(১০) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—তুমি কোরবে (কর্ ~ কোর্ + বে)।

লক্ষণীয় যে, এই শেষের রূপটি নির্দেশক ভাবের। সাধারণ ভবিষ্যতেরই মতো আরো একটি রূপ আছে সেটিও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার অর্থ প্রকাশ করে। সেটি হল—তুমি কোরো (কর্ ~ কোর্ + ও)। একপদী ক্রিয়ার বিভক্তিগুলিই বহুপদী ক্রিয়াতে যুক্ত হয়। শুধু তাতে পূর্বপদ স্বরূপ আরো একটি ক্রিয়া (অসমাপিকা ক্রিয়া) যুক্ত হয়ে বহুপদী ক্রিয়ার অর্থপার্থক্য সৃষ্টি করে। বাংলা বহুপদী ক্রিয়ার কালরূপগুলি হল :

(১) ঘটমান ভবিষ্যৎ (Future Continuous)—
সে কোরতে থাকবে।

(২) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ বা সম্ভাব্য অতীত
(Future Perfect or Doubtful Past)—
সে কোরে থাকবে।

(৩) নিত্যবৃত্ত বর্তমান (Recurring Present)—
সে (প্রায়ই) কোরে থাকে।

(৪) নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান (Habitual Present Continuous)—
সে কোরতে থাকে।

(৫) ঘটমান পুরা নিত্যবৃত্ত অতীত (Habitual Past Continuous)—
সে কোরতে থাকত।

(৬) পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত অতীত বা পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত অতীত (Habitual Past Perfect)—
সে কোরে থাকত।

(৭) পুরাঘটিত ঘটমান বর্তমান (Present Perfect Continuous)—
আমি কোরে আসছি।

(৮) পুরাঘটিত ঘটমান অতীত (Past Perfect Continuous)—
আমি কোরে আসছিলাম।

এগুলি ছাড়া বাংলায় **অসমাপিকা ক্রিয়ার** কয়েকটি রূপ আছে। যেমন—

(১) তুমর্থক ক্রিয়া (Infinite)—
কোরতে (করিতে) (কর্ ~ কোর্ + তে) (to do)
এ কাজ কোরতে অনেক টাকা লাগবে। তবু এটা আমাকে কোরতে হবে।

(২) পুরাঘটিত সংযোজক ক্রিয়া (Perfect Conjunctive)—
কোরে (কর্ ~ কোর্ + এ) (করিয়া) (having done)
এ কাজটা কোরে তুমি কলকাতা যাবে।

(৩) সর্তজ্ঞাপক সংযোজক ক্রিয়া (Conditional Conjunctive) কোরলে (করিলে) (if one does) (কর্ ~ কোর্ + লে)—আমি এটা কোরলে তুমিও কোরো। (অর্থাৎ আমি যদি করি তা হলে তুমিও কোরো)। এখানে অপেক্ষিত ভাবের (Subjunctive Mood) অর্থ জ্ঞাপিত হচ্ছে।

আর বাংলা **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য** (Noun Infinitive/Gerund/Verbal Noun) গঠিত হয় প্রধানত দু'ভাবে—

(১) আ (~ওয়া), অন (~ওন), অনা (~না, ~ওনা), আনি (~উনি), ই প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করে। যেমন—চট্ + আ = চটা, খা + ওয়া = খাওয়া, দা ~দি + না = দেনা, পা + ওনা = পাওনা (দেনাপাওনা), চল্ + অন = চলন, বাঁধ্ + উনি = বাঁধুনি, শুন্ + আনি = শুনানি ইত্যাদি।

ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (Infinitive) গঠনের এই রীতির ক্ষেত্রে বাংলা হল সংস্কৃত, জার্মান ও ফরাসি ভাষার সমধর্মী। সংস্কৃতে ধাতুর সঙ্গে অনট্ প্রত্যয় যোগ করে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠন করা হয় (যেমন—গম্ + অনট্ = গমন)। জার্মানে ধাতুর সঙ্গে -en প্রত্যয় যোগ করা হয় (যেমন—sing + en = singen = গাওয়া)। আর ফরাসি ভাষায় ধাতুর সঙ্গে -er প্রত্যয় যোগ করে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠন করা হয় (যেমন—chant + er = chanter = গান গাওয়া, port + er = porter = বহন করা, all + er = aller = যাওয়া)। অন্য দিকে দেখা যায় ইংরেজিতে ধাতুর সঙ্গে কোনো প্রত্যয় যোগ করে Infinitive-এর রূপটি গঠিত হয় না, ধাতুর আগে পুরঃসর্গ (preposition) 'to' বসিয়ে Infinitive-এর রূপটি গঠন করা হয় (যেমন—to go = যাওয়া)। এখানে তা হলে সংস্কৃত, জার্মান ও ফরাসি ভাষার সঙ্গে বাংলার যেমন সাধর্ম্য আছে, ইংরেজি থেকে তেমনি পার্থক্য আছে। তবে gerund-এর রূপ রচনা ইংরেজিতে প্রত্যয় যোগেই হয়। যেমন—go + ing = going.

(২) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ পদের (genitive case) বিভক্তি যোগ করার জন্যে অনেক সময় -'বা' (~ ইবা) প্রত্যয় যোগ করে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য রচনা করা হয়। যেমন—যা + বা = যাবা ('যাবার বেলা হলে যেও চলে')।

কখনো কখনো অসমাপিকা ক্রিয়াও বাংলায় ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—'জ্যোতি দাদা কথা **বলতে** (কথা বলা) জানেন বটে।' বাংলা ক্রিয়ার কাল রচনার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য ভাষার ক্রিয়ার কালরূপের সঙ্গে তুলনা করলে বুঝতে পারি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলা ক্রিয়ার কালবিভাগ অন্য ভাষার কাল বিভাগের তুলনায় অনেক সূক্ষ্ম। যেমন--বাংলায় ইংরেজির মতো নিত্য (অনির্দিষ্ট) বর্তমান ও ঘটমান বর্তমানের জন্যে পৃথক্ ক্রিয়ারূপ নির্দিষ্ট—'যাই' (I go), যাচ্ছি (I am going)। সংস্কৃত, জার্মান ও ফরাসি ভাষা থেকে এখানে বাংলার স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। সংস্কৃত, জার্মান ও ফরাসি ভাষায় এই সাধারণ বর্তমান ও ঘটমান বর্তমান দু'টি মিলিয়ে একটি কাল--সংস্কৃতে লট্ (গচ্ছামি), জার্মানে Present Tense (gehe), ফরাসি ভাষায়ও Present Tense (vais)।

পুরাঘটিত বর্তমানও সংস্কৃতে পৃথক নেই, অতীতের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। কিন্তু বাংলায় ইংরেজি ও জার্মান ভাষার মতো সাধারণ অতীত ও পুরাঘটিত বর্তমানের জন্যে স্বতন্ত্র রূপ প্রচলিত। যেমন বাংলায়—আমি গিয়েছি, ইংরেজিতে, I have gone, জার্মানে ich habe gegangen। কিন্তু সংস্কৃতে দু'টি মিলিয়ে একই রূপ (লঙ্)। যেমন—অহং অগচ্ছৎ। এ ক্ষেত্রে সংস্কৃতের চেয়েও বাংলার কালবিভাগ সূক্ষ্ম। বাংলা ক্রিয়ার কালবিভাগের সূক্ষ্মতা আরো একটি ক্ষেত্রে দেখা যায়। অভ্যাসগত অতীতের জন্যে বাংলায় স্বতন্ত্র ক্রিয়ারূপ (আমি যেতাম) রয়েছে, ইংরেজিতে স্বতন্ত্র ক্রিয়ারূপ নেই বলে "used to" যোগ করে এর অর্থ প্রকাশ করা হয়.(I used to go)। একটিমাত্র ক্রিয়ারূপ দিয়ে এই অভ্যাসগত অতীতের অর্থ প্রকাশ করার ব্যবস্থা নেই বলে জার্মান, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় সাধারণ অতীতের ক্রিয়ারূপ দিয়েই এর কাজ চালানো হয়। ফরাসি ভাষাতেও অভ্যাসগত অতীতের জন্যে স্বতন্ত্র ক্রিয়ারূপ নেই বলে সেই ভাষায় ঘটমান অতীত (Imperfect) দিয়েই ঘটমান অতীত ও অভ্যাসগত অতীত দু'য়েরই কাজ চালানো হয়। যেমন—Andans = 'আমি যাচ্ছিলাম' এবং 'আমি যেতাম'। সুতরাং অভ্যাসগত অতীত বাংলার এমন এক বিশিষ্ট ক্রিয়ারূপ যার সমতুল্য রূপ অনেক ভাষাতেই নেই।

ইংরেজি থেকে বাংলার পার্থক্য রয়েছে Perfect Continuous Tense-এর ক্ষেত্রেও। ইংরেজিতে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতে Perfect

Continuous Tense-এর পৃথক্ রূপ আছে, বাংলায় নেই। যেমন—I have been doing. I had been doing. I shall have been doing. এগুলির মধ্যে প্রথম দু'টিকে আমি 'করে আসছি', 'করে আসছিলাম' রূপে অনুবাদ করা যায়, কিন্তু তৃতীয়টিকে খাঁটি বাংলা ক্রিয়ারূপ দিয়ে প্রকাশই করা যায় না।

ইংরেজির থেকে বাংলার আরও একটি ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। বাংলায় 'আমি গেলাম' এবং 'আমি গিয়েছিলাম'—এই দুই বাক্যের মধ্যে কালচেতনার সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে আমরা জানি। কিন্তু ইংরেজিতে দু'টিকেই 'I went' রূপে যখন অনুবাদ করা হয় তখন বাংলার এই পার্থক্যটি তাতে ধরা পড়ে না। তেমনি ইংরেজির I went এবং I had gone-এর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে সেই পার্থক্য বাংলাতেও সবসময় স্বতন্ত্র ক্রিয়ারূপ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। এই দু'টি বাক্যকে যথাক্রমে 'আমি গেলাম' এবং 'আমি গিয়েছিলাম' এইভাবে অনুবাদ করা হয়। কিন্তু অনেক সময় I went অর্থেও 'আমি গিয়েছিলাম' ব্যবহার করা হয়।

জার্মান ভাষার ক্রিয়ারূপের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলা ভাষার ক্রিয়ারূপের বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্মতা আরো বেশি ধরা পড়ে। জার্মান ভাষায় মৌলিক কাল মাত্র তিনটি—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। আর যৌগিক কাল মাত্র তিনটি—পুরাঘটিত বর্তমান, পুরাঘটিত অতীত ও পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ। অর্থের সূক্ষ্ম পার্থক্য বোঝাবার জন্যে জার্মানে অতিরিক্ত শব্দ যোগ করা হয়, শুধু ক্রিয়ারূপ দিয়ে সূক্ষ্ম পার্থক্য বোঝান যায় না। বাংলায় যেমন—'গেলাম' ও 'যেতাম'-এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যটির জন্যে পৃথক্ ক্রিয়ারূপ আছে, জার্মানে তেমনটি নেই। ফরাসিতেও নেই।

উপসংহারে বলতে পারি, সাধারণত ধারণা হল যে, ক্রিয়ার যে রূপের দ্বারা ক্রিয়ার কাজটি কোন্ সময়ে ঘটেছে বা ঘটবে বোঝা যায় তা-ই হল ক্রিয়ার কাল। কিন্তু বাংলায় এখন প্রত্যেক কালের জন্যে সর্বক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পৃথক্ ক্রিয়ারূপ নেই ; কখনো কখনো একই ক্রিয়ারূপ প্রসঙ্গ-ভেদে বিভিন্ন সময়ের কাজ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ক্রিয়ার বিভক্তিগুলি সবসময় সুনির্দিষ্ট কালের অর্থ বহন করে না। বিদেশি ভাষাতত্ত্ববিদ বাংলা ক্রিয়ারূপের এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যাখ্যা করতে পারেন নি, শুধু সিদ্ধান্ত করেছেন বাংলার বিভিন্ন কালের ক্রিয়ারূপগুলি সময়ের তাৎপর্য ("temporal semantic values") বহন

৬৭। Ferguson, Charles A. : 'The Basic Grammatical Categories of Bengali.' Proceedings 9th International Congress of Linguistics.

করে।[৬৭]

অনেক সময় যে ক্রিয়ারূপ যে সময়ের কাজ বোঝাবার জন্যে সাধারণত প্রচলিত সেটি সেই সময়ের কাজ না বুঝিয়ে অন্য সময়ের কাজকে বোঝায়। একে ক্রিয়ার কালের তির্যক্ ব্যবহার বলা যায়। যেমন—'আমি এখন স্কুলে যাচ্ছি।'—এখানে 'যাচ্ছি' ক্রিয়াটি ঘটমান কালকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু যখন আমরা বলি—'তুমি কবে বিলেত যাচ্ছো?' 'আমি কালই চলে যাচ্ছি।'—তখন 'যাচ্ছি' ক্রিয়াতে বর্তমানের কাজ বোঝাচ্ছে না, আগামীকালের অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া বোঝাচ্ছে। বাংলায় যেমন কারক-বিভক্তির তির্যক্ ব্যবহার বহুপ্রচলিত হয়েছে, তেমনি ক্রিয়ার কালবিভক্তিরও তির্যক্ ব্যবহার বহুপ্রচলিত হয়েছে। ক্রিয়ার কালবিভক্তির তির্যক্ প্রয়োগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

অতীত অর্থে সাধারণ বর্তমানের ক্রিয়ারূপ—

১৮৭২ সালে শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।

ভবিষ্যৎ অর্থে বর্তমানের ক্রিয়ারূপ—

তুমি কবে কলকাতা যাচ্ছো?

বর্তমান অর্থে অতীতের ক্রিয়ারূপ—

আমি বলছিলাম যে এ মাসে টাকাটা কি না দিলে চলবে না?

অতীত অর্থে ঘটমান বর্তমানের প্রয়োগ—

কলকাতা থেকে কখন এলে?

এই আসছি (অর্থাৎ এই এলাম)।

পুরাঘটিত বর্তমান অর্থে সদ্য অতীত—

আমার কথাটা বুঝলে তো? (অর্থাৎ বুঝতে পেরেছো?)

এইসব তির্যক্ প্রয়োগ থেকে বোঝা যাচ্ছে বাংলায় ক্রিয়ার কাল-বিভক্তির সঙ্গে সময়ের চেতনার (temporal sense) যোগটি ক্রমশ ছিন্ন হয়ে আসছে এবং বাংলা ভাষার ক্রিয়ারূপ ক্রমশ গঠনগত শৈথিল্য লাভ করছে। পূর্বে কারক-বিভক্তির ক্ষেত্রেও এরকম তির্যক্ প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। অনেক বিভক্তি লোপের দৃষ্টান্তও আমরা পেয়েছি। এসব দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাচ্ছে পৃথিবীর অনেক আধুনিক ভাষার মতো বাংলা ভাষার রূপতত্ত্বেও ক্রমশ সংশ্লেষণাত্মক গঠন থেকে বিশ্লেষণাত্মক গঠনের দিকে প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

॥ ২২ ॥

বাক্য ও বাক্যতত্ত্ব

(Sentence and Syntax)

ইংরেজি Syntax শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলায় আমরা 'বাক্যতত্ত্ব' কথাটি ব্যবহার করে থাকি। ইংরেজিতে এই Syntax শব্দটি এসেছে গ্রীক Syntaxis থেকে। গ্রীক ভাষায় এই শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন গ্রীক বৈয়াকরণ দিওনুসিওস্ থ্রাক্স্ (Dionusious Thrax)। গ্রীক ভাষায় শব্দটির অর্থ 'একত্র বিন্যাস'। এই থেকে বাক্যমধ্যে শব্দসমূহের একত্র বিন্যাসের তত্ত্ব অর্থে ক্রমে Syntax কথাটি প্রচলিত হয়।

Syntax হল যেহেতু বাক্যের তত্ত্ব সেহেতু এই বাক্যতত্ত্বের আলোচনায় প্রবেশ করার আগে প্রথমেই জানা দরকার ভাষাবিজ্ঞানে 'বাক্য' (Sentence) বলতে কি বোঝায়? প্রাথমিক পরিচয়ের জন্যে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া সংজ্ঞাটি স্মরণ করা যেতে পারে—"যে পদ বা শব্দ-সমষ্টির দ্বারা কোনও বিষয়ে সম্পূর্ণ-রূপে বক্তার ভাব প্রকটিত হয়, সেই পদ বা শব্দ-সমষ্টিকে বাক্য (Sentence) বলে।[৬৮] এই সংজ্ঞাটিতে বাক্যের শুধু ভাব প্রকাশের দিকটির উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, বাক্যের গঠনগত বৈশিষ্ট্যটি উল্লিখিত হয় নি, তাই ভাষাচার্য পরবর্তীকালে বাক্যের অর্থগত ও গঠনগত দু'টি দিক মিলিয়ে একটি সংশোধিত সংজ্ঞা রচনা করেন। তাতে তিনি বলেন, "কোনও ভাষায় যে উক্তির সার্থকতা আছে, এবং গঠনের দিক হইতে যাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সেইরূপ একক উক্তিকে ব্যাকরণে বাক্য (Sentence) বলা হয়।[৬৯] আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা বাক্যের যেসব সংজ্ঞা দেন তাতে বাক্যের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক আরো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। লেম্যানের (W. P. Lehmann) সংজ্ঞাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : "A sentence is a sequencee of selected syntactic items combined into a unit in accordance with certain patterns of arrangement, modification, and intonation in any given language."[৭০]

৬৮। চট্টোপাধ্যায়, ড. সুনীতিকুমার : 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২, পৃঃ ৪২৮।

৬৯। চট্টোপাধ্যায়, ড. সুনীতিকুমার : 'সরল-ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', কলকাতা ১৯৭১, পৃঃ ২৮৪।

৭০। Lehmann, Winfred P. : *Descriptive Linguistics : An Introduction'*, New York : Random House, 1976, p. 155.

অর্থাৎ বাক্য হচ্ছে এমন কতকগুলি নির্বাচিত উপাদানের পরম্পরাক্রমিক বিন্যাস যেগুলিকে ভাষাবিশেষের বিশেষ ছাঁদ, রূপপরিবর্তন ও সুরতরঙ্গের বিশেষ নিয়ম অনুসারে মিলিত করে একটি এককরূপে গড়ে তোলা হয়েছে। সহজ করে বলা যায়, বাক্য হচ্ছে ভাষার একক (unit) ; ভাষাকে বিশ্লেষণ করলে প্রথম যে বৃহত্তম একক আমরা পাই তা হল বাক্য। এই বাক্য এমন কতকগুলি নির্বাচিত উপাদান নিয়ে গঠিত যেগুলিকে আমরা শব্দ বলি। একটি ভাষায় যত শব্দ প্রচলিত আছে তার সবগুলি একটি বাক্যে ব্যবহৃত হয় না, ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন অনুসারে আমরা এক-একটি বাক্যে নির্বাচিত কয়েকটি শব্দই ব্যবহার করে থাকি। বাক্যের এই উপাদানগুলি বা শব্দগুলিকে বাক্যের মধ্যে যে মিলিত করা হয় তাদের সেই মিলনের ব্যাপারে প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব নিয়ম আছে। এই নিয়মের নানা দিক আছে। এই নিয়মগুলিকে একত্রে পদবিধি বা বাক্যবিধি বলা যায়। এইসব নিয়মের দু'টি দিক হল—বাক্যের মধ্যে শব্দগুলি সাজাবার বা বিন্যাসের নিয়ম আর বাক্যের প্রয়োজন অনুসারে শব্দগুলির রূপপরিবর্তনের নিয়ম। বাক্যের মধ্যে শব্দগুলির বিন্যাস (word order) অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে কোন্ শব্দ কোথায় বসবে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি রকম হবে তা ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে বলে বাক্যতত্ত্ব (Syntax)। আর বাক্যে ব্যবহৃত হলে বিভিন্ন শব্দের যে রূপপরিবর্তন হয় তা ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে বলে রূপতত্ত্ব (Morphology)। চীনা প্রভৃতি কোনো কোনো ভাষায় বাক্যে ব্যবহৃত হলে শব্দের কোনো রূপগত পরিবর্তন হয় না। সেইসব ভাষায় কর্তা, কর্ম, করণ প্রভৃতি বিভিন্ন কারকের পৃথক্ পৃথক্ বিভক্তি-চিহ্ন নেই, ফলে বিভিন্ন কারকে শব্দের রূপভেদ হয় না। এইসব ভাষায় বাক্যের কর্তা, কর্ম ইত্যাদি চেনা যায় তাদের পৃথক্ রূপ দিয়ে নয়, বাক্যের মধ্যে তাদের অবস্থান দিয়ে। যেমন বাংলা ভাষায়—কৃষ্ণ রামকে বই দেয়। বাংলায় 'রামকে' শব্দে যেমন কর্মকারকের বিভক্তি-চিহ্ন আছে '-কে', চীনা ভাষায় তেমন কোনো বিভক্তি-চিহ্ন নেই। এটি যে কর্মকারক তা চেনা যাবে বাক্যের মধ্যে এর অবস্থান থেকে। এর জায়গায় যে শব্দ বসবে সেইটাই হবে কর্মকারক। ফলে 'কৃষ্ণ' শব্দটি যদি এর স্থানে বসানো হয় তবে এইটিই কর্মকারক হয়ে যাবে এবং বাক্যের অর্থ হবে 'রাম কৃষ্ণকে বই দেয়।' চীনা ভাষায় বাক্য গঠনে শব্দের রূপবৈচিত্র্য হয় না। এইসব ভাষায় তাই বাক্য গঠনের আলোচনায় রূপতত্ত্বের কোনো স্থান নেই। আবার সংস্কৃত প্রভৃতি কোনো কোনো ভাষায় শব্দের রূপপরিবর্তন থেকেই বাক্যের মধ্যে শব্দগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক চিহ্নিত করা যায়, এই সম্পর্ক বাক্যের মধ্যে শব্দগুলির অবস্থানের উপরে নির্ভর করে না। সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি ভাষায়

প্রত্যেক কারকের পৃথক্ পৃথক্ বিভক্তি-চিহ্ন আছে। এইসব বিভক্তি-চিহ্ন থেকেই বোঝা যায় কোন্ শব্দটি কর্তা, কোন্‌টি কর্ম ইত্যাদি। বাক্যের মধ্যে শব্দ যেখানেই বসুক না কেন তাতে বাক্যের অর্থের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন 'কৃষ্ণ রামকে বই দেয়' বাক্যটি সংস্কৃতে হবে 'কৃষ্ণঃ রামম্ পুস্তকম্ দদাতি'। বাক্যটিতে 'রাম' ও 'কৃষ্ণ' শব্দের স্থান-পরিবর্তন করে দিলেও অর্থ একই থাকবে—রামম্ কৃষ্ণঃ পুস্তকম্ দদাতি। সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় শব্দগুলির বিন্যাস (word order) গৌণ, রূপতত্ত্বই প্রধান। আবার বাংলা প্রভৃতি অনেক আধুনিক ভাষায় বাক্যগঠন নির্ভর করে বাক্যমধ্যে শব্দের বিন্যাস (word order) ও রূপতত্ত্ব দুই-এর উপর। যেমন—'রাম কৃষ্ণকে বই দেয়' এই বাক্যে কৃষ্ণ শব্দের সঙ্গে '-কে' বিভক্তি আছে বলেই একে কর্মকারক রূপে চিহ্নিত করা যাচ্ছে। এই বিভক্তিটি কৃষ্ণ শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাম শব্দের সঙ্গে যোগ করে দিলে বাক্যটি হবে 'রামকে কৃষ্ণ বই দেয়।' এতে বাক্যের অর্থই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এখানে শব্দের বিভক্তি-চিহ্ন ও রূপবৈচিত্র্যের উপরে বাক্যের অর্থ নির্ভর করছে। আবার 'এখানে মানুষ বাঘ মারে' এই বাক্যের 'মানুষ' ও 'বাঘ' শব্দের স্থান পরিবর্তন করে দিলে বাক্যটি হবে 'এখানে বাঘ মানুষ মারে'। এখানে বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে গেছে শব্দের বিভক্তি-চিহ্ন পরিবর্তনের ফলে নয়, বাক্যের মধ্যে শব্দের স্থান পরিবর্তনের ফলে। এখানে দেখা যাচ্ছে বাংলায় কিছু বিভক্তি-চিহ্ন লোপের ফলে পদ-পরিচয় নির্ভর করছে বিভক্তি-চিহ্নের উপরে নয়, বাক্য মধ্যে পদের অবস্থানের উপরে। এইজন্যে বাংলা প্রভৃতি ভাষায় শব্দের রূপবৈচিত্র্য ও বিন্যাসক্রম দুই-এর উপরেই বাক্যগঠন নির্ভর করে। এইজন্যে রূপতত্ত্ব ও বিন্যাসক্রম ব্যাপক অর্থে দু'টিই বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পড়ে। কিন্তু আধুনিক ভাষাতত্ত্বে রূপতত্ত্বকে (Morphology) ভাষাবিজ্ঞানের পৃথক্ শাখা মনে করা হয়। এবং শব্দের বিন্যাসক্রমকেই বাক্যতত্ত্বের (Syntax) প্রধান আলোচ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করা হয়।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা রূপতত্ত্বকে (Morphology) বাক্যতত্ত্বের (Syntax) অন্তর্গত মনে না করে ব্যাকরণের দু'টি স্বতন্ত্র শাখারূপে রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বকে গ্রহণ করেন ; অবশ্য বাংলা প্রভৃতি ভাষায় রূপতত্ত্ব ও শব্দের বিন্যাসক্রম যেরকম পরস্পর-নির্ভর তাতে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদেরও স্বীকার করতে হয় যে, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের মধ্যে ভেদরেখা সুস্পষ্ট নয়, বরং এই দু'টি শাখা অনেকটা পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত :

"Grammar is conveniently divided into two portions : morphology and syntax. Syntax may be roughly defined as

the principles of arrangement of the constructions formed by the process of derivation and inflection (words) into larger constructions of various kinds. The distinction between morphology and syntax is not always sharp."[৭১]

৭১। Gleason, H. A. Jr. : *An Introduction to Descriptive Linguistics,* 1976, p. 128.

॥ ২৩ ॥

ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণে বাক্যতত্ত্ব ও বাংলা বাক্য

(Syntax in Traditional Grammar and the Bengali Sentence)

বাক্যের বিভিন্ন দিক—তার গঠন, উপাদান, শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি—সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণেই হয়েছিল। আধুনিক বর্ণনামূলক ও গঠনগত (Descriptive and Structural) ভাষাবিজ্ঞান এবং বিশেষ করে রূপান্তরমূলক-সৃজনমূলক ব্যাকরণে (Transformational Generative Grammar) বাক্যতত্ত্ব যে রকম সূক্ষ্ম সমুন্নতি লাভ করেছে তাতে আগেকার ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণে আলোচিত বাক্যতত্ত্বের অনেক ত্রুটি ও ঘাটতি চোখে পড়তে পারে। কিন্তু যেহেতু ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিক ছিল না, মূলত এককালিক বর্ণনামূলকই ছিল, এবং যেহেতু তার কিছুকিছু মূল ধারণা আধুনিক বাক্য বিশ্লেষণেও প্রতিষ্ঠাভূমি রূপে কাজ করে, সেহেতু আধুনিক বর্ণনামূলক বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনার আগে ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্বের মূলসূত্রটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

বাংলা বাক্যের গঠন ও গঠনগত শ্রেণীবিভাগ : ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণে বাক্যকে প্রথমে দু'টি অংশে ভাগ করা হয়—উদ্দেশ্য (Subject) ও বিধেয় (Predicate)। মোটামুটিভাবে যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয় তাকে বিধেয় বলে। যেমন—'অপু চলে গেল।'—এই বাক্যে 'অপু' হল উদ্দেশ্য এবং 'চলে গেল' হল বিধেয়। উদ্দেশ্য ও বিধেয়—বাক্যের গঠনের এই দু'টি মৌলিক উপাদান নির্ণয় করে ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণে গঠনগত দিক থেকে বাক্যকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : **(১) সরল বাক্য** (Simple Sentence), **(২) মিশ্র বা জটিল বাক্য** (Complex Sentence), **(৩) যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য** (Compound Sentence)।

সরল বাক্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সাধারণত বলা হয় যে, যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য এবং একটি মাত্র বিধেয় থাকে তা-ই হল সরল বাক্য। যেমন—'ছাত্রেরা পড়ে'। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার অবশ্য আরো সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে বলেছেন—সরল বাক্যে উদ্দেশ্য-পদ একাধিক থাকতে পারে, কিন্তু বিধেয়-পদ একটিমাত্র থাকা চাই অর্থাৎ বিধেয়ের মূল সমাপিকা-ক্রিয়া মাত্র একটি থাকবে। যদি একটিমাত্র সমাপিকা-ক্রিয়ার একাধিক কর্তা থাকে তবে সব ক'টি কর্তা মিলিয়ে একটিমাত্র উদ্দেশ্য রূপে গণ্য করা হবে। যেমন—'ঠেলাগাড়িতে ইংরাজ রমণী ও অশ্বপৃষ্ঠে ইংরাজ পুরুষগণ বায়ু সেবনে বাহির হইয়াছেন'—(রবীন্দ্রনাথ)। এই বাক্যে একাধিক

কর্তা থাকলেও সমাপিকা ক্রিয়া একটিমাত্র থাকায় বাক্যটি সরল বাক্য। আবার বাক্যে একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলেও সমাপিকা ক্রিয়া একটিমাত্র থাকলেই সে বাক্য সরল বাক্যই হবে। যেমন—'সেই ছেলের পাল ফুল ছিঁড়ে, ফল পেড়ে, ডাল ভেঙে চুরমার করত।' —(অবনীন্দ্রনাথ)। সুতরাং সরল বাক্য যে সব সময় ক্ষুদ্রতম বাক্য, তা নয় ; একটিমাত্র উদ্দেশ্য বা বিধেয় মানে সব সময় একটিমাত্র পদ, তাও নয়। সরল বাক্যের উদ্দেশ্যের আগে তার কোনো বিশেষণ থাকতে পারে, তেমনি বিধেয়ের অন্তর্গত ক্রিয়ার আগে তার কর্ম থাকতে পারে। উদ্দেশ্যের বিশেষণ প্রভৃতি যেসব শব্দ উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার অর্থকে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট বা বিশেষিত করে তাকে উদ্দেশ্যের প্রসারক (Adjuncts to Subject-word) বলে। আবার বিধেয়ের অর্থকে বিশেষিত করার জন্যে অথবা তাকে বিশেষ করে পরিস্ফুট করার জন্যে ক্রিয়ার যে বিশেষণ ইত্যাদি থাকে তাকে বিধেয়ের প্রসারক (Adjuncts to Predicate Verb) বলে। যেমন—'সব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ ভাল ছাত্ররা খুঁব মনোযোগ সহকারে মূল বই পড়ে'। এখানে 'সব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ ভাল' হল উদ্দেশ্যের প্রসারক ; আর 'খুব মনোযোগ সহকারে' হল বিধেয়ের প্রসারক। উদ্দেশ্যের প্রসারক বা বিধেয়ের প্রসারককে বাদ দিলেও বাক্যের অর্থ অসমাপ্ত থাকে না। কিন্তু কোনো কোনো বাক্যে ক্রিয়ার অর্থকে পূর্ণ করার জন্যে অন্য দু'একটি শব্দ অপরিহার্য, সেসব শব্দকে বাদ দিলে বাক্যের অর্থই অপূর্ণ থাকে। যেমন—'সুভাষচন্দ্র আদর্শ নেতা ছিলেন'। এই বাক্যে 'আর্দর্শ নেতা' কথাটি বাদ দিলে 'ছিলেন' ক্রিয়ার অর্থই অপূর্ণ থাকে। এরকম যে শব্দ বিধেয়-ক্রিয়ার অর্থকে পূর্ণতা দানের জন্যে অপরিহার্য, তাকে বিধেয়-ক্রিয়ার পরিপূরক (Complement to Predicate-Verb) বলে। এই বাক্যে 'আদর্শ নেতা' হল বিধেয়ের পরিপূরক। কিন্তু বিধেয়ের প্রসারক ক্রিয়ার অর্থের পূর্ণতার জন্য খুব অপরিহার্য নয়। যেমন 'সব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ ভাল ছাত্ররা খুব মনোযোগ সহকারে মূল বই পড়ে' বাক্যের 'খুব মনোযোগ সহকারে' হল বিধেয়ের প্রসারক, কিন্তু 'মূল বই' হল বিধেয়-ক্রিয়ার পরিপূরক। 'সবদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ ভাল ছাত্ররা খুব মনোযোগ সহকারে মূল বই পড়ে।'—এই বাক্যটি দীর্ঘ হলেও সরল বাক্যই। এর তুলনায় 'ছাত্ররা পড়ে, কিন্তু ছাত্রীরা রান্না করে'—বাক্যটি অনেক ছোট হলেও সরল বাক্য নয়। কারণ এতে দু'টি উদ্দেশ্য আছে—'ছাত্ররা' ও 'ছাত্রীরা' আর দু'টি বিধেয় আছে 'পড়ে' ও 'রান্না করে'।

যে বাক্যে একটি প্রধান উপবাক্য থাকে এবং এক বা একাধিক অপ্রধান বা আশ্রিত উপবাক্য থাকে তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। বাক্যের যে উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বক্তব্যই সেই বাক্যের মুখ্য বক্তব্য সেই উদ্দেশ্য এবং তার বিধেয় সম্বলিত বাক্যই প্রধান বাক্য। আর প্রধান বাক্যের মধ্যে অন্য যে বাক্যটি বসে শুধু

মূল বাক্যের সর্ত বোঝাবার জন্যে বা মূল বাক্যের কর্তার বা ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে, তাকে অপ্রধান বাক্য বলে। যেমন—ছাত্রটি 'যদি পড়ে তাহলেই সে পাশ করবে।' এখানে ছাত্রের পাশ করাই বক্তার মূল বক্তব্য, সুতরাং 'সে পাশ করবে' হল প্রধান বাক্য ; আর 'যদি ছাত্রটি পড়ে' হচ্ছে পাশ করার সর্ত, এটি হচ্ছে অপ্রধান বাক্য। তেমনি 'যে বিভূতিভূষণ পল্লী-প্রকৃতিকে ভালবাসতেন সেই বিভূতিভূষণ পথের পাঁচালী লিখতে পেরেছেন'—এই বাক্যে 'যে বিভূতিভূষণ পল্লী-প্রকৃতিকে ভালবাসতেন' খণ্ডবাক্যটি হল 'সেই বিভূতিভূষণ'-এর বিশেষণ-উপবাক্য। মিশ্রবাক্যের অন্তর্গত প্রধান ও অপ্রধান দু'টি বাক্যকেই খণ্ডবাক্য বা উপবাক্য (Clause) বলে। প্রধান ও অপ্রধান দু'টি বাক্যই যেহেতু একটি বড় বাক্যের অংশ, সেহেতু বড় বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি হল উপবাক্য বা খণ্ডবাক্য। উপবাক্য বা খণ্ডবাক্য তাই দু'রকমের—প্রধান বা স্বাধীন উপবাক্য (Main or Principal Clause) এবং অপ্রধান উপবাক্য বা আশ্রিত উপবাক্য (Dependent Clause)।

এই প্রসঙ্গে বাক্যাংশের বা পদগুচ্ছের (Phrase) সঙ্গে উপবাক্যের (Clause) পার্থক্য জানা দরকার। উপবাক্য বাক্যের সমগ্র অংশ হলেও তাতে একটি উদ্দেশ্য (কর্তা) ও একটি বিধেয় (অন্তত একটি ক্রিয়া) থাকেই ; কিন্তু পদগুচ্ছের এরকম উদ্দেশ্য ও বিধেয় সর্বদা থাকে না, তা হচ্ছে অর্থের আপেক্ষিক একক অনুসারে গোষ্ঠীবদ্ধ পদসমষ্টি। যেমন—'যে বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে ভালবাসতেন তিনি পথের পাঁচালী লিখতে পেরেছেন' এই বাক্যে 'যে বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে ভালবাসতেন' হল আশ্রিত বা অধীন উপবাক্য (Dependent Clause) আর 'তিনি পথের পাঁচালী লিখতে পেরেছেন' হল প্রধান উপবাক্য (Main Clause)। আর 'প্রকৃতি-প্রেমিক বিভূতিভূষণ পথের পাঁচালী লিখতে পেরেছিলেন'—এই বাক্যে 'প্রকৃতি-প্রেমিক বিভূতিভূষণ' হল একটা পদগুচ্ছ (Phrase)।

যে বাক্য একের বেশি প্রধান উপবাক্য-সংযোগে গঠিত হয় তাকে যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য (Compound Sentence) বলে। একের বেশি সরল বা মিশ্রবাক্যকে সংযোজক অব্যয় ('এবং', 'ও', 'আর' প্রভৃতি) বা বিয়োজক অব্যয় ('অথবা', 'বা', 'কিংবা' প্রভৃতি) দিয়ে যুক্ত করে যে বাক্য গঠিত হয় তাকে যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য বলে। যেমন—'বিভূতিভূষণ প্রকৃতি-প্রেমিক ঔপন্যাসিক এবং তিনি মানুষের বাস্তব জীবনের দুঃখবেদনা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন।' এখানে দু'টি সরল বাক্যকে একটি সংযোজক অব্যয় ('এবং') দিয়ে যোগ করা হয়েছে। আর, 'বিভূতিভূষণ প্রকৃতি-প্রেমিক ঔপন্যাসিক ; কিন্তু একথা বললে ভুল হবে যে, বিভূতিভূষণ বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না'--এখানে 'বিভূতিভূষণ প্রকৃতি-প্রেমিক ঔপন্যাসিক ছিলেন'—এই সরল বাক্যের সঙ্গে 'একথা বললে ভুল হবে যে, বিভূতিভূষণ বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ

সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না'—এই মিশ্রবাক্যটি যোগ করা হয়েছে। উপবাক্য যোগ করে বড় বড় জটিল বাক্য রচনা করার প্রবণতা আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে যথেষ্ট কমে এসেছে। বাংলাতেও বহু উপবাক্য যোগ করে বড় বড় জটিল বাক্য রচনার প্রবণতা ক্রমশ কমে আসছে।

শুদ্ধ বাক্যের ত্রি-সূত্র : আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ বলেছিলেন—বাক্য হল যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি-যুক্ত পদ-সমুচ্চয়—'বাক্যং স্যাৎ যোগ্যতা-আকাঙ্ক্ষা-আসত্তি-যুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ।' বিশ্বনাথের এই সূত্রটি ঐতিহ্যাগত বাংলা ব্যাকরণে একটি মূলসূত্র রূপে গৃহীত হয়েছে। এবং বৈয়াকরণরা এই সূত্র অনুসারে শুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠনের জন্যে তিনটি সর্ত নির্ণয় করেছেন—আকাঙ্ক্ষা (Expectancy), যোগ্যতা (Compatibility or Propriety) এবং আসত্তি বা নৈকট্য (Proximity)।

কোনো বাক্যের বক্তব্য পূর্ণ রূপে জানার জন্য শ্রোতার মনে যে আকাঙ্ক্ষা বা কৌতূহল থাকে বাক্যের দ্বারা তা নিবৃত্ত হওয়া চাই। শ্রোতার মনে কৌতূহল জাগিয়ে দিয়ে কোনো বাক্য যদি হঠাৎ মাঝপথে থেমে যায় তা হলে সেই বাক্য পূর্ণাঙ্গই হল না। যেমন—'আজ যদি বৃষ্টি হয়.........' এইটুকু বলেই যদি কোনো বক্তা নীরব হয়ে যান, তাহলে পরবর্তী পরিণামটা জানার জন্য শ্রোতার মনে একটা আকাঙ্ক্ষা থেকে যায় এবং বাক্যটি অপূর্ণ থেকে যায়। শ্রোতার এই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করার জন্য বক্তাকে আরও কিছু বলে বক্তব্যটি পূর্ণ করতে হবে। যেমন—'আজ যদি বৃষ্টি হয় তা হলে আমি ইস্কুলে যাব না।'

বাক্যের অর্থ অর্থাৎ বক্তার বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার বা বৃহত্তর বা গভীরতর সত্যের যে সঙ্গতি থাকে তাকে যোগ্যতা বলা হয়। এই সঙ্গতি না থাকলে যোগ্যতা বিঘ্নিত হয় এবং তাতে বাক্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। আর অর্থযুক্ত না হলে কোনো পদসমষ্টিকে বাক্যই বলা যায় না। যেমন—'মানুষ রাত্রে জাগে, দিনে ঘুমায়' বা 'মানুষ মেরুদণ্ডহীন প্রাণী এবং কেঁচো মেরুদণ্ডযুক্ত প্রাণী'। এই বাক্য-দু'টির বক্তব্য সত্যের সঙ্গে বা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে এগুলি শুদ্ধ বাক্য নয়। কিন্তু বক্তা যদি বিশেষ ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতার বাইরের সত্যই প্রকাশ করে কোনো বৃহত্তর বা গভীরতর সত্য বা 'কোনো কাব্যিক তাৎপর্য প্রকাশ করতে চান, তবে বাক্যের অর্থের সঙ্গে সাধারণ লোকের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গতি না থাকলেও তাকে অর্থহীন বলা যাবে না। যেমন—

'মানুষের আজকাল কোনো মেরুদণ্ড নেই, কারো কোনো আত্মপ্রত্যয় নেই, আদর্শনিষ্ঠা নেই, সে স্বার্থের জন্যে সব জলাঞ্জলি দিয়ে অন্ধভাবে ছুটে চলেছে।' কিংবা 'অন্য লোকের কাছে যখন রাত্রি, জ্ঞানতপস্বী মানুষ তখন জেগে কাটায় ; আর জ্ঞানতপস্বীরা যখন জেগে থাকে, অন্য লোকে তখন ঘুমোয়।'

আসত্তি বলতে বোঝায় বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির মধ্যে রূপতাত্ত্বিক সঙ্গতি ও বিন্যাসের নৈকট্য বা ক্রম। বাক্যে বিন্যস্ত পদগুলির মধ্যে রূপতাত্ত্বিক সঙ্গতি থাকা চাই। যেমন—'আমি কলকাতা যাই' বাক্যে 'আমি' কথাটি উত্তম পুরুষের বলে 'যাই' ক্রিয়াটিও উত্তম পুরুষের হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি বলি 'আমি কলকাতা যান' তা হলে উত্তম পুরুষের কর্তার সঙ্গে প্রথম পুরুষের ক্রিয়ার সঙ্গতি থাকে না। এতেও বাক্যের অর্থ বিপন্ন হয় এবং বাক্য অশুদ্ধ হয়ে পড়ে।

যেসব পদ দিয়ে বাক্য গঠিত হয় সেই পদগুলির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্বের ব্যাপারে প্রত্যেক ভাষায় যে নিজস্ব নিয়ম আছে, কোনো পদ বাক্যে কোথায় বসবে সে বিষয়ে যে প্রথা আছে, তা মেনে চলা দরকার। যেমন—'আমরা চিনি দিয়ে সরবৎ করে খাই' এই বাক্যের পদগুলির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব বাংলা ভাষার প্রথা অনুযায়ী যা রাখা হয়েছে তা উল্টেপাল্টে পদগুলির স্থান পরিবর্তিত করে দিলে বাক্যটি হবে—'আমরা সরবৎ দিয়ে চিনি করে খাই।' তাহলে বাক্যটি অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং আমাদের বক্তব্যটি ঠিক-ঠিক প্রকাশিত হয় না। এইজন্যে স্বাভাবিক ক্ষেত্রে বাক্যে পদবিন্যাসের প্রচলিত পারম্পর্য রক্ষা করতে হয়। তবে কবিতায় বা বিশেষ উক্তিতে বা আবেগ-উত্তেজনার সময় এই পদক্রম অল্পস্বল্প পরিবর্তিত করা চলে। যেমন—বিশেষ ক্রোধের সময় মায়েরা ছোটদের বলে থাকেন—'এক গালে চড় মারবো'। এখানে বাক্যে পদের ইপ্সিত বক্তব্য অনুযায়ী পদক্রম হল—'গালে এক চড় মারবো'। এই ক্রমটি উত্তেজনার সময় পরিবর্তিত হয়ে গেলেও অর্থ ঠিক বোঝা যায়।

বাংলা বাক্যে পদক্রম (Word order in Bengali Sentence) : আগেই বলেছি যে, বাক্যে পদক্রম (word order) আধুনিক বাক্যতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়। আধুনিক বর্ণনামূলক ও রূপান্তরমূলক-সৃজনমূলক ব্যাকরণের প্রতিষ্ঠার আগে কোনো কোনো ঐতিহ্যপন্থী বৈয়াকরণ বাংলা বাক্যের পদক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। বিশেষত ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে' এ বিষয়ে যে আলোচনা করেছিলেন তাতে বাংলা বাক্যে পদবিন্যাসের মূলসূত্র পাওয়া যায়। এই মূলসূত্রগুলি আমাদের আজকের দিনের আলোচনার প্রতিষ্ঠারূপে গ্রহণীয়। মূলত তাঁর সূত্রগুলি অনুসরণে ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণের ধারায় বাংলা বাক্যে পদক্রম সংক্ষেপে এইভাবে লিপিবদ্ধ করা যায় :

(ক) বাংলা বাক্যের দু'টি মূল উপাদান—উদ্দেশ্য ও বিধেয়। সাধারণত বাক্যে দু'টি উপাদানই উপস্থিত থাকে। তবে বিধেয়-অংশ থেকে অস্তিত্ববাচক (to be) ক্রিয়ার অনির্দিষ্ট বর্তমান কালের রূপ সংস্কৃতের মতো বাংলাতেও অধিকাংশ সময় উহ্য থাকে। যেমন—'শ্রীঅরবিন্দ আধুনিক ভারতের একজন মহান্ দার্শনিক।' এই বাক্যে 'হওয়া' ক্রিয়ার রূপটি উহ্য, সেটি দিলে বাক্যটি হবে—'শ্রীঅরবিন্দ হন

আধুনিক ভারতের একজন মহান্ দার্শনিক।' কিন্তু এরকমের প্রয়োগ বাংলায় চলে না। এসব ক্ষেত্রে 'হওয়া' ক্রিয়াটি উহ্য না রেখে যদি বসাতেই চাই তাহলে ক্রিয়ার ঘটমান বর্তমান বা সামান্য অতীতকালের রূপ ব্যবহার করা হয়। যেমন—'শ্রীঅরবিন্দ হচ্ছেন (বা হলেন) আধুনিক ভারতের একজন মহান্ দার্শনিক।' 'হওয়া' ক্রিয়া ছাড়াও অনেক সময় বাংলা বাক্যের সমগ্র উদ্দেশ্য বা সমগ্র বিধেয়-অংশই উহ্য থাকতে পারে। যেমন—'যাও, দূর হও'--এই বাক্যে 'তুমি' বা 'তোমরা' উদ্দেশ্য উহ্য আছে। তেমনি—'লজেন্স্ কে নেবে?'—'আমি'। এখানে দ্বিতীয় বাক্যটি আপাতদৃষ্টিতে একটিমাত্র শব্দ নিয়ে গঠিত—'আমি'। কিন্তু এখানে এই বাক্যের একটি বিধেয় আছে—'নেবো', সেটি উহ্য।

উদ্দেশ্য বা বিধেয় আপাতদৃষ্টিতে উহ্য থাকলেও গভীরতর বিচারে বাক্যে সেটি রয়েছে, একথা আমরা সহজেই বুঝতে পারি।

(খ) উদ্দেশ্য সাধারণত বিধেয়ের আগে বসে। তবে বিশেষ আবেগ প্রকাশ করার জন্যে বা বাক্যের কোনো অংশে জোর দেবার জন্যে বা কবিতার ছন্দের প্রয়োজনে উদ্দেশ্যটি বিধেয়ের পরে বসতে পারে। যেমন—'যাবো না আমি। ছেড়ে দাও আমায়।'

(গ) সংক্ষেপে বাংলা বাক্যে পদের স্বাভাবিক ক্রম হল—কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া। যেমন—রাম সীতাকে বললেন। এই ক্রম বিশেষ শব্দের উপরে জোর দেবার জন্যে নানাভাবে পরিবর্তিত করা যেতে পারে। যেমন—সীতাকে বললেন রাম। রাম বললেন সীতাকে। সীতাকে রাম বললেন।

বিশেষ শব্দের উপরে জোর দেবার প্রয়োজন না হলে স্বাভাবিক ক্ষেত্রে বাংলা বাক্যে পদক্রমের সংক্ষিপ্ত সূত্র হল কর্তার পরে কর্ম, কর্মের পরে ক্রিয়া। বাংলা বাক্যের পদক্রম আরো বিস্তৃত রূপে ব্যাখ্যা করেছেন ড. সুকুমার সেন এইভাবে—

"বাক্যের সর্বশেষে সমাপিকা ক্রিয়া—নঞর্থ বাক্য না হইলে—, তাহার পূর্বে মুখ্য কর্ম, তাহার পূর্বে গৌণ কর্ম, তাহার পূর্বে করণ অধিকরণ, তাহার পূর্বে অসমাপিকা (ও তদ্‌যুক্ত বাক্যাংশ), তাহার পূর্বে কর্তা। সমাপিকা ক্রিয়া বলিতে যুক্ত ও যৌগিক ক্রিয়াপদও ধরিতে হইবে।"[৭২] এখানে বলা প্রয়োজন বাংলায় গৌণকর্ম ও সম্প্রদানের স্থান একই। একটি বাক্য উদাহরণস্বরূপ দিলে সূত্রটি বোঝা যাবে। যেমন—'আমি ভিখারীর কান্না শুনে দু'হাতে তখন তাকে অনেক চাল দিলাম।' এখানে সমাপিকা ক্রিয়া—'দিলাম', মুখ্য কর্ম—'অনেক চাল', সম্প্রদান—'তাকে' (ভিখারীকে), করণ—'দু হাতে', অধিকরণ (সময়াধিকরণ)—'তখন', অসমাপিকা ও তৎসংযুক্ত বাক্যাংশ—'ভিখারীর কান্না শুনে', কর্তা—'আমি'।

৭২। সেন, ড. সুকুমার : 'ভাষার ইতিবৃত্ত', কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ৩৬৩।

আগেই বলা হয়েছে, বিশেষ শব্দের উপরে জোর দেবার প্রয়োজন ছাড়া স্বাভাবিক ক্ষেত্রে বাংলা বাক্যের পদক্রমের মূলসূত্র হল—কর্তার পরে কর্ম ও কর্মের পরে ক্রিয়া। এই মূল সূত্রটি ইউরোপের অনেক ভাষারই বাক্যগঠন থেকে বাংলার বাক্যগঠনকে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করেছে। ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি ভাষার বাক্যগঠন থেকে বাংলা বাক্যগঠন মূলগত ভাবে পৃথক্। ঐ সব ভাষায় স্বাভাবিক বিবৃতিমূলক ইতিবাচক বাক্যের পদক্রমের মূলসূত্র হল—কর্তার পরে ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার পরে কর্ম। যেমন—

	কর্তা +	ক্রিয়া +	কর্ম
ইংরেজি	Ram	reads	the book
জার্মান	Ram	liest	das Buch
ফরাসি	Ram	lit	des livres
কিন্তু বাংলা	কর্তা +	কর্ম +	ক্রিয়া
	রাম	বইটি	পড়ে

জার্মান ভাষায় অবশ্য অপ্রধান উপবাক্যে (subordinate clause) পদক্রম বাংলার মতো কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া হয়ে যায়। যেমন—(Ich Kann nicht lese, weil ich keinen Buch habe) (অর্থাৎ, আমি পড়তে পারি না, কারণ আমার কোনো বই নেই)।

প্রশ্নবোধক বাক্যেও বাংলার পদক্রমের স্বাতন্ত্র্য আছে। ইংরেজি এবং জার্মান ভাষায় প্রশ্নবোধক বাক্যে ক্রিয়ার স্থান পরিবর্তিত হয়, ক্রিয়া চলে আসে কর্তার আগে। ফরাসিতে প্রশ্নবোধক বাক্য গঠনের নানা জটিল নিয়ম আছে, এক-এক ধরনের বাক্যের এক-এক নিয়ম। সাধারণ যেসব প্রশ্নবোধক বাক্যে আমরা শুধু 'হাঁ' বা 'না' উত্তর প্রত্যাশা করি সেসব বাক্যের কর্তা সর্বনাম হলে ক্রিয়া চলে আসে কর্তার আগে। যেমন—Lit il des livnes? (= সে কি বই পড়ে?)। আবার যেসব বাক্যে কর্তা বিশেষ্য সেসব বাক্যে প্রশ্ন যেন ঘুরিয়ে করা হয়। যেমন—Est-ceque Ram lit des livres? (= একি হয় যে রাম বই পড়ে?)।

প্রশ্নবোধক বাক্যে ইংরেজি আবার জার্মান ও ফরাসি ভাষা থেকে একটু গঠনগত স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেয়। ইংরেজিতে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে একটি গৌণ ক্রিয়া (auxiliary verb) যুক্ত হয় এবং সেই গৌণ ক্রিয়াটিই কর্তার আগে চলে আসে, মূল ক্রিয়াটি কর্তার পরেই থাকে ; কিন্তু জার্মান ও ফরাসি ভাষায় কোনো গৌণ ক্রিয়া যুক্ত হয় না, মূল ক্রিয়াটিই কর্তার আগে চলে আসে। কিন্তু বাংলায় গৌণ ক্রিয়া যোগের কোনো বিধান নেই, ক্রিয়াকে স্থানান্তরিত করাও অপরিহার্য নয়। বাংলায় বাক্যে প্রশ্নের বোধটি জাগে পদক্রমের পরিবর্তন থেকে

নয়, সুরতরঙ্গের (intonation) পরিবর্তন থেকে। পদক্রম পরিবর্তিত হতেও পারে, নাও হতে পারে। অন্য ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে বাংলা প্রশ্নবোধক বাক্যের মূল গঠনগত স্বাতন্ত্র্যটি ধরা পড়বে :

ইংরেজি : Does Ram read the book?
জার্মান : Liest Ram das Buch?
কিন্তু বাংলা : রাম বই পড়ে?
কিংবা রাম কি বই পড়ে?

(ঘ) বাংলায় বিশেষণ সাধারণত বিশেষ্যের আগে বসে। এক্ষেত্রে ইংরেজির সঙ্গে বাংলার সাদৃশ্য আছে। যেমন—বাংলায়— **সুন্দর** ফুল, **ভালো** ছেলে। ইংরেজিতে— a beautiful flower, a good boy। কিন্তু ইংরেজিতে বিশেষণটির উপরে বিশেষ জোর দেবার জন্যে কখনো কখনো বিশেষণটিকে বিশেষ্যের পরে বসানো হয়। যেমন—The Divine Life-এর স্থলে The Life **Divine** বলা যায়। বিশেষণকে বিশেষ্যের পরে বসানোর রীতি লাতিন শাখার ভাষা ইতালীয় প্রভৃতিতে বিশেষ প্রচলিত। যেমন—la begge **crudele** = নিষ্ঠুর আইন। আধুনিক কালে অবশ্য ইংরেজির প্রভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইতালীয় ভাষাতেও বিশেষণ বিশেষ্যের আগে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন—**un bel** ragazzo = সুন্দর ছেলে। কিন্তু মূল লাতিন রীতি ছিল বিশেষ্যের পরেই বিশেষণ ব্যবহারের। লাতিন রীতি অনুসরণ করেই কোল্‌রীজ তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন—Biographia **Literaria** = Literary Biography। বাংলায় বিশেষ্যের পরে বিশেষণ বসাবার এই রকম রীতি চোখে পড়ে না। কেবল দু-একটি ক্ষেত্রে বহুব্যবহার-জনিত ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন—আলু-ভাজা, পাঁপড়-ভাজা ; ট্রেনে হকারদের মুখে শোনা যায়—চা-গরম ইত্যাদি।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলায় বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসেছে মনে হতে পারে। যেমন—ছেলে **ভাল**। কিন্তু মনে রাখতে হবে বিশেষণটি বিধেয় বিশেষণ, কারণ 'ছেলে ভাল' আসলে একটি বাক্য, এর ক্রিয়াটি উহ্য আছে, পূর্ণ বাক্যটি হল—'ছেলে (হল) ভাল'। এখানে 'ভাল' বিশেষণটি বিধেয়ের অন্তর্গত। বাংলায় সাধারণত বিধেয় বিশেষণ বিধেয় অংশেই বসে এবং বিধেয় উদ্দেশ্যের পরে বসে। যেমন—আমাদের দেশ অতি **মহান**। কিন্তু বিশেষণের উপরে জোর দেবার জন্যে বিশেষণটিকে বাক্যের প্রথমে এনে উদ্দেশ্যকে পরে বসানো হয়। যেমন—'**মহান** সেই দেশ যার ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছেন রবীন্দ্রনাথের মতো কবি, সুভাষচন্দ্রের মতো বিপ্লবী, বিবেকানন্দের মতো সন্ন্যাসী, শ্রীঅরবিন্দের মতো দার্শনিক।' বিধেয় বিশেষণকে বাক্যের প্রথমে বসানোর এই রীতি ইংরেজি ভাষায়

বহু প্রচলিত। যেমন—'**Great** are the traditions of the past'। এই রীতি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির বাক্যরীতির আধুনিক প্রবণতা এবং বাংলা ভাষাতেও এই প্রবণতা ব্যাপক ভাবে দেখা যাচ্ছে।

(ঙ) সাধারণত উদ্দেশ্যের প্রসারক উদ্দেশ্যের আগে বসে আর বিধেয়ের প্রসারক বিধেয়ের আগে বসে, এবং সমাপিকা ক্রিয়াটি বাক্যের শেষে বসে। যেমন—"হরিহরের দূরসম্পর্কীয় দিদি ইন্দির ঠাক্‌রুণ সকালবেলায় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চালভাজার গুঁড়া জলখাবার খাইতেছে।" (পথের পাঁচালী) এখানে উদ্দেশ্যের প্রসারক—'হরিহরের দূরসম্পর্কীয় দিদি', বিধেয়ের প্রসারক—'সকালবেলায় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া', সমাপিকা ক্রিয়া—'খাইতেছে'।

বিধেয়ের প্রসারক কখনো কখনো বিধেয়ের আগে না বসে উদ্দেশ্যের আগে চলে যেতে পারে। যেমন—"**প্রচণ্ড আলোয়** রাত্রির অন্ধকার টলমল করে উঠল।" (রাজকাহিনী)। আবার আধুনিক বাংলায় প্রায়ই বিধেয়ের প্রসারক সমাপিকা ক্রিয়ারও পরে বসে। যেমন—"সঙ্গে গেল পৃথ্বীরাজের সেই পাঁচ সঙ্গী তার অনেক পেছনে চললেন শূরতান **অসংখ্য রাজপুত সেপাই নিয়ে।"** (রাজকাহিনী)।

(চ) বাংলা বাক্যে কর্তার যে পুরুষ হয়, ক্রিয়ারও সেই পুরুষ হয়ে থাকে। কর্তার পুরুষের সঙ্গে ক্রিয়ার পুরুষের এই সঙ্গতি বা অন্বয় (concord) অধিকাংশ ভাষায় রক্ষিত হয়। যেমন—'আমি যাই'—কর্তা ও ক্রিয়া দুই-ই উত্তম পুরুষের ; 'তুমি যাও'—এখানে কর্তা ও ক্রিয়া দুই-ই মধ্যম পুরুষের, 'সে যায়'—এখানে কর্তা ও ক্রিয়া দুই-ই প্রথম পুরুষের। বাংলা মধ্যম পুরুষের সর্বনামের তিন রূপ : ঘনিষ্ঠতা বা তুচ্ছতা-জ্ঞাপক (prejorative)—তুই, তোরা ; সাধারণ (ordinary)—তুমি, তোমরা ; সম্মানজনক (honorific)—আপনি, আপনারা। প্রথম পুরুষের দু'ই রূপ : সাধারণ—সে, তারা ; সম্মানজনক—তিনি, তাঁরা। সর্বনামের এই প্রতিষ্ঠাভেদ অনুসারে বাংলা বাক্যের ক্রিয়ার রূপের সঙ্গতি রাখা হয়। যেমন--তুই যাস, তুমি যাও, আপনি যান ; সে যায়, তিনি যান। কিন্তু সমস্যা দেখা যায় যখন ক্রিয়া একটাই, কিন্তু তার বিভিন্ন পুরুষের একাধিক কর্তা থাকে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন—এসব ক্ষেত্রে একাধিক কর্তার মধ্যে যদি উত্তম পুরুষের কর্তাও থাকে তা হলে ক্রিয়ার রূপ হয় উত্তম পুরুষ অনুযায়ী। আর যদি উত্তম পুরুষ না থাকে তাহলে ক্রিয়ার রূপ হবে মধ্যম পুরুষ অনুযায়ী। যেমন—আমি, তুমি, আর দাদা কলকাতা **যাবো**। তুমি আর দাদাই **যাও**।

(ছ) কেউ কেউ বলেছেন, মিশ্র বাক্যের অন্তর্গত আশ্রিত উপবাক্য (Dependent clause) প্রধান বাক্যের আগে বলে। যেমন—'দেশের মঙ্গলের

জন্যে যদি তুমি রাজনীতি করতে চাও তা হলে আগে তোমাকে খাঁটি মানুষ হতে হবে।' এখানে 'যদি তুমি দেশের মঙ্গলের জন্যে রাজনীতি করতে চাও' অংশটি আশ্রিত উপবাক্য, এটি আগে বসেছে। কিন্তু এ নিয়ম সর্বত্র অনুসৃত হয় না।

(জ) অনেকের মতে বাংলায় একটি বাক্যে দু'য়ের বেশি উদ্দেশ্য বা দু'য়ের বেশি বিধেয় থাকলে শেষ উদ্দেশ্য বা শেষ বিধেয়ের পূর্ববর্তী উদ্দেশ্য বা বিধেয়ের পরে সংযোজক অব্যয় বসে, অন্য উদ্দেশ্য ও বিধেয়গুলির পরে কমা (,) বসে। যেমন—'বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বাংলার তিন মহান্ সাহিত্যিক।' 'রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার।' কিন্তু এই নিয়মও আধুনিক বাংলায় বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে আর অব্যর্থভাবে অনুসরণ করা হয় না। যেমন—'শেষে ক্রমে বেলা পড়ে এল ; নীল আকাশ, নদীর জল, নগরের পথ আঁধার হয়ে এল'—লক্ষণীয় যে, এখানে 'নদীর জলের' পর 'ও' ব্যবহার করা হয় নি। একাধিক পদগুচ্ছ ও উপবাক্যেও বিশেষ ক্ষেত্রে 'ও' ব্যবহারের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। যেমন—'রয়েছে কেবল আনন্দ—ঘুমের পরে জেগে উঠার আনন্দ, অন্ধকারের পরে আলো পাওয়ার আনন্দ, ফুলের মতো ফুটে উঠা, মালার মতো দুলে ওঠা, গানে গানে বাঁশির তানে জেগে উঠার আনন্দ।' (অবনীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২৯৯) 'রাজারাণীতে দেখা হল, রাজা আবার শকুন্তলাকে আদর করলেন, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন।' (অবনীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ১৯)

(ঝ) বাংলায় একই বাক্যে একই ভূমিকায় ব্যবহৃত একাধিক পদ শুধু যদি কমাচিহ্ন ও সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয় তবে তাদের মধ্যে শেষেরটির সঙ্গেই কারকের বিভক্তি-চিহ্ন বা বহুবচন-প্রত্যয় যোগ হয়। যেমন—'হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনরা ব্যাপকতর অর্থে হিন্দু বলেই পরিচিত।'—এখানে 'হিন্দু' 'বৌদ্ধ' ও 'জৈন'—এই তিনটি উদ্দেশ্য বাক্যে একই ভূমিকা পালন করছে, সেটা ক্রিয়ার কর্তার ভূমিকা, এখানে শুধু শেষেরটির সঙ্গে বহুবচন প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। তেমনি—'আমি অজয়, বিজয় ও সঞ্জয়কে নিয়ে এসেছি।' এখানে 'অজয়', 'বিজয়' ও সঞ্জয়' তিনটি পদ একই ভূমিকা—ক্রিয়ার কর্মের ভূমিকা—পালন করছে। এখানেও শুধু শেষ পদটির সঙ্গে কর্মকারকের বিভক্তি যোগ করা হয়েছে। তবে একই বাক্যে একই ভূমিকায় ব্যবহৃত পদগুলি যদি কমাচিহ্ন ও সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত না হয় বা যুক্ত হলেও তাদের মধ্যে অর্থগত পার্থক্যের উপরে জোর দেওয়া হয়, তবে সেই পদগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে বিভক্তিচিহ্ন বা বহুবচন-প্রত্যয় যোগ করা হয়। যেমন—'নোবেল পুরস্কার পাবার পর **দেশে বিদেশে** রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।' '**ছেলেদের** এবং মেয়েদের আলাদা কমনরুম চাই।'

(ঞ) কোনো ঘটনার ক্রমিক বিবৃতিতে পরপর যতগুলি ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় ইংরেজিতে তাদের কালগত সঙ্গতি (Sequence of Tense) রাখা হয়, বাংলায় এই কালগত সঙ্গতি সর্বদা থাকে না। যেমন—'পনের-ষোল বছর আগেকার কথা। বি. এ. পাস করিয়া কলিকাতায় বসিয়া আছি। বহু জায়গায় ঘুরিয়াও চাকুরী মিলিল না।' (—আরণ্যক)। এখানে লক্ষণীয় যে পনের-ষোল বছর আগেকার ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় বাক্যে বর্তমান কালের ক্রিয়া ('আছি') ব্যবহৃত হয়েছে। আবার তৃতীয় বাক্যের ক্রিয়ার সঙ্গে তার কোনো কালগত সঙ্গতি নেই, সেখানে অতীত কালের ক্রিয়া 'মিলিল' ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রত্যক্ষ উক্তির (Direct Narration) বাক্যকে যখন পরোক্ষ উক্তিতে (Indirect Narration) পরিবর্তিত করা হয় তখন ইংরেজিতে প্রধান বাক্যের ক্রিয়ার সঙ্গে গৌণ বাক্যের ক্রিয়ার যেরকম কালগত সঙ্গতি রক্ষা করা হয়, বাংলায় সেরকম সঙ্গতি রক্ষা করা হয় না। যেমন—প্রত্যক্ষ উক্তি :—সীতা রামকে বললেন—"আমিও তোমার সঙ্গে বনে যাবো।" পরোক্ষ উক্তি :—সীতা রামকে বললেন যে তিনিও রামের সঙ্গে বনে যাবেন। এখানে প্রধান বাক্যের ক্রিয়া 'বললেন' অতীত কালের ক্রিয়া ; অথচ গৌণ বাক্যের ক্রিয়া 'যাবেন' ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া। কিন্তু ইংরেজিতে পরোক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে দুই ক্রিয়ার মধ্যে কালগত সঙ্গতি রাখা হয়। যেমন—Sita said to Rama that she would also go to the forest with Rama. এখানে 'said' এবং 'would go' দু'টিই অতীত কালের ক্রিয়া।

(ট) বাংলায় বাক্য-সম্পর্কসূচক নিত্যসম্বন্ধযুক্ত পদযুগ্মের (Correlatives) মধ্যে একটি ব্যবহৃত হলে অন্যটিও সাধারণত ব্যবহার করতে হয়, নয়তো বাক্য অপূর্ণ থাকে। যেমন : যে—সে, যিনি—তিনি, যখন—তখন, যেমন—তেমন, ইত্যাদি। '**যে** পড়াশোনা করে **সে** পাস করে।' '**যেমন** কর্ম **তেমন** ফল'। কিন্তু আধুনিক বাংলায় অনেক সময় এই রকম পদযুগ্মের মধ্যে একটিই ব্যবহৃত হয়, অন্যটি উহ্য থাকে। যেমন—**যতদূর** চোখ যায়, ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, একটানা হলদে-ফুল-তোলা একখানা সুবিশাল গালিচা কে যেন পাতিয়া গিয়াছে।' (—আরণ্যক) এখানে 'সামনে' শব্দের পরে 'ততদূর' শব্দটি উহ্য। এই শব্দটি উহ্য রাখাতেই এখানে বাক্যটি যেন আরো স্বচ্ছন্দ হয়েছে। ইংরেজিতে এরকম একটি শব্দ প্রায়ই উহ্য থাকে। যেমন—'When the boy came the mother embraced him' এখানে came-এর পরে then কথাটি উহ্য থাকে।

(ঠ) বাংলা বাক্যে নির্দেশক ভাবে (Indicative Mood) নঞর্থক অব্যয় 'না', 'নি' ইত্যাদি সাধারণত সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন—'বাঙালিরা রুটি খায় না।'—এখানে **'না'** বসেছে

সমাপিকা ক্রিয়া 'খায়'-এর পরে। কিন্তু 'বাঙালিরা রুটি **না** খেয়ে দুর্বল হয়ে গেছে।'—এখানে **'না'** বসেছে অসমাপিকা ক্রিয়া 'খেয়ে'-র আগে। বিশেষ ক্ষেত্রে অনেকগুলি ক্রিয়া পরপর ব্যবহৃত হলে সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বা সমগ্র উপবাক্যেরই প্রথমে নঞর্থক অব্যয় ('না') বসতে পারে। যেমন—আজ যে তার কি হয়েছে জানি না, **না** খাচ্ছে, **না** পড়ছে, **না** কারো সঙ্গে কথা বলছে, শুধু জানালার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকছে।

নির্দেশক ভাব ছাড়া অন্যভাবের ক্রিয়া (যেমন—সর্তজ্ঞাপক ভাব Subjunctive Mood) হলে নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ারও আগে বসে। যেমন—'আমি যদি মুখ্যমন্ত্রী **না** হই তা হলে দেশের সেবা করব কি করে?'

নেতিমূলক বাক্যে যখন মূল বক্তব্যকে সামগ্রিক ভাবেই অস্বীকার করা হয় তখন বাংলায় সাধারণত নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বাক্যের শেষে বসে। যেমন—'আমি পড়ি **না**।' বাক্যের মূল বক্তব্য সামগ্রিক ভাবে অস্বীকার করলে জার্মান ভাষাতেও নঞর্থক অব্যয় বাক্যের শেষেই বসে। যেমন—Ich lese **nicht**। কিন্তু ইংরেজিতে আবার একটি গৌণ ক্রিয়া যোগ করা হয় এবং নঞর্থক অব্যয়টি গৌণ ক্রিয়ার পরে, মূল ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন—I do **not** read। বাংলায় এরকম কোনো গৌণ ক্রিয়া সাধারণত যোগ করা হয় না। এক্ষেত্রে জার্মানের সঙ্গে বাংলার গঠনগত সাদৃশ্য ও ইংরেজি থেকে পার্থক্যটি লক্ষণীয়। বাংলায় যৌগিক ক্রিয়ায় অবশ্য একটি গৌণ ক্রিয়া থাকে বলা যায়। কিন্তু সেটা শুধু নঞর্থক বাক্যেই নয়, ইতিবাচক বাক্যেও দেখা যায়। যেমন— 'আমি পাঠ করি।' 'আমি পাঠ করি না।'

বাক্যের মূল বক্তব্য সামগ্রিক ভাবে অস্বীকার না করে অংশবিশেষকে অস্বীকার করলে বাংলায় সাধারণত সেই অংশবিশেষের পরে নঞর্থক অব্যয় বসে, কিন্তু ইংরেজি ও জার্মানে তার আগে বসে। যেমন : বাংলায়—'আমি এসেছি ঘোড়ায় চড়ে **নয়,** পায়ে হেঁটে'। কিন্তু ইংরেজিতে—I came not on horse back, but on foot ; জার্মানে—Ich kam nicht zu Pferde, sondern zu Fuss.

অবশ্য এক্ষেত্রে বাংলায় বাক্যের বাঁধুনিটি শিথিল করে ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটালে ক্রিয়ার পরেও নঞর্থক অব্যয় বসানো হয়। যেমন—'আমি ঘোড়ায় চড়ে আসি নি ; পায়ে হেঁটে এসেছি'। কখনো কখনো এরকম প্রয়োগই বেশি স্বাভাবিক মনে হয়। যেমন—'আমি নোট পড়ি না, বই পড়ি।' এখানে 'আমি পড়ি নোট নয়, বই'—এরকম প্রয়োগ বাংলায় বেশি সংহত (precise) হলেও বহু-প্রচলিত নয়।

উপরে ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণ অনুযায়ী বাক্যতত্ত্বের যে পরিচয় দেওয়া হল

তাতে দেখা যাবে এক্ষেত্রে ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণেরও মূল দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিক নয়, বর্ণনামূলকই ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই আলোচনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে গভীরতা ও বাস্তবদর্শিতার অভাব দেখা যায়। এই ব্যাকরণে বাক্যতত্ত্ব সংক্রান্ত যেসব সূত্র রচনা করা হয়েছে সবক্ষেত্রে তা ভাষার বাস্তবরূপের সঙ্গে মেলে না। যেমন, ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণে অনেক সময় কর্মকে ক্রিয়ার সম্পূরক ধরা হয় এবং কর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়—যার উপরে ক্রিয়ার ফল বর্তায় তাকে কর্ম (object) বলে। "প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণে......কর্তাকে দেয়া হয় ক্রিয়ানিষ্পন্নকারীর ভূমিকা আর কর্মকে দেয়া হয় ক্রিয়াভোগীর ভূমিকা।" কিন্তু একজন আধুনিক বিশেষজ্ঞ অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন এমন একটি উদাহরণ যেখানে কর্মের এই সংজ্ঞাটি খাটে না।[৭৩] 'হাসান হাসিনাকে মেরেছে'—এই বাক্যে 'মারা' ক্রিয়ার ফল ভোগ করেছে 'হাসিনা', সুতরাং 'হাসিনা' কর্ম। এখানে সূত্রটি ঠিক মিলে যায়। কিন্তু 'হাসান হাসিনাকে ভয় পায়'—এই বাক্যে 'ভয় পাওয়া' ক্রিয়ার ফল হাসিনার উপর বর্তাচ্ছে না, বর্তাচ্ছে হাসানের উপরেই। অথচ আমরা জানি 'হাসিনা'ই এই বাক্যে কর্ম। সুতরাং এখানে ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণের কর্ম-সম্পর্কিত সূত্র বাস্তব প্রয়োগ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্বের এরকমের অনেক ত্রুটি ও ঘাটতির কথা আধুনিক গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন। আসলে বাংলার ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণ মূলত ইংরেজি বা সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে কল্পিত, বাংলা ভাষার বাস্তব বাক্য প্রয়োগকে বিশ্লেষণ করে তা থেকে বাংলা বাক্যতত্ত্বের সব সূত্র রচিত হয় নি। পক্ষান্তরে আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ভাষার বাস্তব রূপবিশ্লেষণ করে তা থেকে বাক্যতত্ত্বের সূত্র রচনা করে এবং তার সাহায্যে বাক্য-বিশ্লেষণ করে থাকে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের বাক্যতত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খ বাক্য-বিশ্লেষণে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। অবশ্য আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা বাক্যতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা এখনো করা হয়নি। বর্তমান গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে এরকম বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবও নয়। তা স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। পরবর্তী অধ্যায়ে আধুনিক বর্ণনামূলক বাক্যতত্ত্বের শুধু মূলসূত্র এবং তার আলোকে বাংলা বাক্য বিশ্লেষণের দু'একটি উদাহরণ দেওয়া হবে।

৭৩। হুমায়ুন আজাদ : 'প্রথাগত বাক্যতত্ত্ব' (বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ—চৈত্র, ১৩৮৯, পৃঃ ৪১—৪২)।

॥ ২৪ ॥

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে বাক্যতত্ত্ব ও বাংলা বাক্য
(Descriptive Syntax and Bengali Sentence)

বাক্য বিশ্লেষণ (Syntactic Analysis) :

ভাষা হল আমাদের মুখ থেকে নিঃসৃত অর্থযুক্ত ধ্বনির প্রবাহ। এই প্রবাহকে বিশ্লেষণ করে এর এককগুলিকে (units) চিহ্নিত করা, তাদের ভূমিকা ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করাই হল ভাষাবিজ্ঞানের কাজ। আমাদের বাক্-প্রবাহকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথম আমরা যে বৃহত্তম এককগুলি (units) পাই সেই এককগুলিই হল বাক্য। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে বাক্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে ভাষার বৃহত্তম স্বয়ংসম্পূর্ণ একক রূপে। ভাষার যে অবয়বটি (form) স্বয়ংসম্পূর্ণ, যে অবয়বটি অন্য কোনো বৃহত্তর অবয়বের অংশ নয়, তাকে বাক্য বলা হয়েছে। বাক্য হল "an independent form, not included in any larger (complex) linguistic form."[৭৪] অবশ্য একই অবয়ব কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থপ্রকাশ করে ; আবার কখনো তা অন্য অবয়বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার অংশ হয়ে যায়। যখন একটি অবয়ব স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থপ্রকাশ করে, তখন সেটিই একটি বাক্য। যখন তা অন্য অবয়বের মধ্যে যুক্ত হয়ে তার অংশ হয়ে যায় তখন তা একটি বৃহত্তর অবয়বের অংশমাত্র, তখন তা স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য নয়। যেমন—

'লজেন্স কে নেবে?'

'—আমি'।

এখানে দ্বিতীয় বাক্যে শুধু 'আমি' শব্দেই একটি পূর্ণ অর্থ প্রকাশিত, ক্রিয়াটি উহ্য। এখানে 'আমি' একাই একটা বাক্য। কিন্তু যদি বলি—'আমি আজ পড়াশোনা করব না', তাহলে এখানে 'আমি' হল একটা বড় অবয়বের অংশ, এটি একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য নয়। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুমফিল্ড্ অবয়বের এই ধরনের আপেক্ষিক সম্পূর্ণতার মানদণ্ডে অবয়বের দু'প্রকার অবস্থান নির্ণয় করেছেন—অন্তর্গত অবস্থান (Included position) ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থান (Absolute position)। যখন একটি অবয়ব একটি বৃহত্তর অবয়বের অংশমাত্র

৭৪। Bloomfield. Leonard : *'Language'*, Delhi : Motilal Banarsidass, 1963, p. 170.

হয়ে থাকে তখন বলা হয় সেটি বাক্যান্তর্গত অবস্থানে (Included position) আছে। যেমন—'আমি আজ পড়াশোনা করবো না' বাক্যের 'আমি'। আর যখন কোনো অবয়ব অন্য অবয়বের অংশ নয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ অবয়ব, তখন সেটি চরম বা স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থানে (Absolute position) রয়েছে বলা হয়। যেমন—

'লজেন্স কে নেবে?'

—'আমি'।

এখানে 'আমি' শব্দটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থানে আছে।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে বাক্যকে ভাষার বৃহত্তম একক (unit) ধরে তাকে ধাপে ধাপে ক্রমশ বৃহত্তর থেকে ক্ষুদ্রতর উপাদানে বিশ্লেষণ করা হয়। বাক্যের এই বিশ্লেষণে প্রথমেই কতকগুলি মূল ধারণা (concept) সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। এরকমের একটি মূল ধারণা হল গঠন (Construction)। খণ্ডিত বা পূর্ণ অর্থসমন্বিত যে-কোনো পদসমষ্টিকে বা রূপিম-সমষ্টিকে গঠন (Construction) বলা হয়। যেমন, 'মানুষ যখন যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতায় বিপন্ন তখন প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ এনে দিলেন বিভূতিভূষণ।' এই সমগ্র পদসমষ্টির মধ্যে একটি সম্পর্কের বন্ধন আছে এবং এর একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থ আছে ; এটি একটি বাক্য। এই সমগ্র বাক্যটি হল গঠন (Construction)। আবার—'মানুষ যখন যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতায় বিপন্ন'—এই পদসমষ্টির অর্থ পূর্ণাঙ্গ নয়, কিন্তু এরও একটা অর্থ আছে যদিও তা খণ্ডিত, এবং এর পদগুলির মধ্যেও পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। এই পদসমষ্টি একটি উপবাক্য (Clause)। এরকমের খণ্ডিত অর্থযুক্ত পদসমষ্টিও গঠন (Construction)। এর চেয়ে ক্ষুদ্র পদসমষ্টি হল 'যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতা'—এরও কিছু অর্থ আছে, যদিও তা আরো খণ্ডিত। এই রকম পদসমষ্টিকে আমরা পদগুচ্ছ (Phrase) বলি। এই রকম পদগুচ্ছকেও গঠন (Construction) বলে। সুতরাং ভাষাবিজ্ঞানে গঠন (Construction) কথাটি খুবই ব্যাপক অর্থ বহন করে। একাধিক শব্দ বা রূপিম নিয়ে যখনই কোনো খণ্ডিত বা পূর্ণ অর্থযুক্ত একক (unit) গড়ে উঠে তখনই তাকে গঠন (Construction) বলে। একটি মাত্র শব্দ বা রূপিমকে গঠন বলে না। গঠন হল—অর্থের সংহতিযুক্ত একাধিক শব্দ বা রূপিমের সমষ্টি। আবার একাধিক শব্দ একসঙ্গে নিলেই তাদের গঠন বলে না। দেখতে হবে তাদের মধ্যে অর্থগত সংহতি বা ঘনিষ্ঠতা আছে কিনা। উপরের বাক্য থেকে দু'টি শব্দ নিলাম—'যান্ত্রিকতা' ও 'মানুষ', এটা গঠন নয়, কারণ শব্দ দু'টির মধ্যে কোনো পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। কিন্তু 'যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতা' হল একটি গঠন। কারণ

এই শব্দ দু'টির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। যেসব অর্থপূর্ণ উপাদানে একটি গঠন (Construction) গড়ে উঠে সেইসব উপাদানকে গঠনগত উপাদান (Constituent) বলে। যেমন—উপরের বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করলে দু'টি বড় গঠনগত উপাদান পাই—'মানুষ যখন যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতায় বিপন্ন' এবং 'তখন প্রকৃতির স্নিগ্ধস্পর্শ এনে দিলেন বিভূতিভূষণ।' ইচ্ছা করলে বাক্যটিকে আরো ছোট ছোট অংশে ভাগ করতে পারি এবং একেবারে শেষে ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ এককগুলি পেতে পারি। যেমন—উপরের পূর্ণ বাক্যটিতে মোটামুটিভাবে 'যন্ত্রযুগ', যান্ত্রিকতা', 'মানুষ', ইত্যাদি শব্দগুলি হল ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক বা ক্ষুদ্রতম গঠনগত উপাদান। কারণ এই ক্ষুদ্রতম উপাদানগুলির সবকটিই অর্থপূর্ণ, কিন্তু এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর উপাদানকে আর বাক্যের স্তরে গঠনগত উপাদান বলা হয় না। যেমন—'মানুষ' কথাটিকে আরো ক্ষুদ্রতর উপাদানে ভাগ করা যায়—ম্ + আ + ন্ + উ + ষ্। কিন্তু এই ম্, আ, ন্, উ, ষ্-কে আর বাক্যের স্তরে গঠনগত উপাদান বলা যায় না, এগুলি শব্দের স্তরে গঠনগত উপাদান।

অর্থহীন একক ধ্বনিকে বাক্যের গঠনগত উপাদান বলা যায় না, ধ্বনি হল রূপিমের গঠনগত উপাদান। কিন্তু শব্দ, পদগুচ্ছ ও উপবাক্য বাক্যের গঠনগত উপাদান (Constituent) হতে পারে। আবার আগে বলা হয়েছে পদগুচ্ছ ও উপবাক্যকে গঠনও (Construction) বলা হয়। আসল কথা, গঠনগত উপাদান কথাটি আপেক্ষিক। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত যে-কোনো অর্থপূর্ণ শব্দসমষ্টি বা রূপিম-সমষ্টিই হল গঠন (Construction)। যখন কোনো গঠন একটি বৃহত্তর গঠনের অংশ, তখন সেইটাই সেই বৃহত্তর গঠনের গঠনগত উপাদান (Constituent)। সুতরাং পদগুচ্ছ, উপবাক্য একাধারে গঠন (Construction) এবং গঠনগত উপাদান (Constituent) হতে পারে। কিন্তু একটি সমগ্র বাক্য শুধুই গঠন (Construction), কারণ যেহেতু একটি সমগ্র বাক্য সেই বাক্যটির অংশ নয়, সেহেতু একটি সমগ্র বাক্য সেই বাক্যের গঠনগত উপাদান (Constituent) নয়। যেমন একটি গোটা মানুষকে সেই মানুষের অঙ্গ বলতে পারি না, তেমনি একটি গোটা বাক্যকে সেই বাক্যটির গঠনগত উপাদান বলা যায় না।

আমরা আগে বলেছি, বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে বাক্যকে ধাপে ধাপে ক্রমশ বৃহত্তর থেকে ক্ষুদ্রতর উপাদানে ভাগ করা হয়। যে কোনো গঠনকে প্রথম ধাপে আমরা যে দু'টি বা যে ক'টি বৃহত্তম অর্থপূর্ণ উপাদানে ভাগ করতে পারি তাদের 'অব্যবহিত গঠনগত উপাদান' (Immediate Constituent, বা সংক্ষেপে IC)

বলে। যেমন—'মানুষ যখন যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতায় বিপন্ন তখন প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ এনে দিলেন বিভূতিভূষণ'—এই বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করতে গেলে একে আমরা প্রথম ধাপে সবচেয়ে বড় যে দু'টি অংশে ভাগ করতে পারি তা হল—(১) 'মানুষ যখন যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতায় বিপন্ন' এবং (২) 'তখন প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ এনে দিলেন বিভূতিভূষণ।' ঐ বাক্যটিকে এর চেয়ে বড় উপাদানে আর ভাগ করা যায় না। এই বৃহত্তম উপাদান দু'টি হল সমগ্র বাক্যটির অব্যবহিত গঠনগত উপাদান (Immediate Constituent)। আবার যদি শুধু 'মানুষ যখন যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতায় বিপন্ন'—এই উপবাক্যটি আরো বিশ্লেষণ করতে যাই তাহলে একে দু'টি বৃহত্তম উপাদানে ভাগ করতে পারি—(১) 'মানুষ' এবং (২) 'যখন যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতায় বিপন্ন'। এখানে এই দু'টি হল উপবাক্যটির অব্যবহিত গঠনগত উপাদান (IC)। আবার যদি 'যখন যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতায় বিপন্ন' এই অংশটুকুই বিশ্লেষণ করি তাহলে একে দু'টি বৃহত্তম উপাদানে ভাগ করতে পারি—(১) 'যখন' এবং (২) 'যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতায় বিপন্ন'। এখানে এই দু'টিই হল 'যখন-যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতায় বিপন্নে'র অব্যবহিত গঠনগত উপাদান (IC)। কিন্তু মনে রাখতে হবে 'যখন' বা 'যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতায় বিপন্ন' সমগ্র বাক্যটির গঠনগত উপাদান (Constituent) হলেও এটি সমগ্র বাক্যটির অব্যবহিত গঠনগত উপাদান (Immediate Constituent) নয়। 'অব্যবহিত গঠনগত উপাদান' কথাটির অর্থ আপেক্ষিক। যে গঠনটি বিশ্লেষণ করা হয় তার বৃহত্তম উপাদানকে শুধু তারই অব্যবহিত গঠনগত উপাদান বলে ; তার চেয়ে বৃহত্তর গঠনের অব্যবহিত উপাদান নয়। পূর্বোক্ত সমগ্র বাক্যটিকে ৪৩নং চিত্রে ধাপে-ধাপে অব্যবহিত গঠনগত উপাদানে বিশ্লেষণ করে উপস্থাপিত করা হয়েছে পৃঃ ৪০৮।

মানুষ যখন যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতায় বিপন্ন তখন প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ এনে দিলেন বিভূতিভূষণ।

মানুষ যখন যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতায় বিপন্ন | তখন প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ এনে দিলেন বিভূতিভূষণ

মানুষ | যখন যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতায় বিপন্ন | তখন প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ এনে দিলেন | বিভূতিভূষণ

যখন | যন্ত্রযুগের যান্ত্রিতকতায় বিপন্ন | তখন | প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ এনে দিলেন

যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতায় | বিপন্ন | প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ | এনে দিলেন

যন্ত্রযুগের | যান্ত্রিতকতায় | প্রকৃতির | স্নিগ্ধ স্পর্শ | এনে | দিলেন

স্নিগ্ধ | স্পর্শ

চিত্র নং ৪৩

এভাবে বাক্যকে বৃহত্তর থেকে ধাপে ধাপে ক্রমশ ক্ষুদ্রতর গঠনগত উপাদানে বিশ্লেষণ করার ফলে শেষ ধাপে আমরা যে সব শব্দ পাই তাদের বাক্যের চরম গঠনগত উপাদান (Ultimate Constituent বা সংক্ষেপে UC) বলে। এই যে চরম গঠনগত উপাদান শব্দ, সেই শব্দ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করা বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পড়ে। এর পরে শব্দকেও আরো ক্ষুদ্রতর অর্থপূর্ণ এককে (রূপিম) বিশ্লেষণ করা রূপতত্ত্বের কাজ। তার চেয়েও ক্ষুদ্রতর এককে (ধ্বনি) বিশ্লেষণ করা ধ্বনিতত্ত্বের কাজ।

কোনো গঠনকে (Construction) অব্যবহিত গঠনগত উপাদানে (IC) বিশ্লেষণ করার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। গঠনকে কোন্ স্থানে কেটে একাধিক অব্যবহিত গঠনগত উপাদানে ভাগ করলে বিশ্লেষণটি ঠিক হল তা যাচাই করার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কাজে লাগে। যেমন—'অনুভূতি প্রবণ লোকেরা পল্লীপ্রকৃতিকে খুব ভালবাসে'। এই বাক্যটিকে অব্যবহিত গঠনগত উপাদানে বিশ্লেষণ করা খুবই শক্ত। মনে হবে যে এটি নানাভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যেমন—

১। অনুভূতিপ্রবণ লোকেরা / পল্লীপ্রকৃতিকে খুব ভালবাসে।

২। অনুভূতিপ্রবণ লোকেরা পল্লীপ্রকৃতিকে / খুব ভালবাসে।

৩। অনুভূতিপ্রবণ লোকেরা পল্লীপ্রকৃতিকে খুব / ভালবাসে।

৪। অনুভূতিপ্রবণ লোকেরা পল্লীপ্রকৃতিকে খুব ভাল / বাসে। ইত্যাদি।

উপরে বাক্যটিকে যে ধরনের গঠনগত উপাদানে ভাগ করা হল দেখতে হবে সেই ধরনের গঠনগত উপাদান আলোচ্য ভাষায় আর পাওয়া যায় কিনা। 'অনুভূতিপ্রবণ লোকেরা'—এই অংশটা আরো অনেক বাক্যেই পাওয়া যেতে পারে। যেমন—

অনুভূতিপ্রবণ লোকেরা মানুষকে ভালবাসে।
অনুভূতিপ্রবণ লোকেরা সহজে কষ্ট পায়।
অনুভূতিপ্রবণ লোকেরা কবিতা লেখে।

কিন্তু আমরা যদি 'অনুভূতিপ্রবণ লোকেরা পল্লীপ্রকৃতি'—এতটা অংশকে একটা অব্যবহিত গঠনগত উপাদান ধরি তবে এরকম উপাদানের ব্যবহার খুব কম পাওয়া যাবে। বড় জোর দু'টি বাক্যে—'অনুভূতিপ্রবণ লোকেরা পল্লীপ্রকৃতিকে ভালবাসে' এবং 'অনুভূতিপ্রবণ লোকেরা পল্লীপ্রকৃতিকে ভালবাসে না।' সুতরাং এই বিশ্লেষণটি ঠিক হল না। যেসব গঠনগত উপাদান একই রকম পরিবেশে বসতে পারে তাদের 'গঠনগত শ্রেণী' (Constituent class) বলে। যেমন আগের বাক্যগুলিতে 'প্রকৃতিকে ভালবাসে', 'মানুষকে ভালবাসে', 'সহজে কষ্ট পায়', 'কবিতা লেখে' ইত্যাদি। আরো দেখতে হবে, যে ক'টি অব্যবহিত গঠনগত উপাদান পাওয়া গেল তাদের যে-কোনোটি অনুরূপ পরিবেশে ঐ

ভাষায় বসে কিনা। যে ক'টি অব্যবহিত গঠনগত উপাদান পাওয়া যায় তাদের মধ্যে যে-কোনো একটিকে সরিয়ে তার বদলে একটিমাত্র শব্দ বসিয়ে দিলেও বাকি অব্যবহিত উপাদানটি তার সঙ্গে খাপ খেয়ে যাবে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীর মতে গঠনকে গঠনগত উপাদানে ভাগ করার এইটিই হল মূল নীতি :

"The principal criterion for the grouping of words into constituents is the possibility of syntactic substitution of a single word for the whole group while preserving the rest of the sentence structure intact."[৭৫]

একাধিক শব্দের সমন্বয়ে রচিত একটি গঠনগত উপাদানের বদলে যদি একটিমাত্র শব্দ বসিয়ে দিলেও বাক্যটির গঠন ঠিক থাকে অর্থাৎ যদি বাক্যটি ব্যাকরণের দিক থেকে অশুদ্ধ না হয় তবে বুঝতে হবে যে-সব গঠনগত উপাদানে বাক্যটিকে বিভক্ত করা হয়েছে সেইসব গঠনগত উপাদানে বাক্যটির বিভাজন ঠিকই হয়েছে। ছোট ছোট গঠনগত উপাদানের বদলে একটি করে শব্দ বসিয়ে গেলে ক্রমশ শেষ ধাপে বাক্যের বৃহত্তম অব্যবহিত গঠনের (IC) বদলেও একটিমাত্র শব্দ বসানো যায়।

উপরের এই সূত্রটি ৪৪নং চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

অনুভূতিপ্রবণ লোকেরা পল্লীপ্রকৃতিকে খুব ভালবাসে

<table>
<tr><td>অনুভূতিপ্রবণ</td><td>লোকেরা</td><td>পল্লীপ্রকৃতিকে</td><td>খুব</td><td>ভালবাসে</td></tr>
<tr><td colspan="2">কবিরা</td><td>পল্লীপ্রকৃতিকে</td><td colspan="2">ভালবাসে</td></tr>
<tr><td colspan="2">কবিরা</td><td colspan="3">ভালবাসে</td></tr>
</table>

চিত্র নং ৪৪

উপরের উদাহরণটি বিচার করা যাক—'অনুভূতিপ্রবণ লোকেরা পল্লীপ্রকৃতিকে খুব ভালবাসে।' এখানে প্রথম অব্যবহিত গঠনগত উপাদান 'অনুভূতিপ্রবণ লোকেরা'-এর স্থানে যদি একটিমাত্র শব্দ 'কবিরা' বসিয়ে দেওয়া যায় তা হলে গঠনগত দিক থেকে বাক্যটি ঠিকই থাকে। যেমন—'কবিরা / পল্লীপ্রকৃতিকে খুব ভালবাসে।' কিন্তু 'অনুভূতিপ্রবণ লোকেরা পল্লীপ্রকৃতি' এতখানি অংশকে একটা

৭৫। Robins, Prof. R. H. : *General Linguistics*, London : Longman, 1980, p. 178.

অব্যবহিত গঠনগত উপাদান ধরা যাবে না। কারণ এই অংশের বদলে কোনো একটিমাত্র শব্দ বসানো যায় না, অর্থাৎ এই অংশটুকুর গঠনগত ও অর্থগত সংহতি নেই, এটা একটা একক হতে পারে না।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের বাক্যতত্ত্বে বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির মধ্যে গঠনগত ও অর্থগত ঘনিষ্ঠতা অনুসারে ক্ষুদ্রতর থেকে আবার বৃহত্তর একককে সংবদ্ধ করা হয়। এই নীতি অনুসরণে বাক্যের অন্তর্গত পদগুলিকে পারস্পরিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা অনুসারে যেভাবে ক্ষুদ্রতর থেকে ক্রমশ বৃহত্তর গঠনগত উপাদানে (Constituent) সংবদ্ধ করা হয়, তা ৪৫নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

চিত্র নং ৪৫
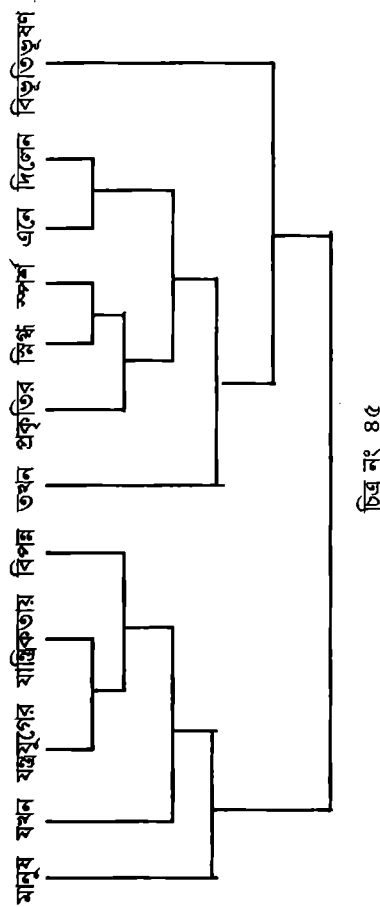
৪৫ নং চিত্রে ডানদিকের অংশে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে 'স্পর্শে'র সঙ্গে 'স্নিগ্ধ' শব্দটি সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ। কারণ 'স্নিগ্ধ' শব্দটি 'স্পর্শে'রই বিশেষণ, আর এই বিশেষণটি নিয়েই 'স্পর্শে'র স্বরূপটি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। এই জন্যে 'স্নিগ্ধ' ও 'স্পর্শ'-কে প্রথমে একটি পদগুচ্ছে এক করে পাওয়া গেল 'স্নিগ্ধ স্পর্শ'। এর পরের ধাপে দেখা যাচ্ছে এই স্নিগ্ধ স্পর্শের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে 'প্রকৃতি'র। সুতরাং দ্বিতীয় ধাপে 'প্রকৃতি' ও 'স্নিগ্ধ স্পর্শ'-কে মিলিয়ে বৃহত্তর পদগুচ্ছ পাওয়া গেল 'প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ'। এমনি করে শব্দগুলির মধ্যে সম্পর্কের আপেক্ষিক ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতেই শব্দগুলিকে ধাপে ধাপে যোগ করে এক-একটি পদগুচ্ছে (Phrase) মিলিত করা হয়েছে, তার পরে পদগুচ্ছগুলিকে মিলিত করে এক-একটি উপবাক্য (Clause) গড়ে তোলা হয়েছে এবং সবশেষে উপবাক্যগুলিকে যোগ করে বাক্য-গঠনটি (Sentence Construction) পাওয়া গেছে।

এইভাবে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের বাক্যতত্ত্বে বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার তারতম্য, দূরত্ব ও নৈকট্য সার্থকভাবে নির্দেশ করা হয়, কিন্তু এতে বাক্যের বন্ধনটি সার্থকভাবে বিশ্লেষিত হয় না। ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণে কর্তা, ক্রিয়া, কর্ম ইত্যাদি পদ-পরিচয়ের মাধ্যমে ক্রিয়ার সঙ্গে অন্যান্য পদের সম্পর্ক বা বাক্যের পদগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ এবং বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন পদের পৃথক পৃথক ভূমিকা যেমন সুন্দরভাবে বোঝানো যেত, বর্ণনামূলক বাক্যতত্ত্বের নিয়মে বাক্যের গঠন বিশ্লেষণ করে তেমন সুন্দরভাবে বোঝানো যায় না। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরাও অনুভব করছেন :

"একদিক দিয়ে প্রথাগত বাক্যচিত্র সাংগঠনিক চিত্রের চেয়ে অনেক উন্নত। প্রথাগত চিত্র বাক্যের বিভিন্ন অংশের ভূমিকা অস্পষ্ট ভাবে হলেও নির্দেশ করে, কিন্তু সাংগঠনিক বাক্যচিত্র তা করে না।"[৭৬] বর্ণনামূলক বাক্যতত্ত্বের এই ঘাটতিটুকু মনে থাকলে এ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হবার বিশেষ কারণ থাকে না, এবং ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্বের গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

বাক্যগঠনের প্রযুক্তি (Syntactic Devices) :

এতক্ষণ গঠনের (Construction) বিভিন্ন অংশ অনুসারে বাক্যের গঠনকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করার রীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এরপর বাক্যগঠনের প্রযুক্তি (Syntactic Devices) সম্পর্কে

৭৬। আজাদ, হুমায়ুন : 'প্রথাগত বাক্যতত্ত্ব' (বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ—চৈত্র, ১৩৮৯, পৃঃ ৫৭)

আলোচনা করা যাক। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক শব্দের সমন্বয়কে গঠন (Construction) বলে। গঠনের প্রকৃতি প্রধানত দু'রকম হতে পারে এবং সেই অনুসারে গঠনের দু'টি শ্রেণী নির্ণয় করা হয়েছে :

অন্তঃ-কেন্দ্রিক গঠন (Endocentric Construction) ও বহিঃ-কেন্দ্রিক গঠন (Exocentric Construction) : কখনো কখনো গঠনের (অর্থসম্বন্ধযুক্ত শব্দসমষ্টির) অন্তর্গত একটি বা একাধিক শব্দ সেই গোটা গঠনটির বদলে বসতে পারে এবং বসলেও বাক্যটি ব্যাকরণের দিক থেকে ভুল হয় না। এই ধরনের গঠনকে অন্তঃ-কেন্দ্রিক গঠন (Endocentric Construction) বলে। যেমন—'ভাল ছেলেরা পড়াশোনা করে।' এই বাক্যে 'ভাল ছেলেরা' হল পরস্পর অর্থসম্বন্ধ যুক্ত একটি শব্দসমষ্টি, সুতরাং এটি হল একটি গঠন (Construction)। এই গঠনের অন্তর্গত একটি শব্দ হল 'ছেলেরা', এই শব্দটিকে ঐ বাক্যের মধ্যে 'ভাল ছেলেরা'-র বদলে বসিয়ে দিলেও বাক্যটি ব্যাকরণের দিক থেকে ভুল হয় না ; শুধু তার অর্থের একটু হেরফের হয়। সুতরাং 'ভাল ছেলেরা পড়াশোনা করে'—এই বাক্যে 'ভাল ছেলেরা' হল একটি অন্তঃ-কেন্দ্রিক গঠন। আবার কখনো কখনো গঠনের অন্তর্গত শব্দগুলির মধ্যে এক বা একাধিক শব্দ ঐ গোটা গঠনের বদলে বসতে পারে না, বসলে বাক্যটি ব্যাকরণের দিক থেকে ভুল হয়ে যায়। সেই ধরনের গঠনকে বহিঃ-কেন্দ্রিক গঠন (Exocentric Construction) বলে। যেমন—'তুমি পড়ো' এই বাক্যটি একটি গঠন। এই বাক্যটিকে যদি সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্য ধরি তা হলে এর অন্তর্গত যে-কোনো একটি শব্দ এই গোটা গঠনটির বদলে বসতে পারে না, গোটা বাক্যটি বাদ দিয়ে তার জায়গায় এর একটিমাত্র শব্দ শুধু 'তুমি' বা 'পড়ো' বসিয়ে দিলে এটি বাক্যই হবে না। সুতরাং 'তুমি পড়ো' গঠনটি একটি বহিঃ-কেন্দ্রিক গঠন। অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে 'তুমি পড়ো' বাক্যটি অন্তঃ-কেন্দ্রিক গঠন হতে পারে। বাক্যটি যদি বিবৃতিমূলক না হয়ে আদেশমূলক হয় তবে এটি অন্তঃ-কেন্দ্রিক গঠন হতে পারে। কারণ আদেশমূলক বাক্যে বাংলায় কর্তা উহ্য থাকতে পারে। 'তুমি পড়ো' গঠনের বদলে যদি বলি 'পড়ো!' তা হলে শুধু একটি শব্দেই বাক্য হয়, সে ক্ষেত্রে 'তুমি পড়ো' গঠনের বদলে শুধু 'পড়ো' শব্দটি বসালেও একটিমাত্র শব্দেই বাক্য হয়। সুতরাং বাংলায় আদেশমূলক বা অনুজ্ঞাসূচক বাক্য 'তুমি পড়ো' একটি অন্তঃ-কেন্দ্রিক গঠন। কিন্তু বাক্যটি যদি বিবৃতিমূলক হয় তবে এটি বহিঃ-কেন্দ্রিক গঠন বলে বিবেচিত হবে। কারণ বিবৃতিমূলক বাক্যে 'তুমি পড়ো' —এই গোটা গঠনটির বদলে এর একটা শব্দ শুধু 'তুমি' বা 'পড়ো' বসালে সাধারণত বাক্যই হয় না। অবশ্য সংলাপে বা বিশেষ ক্ষেত্রে বাক্যের অংশবিশেষ

উহ্য থাকে তখন বাক্য অন্তঃ-কেন্দ্রিক হতে পারে। যেমন—

প্রশ্ন—কে যায়?

উত্তর—আমি।

এখানে উত্তরের বাক্যটি সংক্ষিপ্ত। পূর্ণবাক্য হবে—'আমি যাই।' এই 'আমি যাই' একটি অন্তঃ-কেন্দ্রিক গঠন। এসব বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া বাংলা, ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি ভাষায় সাধারণত সংক্ষিপ্ত, সরল বিবৃতিমূলক বাক্য হল বহিঃ-কেন্দ্রিক গঠন।

অন্তঃ-কেন্দ্রিক গঠন আবার দু'রকমের হতে পারে—সমানাধিকার-জ্ঞাপক (Co-ordinative) এবং অধীনতা-জ্ঞাপক (Sub-ordinative)। যখন কোনো অন্তঃ-কেন্দ্রিক গঠনের অন্তর্গত উপাদানগুলি সমান গুরুত্বসম্পন্ন, একটি উপাদান অন্যটির শুধু বিশেষণ-স্থানীয় শব্দ নয়, একটি অন্যটির অধীনস্থ উপাদান নয়, তখন সেই গঠনকে সমানাধিকার-সম্পন্ন (Co-ordinative) গঠন বলে। যেমন—'রাম ও সীতা হিন্দুদের কাছে আদর্শ চরিত্র'—এই বাক্যে 'রাম ও সীতা' এই গঠনটি দু'টি উপাদান নিয়ে রচিত—'রাম' ও 'সীতা'। এই দু'টি উপাদানের প্রত্যেকটি সমানাধিকার-সম্পন্ন, একটি অন্যটিকে বিশেষিত করার জন্যে আসে নি। এই গঠনের দু'টি উপাদানের মধ্যে কোনোটি প্রধান, কোনোটি অপ্রধান নয়, একটিকে বাদ দিয়ে শুধু অন্যটি বসালে বাক্যের গঠন বিপন্ন হবে না। যেমন—'রাম হিন্দুদের কাছে আদর্শ চরিত্র'—শুধু বাক্যই। 'রাম' ও 'সীতা'—এই দু'টি উপাদানই যদি নাও রাখা হয় তা হলেও বাক্যটি নির্ভুল হবে। এখানে দু'টি উপাদানের সমান গুরুত্ব, কিন্তু দু'টিই অপরিহার্য নয়, একটি হলেও চলবে। এখানে 'রাম ও সীতা' হল একটি সমানাধিকার-জ্ঞাপক গঠন। অন্যদিকে যখন কোনো অন্তঃ-কেন্দ্রিক গঠনের অন্তর্গত উপাদানগুলির মধ্যে একটি প্রধান, অন্যটি অপ্রধান, একটি অন্যটিকে শুধু বিশেষিত করার জন্যে বসে, একটি অন্যটির অধীনস্থ উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন সেই গঠনকে অধীনতা-জ্ঞাপক (Sub-ordinative) গঠন বলে। যেমন—'ভাল ছেলেরা পড়াশোনা করে'—এই বাক্যটিতে 'ভাল ছেলেরা' হল এমন একটি গঠন যার দু'টি উপাদান 'ভাল' এবং 'ছেলেরা'। কিন্তু এই দুটি উপাদানের মধ্যে 'ছেলেরা'ই হল প্রধান, 'ভাল' কথাটি গৌণ, সেটি এসেছে 'ছেলেরা'-কে বিশেষিত করার জন্যে। 'ভাল' কথাটি 'ছেলেরা' কথাটিরই অধীন একটি উপাদান মাত্র। এখানে 'ভাল ছেলেরা' গঠনটির বদলে শুধু 'ছেলেরা' বসিয়ে দিলেও বাক্যটির এমন কিছু অঙ্গহানি হয় না, বা বাক্যটি অশুদ্ধ হয়ে যায় না, বাক্যের গঠন একই থাকে, শুধু অর্থের সামান্য পরিবর্তন হয়। এখানে 'ভাল ছেলেরা' হল অধীনতা-জ্ঞাপক (Subordinative) গঠন। অধীনতা-জ্ঞাপক গঠনের উপাদানগুলিকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

যেটি প্রধান উপাদান তাকে শীর্ষ বা প্রধান (Head) উপাদান বলে এবং যেটি গৌণ বা বিশেষণ-স্থানীয় অংশ সেটিকে অধীনস্থ (Subordinate) উপাদান বলে। যেমন 'ভাল ছেলেরা'—এই গঠনে 'ছেলেরা' হল শীর্ষ বা প্রধান উপাদান এবং 'ভাল' হল অধীনস্থ উপাদান।

গঠনের শ্রেণীবিভাগ ৪৬ নং চিত্রের সাহায্যে সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। যেমন—
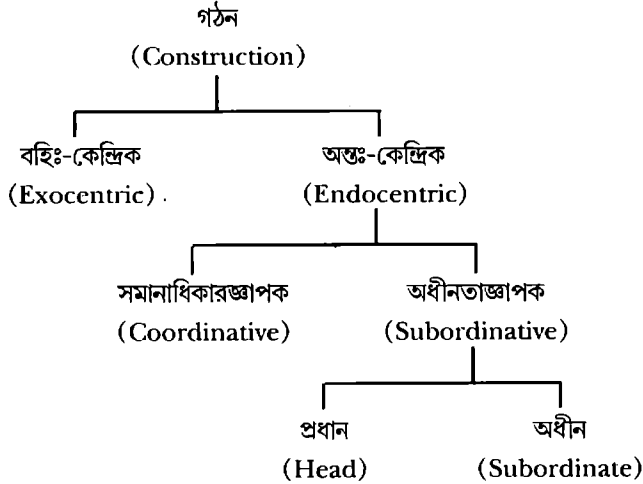
চিত্র নং ৪৬

সমানাধিকার সংযোগ (Coordination/Conjoining) ও অধীনস্থ সংযোগ (Subordination/Embedding) : ছোট বাক্যকে দীর্ঘ করার দু'রকমের প্রযুক্তি প্রচলিত আছে : (১) সমানাধিকার সংযোগ (Coordination/ Conjoining) এবং (২) অধীনস্থ সংযোগ (Subordination/Embedding).

(১) যখন দুই বা তার চেয়ে বেশি পদ, বাক্যাংশ বা বাক্যের সমান গুরুত্ব বজায় রেখে তাদের একসঙ্গে যোগ করা হয় তখন সেই প্রক্রিয়াকে সমানাধিকার সংযোগ (Coordination/Conjoining) বলে। যেমন—'রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ মানুষের পূর্ণতার সন্ধানী ছিলেন।' এখানে 'রবীন্দ্রনাথ মানুষের পূর্ণতার সন্ধানী ছিলেন' এবং 'শ্রীঅরবিন্দ মানুষের পূর্ণতার সন্ধানী ছিলেন' এই দু'টি বাক্যের সমান গুরুত্ব বজায় রেখেই বাক্য দু'টিকে যোগ করে দেওয়া হয়েছে।

দু'টি বা তার বেশি বাক্যকে একসঙ্গে যোগ করার জন্যে বাক্যগুলির মধ্যে যেটুকু অংশ একই রকম সেইটুকু অংশ একাধিক বার ব্যবহার না করে শুধু একবার ব্যবহার করা হয় এবং বাক্যগুলির মধ্যে যেটুকু অংশ পৃথক্ সেটুকু অংশ পরপর যোগ করে একটি বাক্য রচনা করা হয়। যেমন—'রবীন্দ্রনাথ মানুষের পূর্ণতার সন্ধানী ছিলেন' এবং 'শ্রীঅরবিন্দ মানুষের পূর্ণতার সন্ধানী ছিলেন।'—এই দু'টি বাক্যে একই রকম অংশ হল 'মানুষের পূর্ণতার সন্ধানী ছিলেন' এবং পৃথক্ অংশ হল 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'শ্রীঅরবিন্দ'। এই দু'টি পৃথক্ অংশকে সংযোগমূলক অব্যয়ের সাহায্যে যোগ করে একই রকম অংশকে একবার মাত্র ব্যবহার করা হয়েছে। সমানাধিকার সংযোগ বাক্যের কর্তা, ক্রিয়া বা অন্য যে-কোনো অংশে হতে পারে। যেমন—

(অ) শুধু কর্তা পৃথক্, অন্য অংশ একই, এমন দু'টি বাক্য :

(ক) রবীন্দ্রনাথ মানুষের পূর্ণতার সন্ধানী ছিলেন।

(খ) শ্রীঅরবিন্দ মানুষের পূর্ণতার সন্ধানী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ	মানুষের পূর্ণতার সন্ধানী ছিলেন।

(আ) কর্তা একই, অন্য অংশ পৃথক্, এমন দু'টি বাক্য :

(ক) শ্রীঅরবিন্দ মানুষের পূর্ণতার সন্ধানী ছিলেন।

(খ) শ্রীঅরবিন্দ এই পূর্ণতার সন্ধান করেছিলেন যোগের পথে।

শ্রীঅরবিন্দ	মানুষের পূর্ণতার সন্ধানী ছিলেন, (কিন্তু) এই পূর্ণতার সন্ধান (তিনি) করেছিলেন যোগের পথে।

(ই) কর্তা পৃথক্, বাকি অংশের কিছুটা অংশ একই, কিছুটা পৃথক্, এমন তিনটি বাক্য :

(ক) রবীন্দ্রনাথ মানুষের পূর্ণতার সন্ধান করেছিলেন নান্দনিক সৌন্দর্য-সাধনার পথে।

(খ) শ্রীঅরবিন্দ মানুষের পূর্ণতার সন্ধান করেছিলেন যৌগিক সাধনার পথে।

(গ) কার্ল্ মার্ক্স্ মানুষের পূর্ণতার সন্ধান করেছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে।

রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ (ও) কার্ল্‌মার্ক্‌স্	মানুষের পূর্ণতার সন্ধান করেছিলেন (যথাক্রমে)	নান্দনিক-সৌন্দর্য সাধনার যৌগিক সাধনার ও রাজনৈতিক আন্দোলনের	পথে

সমানাধিকার সংযোগে যে পৃথক্ অংশগুলি যোগ করা হয় তাদের সংযোগের রীতি বিভিন্ন ভাষায় পৃথক্ হতে পারে। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় সংযুক্ত পৃথক্ অংশগুলি দুয়ের বেশি হলে সাধারণত শেষেরটির আগে সংযোগমূলক অব্যয় ব্যবহার করা হয় আর বাকিগুলির মাঝখানে কমা ব্যবহার করা হয়। যেমন—

'রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ও কার্ল্ মার্ক্স্ মানুষের পূর্ণতার সন্ধানী ছিলেন।'

বাংলা ভাষার এই রীতির স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়বে যদি আমরা সংস্কৃতের সঙ্গে তার তুলনা করি। সংস্কৃতে কমা ব্যবহার করা হয় না, প্রত্যেকটি সংযুক্ত অংশের পরে সংযোগমূলক অব্যয় ব্যবহার করা হয়। যেমন—'রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ ভরতশ্চ বনম্ অগচ্ছন্'। আরো লক্ষণীয় যে, বাংলায় দু'টি সংযুক্ত অংশের মাঝখানে সংযোগমূলক অব্যয় বসে। যেমন—রাম ও লক্ষ্মণ ; কিন্তু সংস্কৃতে দু'টি উপাদানের মাঝখানে নয়, দুয়ের পরে অব্যয়টি বসে। যেমন—রাম লক্ষ্মণশ্চ।

(২) একাধিক পদ, বাক্যাংশ বা বাক্য যোগ করে বাক্যকে দীর্ঘতর করার দ্বিতীয় প্রযুক্তিটি হল অধীনস্থ সংযোগ (Subordination) বা অন্তর্বিন্যাস (Embedding)। এক্ষেত্রে যে দুই বা ততোধিক পদ, বাক্যাংশ বা বাক্যকে যোগ করা হয় তারা সমান গুরুত্বসম্পন্ন হয় না, একটি প্রধান হয়, অন্যটি তাকেই বিশেষিত করার জন্যে বা তার বক্তব্যকে আরো স্পষ্ট করার জন্যে যুক্ত হয়। যেমন—'যে নেতারা আন্দোলনের পথে যুবকদের এগিয়ে দেন, তাঁদেরই কেউ কেউ পুলিশে গুলি চালালে আগে পালিয়ে যান।' এখানে 'যে নেতারা আন্দোলনের পথে যুবকদের এগিয়ে দেন', অংশটি যোগ করা হয়েছে 'তাঁদেরই কেউ কেউ' কর্তার বিশেষণ রূপে। এই যুক্ত অংশটি 'তাঁদেরই কেউ কেউ' পুলিশে গুলি চালালে আগে পালিয়ে যান'—এই অংশটির সঙ্গে সমান গুরুত্বসম্পন্ন নয়। এরকমের সংযোগকে অধীনস্থ সংযোগ (Subordination) বা অন্তর্বিন্যাস (Embedding) বলে। যে মূল অংশকে বিশেষিত করার জন্যে কিছু পদ বা বাক্যাংশ যোগ করা হয় তাকে প্রধান অংশ (Head) বলে, আর যে

অংশটি যোগ করা হয় তাকে গুণবাচক অংশ (Attribute) বলে। আর যে মূল বাক্যাংশের মধ্যে গুণবাচক অংশটি যোগ করা হয় তাকে 'আধাতৃ বাক্যাংশ' (Matrix Clause) বলে। উপরের উদাহরণে 'তাঁদেরই কেউ কেউ' হল প্রধান, 'যে নেতারা আন্দোলনের পথে যুবকদের এগিয়ে দেন' হল গুণবাচক অংশ এবং 'তাঁদেরই কেউ কেউ' পুলিশে গুলি চালালে আগে পালিয়ে যান' হল 'আধাতৃ বাক্যাংশ' (Matrix Clause)।

প্রতিস্থাপন (Substitution) ও প্রতিরূপ (Pro-form) : পৃথিবীর অনেক ভাষাতেই বাক্যগঠনের প্রযুক্তির মধ্যে প্রতিস্থাপন (Substitution) একটি বহুপ্রচলিত প্রক্রিয়া। পরপর কয়েকটি বাক্যে বা একটি দীর্ঘ বাক্যের বিভিন্ন অংশে একই পদ, বাক্যাংশ বা উপবাক্য বারবার ব্যবহার না করে তার বদলে অন্য কোনো পদ বা সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশ ব্যবহার করাকে বলে প্রতিস্থাপন (Substitution)। যেমন—'রামচন্দ্র বনে গেলেন' ; 'রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্বতে বাস করতে লাগলেন।'—এই দু'টি বাক্যে 'রামচন্দ্র' পদটি দু'বার ব্যবহার করা হয়েছে। এরকম একই পদ দু'বার ব্যবহার না করে আমরা বলি 'রামচন্দ্র বনে গেলেন। তিনি চিত্রকূট পর্বতে বাস করতে লাগলেন।' এখানে এই যে 'রামচন্দ্রে'র বদলে 'তিনি' পদটি ব্যবহার করা হয়েছে, এই প্রক্রিয়াকে বলে প্রতিস্থাপন। আর প্রতিস্থাপনে মূল পদ, বাক্যাংশ বা উপবাক্যের বদলে যে অংশটি বসে তাকে প্রতিরূপ (Pro-form) বলা হয়। প্রচলিত ব্যাকরণে উল্লিখিত সর্বনাম হল এই রকমের একটি প্রতিরূপ। তবে সর্বনাম হল এমন পদ যা শুধু নামপদ বা বিশেষ্যের বদলে বসে। কিন্তু প্রতিরূপের মধ্যে সর্বনাম পড়লেও প্রতিরূপের প্রয়োগ অনেক ব্যাপক। ক্রিয়ারও প্রতিরূপ ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন—

—'তুমি কি রাজনীতি করা পছন্দ করো?'

—'না করি না।'

এখানে উত্তর-বাক্যে শুধু 'করা' ক্রিয়াটি 'পছন্দ করা'র প্রতিরূপ হিসাবে, ব্যবহৃত। আবার 'তোমার স্ত্রী খুব ঝগড়াটে মহিলা, আমার স্ত্রী তেমনটি নন।' এখানে 'ঝগড়াটে মহিলা'র প্রতিরূপ হল 'তেমনটি'। প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়ায় প্রতিরূপ ব্যবহারের রীতি অল্পবিস্তর প্রায় সব ভাষাতেই প্রচলিত।

প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় (Substitution) দীর্ঘতর গঠনটির বদলে যে সংক্ষিপ্ত গঠনটি বসে তাকে **স্থলাভিষিক্ত রূপ** (Substitute) বলে। যেমন—আগের

উদাহরণ দু'টিতে 'করি' ও 'তেমনটি' হল স্থলাভিষিক্ত রূপ (Substitute)।

বাক্যের মধ্যে কিছু কিছু এমন শব্দ ব্যবহৃত হয় সাধারণত যাদের নিজস্ব অর্থের বিশেষ গুরুত্ব থাকে না, কিন্তু যারা বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শব্দ (বিশেষ্য, ক্রিয়া ইত্যাদি), বাক্যাংশ ইত্যাদির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে, অথবা বাক্যের গঠন সুস্পষ্ট করার জন্যে এমনিতেই ব্যবহৃত হয় ; এই রকমের শব্দকে বলে **প্রকার্য শব্দ** (Function word)। আর প্রকার্য শব্দ যাদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ বা সম্বন্ধ প্রকাশ করে তাদের বলে **পূর্ণার্থ শব্দ** (Content word)। যেমন—'তুমি ও আমি পড়াশোনা করি, কিন্তু বাদল করে না।' এখানে 'আমি পড়াশোনা করি', 'তুমি পড়াশোনা করো', 'বাদল পড়াশোনা করে না' এই তিনটি বাক্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে দু'টি অব্যয় 'ও' এবং 'কিন্তু'। এখানে এই দু'টি হল প্রকার্য শব্দ। ইংরেজিতে 'The House of Commons is a forum of democracy'—এই বাক্যটিতে 'House' ও 'Commons' শব্দের মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশ করেছে 'of', তেমনি 'forum' ও 'democracy'-র মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশ করেছে 'of'। এই বাক্যে দু'টি 'of' শব্দ হল দু'টি প্রকার্য শব্দ। সাধারণত প্রচলিত ব্যাকরণে যাদের Preposition, Conjunction, Interjections, Post-position ইত্যাদি বলা হয়, সেগুলি প্রকার্য শব্দের মধ্যে পড়ে। এছাড়া ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় যেসব article এবং বাংলায় যেসব আশ্রিত নির্দেশক (টি, টা, খানা, খানি) ব্যবহৃত হয় সেগুলিও প্রকার্য শব্দ। জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় এসব প্রকার্য শব্দের স্বতন্ত্র অর্থ বিশেষ থাকে না, তবু বিশেষ্যের সঙ্গে এদের ব্যবহার অপরিহার্য। পৃথক্ পৃথক্ লিঙ্গ ও বচনে পৃথক্ পৃথক্ article সুনির্দিষ্ট। আবার কোনো-কোনো ভাষায় এগুলি ব্যবহার না করলে অনেক সময় অর্থই অস্পষ্ট থাকে। এগুলি অর্থকে স্পষ্ট-চিহ্নিত করে দেয় বলে এদের **স্পষ্টনির্দেশক** (Determiner) বলে। যেমন—'লোকের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করা ভাল নয়', 'লোকটির সঙ্গে বেশি মেলামেশা করা ভাল নয়'। প্রথম বাক্যে 'লোক' জাতি বোঝাচ্ছে। দ্বিতীয় বাক্যে 'টি' যোগ করার ফলে বিশেষ করে একটি লোককে বোঝাচ্ছে। এখানে 'টি' স্পষ্ট-নির্দেশকের কাজ করছে। কিছু কিছু এমন প্রকার্য শব্দ আছে যাদের সুস্পষ্ট অর্থ বিশেষ থাকে না, কিন্তু এগুলি ব্যবহার না করলে অনেক সময় অর্থ অস্পষ্ট থেকে যায় বা বাক্যের গঠন পূর্ণাঙ্গ হয় না। যেমন—There was a book on the table। এখানে 'There' শব্দটি একটি প্রকার্য শব্দ। এর

নিজস্ব কোনো সুস্পষ্ট অর্থ নেই, কিন্তু এটি না থাকলে বাক্যের গঠন পূর্ণাঙ্গ হয় না।

সঙ্গতি (Concord) ও **নিয়ন্ত্রণ** (Government) : একাধিক শব্দের সংযোগে যে গঠন (Construction) রচিত হয় তার রূপটি নির্ভুল হওয়ার জন্যে দু'টি সর্ত পালিত হওয়া দরকার। সর্ত দু'টি হল সঙ্গতি (Concord/ Congruence/Agreement) এবং নিয়ন্ত্রণ বা নিয়মন (Government/ Rection)। গঠনের অন্তর্গত উপাদানগুলির মধ্যে কাল (Tense), কারক (Case), পুরুষ (Person), বচন (Number), লিঙ্গ (Gender) প্রভৃতি ব্যাকরণিক সংবর্গের (Grammatical Category) দিক থেকে যে মিল থাকে তাকে সঙ্গতি বা অন্বিতি বা অন্বয় (Concord/Congruence/ Agreement) বলা হয়। যেমন—'আমি যাই'। 'তুমি যাও।' এখানে প্রথম বাক্যটিতে 'আমি' উত্তম পুরুষের সর্বনাম, 'যাই' উত্তম পুরুষের ক্রিয়া। এখানে 'আমি' ও 'যাই' এই দু'টি উপাদানের মধ্যে পুরুষের দিক থেকে যে মিল আছে তা-ই হল সঙ্গতি। তেমনি দ্বিতীয় বাক্যটিতে 'তুমি' মধ্যম পুরুষের সর্বনাম, আর 'যাও' মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া। এখানে 'তুমি' ও 'যাও'-এর মধ্যে পুরুষের দিক থেকে যে মিল আছে তা-ই হল সঙ্গতি। যে-সব ভাষায় পুরুষ অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপ পৃথক্ হয় সে-সব ভাষায় কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার এই সঙ্গতি না থাকলে গঠন অশুদ্ধ হয়ে যায়। যেমন—বাংলায় 'আমি'-র সঙ্গে 'যাও' ক্রিয়াটির পুরুষের দিক থেকে সঙ্গতি নেই। তাই 'আমি যাও' বাংলায় অশুদ্ধ গঠন। অবশ্য সব ব্যাকরণিক সংবর্গ অনুসারে সংহতি সব ভাষায় প্রযোজ্য নাও হতে পারে। যেমন —হিন্দিতে লিঙ্গ অনুসারেও ক্রিয়ার রূপ পৃথক্ হয় বলে হিন্দিতে কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার লিঙ্গের দিক থেকে সঙ্গতি থাকা দরকার। যেমন—পুং :—'রাম পঢ়তা হ্যায়', স্ত্রী :—'সীতা পঢ়তী হ্যায়'। কিন্তু বাংলা, ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় লিঙ্গ-ভেদে ক্রিয়ার রূপ পৃথক্ হয় না বলে লিঙ্গের দিক থেকে কর্তা ও ক্রিয়ার মধ্যে সঙ্গতি গঠনশুদ্ধির সর্ত নয়।

নিয়ন্ত্রণ বা নিয়মন (Government/Rection) বলতে বোঝায় একটি গঠনের (Construction) অন্তর্গত একটি শব্দের রূপনিয়ন্ত্রণে সেই গঠনেরই অন্তর্গত অন্য শব্দের প্রভাব। এখানে দু'টি শব্দের মধ্যে সঙ্গতি থাকে না, সঙ্গতির প্রশ্নও উঠে না, শুধু একটি শব্দ অন্য শব্দের রূপ নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন—'রামকে দিয়ে' এবং 'রামের দ্বারা' এই দু'টি গঠন লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রথমটিতে

'দিয়ে' অনুসর্গ 'রাম' শব্দের রূপ নিয়ন্ত্রিত করছে—'দিয়ে' শব্দটি আছে বলেই 'রাম' শব্দের রূপ হয়েছে 'রামকে'। আর দ্বিতীয় গঠনটিতে 'দ্বারা' শব্দ আছে বলে 'রাম' শব্দটির রূপ হয়েছে 'রামের'। প্রথম গঠনটিতে 'দিয়ে' ও ' দ্বিতীয় গঠনটিতে 'দ্বারা' শব্দ 'রাম' শব্দের রূপ নিয়ন্ত্রিত করছে। বাংলায় এখানে দেখা যাচ্ছে অনুসর্গ (Post-position) পূর্ববর্তী শব্দের বিভক্তিচিহ্ন নিয়ন্ত্রিত করছে। তেমনি জার্মান ভাষায় দেখা যায় পুরঃসর্গ (Preposition) পরবর্তী শব্দের রূপ নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন—nach dem Hause (ঘরের কাছে), ausserhalb des Hauses (ঘরের বাইরে)। প্রথম গঠনটিতে nach (কাছে) পুরঃসর্গটির প্রভাবে Haus শব্দের রূপ হয়েছে সম্প্রদান কারকের রূপ Hause। আর দ্বিতীয় গঠনে ausserhalb (বাইরে) পুরঃসর্গটির প্রভাবে Haus শব্দের রূপ হয়েছে সম্বন্ধপদের রূপ Hauses। এখানে পুরঃসর্গ (Preposition) পরবর্তী শব্দের রূপ নিয়ন্ত্রিত করছে।

বর্ণনামূলক বাক্যতত্ত্বের আলোচনায় বাক্যবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা যেমন দেখেছি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণেই তার বীজ ছিল এবং কোনো কোনো বিষয়ে ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণের বিশ্লেষণ অধিকতর গ্রহণীয়, তেমনি বাক্য গঠনের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেখি বর্ণনামূলক বাক্যতত্ত্বের অনেক মূল ধারণার (Concept) বীজ ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণেই ছিল। যেমন, প্রতিরূপের ধারণার সঙ্কীর্ণ হলেও প্রাথমিক অঙ্কুর পাই ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণের সর্বনামে, প্রকার্য শব্দের ধারণার ইঙ্গিত পাই পুরঃসর্গ (Preposition), অনুসর্গ (Post-position) ইত্যাদিতে, সঙ্গতির অনুরূপ ধারণা পাই 'আসত্তি'তে।

বর্ণনামূলক বাক্যতত্ত্ব অনেক নতুন ধারণা ও সূক্ষ্মবিশ্লেষণের পরিচয় দেয় ঠিকই, কিন্তু ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্বের অবদানও কম নয়, অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণেই বর্ণনামূলক ব্যাকরণের বীজ নিহিত ছিল।

॥ ২৫ ॥

ভাষার বর্ণনামূলক/রূপতত্ত্বানুগত/বাক্যরীতিগত/প্ররূপগত শ্রেণীবিভাগ (Descriptive/Morphological/Syntactic/Typological Classification)

পৃথিবীতে প্রায় চার হাজার ভাষা প্রচলিত আছে। পৃথিবীর এইসব ভাষাকে প্রধানত চার রকম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়। শ্রেণীবিভাগের এই চার রকম দৃষ্টিভঙ্গি হল—

(১) বর্ণনামূলক / রূপতত্ত্বানুগত / বাক্যরীতিগত / প্ররূপগত (Descriptive/Morphological/Syntactic/Typological)

(২) ঐতিহাসিক / বংশানুগত (Historical/Genealogical)

(৩) ভৌগোলিক / আঞ্চলিক (Geographical/Regional)

(৪) জাতিভিত্তিক (Racial)

ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস অনুসন্ধান করে পৃথিবীর কোন্ ভাষা পূর্ববর্তী কোন্ ভাষা থেকে জন্মলাভ করেছে সেইটা নির্ণয় করে ভাষার বংশ অর্থাৎ জন্ম-উৎস অনুসারে ভাষাগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করলে তাকে বংশানুগত বা ঐতিহাসিক শ্রেণীবিভাগ (Genealogical/Historical Classification) বলে। কিন্তু বিভিন্ন কালের ধারায় ভাষার বিবর্তনের যে ইতিহাস, তার দিকে দৃষ্টিপাত না করে, তার জন্ম-উৎসের অনুসন্ধান না করে, যখন আমরা পৃথিবীর ভাষাগুলিকে শুধুই একটি কোনো নির্দিষ্ট কালের গঠন ও সাদৃশ্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করি তখন সেই শ্রেণীবিভাগকে বলে বাক্যরীতিগত বা রূপতত্ত্বানুগত বা প্ররূপগত বা বর্ণনামূলক—(Syntactical/Morphological/Typological/Descriptive) শ্রেণীবিভাগ। এছাড়া কোন্ ভাষার ভৌগোলিক অবস্থান কি, অর্থাৎ কোন্ ভাষা কোথায় প্রচলিত তার উপরে ভিত্তি করে অঞ্চল অনুসারে ভাষার যে শ্রেণীবিভাগ করা হয় তাকে বলে ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক শ্রেণীবিভাগ (Geographical/Regional Classification)। আবার বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির উৎসের উপরে ভিত্তি করে ভাষার যে শ্রেণীবিভাগ করা হয় তাকে জাতিগত শ্রেণীবিভাগ (Racial Classification) বলে। এই চাররকম শ্রেণীবিভাগের মধ্যে শুধু ঐতিহাসিক (বংশানুগত) ও বর্ণনামূলক (রূপতত্ত্বানুগত) শ্রেণীবিভাগই ভাষাবিজ্ঞানে বহু-আলোচিত বিষয়। অন্য দু'প্রকার শ্রেণীবিভাগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে ভাষার বংশানুগত শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে জাতিগত শ্রেণীবিভাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় ভাষার বংশানুগত শ্রেণীবিভাগ আলোচনায় জাতিগত শ্রেণীবিভাগের প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই স্থান পায়।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পূর্ববর্তী ১১শ থেকে ২৪শ অধ্যায়ে করা হয়েছে। এইভাবে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হবার পরে ভাষার বর্ণনামূলক শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। এটা বিস্ময়ের কথা যে, যখন বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়নি, ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান যখন বিকাশের পথে সেই ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাষার বর্গীকরণের পদ্ধতির সূচনা হয়েছিল। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে শ্লেগেল্ (August Von Schlegel) যে Typological Classification-এর সূত্রপাত করেছিলেন তা থেকেই পরে এই রীতি বিকাশ লাভ করে।

ভাষার বর্ণনামূলক শ্রেণীবিভাগ প্রধানত ভাষায় বাক্যগঠনের রীতি ও শব্দরূপ-ধাতুরূপ ইত্যাদি রচনার বৈশিষ্ট্যের উপরে ভিত্তি করে করা হয়। যেসব ভাষার মধ্যে বাক্যগঠনরীতিতে ও শব্দরূপ-ধাতুরূপ ইত্যাদির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাদৃশ্য আছে তাদের একটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়। এই পদ্ধতিতে পৃথিবীর ভাষাগুলিকে সর্বপ্রথমে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় :

(১) জৈববন্ধনহীন / অসমবায়ী / আশ্লেষহীন / বিচ্ছিন্নতাধর্মী / অবস্থান-নির্ভর ভাষা (Inorganic/Isolating/Positional Language)

(২) জৈববন্ধনযুক্ত / সমবায়ী / আশ্লেষযুক্ত ভাষা (Organic/Non-isolating Language)

(১) জৈববন্ধনহীন / অসমবায়ী ভাষা :

জৈববন্ধনহীন বা অসমবায়ী ভাষায় বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কজ্ঞাপক কোনো বিভক্তিচিহ্ন ব্যবহৃত হয় না, শব্দগুলি যেন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ; বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির মধ্যে কোন্‌টি কর্তা, কোন্‌টি কর্ম ইত্যাদি পদ-পরিচয় প্রকাশ পায় বিভক্তিচিহ্ন দিয়ে নয়, বাক্যের মধ্যে তাদের অবস্থান দিয়ে। এই শ্রেণীর ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল চীনা ভাষা। এই ভাষা থেকে একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। উত্তর-চীনের পেইচিং (পিকিং)-কেন্দ্রিক আদর্শ চীনা (Standard Chinese) ভাষায়—

Wó	Dá	Nĭ
ওর্অ	র্তা	র্নি
আমি	মারি	তোমাকে

এই বাক্যটিতে Wó হল কর্তা, Nĭ হল কর্ম। এই দু'টি শব্দে কর্তৃকারক বা কর্মকারকের কোনো বিভক্তিচিহ্নই যুক্ত হয় নি। এই ভাষার নিয়ম অনুসারে যে

শব্দটি বাক্যের প্রথমে বসেছে সেটি কর্তৃকারকের পদ, যেটি শেষে বসেছে সেটি কর্মকারকের পদ, এরকম ধরে নেওয়া হল। সুতরাং এই পদ দু'টির অবস্থান যদি উল্টে দেওয়া যায় তাহলে এদের পদ-পরিচয়ও পাল্টে যাবে এবং বাক্যের অর্থও একেবারে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। যেমন—

Ní	Dá	Wŏ
র্নি	র্ডা	ওঅঁ
তুমি	মারো	আমাকে

এই জাতীয় ভাষায় বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির মধ্যে বিভক্তিজনিত কোনো পারস্পরিক বন্ধন নেই বলে এই জাতীয় ভাষাকে জৈববন্ধনহীন ভাষা বা বিচ্ছিন্নতা ধর্মী ভাষা বলা হয়।

(২) জৈববন্ধনযুক্ত / সমবায়ী ভাষা

জৈববন্ধনযুক্ত বা সমবায়ী ভাষায় (Organic/Non-isolating Language) বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশ করা হয় প্রধানত শব্দের মধ্যে কোনো আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধন করে বা শব্দের সঙ্গে বিভক্তিচিহ্ন ইত্যাদি যোগ করে। বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির মধ্যে কোন্‌টি কর্তা, কোন্‌টি কর্ম ইত্যাদি বোঝা যায় প্রধানত এইসব বিভক্তিচিহ্ন ইত্যাদির সাহায্যে। এই শ্রেণীর ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল—তুর্কি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন ইত্যাদি ভাষা। সংস্কৃত থেকে একটি উদাহরণ দিলে এই শ্রেণীর ভাষার বৈশিষ্ট্য সহজে বোঝা যাবে। যেমন—

অহম্	ত্বাম্	প্রহরামি
আমি	তোমাকে	মারি

—এই বাক্যের কর্তা 'অহম্' এবং কর্ম 'ত্বাম্'। এদের স্থান পরিবর্তন করে দিলেও এরাই যথাক্রমে কর্তা এবং কর্ম থাকবে, বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হবে না। যেমন—

ত্বাম্	অহম্	প্রহরামি
তোমাকে	আমি	মারি।

পৃথিবীতে এই শ্রেণীর ভাষার সংখ্যাই বেশি। বাংলাও মূলত এই শ্রেণীতেই পড়ে, যদিও বাংলাতে জৈববন্ধনহীন ভাষার বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু এসে যাচ্ছে। জৈববন্ধনযুক্ত বা সমবায়ী ভাষাগুলি আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত :

(ক) সর্বসমবায়ী বা অবিচ্ছিন্ন গঠনযুক্ত ভাষা (Incorporating/ Polysynthetic/Holophrastic Language)

(খ) যৌগিক সমবায়ী বা যৌগিক গঠনযুক্ত ভাষা (Agglutinating Language)

(গ) সমন্বয়ী সমবায়ী ভাষা (Inflecting/Inflexional/ Amalgamating/Synthetic Language)

সর্বসমবায়ী (Incorporating) ভাষা : পৃথিবীর যে ভাষাগুলিতে বাক্যের অন্তর্গত পদগুলি থেকে অপ্রধান অংশ বাদ দিয়ে বিভিন্ন পদের প্রধান অংশগুলিকে একসঙ্গে যুক্ত করে একটি অবিচ্ছিন্ন পদে পরিণত করা হয়, সেই ভাষাগুলিকে অবিচ্ছিন্ন গঠনযুক্ত বা সর্বসমবায়ী ভাষা (Incorporating/ Polysynthetic/Holophrastic Language) বলে। এই ভাষায় বাক্য অধিকাংশ সময় একপদী বাক্য হয়ে দাঁড়ায়। গ্রীন্‌ল্যাণ্ডীয় ভাষা এই শ্রেণীতে পড়ে। এই ভাষার একটি প্রচলিত উদাহরণ হল—aulisariartorasuarpok (আউলিসারিআরতোরাসুআরপোক্)। এই বাক্যের অর্থ 'সে মাছ ধরতে ছুটে যায়'। এই বাক্যটি কতকগুলি পদের প্রধান অংশ একসঙ্গে যোগ করে গঠিত হয়েছে। যেমন—aulisar = মাছ ধরা, peartor = কোনো বিষয়ে নিযুক্ত হওয়া, pinnesuarpok = সে ছুটে যায়। লক্ষ্য করার বিষয় যে, এইসব পদের সবটা বাক্যের মধ্যে গ্রহণ করা হয়নি। প্রথম পদটি সবটা নেওয়া হয়েছে, তারপর peartor পদের শুধু artor অংশটি নেওয়া হয়েছে, আর pinnesuarpok পদের শুধু suarpok অংশটুকু নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কিছু কিছু ধ্বনির আগম হয়েছে। এইভাবে সব মিলিয়ে একপদের একটি গোটা বাক্য রচিত হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে এই শ্রেণীর ভাষা প্রচলিত। অবিচ্ছিন্ন গঠনযুক্ত বা সর্বসমবায়ী (Incorporating Language) ভাষাকে কেউ কেউ সম্পূর্ণ ও আংশিক ভেদে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যে ভাষাগুলিতে বাক্যের সব পদ মিলে একপদে পরিণত হয় সেগুলিকে বলেছেন সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন গঠনযুক্ত বা সম্পূর্ণ-সর্বসমবায়ী (Completely Incorporating) ভাষা। যেমন—পূর্বোক্ত গ্রীনল্যাণ্ডীয় ভাষা। আর যে ভাষাগুলিতে বাক্যের কিছু কিছু পদ একসঙ্গে মিলে এক একটি দীর্ঘ পদে পরিণত হয় তাদের তাঁরা আংশিক অবিচ্ছিন্ন গঠনযুক্ত বা আংশিক সর্বসমবায়ী (Partially Incorporating) ভাষা বলেছেন। যেমন—বাস্ক্ (Basque)।

এই শ্রেণীর অবিচ্ছিন্ন গঠনযুক্ত ভাষা ছাড়া অন্য শ্রেণীর ভাষাতেও বাক্যের দু'একটি পদকে বা পদগুচ্ছকে একসঙ্গে যোগ করে একপদে পরিণত করার

রীতি দেখা যায়। যেমন—ইংরেজি Can not = Can't। জার্মান in dem = im। ফরাসি n'est-ce pas (অর্থাৎ is it not?) = 'spas, বাংলা—যা ইচ্ছা তাই = যাচ্ছেতাই। এগুলি সর্বসমবায়ী ভাষা না হলেও সর্বসমবায়ী ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য এগুলিতে দেখা যায়।

যৌগিক সমবায়ী (Agglutinatinating) ভাষা : এই শ্রেণীর ভাষাতেও শব্দগুলিকে বা রূপিমগুলিকে পরপর যুক্ত করে দেওয়া হয়। মনে হতে পারে সর্বসমবায়ী ও যৌগিক সমবায়ী ভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু সর্বসমবায়ী ও যৌগিক সমবায়ী ভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে। দু'দিক থেকে পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন ভাষাতত্ত্ববিদ্ ইরাখ্ জাহাঙ্গীর সোরাব্‌জী তারাপুরওয়ালা। প্রথমত, সর্বসমবায়ী ভাষার মতো যৌগিক সমবায়ী ভাষায় বাক্যের সব শব্দকে একসঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয় না, মাত্র দু'চারটি শব্দ বা রূপিম একসঙ্গে যোগ করা হয়। দ্বিতীয়ত, যৌগিক সমবায়ী ভাষায় যে শব্দ বা রূপিমগুলিকে একসঙ্গে যোগ করা হয় তাঁদের অংশবিশেষ বাদ দিয়ে শুধু প্রধান অংশগুলিকে যোগ করা হয় না, তাদের অখণ্ড রেখেই যোগ করা হয়, তাছাড়া তাদের এমন করে একসঙ্গে যোগ করা হয় যাতে তাদের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সহজেই বোঝা যায়। তুর্কি ভাষা এই শ্রেণীর ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যৌগিক সমবায়ী ভাষায় যে উপাদানগুলি যোগ করা হয় তাদের ভিত্তিতে যৌগিক সমবায়ী ভাষাকে আবার তিনটি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন—উপসর্গ-যৌগিক (Prefix-agglutinating/Juxta-positional), পরসর্গ-যৌগিক (Suffix-agglutinating) এবং অন্তঃসর্গ-যৌগিক (Infix-agglutinating)।

উপসর্গ-যৌগিক সমবায়ী ভাষায় শব্দের আদিতে উপসর্গ যোগ করে প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদির অর্থ প্রকাশ করা হয়। যেমন—কাফ্রি (Kafir) ভাষায় umuntu = একজন লোক (umu = একবচন বাচক উপসর্গ), abantu = একাধিক লোক (aba বহুবচন বাচক উপসর্গ)। আফ্রিকার বাণ্টু বংশের ভাষাগুলি এই শ্রেণীতে পড়ে।

পরসর্গ-যৌগিক ভাষায় শব্দের শেষে পরসর্গ বা প্রত্যয়-বিভক্তি যোগ করা হয়। যেমন—কন্নড় ভাষায় sevaka-ru = সেবকগণ (ru = কর্তৃকারকের বহুবচনের বিভক্তি), sevaka-rannu (rannu = কর্মকারকের বহুবচনের বিভক্তি)। দ্রাবিড় বংশের ভাষাগুলি এই শ্রেণীতে পড়ে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত কোনো কোনো ভাষায় আবার উপসর্গ ও পরসর্গ দুই যোগ করার রীতি আছে। এগুলিকে তাই Prefix-suffix-aggluting language বা উপসর্গ-পরসর্গ-যৌগিক ভাষা বলা যায়। অন্তঃসর্গ-যৌগিক ভাষায় শব্দের আদিতে বা অন্তে নয়, শব্দের মাঝখানে প্রত্যয়, বিভক্তি

ইত্যাদির অর্থবাচক রূপিম যোগ করা হয়। যেমন—তুর্কি ভাষায়—sev-mek = 'ভালবাসা' (ক্রিয়া)। এর সঙ্গে নঞর্থক অব্যয় me যোগ করলে হবে sev-me-mek = ভাল না বাসা। পারস্পরিক ক্রিয়া বোঝাবার জন্যে ish যোগ করলে হবে sev-ish-mek = পরস্পরকে ভালবাসা।

সমন্বয়ী সমবায়ী ভাষা (Inflecting/Inflexional/Amalgamating/ Synthetic Language) : সমন্বয়ী সমবায়ী ভাষায় বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির পদপরিচয় (Parts of Speech) এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশ করার জন্যে (উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি) যেসব রূপিম যোগ করা হয় সেগুলি মূল শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে যায়। ফলে যৌগিক সমবায়ী ভাষায় সংযুক্ত অংশগুলির স্বতন্ত্র সত্তা যেমন স্পষ্ট করে চেনা যায়, সমন্বয়ী ভাষায় সে রকম স্পষ্ট করে চেনা যায় না। যেমন—সংস্কৃতে মূল শব্দ সেবক + বহুবচনে কর্তৃকারকের বিভক্তি জস্ (অঃ) = সেবকাঃ। সেবক + বহুবচনে কর্মকারকের বিভক্তি শস্ (অ) = সেবকান্। এখানে 'সেবকাঃ' ও 'সেবকান্' শব্দে বিভক্তিগুলি এমন মিশে গেছে যে তাদের পৃথক্ সত্তা চেনাই যায় না। কিন্তু আগে কন্নড় ভাষা থেকে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তাতে মূল শব্দ ও বিভক্তির স্বতন্ত্র সত্তা স্পষ্টত দৃশ্যমান। সংস্কৃত হল সমন্বয়ী সমবায়ী ভাষা আর কন্নড় হল যৌগিক সমবায়ী ভাষা। উপরের উদাহরণ থেকে সমন্বয়ী সমবায়ী ও যৌগিক সমবায়ী ভাষার মধ্যে পার্থক্য সহজেই বোঝা যায়।

সমন্বয়ী সমবায়ী ভাষাতে উপসর্গ, পরসর্গ, অন্তঃসর্গ ত্রিবিধ উপাদানই যোগ করা হয়। যে ভাষাগুলিতে শব্দ বা ধাতুর আদিতে বা অন্তে নয়, তার অভ্যন্তরে কোনো ধ্বনি যোগ করে অর্থের পরিবর্তন সাধন করা হয় যেগুলিকে আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনধর্মী সমন্বয়ী (Dynamically varying) ভাষা বলে। যেমন আরবি ভাষায় ধাতু qtl-এর মধ্যে a-a যোগ করে হল qatal = সে নিহত করল, u-i-a যোগ করে পেলাম qutila = সে নিহত হল, i যোগ করে পেলাম qitl = শত্রু। যেসব ভাষায় শব্দের অভ্যন্তরে নয়, আদিতে বা অন্তে উপসর্গ বা পরসর্গ যোগ করে পদ গঠন করা হয় তাদের বলা হয় আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনহীন (Dynamically unvarying language) ভাষা। সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি ভাষা এই শ্রেণীতে পড়ে। সংস্কৃত থেকে একটি উদাহরণ দিলে এই শ্রেণীর ভাষার বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে। সংস্কৃত 'হৃ' ধাতুর সঙ্গে উপসর্গ 'প্র' এবং পরসর্গ 'ঘঞ্' যোগ করে পেলাম 'প্রহার' ; তার সঙ্গে একটি উপসর্গ 'উপ' যোগ করে পেলাম 'উপহার।' ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের ভাষাগুলিতে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। উপরে ভাষার বর্ণনামূলক বর্গীকরণ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হল তা সংক্ষেপে ৪৭ নং চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে—

বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে
ভাষার শ্রেণী
অসমবায়ী / জৈববন্ধনহীন / বিশ্লেষণাত্মক
(Inorganic/Isolating/Analytic/Positional)
যেমন—চীনা ভাষা
সমবায়ী / জৈববন্ধনযুক্ত
(Organic/Non-isolating)
সর্বসমবায়ী / অবিচ্ছিন্ন বাক্যগঠনযুক্ত
(Incorporating / Polysynthetic
Holophrastic)
যৌগিক গঠনযুক্ত / যৌগিক সমবায়ী
(Agglutinating)
সমন্বয়ী সমবায়ী / সংশ্লেষণাত্মক
(Inflecting/Inflexional
Amalgamating/Synthetic)
আংশিক সমবায়ী
(Partially
Incorporating)
যেমন—বাস্ক্ ভাষা
সম্পূর্ণ সমবায়ী
(Completely
Incorporating)
যেমন—গ্রীনল্যাণ্ডীয় ভাষা
আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনধর্মী
(Dynamically
varying)
যেমন—আরবি ভাষা
আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনধর্মী
(Dynamically
unvarying)
যেমন—সংস্কৃত, গ্রীক ভাষা
উপসর্গ-যৌগিক
(Prefix-agglutinating)
যেমন—কাফ্রি ভাষা
পরসর্গ-যৌগিক
(Suffix-agglutinating)
যেমন—কন্নড় ভাষা
অন্তঃসর্গ যৌগিক
(Infix-agglutinating)
যেমন—তুর্কী ভাষা

চিত্র নং ৪৭

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

॥ ২৬ ॥

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান : পর্ব ও পদ্ধতি

(Historical Linguistics : the Periods and the Methods)

আগেই বলা হয়েছে (পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ২৮-২৯) ভাষার বিবর্তনের যে অতীত ইতিহাস তার দু'ইটি পর্ব : প্রাগৈতিহাসিক (prehistoric) এবং ঐতিহাসিক (historic)। ভাষার ঐতিহাসিক পর্বের বিবর্তন-ধারা অধ্যয়নের প্রধান পদ্ধতি হল লিখিত তথ্য প্রমাণ (written record) বিশ্লেষণ করা ; প্রাচীন পুঁথি, প্রত্নলিপি ইত্যাদি হল এখানে প্রধান সম্বল। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক পর্বের বিবর্তন-ধারা বিশ্লেষণের জন্যে এসব সম্বল পাওয়া যায় না। সেখানে ভাষার অতীত রূপ যুক্তির সাহায্যে অনুমানে গড়ে তোলা হয়। ভাষার পরিবর্তনের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে এই পরিবর্তনের যেসব সূত্র আবিষ্কার করা হয় সেই সূত্রের উপরে ভিত্তি করে ভাষার প্রাগৈতিহাসিক পর্বের রূপটি অনুমানে গড়ে তোলার পদ্ধতিকে পুনর্গঠন (Reconstruction) বলে। আর এইভাবে ভাষার যে রূপটি গড়ে উঠে তাকে পুনর্গঠিত রূপ (Reconstructed Form) বলে। এই রূপটি গড়ে তোলার চারটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে :

(ক) আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন (Internal Reconstruction),

(খ) বাহ্য পুনর্গঠন বা তুলনামূলক পদ্ধতি (External Reconstruction or Comparative Method)

(গ) উপভাষাগত ভূগোল (Dialect Geography) এবং

(ঘ) শব্দের অবক্ষয় ও নতুন শব্দ সৃষ্টি বিষয়ক পরিসংখ্যান (Glotto-chronology or Lexico-statistics)।

ভাষাতত্ত্ববিদ্ হকেট্ (Hockett) এই চারটিকে ভাষার প্রাগৈতিহাসিক তত্ত্ব (Linguistic Pre-history) নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে এগুলি হল ভাষার ইতিহাস অধ্যয়নের পরোক্ষ পদ্ধতি (indirect technique)। প্রাগৈতিহাসিক পর্বের ভাষার রূপ ও ইতিহাস অধ্যয়নের এইগুলিই হল প্রধান পদ্ধতি। এইগুলির মধ্যে প্রথম দু'টি পদ্ধতিই সমধিক প্রচলিত ও মোটামুটি নির্ভরযোগ্য। শেষ দু'টি পদ্ধতির নানা ত্রুটি ও ঘাটতি থাকায় প্রাগৈতিহাসিক পর্বের ভাষার ইতিহাস অধ্যয়নের জন্যে এ দু'টি বিশেষ নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বলে বিবেচিত হয় নি এবং ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি।

॥ ২৭ ॥

আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন

(Internal Reconstruction)

যুগ ও জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। পরিবর্তনের পথে এগিয়ে যেতে গিয়ে ভাষা বিভিন্ন পর্বে তার পূর্বরূপের কিছু চিহ্ন রেখে যায়। পরে এইসব চিহ্ন বিশ্লেষণ করে আমরা যখন ভাষার অতীতের রূপটি অনুমানে রচনা করে তুলি তখন সেই পদ্ধতিকে বলে আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন (Internal Reconstruction)। ভাষাতত্ত্ববিদ্ হকেট্ এই পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে যা বলেছেন তা তাঁরই ভাষায় তুলে দেওয়া যাক—

> "...some events in the history of a language leave discernible traces in its design, so that by finding these traces one can draw inferences as to the earlier incidents which are responsible for them".[১]

এই পদ্ধতিকে পুনর্গঠনের পদ্ধতি (method of reconstruction) বলার তাৎপর্য এই যে, এতে যে উপাদানের সাহায্য নেওয়া হয় সেটা অতীতের প্রাপ্ত লিখিত তথ্যাদি হলেও এর সাহায্যে আরো অতীতের ভাষার অপ্রাপ্য রূপটি নতুন করে গড়ে নেওয়া হয়। আর একে আভ্যন্তরীণ পদ্ধতি বলার তাৎপর্য এই যে, এই পদ্ধতিতে শুধু একটি ভাষার নিজের ভিতরের চিহ্ন ধরে তার অতীতের রূপটি অনুমানে গড়ে তোলা হয়, সেই ভাষার বাইরে অন্য ভাষার উপাদানের সাহায্য নেওয়া হয় না বা অন্য ভাষার সঙ্গে তুলনা করা হয় না। অন্যদিকে বাহ্য পুনর্গঠন বা তুলনামূলক পদ্ধতিতে শুধু একটি ভাষার নিজের ভিতরে প্রাপ্ত উপাদানগুলিই বিচার করা হয় না, সেই ভাষার বাইরে অন্য ভাষারও বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং তার সাহায্যে সেইসব ভাষার জন্ম-উৎস-স্বরূপ অতীতের সাধারণ রূপটি সম্বন্ধে অনুমান করা হয়। আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন ও বাহ্য পুনর্গঠনের (অর্থাৎ তুলনামূলক পদ্ধতির) মধ্যে এই পার্থক্য সর্বজন-পরিচিত :

> "When the evidence is from one language (or dialect) and the inference is to an earlier stage of it, the work is known as internal reconstruction. When the evidence is from two or more dialects or languages

---

১ । Hockett, Charles F. : *A Course in Modern Linguistics,* 1968, p. 463.

and the inference is to an earlier ancestral language, one usually speaks of comparative method"[২]

আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের পদ্ধতিতে একটি ভাষার আভ্যন্তরীণ তথ্যের উপরে ভিত্তি করে সেই ভাষার প্রাচীনতর রূপটি কিভাবে গড়ে তোলা হয় তা একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন—ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্যস্তরে পালি ভাষায় আমরা পাচ্ছি 'ধম্ম' ও 'সব্ব' শব্দ। এগুলির পূর্বরূপ আমরা প্রাচীন স্তরে পাচ্ছি যথাক্রমে 'ধর্ম' ও 'সর্ব'। 'ধর্ম' থেকে 'ধম্ম' এবং 'সর্ব' থেকে 'সব্ব'—এই যে পরিবর্তন এ থেকে আমরা ধ্বনি-পরিবর্তনের একটি সূত্র খাড়া করেছি, তার নাম সমীভবন। এখন, আমরা ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্যস্তরে পালিতে যদি 'বগ্গ' শব্দটি পাই এবং এর প্রাচীন রূপ যদি আমাদের জানা না থাকে, তা হলে অনুমান করতে পারি যে এই 'বগ্গ' শব্দটিও নিশ্চয়ই সমীভবনের ফলে এই রূপ লাভ করেছে এবং এই ভাষার আভ্যন্তরীণ অন্যান্য দৃষ্টান্তের (যেমন ধর্ম > ধম্ম, সর্ব > সব্ব) সঙ্গে মিলিয়ে আমরা 'বগ্গ' শব্দের পূর্বতন রূপ পুনর্গঠিত করতে পারি—'বর্গ'। 'বগ্গ' শব্দের প্রাচীনতর রূপ যে 'বর্গ' সেটা অবশ্য প্রাপ্ত লিখিত প্রমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু যেসব শব্দের প্রাচীনতর রূপ পাওয়া যায় না, সেসব শব্দের প্রাচীনতর রূপগুলিও এইভাবে আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের পদ্ধতির সাহায্যে গড়ে নেওয়া হয়। এইভাবে ভাষার প্রাগৈতিহাসিক পর্বের রূপ গড়ে তোলা হয়।

কিন্তু এইভাবে কোনো কোনো শব্দের পূর্বরূপ সব সময় সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা যায় না। যেমন—'সুত্ত' শব্দটির পূর্বরূপ 'সূত্র' না 'সূক্ত' তা বলা যাবে না, কারণ সমীভবনের নিয়মে 'সূত্র' থেকে 'সুত্ত' আসতে পারে, আবার 'সূক্ত' থেকেও 'সুত্ত' আসতে পারে। সুতরাং আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের পদ্ধতিতে ভাষার পূর্ব রূপ সব সময় সঠিকভাবে গঠন করা যায় না। আবার আর একটি উদাহরণ বিচার করা যাক। বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দ 'সফল', 'সবল' ও 'সজল' বিশ্লেষণ করে দেখা যায় 'ফল', 'বল' ও 'জল' শব্দের অর্থ আমাদের জানা, এগুলির মধ্যে প্রত্যেকটি শব্দের নিজস্ব অর্থ আছে। এগুলির মধ্যে প্রত্যেকটিই হল স্বতন্ত্র নিটোল শব্দ। এইগুলিই হল মূল শব্দ, আর এদের সঙ্গে 'স'- যোগ করে পরে 'সফল', 'সবল' ও 'সজল' শব্দ তৈরি করা হয়েছে। এভাবে ভাষার আভ্যন্তরীণ নিজস্ব শব্দের মধ্যে তুলনা করে তাদের মূলরূপ সম্বন্ধে অনুমান করা যায়।

২। *International Encyclopaedia of Social Sciences,* ed. by Sills, David L., Macmillan Co. & The Free Press, Vol. 9. (Article on 'Linguistics').

এটাই হচ্ছে আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের পদ্ধতি। কিন্তু এ পদ্ধতি সর্বদা সঠিক সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় না, সুতরাং সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। যেমন—আমরা যদি 'সধবা' ও 'বিধবা' শব্দ দু'টি বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসি যে, 'ধবা' হল মূল শব্দ এবং এর সঙ্গে যথাক্রমে 'স-' ও 'বি-' যোগে হচ্ছে 'সধবা' (যার স্বামী জীবিত আছে) এবং 'বিধবা' (যার স্বামী বিগত হয়েছে) তা হলে আমাদের সিদ্ধান্ত ভুল হবে। কারণ বিশেষজ্ঞরা গবেষণা করে দেখেছেন, 'ধবা' বলে কোনো মূল শব্দই ছিল না। সুতরাং কোনো ভাষার আভ্যন্তরীণ তথ্যের উপরে ভিত্তি করে তার মূল রূপ বা পূর্বরূপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সর্বক্ষেত্রে নিরাপদ নয়। এইজন্যে আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের পদ্ধতি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি নয়। তাই এই পদ্ধতিকে অতীত রূপ পুনর্গঠনের ব্যাপারে একমাত্র নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ না করে ভাষার অতীত রূপ সম্পর্কিত লিখিত তথ্য যেখানে পাওয়া যায় সেখানে আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের পদ্ধতিকে অতিরিক্ত সহায়ক পদ্ধতি হিসাবে প্রয়োগ করা উচিত। আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের মতো পরোক্ষ পদ্ধতির সাহায্যে যে তথ্য পাওয়া যাবে তাকে লিখিত প্রমাণের সাহায্যে যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে। লিখিত প্রমাণের সাহায্যে সব তথ্য সংগ্রহ করা যায় না, কারণ লিখিত পুঁথি, শিলালেখ ইত্যাদিতে একটি ভাষার সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে সব তথ্য থাকবেই এমন কোনো কথা নেই। লিখিত প্রমাণের সঙ্গে পরিপূরক পদ্ধতি হিসাবে আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন-পদ্ধতির প্রয়োগ করা যেতে পারে ; এর ফলে যে তথ্য লিখিত নেই তা আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের পদ্ধতির সাহায্যে পাওয়া যেতে পারে, এবং ভাষার পূর্ণাঙ্গ রূপটি ধরা পড়তে পারে।

॥ ২৮ ॥

বাহ্য পুনর্গঠন বা তুলনামূলক পদ্ধতি
(External Reconstruction or Comparative Method)

এই পদ্ধতি এক কথায় ব্যাখ্যা করে ভাষাতত্ত্ববিদ্ লেম্যান্ বলেছেন—তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে আমরা দুই বা ততোধিক সম্পৃক্ত ভাষার রূপের মধ্যে তুলনা করে তাদের সঠিক সম্পর্ক নির্ণয় করি। এই সম্পর্ক নির্ণয় করার জন্যে আমরা ভাষার এমন পূর্বতন রূপ পুনর্গঠন করি যে রূপটি থেকে পরবর্তী রূপগুলি জন্মলাভ করেছে :

> "In using the comparative method we contrast forms of two or more related languages to determine their precise relationship. We indicate this relationship most

simply by reconstructing the forms from which they developed."[৩]

কিন্তু লেম্যানের এই ব্যাখ্যায় স্ববিরোধ লক্ষণীয়। পৃথিবীতে যেসব ভাষা প্রচলিত আছে, তাদের মধ্যে কোন্ ভাষাটি কোন্ ভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ত (related) তা জানার জন্যেই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে, যতক্ষণ আমরা এই পদ্ধতির প্রয়োগ না করছি ততক্ষণ কোন্ ভাষার সঙ্গে কোন্ ভাষা সম্পৃক্ত তা আমরা জানি না। কিন্তু লেম্যান বলেছেন দুই বা ততোধিক সম্পৃক্ত ভাষার রূপের মধ্যে তুলনা করা হয়। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, তুলনা করার আগেই আমরা কি করে জেনে নেবো যে, কোন্ দুই ভাষার মধ্যে সম্পর্ক আছে? আসলে দু'টি ভাষা সম্পৃক্ত কিনা তা আগে থেকে জানার উপায় নেই। সেটা না জেনেই দুই বা ততোধিক ভাষার মধ্যে তুলনা শুরু করা হয় ; তারপরে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য চোখে পড়লে ভাষা দু'টি পরস্পর-সম্পৃক্ত অনুমান করা হয়। তারপরে আরো তথ্য সংগ্রহ করে তা যাচাই (verify) করা হয়। তাতে সম্পর্কটি যদি প্রমাণিত হয় তা হলে ভাষাগুলির মধ্যে জন্মসূত্রগত (genealogical) সম্পর্ক নির্ণীত হয়। যে মূলনীতির উপরে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা তা ড. সুকুমার সেন বরং আরো সহজ করে ব্যাখ্যা করেছেন : "একই পর্যায়ের কিংবা স্তরের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যদি শব্দকোষে যথেষ্ট সাম্য এবং ব্যাকরণে যথোপযুক্ত মিল দেখা যায়, অথবা একাধিক ভাষার পূর্বতন রূপ যদি একই প্রকারের হয়, তবে সেই সেই ভাষার মধ্যে মৌলিক সম্পর্ক থাকিবেই। ইহা ভাষাবিজ্ঞানের একটি স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত-সূত্র।"[৪] একটি তুলনার সাহায্যে বিষয়টি এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়—যদি দু'টি লোকের মধ্যে চেহারা ও স্বভাবে বেশ মিল থাকে তবে আমরা অনুমান করি যে তারা একই পিতার সন্তান। আবার সেই পিতার সঙ্গে তার প্রায় সমবয়স্ক এক বা একাধিক লোকের আকৃতি-প্রকৃতিতে যদি মিল থাকে তবে আমরা অনুমান করি যে তারা আবার একই পিতার সন্তান। অর্থাৎ এক পিতামহ থেকে তার পরবর্তী বংশ-পরম্পরায় পিতৃপিতৃব্য ইত্যাদিদের জন্ম, এবং বর্তমান পরম্পরার সাদৃশ্যযুক্ত লোকেরা এক পিতার সন্তান। বলা বাহুল্য সাদৃশ্যটি কম-বেশি হতে পারে, এবং ব্যতিক্রমও থাকতে পারে ; তবে দেখতে হবে সাদৃশ্যটি

৩। Lehmann, Winfred P. : *Historical Linguistics : An Introduction*, New Delhi : Oxford & IBH, 1966, pp. 83-84.

৪। সেন, ড. সুকুমার : 'ভাষার ইতিবৃত্ত', কলিকাতা, ১২শ সং, পৃঃ ৭৬।

আপাত সাদৃশ্য কিনা এবং সাদৃশ্যটি আকস্মিক কিনা। এ বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্যে ভাষাবিজ্ঞানে কিছু কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

বাহ্য পুনর্গঠন বা তুলনামূলক পদ্ধতির প্রথম ধাপ হল বিভিন্ন ভাষার উপাদান সংগ্রহ করে তাদের মধ্যে তুলনা করা। তুলনায় যেসব ভাষার মধ্যে কোনো দিক থেকে কোনো সাদৃশ্য চোখে পড়ে না সেই ভাষাগুলির মধ্যে কোনো জন্মসূত্রগত সম্পর্ক নেই এমন সিদ্ধান্ত করা হয়। যেমন : কয়েকটি ভাষা থেকে মাতৃবাচক শব্দ সংগ্রহ করা গেল—ইংরেজি : mother, ফিন্নীয় : äiti, আরবি : ummun, কন্নড় : tayi, হাঙ্গেরীয় : anya, সাঁওতালি : eṅga, go, ayo ; এখানে দেখা গেল ভাষাগুলির মধ্যে কোনো মিল নেই। এরকম অনেক উপাদানের মধ্যে তুলনা করে যদি দেখা যায় যে, কোনো মিল পাওয়া যাচ্ছে না, তা হলে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, এই ভাষাগুলির মধ্যে জন্ম-উৎসগত কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু যেসব ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য পাওয়া যাবে সেই ভাষাগুলির মধ্যে জন্ম-উৎসগত সম্পর্ক থাকতে পারে এমন অনুমান করা হয়। এবার আরো কয়েকটি ভাষা থেকে মাতৃবাচক শব্দ বিচার করা যাক। যেমন—

ইংরেজি (English) : mother ; চেক্ (Czech) : matka ; ডেনীয় (Danish) : moder ; পঞ্জাবি (Panjabi) : mā̃, mā̃u ; ফিন্নীয় (Finnish) : äiti ; ওলন্দাজ (Dutch) : moeder ; মারাঠি (Marathi) : mā, maī̃ ; ফরাসি (French) : mère ; জার্মান (German) : Mutter ; হাঙ্গেরীয় (Hungarian) : anya ; হিন্দি (Hindi) : mā̃, mā̃ ; ইতালীয় (Italian) : madre ; পোল (Polish) : matka ; পর্তুগীজ (Portuguese) : mãi ; স্লোভাক (Slovak) : matka ; বাংলা (Bengali) : mā ; স্পেনীয় (Spanish) : madre ; রুশীয় (Russian) : mat ; সার্বীয় (Serbian) : majka ; অবধী (Awadhi) : māī ; ক্রোশীয় (Croatian) : majka ; সুইডেনীয় (Swedish) : moder।

উপরের এই তালিকা থেকে যেসব ভাষার শব্দের মধ্যে মোটামুটি সাদৃশ্য আছে সেইসব ভাষাকে এইভাবে এক-একটি গুচ্ছে ভাগ করে সাজানো যায় :

প্রথম গুচ্ছ :

জার্মান (German) : Mutter
ইংরেজি (English) : mother
ওলন্দাজ (Dutch) : moeder
ডেনীয় (Danish) : moder
সুইডেনীয় (Swedish) : moder

দ্বিতীয় গুচ্ছ :

ইতালীয় (Italian) : madre
স্পেনীয় (Spanish) : madre
ফরাসি (French) : mère

তৃতীয় গুচ্ছ :

চেক্ (Czech) : matka
পোল (Polish) : matka
স্লোভাক্ (Slovak) : matka
সার্বীয় (Serbian) : majka
ক্রোশীয় (Croatian) : majka
রুশীয় (Russian) : mat

চতুর্থ গুচ্ছ :

পঞ্জাবি (Panjabi) : mā̃, mā̃u
মারাঠি (Marathi) : mā, māī
হিন্দি (Hindi) : mā, mā̃
বাংলা (Bengali) : mā
অবধী (Awadhi) : māī

মাতৃবাচক শব্দগুলির মধ্যে তুলনা থেকে দেখা যাচ্ছে—জার্মান, ইংরেজি, ওলন্দাজ, ডেনীয় ও সুইডেনীয় ভাষার মধ্যে মোটমুটি সাদৃশ্য আছে। তাই এই ভাষাগুলিকে একটি গুচ্ছে ফেলা হয়েছে এবং অনুমান করা হয় যে, এই ভাষাগুলি একটি কোনো অভিন্ন উৎস থেকে জন্ম লাভ করেছে ; অর্থাৎ অতীতে এগুলি একটিই ভাষা ছিল, ক্রমে একই ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক পার্থক্য বেড়ে তা থেকে এতগুলি ভাষার জন্ম হয়ে থাকতে পারে। তেমনি চেক্, পোল, স্লোভাক্, সার্বীয়, ক্রোশীয় ও রুশীয় ভাষাও একটিমাত্র প্রাচীন ভাষা থেকে জন্ম লাভ করে থাকতে পারে। অনুরূপভাবে ইতালীয়, স্পেনীয় ও ফরাসি ভাষা একটি উৎস থেকে, এবং ভারতের পঞ্জাবি, মারাঠি, হিন্দি, বাংলা ও অবধী ভাষা একটি মূল উৎস থেকে জন্ম লাভ করেছে।

মাতৃবাচক শব্দে সাদৃশ্য থেকে এই অনুমানগুলি করা হল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে একাধিক ভাষার মধ্যে এইরকম প্রথমে এক বা একাধিক শব্দের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ভাষাগুলির একটি সাধারণ বংশগত উৎস সম্পর্কে অনুমান

(hypothesis) করা হয়। পরে আরো শব্দের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়। যদি অনেক সাদৃশ্য থেকে যাচাই (verify) করে অনুমানটি টিকে যায় তবে ভাষাগুলির অভিন্ন উৎস সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা হয়। একাধিক ভাষার যেসব শব্দের মধ্যে রূপগত বা অর্থগত মিল থেকে সাদৃশ্যটি অনুমান করা হয় সেসব শব্দ যদি পরীক্ষার পরে একই উৎস থেকে জাত বলে প্রমাণিত হয় তবে সেগুলিকে **সহোদর শব্দ** (cognate words) বলে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের মূল প্রতিষ্ঠা সহোদর শব্দের উপরেই রয়েছে। যে প্রাচীন ভাষা বা অভিন্ন উৎস থেকে আধুনিক ভাষা জার্মান, ইংরেজি, ওলন্দাজ, ডেনীয় ও সুইডেনীয় ভাষার জন্ম তার নাম দেওয়া হয়েছে টিউটনিক বা জার্মানিক ('জার্মান' নয়) ভাষা। এই টিউটনিক উৎস থেকেই মধ্যবর্তী স্তরের নানা শাখার মাধ্যমে আধুনিক ভাষা ইংরেজি, জার্মান, ওলন্দাজ, ডেনীয় ও সুইডেনীয় ভাষার জন্ম হয়েছে। তাহলে এসবের প্রাচীন উৎস হল প্রাচীন টিউটনিক বা জার্মানিক ভাষা। তেমনি ইতালীয়, স্পেনীয় ও ফরাসি ভাষার প্রাচীন উৎস হল লাতিন বা প্রাচীন ইতালিক ভাষা। আর চেক্, পোল্, স্লোভাক্, সার্বীয়, রুশীয় ও ক্রোশীয় ভাষার উৎস হল প্রাচীন বাল্তো-স্লাবিক ভাষা। আর আমাদের দেশের পঞ্জাবি, মারাঠি, হিন্দি, অবধী, বাংলা ইত্যাদি ভাষার প্রাচীন উৎস হল প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা বৈদিক সংস্কৃত ভাষা ; এই প্রাচীন উৎস থেকে মধ্যভারতীয় স্তরের বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতের মাধ্যমে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির জন্ম। এইভাবে তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে ভাষাগুলিকে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে গোষ্ঠীবদ্ধ করা হয় এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীর একটি করে প্রাচীন উৎস নির্ণয় করা হয়। তারপর প্রাচীন উৎসস্বরূপ যেসব প্রাচীন ভাষা পাওয়া যায় পরবর্তী ধাপে তাদের মধ্যেও তুলনা করা হয়। সেখানে আবার প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যেও যদি সাদৃশ্য চোখে পড়ে তবে মনে করা হয় যে, সেই সাদৃশ্যযুক্ত প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যেও জন্ম-উৎসগত সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ সেই প্রাচীন ভাষাগুলি কোনো প্রাচীনতর একটি অভিন্ন ভাষাবংশ থেকে জাত। যেমন, মাতৃবাচক শব্দে প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে সাদৃশ্য :

প্রাচীন ভারতীয় আর্য (সংস্কৃত Sanskrit) : mātā (mātṛ)
প্রাচীন ইরাণীয় আর্য (আবেস্তীয় Avestan) : mātā
প্রাচীন ইতালিক (লাতিন Latin) : mātre
প্রাচীন গ্রীক (Old Greek) : mētēr
প্রাচীন কেল্তিক (প্রাচীন আইরিশ Old Irish) : māthir
প্রাচীন জার্মানিক বা টিউটনিক (প্রাচীন নর্স্ Old Norse) : mōðer
প্রাচীন বাল্তো-স্লাবিক (লিথুয়ানীয় Lithuanian) : motē

প্রাচীন বাল্তো-স্লাবিক (প্রাচীন বুলগারীয় Bulgarian) : mati
প্রাচীন আর্মেনীয় (Armenian) : mair
প্রাচীন আলবানীয় (Albanian) : motrɛ

অনুমান করা হয় যে, মাতৃবাচক এই শব্দগুলি একটি প্রাচীনতর শব্দ *māter থেকে এসেছিল আর এই প্রাচীন ভাষাগুলি একটিমাত্র প্রাচীনতর ভাষাবংশ থেকে জন্ম নিয়েছিল। যে প্রাচীনতর অভিন্ন ভাষাবংশ থেকে এই প্রাচীন ভাষাগুলির জন্ম হয়েছিল তার নাম দেওয়া হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ (Indo-European Family of Languages) বা মূল আর্য ভাষাবংশ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, তুলনামূলক পদ্ধতির উপযোগিতা ত্রিবিধ : প্রথমত, এই পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে তুলনা করে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে তাদের গোত্রসম্পর্ক অর্থাৎ বংশ-উৎসগত সম্পর্ক (genealogical relation) নির্ণয় করা হয়। দ্বিতীয়ত, ভাষাগুলি থেকে প্রাপ্ত সদৃশ শব্দগুলির মধ্যে তুলনা করে তাদের অভিন্ন আদিরূপ পুনর্গঠন করা হয় এবং এইভাবে আদি উৎসস্বরূপ মূল বংশের যথাসাধ্য পূর্ণ রূপ পুনর্গঠন (reconstruction) করা হয় এবং প্রাগৈতিহাসিক পর্বের ভাষার রূপটি গড়ে তোলা হয়। তৃতীয়ত, এইভাবে ভাষার মূল বংশ ও আদিরূপ নির্ণীত হবার পরে তা থেকে ভাষাগুলির পরবর্তী রূপ ও বিবর্তনের ইতিহাস বিবৃত করা হয়।

তুলনামূলক পদ্ধতির এইসব উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও তার কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। যে সহোদর শব্দের উপরে এই পদ্ধতির মূল প্রতিষ্ঠা সেই সহোদর শব্দ নির্বাচন ও বিচারের ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। দু'টি শব্দের মধ্যে আপাত সাদৃশ্য দেখে আশু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তাতে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। যেমন—বাংলা ভাষার 'মা' শব্দ ও চীনা ভাষার 'মা' শব্দের অর্থ একই। শব্দ দু'টির মধ্যে আপাত সাদৃশ্য দেখে আমরা যদি এই দু'টিকে সহোদর শব্দ মনে করি এবং সিদ্ধান্ত করি যে, বাংলা ভাষা ও চীনা ভাষা একই বংশ থেকে জাত তবে সেটা ভুল সিদ্ধান্ত হবে। প্রথমত শব্দ দু'টির মধ্যে অর্থগত সাদৃশ্য থাকলেও ধ্বনিগত সাদৃশ্য পুরোপুরি নেই। বাংলায় 'মা' শব্দটির অর্থ তার উচ্চারণে বিশেষ সুরাঘাতের (tone) উপর নির্ভর করে না। কিন্তু চীনা ভাষায় 'মা' শব্দটির উচ্চারণ সুরাঘাতের বিশেষ রীতি অনুযায়ী হলে তবেই তার অর্থ 'জননী' হবে, অন্য রীতির সুরাঘাত দিয়ে উচ্চারণ করলে তার অর্থ হয়ে যাবে অন্য রকম (দ্রষ্টব্য পৃ. ৩৩১)। দু'টি শব্দের মধ্যে আপাত সাদৃশ্য দেখে তাদের সহোদর শব্দরূপে গ্রহণ করলে সিদ্ধান্তে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়ত, দু'টি শব্দের মধ্যে আপাত বৈসাদৃশ্য দেখেই এমন সিদ্ধান্তও করা যায়

না যে, সেগুলি সহোদর শব্দ নয়। যেমন, সংস্কৃত ‘ধূমস্’ (ধোঁয়া) এবং গ্রীক ‘thumós’ (আত্মা) শব্দ দু'টির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে ধ্বনিগত বা অর্থগত সাদৃশ্য নেই। কিন্তু এই দুই ভাষার অন্য শব্দে ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা যদি জানা থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারব সংস্কৃত ‘ধ’ এবং গ্রীক ‘th’ মূলত একই উৎস থেকে এসেছে এবং ‘ধোঁয়া’ ও ‘আত্মা'র মধ্যে পুরোপুরি অর্থগত সাদৃশ্য না থাকলেও একটি গভীর অর্থগত সাদৃশ্যের ইঙ্গিত আছে—দুইয়ের অস্পষ্টতার মধ্যে, রহস্যময়তার মধ্যে। আপাত পার্থক্য ছেড়ে তলিয়ে দেখলে শব্দ দু'টিকে সহোদর শব্দরূপে গ্রহণ করা যায়। বস্তুত দুই ভাষার সহোদর শব্দের মধ্যে হুবহু সাদৃশ্য সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত নয়। তৃতীয়ত, দু'টি ভাষার দু'টি শব্দের মধ্যে হুবহু সাদৃশ্য থাকলেও সে দু'টিকে সহোদররূপে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে ভাষা দু'টিকে অব্যবহিত একই উৎস থেকে জাত বলে সর্বদা সিদ্ধান্ত করা যায় না। শব্দ দু'টির মধ্যে একটি যদি ভাষার নিজস্ব শব্দ না হয়ে অন্য ভাষা থেকে গৃহীত কৃতঋণ শব্দ (loan word) হয় তবে সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে। যেমন—বাংলা ‘রেডিও’ শব্দ ও ইংরেজি ‘radio’ শব্দের মধ্যে ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য দেখে এ দু'টিকে যদি সহোদর শব্দ বলি এবং তার ভিত্তিতে যদি সিদ্ধান্ত করি যে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা একই অব্যবহিত উৎস থেকে জাত তাহলে সেই সিদ্ধান্ত ভুল হবে। কারণ বাংলায় রেডিও শব্দ বহু-প্রচলিত হলেও সেটি বাংলার নিজস্ব শব্দ নয়, সেটি ইংরেজি থেকে গৃহীত কৃতঋণ শব্দ। কিন্তু কি করে বোঝা যাবে ভাষার কোন্ শব্দ নিজস্ব আর কোন্ শব্দ কৃতঋণ? সাধারণ অশিক্ষিত বাঙালির কাছে বরং ‘রেডিওই’ খাঁটি বাংলা মনে হবে, ‘বেতার’ মনে হবে বিদেশি শব্দ। এমন ক্ষেত্রে ভাষার খাঁটি নিজস্ব শব্দ বিচারের একটি পদ্ধতির কথা বলেছেন ভাষাতত্ত্ববিদ্ হকেট্ (Hockett) : দেখতে হবে শব্দটিতে যে ধ্বনিবিন্যাস-রীতি অনুসৃত হয়েছে সেই রীতি বাংলার অধিকসংখ্যক শব্দে বহু-প্রচলিত বিন্যাসরীতির সঙ্গে মেলে কিনা। যেমন—‘রেডিও’ শব্দে ‘ড্’ ধ্বনিটি রয়েছে দু'টি স্বরধ্বনির মাঝখানে (র্ + এ + ড্ + ই + ও)। ‘ড্’ ধ্বনির এরকম অবস্থান বাংলার নিজস্ব রীতিসম্মত নয়, এই রীতি বাংলায় খুব বেশি শব্দে পাওয়া যাবে না। এরকম যেসব শব্দের ধ্বনিবিধি ভাষার নিজস্ব বহু-প্রচলিত ধ্বনিবিধির সঙ্গে মেলে না, সেসব শব্দকে সাধারণত ভাষার কৃতঋণ শব্দ ধরা হয় এবং কৃতঋণ শব্দকে সহোদর শব্দরূপে গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু আমাদের মনে হয় হকেট্-প্রস্তাবিত এই বিচার-পদ্ধতিও অব্যর্থ নয়। কারণ সব শব্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এইভাবে করা যাবে না। অনেক কৃতঋণ শব্দ এমন থাকে যেগুলি ভাষার নিজস্ব ধ্বনি-বিধির সঙ্গে মিশে যায়। যেমন—‘চা’ শব্দ বাংলায় চীনা ভাষা থেকে গৃহীত কৃতঋণ শব্দ, অথচ চ্ + আ—এরকম ধ্বনিবিন্যাস

বাংলায় বহু প্রচলিত। বস্তুত সহোদর শব্দ যাচাই করার সম্পূর্ণ নির্ভুল কোনো মানদণ্ড নেই। অথচ তুলনামূলক পদ্ধতির মূল প্রতিষ্ঠা সহোদর শব্দের উপরেই। এই কারণে একথা মানতেই হবে যে তুলনামূলক পদ্ধতিরও সীমাবদ্ধতা আছে। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ নির্ভুল কোনো পদ্ধতি নয়।

সবশেষে আরো একটি কথা ভেবে দেখা দরকার। এই পদ্ধতির সাহায্যে প্রাগৈতিহাসিক পর্বের মূল ভাষাবংশের যে রূপটি গড়ে তোলা হয় সেটা ঐ ভাষার বাস্তব রূপ নাকি অনুমানে গড়ে তোলা একটা আদর্শায়িত রূপ মাত্র। যে রূপটি গড়ে তোলা হয় তাতে উপভাষাগত বৈচিত্র্য ধরা পড়ে না। কিন্তু বাস্তব জীবন্ত ভাষামাত্রেই উপভাষাগত বৈচিত্র্য থাকে। তাছাড়া যে রূপটি গড়ে তোলা হয় তাতে পরবর্তী স্তরের সব ভাষার উপাদান সমন্বিত থাকে বলে সেই রূপটি অত্যন্ত জটিল। যেমন, সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন, গথিক প্রভৃতি ভাষা থেকে উপাদান নিয়ে প্রাগৈতিহাসিক কালের মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার যে রূপটি গড়ে তোলা হয়েছে তাতে ধ্বনিসংখ্যা অনেক : প্রাথমিক স্বর-ধ্বনি (Primary vowels) ৭টি, গৌণ স্বরধ্বনি (secondary vowels) ২৪টি, যৌগিক স্বর ১২টি, ব্যঞ্জনধ্বনি ২৮টি। আদিম কালের মানুষের ভাষা যখন বিশেষ উন্নত ছিল না, এবং সাহিত্য বলতে যখন কিছুই ছিল না, তখনকার ভাষায় এত ধ্বনিবৈচিত্র্য থাকা স্বাভাবিক নয়। তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে যে আদি রূপটি গড়ে তোলা হয়, তা কতদূর বাস্তব সত্য-সম্মত সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। এই সন্দেহ তুলনামূলক পদ্ধতির উপযোগিতাকে অংশত প্রশ্নাধীন করে তোলে।

॥ ২৯ ॥

উপভাষাগত ভূগোল ও ক্ষেত্র-গবেষণার রীতিপদ্ধতি

(Dialect Geography and Methods of Field Investigation)

যাদের আমরা আপাত বিচারে একই ভাষাভাষী বলে মনে করি তাদের ভাষার মধ্যেও সামাজিক স্তরভেদে এবং ভৌগোলিক অঞ্চলভেদে কিছু পৃথক্ রূপ গড়ে উঠে। একই ভাষার মধ্যে সামাজিক স্তর (Strata) ভেদে যে অল্পস্বল্প পৃথক্ রূপ গড়ে উঠে তাকে সামাজিক উপভাষা (Social Dialect) বলে। তেমনি একই ভাষার মধ্যে অঞ্চলভেদে যে কিছুটা পৃথক্ রূপ দেখা যায় তাকে আঞ্চলিক উপভাষা (Regional Dialect) বলে। আবার একই ভাষার অন্তর্গত একটি উপভাষা থেকে অন্য উপভাষার পার্থক্য যখন বেশি হয়ে যায় এবং উপভাষা দু'টি যখন স্বতন্ত্র সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে তখন সেই উপভাষা দু'টি স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু একটি উপভাষা অন্য

উপভাষা থেকে কতখানি পৃথক্ হলে তাকে স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা দেওয়া হবে সে বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক মানদণ্ড অনুসরণ করা হয় না। এটা অনেকটা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জাতিগত উদ্যোগ ও কারণের উপর নির্ভর করে। তাই ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্য অনেকটাই আপেক্ষিক।

আবার আরো একটি সহজ কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে নিই যে, একটি ভাষাগোষ্ঠীর (Speech community) মধ্যে শিষ্ট জনের আদর্শ ভাষা (Koine) ও প্রাকৃতজনের নিত্য ব্যবহৃত ভাষার (Patois) মধ্যে পার্থক্য একটি বাস্তব ঘটনা। আদর্শ ভাষায় আঞ্চলিকতা-নিরপেক্ষ সর্বজনীনতা (Uniformity) বেশি ; কিন্তু প্রাকৃতজনের মুখের ভাষায় আঞ্চলিক রূপবৈচিত্র্য অধিকতর। এই রূপবৈচিত্র্য প্রধানত দ্বিবিধ : অঞ্চলভিত্তিক উপভাষা (regional dialect) ও সমাজস্তর-ভিত্তিক উপভাষা (social stratificational dialect)। কিন্তু সর্বদা স্মরণীয় এই যে এই দ্বিবিধ উপভাষা নির্ণয়ে দ্বিবিধ মানদণ্ড অনুসৃত হলেও একটি মানদণ্ড অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কারণ, আগেই বলেছি, সামাজিক স্তরভেদে যে পার্থক্য আমরা নির্ণয় করি, তাতে আবার দেখি সমাজের নিম্নস্তরের মধ্যে আঞ্চলিকতার মানদণ্ড অধিকতর ক্রিয়াশীল। আবার আঞ্চলিকতার মানদণ্ডের মধ্যেও সামাজিক স্তরভেদের মানদণ্ড ক্রিয়াশীল। কারণ অনেক সময় ভৌগোলিক কারণে অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগহীন পল্লীতে বর্ণবৈষম্য প্রবল ও তার ফলে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর স্তরে সাংস্কৃতিক ভেদ ও তজ্জনিত ভাষাভেদও প্রবল। সুতরাং আঞ্চলিক ও সামাজিক মানদণ্ডের পরস্পর নির্ভরতা স্বীকার্য। যখন সমাজভিত্তিক ভাষাবিজ্ঞানের (socio-linguistics) ব্যাপক প্রতিষ্ঠা হয় নি তখনকার ভাষাতত্ত্ববিদেরাও[৫] শ্রেণীগত উপভাষার (class-dialect) পার্থক্য অনুভব করেছিলেন।

যাই হোক, একই ভাষার মধ্যে উপভাষার আঞ্চলিক রূপটি সাধারণত সমাজের অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত স্থিতিশীল শ্রেণীতে বেশি গড়ে উঠে, শিক্ষিত গতিশীল লোকেরা সাধারণত আঞ্চলিক ভাষার গণ্ডি পেরিয়ে সর্বজনীন আদর্শ ভাষায় (Standard Language) কথা বলে থাকে। শিক্ষিত

৫। 'An intermingling of dialects, in addition to the dominant influence of the literary language, has made the question complicated. There were also class-dialects, spoken by members of the same class or caste scattered over a large area"–Chatterji, Dr, Suniti Kumar : *The Origin and Development of the Bengali Language,* Vol. I. I. London : George Allen & Unwin Ltd., 1970, p. 138.'

লোকের ভাষা অনেকটা অভিজাত ও কৃত্রিম। সমাজের যারা অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত জনসাধারণ তাদের ভাষায় পরিবর্তনের ছাপ কম, বিদেশি প্রভাবও কম। তাই তাদের মধ্যে নিজস্ব ভাষার অকৃত্রিম জীবন্ত রূপ বজায় থাকে এবং তাদের মধ্যেই ভাষার আদিরূপের উপাদান অনেকটা রক্ষিত থাকে।

এইজন্যে সমাজের অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল অশিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে গড়ে-উঠা উপভাষা থেকে ভাষার অতীত ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করার একটা পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। কারণ উপভাষাতেই প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান বেশি রক্ষিত থাকে। যেমন আমরা যদি দেখি যে, পূর্ব বাংলার উচ্চারণে দন্ত্য 'স্'-এর বেশ প্রাধান্য রয়েছে তাহলে অনুমান করতে পারি এখানে ইসলাম ধর্ম ও আরবি-ফারসি ভাষার প্রভাবের মাধ্যমে এটা এসেছিল। ঝাড়খণ্ডীতে অস্ট্রিক শব্দের আধিক্য থেকে অনুমান হয় ঝাড়খণ্ডী এলাকায় (দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর, ধলভূম, মানভূম প্রভৃতি) অস্ট্রিক বংশের আদিবাসীদের বিস্তার ছিল। তেমনি 'কইর্‌যা'র মধ্যে রয়েছে অপিনিহিতি। এটি বঙ্গালী উপভাষায় (পূর্ববাংলা) মধ্যযুগীয় ভাষার চিহ্ন বহন করে। আঞ্চলিক উপভাষায় রক্ষিত প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান অনুসন্ধানের যে রীতি তাকে উপভাষাগত ভূগোল (Dialect Geography) বলে। এর সাহায্যে উপভাষা-বিশেষের বিশেষ উচ্চারণ-রীতি, বিশেষ শব্দ, শব্দরূপ ইত্যাদি ব্যবহারের এলাকা চিহ্নিত করে তা থেকে ভাষার গতিপথ ও ভাষার সম্প্রসারণের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা হয়। এর জন্য উপভাষার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে তার এলাকা চিহ্নিত করা হয় এবং উপভাষার মানচিত্র (Dialect Atlas) তৈরি করা হয়।

উপভাষাগত মানচিত্র রচনার জন্যে প্রথমে ক্ষেত্র-সমীক্ষা করা হয়। এই ক্ষেত্র-সমীক্ষায় দেখা হয় যে, বিশিষ্ট ধরনের উচ্চারণ-রীতি বা শব্দ বা প্রয়োগবিধি কোন্ কোন্ স্থানে প্রচলিত আছে, এবং এই দিক থেকে কোন্ কোন্ স্থানকে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে একটা এলাকা বা অঞ্চলরূপে চিহ্নিত করা যায়। তার জন্যে দেখা হয় একটা বিশেষ ধরনের উচ্চারণ বা ভাষারীতি কোন্ স্থানে এসে থেমে যাচ্ছে, কোথা থেকে অন্য এলাকা শুরু হয়ে যাচ্ছে। এরকম এলাকা মোটামুটি ঠিক করে দেবার জন্যে ভাষার কোন্ কোন্ দিকে সমীক্ষা চালানো হবে তা ঠিক করা হয়—কোনো শব্দের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য, নাকি কোনো জিনিসের নাম, নাকি কোনো শব্দের রূপ বা ক্রিয়ার রূপ, নাকি কোনো বাগ্‌রীতি বিভিন্ন স্থানে কিরূপ নেয় তা খোঁজ করে দেখা হবে। এইরকম ভাষার যে দিকটা নিয়ে অনুসন্ধান করা হয় তাকে বলে বিষয় (item)। আর ঠিক করা হয় কোন্ কোন্ গ্রামে বা শহরে ভাষার ঐ দিকটার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে যাচাই করে দেখা হবে। যে-যে স্থানে অনুসন্ধান চালান হয় সেটাকে বলে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রবিন্দু (point)।

উপভাষা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলের এমন কয়েকটি গ্রামকে তথ্য সংগ্রহের কেন্দ্ররূপে বেছে নিতে হয় সাধারণত যেখানে বাইরের প্রভাব কম এবং যেখানকার জনজীবনে গতিশীলতা কম। সেই রকম স্থিতিশীল (sedentary) অঞ্চল কোনো উপভাষার আদিরূপ অধ্যয়নের পক্ষে ভাল তথ্যকেন্দ্র বলে বিবেচিত হয়। এই রকমের ক্ষেত্রবিন্দুতে গিয়ে সেখানকার বয়স্ক অল্পশিক্ষিত আদি অধিবাসীদের কাছ থেকে শুনে ভাষার উপাদান সংগ্রহ করে আনতে হয়। যাদের কাছ থেকে তথ্য নেওয়া হয় তাদের তথ্য-সরবরাহক (Informant) বলে। গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে থেকে একজন করে তথ্য-সরবরাহক (Informant) বেছে নেওয়া উচিত ; যারা ঐ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা, যারা অন্য অঞ্চল থেকে আগত (Migrant) নয়, যারা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক, অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত তাদেরই তথ্য-সরবরাহক রূপে নির্বাচন করা হয়। এই তথ্য-সরবরাহকারীর নাম, গ্রামের নাম, বয়স, পেশা, শ্রেণী ইত্যাদি লিখে নেবার পরে যথাসম্ভব তার স্বাভাবিক কথোপকথন থেকে—সম্ভব হলে তাকে না জানিয়ে—তার মুখের ভাষা টেপ-রেকর্ডারে গ্রহণ করে নিতে হবে। সোজাসুজি যদি লিখে নিতে হয় তবে এমন ব্যক্তিকে ক্ষেত্র-গবেষক (Field Investigator) নিযুক্ত করা উচিত যে কানে শুনে শুধু বোধশক্তি-ভিত্তিক (impressionistic) পদ্ধতিতে ধ্বনির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য ধরতে পারে এবং আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার (IPA) চিহ্ন ব্যবহার করে লিখে নিতে পারে। ক্ষেত্রানুসন্ধানকারী নিজেই মানচিত্র অঙ্কনে দক্ষ হলে ভাল হয়, না হলে তার সহায়ক একজন মানচিত্র-অঙ্কনকারী (cartographer) রাখতে হবে। তথ্যসংগ্রাহক ক্ষেত্রানুসন্ধানকারী কতকগুলি প্রশ্নাবলির (Questionaire) মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে। প্রশ্নাবলি যথাসম্ভব এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হয় যাতে উপভাষার ধ্বনিগত, রূপগত, বাক্য-গঠনগত ও শব্দার্থগত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।

উপভাষা বিষয়ক গবেষণার দু'টি ধাপ : উপভাষা-জরিপ (Dialect Survey) এবং উপভাষা-বিশ্লেষণ (Dialect Analysis)। প্রথমে উপভাষার এলাকা জরিপ করে তারপরে সেই উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে হয়। উপভাষা-জরিপের জন্যে ক্ষেত্র-গবেষককে প্রধানত প্রশ্নাবলি (questionaire) নিয়ে তথ্যকেন্দ্রে যেতে হয়। আজকাল নানা ধরনের প্রশ্নাবলি পাওয়া যায়। যেমন—Dieth and Orton Questionaire, Scottish Questionaire, Swedish Word-list ইত্যাদি। কিন্তু এসব পূর্বপরিকল্পিত প্রশ্নাবলি যান্ত্রিকভাবে সব ক্ষেত্রে অনুসরণ করা যায় না। কারণ ভাষা-বিশেষের বৈশিষ্ট্য সব সময় কোনো একটিমাত্র কাঠামোতে ধরা নাও পড়তে পারে। গবেষণার উদ্দেশ্য অনুসারে প্রধানত দু'রকমভাবে প্রশ্নাবলি রচনা করে নেওয়া

যায়। প্রথমত উপভাষা জরিপ যদি উদ্দেশ্য হয় তবে pilot survey-র জন্যে এমন কতকগুলি জিনিস (item) বেছে নেওয়া উচিত যার ব্যবহার প্রায় সব অঞ্চলে আছে। সেই জিনিসগুলির নাম আদর্শ ভাষায় (Standard Language) তালিকাবদ্ধ করে বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে আদর্শ ভাষায় নামটি বলে বা আভাসে-ইঙ্গিতে জিনিসটি তথ্যসরবরাহকারীকে (Informant) বুঝিয়ে দিতে হবে। তার প্রতিশব্দ সে কি ব্যবহার করে তা শুনে লিখে আনতে হবে। তারপরে ঐ জিনিসের একই নাম যে-যে অঞ্চলে প্রচলিত মানচিত্রে সেই সব অঞ্চলে বিন্দু বসিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। পরে একটি রেখা এঁকে সেই বিন্দুচিহ্নগুলি যোগ করে দিতে হবে। এইভাবে একই শব্দ যেসব স্থানে প্রচলিত সেই স্থানগুলি যোগ করে যে রেখা পাওয়া যায় তাকে সমশব্দ গণ্ডিরেখা (Isogloss) বলে। যেমন ধরা যাক ৪৮ নং চিত্রের ভূখণ্ডটি হল দেশ-বিভাগের পূর্বের অবিভক্ত বঙ্গদেশ। এর মধ্যে কাল্পনিকভাবে ধরা যাক ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ হল কয়েকটি গ্রামের নাম। ক্ষেত্র অনুসন্ধানের পরে জানা গেল এই গ্রামগুলির মধ্যে ক, খ, গ, ঘ, ঙ গ্রামে 'জলে'র প্রতিশব্দ হিসাবে 'পানি' শব্দ প্রচলিত। এবার মানচিত্রে এই গ্রামগুলিতে বিন্দুচিহ্ন দিয়ে সেই বিন্দুগুলি রেখা দিয়ে যোগ করে দেওয়া হল। এর ফলে যে রেখাটি পাওয়া গেল সেটি হল সমশব্দ গণ্ডিরেখার (Isogloss) একটি উদাহরণ। যেমন--

চিত্র নং ৪৮ : সমশব্দ গণ্ডিরেখা (Isogloss)

তেমনি যেসব অঞ্চলে কোনো একটি বিশেষ ধ্বনি বা কোনো ধ্বনির বিশিষ্ট উচ্চারণ প্রচলিত সেইসব অঞ্চল মানচিত্রে বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত করে সেই বিন্দুগুলি একটি রেখা দিয়ে যোগ করে দিলে যে রেখাটি পাওয়া যায় তাকে সমধ্বনি গণ্ডিরেখা (Isophone) বলে। যেমন বাংলা 'জ্'-এর উচ্চারণ কোনো কোনো অঞ্চলে ইংরেজি Z-এর মতো হয় (হয়, হয়, জানতে পারো না = 'অয়, অয় Zান্তি পারো না'—পরশুরাম)। কাল্পনিক ভাবে ধরা যাক খ, গ, ঘ, ঙ, চ গ্রামে এরকম উচ্চারণ প্রচলিত আছে। এবার মানচিত্রে এই গ্রামগুলি রেখাচিহ্ন দিয়ে যোগ করে দিলে এই বিশিষ্ট উচ্চারণের সমধ্বনি গণ্ডিরেখা পাওয়া যায় (চিত্র নং ৪৯)। যেমন—

চিত্র নং ৪৯ : সমধ্বনি (Isophone)

আবার ক্রিয়ার কোনো বিশিষ্ট রূপ বা শব্দের কোনো বিশিষ্ট রূপ কিংবা কোনো বিশিষ্ট বিভক্তি বা প্রত্যয় যেসব অঞ্চলে প্রচলিত সেই অঞ্চলগুলি মানচিত্রে বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত করে বিন্দুগুলি যোগ করে দিলে যে রেখাটি পাওয়া যায় তাকে সমরূপ গণ্ডিরেখা (Isomorph) বলে। যেমন কাল্পনিকভাবে ধরা

যায় 'করিয়া'—এই অসমাপিকা ক্রিয়ার বিশিষ্ট রূপ 'কইর‍্যা' পাওয়া যায় ক, খ, গ, ঘ ও ছ গ্রামে। এবার এই গ্রামগুলি মানচিত্রে বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত করে সেই বিন্দুগুলি যোগ করে দেওয়া গেল। যে রেখাটি পাওয়া গেল সেটি হল সমরূপ গণ্ডিরেখা। (চিত্র নং ৫০)।

চিত্র নং ৫০ : সমরূপ গণ্ডিরেখা (Isomorph)

কখনো কখনো দেখা যায় যে, অনেকগুলি সমশব্দ গণ্ডিরেখা (Isogloss) খুব কাছাকাছি হয়ে একসঙ্গে চলেছে, একে সমশব্দ গণ্ডিরেখাগুচ্ছ (bundle Isoglosses) বলে। কোনো এলাকা দিয়ে একটিমাত্র সমশব্দ গণ্ডিরেখা (Isogloss) চলে গেলে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নাও হতে পারে, কিন্তু সমশব্দ গণ্ডিরেখাগুচ্ছ (bundle of isoglosses) চলে গেলে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যে স্থানের উপর দিয়ে এরকম সমশব্দ গণ্ডিরেখাগুচ্ছ চলে যায় বুঝতে হবে সে জায়গাগুলি একই উপভাষার অন্তর্গত এলাকা। আর যদি দেখা যায় যে, এরকম গুচ্ছ দিয়ে কোনো এলাকা বেষ্টিত রয়েছে তবে সেই এলাকাকে একটি উপভাষার এলাকা (dialect area) বলে। উপভাষা

অধ্যয়নের এসব রীতিপদ্ধতি বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হল উপভাষার এরকম এলাকা নির্ণয় থেকে ভাষা বা জাতির ইতিহাসের কি তথ্য পাওয়া যায়, কিভাবে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়। এরকমের একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হল—কোনো এলাকায় যে শব্দের গণ্ডিরেখা (isogloss) অন্য শব্দের গণ্ডিরেখার চেয়ে বেশি, সেই বেশি গণ্ডিরেখা-(isogloss)-যুক্ত শব্দ প্রাচীনতর। যেমন, ঝাড়গ্রামের উপভাষার এলাকায় যদি অস্ট্রিক শব্দের গণ্ডিরেখা (isogloss) সেমিটিক শব্দের গণ্ডিরেখার চেয়ে বেশি পাওয়া যায় তা হলে সিদ্ধান্ত হবে ঝাড়গ্রামে অস্ট্রিক প্রভাব সেমিটিক প্রভাবের চেয়ে প্রাচীনতর। হকেট্ এরকমের অনুমানের নাম দিয়েছেন age-area hypothesis। কিন্তু এ ধরনের অনুমান সর্বদা সত্য নাও হতে পারে। কলকাতার উপভাষায় যদি 'কেদারা' শব্দের চেয়ে 'চেয়ার' শব্দের সমশব্দ গণ্ডিরেখা (isogloss) বেশি পাওয়া যায় তাতে এটা প্রমাণিত হয় না যে, চেয়ার শব্দ কেদারা শব্দের চেয়ে প্রাচীনতর। যে অঞ্চল সর্বাধিক সমশব্দ গণ্ডিরেখা বা অনুরূপ সাদৃশ্যদ্যোতক রেখা দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে তাকে উপভাষা-কেন্দ্র (focal area) বলে। প্রধানত এক-একটি focal area-কে কেন্দ্র করে এক-একটি উপভাষা অঞ্চল (dialect area) চিহ্নিত করা যায়। উপভাষা অঞ্চল চিহ্নিত করার পর সেই অঞ্চলের উপভাষার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ে গবেষণার জন্যে স্বতন্ত্র ধরনের প্রশ্নাবলি (questionaire) নিয়ে তথ্য সংগ্রহে যেতে হয়। প্রশ্নাবলি এমন ব্যাপকভাবে পরিকল্পিত হবে যাতে তার উত্তরে ঐ অঞ্চলের উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক (phonetic), রূপতাত্ত্বিক (morphological), বাক্য-গঠনগত (syntactic) ও বিশিষ্ট প্রয়োগগত (idiomatic) বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়ে। অনেক সময় প্রশ্নাবলি বাদ দিয়ে বৃদ্ধদের কাছ থেকে কিছু প্রচলিত গল্প ও সাধারণ লোকের কাছ থেকে কিছু কথোপকথন টেপ-রেকর্ডারে ধরে আনতে হয়। এভাবে যে তথ্য (data) সংগৃহীত হয় তার সুবিন্যাসের জন্যে সূচকপত্রে (index card) সেগুলি তুলে প্রয়োজন অনুসারে বর্ণনানুক্রমিকভাবে (alphabetically), বিষয় অনুসারে (item-wise), স্থান অনুযায়ী (locality-wise), ভাষার বিভিন্ন দিক (parametre, paradigm ইত্যাদি) অনুসারে সাজিয়ে নিতে হবে। আজকাল কম্পিউটারের সাহায্যে বিষয়-বিন্যাস (data-processing)-এর কাজ অনেক দ্রুত ও সহজে সাধিত হয়। বিন্যাসের (Processing)-এর কাজ শেষ হলে বিশ্লেষণ (analysis) ও সূত্ররচনা-র (generalisation) পালা। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভাষাতত্ত্ববিদ্‌কে অজানা ভাষার বর্ণনামূলক ব্যাকরণ রচনার জন্যে যে পদ্ধতিগুলির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় সেগুলি এখানে প্রয়োগ করা যায়। এই প্রক্রিয়াগুলি এই গ্রন্থে আগেই স্বতন্ত্র

অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে আবার এখানে বিস্তৃত ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। সংক্ষেপে এগুলি হল স্বনিম বিশ্লেষণ (phonemic analysis), রূপিম সনাক্তকরণ (identification of morpheme), বাক্য গঠনের উপকরণ ও পদক্রম বিশ্লেষণ (formulation of syntactic devices and word order rules) ইত্যাদি। এইগুলির সাহায্যে উপভাষা-বিশেষের সর্বাঙ্গীন বর্ণনা দিতে হয়। তার সঙ্গে ভাষার প্রতি স্তরে আদর্শভাষার (Standard Language) সঙ্গে তুলনা করে উপভাষার পার্থক্যটুকু তুলে ধরলে উপভাষার স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। আবার একই ভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন উপভাষার মধ্যেও পারস্পরিক তুলনা করলে কাজটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠে।

এইভাবে উপভাষা-বিশেষের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পূর্ণাঙ্গ হবার পর তাতে যেসব ধ্বনি, শব্দ ইত্যাদি পাওয়া যায় তাদের উৎস ও ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা হয়, অধ্যয়ন করা হয় এবং তা থেকে ভাষা ও জাতির অতীত ইতিহাস নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে এই নির্ণয় সর্বক্ষেত্রে নির্ভুল হয় না। তাই উপভাষার বিশ্লেষণ থেকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান যত সমৃদ্ধ হয়েছে, ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান তত সমৃদ্ধ হয় নি।

॥ ৩০ ॥

শব্দভাণ্ডারের অবক্ষয় ও নতুন শব্দসৃষ্টির পরিসংখ্যান (Glottochronology/Lexico-Statistics)

মূলত প্রাগৈতিহাসিক পর্বের ভাষার ইতিহাস-অধ্যয়ন ও বংশ-নির্ণয়ের জন্যে যেসব পদ্ধতি প্রচলিত আছে শব্দ ভাণ্ডারের অবক্ষয় ও নতুন শব্দসৃষ্টির পরিসংখ্যান (Glottochronology/Lexico-Statistics) তাদের মধ্যে অন্যতম। সমাজজীবনের পরিবর্তনের ফলে সমাজে প্রচলিত অনেক জিনিস অচল হয়ে যায়, তেমনি মানুষের সাংস্কৃতিক সাধনার পরিবর্তনের ফলে অনেক পুরানো ধ্যান-ধারণাও বাতিল হয়ে যায়। সমাজে একদা-প্রচলিত ঐসব জিনিস ও ধ্যান-ধারণা ক্রমে অপ্রচলিত হওয়ার ফলে ঐসব জিনিস ও ধ্যানধারণার প্রকাশক শব্দগুলির ব্যবহারও ক্রমে অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। এমনি করে ভাষা থেকে কিছু কিছু শব্দের অবক্ষয় ও বিলুপ্তি ঘটে। বিষয়টি বোঝাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতা থেকে প্রথমে কালিদাসের যুগের নায়িকাদের প্রসাধন-কলার একটি

ছবি উদ্ধৃত করি—

'মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা-আধা।'

কালিদাসের যুগের জীবনধারা ও সমাজ-ব্যবস্থা থেকে এখন আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। এখনকার নায়িকারা প্রসাধনের জন্যে মুখে লোধ্ররেণু মাখে না, হাতে লীলাপদ্ম ধারণ করার অবকাশও তাদের নেই, কানে কুন্দকলি ও মাথায় কুরুবক ফুল গুঁজে সৌন্দর্য-চর্চার রীতিও এখন অপ্রচলিত। ফলে লোধ্ররেণু, কুরুবক প্রভৃতি শব্দও এখন অপ্রচলিত, এত অপ্রচলিত যে আমরা জানি না কুরুবক কিসের নাম। এযুগের কিশোর-নায়কেরা তাই বিতর্ক করে—কুরুবক এক রকমের ফুল, না এক রকমের বক!

"টেনিদা মুখটাকে ডিম-ভাজার মতো করে বললে, ধ্যুৎ! খালি কুরুবকের মতো বকবক করলে গপ্পো হয়?

ক্যাবলা বললে, কুরুবক এক রকমের ফুল। ফুল কখনো বকবক করে না।

টেনিদা চেঁচিয়ে বললে, শাট্ আপ! আমি বলছি কুরুবক এক রকমের বক—খুব বিচ্ছিরি বক।..." (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'সমগ্র কিশোরসাহিত্য', "বেয়ারিং ছাঁট")।

তেমনি ঋগ্বেদের যুগে যেসব দেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল সেসব দেবদেবীর মধ্যে অনেকেরই উপাসনা এখন আর আমরা করি না। ফলে সেইসব দেবদেবীর নামও এখন আমাদের ভাষায় অপ্রচলিত হয়ে গেছে। যেমন—পর্জন্য, পূষণ, সোম, অদিতি, রাত্রি, বাক্ ইত্যাদি। কিছু কিছু নাম এখন প্রচলিত ; কিন্তু তাদের অর্থ ও তাৎপর্য এখন পরিবর্তিত। যেমন, বৈদিক বাগ্‌দেবী ছিলেন বিশ্বের জনয়িত্রী আদি মহাশক্তি, এখন বাগ্‌দেবী বলতে আমরা বুঝি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে। আবার ঋগ্বেদের যুগে 'সরস্বতী' ছিল একটি নদীর নাম। এখন সরস্বতী হলেন বিদ্যার দেবী।

জীবনধারার পরিবর্তনের ফলে জীবনের সব দিকেরই পরিবর্তন হয়, চিকিৎসা-পদ্ধতিরও। ফলে প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদের অনেক ঔষধের নাম এখন আমরা প্রায় ভুলেই গেছি। যেমন—বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত, হিঙ্গুষ্টক চূর্ণ, মহারাজ নৃপতি-বল্লভ, বৃহৎ প্রাণেশ্বর ইত্যাদি।

আমাদের সমাজে এমন এক রকমের চেয়ারের ব্যবহার ছিল যার গঠন আধুনিক কালের চেয়ার থেকে একটু পৃথক্ ; তাকে বলা হত 'কেদারা'। ইংরেজ আগমনের পরে ইংরেজদের আসবাব-পত্রের সঙ্গে আমাদের সমাজে আধুনিক

ধরনের চেয়ারের প্রচলন হয়। পুরোনো আসবাবটির সঙ্গে-সঙ্গে 'কেদারা' নামটিও অপ্রচলিত হয়ে যায়। তেমনি অপ্রচলিত হয়ে যাচ্ছে পোশাকের নামের মধ্যে 'সেমিজ' শব্দ, নতুন শব্দ এসেছে 'ম্যাক্সি', হয়ত এমন দিন আসবে যখন 'খড়ম' বলতে কি বোঝায় তা আমরা বলতেই পারব না। কারণ এখন পুরোহিতরাও 'হাওয়াই' চটি পরতে শুরু করেছেন।

ভাষায় একদা-প্রচলিত শব্দগুলির মধ্যে কত ভাগ শব্দ বিলুপ্ত হয়েছে এবং কত ভাগ শব্দ আছে, তার হিসাব বের করে তার সাহায্যে পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক বংশগত সম্পর্ক নির্ণয়ের যে পদ্ধতি চালু হয়েছে তাকে শব্দসমূহের অবক্ষয়ের পরিসংখ্যান বা Lexico-Statistics বলা হয়। শব্দ-ভাণ্ডারের অবক্ষয়ের পরিসংখ্যানের উপরে ভিত্তি করে ভাষার ইতিহাস অধ্যয়নের যে রীতি প্রচলিত হয়েছে তাকে 'ভাষা-কালক্রমবিজ্ঞান' (Glottochronology) বলে।

এই যে শব্দভাণ্ডারের অবক্ষয় ও বিলুপ্তির পরিসংখ্যানের উপরে ভিত্তি করে ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস ও ভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক উৎসগত সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়, এর মূলে একটি সামাজিক কারণ রয়েছে। সমাজে দেখা যায় যে, কতকগুলি জিনিস ও ধ্যান ধারণা দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ও জাতির গভীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত। সেই জিনিসগুলি ও ধ্যানধারণাগুলি আমূল সামাজিক বিপ্লব ও ভাবগত পরিবর্তন ছাড়া পরিবর্তিত হয় না। সেইজন্যে এইসব জিনিস ও ধ্যান-ধারণার নাম ও তাদের সঙ্গে যুক্ত শব্দগুলিও সহজে পরিবর্তিত হয় না, সেই ধরনের শব্দগুলি ভাষায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী। যেমন—সামাজিক-পারিবারিক সম্পর্কজ্ঞাপক শব্দ (বাবা, মা, ভাই, বোন ইত্যাদি), নিত্যব্যবহার্য সর্বনাম শব্দ (আমি, তুমি, তুই, সে ইত্যাদি), শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম (হাত, পা, মাথা, চুল ইত্যাদি), ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত নাম (স্বর্গ, নরক, শিব, কালী, ভূত, প্রেত ইত্যাদি), পশুপক্ষীর নাম, গাছপালার নাম ইত্যাদি। এই ধরনের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী শব্দকে ভাষার মূল শব্দভাণ্ডার (Basic Core Vocabulary) বলা হয়। যে শব্দগুলি জীবনধারার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত নয় (যেমন—নিত্যনতুন ফ্যাশান অনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদের নাম, সিনেমা অনুযায়ী শাড়ির নাম, কায়দা-কানুনের নাম ইত্যাদি) সেগুলি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেগুলিকে ভাষার মূল শব্দভাণ্ডারের মধ্যে ধরা হয় না। অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে যে, মূল শব্দভাণ্ডারের স্থায়িত্বের ধারণাটিও আপেক্ষিক। কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে মূল শব্দভাণ্ডারও কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন—বাঙালি পরিবারে 'বাবা', 'মা', 'কাকা', 'কাকিমা' প্রভৃতি শব্দগুলি দীর্ঘকাল চলে আসছিল। এখন অতি আধুনিক ইংরেজি ভাবাপন্ন বাঙালি পরিবারে এই শব্দগুলি অনেকটা

অচল্ হয়ে এসেছে। সেখানে 'ডেডি', 'মাম্মি', 'আংক্‌ল্', 'আণ্টি' প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত হয়েছে।

যাই হোক, ভাষার মূল শব্দভাণ্ডারের কিছু-সংখ্যক শব্দের ক্রমিক বিলুপ্তি ও কিছু-সংখ্যক শব্দের সংরক্ষণের পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রাচীন ভাষার ইতিহাস ও পারস্পরিক সম্পর্ক-নির্ণয়ের যে পদ্ধতিটি চালু হয়েছে তার মূলে দু'টি সিদ্ধান্ত ভিত্তিস্বরূপ গৃহীত হয়েছে। এই মূল সিদ্ধান্ত দু'টি সংক্ষেপে সূত্রবদ্ধ করেছেন আধুনিক ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানী লেম্যান্—

এক : ..."the rate of retention of items in the basic core is constant."

দুই : ..."their rate of loss is approximately the same from language to language".

এই দুই মূল সিদ্ধান্তের উপরে ভিত্তি করে যে পদ্ধতির সাহায্যে একাধিক ভাষার ইতিহাস ও পারস্পরিক বংশগত সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়, সেই পদ্ধতিটি হল লেম্যানের ভাষায়—

..."If then the percentage of cognates in basic core is determined for two related languages, the length of time that they have been separated can be stated."[৬]

অর্থাৎ ভাষার মূল শব্দভাণ্ডারের সংরক্ষণের হার মোটামুটি একই থাকে। যে শব্দগুলি বিলুপ্ত অর্থাৎ অপ্রচলিত হয়ে যায় সেগুলিকে ছেড়ে যে শব্দগুলি সংরক্ষিত থেকে যায় সেগুলির হার মোটামুটি একই থাকে। দ্বিতীয়ত যে শব্দগুলি বিলুপ্ত অর্থাৎ অপ্রচলিত হয়ে যায় তাদের হারও মোটামুটি একই থাকে।

এখন, দু'টি সম্পৃক্ত ভাষার সহোদর স্থানীয় শব্দের (Cognate Words) শতকরা হার যদি নির্ণয় করা যায় তা হলে তার সাহায্যে সেই দু'টি ভাষা কতদিন আগে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গেছে তা নির্ণয় করা যাবে। যেমন— বাংলা ও হিন্দির মূল শব্দভাণ্ডার থেকে দু'টি পশু, দু'টি মানবাঙ্গ, দু'টি সংখ্যাশব্দ, দু'টি সর্বনাম এবং চন্দ্র-সূর্য—এই শব্দগুলি বেছে নেওয়া যাক : বাংলা—গরু, মোষ, হাত, পা, এক, দুই, আমি, তুমি, চন্দ্র, সূর্য ; হিন্দি—গায়্, ভঁ্যাস্, হাথ্, প্যের, এক, দো, ম্যায়্, তুম্, চন্দ্র, সূর্য। দেখা যাচ্ছে যে, হাত, এক, চন্দ্র, সূর্য শব্দে এই দুই ভাষার মধ্যে মোটামুটি মিল আছে, বাকি শব্দগুলিতে

৬। Lehmann. Winfred P. : *Historical Linguistics An Introduction,* Oxford AIBH Publishing Co., 1966, p. 108.

পুরোপুরি মিল নেই। হিসাব করলে দেখা যাবে যে, এখানে ৪০% শব্দে মিল আছে এবং ৬০% শব্দের মিল নেই। অর্থাৎ যেসব মূল সংস্কৃত শব্দ থেকে বাংলা ও হিন্দির এই শব্দগুলি এসেছে, সেইসব শব্দের ৪০% বাংলা ও হিন্দি দুই ভাষাতেই রক্ষিত আছে, বাকি ৬০% ভাগ শব্দ বিলুপ্ত বা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এই বিলুপ্তি ও সংরক্ষণের হারের (rate) উপরে ভিত্তি করে নির্ণয় করা হবে বাংলা ও হিন্দি ভাষা কত বছর আগে পরস্পর থেকে পৃথক্ হয়ে গিয়েছিল। দুই ভাষার পৃথক্ হবার যে কাল তাকে সময়ের গভীরতা (Time Depth) বলে। দু'টি ভাষার মূল শব্দভাণ্ডারে রক্ষিত সহোদরস্থানীয় শব্দের (Cognate Words) পরিসংখ্যানের উপরে ভিত্তি করে দুই ভাষার পৃথক্ হবার কাল নির্ণয়ের একটি বীজগাণিতিক সূত্র বের করেছেন ভাষাবিজ্ঞানী লীজ্ (Lees)। এই সূত্রের জন্যে আগে ধরা যাক—

দুই ভাষার অভিন্ন সহোদর স্থানীয় শব্দের শতকরার logarithm = C, দুই ভাষার মধ্যে বিচ্ছেদের দশ লক্ষ বছর পরেও সংরক্ষিত সহোদর স্থানীয় শব্দের শতকরার logarithm = r, বিচ্ছেদের কাল বা সময়ের গভীরতা = t. এখন সূত্রটি হল—

$$t = \frac{\log c}{2 \log r}$$

এখন আমরা যদি ধরে নিই যে, দুই ভাষায় সহোদর স্থানীয় শব্দ রয়েছে ৯০% তা হলে আমাদের অঙ্কটি দাঁড়াবে—

$$t = \frac{\log 40\%}{2 \log 90\%}$$

বিষয়টি সহজ করে বোঝাবার জন্যে উপরে মাত্র দশটি শব্দের উপর ভিত্তি করে এই অঙ্কটি করা হয়েছে। কিন্তু ভিত্তি স্থানীয় শব্দের সংখ্যা এত কম হলে কাল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নির্ভরযোগ্য হয় না। শব্দের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়া দরকার আর শব্দের নির্বাচন সুপরিকল্পিত হওয়ারও প্রয়োজন আছে। তবে একথাও ঠিক যে, ভাষার প্রয়োজনীয় সমস্ত শব্দকে সংগ্রহ করা এবং তার উপরে ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে আসাও সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা যতই সাবধান হই না কেন, একই উৎস থেকে জাত দুই ভাষার পৃথক্ হওয়ার একেবারে সঠিক কাল এই পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করা যায় না, শুধু মোটামুটি সময়সীমাই নির্ণয় করা যায়। তবে দু'টি ভাষার মধ্যে শব্দভাণ্ডারের ক্ষেত্রে সম্পর্ক কতটা কাছের সেইটা এই

পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

আগেই বলা হয়েছে যে, দু'টি মূল সিদ্ধান্তের উপরে এই পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠিত। তাদের মধ্যে একটি হল—প্রত্যেক ভাষায় কিছু মূল শব্দভাণ্ডার (Basic core vocabulary) আছে। আর দ্বিতীয়টি হল—সব ভাষার মূল শব্দভাণ্ডারে শব্দের বিলুপ্তি ও সংরক্ষণের হার একই। কিন্তু এই মূল সিদ্ধান্ত দু'টিই পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না। যেমন—'সূর্য'-বাচক শব্দকে দক্ষিণ এশিয়ার কোনো কোনো জাতির ভাষায় মূল শব্দভাণ্ডারের মধ্যে ধরা যায় না, কারণ সেসব জাতির ভাষায় বিভিন্ন ভাষাবংশ থেকে গৃহীত শব্দ রয়েছে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিও পুরোপুরি গ্রহণীয় নয়। কারণ যেসব জাতির জীবন বেশি গতিশীল, নিত্য নতুন ভাব-ভাবনায় সমৃদ্ধ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নিত্যস্পন্দিত, সেসব জাতির ভাষায় মূল শব্দভাণ্ডারও দ্রুত পরিবর্তনশীল। অন্যদিকে, যেসব জাতি রক্ষণশীল, আত্মসমাহিত, বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের মূল শব্দভাণ্ডারও অপেক্ষাকৃত বেশি স্থিতিশীল। আবার একই জাতির বিভিন্ন সামাজিক স্তরে মূল শব্দভাণ্ডারের পরিবর্তনের হারও বিভিন্ন। সুতরাং সব ভাষায় মূল শব্দভাণ্ডারের পরিবর্তনের হার একই রকম নয়। এই কারণে এই পদ্ধতির ব্যাপক উপযোগিতা সম্পর্কে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা সংশয় প্রকাশ করেছেন। তবে লেম্যান্ প্রমুখ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন একই রকম সাংস্কৃতিক বাতাবরণে পুষ্ট মোটামুটি নিকট-সম্পর্কিত ভাষাগুলির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগের উপযোগিতা আছে।

॥ ৩১ ॥

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতি : লিপিবদ্ধ দলিল বিশ্লেষণ (Method of Historical Linguistics : Analysis of Written Records)

প্রাগৈতিহাসিক পর্বের (Pre-historic period) বিভিন্ন ভাষার বংশ পরিচয়, পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় ও ইতিহাস অধ্যয়নের জন্যে যেমন চারটি প্রধান পদ্ধতি আছে, তেমনি ঐতিহাসিক পর্বের (Historic Period) ভাষার ইতিহাস ও বিবর্তন-কাহিনি অধ্যয়নের জন্যে প্রধান পদ্ধতি হল একটি—লিপিবদ্ধ দলিল (Written Records) বিশ্লেষণ। লিপিবদ্ধ দলিলের মধ্যে পড়ে প্রত্নলিপি, সাহিত্য ও ধর্ম-বিষয়ক পাণ্ডুলিপি, গ্রন্থ ইত্যাদি। এইগুলির মধ্যে ভাষার রূপ, বৈশিষ্ট্য ও ক্রমিক বিবর্তনের চিহ্ন বিধৃত থাকে। কারণ প্রাচীন কালে গ্রামোফোন রেকর্ড, টেপ-রেকর্ডার প্রভৃতি ছিল না, ভাষাকে ধরে রাখার একমাত্র মাধ্যম ছিল লিপি বা লিখে রাখা। সুতরাং ভাষার ইতিহাস ও বিবর্তন অধ্যয়নের জন্যে বিভিন্ন কালের লিপির

ইতিহাস ও বিভিন্ন ধরনের লিপি-পদ্ধতির জ্ঞান অপরিহার্য।

মানুষ তার জ্ঞান-সাধনার সম্পদকে, তার ভাব-ভাবনার ফসলকে দশজনের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্যে তাকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে। কিন্তু সাধারণভাবে মুখের ভাষার সাহায্যে এক স্থানের মানুষ অন্য স্থানের মানুষের কাছে, এককালের মানুষ অন্য কালের মানুষের কাছে নিজের বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারে না। মুখের ভাষা যে স্থানে ও যে সময়ে বলা হয় সেই স্থান ও সেই সময়ের মানুষই শুধু শুনতে পায়। মুখের ভাষার এই দ্বিবিধ সীমাবদ্ধতাকে—স্থানের সীমা (limitation of space) এবং কালের সীমাকে (limitation of time)—জয় করে যাতে এক স্থানের মানুষ অন্য স্থানের মানুষের কাছে, এক কালের মানুষ অন্য কালের মানুষের কাছে নিজের বক্তব্য, নিজের জ্ঞান-সাধনার সম্পদকে পৌঁছে দিতে পারে তার জন্যে সে একটি অমূল্য মাধ্যম আবিষ্কার করেছে—সেটা হল লিপি-পদ্ধতি (Writing System)। লিপি হল মানুষের মুখের ভাষার এমন রূপায়ণ যাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যায়, যাকে এক কাল থেকে অন্য কালের জন্যে রেখে দেওয়া যায়। এই রূপায়ণ সাধন করতে গিয়ে যে ভাষা ছিল মূলত মুখে বলার ও কানে শোনার জিনিস, মানুষ লিপির মাধ্যমে সেই ভাষাকে করেছে চোখে দেখার জিনিস, পড়ার জিনিস। অর্থাৎ যেটা ছিল মূলত শ্রব্য, সেটাকে সে করেছে দৃশ্য। সুতরাং বলতে পারি লিপি হল উচ্চারিত ধ্বনির দৃশ্য রূপায়ণ। লিপির সব দিক লক্ষ্য করে একজন ফরাসি মনীষী লিপির একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন—লিপি হল ভাষার এমন দৃশ্য এবং স্থায়ী উপস্থাপনা যা স্থানান্তরযোগ্য এবং সংরক্ষণযোগ্য অর্থাৎ কালান্তরযোগ্য।[৭]

লিপির উদ্ভব ও স্তরভেদ : বাংলা লিপির উৎস ও ক্রমবিকাশ :

মুখের ভাষার এই যে স্থায়ী ও দৃশ্য রূপায়ণ লিপি, যাকে মনীষীরা মনে করেন মানব সভ্যতার একটি অনন্য সম্পদ, সেই লিপির কিন্তু বর্তমান রূপটি একদিনে কোনো পরিকল্পিত প্রয়াসে সৃষ্ট হয় নি। মানুষের চিন্তার সম্পদ এবং তার মনের ভাব যাতে স্থান-কালের সীমা জয় করে স্থায়ী রূপ পায় তার জন্যে মানুষ কখনো পরিকল্পিত ভাবে, কখনো অপরিকল্পিতভাবে নানা উপায় আবিষ্কার করে আসছে এবং তারই মিলিত ফলশ্রুতি-স্বরূপ ধাপে-ধাপে অল্পে-অল্পে লিপির বর্তমান রূপটি গড়ে উঠেছে নানা স্তরের মাধ্যমে। আদিম কাল থেকে আধুনিক

৭। "Une représentation visueile et durable du langage. qui le rend transportable et conservable." (Vide : Diringer, David : *Writing* London : Thames & Hudson. 1962, Introduction).

কাল পর্যন্ত লিপির এই যে ক্রমবিকাশ তাতে মোটামুটিভাবে চারটি স্তর দেখতে পাই। এই স্তরগুলি হল—

চিত্রলিপি (Pictogram) ও গ্রন্থিলিপি (Quipu) : আনুমানিক ২০০০০ থেকে ১০০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তীকালে মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির যখন বিশেষ বিকাশ ঘটে নি তখনো মানুষ তার জীবনের বীরত্ব-কাহিনিকে ও তার চোখে দেখা ও মনে দাগ-কাটা জিনিসগুলির ছবি এঁকে মনের স্মৃতিকে বাইরে প্রকাশ করত। বিশেষজ্ঞদের মতে আদি কালের মানুষের এই অনুন্নত শিল্পচর্চা ছিল মূলত তার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ। ক্রমে মানুষ তার এই চিত্র-বিদ্যাকে কাজে লাগাল স্মৃতিকে শাশ্বত করে রাখার মাধ্যম রূপে। দেওয়ালে, পর্বতগাত্রে, গাছের গুঁড়িতে দাগ কেটে, রেখাচিত্র বা ছবির মাধ্যমে মানুষ তার জন্তু শিকারের ঘটনা বা বিভিন্ন প্রাণী ও বস্তুর রূপ এঁকে রাখত। এই অনুন্নত স্মারকচিত্র-পদ্ধতি এখনো আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ান্‌দের মধ্যে এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এগুলি ঘটনা বা বস্তুকে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী রূপ দিয়েছে বলে এগুলিকে চিত্রলিপি বলা হয়, কিন্তু এগুলিকে ঠিক ভাষার লিখিত রূপ বা প্রকৃত লিপির প্রথম পদক্ষেপ বলা যায় না। কারণ এগুলি ছিল ঘটনা বা বস্তুর বা প্রাণীরই দৃশ্য রূপায়ণ, কিন্তু আসল লিপি হল মানুষের মুখের ভাষার অর্থাৎ ধ্বনির দৃশ্য রূপায়ণ।

চিত্রলিপির অনুরূপ পদ্ধতি ছিল দড়িতে গিঁট বেঁধে তার সাহায্যে ঘটনা মনে করে রাখার পদ্ধতি। এই পদ্ধতির প্রচলন ছিল দক্ষিণ আমেরিকার পেরু অঞ্চলের ইস্‌কাস্‌দের মধ্যে। এই পদ্ধতির নাম কুইপু (Quipu) বা গ্রন্থিলিপি। আদিম রীতির এই উত্তরাধিকার এখনো দেখতে পাই যখন বিশেষ ঘটনা মনে করার জন্যে মেয়েরা কাপড়ের আঁচলে গিঁট বেঁধে রাখে বা পুরুষেরা রুমালে গিঁট বেঁধে নেয়।

ভাবলিপি (Ideogram) : চিত্রলিপির শেষ পর্বে চিত্রাঙ্কন অপেক্ষাকৃত সরলীকৃত হয়ে এসেছিল। তখন কোনো জিনিসের পুরো ছবি না এঁকে কয়েকটি রেখার সাহায্যে সংক্ষেপে জিনিসটি বুঝিয়ে দেওয়া হত। এর পরের ধাপে রেখাচিত্র ক্রমে বস্তুকে না বুঝিয়ে বিশেষ ভাবকে বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হত। যেমন ডেভিড্ ডিরিঙ্গার্ একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন—একটি ছোট গোল বৃত্ত চিত্রলিপির যুগে সূর্যকে বোঝাতো, ভাবলিপির যুগে সেই বৃত্তটি সূর্যকে না বুঝিয়ে উত্তাপকে বা আলোকে বা আলোর দেবতাকে বোঝাতে লাগল। তেমনি—একটি চোখ থেকে ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ার ছবি চিত্রলিপির স্তরে শুধু চোখ ও অশ্রুবিন্দুকে বোঝাতো, কিন্তু ভাবলিপির যুগে সেটা দুঃখকে বোঝাতে লাগল। এইভাবে লিপিপদ্ধতি স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে এগিয়ে ক্রমশ প্রতীকধর্মী হয়ে উঠল। এই ভাবলিপি

কালিফোর্নিয়াতে পাওয়া যায়। উত্তর আমেরিকার ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী ও আফ্রিকার কোনো-কোনো নিগ্রো সম্প্রদায়ে এই লিপিপদ্ধতি প্রচলিত।

চিত্রপ্রতীকলিপি (Hieroglyph) : চিত্রলিপি (Pictogram) ও ভাবলিপির (ideogram) স্তরে অঙ্কিত ছবিগুলি যথাক্রমে উপস্থাপ্য বস্তু ও ভাবের প্রতীক ছিল। পরবর্তী ধাপে অর্থাৎ চিত্রপ্রতীকলিপির (Hieroglyph) স্তরে অঙ্কিত চিত্রগুলি উপস্থাপ্য বস্তু বা ভাবের প্রতীক না হয়ে সেই উপস্থাপ্য বস্তু বা ভাবের নামবাচক শব্দ বা ধ্বনিসমষ্টির প্রতীক হয়ে উঠল। যেমন—এক রকমের চিত্রপ্রতীক লিপিতে মাথার ছবি আঁকা হত, এই ছবিটি 'tp' ধ্বনির প্রতীক ছিল, এই ধ্বনিটিতে 'মাথা'কে বোঝাতো। তেমনি, একটি লোক তার মুখের কাছে হাত এনে বসে আছে—এ ছবিটি 'wnm'-শব্দটির প্রতীক ছিল। আর এই শব্দের অর্থ ছিল 'খাওয়া'। এখানে সোজাসুজি বস্তু বা ভাবকে না বুঝিয়ে বিশেষ বিশেষ ধ্বনিগুচ্ছকে বোঝাচ্ছে আর এই সব ধ্বনিগুচ্ছ ঐসব বস্তুকে বা ভাবকে বোঝাচ্ছে। এসব উদাহরণে অবশ্য দেখা যাচ্ছে যে, ধ্বনিগুচ্ছ যেসব বস্তুকে বা ভাবকে বোঝাচ্ছে অঙ্কিত ছবিগুলি সেইসব বস্তু বা ক্রিয়ার ছবি। কিন্তু ক্রমে এমন হল যে, ছবির সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক দূরবর্তী হয়ে এল। শেষ ধাপে ছবি এমন ধ্বনিগুচ্ছকে বোঝাতো যে ধ্বনিগুচ্ছ সেই অঙ্কিত ছবির বস্তু বা ক্রিয়ার নাম নয়, অন্য কোনো জিনিসের নাম। যেমন—একটি বাজপাখির ছবি 'nsw' ধ্বনির প্রতীক ছিল এবং এই 'nsw' ধ্বনিগুচ্ছ বলতে বাজপাখিকে বোঝাতো না, 'রাজা'কে বোঝাতো। এমনি করে ছবিগুলি যখন পুরোপুরি ধ্বনির প্রতীক হয়ে উঠল তখনকার লিপিকে চিত্রলিপি বা ভাবলিপি না বলে শব্দলিপি (Logogram) বলা হয়। লেম্যান্ (Lehmann) উপরে উদ্ধৃত উদাহরণগুলি দিয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন—"...the formerly used terms *pictograms* or *ideograms* are less appropriate than *logograms*. The symbols themselves we describe as logographic."[৮] এইভাবে চিত্রপ্রতীক লিপি ক্রমশ ধ্বনিলিপিতে (Phonogram) উত্তীর্ণ হল। এই জন্যে চিত্রপ্রতীক লিপিকে সন্ধিলগ্নের লিপি (transitional script) বলা হয়। মিশরের চিত্রপ্রতীকলিপি এই শ্রেণীর লিপির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ধ্বনিলিপি (Phonogram) : চিত্রপ্রতীকগুলি যখন বস্তু বা ক্রিয়ার প্রতীক না হয়ে ধ্বনিগুচ্ছের প্রতীক হয়ে উঠল তখন লিপি হয়ে উঠল ধ্বনিলিপি (Phonogram/ Phonetic Script)। ধ্বনিলিপির প্রথম স্তরে লিপিতে

৮। Lehmann. Winfred P. : *Historical Linguistics : An Introduction*, Oxford & IBH Publishing Co., 1966, p. 65.

ব্যবহৃত প্রতীকগুলি একটি ধ্বনি (sound) বা অক্ষরের (syllable) প্রতীক ছিল না, এক-একটি প্রতীক একাধিক ধ্বনির সমবায়ে গঠিত গোটা শব্দেরই (word) প্রতীক ছিল। এই পূর্ববর্তী স্তরের নাম **শব্দলিপি** (logogram) ক্রমে সরলীকরণের ফলে লিপিতে ব্যবহৃত রেখাচিত্রগুলি ক্রমশ ছোট ও সরল হয়ে এলো এবং এক-একটি রেখাচিত্র এক-একটি গোটা শব্দের প্রতীক না হয়ে শুধু শব্দের আদি অক্ষরের (syllable) প্রতীক হয়ে উঠল। এই সরলীকরণের প্রক্রিয়াকে বলা হয় **শীর্ষনির্দেশ** (Acrology)। এই প্রক্রিয়ার ফলে চতুর্থ স্তরে যে লিপি-পদ্ধতির জন্ম হল তাকে বলে **অক্ষর-লিপি বা দললিপি (Syllabic Script)**। অক্ষর হল নিঃশ্বাসের এক ধাক্কায় উচ্চারিত, ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ। অক্ষরলিপিতে এক-একটি রেখাচিত্র এক-একটি অক্ষরের (syllable) প্রতীক হয়ে উঠল। যেমন—ক = ক্ + অ। এর পরে ক্রমে ক্রমে ধ্বনিলিপি বিকাশের শেষ ধাপে লিপি আরো বিশ্লেষণধর্মী হয়ে গেল এবং লিপিতে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি রেখাচিহ্ন এক-একটি অক্ষরের (syllable) প্রতীক না হয়ে এক-একটি একক ধ্বনির প্রতীক হয়ে উঠল। যেমন—রোমীয় লিপির a, b, c, d ইত্যাদি। একক ধ্বনির এক-একটি লিখিত রূপের নাম বর্ণ (Letter)। কোনো ভাষার বর্ণের সমষ্টিকে বর্ণমালা (Alphabet) বলে। লিপি-পদ্ধতির বিকাশের এই শেষ ধাপের নাম **বর্ণলিপি (Alphabetic Script)**। এই ধরনের লিপির নিদর্শন হল রোমীয় লিপি (Roman Script)। বাংলা লিপি অংশত অক্ষর লিপি (যেমন—ক = ক্ + অ, খ = খ্ + অ), অংশত ধ্বনিলিপি বা বর্ণলিপি (যেমন—অ, আ)।

লিপির শ্রেণী বা প্রকারভেদ

চিত্রলিপি ও গ্রন্থিলিপিতে লিপির প্রাক্-রূপের সূচনা হয়েছিল, ভাবলিপি, শব্দলিপি, অক্ষরলিপি ও বর্ণলিপির মাধ্যমে ধাপে ধাপে আধুনিক লিপির জন্ম হল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষার জন্যে নানা ধরনের লিপির বিকাশ হল। পৃথিবীতে যে সব লিপি প্রচলিত ছিল ও আছে সেগুলিকে এই কয়েকটি মূল শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

(ক) সুমেরীয় বাণমুখ লিপি বা কীলকাকার লিপি (Sumerian Cuneiform Script)

(খ) চীনীয় চিত্রলিপি (Chinese Pictographic Script)

(গ) মিশরীয় চিত্রপ্রতীক লিপি (Egyptian Hieroglyphic Script) এবং

(ঘ) সম্ভাব্য ভারতীয় লিপি (Hypothetical Indian Script)।

এগুলি ছাড়া কতকগুলি লিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি বলে সেগুলির

শ্রেণীনির্ণয় করা যায় নি। এগুলিকে অপঠিত (undeciphered) বা অশ্রেণীবদ্ধ (unclassified) লিপি বলা যায়। যেমন—ভারতের সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত সিন্ধুলিপি (Indus Script), ইউরোপের প্রাচীন দেশ ক্রীটে প্রাপ্ত ক্রীট বা মীনোয়ান লিপি (Cretan/Minoan Script), প্রাচীন আমেরিকার আদিবাসীদের মায়া লিপি (Maya Script) ও আজ্‌টেক্ লিপি (Aztec Script) ইত্যাদি।

(ক) সুমেরীয় বাণমুখ লিপি : কোনো কোনো ভাষাতত্ত্ববিদ্ সুমেরীয় লিপি ও বাণমুখ লিপিকে দু'টি পৃথক্ ধারা রূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আসলে এ দু'টি পৃথক্ ধারা নয়, একই ধারা। সুমেরীয় হল জাতির নাম, বাণমুখ হল তাদের লিপি-পদ্ধতির নাম। লিপিবিশেষজ্ঞ ডেভিড্ ডিরিঙ্গার বলেছেন[৯]—যীশুখ্রীস্টের জন্মের বহু বর্ষ আগে সুমেরীয়দের একটি শাখা মেসোপোটেমিয়ায় প্রবেশ করে। তারাই কাঁচা মাটির টালির উপরে কীলক বা বাটালি বসিয়ে যে লিপি লিখত তারই নাম Cuneiform লিপি ; লাতিন ভাষায় Cuneus মানে কীলক বা বাটালি (wedge) আর forma মানে আকৃতি। এই জন্যে বাণমুখ (arrow-headed) নামটিও এখন সুপ্রযুক্ত মনে হয় না। জার্মানদের দেওয়া Keilschrift-এর অনুসরণে এর নাম দেওয়া যায় কীলক লিপি। এই লিপি প্রথমে চিত্রলিপি হলেও পরে ভাবলিপি ও ধ্বনিলিপিতে পরিণত হয়। সুমেরীয়, আসীরীয় ও ব্যাবীলনীয়রা এই লিপি ব্যবহার করত এবং শেষে পারস্য দেশে আর্যদের প্রাচীন পারসিক ভাষা লেখার জন্যেও এই লিপি ব্যবহৃত হয়। এই লিপি এখন বিলুপ্ত, এর কোনো উত্তরাধিকার নেই।

(খ) চীনীয় লিপি : মূলত চিত্রলিপি থেকে চীনীয় লিপির জন্ম। চীনে প্রচলিত লৌকিক ঐতিহ্য থেকে জানা যায় মরমিয়া সাধনায় ব্যবহৃত আটটি প্রতীক চিত্র (pa kua) থেকে সেখানে চিত্রলিপি বিকাশ লাভ করে। অবশ্য চিত্রলিপি থেকে জন্ম হলেও চীনা লিপি এখন ভাবলিপিতে উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এই লিপি এখনো অক্ষরলিপি বা বর্ণলিপির স্তরে এসে পৌঁছায় নি। চীনালিপি

৯। "It seems that the great invention was due to the Sumerians, a people who spoke not a Semitic or Indo-European, but an agglutinating language....Some scholars, however, are beginning to doubt whether we are right in crediting the Sumerians with this achievement......Whatever the truth, the earliest exant written cuneiform documents...are...probably in the Sumerian language."–Diringer, David : *The Alphabet,* Vol. I, London : Hutchinson & Co. (Pub) Ltd., 1968, pp. 17-18.

কবে সূচিত হয়েছিল তা জানা যায় না, তবে খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দেও এই লিপি ছিল এমন অনুমান করা হয়। এই লিপি চীনা ভাষা ছাড়াও এখন ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে জাপানি ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়।

(গ) মিশরীয় চিত্রপ্রতীক লিপি : একদা মিশরে প্রচলিত এই লিপির উৎস নিশ্চিতরূপে জানা যায় নি, কিন্তু খ্রীঃ পূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে এই লিপি প্রচলিত ছিল বলে অনুমান করা হয়। গ্রীকেরা প্রাচীন মিশরে পুরোহিতদের মধ্যে যে লিপি-পদ্ধতি প্রচলিত দেখে, পরবর্তী কালে তাকেই তারা hieroglyphiká grammatá (খোদিত পবিত্র বর্ণ) (hierós = পবিত্র, gly phein = খোদাই করা, grámma = বর্ণ, অক্ষর) নামে অভিহিত করে। তা-ই থেকে প্রাচীন মিশরীয় লিপির নাম হয় hieroglyph বা পবিত্র লিপি। অবশ্য পুরোহিতরা ছাড়া অন্যান্যরাও ব্যাপক ক্ষেত্রে এই লিপি ব্যবহার করত। এই লিপিতে রেখাচিত্রগুলি শব্দের প্রতীক বা অক্ষরের প্রতীক রূপে ব্যবহার করা হত বলে একে বাংলায় চিত্রপ্রতীক লিপি বলা যায়। মিশরের প্রাচীন চিত্রপ্রতীক লিপি জটিল ছিল এবং তাতে প্রতীকের সংখ্যাও খুব বেশি ছিল--পাঁচ শ'য়ের কাছাকাছি। ক্রমে এই লিপি-পদ্ধতি ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্যে সরলীকৃত হয় এবং দ্রুত লিখনের জন্যে এতে টানা হাতের লেখার রীতি (cursive system) গড়ে উঠে। মিশরের চিত্রপ্রতীক লিপির সরলীকৃত টানা লেখার নাম হয় hieratic। এবং তা থেকে আরো সংক্ষেপিত লিপি-পদ্ধতির সৃষ্টি হয় যার নাম demotic। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়নের সৈন্যরা মিশরে যে রোসেটা প্রস্তর-লিপি (Rosetta Stone) আবিষ্কার করে তাতে hieroglyphic, demotic ও Greek লিপি পাওয়া যায় এবং তার সাহায্যে মিশরীয় লিপির পাঠোদ্ধার অনেকটা সহজসাধ্য হয়েছে।

সেমীয়-হামীয় (Semitic-Hamitic) ভাষাবংশের একটি শাখা হল সেমীয় শাখা। এই শাখার দু'টি উপশাখা—পূর্বী ও পশ্চিমা। পূর্বী শাখার ভাষা আসীরীয় (Assyrian), আক্কাদীয় (Akkadian) এবং ব্যাবীলনীয় (Babylonian) বাণমুখ লিপিতে লেখা হত, একথা আগে বলা হয়েছে। পশ্চিমা উপশাখার দু'টি গোষ্ঠী—দক্ষিণী ও উত্তরা। উত্তরা গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে কানানীয় (Canaanite), ফিনীসীয় (Phœnician) এবং আরামীয় (Aramaie) ভাষা। পশ্চিমা সেমীয় উপশাখার উত্তরা গোষ্ঠীর ফিনীসীয় ও আরামীয়রা মিশরীয়দের কাছ থেকে লিপিবিদ্যা গ্রহণ করে এবং তারাই মিশরীয় চিত্রপ্রতীকে (Hieroglyph) ব্যবহৃত

অক্ষরলিপি (Syllabic Script) থেকে ক্রমে বর্ণলিপি (Alphabetic Script) সৃষ্টি করে। সিরিয়া (Syria) ও প্যালেস্টাইন্ (Palestine) অঞ্চলে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে এই বর্ণলিপির প্রচলন হয়। তাদের আবিষ্কৃত বর্ণমালা থেকে পৃথিবীর অধিকাংশ আধুনিক বর্ণমালার জন্ম। পশ্চিমা সেমীয় উপশাখার উত্তরা গোষ্ঠীর আবিষ্কৃত এই বর্ণমালার দু'টি প্রধান ধারা—আরামীয় ও ফিনীসীয়। ফিনীসীয় ধারা থেকে গ্রীকেরা আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে তাদের বর্ণলিপি গ্রহণ করে তার অনেক পরিবর্তন করে এবং গ্রীক বর্ণমালা গড়ে তোলে। এই গ্রীক বর্ণমালা থেকে ক্রমবিবর্তনের ফলে লাতিন ভাষায় ব্যবহৃত রোমীয় লিপির (Roman Alphabet) বিকাশ হয়। এই রোমীয় বর্ণমালা আধুনিক ইউরোপের প্রধান ভাষা ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতিতে গৃহীত হয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিমা সেমীয় উপশাখার উত্তরা গোষ্ঠীর আরামীয় ধারা থেকে প্রাচীন ভারতের দু'টি মূল লিপিমালা ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠীর জন্ম। এই ব্রাহ্মী থেকে আধুনিক ভারতের বাংলা, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার লিপির জন্ম।

(ঘ) সম্ভাব্য ভারতীয় লিপি : বাংলা লিপির উৎস ও ইতিহাস : প্রাচীন ভারতের আদি লিপিমালা দু'টি—ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী। এদের থেকে পরবর্তী কালের সমস্ত ভারতীয় লিপির জন্ম। এদের মধ্যে খরোষ্ঠীর উৎস নিঃসন্দেহে বহির্ভারতীয়—সেমীয়। কিন্তু ব্রাহ্মী লিপির উৎস সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ মনে করেন ভারতবর্ষেই ব্রাহ্মী লিপির জন্ম হয়েছিল। এড্ওয়ার্ড টমাসের (Edward Thomas) মতে ব্রাহ্মী লিপি ভারতের প্রাক্-আর্য জাতি দ্রাবিড়দের আবিষ্কার। সুধাংশু কুমার রায়ের সিদ্ধান্ত হল—সিন্ধুলিপি (Indus Script) থেকে ব্রাহ্মী লিপির জন্ম।[১০] কিন্তু সিন্ধুলিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভব হয় নি। সুতরাং এই মত এখনো নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। ড'সন্ (Dowson) ও কানিংহাম্ (Cunningham) মনে করেন—ভারতীয় পুরোহিতেরা চিত্রলিপি থেকে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মী লিপি রচনা করে। ব্রাহ্মী লিপির ভারতীয় উৎসের সমর্থনে বলিষ্ঠ তথ্য-প্রমাণ না থাকায় উপর্যুক্ত মতগুলি গ্রহণ করা যায় না।

১০। *Indus Script : Memorandum No. I,* New Delhi, 1963 ; *Memorandum No. 2,* New Delhi, 1965 ; *Indus Script : Methods of My Study,* New Delhi, 1966.

যাঁদের মতে বিদেশি উৎস থেকে ব্রাহ্মী লিপির জন্ম তাঁরা এ বিষয়ে একমত যে, সেই উৎসটি হল সেমীয় লিপি। কিন্তু সেমীয় লিপির কোন্ ধারা বা উপধারা থেকে ব্রাহ্মীর জন্ম সে-বিষয়ে মতভেদ আছে। আমরা জানি, সেমীয়-হামীয় ভাষাবংশের একটি শাখা হল সেমীয় শাখা। এই শাখার দু'টি উপশাখা হল—পূর্বী ও পশ্চিমা। পূর্বী উপশাখার ভাষাগুলি বাণমুখ লিপিতে লেখা হত। পশ্চিমা উপশাখার দু'টি ভাগ—উত্তরা ও দক্ষিণী। উত্তরা গোষ্ঠীর ভাষা ছিল—কানানীয় (Canaanite), ফিনীসীয় (Pœnician) ও আরামীয় (Aramaic)। এই উত্তরা গোষ্ঠীর সেমীয় ভাষাভাষীরা মিশরীয়দের কাছ থেকে লিপিবিদ্যা গ্রহণ করে মিশরীয় চিত্রপ্রতীকে (Hieroglyph) ব্যবহৃত অক্ষরলিপি (Syllabic Script) থেকে বর্ণলিপি (Alphabetic Script) গড়ে তোলে। এই বর্ণলিপির দু'টি প্রধান ধারা—ফিনীসীয় ও আরামীয়। ব্রাহ্মী লিপির বিদেশীয় উৎস সম্পর্কে যে দু'টি মত দেখা যায় তাতে একটির সিদ্ধান্ত হল—ব্রাহ্মী লিপি ফিনীসীয় লিপি থেকে জাত ; অন্যটির সিদ্ধান্ত হল—ব্রাহ্মী লিপি আরামীয় লিপি থেকে জাত।

ব্রাহ্মী লিপির বর্ণগুলির সঙ্গে ফিনীসীয় লিপির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বর্ণের সাদৃশ্য দেখে ব্যুলার্ (Bühler), ভেবর্ (Waber), উইলিয়াম্ জোন্স্ (William Jones) প্রমুখ মনীষীরা সিদ্ধান্ত করেন—ব্রাহ্মী লিপি ফিনীসীয় লিপি থেকে জন্মলাভ করেছে। কিন্তু আধুনিক লিপি বিশেষজ্ঞ ডেভিড্ ডিরিঙ্গার (David Diringer) মনে করেন—ব্রাহ্মী লিপির জন্ম ফিনীসীয় লিপি থেকে নয়, আরামীয় লিপি থেকে। কারণ ব্রাহ্মী লিপির যখন জন্ম হয় (আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম-সপ্তম শতাব্দী), তখন ভূমধ্যসাগরের (Mediterranean) পূর্ব উপকূলের অধিবাসীদের সঙ্গে ভারতীয়দের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগই ছিল না। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলের অধিবাসী গ্রীকেরা—যারা ফিনীসীয় লিপি গ্রহণ করেছিলেন—অনেক পরে আলেক্জাণ্ডারের সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ৩২৭-২৮) ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। ডিরিঙ্গারের এই যুক্তি অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্তই গ্রহণীয় —আরামীয় লিপি থেকেই ব্রাহ্মী লিপির জন্ম। আরামীয় (Aramaic) লিপি থেকে ভারতের আদি লিপি ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী দু'য়েরই জন্ম।[১১] এই দুই লিপির প্রাচীনতম

১১। "All historical and cultural evidence is best co-ordinated by the theory which considers the early Aramaic alphabet to be the prototype of the Brahmi script. The acknowledged resemblance of the Brahmi signs to the Phœnician letters also applies to the early Aramaic letters, while in my opinion there

নিদর্শন পাওয়া যায় অশোকের অনুশাসনে (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী)। ব্রাহ্মী লেখা হত মূলত বাম থেকে ডান দিকে, যদিও ডান থেকে বাম দিকে লেখা ব্রাহ্মীরও নিদর্শন পাওয়া যায়। আর খরোষ্ঠী লেখা হত শুধুই ডান থেকে বাম দিকে। খরোষ্ঠী ব্যবহৃত হত সেমিটিক্ ভাষা (আরবি প্রভৃতি) লেখার জন্যে এবং তা থেকে আধুনিক উর্দু ভাষার লিপির জন্ম। আর ব্রাহ্মী ব্যবহৃত হত অ-সেমিটিক ভাষা (সংস্কৃত, প্রাকৃত প্রভৃতি) লেখার জন্যে এবং তা থেকে আধুনিক নাগরী, বাংলা প্রভৃতি অধিকাংশ ভারতীয় লিপির জন্ম।

ব্রাহ্মী লিপির প্রসারের ফলে এর নানা আঞ্চলিক রূপ গড়ে উঠেছিল। খ্রীস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীতে ব্রাহ্মী লিপির তিনটি প্রধান আঞ্চলিক রূপ পাই —উত্তর ভারতীয়, দক্ষিণ ভারতীয় ও বহির্ভারতীয়। ক্রমবিকাশের নানা স্তরের মাধ্যমে উত্তর ভারতীয় লিপি থেকে বাংলা, নাগরী প্রভৃতি, দক্ষিণ ভারতীয় লিপি থেকে তামিল, তেলুগু প্রভৃতি এবং বহির্ভারতীয় লিপি থেকে তিব্বতী, বর্মী, শ্যামদেশীয়, যবদ্বীপী প্রভৃতি লিপির জন্ম হয়েছে।

ব্রাহ্মী লিপি থেকে যে উত্তর ভারতীয় লিপিটি গড়ে উঠেছিল তা পূর্ণ বিকশিত বিশিষ্ট রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে খ্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে অর্থাৎ গুপ্তযুগে। এই জন্যে তখনকার উত্তর ভারতীয় লিপিকে 'গুপ্তলিপি' বলা হয়। এই গুপ্তলিপি দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়—পূর্বী ও পশ্চিমা। এই পূর্বী ধারাটি আবার দু'টি উপধারায় বিভক্ত হয়ে যায়—পূর্বী ও পশ্চিমা। গুপ্তলিপির পূর্বী ধারার পশ্চিমা উপধারা থেকে খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'সিদ্ধমাতৃকা' লিপির জন্ম হয়। এই সিদ্ধমাতৃকা লিপির একটি জটিলতর রূপ খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গড়ে উঠে ; তার নাম হয় 'কুটিল লিপি'। ড. সুকুমার সেন সিদ্ধান্ত করেছেন : "এই কুটিল লিপি হইতে বাঙ্গালা লিপির উদ্ভব।"[১২] এই কুটিল লিপি থেকে ভারতের বহু-প্রচলিত 'নাগরী' বা 'দেবনাগরী' লিপিরও বিকাশ হয়। খ্রীস্টীয়

---

can be no doubt that of all the Semites, the Aramæan traders were the first who came in direct communication with the Indo-Aryan merchants. We need not assume that the Brahmi is a simple derivative of the Aramaic alphabet. It was probably mainly the *idea* of alphabetic writing which was accepted, although the shapes of many Brahmi signs show also Semitic influence."–Diringer, David : *The Alphabet,* Vol. I, London : Hutchinson & Co. (Pub.) Ltd., 1968, p. 262.

১২। সেন, অধ্যাপক ড. সুকুমার : 'ভাষার ইতিবৃত্ত', ১৯৭৫, পৃঃ ১৮।

সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে নাগরী লিপিতে লিখিত প্রত্নলেখ পাওয়া যাচ্ছে। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে নাগরী লিপি প্রায় পূর্ণ বিকশিত আধুনিক রূপ লাভ করে। এই লিপি এখন সংস্কৃত, হিন্দি, নেপালি, মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় ব্যবহৃত হয়। বাংলা লিপির উৎস সম্পর্কে দু'টি মত প্রচলিত আছে। নাগরী লিপির দু'টি প্রকারভেদ গড়ে উঠেছিল—পূর্ব-ভারতীয় ও পশ্চিম-ভারতীয়। ব্যুলারের (Bühler) মতে এর পূর্ব-ভারতীয় রূপটি থেকেই প্রত্ন-বাংলা লিপি (Proto-Bengali Script) খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে গড়ে উঠে। অন্য দিকে এস্.এন্ চক্রবর্তীর মতে[১৩] প্রস্তরে খোদিত উত্তর ভারতীয় লিপির দু'টি শাখা ছিল—পূর্বী এবং পশ্চিমা। পশ্চিমা শাখাটি থেকে সিদ্ধমাতৃকা লিপির জন্ম হয়। আর পূর্বী শাখাটি থেকে স্বতন্ত্র ধারায় প্রত্ন-বাংলা' লিপির জন্ম হয় খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতেই। আমাদের মনে হয় সিদ্ধমাতৃকা লিপির যে জটিলতর রূপ কুটিল লিপি তা থেকে দুই স্বতন্ত্র ধারায় প্রায় সমান্তরালভাবে নাগরী ও বাংলা লিপির বিকাশ হয়েছিল, নাগরী লিপি থেকে বাংলা লিপির জন্ম হয় নি। অবশ্য নাগরী লিপির কিছু প্রভাব প্রত্ন-বাংলা লিপির উপরে পড়েছিল।

যাই হোক, প্রত্ন-বাংলা লিপির নিজস্ব রূপটি খ্রীস্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতেই গড়ে উঠেছিল। এই প্রত্ন-বাংলা লিপির প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় নারায়ণ পালের তাম্রশাসনে (খ্রীঃ নবম শতাব্দী) এবং মহীপালের বাণগড় দানলিপিতে (আনুমানিক ৯৭৫-১০২৬ খ্রীঃ)। খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দীর বিজয় সেনের দেবপাড়া লিপিতে এবং তারপরে লক্ষ্মণ সেনের তর্পণ-দীঘি লিপিতে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলা লিপির বিবর্তনের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। সেন-যুগে চ, ছ, ঝ, ট, ণ, হ প্রভৃতি কয়েকটি অক্ষর বাদে বাকিগুলি সুগঠিত রূপ লাভ করে। ঢাকায় দ্বাদশ শতকের একটি প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তিতে যে বাংলা অক্ষর পাওয়া গেছে বিশেষজ্ঞদের মতে তাতে 'বাংলা অক্ষরের পূর্ণ আকার প্রথম প্রত্যক্ষ করা গেল।' বাংলা লিপি যে এই সময়ে বেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল তার প্রমাণ বহির্বঙ্গেও তার নিদর্শন পাওয়া গেছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচয়িতা ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন জাপানের কোনো মন্দিরে খ্রীস্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে বাংলা অক্ষরে লিখিত গ্রন্থ রক্ষিত আছে এবং যবদ্বীপে খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলা অক্ষরে লিখিত প্রত্নলিপি পাওয়া গেছে। বাংলা

১৩। Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol. VI, 1938, pp. 351-91.

লিপির যেসব প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ যথার্থই সিদ্ধান্ত করেছেন বাংলা লিপি নাগরী লিপি থেকে জন্মলাভ করে নি, বাংলা লিপি নাগরী লিপির সঙ্গে সমান্তরাল স্বতন্ত্র ধারায় বিকাশলাভ করেছিল :

> "ব্রাহ্মী অক্ষর...খ্রীষ্টীয় ৮ম-১০ম শতাব্দীর মধ্যে বাংলা অক্ষরের জন্মদান করিয়াছে। দেবনাগরী অক্ষর ব্রাহ্মী লিপির আরেকটি রূপান্তর মাত্র। দেবনাগরী অক্ষর হইতে বাংলা লিপির জন্ম হয় নাই। কারণ নাগরী অক্ষরের আদিম রূপ দক্ষিণ-পশ্চিমের নাগরী লিপি উত্তর-ভারতে প্রভুত্বস্থাপনের পূর্বেই বাংলা লিপির প্রাথমিক নিদর্শন মিলিতেছে।...দক্ষিণ-পশ্চিমের এই নাগরী লিপি উত্তর-পশ্চিম ভারতে আধিপত্য স্থাপন করে অনেক পরে—অন্ততঃ ১০ম শতাব্দীর পূর্বে নহে।"[১৪]

বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্যসৃষ্টি চর্যাগীতিগুলি খ্রীস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হলেও ঐ সময়ের লেখা চর্যাগীতির কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। চর্যাগীতির যে পুঁথিটি নেপালের রাজদরবার থেকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করেন তাতে কোনো লিপিকাল লিখিত নেই। ড. সুকুমার সেনের মতে তার লিপিকাল আনুমানিক চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে।[১৫] ড. সেনের অনুমান গ্রহণ করলে শিলালিপি-প্রত্নলিপির বাইরে সাহিত্য রচনার পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত বাংলা লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করতে হয় খ্রীস্টীয় চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে অনুলিখিত চর্যাগীতির পাণ্ডুলিপিকে। আবার বাংলা ভাষার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রচনাকাল সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এর যে পুঁথিটি আবিষ্কার করেন তার লিপিকালও কারো কারো মতে আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দী।[১৬] অথচ এই পুঁথিতে বাংলা

১৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ড. অসিতকুমার : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ১ম খণ্ড, ১৯৫৯, পৃঃ ১২১।

১৫। "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের পুঁথি খুব প্রাচীন নয়, চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে অনুলিখিত বলিয়া অনুমান হয়।"—সেন, অধ্যাপক ড. সুকুমার : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, ১৯৪৮, পৃঃ ৪৬।

১৬। "যোগেশচন্দ্র রায় অনুমান করিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথি ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে লেখা হইয়াছিল। আমার অভিমত ছিল আরো পরে, ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে।" —সেন, অধ্যাপক ড. সুকুমার : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, ১৯৪৮, পৃঃ ১৬৫।

লিপির আরো এক ধাপ লক্ষণীয় অগ্রগতির চিহ্ন রয়েছে। এই অগ্রগতি সাধিত হতে কম পক্ষে দু-এক শতাব্দী লেগেছিল। অর্থাৎ চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির লিপিকালের মধ্যে দু'-একশ' বছর ব্যবধান হওয়াই স্বাভাবিক। অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় চর্যার পুঁথির লিপি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। তাঁর মতে, "চর্যার পুঁথির লিপিকাল জানা যায় নি বটে তবে তারিখওয়ালা অনেক পুঁথির অক্ষরের সঙ্গে চর্যার পুঁথির অক্ষরের মিল আছে। সবচেয়ে বেশি মিল আছে ১১৯৯ খ্রীস্টাব্দে অনুলিখিত 'পঞ্চাকার' পুঁথির সঙ্গে। এই পুঁথিখানির অক্ষর আর চর্যাচর্যবিনিশ্চয় পুঁথির অধিকাংশ অক্ষর হুবহু এক তো বটেই, লেখার ধাঁচও এক।"[১৭] এই যুক্তিতে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, "চর্যার পুঁথির লিপিকাল দ্বাদশ শতকের শেষার্ধ।"[১৮] আমাদের মনে হয় চর্যার পুঁথির লিপিকাল বড় জোর খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে পারে ; কিন্তু ড. সেনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চতুর্দশ-ষোড়শ শতাব্দী নয়। যাই হোক, চর্যার পর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিতে বাংলা লিপির একটি নতুন পর্বের, নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। চর্যার লিপিকে যদি আমরা প্রাচীন বাংলা লিপির নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করি তা হলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকে মধ্যযুগের বাংলা লিপির নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা যায়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাণ্ডুলিপিতে বাংলা লিপির প্রায় পূর্ণ বিকশিত রূপটি বিধৃত রয়েছে। এই পুঁথির লিপিকাল, আগেই বলেছি, ষোড়শ শতাব্দী। এর পরে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা লিপির আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো বিবর্তন-পরিবর্তন ঘটে নি।[১৯]

এর পরে বাংলা লিপির আর একবার পরিবর্তন-পরিমার্জন হয় যখন মুদ্রাযন্ত্রের জন্যে সমগ্র বাংলা লিপির কাঠামো তৈরি করা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে। মাঝখানে বাংলা লিপির দু'-একটি বিচ্ছিন্ন মুদ্রিত রূপের উল্লেখ বা নিদর্শন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে বাংলা লিপির সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় না। ফাদার হস্টেন ১৬৯২ খ্রীস্টাব্দে লিখিত একটি গ্রন্থে বাংলা মুদ্রিত

১৭। মুখোপাধ্যায়, ড. তারাপদ : 'চর্যাগীতি', কলকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ৬৩-৬৪।

১৮। তদেব, পৃঃ ৯৬।

১৯। "In the fifteenth and sixteenth centuries the Bengali character appears fully developed. Indeed, during the seventeenth and eighteenth centuries there appear no changes at all"– Diringer, David : *The Alphabet,* Vol. I, London : Hutchinson & Co. (Pub.) Ltd, 1968, p. 287.

লিপির প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেই গ্রন্থটি লিপি-বিশেষজ্ঞদের হস্তগত না হওয়ায় তখনকার মুদ্রিত বাংলা লিপির আকৃতি সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় না। এর পরে ১৭২৫ খ্রীস্টাব্দে জার্মানিতে মুদ্রিত একটি গ্রন্থে (Urent Szeb) দু'-একটি বাংলা সংখ্যা ও দু'-একটি বাংলা শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে বাংলা লিপির সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় না। বাংলা মুদ্রিত লিপির প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া যায় ন্যাথানিয়েল্ ব্রাসি হ্যাল্‌হেড্ লিখিত 'A Grammar of the Bengal Language' গ্রন্থে (১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে)। ড. সুকুমার সেন তো মনে করেন "এই ব্যাকরণে বাঙ্গালা টাইপ সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইল।"[২০] 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পুঁথির সময় থেকেই বাংলা লিপির যে আকৃতি গড়ে উঠেছিল তার ক্রমবিকশিত রূপটি সামনে রেখে কালীকুমার রায় ও খুসমৎ মুন্‌সী-র হাতের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী চার্লস্ উইল্‌কিন্স্ হ্যাল্‌হেডের ব্যাকরণের জন্যে বাংলা ছাপা লিপির যে আদর্শটি গড়ে দেন সেই অনুসারে পঞ্চানন কর্মকার ও মনোহর কর্মকার বাংলা লিপির ছাঁদ তৈরি করে দেন। সেই ছাঁদে বাংলা লিপির যে মূল রূপটি দাঁড়িয়ে যায় মোটামুটি তা-ই দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাংলা ছাপা লিপির আদর্শ হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে বাংলা বানান-সংস্কার ও ছাপার জগতে লাইনো টাইপ, মনোটাইপ ইত্যাদি প্রবর্তন ও অফসেট মুদ্রণ-রীতি প্রভৃতি নতুন-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বাংলা লিপির সরলীকরণ ও সুদৃশ্য রূপায়ণ হয়ে চলেছে। ৫১ নং চিত্রে বিভিন্ন ধাপের মধ্যে দিয়ে বাংলা লিপির উৎস ও ক্রমবিকাশ দেখানো হয়েছে।[২১]

২০। সেন, ড. সুকুমার : 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য', ১৩৭৩, পৃঃ ১৩।

২১। এই চিত্রটি প্রস্তুত করার ব্যাপারে বর্তমান গ্রন্থকার নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহের কাছে ঋণী : (ক) *The Alphabet*, Vol. II–Diringer, David (Hutchinson & Co. Pub. Ltd., London, 1968), (খ) *The Origin of the Bengali Script*–Bandyopadhyay, R. D. (Calcutta University, 1919), (গ) 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ১ম খণ্ড—বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার (মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ১৯৫১), (ঘ) 'চর্যাগীতি—মুখোপাধ্যায়, ড. তারাপদ (বিশ্বভারতী, ১৯৬৫), (ঙ) চর্যাগীতিকোষ—সেন, ড. নীলরতন (দে বুক স্টোর, ১৯৭৮)।

চিত্র নং ৫১ : বাংলা লিপির উৎস ও ক্রমবিকাশ

॥ ৩২ ॥

ভাষাসংযোগ : মিশ্রভাষা ও ভাষাঋণ
(Language Contact : Mixed Language and Borrowing)

যখন এক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী অন্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে অথবা এক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী নিজের প্রান্ত-এলাকায় অন্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগে আসে তখন ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি নানা স্বাভাবিক কারণে একাধিক ভাষার মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় ; তখন পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের জন্যে এক ভাষাসম্প্রদায়ের লোকে অন্য ভাষাসম্প্রদায়ের ভাষা বলতে ও বুঝতে চেষ্টা করে। এর ফলে ভাষার পরিবর্তনের ধারায় নানা প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। এই সব প্রক্রিয়ার মধ্যে মিশ্রভাষা সৃষ্টি (Creation of Mixed Language), দ্বিভাষিকতা (Bilingualism), বহুভাষিকতা (Polyglottism/Multilingualism), ভাষাঋণ (Borrowing) ইত্যাদি প্রধান। অবশ্য দ্বিভাষিকতা, বহুভাষিকতা ও ভাষাঋণ উপর্যুক্ত গোষ্ঠীগত সংযোগ ছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষার প্রয়োজনেও সাধিত হতে পারে। যেমন—মনীষী হরিনাথ দে, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত গুপ্ত, প্রণবেশ সিংহরায় প্রভৃতি পণ্ডিতের বহুভাষিকতা জনগোষ্ঠীগত সংযোগ নয়, বহুভাষা-প্রীতির বশে ব্যক্তিগত উদ্যোগেই সাধিত। দ্বিভাষিকতা ও বহুভাষিকতা থেকে মিশ্রভাষা সৃষ্টির তফাৎ এই যে, দ্বিভাষিকতা ও বহুভাষিকতা ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ভাষাগোষ্ঠীগত সংযোগ দুই কারণেই সাধিত হতে পারে, কিন্তু মিশ্রভাষাসৃষ্টি সাধারণত গোষ্ঠীগত সংযোগের ফলেই সাধিত হয়। এছাড়া দু'টি প্রক্রিয়ার মধ্যেও পার্থক্য আছে। খাঁটি দ্বিভাষী বা বহুভাষী লোকেরা যে ভাষা যখন বলে শুধু সেই ভাষাটিই তারা তখন অবিমিশ্রভাবে বলে এবং তারা একাধিক ভাষা বিশুদ্ধভাবে জানে ও বলতে পারে। কিন্তু মিশ্র ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একাধিক ভাষার মিশ্রণে একটি নতুন 'খিচুড়ি' জাতীয় বিকৃত মিশ্রভাষা তৈরি হয় এবং তাতে একাধিক ভাষার উপাদান একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় মিশ্রভাষা শুধু কাজ-চালানো-গোছের ভাষা (Make-shift language), এতে কোনো উচ্চমানের ভাব-বিনিময় বা সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। শিক্ষিত লোকের কাছে এই জাতীয় বিকৃত ভাষা হাসির উদ্রেক করে। সাহিত্যেও এই জাতীয় ভাষা হাস্যরস সৃষ্টির জন্যে তুলে ধরা হয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'খট্টাঙ্গ ও পলান্ন' গল্পে খাটের ব্যবসায়ী একটি চীনেম্যানের সঙ্গে একটি বাঙালি ছেলের দরকষাকষির

মধ্যে চীনা উচ্চারণ, বাংলা বাক্যগঠন-রীতি ও ইংরেজি শব্দের মিশ্রণে সৃষ্ট একটি অদ্ভুত মিশ্রভাষার চমৎকার নমুনা পাই—

"চীনেম্যান বললে, কাম কাম, বাবু। হোয়াত্ ওয়ান্ত? (What want?)

টেনিদার ইংরেজি বিদ্যেও চীনেম্যানের মতোই। বললে, কট্ ওয়ান্ট্।

—কত্? ভেরি নাইস্ কত্ দেয়ার আর মেনি। হুইচ্ তেক? (Cot? Very nice cot. There are many. Which take?)

—দিস্।...একটা দেখিয়ে দিয়ে টেনিদা বললে, কত দাম?

—তু হান্দ্রেদ্ লুপীজ (Two hundred rupees)।

—অ্যাঁ—দুশো টাকা! ব্যাটা বলে কী! পাগল না পেট খারাপ? কী বলিস্ প্যালা—এর দাম দুশো হয় কখনো?

চুপ করে থাকাই ভালো। যা দেখছি তা আশাপ্রদ নয়। পুরোনো খাট—রং-চং করে একটু চেহারা ফিরাবার চেষ্টা হয়েছে। খাট দেখে একটুও পছন্দ হল না। কিন্তু টেনিদা যখন পছন্দ করেছে, তখন প্রতিবাদ করে মার খাই আর কি! না হয় ম্যালেরিয়াতেই ভুগছি, তাই বলে কি এতই বোকা?

বললাম, 'হুঁ, বড্ড বেশি বলছে।

টেনিদা বললে, সব ব্যাটা চোর। ওয়েল মিস্টার চীনেম্যান, পনেরো টাকায় দেবে?

হো-হোয়তে? ফিপ্তিন লুপীজ? দোন্ত জোক বাবু। গিভ্ এইতি লুপীজ। (What? Fifteen repees? Don't joke, Babu! Give eighty rupees).

—নাও—নাও চাঁদ—আর পাঁচ টাকা দিচ্ছি—

—দেন গিভ্ ফিপ্তি—

শেষ পর্যন্ত পঁচিশ টাকায় রফা হল।"

বাংলায় ভাষামিশ্রণের সবচেয়ে বেশি হাস্যজনক নিদর্শন পাওয়া যায় বাংলা-হিন্দি মিশ্রণে। পরশুরামের 'লম্বকর্ণ' গল্পে রায়বাহাদুর বংশলোচন চান বাড়িতে একটি ছাগল পুষতে, কিন্তু তাঁর গৃহিণী সেটা পছন্দ করেন না। এই নিয়ে কর্তা-গিন্নীর কলহ এবং হিন্দুস্থানী দারোয়ান চকুন্দর সিং-এর প্রতি তাঁদের মিশ্র-হিন্দিতে পরস্পর-বিরোধী হুকুম—

"রায়বাহাদুর...মনে মনে তাল ঠুকিয়া বাড়ির ভিতরে আসিলেন। গৃহিণী তাঁহার প্রতি দৃক্পাত না করিয়া দারোয়ানকে বলিলেন—'ছাগলটাকে আভি নিকাল দেও, একদম ফটকের বাইরে। নেই তো এক্ষুনি ছিষ্টি নোংরা করেগা।'

চকুন্দর বলিল—'বহুত আচ্ছা।'

বংশলোচন পাল্টা হুকুম দিলেন—'দেখো চকুন্দর সিং, এই বকরি গেটের

নাইয়ে যাগা তো তোমরা নোকরি ভি যাগা।'

চকুন্দর বলিল—'বহুত আচ্ছা'।"

ভাষাঋণ আবার দ্বিভাষিকতা, বহুভাষিকতা ও মিশ্রভাষা সৃষ্টি থেকে পৃথক্ একটি প্রক্রিয়া। এতে যে একই ব্যক্তি একাধিক ভাষা বিশুদ্ধ ভাবে বলতে পারে, তা নয় ; বা এতে যে একাধিক ভাষার উপাদান মিশ্রিত করে একটি বিকৃত ভাষা সৃষ্টি হয়, তাও নয়। এতে একটি ভাষা স্ব-স্বরূপে প্রায় অবিকৃত থাকে, শুধু অন্য ভাষা থেকে কিছু উপাদান তাতে গৃহীত হয়ে যায়। মিশ্র ভাষায় একাধিক ভাষার উপাদানের মিশ্রণের ফলে একটি বিকৃত ভাষার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভাষাঋণ প্রক্রিয়ায় একটি ভাষা অন্য ভাষা থেকে উপাদান নিয়ে নিজের গঠনে তাকে আত্মসাৎ (assimilate) করে ফেলে। এতে ভাষার আংশিক মিশ্রণ হয় বটে, কিন্তু কোনো ভাষার বিকৃতি হয় না, একটি ভাষা বরং সমৃদ্ধ হয়।

মিশ্রভাষা (Mixed Language) :

ব্যবসায়িক বা অন্যবিধ প্রয়োজনে দু'টি ভাষাসম্প্রদায়ের লোক পাশাপাশি থাকতে গিয়ে যখন তাদের উভয়ের ভাষা থেকে নির্বিচারে উপাদান গ্রহণ করে ফেলে এবং একটি প্রায় বিকৃত নিম্নমানের ভাষার সৃষ্টি করে তখন তাকে মিশ্রভাষা (Mixed Language/Jargon) বলে। পৃথিবীতে যেসব মিশ্রভাষা প্রচলিত আছে, তাদের মধ্যে এই চারটি প্রধান :—বীচ-লা-মার (Beach-La-Mar/Beche-La-Mar), পিজিন বা পিজিন-ইংরেজি (Pidgin/Pidgin English), মরিশাস ক্রেওল (Mauritius Creole) এবং চিনুক (Chinook)। পশ্চিম প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অঞ্চলে মূলত ইংরেজি ভাষার সঙ্গে অল্পস্বল্প স্পেনীয় ও পর্তুগীজ ভাষার উপাদান মিশ্রিত হওয়ার ফলে বীচ-লা-মার মিশ্রভাষাটি গড়ে উঠেছে। এই ভাষায় শব্দের কারক-বিভক্তি অনুযায়ী রূপভেদ নেই, তেমনি ক্রিয়ার কাল-পুরুষ-বচন ভেদ নেই। উদাহরণ—সে খাচ্ছে = he kaikai, সে সব খেয়েছে = he kaikai all finish। পিজিন (Pidgin) মূলত চীনে প্রচলিত, জাপানেও এর কিছু প্রচলন আছে। এটি ইংরেজি ও চীনা ভাষার মিশ্রণে গড়ে উঠেছে। উদাহরণ—তুমি ভাল আছ? = You belong ploper (এখানে proper-এর স্থানে ploper হয়েছে, 'র' স্থানে 'ল' হয়েছে, কারণ চীনা ভাষায় 'র' নেই।) মরিশাস দ্বীপে মরিশাস ক্রেওল প্রচলিত। ফরাসি ভাষার সঙ্গে নিগ্রোদের ভাষার মিশ্রণে এই মিশ্রভাষার সৃষ্টি। এতেও শব্দের বা ক্রিয়ার রূপভেদ নেই। যেমন—আমি খাবো—mo va manzé ; আমি খেয়েছিলাম—mo té manzé। উত্তর আমেরিকার ওরেগন অঞ্চলে চিনুকের প্রচলন দেখা যায়। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষা নুটকা চিনুকের সঙ্গে

মূলত ইংরেজির মিশ্রণে চিনুক মিশ্রভাষার সৃষ্টি। যেমন—তিন = ক্লোন্, শুষ্ক = ৎলাই।

ভাষাঋণ (Borrowing) :

ভাষাসংযোগের ফলে ভাষার পরিবর্তনের ধারায় যেসব প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় তাদের মধ্যে অন্যতম হল ভাষাঋণ (Borrowing)। যখন দু'টি ভাষাগোষ্ঠী ব্যবসায়িক, ভৌগোলিক অবস্থানগত, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক কারণে পরস্পরের সংযোগে আসে তখন তাদের ভাষার যদি মানগত বিকৃতি সাধন না করেও একটি ভাষার লোক অন্য ভাষার কিছু উপাদান (শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য, উচ্চারণরীতি ইত্যাদি) তার নিজের ভাষার কোনো ঘাটতি পূরণ, বৈচিত্র্য সাধন, মান উন্নয়ন বা সম্মান বৃদ্ধির জন্যে নিজের ভাষায় গ্রহণ করে এবং গৃহীত উপাদানটি যদি পুরোপুরি ঐ ভাষায় প্রচলিত হয়ে যায় তাহলে সেই প্রক্রিয়াকে ভাষাঋণ (Borrowing) বলে। যে ভাষা থেকে ঐ উপাদানটি গ্রহণ করা হয় তাকে দানকারী ভাষা (donor language) বলে ; যে ভাষায় ঐ উপাদানটি গ্রহণ করা হয়, তাকে গ্রহণকারী ভাষা (borrowing language) বলে। আর যে উপাদানটি গ্রহণ করা হয় তাকে গৃহীত আদর্শ (model) বলে।

ভাষাঋণের সর্তাবলী (Conditions of Borrowing) : ভাষাঋণ প্রক্রিয়াটি যেসব সর্তে বা পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয় তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হল দু'টি ভাষার মধ্যে সংযোগ। একটি জাতির লোক অন্য জাতিকে রাজনৈতিক দিক থেকে অধিকার করলে, এক দেশের লোক ব্যবসাবাণিজ্য বা শিক্ষার জন্যে অন্য দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করলে দু'টি ভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। তখন এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় ঋণ গৃহীত হয়।

দ্বিতীয়ত, হকেটের (Hockett) মতে, ভাষাগুলির মধ্যে আংশিক সাদৃশ্য ও আংশিক বৈসাদৃশ্য থাকা চাই। কারণ, তাঁর মতে, ভাষাগুলির মধ্যে আংশিক সাদৃশ্য না থাকলে এক ভাষার লোক অন্য ভাষার কিছুই বুঝতে পারবে না এবং বুঝতে না পারলে ভাষাঋণ গৃহীত হবে না। কিন্তু হকেট্-কথিত এই সর্তটি পুরোপুরি স্বীকার করা যায় না। কারণ, অনেক সময় ভাষাগুলির মধ্যে কোনো সাদৃশ্য না থাকলেও পরিস্থিতির চাপে, ইঙ্গিতে ইসারায় বা নিত্য ব্যবহারে অন্য ভাষার কিছু কিছু শব্দের অর্থ আমরা বুঝে নিই এবং তাকে নিজের ভাষায় গ্রহণ করি, তাতে ভাষাঋণ সংঘটিত হয়। যেমন, চীনা ভাষার সঙ্গে বাংলা বা ইংরেজি ভাষার কোনোই সাদৃশ্য নেই, কিন্তু চীনা ভাষা থেকে 'চা' শব্দটি বাংলায় এসেছে, চীনা ভাষা থেকে 'টাইফুন' (typhoon = বিশেষ এক শ্রেণীর ঝড়)

শব্দটি ইংরেজিতে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং দু'টি ভাষার মধ্যে আংশিক সাদৃশ্য না থাকলে একটি ভাষা থেকে অন্যটিতে ভাষাঋণ গৃহীত হতে পারে না এমন সর্ত স্বীকার্য নয়। তবে একটি ভাষা থেকে অন্য ভাষায় ঋণ-গ্রহণ সংঘটিত হবার জন্যে ভাষা দু'টির মধ্যে অন্তত আংশিক পার্থক্য থাকা অবশ্যই দরকার। কারণ দু'টি ভাষার মধ্যে কোনো দিক দিয়ে কোনো পার্থক্যই যদি না থাকে তবে তো সে দু'টি পৃথক্ ভাষাই নয়, একই ভাষা। সেখানে একটি থেকে অন্যটিতে গ্রহণের জন্যে কোনো নতুন উপাদানই পাওয়া যাবে না।

ভাষাঋণ সংঘটিত হবার জন্যে তৃতীয় সর্ত হল—ভিন্ন ভাষাভাষী লোকের মধ্যে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় উপাদান গ্রহণের মনোভাব বা ইচ্ছা (motive) চাই। এই মনোভাব আবার দ্বিবিধ হতে পারে বলে হকেট্ উল্লেখ করেছেন—সামাজিক সম্মান লাভের মনোভাব (Prestige Motive) ও অভাব পূরণের মনোভাব (Need-feeling Motive)। কিন্তু এর সঙ্গে আরো একটি মনোভাব কাজ করে। সেটি হল বৈচিত্র্য সাধনের মনোভাব (Variation Motive)।

যখন একটি জাতি অন্য কোনো উন্নত জাতির সংস্পর্শে আসে বা সে মনে করে যে, যে জাতির সংস্পর্শে সে এসেছে সে জাতি তার চেয়ে উন্নত, তখন সেই উন্নত জাতির ভাষা-সংস্কৃতি সে অনুকরণ করে এবং এর ফলে নিজের ভাষার শব্দভাণ্ডার তার কাছে হেয় মনে হয়, নিজের ভাষার শব্দের বদলে সে উন্নত জাতির শব্দ ব্যবহার করে। যেমন—দু'জন আধুনিক শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে একজন যখন অন্য জনের কাছে নিজের স্ত্রীকে পরিচিত করিয়ে দেন তখন তিনি বলেন—'ইনি আমার ওয়াইফ্ (wife), বা 'ইনি আমার মিসেস্'। 'ইনি আমার স্ত্রী বা পরিবার' বললে যেন তাঁর গ্রাম্য মনে হয়। এখানে স্ত্রীকে 'ওয়াইফ' (wife) বলার মূলে আছে শিক্ষিত বলে সম্মান লাভের ইচ্ছা। পূর্ববাংলার লোকে যখন নিজেদের দেশীয় উচ্চারণ 'দ্যাশ্' ছেড়ে 'দেশ' উচ্চারণ করে তখনো একই রকম মনোভাব কাজ করে। এইসব ভাষাঋণের পেছনে সামাজিক সম্মান লাভের মনোভাবটি কাজ করেছে।

যখন এক জাতির কোনো নতুন ব্যবহার-সামগ্রী বা সাহিত্য-সংস্কৃতির কোনো বিষয় অন্য জাতি গ্রহণ করে—যা তার নিজের সমাজ-সংস্কৃতিতে ছিল না—তখন সেটি প্রকাশ করার জন্যে উপযুক্ত নাম তার নিজের ভাষায় থাকে না, তখন অনেক সময় ঐ ঘাটতি পূরণের মনোভাব থেকে সে সেই জিনিস বা বিষয়টির সঙ্গে মূল ভাষা থেকে তার নামটিও নিজের ভাষায় গ্রহণ করে। যেমন—আমাদের সমাজে আগে 'চা'য়ের ব্যবহার ছিল না, চীনাদের কাছ থেকে আমরা যখন চায়ের ব্যবহার শিখলাম (যদিও পরোক্ষভাবে) তখন আমরা চীনা ভাষা

থেকে 'চা' শব্দটিও বাংলায় গ্রহণ করলাম। তেমনি আমাদের দেশে প্রাচীন সাহিত্যে ট্রাজিডি ছিল না, ইংরেজির প্রভাবে আমাদের সাহিত্যে যখন ট্রাজিডি লেখা ও অভিনয় করা শুরু হল তখন ইংরেজি থেকে আমাদের ভাষায় 'ট্রাজিডি' শব্দটিও চালু হয়ে গেল।

যখন বহুব্যবহারের ফলে এক ভাষার শব্দ তার অর্থগত ব্যঞ্জনা হারিয়ে ফেলে বা একঘেয়ে হয়ে যায় তখন সেই শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু বৈচিত্র্য-সাধনের জন্যে আমরা বিদেশি শব্দ নতুনতর ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করি। সাধারণত কবি-সাহিত্যিকেরা এরকম প্রয়োগ বেশি করে থাকেন। যেমন—"দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র বিদেশীর হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী **পোলিটিক্যাল শিক্ষা** বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।" (—রবীন্দ্রনাথ : 'স্বদেশী সমাজ')। এমনি নিজের ভাষার শব্দের শক্তি কমে এসেছে এই ধারণায় বৈচিত্র্য সৃষ্টির তাগিদে বাংলায় হিন্দি থেকে এসেছে 'বাতাবরণ' (আবহাওয়া, পরিবেশ-পরিমণ্ডল), 'লাগাতার' (নিরবচ্ছিন্ন, 'বন্ধ্' (ধর্মঘট, হরতাল) ইত্যাদি।

ভাষাঋণের প্রকারভেদ (Kinds of Borrowing / Loan) : এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় উপাদান যে গ্রহণ করা হয় সেই প্রক্রিয়ার প্রকৃতি নানা রকম হতে পারে। প্রক্রিয়ার এই প্রকৃতি অনুযায়ী ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষাঋণের কয়েকটি শ্রেণী নির্ণয় করেছেন। প্রথমত ভাষাঋণকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করে নিয়ে তার পরে ভাষাঋণের প্রধান প্রধান প্রকারভেদগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি। ভাষাঋণের প্রাথমিক দু'টি বিভাগ হল—**অবিমিশ্র ঋণ** (Unmixed Borrowing) ও **মিশ্র ঋণ** (Mixed / Hybrid Borrowing)। যখন কোনো ভাষায় অন্য ভাষার কোনো উপাদান সবটা অবিমিশ্র আকারে গ্রহণ করা হয় তখন তাকে **অবিমিশ্র ভাষাঋণ** (Unmixed Borrowing) বলতে পারি। যেমন—বাংলায় ইংরেজি থেকে গৃহীত হয়েছে 'চেয়ার্' (Chair), 'কলেজ্' (College) ইত্যাদি। আবার যখন কোনো ভাষায় অন্য ভাষার কোনো উপাদানের সবটা গ্রহণ করা হয় না, কোনো উপাদানের অংশবিশেষ গ্রহণ করা হয় বা একটা কোনো উপাদান গ্রহণ করে তার সঙ্গে নিজের ভাষার উপাদান যোগ করে একটা নতুন মিশ্র উপাদান তৈরি করা হয় তখন সেই প্রক্রিয়াকে মিশ্র ভাষাঋণ গ্রহণ (Mixed Borrowing) বলে। আংশিক ঋণ গ্রহণের ফলে এইভাবে দুই ভাষার উপাদানের মিশ্রণে যে নতুন উপাদানটি গড়ে উঠে তাকে **মিশ্রঋণ** (Loan blend) বলা হয়। যেমন—বাংলায় ইংরেজি থেকে 'মাস্টার' (master) শব্দটি গ্রহণ করে তার সঙ্গে বাংলা '-ই' প্রত্যয়টি যোগ করা হল, এর ফলে পেলাম 'মাস্টারি'। তেমনি ইংরেজি থেকে 'রেল' (rail) শব্দটি নিয়ে

তার সঙ্গে বাংলা 'গাড়ি' যোগ করে হল 'রেলগাড়ি'। এই রকম ভিন্নভিন্ন ভাষার উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত শব্দকে **সঙ্কর শব্দ (Hybrid word)** বলে।

গৃহীত উপাদানের প্রকৃতি অনুযায়ী ভাষাঋণ আবার চার রকমের হতে পারে :

(ক) শব্দঋণ (Loan word)

(খ) অনূদিত ঋণ (Loan translation)

(গ) অর্থ পরিবৃত্তি (Loanshift) এবং

(ঘ) উচ্চারণ ঋণ (Pronunciation Borrowing)।

শব্দঋণ (Loan word) : এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় যখন কোনো শব্দ গৃহীত হয় তখন তাকে **শব্দঋণ** বা **কৃতঋণ শব্দ** (Loan word) বলে। কৃতঋণ শব্দে ঋণদানকারী ভাষার ধ্বনি ও অর্থ কখনো কখনো প্রায় অবিকৃত থাকে। যেমন—বাংলায় ইংরেজি থেকে গৃহীত শব্দ 'চেয়ার্' (Chair), 'কলেজ্' (College) ইত্যাদিতে রয়েছে। কিন্তু গৃহীত শব্দটি ঋণগ্রহণকারী ভাষার প্রভাবে বা তার কোনো শব্দের সাদৃশ্যে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। যেমন—ইংরেজি 'টেব্‌ল্' (table) থেকে বাংলায় হয়েছে 'টেবিল', ইংরেজি 'হস্‌পিটাল্' (hospital) থেকে বাংলায় 'হাসপাতাল', ফরাসি 'কূপ' (Coupon) থেকে ইংরেজির মাধ্যমে বাংলায় 'কুপন'। কোনো ভাষায় অন্য ভাষা থেকে গৃহীত উপাদানটি যখন্ গ্রহণকারী ভাষার গঠন-প্রকৃতি অনুযায়ী এমন পরিবর্তিত হয়ে যায় যে তার মূল স্বরূপটি বোঝা যায় না এবং তাকে গ্রহণকারী ভাষার নিজস্ব শব্দই মনে হয়, তখন তাকে স্বদেশীকৃত ঋণ (Naturalised or Adopted loan) বলে। যেমন—ইংরেজি lord থেকে বাংলা 'লাট', ইংরেজি lantern থেকে বাংলা 'লণ্ঠন', ইংরেজি chord থেকে বাংলা 'কার' (লাল কার, কালো কার), জার্মান Zar (ৎসার্) থেকে বাংলা 'জার' ইত্যাদি।

অনূদিত ঋণ (Loan translation) : ঋণ-দানকারী ভাষা থেকে অনেক সময় শুধু একক শব্দ গ্রহণ না করে শব্দগুচ্ছ বা বাক্যাংশ বা বাক্যও গ্রহণ করা হয় এবং সেটিও মূল রূপে গ্রহণ করা হয় না, ঋণ-গ্রহণকারী ভাষার নিজস্ব উপাদানের সাহায্যেই ঋণদানকারী ভাষার গঠনের ছাঁদে বা প্রকাশরীতি অনুসারে তাকে অনুবাদ করে নেওয়া হয়। এই রকমের ভাষাঋণকে অনূদিত ঋণ (Loan translation) বলে। এখানে মূল উপাদানটা অন্য ভাষার নয়, শুধু তার গঠনরীতি বা প্রকাশরীতিটা অন্য ভাষার। যেমন—ইংরেজি থেকে বাংলায় : lighthouse > বাতিঘর, university > বিশ্ববিদ্যালয়, cottage industry > কুটিরশিল্প, wrist-watch > হাতঘড়ি, neck-tie > গলাবন্ধ, May I come in? > আমি কি আসতে পারি? He will place his opinion now >

এবার তিনি তাঁর বক্তব্য রাখবেন। জার্মান থেকে Zeitgeist > কালপুরুষ।

অর্থপরিবৃত্তি (Loan shift) : অনূদিত ভাষাঋণে দেখা যায় যে, অন্য ভাষার কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে একটি ভাষায় যে দেশীয় শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সাহায্যে অনুবাদ করে নেওয়া হয় সেই সব দেশীয় শব্দগুচ্ছের প্রচলিত অর্থের তেমন কোনো পরিবর্তন সাধন করা হয় না, কারণ দেশীয় শব্দগুলির অর্থের সঙ্গে ঋণদানকারী ভাষার শব্দগুলির অর্থের মোটামুটি মিল থাকে। যেমন—Wrist-watch শব্দের wrist-এর সঙ্গে 'হাতে'র এবং watch শব্দের সঙ্গে 'ঘড়ি'র প্রচলিত অর্থের মোটামুটি মিল আছে। এই জন্যে যখন 'হাতঘড়ি' শব্দটা তৈরি করা হল তখন 'হাত' বা 'ঘড়ি' কোনো শব্দেরই প্রচলিত অর্থের বিশেষ কোনো পরিবর্তন করা হল না। কিন্তু অর্থ পরিবৃত্তি (Loanshift) প্রক্রিয়ায় এমনটি হয় না। অর্থ পরিবৃত্তিতেও একটি ভাষায় কোনো অন্য ভাষার শব্দ গ্রহণ করা হয় না, কোনো নতুন জিনিস বা ভাবকে প্রকাশ করার জন্যে অন্য ভাষার শব্দের বদলে নিজের ভাষারই কোনো প্রচলিত বা অপ্রচলিত পুরানো শব্দ খুঁজে বের করা হয়, কিন্তু তার পুরানো বা প্রচলিত অর্থটা ঝেড়ে ফেলা হয় এবং শব্দটাকে নতুন বিদেশি অর্থে ব্যবহার করা হয়। এখানে শব্দটা কোনো অন্য ভাষার শব্দ নয়, নিজের ভাষারই শব্দ, শুধু অন্য ভাষার কোনো শব্দের প্রভাবে তার অর্থের পরিবর্তন ঘটানো হয় বলে এই প্রক্রিয়াকে অর্থপরিবৃত্তি বলে। যেমন—আমাদের দেশে আগেও 'আকাশবাণী' শব্দটা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তার অর্থ ছিল আকাশ থেকে উচ্চারিত দৈববাণী বা দেবতার সাবধানবাণী। আধুনিক যুগে যখন রেডিও-র প্রচলন হল তখন রবীন্দ্রনাথ 'আকাশবাণী'র ঐ পুরানো অর্থ ত্যাগ করে শব্দটাকে নতুন যুগের জিনিস 'রেডিও' অর্থে প্রয়োগ করলেন। এখানে 'আকাশবাণী' শব্দটার অর্থ-পরিবর্তন ঘটল। কিন্তু এই পরিবর্তন ঘটল অন্য ভাষার শব্দ 'রেডিও'-র প্রভাবে। এই ধরনের প্রক্রিয়াকেই বলে অর্থপরিবৃত্তি। অর্থপরিবৃত্তির অন্যান্য উদাহরণ হল—airoplane অর্থে 'বিমান', mystic অর্থে 'মরমিয়া' শব্দের প্রয়োগ।

উচ্চারণ ঋণ (Pronunciation Borrowing) : অর্থপরিবৃত্তির বিপরীত প্রক্রিয়া হল উচ্চারণ ঋণ। অর্থপরিবৃত্তিতে একটি ভাষার নিজস্ব শব্দই নতুন যুগের উপযোগী করে গ্রহণ করা হয় তার অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায়। আর উচ্চারণ ঋণেও নিজের ভাষার শব্দই থাকে, কিন্তু অর্থটা অপরিবর্তিত থাকে, শুধু উচ্চারণটাই অন্য ভাষার ছাঁদে পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়। যেমন—অনেক শিক্ষিত লোক 'সংস্কৃত' কথাটিকে ইংরেজি ছাঁদে 'স্যান্স্ক্রিট্' উচ্চারণ করেন ; বাংলায় যখন কথা বলে তখনো শব্দটার উচ্চারণ ঐ রকম করে থাকে। যেমন—'এখন স্যান্স্ক্রিটের ক্লাস আছে'। এই রকমের প্রক্রিয়াকে বলে উচ্চারণ ঋণ।

॥ ৩৩ ॥

ধ্বনিপরিবর্তন
(Sound Change)

আগেই বলেছি, ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম উপজীব্য হল কাল-পরম্পরায় ভাষার পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ। ভাষার এই পরিবর্তন হয় তার দেহে এবং আত্মায়—তার বহিরঙ্গ গঠনে এবং তার অন্তরঙ্গ বক্তব্যে। ভাষার বহিরঙ্গ গঠনের মূল উপাদান হল ভাষার ধ্বনি এবং তার অন্তরঙ্গ বক্তব্য হল তার অর্থ। ভাষার পরিবর্তনের তাই দু'টি প্রধান দিক হল ধ্বনিপরিবর্তন (Sound change) এবং অর্থপরিবর্তন (Semantic change)।

ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ

ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু : বিখ্যাত দার্শনিক বডিন প্রথম অনুমান করেন যে, একটি জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রকৃতি সেই জাতির ভৌগোলিক পরিবেশ ও তার জলবায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই থেকে কোনো কোনো ভাষাতত্ত্ববিদ্ সিদ্ধান্ত করেন যেখানকার ভূপ্রকৃতি রুক্ষ কঠোর সেখানকার ভাষায় কর্কশতা ও কঠোরতা বেশি এবং যেখানকার ভূপ্রকৃতি বর্ষাস্নিগ্ধ কোমল সেখানকার ভাষায় কোমলতা ও মাধুর্য বেশি। এই কারণে জার্মান ও ইংরেজি ভাষা অপেক্ষাকৃত কর্কশ, আর ফরাসি ও ইতালীয় ভাষা অপেক্ষাকৃত মধুর। এই কারণে পঞ্চম চার্লসের বিখ্যাত উক্তি "আমি ভগবানের সঙ্গে কথা বলি স্পেনীয় ভাষায়, নারীর সঙ্গে কথা বলি ইতালীয় ভাষায়, পুরুষের সঙ্গে কথা বলি ফরাসি ভাষায় এবং আমার ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলি জার্মান ভাষায়।"—এর পেছনে কেউ কেউ ভৌগোলিক কারণ আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। উক্তিটির অন্তর্নিহিত মূল তাৎপর্য যে বিভিন্ন ভাষার স্বরূপগত স্বাতন্ত্র্য তা স্বীকার্য সত্য ; কিন্তু প্রত্যেক ভাষার স্বরূপ-স্বাতন্ত্র্য যে পুরোপুরি ভৌগোলিক প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একথা সর্বক্ষেত্রে অব্যর্থভাবে লক্ষ্য করা যায় না। বর্ষাস্নিগ্ধ সুজলা সুফলা বঙ্গ-প্রকৃতির কোলে গড়ে-উঠা বাংলা ভাষা একটি মধুর ভাষা সন্দেহ নেই, কিন্তু দিল্লি-আলীগড়-লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের শুষ্ক রুক্ষ প্রকৃতিতে বিকশিত উর্দূভাষার মাধুর্যও সর্বজনস্বীকৃত। প্রাচীন পশ্চিম ভারতের মধ্যদেশ (শূরসেন) অঞ্চলের জলবায়ুও শুষ্ক রুক্ষ কঠোর, অথচ সেখানেই বিকাশ লাভ করেছিল সুমধুর ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত ভাষা। সুতরাং ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির গঠনে ও পরিবর্তনে ভৌগোলিক পরিবেশের আংশিক প্রভাব থাকলেও ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের এইটিই

একমাত্র শক্তি নয়।

অন্য জাতির ভাষার প্রভাব : একটি জাতি দীর্ঘকাল অন্য জাতির শাসনাধীনে থাকলে শাসক-জাতির ভাষার প্রভাব শাসিত-জাতির ভাষায় পড়তে থাকে। এর ফলে এক ভাষার শব্দ ও বাগ্‌ধারাই শুধু অন্য ভাষায় গৃহীত হয় তা নয়, এক-ভাষার উচ্চারণরীতি এবং ধ্বনিও অন্য ভাষায় গৃহীত হয়, এবং এতে গ্রহণকারী ভাষার ধ্বনিপরিবর্তনও সংঘটিত হয়। পশ্চিম বাংলার আদর্শ চলিত বাংলায় তিনপ্রকার শিস্ ধ্বনির (শ্, ষ্ স্) মধ্যে স্বনিম বা মূল ধ্বনি হিসাবে তালব্য 'শ্'-ই স্বীকৃত। কিন্তু পূর্ববাংলায় (বাংলা দেশ) মধ্যযুগ থেকে মুসলমান শাসনের ব্যাপক প্রভাবের ফলে ফারসি ভাষার প্রভাবে দন্ত্য 'স্'-এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় এবং আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদেরা সেখানকার বাংলায় দন্ত্য 'স্'-কেও মূলধ্বনিরূপে স্বীকার করেন। বাংলায় পদান্তে যুক্ত ব্যঞ্জন স্বরধ্বনি ছাড়া উচ্চারিত হয় না। অন্য স্বরধ্বনি না থাকলে অন্তত 'অ' বা 'ও' উচ্চারিত হয়। যেমন—'নন্দ'-এর খাঁটি বাংলা উচ্চারণ হল [নন্দো], তেমনি বন্ধ = [বন্ধো]। কিন্তু আধুনিক কালে হিন্দির প্রভাবে পদান্তিক যুক্ত ব্যঞ্জনও কোথাও কোথাও স্বরহীনভাবে অর্থাৎ হসন্ত ব্যঞ্জনের মতো উচ্চারিত হচ্ছে। যেমন—স্ট্রাইক বা ধর্মঘট অর্থে 'বন্ধ্'।

উচ্চারণের ত্রুটি, আরামপ্রিয়তা ও অনবধানতা : ভাষা ব্যবহারে ও ভাষাসঞ্চারে দু'টি পক্ষের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ—বক্তা ও শ্রোতা। বক্তা ভাষা উচ্চারণ করে এবং শ্রোতা তা শ্রবণ করে। বক্তার উচ্চারণে বা শ্রোতার শ্রবণে ত্রুটি ঘটলে ধ্বনিবিকৃতি সাধিত হয় এবং সেই ধ্বনিবিকৃতিই প্রচলন লাভ করলে ভাষার ধ্বনির পরিবর্তন সাধিত হয়। বক্তার দিক থেকে যদি ধ্বনি উচ্চারণের কষ্ট লাঘব করার প্রবণতা থাকে অথবা জিহ্বার আড়ষ্টতা থাকে তা হলে বক্তা অনেক দুরুচ্চার্য ধ্বনিসমাবেশকে সহজ করে ফেলে। যেমন—যুক্তব্যঞ্জনকে ভেঙে সে পৃথক্ করে দেয়, বা বিষম ব্যঞ্জন বা বিষম স্বরকে একই রকম করে উচ্চারণ করে। যেমন—'লক্ষ্মী' শব্দের যুক্তব্যঞ্জন 'ক্ + ষ্ + ম্' বাংলায় পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে শুধু 'ক্ + খ্' আর 'ম্' লোপ পেয়েছে, উচ্চারণ হয়েছে [লোক্‌খি]। তেমনি 'দেশী' শব্দের দু'টি পৃথক্ স্বর 'এ' আর 'ঈ' বাংলা উচ্চারণে হয়েছে শুধু 'ই' আর 'ই', শব্দটির উচ্চারণ হয়েছে [দিশি]। একই কারণে শব্দের গোড়ায় শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের অন্য ধ্বনিতে আর আমরা বেশি জোর দেবার কষ্ট স্বীকার করি না। তখন সেই শ্বাসাঘাতহীন ধ্বনিটা ক্ষীণ হয়ে যায় বা তার সঙ্গে যুক্ত স্বরটি লোপ পায়। যেমন—গামোছা > গাম্‌ছা। বক্তার দিক থেকে আর এক রকমের ত্রুটি হতে পারে—অনবধানতা বা সাবধানতার অভাব। এর ফলে শব্দের অন্তর্গত একটি ধ্বনি উচ্চারণ করার পরে অন্য ধ্বনি উচ্চারণে যাবার পথে

জিহ্বা মাঝখানে ভুঁইফোড় ধ্বনি উচ্চারণ করে ফেলে। যেমন—সংস্কৃত বানর থেকে প্রাচীন বাংলা বান্দর (আধুনিক বাংলা বাঁদর)—এখানে 'ন্' ও 'র্'-এর মাঝখানে যে 'দ্' ধ্বনিটি এসেছে সেটা অনবধানতার জন্যেই এসেছে। ইংরেজিতে যাকে Spoonerism বলে—যা অক্সফোর্ডের স্পুনার সাহেবের নামে পরিচিত—তাও এই অনবধানতার বশেই ঘটে। যেমন—'এক কাপ চা' আমরা তাড়াতাড়ি বলতে গিয়ে বলে বসি 'এক চাপ কা'।

শ্রবণের ও বোধের ত্রুটি : বক্তার দিক থেকে উচ্চারণের ত্রুটির ফলে যেমন ধ্বনিবিকৃতি হতে পারে, শ্রোতার দিক থেকে শোনার ও বোঝার ত্রুটির ফলেও তেমনি ধ্বনিবিকৃত ঘটতে পারে। বিদেশি ভাষা থেকে গৃহীত শব্দের ধ্বনিবিকৃতি ও ধ্বনিপরিবর্তন এই কারণে হতে পারে। যেমন—ইংরেজি zeal শব্দের উচ্চারণ ইংরেজের কাছ থেকে শোনার সময় বাঙালি যদি মনে মনে এর উচ্চারণ ধরে নেয় 'জীল্' তা হলে এটা শ্রোতারই ত্রুটি। কারণ এটা আসলে 'জীল্' (Ɉi : l) নয়, 'জীল্' (zi : l) ; কারণ ইংরেজি 'z'-এর উচ্চারণ বাংলা 'জ্'-এর মতো নয়। তেমনি জার্মান Zar-এর উচ্চারণ যদি জার্মান বক্তার উচ্চারণ থেকে ঠিক-ঠিক বুঝে না নিতে পারে তা হলে বাঙালি ভাববে এটা 'জার্', কিন্তু আসলে Zar-এর মূল জার্মান উচ্চারণ হল 'ৎসার্'।

সন্নিহিত ধ্বনির প্রভাব : ধ্বনিসৃষ্টি ও ধ্বনিলোপ : উপর্যুক্ত এইসব কারণই বাহ্য কারণ। এছাড়া ভাষার আভ্যন্তরীণ কারণেও ধ্বনিপরিবর্তন হয়। যেমন—একই ভাষার নিজস্ব একটি ধ্বনির প্রভাবে অন্য ধ্বনির পরিবর্তন হয়, একটি শব্দের সাদৃশ্যে অন্য শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন হয়, ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনে ভাষার ধ্বনিক্ষয় হয় ও ভাষায় নতুন ধ্বনির সৃষ্টি হয়। খাঁটি বাংলায় 'পদ্ম' শব্দ যখন [পদ্দ] উচ্চারিত হয় তখন বোঝা যায় 'দ্'-এর প্রভাবে 'ম্'-এর উচ্চারণ হয়েছে 'দ্'। এখানে পৃথক্ পৃথক্ দু'টি ধ্বনি উচ্চারণের কষ্ট লাঘব করার জন্যে এই পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই ; কিন্তু 'ম্' যে পরিবর্তিত হয়ে 'দ্'-ই হয়েছে, অন্য ধ্বনি হয় নি, তার কারণ প্রথম 'দ্'-এর প্রভাব। এসব ছাড়া ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনে ভাষার ধ্বনিক্ষয় হতে পারে এবং ধ্বনি লোপ পেতে পারে, যেমন—বৈদিক সংস্কৃতের ঌ-কার ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে প্রায় লোপ পেয়েছিল, এবং বাংলা ভাষায় এর ব্যবহার একেবারেই নেই। তেমনি বাংলায় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার মূর্ধন্য 'ণ্' ও অন্তঃস্থ 'ব্' (ৱ্) লোপ পেয়েছে। আবার ভাষায় নতুন ধ্বনির সৃষ্টিও হতে পারে,—একই মূলধ্বনি বা স্বনিমের উপধ্বনিগুলি ক্রমে স্বতন্ত্র স্বনিম রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করার ফলে ভাষায় নতুন মূলধ্বনি বা স্বনিমের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন—বাংলার 'অ্যা' ধ্বনি (অ্যাখন, অ্যামন), বাংলার 'ড়' 'ঢ়' ধ্বনি (বড়, দৃঢ়) ইত্যাদি।

ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা ও সূত্র

ভাষার বহিরঙ্গগত কারণে ধ্বনি পরিবর্তন

বহিরঙ্গগত কারণে বিভিন্ন ভাষায় যেসব বহু বিচিত্র ধরনের ধ্বনিপরিবর্তন হয়েছে এবং হয়ে চলেছে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরা তা পর্যবেক্ষণ করে তা থেকে ধ্বনিপরিবর্তনের কয়েকটি সূত্র আবিষ্কার করেছেন। এবং এই সূত্রগুলিকে তাঁরা প্রধানত চারটি ধারায় বিভক্ত করেছেন। যেমন—

১। ধ্বনির আগম

২। ধ্বনির লোপ

৩। ধ্বনির রূপান্তর ও

৪। ধ্বনির স্থানান্তর ও বিপর্যাস।

সুতরাং প্রত্যেক ধারায় ধ্বনিপরিবর্তনের বিভিন্ন সূত্র লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক ধারায় ধ্বনিপরিবর্তনের কয়েকটি প্রধান সূত্র নিম্নে ব্যাখ্যা করা হল।

ধ্বনির আগম :

ধ্বনির আগম আবার দু'রকম হয়—স্বরধ্বনির আগম ও ব্যঞ্জনধ্বনির আগম। আগেই বলেছি শব্দের মধ্যে ধ্বনির স্থান (position) তিন রকম—আদি (initial), মধ্য (medial) ও অন্ত্য (final)। শব্দের মধ্যে যে স্থানে স্বর-ধ্বনিটি এসে যুক্ত হয় সেই স্থানভেদ অনুসারে স্বরধ্বনির আগমকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—আদিস্বরাগম (Vowel Prothesis), মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি (Anaptyxis) ও অন্ত্যস্বরাগম (Catathesis)। এছাড়া কোনো কোনো অপিনিহিতিও (Epenthesis) স্বরাগমের মধ্যে পড়ে।

আদিস্বরাগম (Vowel Prothesis) : সাধারণত শব্দের আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে সেই সংযুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ-প্রস্তুতিরূপে বা উচ্চারণ-সৌকর্যের জন্যে তার আগে একটা স্বরধ্বনি এনে ফেলা হয়। শব্দের আদিতে স্বরধ্বনির এই আবির্ভাবকে বলে আদিস্বরাগম। যেমন—স্পৃহা > আস্পৃহা, স্কুল > ইস্কুল, স্টেবল (stable) > আস্তাবল, স্ত্রী > (পালি) ইত্থি।

মধ্যস্বরাগম / বিপ্রকর্ষ / স্বরভক্তি (Anaptyxis) : যুক্তব্যঞ্জনের অর্থ হল একাধিক ব্যঞ্জনের মাঝখানে কোনো স্বরধ্বনি না থাকা এবং ধ্বনিগুলির যুক্ত উচ্চারণ। এইরকমের যুক্তব্যঞ্জন উচ্চারণ করা অপেক্ষাকৃত কষ্টকর। যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত কর্কশও বটে। যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণের কষ্ট লাঘব করার জন্যে বা তার উচ্চারণের কর্কশতা কমিয়ে তাকে মধুর করার জন্যে আমরা

যুক্তব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির মাঝখানে স্বরধ্বনি এনে যোগ করি। যুক্তব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির মাঝখানে এইভাবে স্বরধ্বনির আবির্ভাবকে মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি বলে (Anaptyxis)। প্রকর্ষ মানে প্রকৃষ্ট আকর্ষণ। আর বিপ্রকর্ষ মানে এই প্রকৃষ্ট আকর্ষণ যে প্রক্রিয়ায় বিগত হয়েছে সেই প্রক্রিয়া। যুক্তব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসার ফলে ব্যঞ্জনগুলির মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বিগত হয়ে যায়, ব্যঞ্জনগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এইজন্যে এই প্রক্রিয়াকে বিপ্রকর্ষ বলে। আর এই প্রক্রিয়ায় স্বরধ্বনির প্রতি অধিক ভক্তি বা অনুরাগ দেখান হয় বলে একে স্বরভক্তিও বলে। উদাহরণ—ভক্তি > ভকতি (ভ্ + অ + ক্ + ত্ + ই > ভ্ + অ + ক্ + অ + ত্–ই)। তেমনি মনোহর্থ > মনোরথ, গ্লাশ > গেলাশ, গার্ড > গারদ ইত্যাদি।

অপিনিহিতি (Epenthesis) : শব্দমধ্যস্থ 'ই' বা 'উ'-এর স্থানান্তরের ফলে যে একরকমের অপিনিহিতি হয় (যেমন—করিয়া > কইর‍্যা) তার কথা পরে আলোচনা করা হবে। এছাড়া শব্দমধ্যে য-ফলা (্য)-যুক্ত ব্যঞ্জন, 'জ্ঞ' বা 'ক্ষ' থাকলে তার আগে একটি 'ই'-এর আগম হয়। এই প্রক্রিয়াকেও অপিনিহিতি বলা হয়। এটিও আসলে একধরনের মধ্যস্বরাগম। উদাহরণ—পূর্ববাংলার উচ্চারণে বাক্য > বাইক্ক, যজ্ঞ যইগ্গ ইত্যাদি।

অন্ত্যস্বরাগম (Vowel Catathesis) : বাংলা ভাষায় শব্দের শেষে সাধারণত কোনো যুক্তব্যঞ্জন স্বর ছাড়া থাকে না, অর্থাৎ শব্দের শেষে যুক্তব্যঞ্জনের পরে কোনো-না-কোনো স্বর অবশ্য থাকে। যেখানে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় কোনো স্বর নেই সেখানেও শেষে 'অ' বা 'ও' উচ্চারিত হয়। কিন্তু ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশি ভাষায় শব্দের শেষেও স্বরহীন যুক্তব্যঞ্জন উচ্চারিত হয় ; যেমন--bench (বেন্চ্)। এইরকমের শব্দ যখন আমরা বাংলা ভাষায় গ্রহণ করি তখন বাংলা রীতি অনুযায়ী সেগুলির শেষে সাধারণত একটি অতিরিক্ত স্বরধ্বনি যোগ করে উচ্চারণ করি। এই প্রক্রিয়াকে অন্ত্যস্বরাগম বলে। যেমন—বেন্চ্ (ব্ + এ + ন্ + চ্) > বেন্চি (ব্ + এ + ন্ + চ্ + ই)। এইরকম গিল্ট্ (gilt) > গিল্টি, আরবি কিস্ত্ > কিস্তি। মধ্যভারতীয় ও নব্যভারতীয় আর্যভাষায় শব্দান্তিক একক ব্যঞ্জনের পরেও কখনো কখনো অন্ত্যস্বরাগম দেখা যায়। যেমন--সংস্কৃত পরিষদ্ > পালি পরিসদা। সং দিশ্ > বাংলা দিশা।

আদি ব্যঞ্জনাগম (Consonant Prothesis) : শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনধ্বনি যোগ হলে তাকে আদিব্যঞ্জনাগম (Consonant Prothesis) বলা যায়। তবে বাংলায় শব্দের আদিতে যে-কোনো ব্যঞ্জনের আগম হয় না, সাধারণত শুধু 'র্'-এর আগম হয়ে থাকে ; এবং এই 'র্'-এরও আগম হয় শুধু সেই শব্দের

গোড়ায় যে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি আছে। যেমন—ঋজু > উজু > রুজু (এখানে 'উ'-এর আগে 'র্'-এর আগম হয়েছে) ; উপাধ্যায় > প্রাকৃত উব্‌জ্‌ঝাঅ > বাংলা ওঝা > রোজা ('ও'-এর আগে 'র্'-এর আগম)।

অন্ত্যব্যঞ্জনাগম (Consonant Catathesis) : ড. সুকুমার সেনের মতে অন্ত্যস্বরাগমের মতো অন্ত্যব্যঞ্জনাগমও হতে পারে অর্থাৎ শব্দের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনিরও আগম হতে পারে। যেমন—সংস্কৃত সর্ব + জি > সর্বজিৎ ; ভূ + ভৃ > ভূভৃৎ ; বাংলা খোকা > খোকন ; বাবু > বাবুন।

মধ্যব্যঞ্জনাগম / শ্রুতিধ্বনি (Glide) : শব্দের ধ্বনিগুলি উচ্চারণ করার সময় আমাদের জিহ্বা অসাবধানতাবশত দু'টি ধ্বনির মাঝখানে কোনো অতিরিক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করে ফেললে সেই প্রক্রিয়াকে মধ্যব্যঞ্জনাগম বলে। এইভাবে যে অতিরিক্ত ধ্বনিটি শব্দের মাঝখানে উচ্চারিত হয়ে যায় তাকে শ্রুতিধ্বনি (Glide) বলে। যেমন—চা + এর (ষষ্ঠী বিভক্তি) > চায়ের (এখানে 'য়'-এর আগম হয়েছে) ; শৃগাল > সিআল ('গ্'-এর লোপ) > শিয়াল (এখানে 'য়'-এর আগম হয়েছে)। এইভাবে শব্দমধ্যে যে ব্যঞ্জনের আগম হয় সেই ব্যঞ্জনের নাম অনুসারে শ্রুতির নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন—

য়-শ্রুতি (y-glide) : মোদক > মোঅঅ ('দ্' ও 'ক্'-এর লোপ) > মোয়া ('য়'-এর আগম) ; লৌহ > *নোআ ('ল্' স্থানে 'ন্' উচ্চারণ এবং 'হ্'-এর লোপ) > নোয়া ('য়্'-এর আগম) ইত্যাদি।

ওয়্-শ্রুতি (w-glide) : যা (= to go, ধাতু) + আ (প্রত্যয়) > যাওয়া ('ওয়্'-এর আগম) ; ইত্যাদি।

হ-শ্রুতি (h-glide) : সংস্কৃত বিপুলা > প্রাকৃত বিউলা ('প্'-এর লোপ) বিহুলা ('হ্'-এর আগম) > বেহুলা ; পর্তুগীজ viola (violin) > *বেআলা > বেহালা ('হ্'-এর আগম) ইত্যাদি।

দ-শ্রুতি (d-glide) : বৈদিক সূনর > ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সুন্দর ('দ্'-এর আগম) ; সংস্কৃত বানর > প্রাচীন বাংলা বান্দর ('দ্'-এর আগম) > আধুনিক বাংলা বাঁদর ; ইংরেজি General (জেনারেল্) > *জান্দরেল ('দ্'-এর আগম) > জাঁদরেল।

ব-শ্রুতি (b-glide) : সংস্কৃত তাম্র > * তম্‌ব্র ('ব'-এর আগম) > প্রাকৃত তম্ব > বাংলা তাঁবা ইত্যাদি।

ধ্বনির লোপ :

আদিস্বরলোপ (Aphesis / Aphaeresis) : সাধারণত শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত না থেকে যদি শব্দের মধ্যবর্তী কোনো অক্ষরে শ্বাসাঘাত থাকে তবে আদি স্বরধ্বনিটি গৌণ হয়ে ক্রমশ ক্ষীণ উচ্চারিত হয় এবং শেষে লোপ পায়। একেই আদিস্বরলোপ (Aphesis / Aphaeresis) বলে। যেমন—উদ্ধার উধার > ধার ('উ' লোপ), অলাবু > লাউ ('অ' লোপ)।

মধ্যস্বরলোপ (Syncope) : সাধারণত শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনি ক্ষীণ হয়ে ক্রমশ লোপ পেয়ে যায়। একে মধ্যস্বরলোপ (Syncope) বলে। যেমন—গামোছা > গাম্‌ছা ('ও'-কার লোপ) ; সুবর্ণ (স্ + উ + ব্ + অ + র্ + ণ্ + অ) > স্বর্ণ (স্ + ব্ + অ + র্ + ণ্ + অ) 'উ'-কার লোপ) ; সংস্কৃত সঙ্কটিকা > প্রাকৃত সঙ্কডী > সকডী (স্ + অ + ক্ + অ + ড্ + ঈ) > সক্‌ড়ী (স্ + অ + ক্ + ড্ + ঈ) ('অ'-কার লোপ)।

অন্ত্যস্বরলোপ (Apocope) : স্বাভাবিক উচ্চারণে প্রায়ই শব্দের শেষের দিকে শ্বাসের জোর কমে আসে এবং শব্দের শেষে অবস্থিত স্বর ক্ষীণ উচ্চারিত হতে-হতে শেষে লোপ পায়। যেমন—রাশি (র্ + আ + শ্ + ই) > রাশ (ই-কার লোপ) ; সংস্কৃত সন্ধ্যা > প্রাকৃত সঞ্ঝা > বাংলা সাঁঝ (স্ + আঁ + ঝ্) আ-কার লোপ)।

দ্বিমাত্রিকতা / দ্ব্যক্ষরতা (Bimorism / Bisyllabism) : শ্বাসবায়ুর এক ধাক্কায় যতটুকু ধ্বনিগুচ্ছকে একসঙ্গে উচ্চারণ করা যায় তাকে অক্ষর (Syllable) বলে। প্রত্যেক অক্ষরে একটি স্বরধ্বনি থাকবেই এবং কোনো অক্ষরে একের বেশি স্বরধ্বনি থাকবে না। অক্ষর (syllable) উচ্চারণে যে সময় লাগে সেই সময় পরিমাপের একককে মাত্রা (Mora) বলে। অক্ষর হ্রস্ব উচ্চারিত হলে এক মাত্রা, দীর্ঘ উচ্চারিত হলে দু' মাত্রা ও অতি দীর্ঘ (প্লুত) উচ্চারিত হলে আরো অধিক মাত্রা ধরা হয়। সাধারণত সংস্কৃতে হ্রস্ব স্বরান্ত অক্ষর একমাত্রা হয়। যেমন—নি (ন্ + ই) = একমাত্রা। দীর্ঘস্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর দু'মাত্রা। যেমন—সৎ, ধী প্রত্যেকটি = দু'মাত্রা ; অবশ্য বাংলায় সর্বক্ষেত্রে এমন হয় না। আর বাংলায় উচ্চারণের একটি প্রবণতা হল বড় শব্দকে এমন টুকরো টুকরো অংশে ভাগ করে উচ্চারণ করা যাতে প্রত্যেক টুকরোতে দু'টি দু'টি করে অক্ষর (syllable) থাকে বা দু'য়ের গুণিতক অক্ষর থাকে। শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে মধ্যবর্তী কোনো স্বর লোপ পেয়ে যায় আবার

কখনো কখনো মধ্য অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দের শেষের কোনো স্বর লোপ পেয়ে যায়, এরই ফলে বড় শব্দ দুই বা দু'য়ের গুণিতক সংখ্যক অক্ষরের এক-একটা টুকরোতে বিভক্ত হয়ে উচ্চারিত হয় অথবা শব্দটি যদি বে-জোড় সংখ্যার অক্ষরের (যেমন—তিন অক্ষরের) শব্দ হয় তবে সেটি জোড় সংখ্যার অক্ষরের শব্দে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে দ্বিমাত্রিকতা বা দ্ব্যক্ষরতা (Bimorism / Bisyllabism) বলে। বাংলায় বিভাজনটা ঠিক জোড়মাত্রা অনুসারে হয় না, জোড় অক্ষরের শব্দে হয়। তাই একে ঠিক দ্বিমাত্রিকতা না বলে দ্ব্যক্ষরতা বলাই ভাল। যেমন—গামোছা (গা + মো + ছা) (তিন অক্ষরের শব্দ) > গাম্‌ছা (গাম্ + ছা) (দু'-অক্ষরের শব্দ) ; অপরাজিতা (অ + প + রা + জি + তা) (পাঁচ অক্ষরের শব্দ) > অপ্‌রাজিতা (অপ্ + রা + জি + তা) (চার অক্ষরের শব্দ)।

ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ : স্বরধ্বনি যেমন শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত্য যে-কোনো স্থান থেকেই লোপ পেতে পারে, ব্যঞ্জনধ্বনি তেমন লোপ পায় না। আদি ও অন্ত্য অবস্থান থেকে ব্যঞ্জন লোপের নিদর্শন নেই বললেই চলে। শব্দের আদিতে শুধু 'র্' ধ্বনি লোপের নিদর্শন পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় আদি 'র্'-এর লোপ ও আদি 'র্' আগম দুই দেখা যায়। যেমন—'আমের রস' > সেখানকার উচ্চারণে 'রামের অস'। এছাড়া ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পায় সাধারণত শব্দের মধ্যে দু'টি স্বরের মধ্যস্থান থেকেই। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন অনেক ক্ষেত্রে লোপ পেয়েছে। যেমন—সংস্কৃত রাজা (র্ + আ + জ্ + আ) প্রাকৃত রাআ (র্ + আ + আ) ('জ'-এর লোপ)। তেমনি সখী > সহি > সই ('হ্'-এর লোপ) ইত্যাদি। আধুনিক বাংলায় 'বাবা' > জড়িত উচ্চারণে 'আওবা'। যেমন—"কেন বাওআ কাঁচা পয়হা নষ্ট করছ? থাকলে পাঁচ রাত বক্সে ব'সে ঠিয়াটার দেখা চলত।" (—পরশুরাম : 'চিকিৎসা-সঙ্কট')। স্বরমধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন (single consonant) ছাড়াও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগ্ম-ব্যঞ্জনের (double consonant) একটি ব্যঞ্জনও বাংলা ভাষায় লোপ পেয়েছে। যেমন—সংস্কৃত ভক্ত > মধ্যভারতীয় আর্য ভত্ত (ত্ত = ত্ + ত্ = যুগ্ম ব্যঞ্জন) > ভাত (দু'টি 'ত্'-এর একটি লোপ পেল।) চলিত বাংলায় 'হ্' ধ্বনির লোপ প্রায়ই দেখা যায়। যেমন—খড়দহ (খ্ + অ + ড় + দ্ + অ + হ্ + অ) > *খড়দঅ (খ্ + অ + ড় + দ্ + অ + অ) ('হ্' লোপ) খড়দা। তেমনি—ফলাহার > ফলার।

বাংলায় অনুনাসিক ব্যঞ্জন লোপের নিদর্শন হিসাবে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন পঙ্ক > পাঁক ইত্যাদি দৃষ্টান্ত, যেন এখানে 'ঙ্' লোপ পেয়েছে। কিন্তু

এটা ঠিক ধ্বনি লোপের দৃষ্টান্ত নয়, এটা ধ্বনির রূপান্তর। এখানে ঙ্ রূপান্তরিত হয়েছে অনুনাসিক ধ্বনিতে (ঁ)। এটা স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া, নাম নাসিক্যীভবন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

সমাক্ষর লোপ (Haplology / Syllabic Syncope) : পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি সমধ্বনির মধ্যে একটি যখন লোপ পায় বা দু'টি সমধ্বনিযুক্ত অক্ষরের (syllable) মধ্যে একটি যখন লোপ পায় তখন তাকে সমাক্ষর লোপ বলে। যেমন—বড় দাদা > বড়দা (একটি অক্ষর 'দা' লোপ পেয়েছে) ; পাদোদক > পাদোক (একটি ধ্বনি 'দ' লোপ পেয়েছে)।

সমবর্ণ লোপ (Haplography) : অনেক সময় শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি সমবর্ণ বা সমাক্ষরের মধ্যে একটি শুধু লেখার বানানে লোপ পায়, কিন্তু লোকের মুখে উচ্চারণ ঠিকই থাকে। একে সমবর্ণ লোপ (Haplography) বলে। যেমন—ইংরেজিতে আগে কৃষ্ণনগর (Krishnanagar) লেখা হত Krishnagar, একটি 'na' বাদ দিয়ে লেখা হত, কিন্তু লোকের মুখে দু'টি 'ন' ঠিকই উচ্চারিত হয়—ক্রিশ্নোনগোর [Kriʃnonagor]।

ধ্বনির রূপান্তর :

ধ্বনি যখন লোপ পায় না বা নতুন কোনো ধ্বনির যখন আগম হয় না, যখন একটি ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে অন্য ধ্বনির রূপ লাভ করে তখন তাকে ধ্বনির রূপান্তর বলা যায়। স্বর ও ব্যঞ্জন উভয়বিধ ধ্বনিরই রূপান্তর হয়। স্বরধ্বনির রূপান্তরের প্রধান প্রক্রিয়া হল অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি ইত্যাদি। ব্যঞ্জনধ্বনির রূপান্তরের বহু বিচিত্র প্রক্রিয়া ; তাদের মধ্যে প্রধান হল সমীভবন, বিষমীভবন ইত্যাদি।

অভিশ্রুতি (Umlaut) : অপিনিহিতির প্রক্রিয়ায় শব্দের অন্তর্গত যে 'ই' বা 'উ' তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের আগে সরে আসে সেই 'ই' বা 'উ' যখন পাশাপাশি স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করে এবং নিজেও তার সঙ্গে মিশে পরিবর্তিত হয়ে যায় তখন তাকে অভিশ্রুতি (Umlaut) বলে। অভিশ্রুতি হল অপিনিহিতির পরবর্তী ধাপ। যেমন—করিয়া (ক্ + অ + র্ + ই + য় + আ) > কইর‍্যা (ক্ + অ + ই + র্ + য় + আ)—যে 'ই' ছিল 'র্'-এর পরে তা এখানে 'র্'-এর আগে সরে এসেছে—এইটা অপিনিহিতি ; কইর‍্যা (অপিনিহিতি) > করে (অভিশ্রুতি)—অপিনিহিতির ফলে যে 'ই' 'র্'-এর আগে সরে এসেছিল সেই 'ই'-এর প্রভাবে য-ফলার পরবর্তী স্বরধ্বনি 'আ'-কার পরিবর্তিত হয়ে 'এ'-কার হয়ে গেছে এবং

'ই'-কারটিও নিজে তার সঙ্গে মিশে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেসব শব্দ মূলত 'দু' অক্ষরের (Bisyllybic) সেগুলির ক্ষেত্রে অভিশ্রুতির এই প্রক্রিয়াটি কার্যকর হয় না; যেমন—বাক্য, যজ্ঞ, আজি প্রভৃতি দু' অক্ষরের শব্দের রূপান্তর অপিনিহিতি পর্যন্ত ঠিকই হবে,—বাইক্ক, যইগ্গ, আইজ ; কিন্তু এর পরে অভিশ্রুতি হবে না; অপিনিহিতির ফলে যে 'ই' এসেছে, পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় সেটা শুধু লোপ পাবে। যেমন—[বাক্কো, যগ্গো, আজ]।

স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony) : শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অথবা প্রায় কাছাকাছি অবস্থিত দু'টি পৃথক্ স্বরধ্বনির মধ্যে যদি একটি অন্যটির প্রভাবে বা দু'টিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে একই রকম স্বরধ্বনিতে বা প্রায় একই রকম স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony) বলে। মৌলিক স্বরধ্বনি ও স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগের কথা মনে রাখলে বোঝা যাবে বিভিন্ন প্রকার স্বরধ্বনির উচ্চারণের সময় আমাদের জিহ্বা বিভিন্ন রকম অবস্থানে থাকে। দু'টি পৃথক্ অবস্থানের স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় আমাদের জিহ্বাকে মুখের মধ্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছুটোছুটি করতে হয়। এই পরিশ্রম লাঘব করার জন্যে আমরা দু'টি পৃথক্ অবস্থানের ধ্বনি উচ্চারণ করার সময় সেই দু'টিকে যথাসম্ভব জিহ্বার একই রকম বা কাছাকাছি অবস্থান থেকে উচ্চারণ করে ফেলি ; এরই ফলে স্বরসঙ্গতি সাধিত হয়। যেমন—'সুপারি' উচ্চারণ করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের লোকে যখন 'সুপুরি' উচ্চারণ করে ফেলে তখন 'সুপারি' (স্ + উ + প্ + আ + র্ + ই) শব্দের দু'টি পৃথক্ স্বরধ্বনি ('উ' এবং 'আ') পরিবর্তিত হয়ে 'সুপুরি' (স্ + উ + প্ + উ + র্ + ই) উচ্চারণে একই রকম ('উ' এবং 'উ') স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় ; লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মূল শব্দের পৃথক্ স্বরধ্বনি দু'টোর ('উ' এবং 'আ') মধ্যে 'উ' উচ্চারিত হয় জিহ্বার উচ্চ অবস্থান থেকে আর 'আ' উচ্চারিত হয় জিহ্বার নিম্ন অবস্থান থেকে। এরকম দু'টি দূরবর্তী অবস্থান থেকে দু'টি স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে হলে জিহ্বাকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে এই যে ছুটে যেতে হয়, এর পরিশ্রমটুকু কমাবার জন্যে আমরা 'আ'কেও 'উ'তে রূপান্তরিত করে ফেলি, তার ফলে 'সুপারি' শব্দটি উচ্চারিত হয় 'সুপুরি' রূপে এবং 'সুপুরি'-র দু'টি 'উ'-এর উচ্চারণ স্থান একই হওয়ায় জিহ্বার পরিশ্রম লাঘব হয়। স্বরসঙ্গতিতে দু'টি পৃথক্ স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে একেবারে একই রকম হয়ে গেলে তাকে **পূর্ণ স্বরসঙ্গতি** বলা যায়। যেমন—সুপারি > সুপুরি। স্বরসঙ্গতিতে অনেক সময় দু'টি পৃথক্ স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ণ একই রকম স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়

না, প্রায় একই রকম বা কাছাকাছি স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। একে **আংশিক স্বরসঙ্গতি** বলা যায়। যেমন—পূজা (প্ + উ + জ্ + আ) > পুজো (প্ + উ + জ্ + ও)। 'উ' এবং 'আ' ছিল যথাক্রমে উচ্চ (High) এবং নিম্ন (Low) স্বরধ্বনি। এই দু'টির মধ্যে 'আ' পরিবর্তিত হয়ে 'উ'-এর কাছাকাছি উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি (High-mid vowel) 'ও'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। এটা আংশিক স্বরসঙ্গতি।

স্বরসঙ্গতিকে ধ্বনিপরিবর্তনের গতিমুখ অনুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় —(ক) প্রগত (Progressive), (খ) পরাগত (Regressive), (গ) পারস্পরিক বা অন্যোন্য (Mutual)। পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে একই রকম বা কাছাকাছি ধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে তাকে বলে **প্রগত (Progressive)** স্বরসঙ্গতি। যেমন—পূজা > পূজো, দিশাহারা > দিশেহারা। পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে একই রকম বা কাছাকাছি স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে তাকে বলে **পরাগত (Regressive)** স্বরসঙ্গতি। যেমন—দেশী > দিশি ; ভুল + আ = *ভুলা > ভোলা (to forget)। যদি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দু'টি স্বরধ্বনিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে একই রকম বা কাছাকাছি স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তবে তাকে **পারস্পরিক বা অন্যোন্য (Mutual / Reciprocal)** স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন—যদু > যোদো। এগুলি ছাড়া স্বরধ্বনির আরো একটি শ্রেণীর কথা কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন—মধ্যগত ; দু'পাশের দু'টি স্বরধ্বনির প্রভাবে তাদের মধ্যবর্তী অন্য কোনো ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে তাদের মতো একই বা কাছাকাছি ধ্বনি হয়ে গেলে তাকে বলেছেন মধ্যগত স্বরসঙ্গতি। যেমন—বিলাতি > বিলিতি। কিন্তু এটা স্বরসঙ্গতির কোনো স্বতন্ত্র শ্রেণী নয়, এটা একই সঙ্গে প্রগত ও পরাগত স্বরসঙ্গতির মিশ্র প্রক্রিয়া। স্বরসঙ্গতির বিপরীত প্রক্রিয়া হল **স্বরের অসঙ্গতি** (Vowel Disharmony)। এই প্রক্রিয়ায় কাছাকাছি অবস্থিত দু'টি একই রকম স্বরধ্বনির মধ্যে একটি পৃথক্ হয়ে যায়। যেমন—মামা > মামু, কাকা > কাকু।

ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন বা পরিপূরক দীর্ঘীভবন (Compensatory Lengthening) : শব্দের কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে অনেক সময় সেই লোপের ক্ষতিপূরণ দেবার জন্যে তার পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘস্বরে রূপান্তরিত হয়। একেই বলে ক্ষতিপূরণ বা পরিপূরক দীর্ঘীভবন (Compensatory Lengthening)। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিষম ব্যঞ্জনের মিলনে গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জন মধ্যভারতীয় আর্য ভাষায় সমব্যঞ্জনের মিলনে গঠিত সংযুক্ত

ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছিল। যেমন—সপ্ত > সত্ত। এই সমব্যঞ্জনের মিলনে গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জন নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় লোপ পেল এবং তার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হল। যেমন—সত্ত (স্ + অ + ত্ + ত্ + অ) > সাত (স্ + আ + ত)। এখানে দু'টি 'ত্'-এর মধ্যে একটি লোপ পেয়েছে এবং তার ফলে 'অ'-এর দীর্ঘীভবন হওয়ায় এটি 'আ' হয়ে গেছে। তেমনি ধর্ম > ধম্ম > ধাম, কর্ম > কম্ম > কাম।

সমীভবন (Assimilation) : শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত বা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত দু'টি বিষম ব্যঞ্জনধ্বনি অর্থাৎ পৃথক্ ধরনের ব্যঞ্জনধ্বনি যখন একে অপরের প্রভাবে বা দু'টিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে একই রকম ধ্বনিতে বা প্রায় অনুরূপ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলে **সমীভবন (Assimilation)**। যেমন—উৎ + লাস > উল্লাস (এখানে 'ল্'-এর প্রভাবে 'ৎ' পরিবর্তিত হয়ে 'ল্'-এর সঙ্গে একই রকম ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে)। তেমনি সংস্কৃত যক্ষা (য্ + অ + ক্ + ষ্ + আ) > খাঁটি বাংলা উচ্চারণে 'যক্খা' (য্ + অ + ক্ + খ্ + আ)। (এখানে 'ক্'-এর প্রভাবে 'ষ্' পরিবর্তিত হয়ে 'ক্'-এর প্রায় কাছাকাছি ধ্বনি 'খ্'তে রূপান্তরিত হয়েছে।) স্বরসঙ্গতির মতো সমীভবনও **পূর্ণ** এবং **আংশিক** দু'রকমেরই হতে পারে। 'উল্লাসে'-এ 'ৎ' পরিবর্তিত 'ল্'-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ একই রকম ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে; এখানে পূর্ণ সমীভবন হয়েছে। কিন্তু 'যক্খা'-তে 'ষ্' পরিবর্তিত হয়ে 'ক্'-এর সঙ্গে পুরোপুরি একই রকম ধ্বনি হয়ে যায় নি, উচ্চারণের দিক থেকে প্রায় কাছাকাছি ধ্বনি 'খ্'-তে পরিণত হয়েছে। এখানে 'ক্' ও 'ষ্'-এর মধ্যে 'ক্' ছিল স্নিগ্ধতালু থেকে উচ্চারিত আর 'ষ্' ছিল মূর্ধা থেকে উচ্চারিত ধ্বনি। এই দু'টির সমীভবন হওয়ার ফলে 'ক্' ও 'খ্' দু'য়েরই উচ্চারণ-স্থান হয়েছে স্নিগ্ধতালু। এখানে সমীভবন হয়েছে উচ্চারণস্থানের দিক থেকে। আরো একদিক থেকে সমীভবন হয়েছে। 'ক্' ও 'ষ্' ছিল যথাক্রমে স্পর্শধ্বনি ও উষ্মধ্বনি। সমীভবনের ফলে 'ক্' ও 'খ্' দু'টিই হয়েছে স্পর্শ ধ্বনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে পূর্ণ সমীভবন হয় নি। 'ক্' হল অল্পপ্রাণ ধ্বনি, কিন্তু 'খ্' হল মহাপ্রাণ। এইটুকু পার্থক্য থেকেই গেছে। সেই জন্য এখানে আংশিক সমীভবন হয়েছে মাত্র।

সমীভবনে ধ্বনিপরিবর্তনের গতিমুখ অনুসারে সমীভবনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—প্রগত, পরাগত এবং অন্যোন্য বা পারস্পরিক। পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে যদি কখনো পরবর্তী ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে একই রকম বা কাছাকাছি

ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে **প্রগত সমীভবন (Progressive Assimilation)** বলে। যেমন—পদ্ম > পদ্দ (এখানে পূর্ববর্তী ধ্বনি 'দ্'-এর প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনি 'ম্' পরিবর্তিত হয়ে 'দ্' হয়ে গেছে)। তেমনি—সূত্র (স + ঊ + ত্ + র্ + অ) > সুত্ত (স্ + ঊ + ত্ + ত্ + অ)। পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনি যদি কখনো পরিবর্তিত হয়ে একই রকম ধ্বনি বা কাছাকাছি ধ্বনি হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে **পরাগত সমীভবন (Regressive Assimilation)** বলে। যেমন—সৎ + মান > সম্মান (এখানে দেখা যাচ্ছে, পরবর্তী ধ্বনি 'ম্'-এর প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনি 'ৎ' পরিবর্তিত হয়ে একই রকম ধ্বনি 'ম্'-তে পরিণত হয়েছে)। তেমনি--ধর্ম (ধ্ + অ + র্ + ম্ + অ) > ধম্ম (ধ্ + অ + ম্ + ম্ + অ) ; ভক্ত (ভ্ + অ + ক্ + ত্ + অ) > ভত্ত (ভ্ + অ + ত্ + ত্ + অ) ; বড় ঠাকুর > বট্‌ঠাকুর। পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যদি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী দু'টি ধ্বনিই পরিবর্তিত হয়ে একই রকম ধ্বনি বা কাছাকাছি ধ্বনিতে পরিণত হয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলে **পারস্পরিক বা অন্যোন্য সমীভবন (Mutual / Reciprocal Assimilation)**। যেমন—উৎ + শ্বাস > উচ্ছ্বাস—এখানে পূর্ববর্তী ধ্বনি 'ৎ' ও পরবর্তী ধ্বনি 'শ্' দু'টিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে কাছাকাছি বা প্রায় একই রকম ধ্বনি 'চ্' ও 'ছ্'-তে পরিণত হয়েছে। তেমনি—সত্য > সচ্চ > হিন্দি সচ্চা > বাংলা সাচ্চা ; কুৎসা > কেচ্ছা ; মহোৎসব > মোচ্ছব ইত্যাদি।

বিষমীভবন (Dissimilation) : সমীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া হল বিষমীভবন। এই প্রক্রিয়ায় দু'টি সংযুক্ত বা কাছাকাছি অবস্থিত সমধ্বনির মধ্যে একটি পরিবর্তিত হয়ে বিষম অর্থাৎ পৃথক্ ধ্বনিতে পরিণত হয়ে যায়। যেমন—পর্তুগিজ আর্মারিও (আ + র্ + ম্ + আ + র্ + ই + ও) > বাংলা আলমারি (আ + ল্ + ম্ + আ + র্ + ই) (দুটি 'র্'-এর মধ্যে একটি পরিবর্তিত হয়ে 'ল্' হয়ে গেছে)। তেমনি—লালা > নাল, চন্দননগর > ইংরেজিতে হয়েছিল Chandernagore। সংস্কৃত পিপীলিকা > পালি কিপিল্লিকা। চুঁচুড়া > (চ্ + উঁ + চ্ + উ + ড় + আ) ইংরাজিতে চিনসুরা Chinsurah (চ + ই + ন্ + স্ + উ + র্ + আ) এখানে দু'টি 'চ্'-এর মধ্যে একটি পরিবর্তিত হয়ে 'স্' হয়েছে—এটা ব্যঞ্জনধ্বনির বিষমীভবন। তেমনি দু'টি 'উ'-এর মধ্যে একটি পরিবর্তিত হয়ে 'ই' হয়ে গেছে—এটা স্বরধ্বনির বিষমীভবন বা স্বরের অসঙ্গতি।

ঘোষীভবন (Voicing) : সাধারণত বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ধ্বনি, য্, র্, ল্, হ্, ড়, ঢ় এবং সমস্ত স্বরধ্বনি হল সঘোষ ধ্বনি ; আর অন্য ধ্বনিগুলি অঘোষ ধ্বনি। কোনো সঘোষ ধ্বনির প্রভাবে অঘোষ ধ্বনি যদি সঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয় তবে তাকে ঘোষীভবন (Voicing) বলে। যেমন—চাকদহ > চাগ্দা—এখানে ঘোষধ্বনি 'দ্'-এর প্রভাবে অঘোষ ধ্বনি 'ক্' পরিবর্তিত হয়ে ঘোষধ্বনি 'গ্'-এ পরিণত হয়েছে। এখানে 'ক্' ও 'দ্'-এর মধ্যে ঘোষবত্তার (voicing) দিক থেকে সমীভবন হয়েছে বলে একে আংশিক সমীভবনও বলতে পারি। এ রকম আংশিক সমীভবনের দৃষ্টান্ত সন্ধিতে অনেক পাওয়া যায়। যেমন —দিক্ + বিজয় > দিগ্বিজয় ইত্যাদি। তেমনি বাংলা ছোট্দিদি > ছোড়্দি। এরকম ঘোষধ্বনির প্রভাবে যে অঘোষধ্বনির ঘোষীভবন হয় তা কার্যত আংশিক সমীভবনই। কিন্তু এরকম ঘোষধ্বনির প্রভাব ছাড়াও আপনা থেকেই কোনো-কোনো সময় পশ্চিমবাংলার উচ্চারণে শব্দের শেষে অবস্থিত একক অঘোষধ্বনি সঘোষ উচ্চারিত হয়। একে **স্বতোঘোষীভবন (Spontaneous Voicing)** বলা হয়। যেমন—কাক > কাগ, লোক > লোগ, ছত্র > ছত্ত > ছাদ। কিন্তু এরকম ঘোষীভবন সর্বক্ষেত্রে হয় না। যেমন—শোক, হাত ইত্যাদি। ঘোষীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া **অঘোষীভবন (Devoicing / Devocalization)**। ঘোষধ্বনি অঘোষ উচ্চারিত হলে সেই প্রক্রিয়াকে অঘোষীভবন বলে। যেমন—অবসর > কথ্য বাংলায় অপ্সর, ভোঁদা কাকা > দ্রুত উচ্চারণে 'ভোৎকা' ; ফারসি খরাব > বাংলা খারাপ, ফারসি গুলাব > বাংলা গোলাপ, বড় ঠাকুর > বট্ঠাকুর, পোর্তুগিজ cowve > বাংলা কোপি, জার্মান leben > lieb [lip]।

মহাপ্রাণীভবন (Aspiration) : বাংলায় সাধারণত বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি এবং 'হ্' হল মহাপ্রাণ ধ্বনি, আর অন্য ধ্বনিগুলি হল অল্পপ্রাণ ধ্বনি। সন্নিকটস্থ বা সংযুক্ত কোনো মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাবে যদি কোনো অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ উচ্চারিত হয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে মহাপ্রাণীভবন (Aspiration) বলে। যেমন—স্তম্ভ > থাম ('স্' লোপ পেয়েছে এবং 'ত্' মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ভ্'-এর প্রভাবে মহাপ্রাণিত হয়ে 'থ্' হয়ে গেছে। তেমনি পাঁচ হালা > পাঁছালা ('হ্'-এর প্রভাবে 'চ্' হয়েছে নিকটস্থ 'ছ্')। মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাব ছাড়াই যদি কোনো অল্পপ্রাণ ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে মহাপ্রাণ হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে **স্বতোমহাপ্রাণীভবন (Spontaneous Aspiration)** বলে। যেমন—পুস্তক > পুথি (এখানে 'ত্' পরিবর্তিত হয়েছে 'থ্'-তে, কোনো মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাব এখানে নেই)। তেমনি—পতঙ্গ > ফড়িং ('প্' হয়েছে 'ফ্', কোনো মহাপ্রাণ

ধ্বনির প্রভাব ছাড়াই)।

অল্পপ্রাণীভবন (Deaspiration) : কোনো মহাপ্রাণ ধ্বনি যদি অল্পপ্রাণ উচ্চারিত হয় তবে তাকে অল্পপ্রাণীভবন (Deaspiration) বলে। যেমন শৃঙ্খল > প্রাচীন বাংলা শিংকল > শিকল ('খ্' পরিবর্তিত হয়েছে 'ক্'-তে)। পশ্চিম বাংলার রাঢ়ী উপভাষায় প্রায়ই শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের অন্তে অবস্থিত মহাপ্রাণধ্বনি অল্পপ্রাণ উচ্চারিত হতে দেখা যায়। যেমন—দুধ > দুদ, বাঘ > বাগ। পূর্ববাংলার বঙ্গালী উপভাষাতেও এক রকমের অল্পপ্রাণীভবন দেখা যায়। যেমন—ভাই > বাই, ভাত > বাত। পূর্ববাংলার এসব পরিবর্তনে মহাপ্রাণধ্বনি শুধু অল্পপ্রাণ হয়ে যায় না, অবরুদ্ধ বা recursive ধ্বনিতে পরিণত হয়।

কণ্ঠনালীয়ভবন (Glottalization) : সাধারণ ফুসফুস-চালিত বহির্মুখী বায়ুপ্রবাহের (Pulmonic Egressive Airstream) দ্বারা সৃষ্ট স্পর্শ ধ্বনি (Stop / Occlusive) যদি রুদ্ধস্বরপথ-চালিত অন্তর্মুখী বায়ুপ্রবাহের (Glottatic Ingressive Airstream) দ্বারা সৃষ্ট অন্তঃস্ফোটক (Implosive) ধ্বনিতে পরিণত হয় তবে তাকে কণ্ঠনালীয়ভবন (Glottalization) বলে। পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো উপভাষায় ভ্, ধ্, ঘ্ পরিবর্তিত হয়ে যথাক্রমে অন্তঃস্ফোটক ব্ᶜ, দ্ᶜ, গ্ᶜ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—ভাত > বᶜাত, ভাই > বᶜাই ইত্যাদি। এই ধ্বনিগুলিকে কেউ কেউ অবরুদ্ধ (Recursive) ধ্বনি বলেছেন।

নাসিক্যীভবন (Nasalization) : কোনো নাসিক্য ব্যঞ্জন (ম্, ন্, ঙ্ ইত্যাদি) যদি ক্ষীণ হতে হতে ক্রমশ লোপ পায় এবং তার রেশ স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিতে একটা অনুনাসিক অনুরণন যোগ হয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে নাসিক্যীভবন বলে। যেমন—বন্ধ (ব্ + অ + ন্ + ধ্ + আ) বাঁধ (ব্ + আঁ + ধ)। (এখানে অনুনাসিক ব্যঞ্জন 'ন্' লোপ পেয়েছে, তার ফলে পূর্ববর্তী স্বর 'অ' দীর্ঘ হয়ে অনুনাসিক 'আঁ'তে পরিণত হয়েছে)। তেমনি—অঙ্ক > আঁক, সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ। লাতিন vinum (মদ্য) > ফরাসি vin [ve] [ভেঁ]।

স্বতোনাসিক্যীভবন (Spontaneous Nasalization) : শব্দ-মধ্যে নাসিক্যব্যঞ্জন না থাকলেও অনেক সময় কোনো কোনো স্বরধ্বনি আপনা থেকেই অনুনাসিক উচ্চারিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে স্বতোনাসিক্যীভবন (Spontaneous Nasalization) বলে। যেমন—পুস্তক > পুথি > পুঁথি। (এখানে 'পুস্তক' শব্দে

কোনো নাসিক্যব্যঞ্জন নেই, সুতরাং সেটা লোপের প্রশ্নও ওঠে না। তবে 'পুঁথি' শব্দে 'উঁ' ধ্বনিটা আপনা থেকেই অনুনাসিক হয়ে গেছে)। তেমনি—পেচক > পেঁচা ইত্যাদি।

বিনাসিক্যীভবন (Denasalization) : অনেক সময় শব্দের অন্তর্গত কোনো নাসিক্যব্যঞ্জন লোপ পায়, কিন্তু তার কোনো প্রভাব বা রেশ রেখে যায় না। একে বিনাসিক্যীভবন (Denasalization) বলে। যেমন—শৃঙ্খল > শিকল > শেকল (এখানে নাসিক্য ব্যঞ্জন 'ঙ্' লোপ পেয়েছে, অথচ তার প্রভাবে কোনো স্বর অনুনাসিক হয় নি)। তেমনি মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা '*পেঙ্‌কে (Peŋqʷe) (= পাঁচ) থেকেই নানা ধাপের মধ্যে দিয়ে ইংরেজি শব্দ 'five'-এর সৃষ্টি ; কিন্তু মূল ভাষার অনুনাসিক ব্যঞ্জন ঙ্ (ŋ) এখানে লোপ পেয়েছে। অথচ লক্ষণীয় যে, এই বিনাসিক্যীভবন একই মূল উৎস থেকে জাত সব ভাষায় হয় নি। যেমন—সংস্কৃতে—পঞ্চ (এখানে 'ঞ্' রয়েছে), জার্মান fünf (এখানে 'n' রয়েছে)। বাংলা 'পাঁচ' এবং ফরাসি cinq [স্যাঁক্]—এখানে আবার নাসিক্যব্যঞ্জনটি লোপ পেয়েছে, কিন্তু পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক করে দিয়েছে।

মূর্ধন্যীভবন (Cerebralization) : 'ঋ', 'র্', 'ষ্' এবং 'ট্', 'ঠ্', 'ড্' প্রভৃতি মূর্ধন্যধ্বনির প্রভাবে সংশ্লিষ্ট বা কাছাকাছি অবস্থিত কোনো দন্ত্যধ্বনি (ত্, থ্, দ্, ধ্ ইত্যাদি) যদি মূর্ধন্য ধ্বনিতে পরিণত হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে মূর্ধন্যীভবন (Cerebralisation) বলে। যেমন—বৃদ্ধ > বুড্‌ঢ > বুড়া ('ঋ'-এর প্রভাবে 'দ্' ও 'ধ' যথাক্রমে মূর্ধন্যধ্বনি 'ড্' ও 'ঢ্'-তে পরিণত হয়েছে। তেমনি—বিকৃত > বিকট, উৎ + ডীন > উড্ডীন ইত্যাদি।

স্বতোমূর্ধন্যীভবন (Spontaneous Cerebralisation) : 'ঋ', 'র্', 'ষ্' বা 'ট্', 'ঠ্', 'ড্' প্রভৃতি কোনো মূর্ধন্যধ্বনির প্রভাব ছাড়াই যদি কোনো দন্ত্যধ্বনি মূর্ধন্যধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে যায় তবে সেই পরিবর্তনকে বলে স্বতোমূর্ধন্যীভবন (Spontaneous Cerebralisation)। যেমন—সংস্কৃত পততি > প্রাকৃত পড়ই > বাংলা পড়ে ইত্যাদি।

বিমূর্ধন্যীভবন (Decerebralisation) ঃ যদি কোনো মূর্ধন্যধ্বনি মূর্ধন্য না থেকে দন্ত্যধ্বনি বা অন্য কোনো প্রকার ধ্বনিতে পরিণত হয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলে বিমূর্ধন্যীভবন। যেমন—সংস্কৃত প্রাণ [praŋ] > বাংলা উচ্চারণে প্রান [pran], সংস্কৃত বিষ [biʂ] > বাংলা উচ্চারণে বিশ [biʃ] ইত্যাদি।

তালব্যীভবন (Palatalisation) : সংস্কৃতে ই, ঈ, চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ঞ, য্, শ্-কে তালব্যধ্বনি বলা হত (ই-চু-য-শানাস্তালু)। এইসব তালব্যধ্বনির প্রভাবে কোনো দন্ত্যধ্বনি বা অন্য ধ্বনি যদি তালব্যধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলে তালব্যীভবন (Palatalisation)। যেমন—সন্ধ্যা > সঞ্ঝা (এখানে য-ফলার প্রভাবে দন্ত্যধ্বনি 'ন্' ও 'ধ্' পরিবর্তিত হয়ে তালব্যধ্বনি যথাক্রমে 'ঞ' ও 'ঝ্'-তে পরিণত হয়েছে) > সাঁঝ। সংস্কৃত বিষ [biʂ] > খাঁটি বাংলা উচ্চারণে বিষ [biʃ]। institute > ইন্স্টিটিউট্। অনেক সময় কোনো তালব্যধ্বনির প্রভাব ছাড়াও দন্ত্য বা দন্তমূলীয় ধ্বনি তালব্যধ্বনিতে পরিণত হয়। এটাকে স্বতোতালব্যীভবন (Spontaneous Palatalisation) বলতে পারি। যেমন—graduate > গ্র্যাজুয়েট।

উষ্মীভবন (Spirantisation) : ধ্বনি উচ্চারণে শ্বাসবায়ু পূর্ণ বাধা পেলে স্পর্শধ্বনি (stop) এবং আংশিক বাধা পেলে উষ্মধ্বনি (Spirant/Fricative) সৃষ্ট হয়। স্পর্শধ্বনি উচ্চারণ করতে গিয়ে যদি এমন হয় যে, শ্বাসবায়ু পূর্ণ বাধা পাচ্ছে না, আংশিক বাধা পাচ্ছে, তবে স্পর্শধ্বনি উষ্মধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ার নাম হল উষ্মীভবন। যেমন—হয়, হয় জানতে পারো না > 'অয় অয় জান্তি পারো না' (জ > z)। কালীপূজা > চট্টগ্রামের উপভাষায় খালি ফুজা [xali fuza]।

সকারীভবন (Assibilation) : উষ্মীভবনের ফলে যদি স্পৃষ্ট বা ঘৃষ্টধ্বনি 'স্', 'শ্' বা 'জ' [ʂʃz]-তে পরিণত হয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলে সকারীভবন (assibilation)। যেমন—আগাপাছতলা > আগাপাস্তলা, খেয়েছে > পূর্ব বাংলার উচ্চারণে > খাইসে।

রকারীভবন (Rhotacism) : 'স্' [s] অনেক সময় পরিবর্তিত হয়ে প্রথমে সঘোষ জ [z] এবং পরে 'র' [r]-তে পরিণত হয়। এই পরিবর্তনকে রকারীভবন (Rhotacism) বলে। যেমন—লাতিন ausosa > *auzoza aurora। আমাদের ভাষায় আর একরকম রকারীভবনের নিদর্শন পাওয় যায়—দ্ > ড্ / ড় > র্। যেমন—সংস্কৃত পঞ্চদশ > প্রাকৃত পন্নডহ > পনর > পনেরো। এই রকম লকারীভবনেরও (Lateralisation) দৃষ্টান্ত কিছু পাওয়া যায়—দ্ > ড্ / ড় > ল্। যেমন—ষট্ + দশ > ষোড়শ > ষোল।

সঙ্কোচন (Contraction) : উচ্চারণের দ্রুততার জন্যে অথবা উচ্চারণ প্রয়াস লাঘব করার জন্যে অনেক সময় আমরা কোনো শব্দের সবক'টি ধ্বনি

পূর্ণরূপে স্পষ্টরূপে উচ্চারণ না করে কতকগুলি ধ্বনিকে মিলিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ করি। এর ফলে অধিক সংখ্যক ধ্বনি স্বল্প কয়েকটি ধ্বনিতে সঙ্কুচিত হয়ে আসে ; একে সঙ্কোচন (Contraction) বলে। যেমন—বৈবাহিক > বেয়াই > ব্যাই, যাহা ইচ্ছা তাই > যাচ্ছেতাই, জামাইবাবু > জাঁইউ, ব্যবসায়ী > বেবুস্যে, পেঁয়াজ > প্যাঁজ।

বিস্ফোরণ বা প্রসারণ (Expansion) : শব্দের দীর্ঘ উচ্চারণের জন্যে শব্দের নির্দিষ্ট সংখ্যক ধ্বনিকে বাড়িয়ে উচ্চারণ করাকে বিস্ফোরণ বা প্রসারণ (Expansion) বলে। যেমন—পর্তুগীজ পেরা > বাংলা পেয়ারা, সংস্কৃত পর্যঙ্ক > ব্রজবুলি পরিযঙ্ক।

বিভাজন (Split) : একটি মূলধ্বনি বা স্বনিমের (Phoneme) যেসব উপধ্বনি বা পূরকধ্বনি থাকে (Allophones), সেগুলির অবস্থান (distribution) ব ধ্বনিসংযোগের (combination) সর্তগুলি ভাষার গঠনগত পরিবর্তনের ফলে কোনো ক্ষেত্রে উঠে গেলে উপধ্বনিগুলি স্বতন্ত্র স্বনিমের মর্যাদা লাভ করে। এর ফলে একই স্বনিমের বিভাজন থেকে ভাষায় একাধিক নতুন স্বনিমের প্রতিষ্ঠা ঘটে। যেমন বাংলায় 'ড্' এবং 'ড়্' ছিল একটিই স্বনিমের দু'টি উপধ্বনি মাত্র। এদের অবস্থানের সুনির্দিষ্ট সর্ত ছিল। যেমন—'ড়্' বসবে শব্দের অন্তে অথবা দু'টি স্বরধ্বনির মাঝখানে, আর 'ড্' বসবে অন্যান্য ক্ষেত্রে ; একটির জায়গায় অন্যটি বসতে পারবে না। কিন্তু এই সর্তটি এখন বাংলায় কয়েকটি বিদেশি শব্দ বহুপ্রচলিত হওয়ায় একেবারেই উঠে গেছে। ফলে এখন দেখা যায় দু'টি স্বরের মাঝখানে এবং শব্দের শেষেও 'ড্' বসছে। যেমন—রেডিও, রড্। এর ফলে বাংলায় 'ড্' ও 'ড়্' এখন আর একই স্বনিমের দু'টি উপধ্বনি নয় ; এখন এ দু'টি স্বতন্ত্র স্বনিম। এইভাবে একই স্বনিম থেকে একাধিক স্বনিমের জন্ম হওয়াকে বিভাজন বলে। এইরকম মধ্যযুগের ইংরেজিতে ঙ্ [ŋ] এবং ন্ [n] ছিল একই স্বনিমের দু'টি উপধ্বনি। কিন্তু এখন এ দু'টি স্বতন্ত্র স্বনিম। বিস্ফোরণ ও বিভাজনের মধ্যে পার্থক্য আছে। বিস্ফোরণের ফলে বিশেষ শব্দে নতুন ধ্বনির আগম হয় মাত্র, কিন্তু ভাষার সামগ্রিক ধ্বনিসম্পদে একটি নতুন স্বনিম যুক্ত হয় না। বিস্ফোরণে যে ধ্বনিটা বাড়ে সেটা ভাষায় প্রচলিত ধ্বনিসম্পদ থেকেই একটি বা একাধিক ধ্বনি এনে শব্দবিশেষে যোগ করা হয় মাত্র। কিন্তু বিভাজন শুধু শব্দবিশেষে ধ্বনিবৃদ্ধির ব্যাপার নয়। এতে সামগ্রিকভাবে ভাষাতেই একটি নতুন স্বনিম যুক্ত হয়।

একীভবন (Merger) : ভাষার কোনো স্বনিম (Phoneme) যদি তার উচ্চরণগত স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে অন্য কোনো স্বনিমের সঙ্গে এক হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলে একীভবন (Merger)। যেমন—সংস্কৃতের মূর্ধন্য 'ণ্' বাংলায় তার উচ্চারণগত স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে এখন দন্ত্য 'ন্'-এর সঙ্গে উচ্চারণের দিক থেকে এক হয়ে গেছে। এইভাবে মূর্ধন্য 'ণ্' ও দন্ত 'ন্' বাংলায় আসলে পৃথক্ স্বনিম নয়, একই স্বনিম। সঙ্কোচন ও একীভবন একই প্রক্রিয়া নয়। সঙ্কোচনে কোনো শব্দের ধ্বনিসংখ্যা কমে যায় ; কিন্তু তার মানে এ নয় যে, ভাষার সামগ্রিক ধ্বনিসংখ্যা কমে গেল ; কিন্তু একীভবনে ভাষার একটি স্বনিম নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে অন্য স্বনিমের সঙ্গে এক হয়ে যায়, এতে ভাষার সামগ্রিক স্বনিম-সংখ্যাই কমে যায়।

অন্যান্য ধ্বনিপরিবর্তন : উপরি-উক্ত সূত্রগুলি ছাড়া ধ্বনির রূপান্তরের আরো কয়েকটি সূত্র ক্রিয়াশীল দেখা যায়। যেমন—(ক) 'ন্' স্থানে 'ল্' উচ্চারণ ; যেমন—'এবার নামুন' > অশিক্ষিত ব্যক্তির উচ্চারণে 'এবার লামুন'। 'না গো বাবু' > 'লা গো বাবু'। পরশুরামের গল্পে ('লম্বকর্ণ') এর একটি সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় :

"বংশলোচন। দেখুন আমার একটি ছাগল আছে, সেটি আপনাকে দিতে পারি, কিন্তু—

লাটু। আমরা হলুম উলিশটি (< উনিশটি) প্রালী (< প্রাণী), একটা পাঁঠায় কি হবে মশায়? কি বল হে লরহরি (< নরহরি)?

নরহরি। লস্যি, লস্যি (< নস্যি, নস্যি)।"

(খ) 'ল্'-এর 'ন্'-তে পরিবর্তন : লবণ > নুন, লোহা > নোয়া ইত্যাদি।

(গ) 'র্'-এর 'ল্'-তে পরিবর্তন : প্রাচীর > পাঁচিল, সংস্কৃত রাজা > প্রাকৃত লাজা, বৈদিক বম্রী > সংস্কৃত বল্মীক ইত্যাদি।

(ঘ) 'ল্'-এর 'র্'-তে পরিবর্তন : প্রাচীন বাংলা লশুন > আধুনিক বাংলা রসুন।

(ঙ) 'স্'-এর 'হ্'-তে পরিবর্তন : সিন্ধু > হিন্দু ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনদ্বিত্ব (Gemination) : কোনো শব্দে জোর দেবার জন্যে আমরা যখন বিশেষ অক্ষরে শ্বাসাঘাত দিই তখন স্বরমধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়াকে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব (Gemination) বলে। যেমন—বড় কষ্ট > বড্ড কষ্ট ; কোথাও পাবে না > কোত্থাও পাবে না।

ধ্বনির স্থানান্তর :

বিপর্যাস (Metathesis) : শব্দের মধ্যে কাছাকাছি অবস্থিত বা সংযুক্ত দু'টি ধ্বনি যদি নিজেদের মধ্যে স্থান-বিনিময় করে তবে ধ্বনির সেই স্থান-বিনিময়কে বিপর্যাস (Metathesis) বলে। যেমন—বাক্স (box) > বাস্ক (ব্ + আ + স্ + ক্ + অ) (এখানে 'ক্' ও 'স্' নিজেদের মধ্যে স্থান-বিনিময় করেছে)। তেমনি—রিক্শা (rickshow) > রিশ্কা, বারাণসী > হিন্দি বনারস > ইংরেজি বেনারস > (Benaras)। অনেক সময় গোটা ধ্বনির বিপর্যাস না হয়ে তার একটি বৈশিষ্ট্য বা ধর্মের বিপর্যাস হয়। যেমন—গর্দভ > গদ্দহ (গ্ + অ + দ্ + দ্ + অ + হ্ + অ) গাধা (গ্ + আ + ধ্ + আ) ('হ্' ধ্বনি একটি মহাপ্রাণ ধ্বনি, এর মহাপ্রাণতা আগে সরে এসে 'দ্'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এর ফলে 'দ্' হয়েছে 'ধ্')। তেমনি আধিক্যতা > আদিখ্যেতা ইত্যাদি।

দূরস্থ ধ্বনির বিপর্যাস / স্পুনারিজম্ (Spoonerism) : শব্দের মধ্যে পাশাপাশি ধ্বনির যেমন স্থান-বিনিময় হয় তেমনি একটি বাক্যের মধ্যে পরস্পর থেকে দূরে অবস্থিত ধ্বনির মধ্যেও পারস্পরিক স্থান-বিনিময় ঘটে। এই শেষোক্ত প্রক্রিয়াকে দূরস্থ ধ্বনির বিপর্যাস বা বাক্যের অন্যোন্য ধ্বনিবিপর্যাস বলতে পারি। অক্সফোর্ডের ড. স্পুনারের উচ্চারণে এরকম ধ্বনিবিপর্যাস প্রায়ই ঘটত বলে এই প্রক্রিয়াটিকে ভাষাবিজ্ঞানে স্পুনারিজম্ (Spoonerism) বলে। ভাষাবিজ্ঞানী তারাপুরওয়ালা উল্লেখ করেছেন—একবার একটি ছাত্রকে বকতে গিয়ে তিনি বলতে চেয়েছিলেন—ছাত্রটি গোটা বছরটাই নষ্ট করেছে—Wasted a whole term—এই কথাটি বলতে গিয়ে বলে ফেলেছিলেন—tasted a whole worm। এখানে t ও w—এই দু'টি দূরস্থ ধ্বনির বিপর্যাস ঘটেছে। বাংলায় তাড়াতাড়িতে অনেক সময় 'এক কাপ চা' বলতে গিয়ে আমরা বলে ফেলি 'এক চাপ কা'। গলে জল হয়ে গেছে > জলে গল হয়ে গেছে।

অপিনিহিতি (Epenthesis) : অনেক সময় শব্দের মধ্যে 'ই' (ি) বা 'উ' (ু) থাকলে, সেটি যে ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে সেই ব্যঞ্জনের আগে সরে এসে উচ্চারিত হয়। এছাড়া শব্দে য-ফলা-যুক্ত ব্যঞ্জন বা 'ক্ষ' বা 'জ্ঞ' থাকলে তার আগে অনেক সময় একটা অতিরিক্ত 'ই' বা 'উ'-উচ্চারিত হয়। এই উভয় প্রক্রিয়াকে অপিনিহিতি বলে। অপিনিহিতিতে শব্দের মাঝখানে যেখানে একটি অতিরিক্ত স্বর যোগ হয় সেখানে অপিনিহিতিও কার্যত একরকমের মধ্যস্বরাগম। যেমন—বাক্য (ব্ + আ + ক্ + য্ + অ) > বাইক্ক (ব্ + আ +

ই + ক্ + ক্ + অ)। অন্য ক্ষেত্রে অপিনিহিতি হল স্বরধ্বনির স্থানান্তর (vowel transfer)। যেমন—করিয়া (ক্ + অ + র্ + ই + য় + আ) > কইর‍্যা (ক্ + অ + ই + র্ + য্ + আ)—এখানে যে 'ই' র্-এর পরে ছিল সেটি র্-এর আগে স্থানান্তরিত হয়েছে। অনেকে এই অপিনিহিতিকে স্বরধ্বনির বিপর্যাস বলেছেন। কিন্তু এটা দু'টি স্বরধ্বনির পারস্পরিক স্থান বিনিময় নয়, একটি ধ্বনির স্থানান্তর।

ভাষার অন্তরঙ্গ ও অর্থপ্রভাবিত কারণে ধ্বনিপরিবর্তন

সাদৃশ্য (Analogy) ঃ মনে রাখার সুবিধার জন্যে বা উচ্চারণ-বৈষম্য হ্রাস করার জন্যে যখন আমরা কোনো ধ্বনি বা রূপ বা অর্থকে অন্য কোনো শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে তার সাদৃশ্যে শব্দের পরিবর্তন করে নিই বা একটি কোনো শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে আমরা অনুরূপ কোনো নতুন শব্দ গড়ে নিই তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলে সাদৃশ্য (Analogy)। সাদৃশ্যের ফল চার রকম হতে পারে—(১) শব্দের ধ্বনিপরিবর্তন, (২) শব্দের রূপপরিবর্তন, (৩) শব্দের অর্থপরিবর্তন এবং (৪) নতুন শব্দসৃষ্টি। বাংলায় বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছ 'টাকার কুমীরে'র 'কুমীর' শব্দটি এসেছে ধনসঞ্চয়ের দেবতা 'কুবের' থেকে। সুতরাং বাংলায় পদগুচ্ছটি হওয়া উচিত ছিল 'টাকার কুবের' বা 'টাকার কুবীর'। কিন্তু বাংলায় হয়েছে 'টাকার কুমীর'। এখানে 'কুবীর' শব্দটি 'কুমীর' শব্দের সাদৃশ্যে পরিবর্তিত হয়ে এই রূপ লাভ করেছে—এখানে 'ব্' থেকে 'ম্' এই ধ্বনিপরিবর্তনটি সাদৃশ্যের প্রভাবেই ঘটেছে। 'র্' থেকে 'ল্' হওয়ায় সংস্কৃত 'প্রাচীর' থেকে বাংলায় 'প্রাচীর' হওয়া উচিত ছিল 'পাচীল' (র্ > ল্), কিন্তু বাংলায় আরো পরিবর্তন হয়ে শব্দটি হয়েছে 'পাঁচীল', এখানে পাঁচ শব্দের সাদৃশ্যে স্বতোনাসিক্যীভবন হয়েছে। 'পাঁচ'-এর প্রভাবে এই পরিবর্তনটাই সাদৃশ্যের নিদর্শন। প্রাচীন বাংলায় উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের সর্বনামের সম্বন্ধ পদের রূপ ছিল যথাক্রমে 'আহ্মার' ও 'তোহ্মার'। এই দু'টি পদের সাদৃশ্যে প্রাচীন বাংলায় 'সবার' শব্দের বিকল্প রূপ গড়ে উঠেছিল 'সহ্মার'। 'হাঁস' ও 'পাতাল' এই দু'টি শব্দের সাদৃশ্যে ইংরেজি শব্দ 'হস্‌পিট্যাল্' (hospital) বাংলায় হয়েছে 'হাঁসপাতাল'।

সাদৃশ্যের প্রভাব শব্দরূপের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। সংস্কৃতে 'নর' শব্দের ষষ্ঠীর একবচনের রূপ 'নরস্য', কিন্তু 'মুনি' শব্দের ষষ্ঠীর একবচনের রূপ 'মুনেঃ'। প্রাকৃতে কিন্তু ঐ 'নরস্স' রূপের সাদৃশ্যে 'মুনি' শব্দেরও ষষ্ঠীর একবচনে হয়েছিল 'মুণিস্স্'। আদিমধ্য যুগের বাংলায় '-রা' বিভক্তি যোগ করে শুধু সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনের রূপ গড়া হত। যেমন—আহ্মারা, তোহ্মারা

ইত্যাদি। (কিন্তু প্রাচীন ও আদিমধ্য বাংলায় বিশেষ্য পদের কর্তৃকারকের বহুবচন রূপ করা হত সমষ্টিবাচক পদ যোগ করে বা অন্যভাবে। যেমন—'সকল সমাহিঅ কাহি করিঅই' সকল সমাধি দিয়ে কি করা যায়?) এর সাদৃশ্যে অন্ত্যমধ্য বাংলায় বিশেষ্যেরও কর্তৃকারকের বহুবচনের পদ ক্রমশ '-রা' বিভক্তি যোগে রচিত হতে থাকে। যেমন—রাজারা। সাদৃশ্যের প্রভাবে ভাষায় আরো দু'রকম প্রক্রিয়া ঘটে—পুরানো শব্দের অর্থপরিবর্তন এবং নতুন শব্দসৃষ্টি। ধ্বনিপরিবর্তনের ধারায় এই দু'টি প্রক্রিয়া যদিও পড়ে না তবু সাদৃশ্যের সামগ্রিক প্রভাব বোঝাবার জন্যে প্রক্রিয়া দু'টি এখানে ব্যাখ্যা করা হল। বৈদিক শব্দ 'ক্রন্দসী'র মূল অর্থ ছিল 'গর্জনকারী প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সৈন্য।'[২২] আবার বৈদিক 'রোদসী' শব্দের অর্থ হল 'দুই জগৎ' (স্বর্গ ও পৃথিবী) > অন্তরীক্ষ।[২৩] এই 'রোদসী' শব্দের সাদৃশ্যে 'ক্রন্দসী' শব্দটির নতুন অর্থ রবীন্দ্রনাথ করেছেন 'অন্তরীক্ষ'। রবীন্দ্র-প্রয়োগে 'রোদসী' শব্দের সাদৃশ্যে 'ক্রন্দসী' শব্দের অর্থপরিবর্তন ঘটেছে।

সাদৃশ্যের প্রভাবে ভাষায় নতুন শব্দ সৃষ্টির অনেক উদাহরণ ভাষাবিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। ড. সুকুমার সেন দেখিয়েছেন—মূল শব্দ 'বধূটি' থেকে বাংলায় ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে এসেছে 'বউড়ী'। এই বউড়ী শব্দের সাদৃশ্যে বাংলায় 'শাশুড়ী', 'ঝিউড়ী' প্রভৃতি নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকে সাদৃশ্যের প্রভাবে নতুন শব্দ সৃষ্টির একটি মজার উদাহরণ পাওয়া যায়। নাটকটির একটি চরিত্র রামমাণিক্য ইংরেজি শিখতে গিয়ে পুংলিঙ্গের সর্বনাম 'হিম্' (him) শব্দের সাদৃশ্যে স্ত্রীলিঙ্গে 'শিম্' (shim) শব্দ সৃষ্টি করতে

২২। যং ক্রন্দসী সংযতী বিহ্বয়েতে পরেঽবর উভয়া অমিত্রাঃ।
সমানং চিদ্রথমাতস্থিবাংসা নানা হবেতে স জনাস ইন্দ্রঃ ॥

—ঋগ্বেদ-সংহিতা ২।১২।৮

—'হে মনুষ্যগণ! গর্জনকারী প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সেনাদল পরস্পর সঙ্গত হয়ে যাকে আহ্বান করে, উত্তম ও অধম শত্রুগণ যাঁকে আহ্বান করে, একবিধ রথারূঢ় দু'জনই যাঁকে নানাপ্রকারে আহ্বান করে, তিনিই ইন্দ্র।'—এখানে বৈদিক 'ক্রন্দ' ধাতুর অর্থ 'গর্জন করা' (below)—Macdonell : *A Vedic Reader for Students,* 1970, p. 230.

২৩। অয়ং দেবানামপসামপস্তমো যো জজান রোদসী বিশ্বশম্ভুবা।

—ঋগ্বেদ,সংহিতা ১।১৬০।৪

—তিনি দেবগণের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয়, তিনি দুই জগৎ (স্বর্গ-পৃথিবী) সৃষ্টি করেছেন, সেই জগৎ সকলের পক্ষে কল্যাণকর।

চায়! সে বলে—"মর্দাগোর পের্‌লাউনে 'হি, হিজ্‌, হিম্‌' অইচে ; মাইয়াগোর নামে 'শি, হার্‌, হার্‌' কইচে ; যদি মর্দাগোর পের্‌লাউনে 'হি, হিজ্‌, হিম্‌' অইল, তবে মাইয়াগোর 'শি, শিজ্‌, শিম্‌' অইব না ক্যান?" এই রকম নতুন শব্দ সৃষ্টির আরো একটি মজার উদাহরণ দিয়েছেন ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ আই. জে. এস্‌. তারাপুরওয়ালা। একসময় দু'টি ছেলের মধ্যে কোনো বিষয়ে তর্ক হচ্ছিল। তর্কের সময় একজন অন্য জনের যুক্তি অস্বীকার করে জোরের সঙ্গে বলল—No, it is not (না, এমনটি হতে পারে না)। তার উত্তরে আবার অন্য পক্ষটি আরো জোরের সঙ্গে বলল—Yes, it is sot (হ্যাঁ, এটা তা-ই)। এই যে 'sot' শব্দটি তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে এইটা 'not' শব্দের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।

বিমিশ্রণ / মিশ্রণ (Contamination) : যদি একটি শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে তার সঙ্গে ভাবানুষঙ্গের জন্যে অন্য কোনো শব্দ মনে এসে যায় এবং মূল শব্দের অংশবিশেষ বাদ দিয়ে সেই জায়গায় মনে-আসা শব্দটি যোগ করে দেওয়া হয় এবং তার ফলে একটি নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়, তবে তাকে বিমিশ্রণ / মিশ্রণ (Contamination) বলে। যেমন—পর্তুগীজ আনানস (annanas) শব্দের 'নস' অংশটুকু বাদ দিয়ে তার জায়গায় বাংলা 'রস' শব্দ যোগ করা হয়েছে এবং তার ফলে 'আনারস' শব্দটি সৃষ্ট হয়েছে। এখানে যে ফলের কথাটি বলা হয়েছে তার মধ্যে রস থাকে বলে বাংলা 'রস' শব্দটির কথা মনে এসেছে। এখানে 'আনানস' ও 'রস' শব্দের মিশ্রণে নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়েছে—'আনারস'।

জোড়কলম শব্দ (Portmanteau Word) : একটি শব্দের বা তার অংশবিশেষের সঙ্গে অন্য শব্দ বা তার অংশবিশেষ যোগ করে যদি একটি নতুন শব্দ তৈরি করা হয় তবে সেই শব্দকে বলে জোড়কলম শব্দ (Portmanteau word)। যেমন—আরবি 'মিন্নৎ' শব্দের প্রথমাংশের সঙ্গে সংস্কৃত 'বিজ্ঞপ্তি' শব্দের শেষাংশ যোগ করে করা হয়েছে 'মিনতি'। বাংলা তফাৎ + ইংরেজি difference > তফারেন্স্‌। 'নিশ্চল' শব্দের প্রথমাংশের সঙ্গে 'চুপ' শব্দটি যোগ করে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন 'নিশ্চুপ' শব্দ। রবীন্দ্রনাথ আরও সৃষ্টি করেছেন—ঝট্‌ + তড়িৎ = ঝটিৎ। এখন বহু প্রচলিত ধোঁয়া + কুয়াশা = ধোঁয়াশা, Smoke + Fog = Smog, India + European = Indo-European. সুকুমার রায়ের একটি কবিতায় জোড়কলম শব্দের চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায় :

> "হাঁস ছিল সজারু, (ব্যাকরণ মানি না),
> হয়ে গেল **"হাঁসজারু"** কেমনে তা জানি না।
> বক কহে কচ্ছপে—'বাহবা কি ফুর্তি!
> অতি খাসা আমাদের **বকচ্ছপ** মূর্তি।।"

বিমিশ্রণ ও জোড়কলমের মধ্যে গঠন-প্রক্রিয়ার দিক থেকে সাদৃশ্য আছে, পার্থক্য শুধু অর্থগত। বিমিশ্রণে যে দু'টি শব্দের যোগ হয় সেই শব্দ দু'টির অর্থ প্রায় একই রকম নয়, বা শব্দ দু'টি প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণও নয়। যেমন—'আনানস' ও 'রস' শব্দ দু'টির অর্থ একই রকম নয়, বা কাছাকাছিও নয়, একটি হল ফলের নাম, অন্যটি আস্বাদের ; শুধু ভাবের অনুষঙ্গ আছে, একটির কথা বললে অন্যটির কথা মনে পড়ে। কিন্তু জোড়কলম শব্দে যে দু'টি শব্দের যোগ সাধন ঘটে সেই শব্দ দু'টির অর্থ প্রায় একই রকম, বা শব্দ দু'টি প্রায় সমান গুরুত্বসম্পন্ন। যেমন—'ধোঁয়া' ও 'কুয়াশা' প্রায় একই রকম জিনিস, দু'য়ে মিলে 'ধোঁয়াশা'। India ও Europe-এর মধ্যে যদিও একটি হল দেশের নাম, অন্যটি মহাদেশের নাম, তবু দু'টিই স্থানের নাম, দু'য়ের মিলনে Indo-Europe, তা থেকে Indo-European।

সঙ্কর শব্দ (Hybrid Word) : বিভিন্ন ভাষার উপাদান যোগ করে একটি নতুন শব্দ গঠিত হলে তাকে সঙ্কর শব্দ বা মিশ্র শব্দ (Hybrid Word) বলে। যেমন—ইংরেজি শব্দ 'মাস্টার' (Master) + বাংলা প্রত্যয় 'ঈ' = মাস্টারী ; বাংলা পুরঃসর্গ 'নি' + ফারসি শব্দ 'খরচা' = নিখরচা। বিমিশ্রণ ও জোড়কলমে দু'টি বা একটি শব্দের অংশবিশেষ নেওয়া হয়, কিন্তু সঙ্কর শব্দে যে উপাদানটি নেওয়া হয় সেটি গোটাই নিয়ে যোগ করা হয়।

লোকনিরুক্তি (Folk-Etymology) : নিরুক্তি মানে ব্যুৎপত্তি বা উৎস-নির্ণয়। শিক্ষিত মানুষের নয়, লোক-সাধারণের অর্থাৎ অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের জ্ঞান-বিশ্বাস অনুসারে নির্ণীত ব্যুৎপত্তির উপরে নির্ভর করে শব্দের যে ধ্বনিপরিবর্তন হয় তাকে লোকনিরুক্তি (Folk-Etymology) বলে। যেমন—বৈদিক ভাষায় 'মাকড়সা'র প্রতিশব্দ ছিল 'ঊর্ণবাভ'। এই মূল শব্দটি 'বভ্' (= বয়ন করা) ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে এই 'বভ্' ধাতু পরে অপ্রচলিত হয়ে যায় এবং লোকসাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস গড়ে উঠে যে মাকড়সা নিজের 'নাভি' থেকে সুতোর মতো একরকম লালা বের করে তা থেকে জাল রচনা করে। লোকবিশ্বাসের ঐ 'নাভি' শব্দের উপরে ভিত্তি করে শব্দটির নতুন ব্যুৎপত্তি করে নেওয়া হয় এবং 'ঊর্ণবাভ' শব্দটির সেই অনুযায়ী ধ্বনিপরিবর্তন হওয়ায় শব্দটি হয়ে যায় 'ঊর্ণনাভ'। তেমনি ধনসঞ্চয়ের দেবতা হলেন 'কুবের'। স্বরসঙ্গতির ফলে 'কুবের' হয়েছে 'কুবীর'। এই 'কুবীর' নিয়ে বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ হওয়া উচিত ছিল 'টাকার কুবীর'। কিন্তু বাংলায় এটি পরিবর্তিত হয়ে রূপ নিয়েছে 'টাকার কুমীর'। কুমীরের পেটে জলে-ডোবা

মানুষের টাকা-পয়সা জমা থাকে এবং কেউ তার সন্ধান পায় না—এই লোক-বিশ্বাসের ফলে 'কুমীর' শব্দের উপরে নির্ভর করে শব্দটির নতুন ব্যুৎপত্তি ধরে নেওয়া হয়েছে এবং শব্দগুচ্ছটি হয়েছে 'টাকার কুমীর'। এই রকম 'আর্ম চেয়ার' (Arm chair) হয়েছে 'আরাম চেয়ার' বা 'আরাম কেদারা'। আর্ম চেয়ারে বসলে আরাম পাওয়া যায় এই ধারণার বশে 'আর্ম' হয়েছে 'আরাম'।

শব্দবিভ্রম (Malapropism) : কখনো কখনো অজ্ঞানতাবশত একটি শব্দের বদলে তার জায়গায় প্রায় সমধ্বনিযুক্ত অন্য একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়। একেই বলে শব্দবিভ্রম (Malapropism)। যেমন—'আমার একটি নীতি আছে'—এই অর্থে অনেক লোককে বলতে শোনা যায়—'আমার একটি প্রিন্সিপ্যাল্ আছে'; আসলে এখানে হবে 'আমার একটি প্রিন্সিপ্‌ল্' (Principle) আছে। প্রিন্সিপ্যাল্ (Principal) মানে 'অধ্যক্ষ', প্রিন্সিপ্‌ল্ (principle) মানে 'নীতি'। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে 'উদ্বাহ বন্ধনে' বলতে গিয়ে একটি চরিত্র বলে ফেলেছে 'উদ্বন্ধনে' ('তোমার সহিত উদ্বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাই')। 'উদ্বাহ বন্ধন' মানে 'বিবাহ বন্ধন' আর 'উদ্বন্ধন' মানে 'গলায় দড়ি'! শব্দবিভ্রমের ফলে এরকম হাস্যকর পরিবর্তন প্রায়ই দেখা যায়। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে কালীবাবু বলেছেন—জাতীয় ভাষা সংস্কৃত চর্চার জন্যে তাঁরা জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা স্থাপন করেছেন। কিন্তু কর্তা মহাশয় যখন জিজ্ঞেস করলেন—সেখানে 'তোমরা কোন সকল পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল দেখি?' তখন কালীবাবু বললেন—'আজ্ঞে শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর বোপদেবের বিন্দা দূতী'। আসলে কালীবাবু মূর্খ, তিনি 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'কে বলছেন—'শ্রীমতী ভগবতীর গীত' আর জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'কে বলছেন—'বোপদেবের বিন্দা দূতী'।

বিষমচ্ছেদ বা ভ্রান্তবিশ্লেষ বা নিষ্কালন (Metanalysis) : শব্দের অন্তর্গত উপাদানগুলির বা শব্দের ব্যুৎপত্তির সঠিক জ্ঞান না থাকার ফলে আমরা অনেক সময় শব্দকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করি যাতে শব্দটিকে ঠিক-ঠিক অংশে ছেদন না করে ভুল অংশে ছেদন করে ফেলি এবং ঐ ভ্রান্ত অংশগুলি নিয়ে আবার নতুন শব্দ গঠন করে ফেলি। এই প্রক্রিয়াকে বলে বিষমচ্ছেদ বা ভ্রান্তবিশ্লেষ বা নিষ্কালন (Metanalysis)। যেমন—একজন জনপ্রিয় অধ্যাপকের আসল নাম শ্রীযুক্ত বাবুরাম প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। নামটি একবার টাইপে ভুল জায়গায় বিশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে হয়ে গিয়েছিল শ্রীযুক্তবাবু রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনি টাইপের ভুলেই একবার God is now here হয়ে গিয়েছিল God is no where ; শুধু 'now'-এর 'w' বিশ্লিষ্ট হয়ে here-এর সঙ্গে যোগ হয়ে যাওয়ায় বাক্যটির

অর্থই উল্টে গেছে! এসব হল আকস্মিক (casual) বিষমচ্ছেদ। ভাষায় এরকম বিষমচ্ছেদের ফলে স্থায়ীভাবে নতুন শব্দসৃষ্টি হতে পারে। যেমন—সংস্কৃত নিধুবন (নি + ধুবন) শব্দের মূল অর্থ 'রমণ' অর্থাৎ 'কামকেলি' (দ্রঃ 'A Trilingual Dictionary' by Dr. Gobindagopal Mukhopadhyay and Dr. Gopikamohan Bhattacharya, 1966, p. 204)। কিন্তু 'বন' শব্দের সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্যবশত জনচেতনায় এই শব্দের গঠন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছে, ফলে শব্দটির গঠন ভ্রান্তভাবে বিশ্লেষণ করা হয়—'নিধু + বন' এবং শব্দটির ভ্রান্ত অর্থও করা হয়—'কেলি-কানন' (অশুদ্ধ কিন্তু সুপ্রচলিত—'চলন্তিকা' —রাজশেখর বসু, ১৩৭৩, পৃঃ ৩৬৩)। যে শব্দের মূল গঠন ছিল 'নি + ধুবন' (নি = নিশ্চয়তাবাচক উপসর্গ, ধুবন = হস্তপদাদিচালন, অগ্নি, কামাগ্নি = fire of passion) সেই শব্দকে বিশ্লেষণ করা হয় 'নিধু + বন' রূপে—এটাই ভ্রান্তবিশ্লেষ বা বিষমচ্ছেদ। তেমনি বৈদিক 'অসুর' (তুলনীয় : আবেস্তার 'আহুর') মূলত একটি অখণ্ড মৌলিক শব্দ—ভ্রান্তজ্ঞানের ফলে এই শব্দের 'অ'-কে নঞর্থক উপাদান ধরে নিয়ে মূল শব্দ থেকে 'অ'-কে বিশ্লিষ্ট করে নতুন শব্দ 'সুর' (দেবতা) সৃষ্টি করা হয়েছে। আরবি 'নারাঞ্জ' ইংরেজিতে গৃহীত হয়েছিল 'norange' রূপে। তার সঙ্গে article যোগ করে হল 'a norange'। পরে ভ্রান্ত বিশ্লেষের ফলে 'norange'-এর প্রথম 'n' বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ববর্তী article 'a'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। ফলে হল 'an orange' আর article বাদ দিয়ে শব্দটি দাঁড়াল 'orange' (কমলা লেবু)।

ভুয়া শব্দ (Ghost Word) : অনেক সময় শব্দের একটা কল্পিত মূল উপাদান খাড়া করে নিয়ে তার সঙ্গে বিভক্তি, প্রত্যয় ইত্যাদি যোগ করে এমন শব্দ গঠন করা হয় যার মূল উৎস ভাষায় ছিলই না। যেমন—'প্রোথিত' শব্দ। এখানে কল্পিত মূল উপাদান হচ্ছে 'প্রোথ্' ধাতু। এর সঙ্গে '-ইত' যোগ করে হয়েছে 'প্রোথিত'। কিন্তু এর মূল যে 'প্রোথ্' ধাতু সেটি কাল্পনিক ধাতু, সংস্কৃতে এর উৎস পাওয়া যায় না।

পুনর্গঠন বা পূর্বস্তরীয় গঠন (Back Formation) : কোনো বিদেশি বা নতুন শব্দকে পরিবর্তিত করে নিজের দেশের প্রাচীন ভাষার ছাঁদে নতুন রূপে গড়ে তোলাকে বলে পুনর্গঠন বা পূর্বস্তরীয় গঠন (Back Formation)। যেমন—গ্রীক 'দ্রাখ্মে' থেকে সংস্কৃত 'দ্রম্য', গ্রীক 'কামেলস্' (Kamelos) থেকে সংস্কৃত 'ক্রমেলক', পর্তুগীজ viola থেকে সাধু বাংলা বেহালা, জার্মান মাক্স্ম্যুলর্ (Max Müller) থেকে সাধু বাংলায় 'মোক্ষমূলর'।

সমমুখ ধ্বনিপরিবর্তন (Convergent Phonemic Change) : ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে যদি একাধিক শব্দ পরিবর্তিত হয়ে উচ্চারণ ও বানানে সম্পূর্ণ একই রকম রূপ লাভ করে তবে সেই ধরনের পরিবর্তনকে **সমমুখ ধ্বনিপরিবর্তন** (Convergent Phonemic Change) বলে। যেমন—সংস্কৃত পততি > বাংলা পড়ে (falls), সংস্কৃত পঠতি > বাংলা পড়ে (reads)। এখানে দু'টি শব্দ 'পততি' ও 'পঠতি' ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণ একই রকম রূপ লাভ করেছে—'পড়ে'। তেমনি সখী > সই, সহি > সই ; ব্যাকুল > বাউল, বাতুল > বাউল। এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে শব্দগুলি যে রূপ লাভ করে তাকে সমরূপ শব্দ (Homonym) বলে। ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে একাধিক শব্দের পরিবর্তিত রূপ যদি ধ্বনির দিক থেকে অর্থাৎ উচ্চারণের দিক থেকে একই রকম হয়ে যায়, শুধু লেখার বানানে পৃথক্ থাকে তবে সেই পরিবর্তিত রূপকে সমোচ্চারিত বা সমধ্বনি শব্দ (Homophone) বলে। যেমন—শ্রবণ > শোনা [ʃona], স্বর্ণ > সোনা [ʃona]। এরকম ঐতিহাসিক সমমুখ পরিবর্তন ছাড়াও যদি দেখা যায় যে দু'টি শব্দের মধ্যে উচ্চারণগত বা ধ্বনিগত মিল আছে, শুধু বানান ও অর্থে পার্থক্য আছে তা হলেও সেই শব্দ দু'টিকে সমোচ্চারিত বা সমধ্বনি শব্দ (Homophone) বলে। যেমন—বন [bo:n] (= অরণ্য), বোন [bo:n] (= ভগিনী) ; বিষ [bi:ʃ] (= poison), বিশ [bi:ʃ] (= twenty) ; কুল [ku:l] (= বংশ), কূল [ku:l] (= নদীর তীর) ইত্যাদি।

বিমুখ ধ্বনিপরিবর্তন (Divergent Phonemic Change) : একই শব্দ যদি ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে একাধিক রূপ লাভ করে অর্থাৎ ধ্বনির পরিবর্তনের ফলে যদি একই শব্দ থেকে একাধিক শব্দের জন্ম হয় তবে সেই ধরনের পরিবর্তনকে বিমুখ ধ্বনিপরিবর্তন (Divergent Phonemic Change) বলে। যেমন—ভণ্ড > ভান ও ভাঁড়, চিত্র > চিতা ও চিত্তির, শ্রদ্ধা > সাধ ও ছেদ্দা।

এভাবে যে কোনো কারণে ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে বা এরকম পরিবর্তন ছাড়াই যদি দেখা যায় যে দু'টি শব্দের একই রকম রূপ, তা হলে সেই শব্দ দু'টিকে **যমক (Doublet)** বলে, যেমন—পড়ে (reads) ও পড়ে (falls) ; যদি তিনটি শব্দের একই রূপ হয় তবে তাদের **ত্রিক (Triplet)** বলে, যেমন—কর (উপাধি), কর (তুই কর), কর (ট্যাক্স) ; এরকম তিনের বেশি শব্দের রূপ একই রকম হলে তাকে **গুচ্ছক (Multiplet)** বলে। যেমন—কড়া (কঠিন), কড়া (পায়ের কড়া), কড়া (রান্নার কড়া), কড়া (দরজার রিং)।

॥ ৩৪ ॥

শব্দার্থতত্ত্ব ও অর্থপরিবর্তনের ধারা

(Semantics and Change of Meaning)

ভাষার দু'টি দিক হচ্ছে—তার বাইরের প্রকাশরূপ (expression aspect) এবং তার ভিতরের ভাব বা অর্থ (content aspect)। ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় ভাষার এই অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে শব্দার্থতত্ত্ব বা Semantics বলে। কোনো কোনো বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী ভাষার শুধু বাইরের গঠনের (Structure) উপরে জোর দেন এবং শব্দার্থকে ভাষাবিজ্ঞানের বহির্ভূত বলে উপেক্ষা করেন। তাঁদের মতে শব্দের অর্থ বা ভাব মানুষের মানসিক প্রক্রিয়ার উপরে নির্ভর করে, এবং যেহেতু মানুষের মনের খেলাকে বিজ্ঞানের সূত্র দ্বারা পুরোপুরি নির্দিষ্ট করা যায় না, সেহেতু শব্দার্থতত্ত্বকে ঠিক বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলা যায় না। তাই তাঁরা শব্দার্থতত্ত্বকে (Semantics) ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে আনতে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে আব্রাহাম নোয়াম্ চম্স্কি (Abraham Noam Chomsky) যে নতুন রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক (Transformational Generative) ভাষাবিজ্ঞান প্রবর্তন করেছেন, তাতে শব্দার্থকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই মতবাদের সমর্থক ভাষাবিজ্ঞানীরা অর্থকে ভাষার আভ্যন্তরীণ গঠনের (deep structure) সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করেন, অর্থের সঙ্গে যোগ রেখেই ভাষার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেন। আমাদের মনে হয় শব্দার্থই হল ভাষার প্রাণ ; এই ভাব বা অর্থকে বাদ দিলে ভাষার কোনো উপযোগিতাই থাকে না। তাই ভাষাবিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল শব্দার্থতত্ত্ব বা Semantics।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বাইরের কাঠামোর যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনি তার ভিতরের অর্থেরও পরিবর্তন হয়। ভাষার ধ্বনিপরিবর্তনের যেমন নানা কারণ আছে তেমনি অর্থপরিবর্তনেরও নানা কারণ আছে। এই কারণগুলিকে প্রথমত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(১) স্থূল কারণ, (২) সূক্ষ্ম কারণ। স্থূল কারণগুলিকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি—(ক) ভৌগোলিক, (খ) ঐতিহাসিক এবং (গ) উপকরণগত। সূক্ষ্ম কারণগুলিকে আবার নানা ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—(ক) সাদৃশ্য (খ) মানসিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার, (গ) শৈথিল্য ও আরামপ্রিয়তা, (ঘ) আলঙ্কারিক প্রয়োগ ইত্যাদি।

অর্থপরিবর্তনের স্থূল কারণ :

ভৌগোলিক কারণ : একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। যেমন—মূল শব্দ 'অভিমান' বাংলার স্নিগ্ধ শ্যামল

কোমল প্রকৃতিতে যে অর্থ বহন করে তাতে কোমল অনুভূতি 'স্নেহমিশ্রিত অনুযোগে'র ভাব আছে। কিন্তু পশ্চিম ভারতের শুষ্ক কঠিন কঠোর প্রকৃতিতে 'অভিমান' শব্দের অর্থে সেই কোমলতা নেই, হিন্দিতে সেখানে 'অভিমান' মানে 'অহংকার' 'অহংভাব'। বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ুতে আমিষ আহার অপেক্ষাকৃত অনুকূল বলে ভোজ্য তালিকায় তা অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে। এখানকার পরিবেশে নিরামিষ খাবার খাওয়া খুব স্বাস্থ্যসম্মত নয় বলে তার স্থান সঙ্কুচিত। এখানে তাই 'শাক' শব্দের অর্থ সঙ্কীর্ণ —শুধুই ভোজ্যপত্র বোঝায়। কিন্তু পশ্চিম ভারতের জলবায়ুতে নিরামিষ আহারই প্রশস্ত হওয়ায় ভোজ্য তালিকায় তার স্থান ব্যাপক এবং সেখানে 'শাক' শব্দ ব্যাপকতর অর্থে প্রযুক্ত—সেখানে যেকোনো নিরামিষ তরকারিই 'শাক'।

ঐতিহাসিক কারণ : জীবনধারার পরিবর্তনের ফলে শব্দের অর্থও পরিবর্তিত হয়। 'আর্য' শব্দটি এসেছে √ঋ (অর্) থেকে ; √'ঋ' = 'গমন করা'। √ঋ + ণ্যৎ = আর্য = গমনধর্মী। ভারতবর্ষে আসার আগে আর্যদের জীবনধারা কৃষিনির্ভর হয়ে উঠেনি। অরণ্যের পশুপ্রাণী ফলমূল খেয়ে জীবন নির্বাহিত করত বলে এরা বন থেকে বনান্তর ঘুরে বেড়াত। তাই 'আর্য' নামের মূল অর্থ 'গতিশীলতা' > 'গতিশীল গোষ্ঠী'। পরে কৃষিনির্ভর স্থিতিশীল জীবনযাত্রা গড়ে ওঠার পরেও তাদের 'আর্য' নামটি থেকেই যায়। তখন 'গতিশীল জনগোষ্ঠী' থেকে অর্থ পরিবর্তিত হয়ে অর্থ দাঁড়ায় ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের নৃজাতি।

আদিম কালে পুরুষেরা বিবাহযোগ্যা কন্যাকে হরণ করে ঘোড়ার পিঠে বহন করে নিয়ে যেত। 'বিবাহ' কথাটি এই বিশেষ রূপে বহন করার অর্থেই প্রথমে প্রচলিত হয়। ক্রমে সমাজে এই আদিম বর্বর বিবাহ-বিধি অপ্রচলিত হয়ে যায়। আধুনিক সমাজে যেখানে বহন করার প্রশ্ন নেই, এমন কি যেখানে পাত্রই ঘরজামাই হয়ে থাকতে পারে, সেখানেও বিবাহ কথাটি প্রযুক্ত হয় ; এখন বিবাহ মানে বিশেষ রূপে বহন করা নয়, এখন বিবাহ মানে 'পরিণয়-সূত্র'।

উপকরণগত : যে উপকরণে কোনো বস্তু তৈরি হয় সেই উপকরণের নাম বা ধর্ম অনুসারে অনেক সময় বস্তুটির নামকরণ হয়, কিন্তু পরে সেই উপকরণটি পরিবর্তিত হয়ে গেলেও পুরোনো নামটিই থেকে যায়। সেক্ষেত্রে পুরোনো নামটির সঙ্গে উপকরণটির যোগ থাকে না, পুরোনো নামে নতুন জিনিসকে বোঝায়, অর্থাৎ সেখানে নামটির অর্থ এমন পরিবর্তিত হয়ে যায় যে তাতে নতুন উপকরণে গঠিত বস্তুকে বোঝায়। যেমন—আগে 'কালি' (ink) বলতে 'কালো' (black) উপকরণে গঠিত কালো তরল পদার্থকেই বোঝাতো। পরে 'লাল', 'সবুজ' প্রভৃতি রঙের উপকরণে গঠিত পদার্থকেও বোঝাতে থাকে ; 'কালি' বলতে শুধু কালো তরল পদার্থকে বোঝায় না, 'লাল', 'সবুজ' প্রভৃতি রঙের

তরল পদার্থকেও বোঝায়। প্যাপিরাস্ (Papyrus) গাছের মজ্জা দিয়ে কাগজ তৈরি হত বলে ইংরেজিতে কাগজকে বলা হত 'পেপার' (Paper)। এখন সেই উপকরণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে, প্যাপিরাস্ গাছ ছাড়াও বাঁশের মণ্ডে তৈরি কাগজকেও পেপারই (Paper) বলা হয়।

অর্থপরিবর্তনের সূক্ষ্ম কারণ :

সাদৃশ্য : সাদৃশ্যের প্রভাবে শব্দের অর্থপরিবর্তন ঘটতে পারে। এই সাদৃশ্য আবার দু'দিক থেকে হতে পারে—একটি শব্দের ধ্বনির সঙ্গে অন্য শব্দের ধ্বনির সাদৃশ্য এবং একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর সাদৃশ্য। 'রোদসী' শব্দের সঙ্গে 'ক্রন্দসী' শব্দের যে আংশিক ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে তারই ফলে 'ক্রন্দসী' শব্দের অর্থপরিবর্তন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। বৈদিক ভাষায় 'ক্রন্দসী' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'গর্জনকারী প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যদ্বয়'[২৪] ; আর বৈদিক ভাষায় 'রোদসী' শব্দের মূল অর্থ 'দুই জগৎ' (স্বর্গ ও পৃথিবী)[২৫], তা থেকে অর্থ দাঁড়িয়েছে 'অন্তরীক্ষ'। রবীন্দ্রনাথ 'রোদসী' শব্দের সঙ্গে ধ্বনিগত সাদৃশ্য ধরে 'ক্রন্দসী' শব্দটিও 'অন্তরীক্ষ' অর্থে প্রয়োগ করেছেন। একটি জিনিসের সঙ্গে অন্য একটি জিনিসের আকৃতি বা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকলেও অনেক সময় একটি জিনিসের নাম অন্য জিনিসটি বোঝবার জন্যেও প্রযুক্ত হয়। যেমন—যে শস্য থেকে তিল তেল তৈরি হয় সেই শস্যের কালো রঙের সঙ্গে মানুষের গায়ের চামড়ায় ছোট্ট গোল কালো রঙের দাগের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে, তাই ওই দাগটিকেও 'তিল' বলা হয়। এর ফলে তিল কথাটির মূল অর্থের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটেছে। 'তিল' শব্দে শুধু বিশেষ শস্যকেই বোঝাতো, এখন গায়ের বিশেষ কালো দাগকেও বোঝায়।

মানসিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার : সাধারণ লোকের ধারণা—অশুভ বিষয় বা বিপজ্জনক বস্তুর নাম উচ্চারণ করতে নেই। এই সংস্কারের বশে অনেক সময় অশুভ বিষয়কে বা বিপজ্জনক বস্তুকে শুভ বা শোভন নাম দেওয়া হয়, একে সুভাষণ (euphemism) বলে। এতে নতুন নামটির নতুন অর্থে প্রয়োগ হতে-হতে তার অর্থবিস্তার ঘটে বা অর্থপরিবর্তন ঘটে। যেমন—'মৃত্যু' অর্থে 'গঙ্গা লাভ করা', 'সাপ' অর্থে 'লতা', সাধু-সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে মৃত্যু অর্থে 'দেহরক্ষা করা' বা 'মহাসমাধি লাভ করা', 'আর সন্তান দিও না'—এই অর্থে 'আর না কালী' থেকে

২৪। ঋগ্বেদ-সংহিতা ২।১২।৮

২৫। ঋগ্বেদ-সংহিতা ১।১৬০।৪

'আন্নাকালী'। এই রকম নিম্নশ্রেণীর লোককে 'হরিজন' বলা, বাড়ির ঝিকে 'কাজের লোক' বলা হয়।

শৈথিল্য ও আরামপ্রিয়তা : ভাষা ব্যবহারে শৈথিল্যের (laxity) বশে অনেক সময় একটা শব্দগুচ্ছের সবটা ব্যবহার না করে তার অংশবিশেষ দিয়ে আমরা কাজ চালাই। এতে শব্দটির নতুন অর্থ দাঁড়িয়ে যায়। যেমন—'সন্ধ্যার সময় প্রদীপ দেওয়া' এই অর্থে 'সন্ধ্যা দেওয়া', 'একটু চা-টা খেয়ে যাও' এবং 'চায়ের সঙ্গে টা না দিলে আমি শুধু চা খাব না'—এখানে 'টা' মানে 'জলখাবার'।

আলঙ্কারিক প্রয়োগ : আলঙ্কারিক অর্থে কোনো শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকলে অনেক সময় শেষে শব্দটি আলঙ্কারিক তাৎপর্য হারিয়ে সাধারণ গতানুগতিক অর্থেই প্রচলিত হয়ে যায়, বা শব্দের কিঞ্চিৎ অর্থপরিবর্তন ঘটে। যেমন—সন্ধ্যায় ফোটে বলে একটি ফুলকে 'সন্ধ্যার মণিস্বরূপ কল্পনা করে প্রথমে তাকে আলঙ্কারিক অর্থে 'সন্ধ্যামণি' বলা হয়েছিল। এখন বহুব্যবহারের ফলে এটি একটি ফুলের সাধারণ নাম হয়ে গেছে। ব্যবসায়ে ব্যর্থ হওয়া অর্থে 'গণেশ ওল্টানো', মিথ্যা কথা বলা অর্থে 'গুলমারা' ইত্যাদি।

অর্থপরিবর্তনের ধারা :

প্রধানত তিনটি ধারায় অর্থপরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন :

(১) অর্থবিস্তার বা অর্থপ্রসার (Expansion of Meaning)

(২) অর্থসংকোচ (Reduction or Contraction of Meaning)

(৩) অর্থসংক্রম বা অর্থসংশ্লেষ (Alteration or Transfer of Meaning)

(১) অর্থবিস্তার : যদি কোনো শব্দ প্রথমে কোনো সংকীর্ণ ভাব বা সীমাবদ্ধ বস্তুকে বোঝায় এবং কিছুকাল পরে ব্যাপক ভাব বা অধিকতর বস্তুকে বোঝায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে 'অর্থবিস্তার' বা 'অর্থপ্রসার' বলা হয়। সাধারণত রূপক বা অতিশয়োক্তির জন্যে এরকম অর্থবিস্তার ঘটে থাকে। যেমন আগে সংস্কৃতে 'বর্ষ' শব্দের অর্থ ছিল 'বর্ষাকাল', অর্থাৎ বৎসরের একটিমাত্র অংশ। পরে শব্দটি বৎসরের একটিমাত্র অংশ অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে সারা বৎসর অর্থেই ব্যবহৃত হতে থাকে। এখানে 'বর্ষ' শব্দের অর্থবিস্তার ঘটেছে। তেমনি সংস্কৃতে 'পরশ্বঃ' শব্দের অর্থ আগে ছিল 'আগামী কালের পরের দিন' (ভবিষ্যৎকাল)। এই শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে 'পরশু'। কিন্তু এর মানে এখন হয়েছে 'আগামী কালের পরের দিন' ও 'গতকালের আগের দিন' অর্থাৎ যা শুধু ভবিষ্যৎকালের অর্থ বোঝাতো তা এখন ভবিষ্যৎ ও অতীত দুই ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। এখানে 'পরশু' শব্দের অর্থবিস্তার ঘটেছে। 'কালি' শব্দের মূল অর্থ 'কালো রঙের তরল

পদার্থ', এখন কালি বলতে যে কোনো রঙের লেখার কালিই বোঝায়। 'মীরজাফর' মূলত এক ব্যক্তির নাম, এখন যে-কোনো বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি অর্থেই আমরা ব্যবহার করি।

(২) অর্থসংকোচ : প্রথমে কোনো শব্দের অর্থ যদি একাধিক বস্তুকে বা ব্যাপক ভাবকে বোঝায় এবং কিছুকাল পরে যদি তার অর্থ একাধিক বস্তু বা ব্যাপক ভাবকে না বুঝিয়ে তার মধ্যে একটিমাত্র ভাব বা বস্তুকে বোঝায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে অর্থসংকোচ বলে। যেমন সংস্কৃতে প্রথমে 'প্রদীপ' শব্দের অর্থ ছিল 'সব রকমের আলো'। পরে বাংলায় এর অর্থ দাঁড়ায় সব রকমের আলো নয়, একটি বিশেষ রকমের আলো যা পিতল বা মাটির তৈরি এবং যা তেল বা সল্‌তে সংযোগে আলো দান করে। এখানে প্রদীপ শব্দের অর্থসংকোচ হয়েছে। 'মনুষ্য' থেকে বাংলায় আগত 'মুনিস' শব্দের অর্থ সর্বশ্রেণীর মানুষ নয়, এখন শুধুই 'মজুর'।

(৩) অর্থসংক্রম : শব্দের অর্থপরিবর্তন কতকগুলি ধাপের মধ্যে দিয়ে হয়। অনেক সময় অর্থপরিবর্তন হতে-হতে শেষ ধাপে এসে শব্দের এমন নতুন অর্থ দাঁড়িয়ে যায় যে মূল অর্থের সঙ্গে তার যোগ সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন মনে হয় শব্দটির অর্থ এক বস্তু থেকে একেবারে অন্য বস্তুতে সরে এসেছে; এই ধরনের পরিবর্তনকে বলে অর্থসংশ্লেষ বা অর্থসংক্রম। যেমন, সংস্কৃতে প্রথমে 'ঘর্ম' বলতে বোঝাতো 'গরম'। এখন বাংলায় বোঝায় 'ঘাম' বা 'স্বেদ'। আরো সার্থক উদাহরণ হল 'পাত্র' শব্দের অর্থ। সংস্কৃতে এর অর্থ ছিল 'পান করার আধার'। তা-ই থেকে অর্থবিস্তারের ফলে মানে দাঁড়ায় 'যে কোনো রকমের আধার', তাই থেকে অর্থসংকোচের ফলে মানে দাঁড়ায় 'কন্যা দান করার আধার', এখন সংকীর্ণ অর্থ হল 'বর'। এখানে যেহেতু মূল অর্থের সঙ্গে বর্তমান অর্থের যোগ সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না, সেহেতু একে অর্থসংক্রম বলতে পারি। 'সন্দেশ' শব্দেও অর্থপরিবর্তনের একাধিক প্রক্রিয়া কাজ করেছে। এই শব্দের মূল অর্থ ছিল 'খবর, সংবাদ'। যখন ডাকব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না তখন আত্মীয়ের বাড়িতে যে ব্যক্তি খবরাখবর নিতে যেত সে কিছু মিষ্টান্ন নিয়ে যেত। এই অনুষঙ্গের সূত্র ধরে সন্দেশ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় মিষ্টান্ন। 'খবর' থেকে 'মিষ্টান্ন'—এটা অর্থসংক্রম। প্রথমে যে কোনো রকমের মিষ্টান্ন বোঝাত। এখন এক বিশেষ ধরনের মিষ্টান্ন বোঝায়। এটা আবার অর্থসংকোচ। সাম্প্রতিক কালে 'চামচে' শব্দের অর্থ 'ছোট্ট হাতা' থেকে 'তোষামোদকারী', 'অতি অনুগত ব্যক্তি' হয়েছে, এটাও অর্থসংক্রম।

অর্থোন্নতি ও অর্থাবনতি : উপরে উল্লিখিত ধারাগুলি ছাড়া শব্দার্থ পরিবর্তনের আরো দু'টি ধারার কথা উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ। সে দু'টি হল

—অর্থোন্নতি (Elevation or Melioration of Meaning) এবং অর্থাবনতি (Degeneration or Pejoration of Meaning)। কোনো শব্দের অর্থ যদি এমন ভাবে পরিবর্তিত হয় যে শব্দটিতে প্রথমে যে ভাব বা বস্তুকে বোঝাতো তার চেয়ে সম্মানিত বা আদৃত ভাব বা বস্তুকে বোঝায় তা হলে তাকে অর্থোন্নতি বলে। যেমন—'বাতুল' শব্দের মূল অর্থ 'বায়ুগ্রস্ত, উন্মাদ, পাগল' (বাত + উল)। কিন্তু 'বাতুল' থেকে আগত 'বাউল' শব্দের অর্থ 'বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়'। তেমনি 'ভোগ' শব্দের মূল অর্থ উপভোগ বা খাদ্যসামগ্রী। কিন্তু দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত হলে 'ভোগ' শব্দের অর্থোন্নতি ঘটে। আবার কোনো শব্দের অর্থপরিবর্তনের ফলে যদি এমন হয় যে, শব্দটিতে পূর্বাপেক্ষা হেয় বা তুচ্ছ বিষয়কে বোঝাচ্ছে তাহলে তাকে বলে অর্থাবনতি। যেমন—'মহাজন' শব্দের মূল অর্থ মহৎ ব্যক্তি ; কিন্তু মহাজন শব্দে যখন মহাজনী-কারবারীকে অর্থাৎ ঋণ-ব্যবসায়ীকে বোঝায় তখন শব্দের অর্থাবনতি হয়েছে বোঝা যায়। তেমনি মনুষ্য > মুনিষ (labourer), শ্যালক > শালা, উপাধ্যায় > ওঝা > রোজা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও অর্থাবনতি ঘটেছে। এরকম অর্থোন্নতি ও অর্থাবনতি নামে স্বতন্ত্র ধারার উল্লেখ করা হয় বটে, কিন্তু দৃষ্টান্তগুলি সূক্ষ্মভাবে দেখলে বোঝা যায় এগুলি পূর্বোক্ত কোনো-না-কোনো ধারায় পড়ে, অধিকাংশই আংশিক বা পূর্ণ অর্থসংক্রম মাত্র।

শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারায় অতীত ইতিহাসের ইঙ্গিত :

শব্দের অর্থপরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্যে জাতির সামাজিক ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন 'কলম' শব্দের মূল অর্থ হল 'শর' বা 'খাগ'। এ থেকে বোঝা যায় আগেকার দিনে লোকে শরের কলম ব্যবহার করত। ইংরেজি 'পেন' (pen) শব্দটি লাতিন penna থেকে এসেছে। লাতিন ভাষায় শব্দটির অর্থ ছিল 'পাখির পালক'। এ থেকে অনুমান করা যায় পাশ্চাত্য দেশে আগেকার দিনে লোকে পাখির পালকের কলম ব্যবহার করত। 'আর্য' শব্দের অর্থ সন্ধান করলে জানতে পারি ভারতবর্ষে আসার আগে আর্যদের জীবনযাত্রা ছিল গতিশীল ভ্রাম্যমাণ ($\sqrt{}$ ঋ + ণ্যৎ = আর্য। $\sqrt{}$ ঋ = গমন করা ; আর্য = গমনধর্মী, গতিশীল)। 'বিবাহ' শব্দের মূল অর্থ বিশেষ রূপে বহন করা'। এ থেকে কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন অতীতে বিবাহযোগ্যা কন্যাকে অপহরণ করে ঘোড়ার পিঠে বহন করে নিয়ে যাওয়া হত। 'বিবাহ' শব্দের মূল অর্থের মধ্যে তার ইঙ্গিত আছে। শব্দের অর্থপরিবর্তনের ধারা থেকে এইভাবে সমাজের অতীত ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

॥ ৩৫ ॥

ভাষার বংশানুগত বা ঐতিহাসিক শ্রেণীবিভাগ : পৃথিবীর আদি ভাষাবংশসমূহ

(Genealogical / Historical Classification of Languages : Language Families of the World)

একই ভাষায় কথা বলে এমন বৃহত্তর জনসাধারণ যখন বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে এক অঞ্চলের লোকের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের লোকের পারস্পরিক যোগাযোগ কমে যায় তখন তাদের ভাষায় আঞ্চলিক পার্থক্য গড়ে উঠে। এই আঞ্চলিক পার্থক্য যখন খুব বেশি হয়ে যায়, তখন মূলত একই ভাষাগত এলাকার অন্তর্গত এক-এক অঞ্চলের ভাষায় স্বতন্ত্র রূপ গড়ে উঠে। এই আঞ্চলিক রূপগুলি ক্রমে স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা লাভ করে। এইভাবে মানুষের বংশবৃদ্ধির মতো একই ভাষা থেকে একাধিক ভাষার জন্ম হয়। কিন্তু এইভাবে যে স্বতন্ত্র ভাষাগুলির জন্ম হয়, তাদের মধ্যে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য বা কিছু পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে কিছু মূলগত সাদৃশ্যও চোখে পড়ে। ভাষার মূল ধ্বনির ক্ষেত্রে, ভাষার শব্দভাণ্ডার, রূপতত্ত্ব ও বাক্যগঠনরীতির ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক সাদৃশ্য দেখা যায়। বিশেষ করে একই উৎস থেকে জাত ভাষাগুলির মূল শব্দভাণ্ডারে (core vocabulary)—অর্থাৎ নিচুর দিকের সংখ্যাশব্দে, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কবাচক শব্দে, গৃহপালিত পশুর নামে এবং দৈনন্দিন কাজকর্মজ্ঞাপক শব্দে—এই সাদৃশ্য চোখে পড়ে। সুতরাং এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, যে ভাষাগুলির প্রাচীন রূপের মধ্যে এরকম মূল ধ্বনি, মূল শব্দভাণ্ডার, শব্দরূপ-ধাতুরূপ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাদৃশ্য চোখে পড়ে সেগুলি একই ভাষাগত উৎস বা একই ভাষাবংশ থেকে জাত। এইভাবে সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে মূলত তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পদ্ধতির (দ্রঃ পৃঃ ৪৩২-৩৯) সাহায্যে নির্ণয় করা হয়েছে যে, পৃথিবীর ভাষাগুলি কয়েকটি আদি উৎস থেকে জন্মলাভ করেছে, এই আদি উৎসগুলিকে পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাবংশ বলা হয়। পৃথিবীর প্রায় চার হাজার ভাষাকে এই কয়েকটি ভাষাবংশে ভাগ করা হয়। যেমন—

(১) ইন্দো-ইউরোপীয় (বা ইন্দো-জার্মানিক্ বা আর্য) (Indo-European / Indo-Germanic / Aryan)

(২) সেমীয়-হামীয় (Semito-Hamitic)

(৩) বান্টু (Bantu)

(৪) ফিন্নো-উগ্রীয় বা উরালীয় (Finno-Ugrian / Uralian)

(৫) তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু বা আল্‌তাইক্ (Turko-Mongol-Manchu / Altaic)

(৬) ককেশীয় (Caucasian)

(৭) দ্রাবিড় (Dravidian)

(৮) অস্ট্রিক (Austric)

(৯) ভোট-চীনীয় বা চীনা-তিব্বতীয় (Tibeto-Chinese / Sino-Tibetan)

(১০) উত্তরপূর্ব সীমান্তীয় বা প্রাচীন এশীয় (Hyperborean or Palaeo-Asiatic)

(১১) এস্‌কিমো (Esquimo)

(১২) আমেরিকার আদিম ভাষাগুলি (American Indian Languages)

উপরে উল্লিখিত এই ভাষাবংশগুলিই প্রধান। কোনো কোনো ভাষাতত্ত্ববিদ্ এগুলি ছাড়াও আরো কয়েকটি ভাষাবংশের উল্লেখ করেন। সেগুলি হল—(১) কোরীয়-জাপানি (Korean and Japanese), (২) আইবেরীয়-বাস্ক (Ibero-Basque), (৩) আন্দামানি (Andamanese), (৪) পাপুয়ান্ (Papuan), (৫) তাস্‌মানীয় (Tasmanian), (৬) সুদানি-গিনীয় (Sudano-Guinean), (৭) বুশম্যান হটেন্টট্ (Bushman-Hottentot), (৮) বুরুশাস্কী (Burushaski), (৯) লা-তি (La-Ti), (১০) অস্ট্রেলীয় ইত্যাদি।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাবংশের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হল—ইন্দো-ইউরোপীয় (বা ইন্দো-জার্মানিক বা আর্য) ভাষাবংশ। কারণ এই বংশের ভাষার প্রাচীন সাহিত্য (সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন) অতি সমৃদ্ধ, এই বংশ থেকে জাত অনেকগুলি আধুনিক ভাষার (ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, ইটালীয়, রুশীয়, বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি) সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধি বিস্ময়কর এবং এই বংশের ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর অনেকগুলিই এখন পৃথিবীতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করেছে। এইসব কারণে ইন্দো-ইউরোপীয় বংশটি পৃথিবীর ভাষাবংশগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বংশের আদি পীঠস্থান বিষয়ে নানা মত থাকলেও দু'টি মতই প্রধান। এক মতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীদের অর্থাৎ আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল মধ্য-ইউরোপ, অন্য মতে দক্ষিণ রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশ। এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী মূল আর্যজাতি পরবর্তীকালে প্রধানত ভারতবর্ষ ও ইউরোপের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং মূল আর্যভাষা বা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে ১০টি প্রাচীন শাখার জন্ম হয়। এই শাখাগুলি হল : (১) ইন্দো-ইরানীয় (Indo-Iranian), (২) বাল্তো-

স্লাবিক্ (Balto-Slavic), (৩) আল্‌বানীয় (Albanian), (৪) আর্মেনীয় (Armenian), (৫) গ্রীক্ (Greek), (৬) ইতালিক্ (Italic), (৭) জার্মানিক্ বা টিউটনিক্ (Germanic / Teutonic), (৮) কেল্‌তিক্ (Celtic), (৯) তোখারীয় (Tokharian) এবং (১০) হিত্তীয় (Hittite)। ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের সমৃদ্ধ প্রাচীন ভাষা হল—গ্রীক্, ইন্দো-ইরানীয় শাখার আবেস্তীয় ও সংস্কৃত, ইতালিক্ শাখার লাতিন এবং জার্মানিক্ শাখার গথিক্ ভাষা। কেউ কেউ মনে করেন এই বংশের প্রাচীন ভাষা বৈদিক সংস্কৃতে রচিত ঋগ্বেদ-সংহিতা (আনুমানিক ১২০০ খ্রীঃ পূঃ), 'সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীনতম গ্রন্থ'। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষক পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করেছেন "মানবজাতির ইতিহাসে ঋগ্বেদ অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল।"[২৬] এই বংশের কয়েকটি আধুনিক সমৃদ্ধ ভাষা হল—ইন্দো-ইরানীয় শাখার ফারসি, বাংলা, হিন্দি, বাল্‌তো-স্লাবিক শাখার রুশীয়, গ্রীক্ শাখার আধুনিক গ্রীক, ইতালিক্ শাখার ফরাসি, ইতালীয়, স্পেনীয়, জার্মানিক্ শাখার ইংরেজি, জার্মান ইত্যাদি।

সেমীয়-হামীয় (Semito-Hamitic) : এই শাখার দু'টি প্রধান উপশাখা-সেমীয় ও হামীয়। সেমীয় উপশাখার প্রাচীনতম নিদর্শন বাণমুখ (Cuneiform) লিপিতে খোদাই করা খ্রীস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের প্রত্নলেখ পাওয়া গেছে। এই উপশাখার দু'টি উল্লেখযোগ্য ভাষা হল হিব্রু (Hebrew) এবং আরবি (Arabic)। বাইবেলের ওল্ড্ টেস্টামেন্ট্ মূলত হিব্রু ভাষায় লেখা হয়েছিল। এই প্রাচীন ভাষাটিকে আধুনিক রাষ্ট্র ইজ্‌রায়েলে পুনর্জীবিত করে সেখানকার রাষ্ট্রভাষা রূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। (এ থেকে মনে হয় প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ ভাষা সংস্কৃতকে পুনর্জীবিত করে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করা অসম্ভব নয়।) আরবি হল ঐস্লামিক ধর্ম-সংস্কৃতির মাধ্যম এবং সমৃদ্ধ সাহিত্যের আধার। হামীয় শাখার একমাত্র ভাষা মিশরীয় এখন লুপ্ত। মিশরেও এখন আরবি ভাষা প্রচলিত।

বাণ্টু (Bantu) বংশের ভাষাগুলি প্রধানত মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকায় প্রচলিত। এই বংশের প্রধান ভাষা হল স্বহিলি (Swahili), কাফির (Kafir) ইত্যাদি।

ফিন্নো-উগ্রীয় (Finno-Ugrian) বংশের ভাষাগুলির মধ্যে ফিন্‌ল্যাণ্ডের ভাষা ফিন্নীয় (Finnish), হাঙ্গেরীর ভাষা হাঙ্গেরীয় (Hungarian) প্রধান।

তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু (Turk-Mongol-Manchu) বংশের তিনটি শাখা—তুর্ক-তাতার, মোঙ্গল ও মাঞ্চু। এই বংশের প্রধান ভাষা হল তুর্ক শাখার অন্তর্গত

২৬। চট্টোপাধ্যায়, ড. সুনীতিকুমার : 'সাংস্কৃতিকী' (২য় খণ্ড), কলিকাতা, ১৩৭২, পৃঃ ১৭২।

তুরস্কের ভাষা তুর্কী (Turkish) বা ওস্‌মালি (Osmali)।

ককেশীয় (Caucasian) বংশের একটিই উল্লেখযোগ্য ভাষা। সেটি হল জর্জিয়ার ভাষা জর্জীয় (Georgian)।

দ্রাবিড় (Dravidian) বংশের ভাষাগুলি প্রধানত দক্ষিণ ভারতেই প্রচলিত। এই বংশের ভাষাগুলির মধ্যে তামিলনাডুর (মাদ্রাজ) ভাষা তামিল (Tamil), অন্ধ্রপ্রদেশের ভাষা তেলুগু (Telegu), কেরলের ভাষা মলয়ালম্ (Malayalam) ও কর্ণাটকের (মহীশূর) ভাষা কন্নড় (Canarese) প্রধান। এইগুলির মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ তামিল ভাষা এবং সাহিত্যের আধুনিকতম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রাগ্রসর মলয়ালম্ ভাষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বংশের অপ্রধান ভাষা হল টুলু (Tulu), পূর্ব বেলুচিস্থানের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচলিত ব্রাহুই (Brahui) এবং উড়িষ্যা-ছোটনাগপুর-মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত গোণ্ড (গোঁড়), ওরাওঁ, বাংলার রাজমহল পাহাড়ে প্রচলিত মাল্‌তো বা মালপাহাড়ি প্রভৃতি।

অস্ট্রিক্ (Austric) বংশের দু'টি শাখা অস্ট্রো-এশিয়াটিক্ (Austro-Asiatic) ও অস্ট্রোনেশীয় (Austronesian)। অস্ট্রো-এশিয়াটিক্ শাখার প্রধান ভাষা হল—শবর, সাঁওতালি, খাসি, মুণ্ডরি, নিকোবরি। এগুলি আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত ভাষা। অস্ট্রোনেশীয় শাখার ভাষা মালয় (Malay), যবদ্বীপীয় (Javanese) ইত্যাদি মালয়, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত।

ভোট-চীনীয় (Tibeto-Chinese) বংশের তিন শাখা—চীনীয়, থাই ও ভোট-বর্মী। প্রথম শাখার প্রধান ভাষা হল চীনের চীনা ভাষা। এই ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয় শাখার ভাষা শ্যামদেশের ভাষা শ্যামী বা সিয়ামী। তৃতীয় শাখার ভাষা তিব্বতের ভাষা তিব্বতী, ব্রহ্মদেশের ভাষা বর্মী এবং ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচলিত বোড়ো, নাগা প্রভৃতি ভাষা।

উত্তর-পূর্ব সীমান্তীয় (Hyperborean) বংশের প্রধান ভাষা চুক্‌চী এশিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে প্রচলিত।

এস্‌কিমো (Esquimo) বংশের ভাষা এস্‌কিমো উত্তর মেরুর সীমান্ত অঞ্চলে (গ্রীনল্যাণ্ড থেকে আলেউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ) পর্যন্ত প্রচলিত।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষাবংশ একটি নয়, আটটি। এগুলি হল : (১) আল্‌গোঙ্কীয়ান্ (Algonquion), (২) আথাবাস্কান্ (Athabascan), (৩) ইরোকোইয়ান্ (Iroquoian), (৪) মুস্কোজীয়ান্ (Muskogean), (৫) সিওউয়ান্ (Siouan), (৬) পিমান্ (Piman), (৭) শোশোনীয়ান্ (Shoshonean) এবং (৮) নাহুয়াট্‌লান্ট্ (Nahuatlant)। এইসব বংশের

ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বিশেষ সমৃদ্ধ নয়। একমাত্র নাহুয়াট্‌লাণ্ট্‌ বংশের ভাষা আজ্‌টেক্‌ একদা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে কিঞ্চিৎ সমৃদ্ধিলাভ করেছিল।

যে ভাষার সঙ্গে অন্য কোনো ভাষার সাদৃশ্য পাওয়া যায়নি, বা সেই সাদৃশ্য-সন্ধানের জন্যে কোনো প্রমাণাদি পাওয়া যায় নি, সেই ভাষাকে স্বাভাবিকভাবেই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অন্য কোনো ভাষার সঙ্গে একই বংশজাত বলে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় নি, সেই ভাষাকে কোনো বংশে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় নি। এই রকমের ভাষাকে **অশ্রেণীবদ্ধ ভাষা (Unclassified Language)** বলে। এই রকমের ভাষা হল প্রাচীন ইতালীর ভাষা এট্রুস্কান (Etruscan) ইত্যাদি। আগেকার ভাষাতত্ত্ববিদেরা সাদৃশ্যের অভাবে এরকম আরো কিছু কিছু ভাষাকে অশ্রেণীবদ্ধ ভাষা বলে চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। যেমন—জাপানি, কোরীয়, বাস্ক্‌, বুশম্যান্‌, হটেন্‌টট্‌ ইত্যাদি। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা এগুলির মধ্যে কয়েকটিকে স্বতন্ত্র বংশের মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

॥ ৩৬ ॥

ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য ভাষাবংশ

(Indo-European or Aryan Family of Languages)

আগেই বলেছি, পৃথিবীর ভাষাবংশগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হল ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য ভাষাবংশ (Indo-European or Aryan Family)। কেউ-কেউ মনে করেন "এই ভাষাবংশের নাম দেওয়া হইয়াছে ইন্দো-ইউরোপীয়, কেননা এগুলির বর্তমান বংশধর ভাষাসমূহ এক সীমায় ভারতবর্ষে, অপর সীমায় ইউরোপে, এবং ভারতবর্ষ ও ইউরোপের মধ্যস্থানে—ইরানে ও পূর্ব-এশিয়ার অপর কোনো কোনো অঞ্চলে—বরাবর প্রচলিত আছে।"[২৭] কিন্তু এই ইন্দো-ইউরোপীয় নামকরণ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদেরা এই ভাষাবংশের নাম দিয়েছেন 'ইন্দো-জার্মানিক্‌' (Indo-Germanic)। কারণ 'ইন্দো-ইউরোপীয়' শব্দে এই ভাষার বিস্তার ঠিক-ঠিক বোঝায় না। 'ইন্দো' শব্দে ভারতকে (India) বোঝায়। কিন্তু ভারত ছাড়া এশিয়ার অন্যান্য দেশেও (যেমন—ইরান ইত্যাদি) এই বংশের ভাষা প্রচলিত। যদি এই বংশের ভাষার সমগ্র বিস্তারক্ষেত্র লক্ষ্য করে নামকরণ করতে হয়, তাহলে এই বংশের নাম হতে পারে 'এশিয়া-ইউরোপীয়' বা 'ইউরো-এশীয়' (Euro-Asiatic)। আর যদি 'ইন্দো' (ইণ্ডিয়া) শব্দটি সমগ্র বিস্তারক্ষেত্র

২৭। সেন, ড. সুকুমার : 'ভাষার ইতিবৃত্ত', কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ৭৬-৭৭।

বোঝাবার জন্যে নয়, তার একটি প্রান্ত বোঝাবার জন্যে গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তবে অন্যদিকে আবার 'ইউরোপ' শব্দটি গ্রহণীয় নয়। কারণ 'ইউরোপ' শব্দটিতে ঠিক প্রান্ত বোঝাচ্ছে না, ইউরোপের সমগ্র বিস্তারক্ষেত্রটি বোঝাচ্ছে। ভারত হল এই ভাষাবংশের বিস্তারক্ষেত্রের যেমন দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত, তেমনি এর ঠিক বিপরীত দিকে সমগ্র ইউরোপকে না ধরে উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত ধরা উচিত। সেই উত্তর-পশ্চিম প্রান্তটি হল আইস্‌ল্যাণ্ড। এই আইস্‌ল্যাণ্ডে জার্মানিক ভাষা প্রচলিত। তাহলে এই ভাষাবংশের বিস্তারক্ষেত্রের দুই প্রান্তীয় ভাষার নাম অনুসারে জার্মান পণ্ডিতেরা এই ভাষাবংশের নাম ঠিকই দিয়েছেন ইন্দো-জার্মানিক (Indo-Germanic)। এই যুক্তি খুঁজে বের করেছেন ভাষাতত্ত্ববিদ্ লেম্যান : "Since the Germanic family was located farthest to the north, in the Iceland, many scholars, particularly in Germany, label the family *Indo-Germanic.*"[২৮] এদিক থেকে 'ইন্দো-ইউরোপীয়ে'র চেয়ে 'ইন্দো-জার্মানিক্' নামটি অপেক্ষাকৃত বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কিন্তু এই নামকরণটিও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। কারণ এতে একদিকে দেশের নাম ইন্দো (Indo < India) অন্য দিকে ভাষাগোষ্ঠীর শাখার নাম 'জার্মানিক্' (Germanic) গ্রহণ করা হয়েছে। ভাষার নাম ধরলে দুই প্রান্তের দু'টি প্রাচীন ভাষার নাম অনুসারে এর নামকরণ করা উচিত ছিল 'বৈদিক-জার্মানিক্'। আর স্থানের নাম ধরলে এর নাম হওয়া উচিত ছিল ভারত-আইসল্যাণ্ডিক। কিন্তু আইসল্যাণ্ডিক বলতে এখন একটি অন্য বংশের ভাষাকে বোঝায়। এইসব কারণে এই ভাষাবংশের সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও সহজ নাম মনে হয়—'আর্য ভাষাবংশ'। 'আর্য' নামটিতে সাধারণত আমরা জাতিবিশেষ বুঝে থাকি বলে ভাষাবংশ বোঝাতে এ নামটি আমাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত অনুসারে 'আর্য' মূলত কোনো জাতির নাম নয়, 'আর্য" হল ভাষারই নাম। স্বয়ং মাক্সমুলরের (Max Müller) উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় : "Aryan, in scientific language, is utterly inapplicable to race. It means languages and nothing but language and if we speak of Aryan race at all, we should know that it means no more than X + Aryan speech."[২৯]

সুতরাং ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদি ভাষা অর্থে 'আর্য' শব্দটি গ্রহণীয়। এখন অবশ্য 'আর্য' শব্দের অর্থবিস্তারের ফলে আর্য শব্দেই জাতিকেও বোঝানো হয়।

২৮। Lehmann, Winfred, P. : *Historical Linguistics : An Introduction,* Oxford, & IBH Publishing Co., 1966, p. 19

২৯। Max Muller, Friedrich : *Collected Works,* New Impression, 1898, Vol. X, (The Homes of the Aryans), p. 90.

আবার ভাষা থেকে জাতি অর্থে আর্য শব্দের প্রয়োগেও একাধিকবার অর্থান্তর ঘটেছে। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী জাতির যে একটি শাখা ভারত ও ইরানে চলে আসে, যাকে আমরা ইন্দো-ইরানীয় বলি, শুধু সেই শাখার লোকেরাই প্রথমে নিজেদের 'আর্য' নামে অভিহিত করতেন, পরে অর্থবিস্তার হওয়ায় সমগ্র ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের সব শাখার জাতিকেই 'আর্য' নামে অভিহিত করা হয়। এখন সমগ্র ইন্দো-ইউরোপীয় বংশকেই আমরা আর্য বলে থাকি এবং অনেক বিশেষজ্ঞ এই অর্থে আর্য নামের ব্যবহারই সমর্থন করেন : "I know that only the Indians and Iranians actually designated themselves by this name (i.e. 'Aryan'). But what expression is to be used conventionally to denote the linguistic ancestors of the Celts, Teutons, Romans, Hellens and Hindus, if 'Aryan' is to be restricted to the Indo-Iranians? The word Indo-European is clumsy, and cannot even claim to be scientific.......'Aryan' on the other hand has the advantage of brevity and familiarity. I therefore prefer to retain it."[৩০]

এখন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ এবং এই বংশের ভাষাভাষী জাতি দুই অর্থেই 'আর্য' শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

যাই হোক, মূল ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষায় লিখিত কোনো গ্রন্থ বা প্রত্নলিপি পাওয়া যায় নি। সেই জন্যে এই ভাষার আদি রূপ যে কেমন ছিল তা নিশ্চিতভাবে জানার কোনো উপায় নেই। এই মূল ভাষা থেকে জাত প্রাচীন ভাষা বৈদিক সংস্কৃত, আবেস্তীয়, গ্রীক্, লাতিন, গথিক্ প্রভৃতির তুলনামূলক আলোচনা করে মূল ভাষার একটি অনুমান-গঠিত রূপ (Reconstructed Form) খাড়া করে নেওয়া হয়েছে মাত্র। এই ভাষার আদি রূপটি যেমন সঠিক জানা যায় না তেমনি এই ভাষার আদি পীঠস্থান অর্থাৎ আর্য জাতির আদি বাসস্থান কোথায় ছিল তাও অবিসংবাদিতভাবে নির্ণীত হয় নি। একদা অনেক ভারতীয় পণ্ডিতের ধারণা ছিল ভারতবর্ষই মূল আর্য জাতির আদি বাসস্থান। পরবর্তী কালে অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, মধ্য ও পূর্ব-ইউরোপ এই আর্য জাতির আদি বাসস্থান ছিল। এখন অনেকে মনে করেন রাশিয়ার উরাল পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিম পাদদেশ বা উত্তর-পশ্চিমের কিরখিজ তৃণভূমিতে আর্য জাতির জন্ম হয় অর্থাৎ দক্ষিণ রাশিয়ার ইউরোপীয় অঞ্চলেই আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল ; এই অঞ্চল থেকে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করার পরেও দীর্ঘকাল

৩০। Childle, V. Gordon : *The Aryan,* London, 1926, (Preface).

এখানে কিছু ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীর বসবাস ছিল এবং এখানে তাদের উন্নত সভ্যতা প্রাচীনকালেই গড়ে উঠেছিল। সম্প্রতি "উরাল্স্-এ আরকাইম পাহাড়ের কাছে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত একটি শহর আবিষ্কৃত হয়েছে। কাছাকাছি পাহাড়টির নামানুসারে...এই শহরটির নাম দেওয়া হয়েছে আরকাইম। শহরটি হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর সমকালীন বলে মনে করা হয়।...প্রস্তরযুগ থেকেই এই ভূখণ্ডটুকু ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় আর ইন্দো-ইরানীয়দের দ্বারা অধ্যুষিত।" ('সোভিয়েত দেশ', খণ্ড ৪১, সংখ্যা ১০ / অক্টোবর ১৯৯০ / পৃঃ ৪৩)। রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশে মূল আর্যজাতি ও মূল আর্যভাষা (ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা) প্রথম রূপ লাভ করে। এই মতবাদটি প্রবর্তন করেন জার্মান পণ্ডিত শ্র্যাডার্ (Schrāder)। আর্যজাতির উৎস সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত থাকলেও শ্র্যাডারের মতটি গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করা হয় : "In spite of the enormous increase in knowledge since the days of Schrāder it would be best to adhere to his conclusion that South Russia, more than any other region, can claim to be regarded as the cradle-land of the Aryans (= Indo-Europeans)."[৩১] আনুমানিক ২৫০০ খ্রীঃ পূঃ আর্যরা তাঁদের আদি বাসস্থান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেন। এর ফলে মূল আর্যভাষা থেকে ক্রমে দশটি প্রাচীন শাখার জন্ম হয় : (১) ইন্দো-ইরানীয় (Indo-Iranian), (২) বাল্তো-স্লাবিক্ (Balto-Slavic), (৩) আল্বানীয় (Albanian), (৪) আর্মেনীয় (Armenian), (৫) গ্রীক (Greek), (৬) ইতালিক্ (Italic), (৭) কেল্তিক্ (Celtic), (৮) টিউটনিক্ / জার্মানিক (Teutonic / Germanic), (৯) তোখারীয় (Tokharian) এবং (১০) হিত্তীয় (Hittite)।

মূল ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষার পুরঃকণ্ঠ্য স্পৃষ্ট (palato-guttural plossive) ধ্বনির পরবর্তী রূপান্তরের উপরে ভিত্তি করে এই বংশের ভাষাগুলিকে দু'টি গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে : সতম্ (Satam) ও কেন্তুম্ (Centum) গুচ্ছ। যে ভাষাগুলিতে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় পুরঃকণ্ঠ্য স্পৃষ্টধ্বনি পরবর্তী কালে শিস্ধ্বনিতে (Sibilant) (শ্, ষ্, স্) পরিবর্তিত হয়ে গেছে সে ভাষাগুলিকে সত্ম (Satem) গুচ্ছে ধরা হয়। এই গুচ্ছে চারটি শাখার ভাষা পড়ে। যেমন—ইন্দো-ইরানীয়, বাল্তো-স্লাবিক্, আল্বানীয় ও

৩১। Ghose, Dr. B. K. 'The Aryan Problem' in *The History and Culture of the Indian People,* Vol. I : The Vedic Age, 1952, p. 21.

আর্মেনীয়। আর মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পুরঃকণ্ঠ্য (palato-guttural) স্পৃষ্টধ্বনি পরবর্তী কালে যেসব ভাষায় পশ্চাৎকণ্ঠ্য অর্থাৎ স্নিগ্ধতালব্য (Velar) ধ্বনি হয়ে গেছে সেই ভাষাগুলিকে কেন্তুম্ (Centum) গুচ্ছের অন্তর্গত ধরা হয়। এই গুচ্ছে পড়ে—গ্রীক্, ইতালিক্, কেল্‌তিক্, টিউটনিক্, তোখারীয় ও হিত্তীয় শাখা। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায়·পুরঃকণ্ঠ্য স্পৃষ্ট ধ্বনি ছিল ৪টি—*k̑, k̑h, g̑, g̑h*। এগুলির মধ্যে *g̑h*-এর পরিবর্তন একটু জটিল। কিন্তু বাকি ৩টি ধ্বনির পরিবর্তন সুস্পষ্ট। *k̑, g̑* ও *k̑h* সত্‌ম গুচ্ছে হয়েছে যথাক্রমে *š, ž* ও *žh*, আর কেন্তুম্ গুচ্ছে হয়েছে যথাক্রমে *k, g* ও *kh*। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার 'শত' (hundred)-বাচক শব্দ (**k̑m̥*tom) পরবর্তী কালে ইন্দো-ইরানীয় শাখার আবেস্তীয় ভাষায় হয়েছে 'সত্‌ম' (Satəm) আর ইতালিক্ শাখার লাতিন ভাষায় হয়েছে 'কেন্তুম্' (Centum)। আবেস্তীয় ভাষার 'সত্‌ম' ও লাতিন্ ভাষার 'কেন্তুম্' শব্দের উপরে ভিত্তি করে দু'টি গুচ্ছের নামকরণ করা হয়েছে কেন্তুম্ ও সত্‌ম গুচ্ছ। সত্‌ম ও কেন্তুম্ গুচ্ছের বিভিন্ন ভাষায় এই শব্দের রূপান্তরের দৃষ্টান্ত নিচের চিত্রে দেওয়া হল—
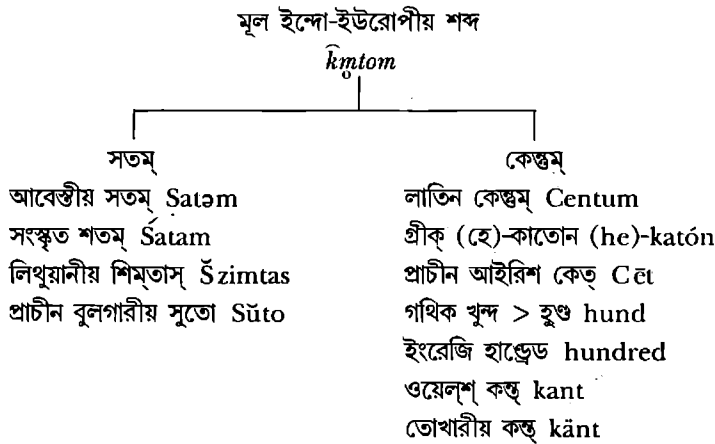
ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হল—

ইন্দো-ইরানীয় : সতম্‌গুচ্ছের শাখাগুলির মধ্যে প্রাচীন সাহিত্যে বিশেষ সমৃদ্ধ হল ইন্দো-ইরানীয় শাখা। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার যে শাখাটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষ ও ইরানে প্রবেশ করে সেই শাখাটিকেই ইন্দো-ইরানীয় শাখা বলা হয়। এই শাখার লোকেরা নিজেদের 'আর্য' বলে গর্ব করতেন। 'আর্য' শব্দটি

সংকীর্ণ অর্থে এই শাখাটিকে বোঝাবার জন্যে কখনো কখনো ব্যবহৃত হয় (কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, ব্যাপক অর্থে 'আর্য' শব্দে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ও ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিকেই বোঝায়)। ড. সুকুমার সেনের মতে "ইন্দো-ইরানীয় শাখা-ভাষীরা নিজেদের 'অর্য' বা 'আর্য' বলিয়া গৌরব বোধ করিত, তাই ইহার নামান্তর **আর্য শাখা** ('আর্য' আসিয়াছে 'অর্য' হইতে, মানে "বিদেশীয়")।[৩২] আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যাটি গ্রহণীয় মনে হতে পারে, কারণ আর্যরাও ভারতের বা ইরানের আদি বাসিন্দা নন, তাঁরাও বিদেশি। কিন্তু বিদেশীয়রা নিজেদেরই বিদেশীয় বলবেন, এটা স্বাভাবিক নয় ; এদেশের আর্য-পূর্ব অধিবাসী দ্রাবিড়-অস্ট্রিকরা যদি আর্যদের বিদেশীয় বলতেন তাহলে সেটাই বেশি স্বাভাবিক হত। কিন্তু 'আর্য' শব্দটি দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক শব্দ নয়। 'আর্য' শব্দটি এসেছে 'ঋ' (অর্) ধাতু থেকে (√ঋ + ণ্যৎ = আর্য। √ঋ = গমন করা to go)। 'আর্য' = 'গমনশীলতা', 'গতিশীলতা' > 'যে গমন শীল', 'যে গতিশীল'। ভারতবর্ষে আসার আগে আর্যরা যাযাবর ছিলেন ; বনের পশুপ্রাণী শিকার করে, অরণ্যের ফলমূল খেয়ে তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করতেন ; তখনো কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রা গড়ে উঠেনি। কৃষিনির্ভর না হলে জীবন স্থিতিশীল হয় না। বনের পশুপ্রাণী ফলমূলের সন্ধানে তাঁরা স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন ; জীবন ছিল স্থিতিহীন গতিশীল। এই গতিশীলতা তাঁদের জীবনচর্যার অঙ্গ, জীবনধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য। তাই 'গতিশীল গোষ্ঠী' অর্থে 'আর্য' নামটি গভীর তাৎপর্যবাহী। আবার সংস্কৃত-গ্রীক-লাতিন ভাষাবিদ্ মনীষী শ্রীঅরবিন্দ আর্যদের জীবনধারার সঙ্গেই যুক্ত আরো একটি তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন 'আর্য' নামের মধ্যে : 'আর্য' নামটি এসেছে 'অর্' থেকে। 'অর্'-এর অর্থ 'সংগ্রাম করা' > 'সংগ্রামী শক্তি'। সেই আদি কালে প্রকৃতির নানা বিরোধী শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবন ধারণ করতে হত। সুতরাং 'অর্' থেকে নিষ্পন্ন 'আর্য' শব্দের অর্থ 'সংগ্রামী শক্তি', 'সংগ্রামী জনগোষ্ঠী'। জীবনধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে শ্রীঅরবিন্দ 'আর্য' নামের এই গভীরতর তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করেছিলেন : "If Arya were a purely racial term, a more probable derivation would be *ar,* meaning strength or valour, from *ar* to fight, whence we have the name of the Greek war-god Ares, *areios,* brave or warlike, perhaps even *aretê,* virtue, signifying, like the Latin *virtus,* first, physical strength and courage and then moral force and elevation. This sense of the word also we may accept......Intrinsically in its most fundamental sense. Arya

---

৩২। সেন, ড. সুকুমার : 'ভাষার ইতিবৃত্ত', ১৯৭৫, পৃঃ ৯৫।

means an effort or an uprising and overcoming. The Aryan is he who strives and overcomes all outside him and within him that stands opposed to the human advance"[৩৩]

ইন্দো-ইরানীয় শাখার যে উপশাখাটি ইরানে চলে যায় তা থেকে ক্রমে দু'টি প্রাচীন ভাষার জন্ম হয়—আবেস্তীয় (Avestan) ও প্রাচীন পারসীক (Old Persian)। আবেস্তীয় ভাষা হল ধর্মাচার্য জরথুশ্ত্র-পন্থী পারসীকদের মূল ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তা'র ভাষা। আবেস্তার প্রাচীনতম অংশ হল গাথা (Ghatha) (খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দী)। ইরানীয় উপশাখার অন্য ভাষাতে প্রাচীন পারসীকের নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাচীন পারস্যের হখামেনীয় (Achaemeniæn) রাজবংশের সম্রাট দারয়বহুশ্ (Darius / Dereios) (খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ-৫ম শতাব্দী) এবং তাঁর পুত্র খশ্‌য়র্শার (Xerxes) শিলালিপি ও ধাতুলিপিতে। এই প্রাচীন পারসীক থেকেই মধ্যযুগে পহ্লবী ভাষার এবং তা থেকে আধুনিক যুগে ইরানের ভাষা ফারসির জন্ম। ইরানীয় বংশের অন্য দু'টি আধুনিক ভাষা হল আফগানিস্তানের ভাষা পশ্‌তো বা পখ্‌তো এবং বেলুচিস্তানের ভাষা বেলুচী।

ইন্দো-ইরানীয় শাখার যে উপশাখাটি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তাকেই আমরা ভারতীয় আর্যভাষা বলে থাকি। এই শাখাটি সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তৃত আলোচনা করব। এই শাখার প্রাচীনতম রচনা 'বেদ' (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১২০০)। বেদের মধ্যে আবার সবচেয়ে প্রাচীন অংশ হল ঋগ্বেদ-সংহিতা। এই ঋগ্বেদ-সংহিতার ভাষা ও দেবদেবীর সঙ্গে আবেস্তার গাথা অংশের ভাষা ও দেবদেবীর সাদৃশ্য ভারতীয় ও ইরানীয় আর্য শাখার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রমাণ করে। বৈদিক ভাষা থেকে ক্রমে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি ভাষার জন্ম হয়। এবং প্রাকৃতের শেষ স্তর অপভ্রংশ-অবহট্ট হয়ে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা বাংলা, হিন্দি, অবধী, মারাঠি, পঞ্জাবি ইত্যাদির জন্ম হয়।

বাল্‌তো-স্লাবিক্ : এই শাখার দু'টি উপশাখা—বাল্তিক (Baltic) ও স্লাবিক (Slavic)। বাল্তিক উপশাখার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও রক্ষণশীল ভাষা হল লিথুয়ানীয়ার ভাষা লিথুয়ানীয় (Lithuanian)। স্লাবিক উপশাখার বুলগারীয় (Bulgarian) ভাষায় খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীতে বাইবেলের যে অনুবাদ করা হয়, সেই অনুবাদই সমগ্র বাল্তো-স্লাবিক শাখার সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন। এই শাখার একটি সাহিত্য-সমৃদ্ধ ভাষা হল রুশ ভাষা। এটি আধুনিক সোভিয়েত রাশিয়ার একটি প্রধান ভাষা।

৩৩। Sri Aurobindo : 'Notes from the "Arya" in *Sri Aurobindo Birth Centenary Library,* Vol. 17, 1972, p. 394.

আল্‌বানীয় : এই শাখার ভাষা আধুনিক আল্‌বানীয় আড্রিয়াটিক্ সাগরের পূর্ব-উপকূলে প্রচলিত। এই শাখাটির প্রাচীনতম প্রাপ্ত নিদর্শনও নিতান্ত অর্বাচীন (খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দী)।

আর্মেনীয় : আর্মেনীয় শাখার প্রাচীন রূপটি (খ্রীঃ পূঃ সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী) এশিয়া মাইনরের আর্মেনিয়া অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। আধুনিক আর্মেনীয় ভাষা আর্মেনীয়ার বাইরে কোনো কোনো দেশে প্রচলিত আছে।

গ্রীক : কেন্তুম্ গুচ্ছের শাখাগুলির মধ্যে প্রাচীন সাহিত্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ হল গ্রীক শাখা। এই শাখার একমাত্র ভাষা গ্রীক (Greek)। প্রাচীন গ্রীক গ্রীস দেশে, এসিয়া মাইনরে, সাইপ্রাস ও ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত ছিল। ক্রীট দ্বীপে প্রাপ্ত একটি প্রত্নলেখে গ্রীক ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন (খ্রীঃ পূঃ ১৪শ শতাব্দী) পাওয়া যায়। গ্রীক ভাষার উপভাষা হল অ্যাত্তিক-ইওনিক, (Attic-Ionic), দোরিক (Doric), আর্কাদিয়ান-সাইপ্রিয়ান (Arcadian-Cyprian), আয়োলিক (Aeolic), উত্তর-পশ্চিমা গ্রীক (North Western Greek) ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ হল অ্যানিক-ইওনিক উপভাষা। ইওলিক উপভাষায় হোমরের ইলিয়াদ-ওদিসি (খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতাব্দী) এবং আত্তিক উপভাষায় পরবর্তী কালের উন্নত নাট্যসাহিত্য ও ক্লাসিক্যাল গদ্যসাহিত্য রচিত। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক ভাষার উপভাষাগুলির মিশ্রণ ঘটিয়ে এবং প্রধানত অ্যাত্তিক-ইওনিক উপভাষার উপরে ভিত্তি করে আধুনিক সর্বজনীন গ্রীক ভাষা কোইনে (Coine)-র রূপটি গড়ে উঠে।

ইতালিক্ : প্রাচীন সাহিত্যের সমৃদ্ধির বিচারে ইতালিক শাখার প্রধান ভাষা লাতিন কেন্তুম্ গুচ্ছের ভাষাগুলির মধ্যে গ্রীকের পরেই উল্লেখযোগ্য। লাতিন (Latin) ছিল প্রথমে প্রাচীন ইতালীর লাতিউম্ (Latium) প্রদেশের ভাষা। পরে যদিও এরকম ধারণা প্রচলিত হয় যে, এই লাতিউম্ প্রদেশের প্রধান নগরী রোমের ভাষা লাতিন, তবু আসলে লাতিনের বিস্তার ছিল রোমেরও বাইরে ব্যাপক ক্ষেত্রে। মধ্যযুগে সমগ্র ইউরোপে পণ্ডিত ব্যক্তির সারস্বত সাধনার ভাষা হয়ে উঠে লাতিন। লাতিনের প্রাচীনতম যে নিদর্শন পাওয়া যায় তা খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর রচনা। মধ্যযুগ পেরিয়ে ইতালিক্ শাখা যখন আধুনিক যুগে পদার্পণ করে তখন আধুনিক ইতালিক্ বা রোমান্স্ (Romance) ভাষাগুলির জন্ম হয়। এগুলির মধ্যে প্রধান ভাষা হল—আধুনিক ইতালীর ভাষা ইতালিয় (Italian), ফ্রান্সের ভাষা ফরাসি (French), স্পেনের ভাষা স্পেনীয় (Spanish), পোর্তুগালের ভাষা পোর্তুগিজ (Portugese) ইত্যাদি।

কেল্‌তিক্ : ইউরোপে একসময় কেল্‌তিক্ ভাষার বিস্তার ছিল ব্যাপক, কিন্তু পরে ইতালিক্ ও টিউটনিক্ শাখার ভাষার প্রসারে তা একান্তই সঙ্কুচিত হয়ে

আসে। এই শাখার প্রধান আধুনিক ভাষা হল আয়ার্ল্যাণ্ডের ভাষা আইরিশ্। খ্রীস্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রত্নলিপিই হল এই ভাষায় প্রাচীনতম নিদর্শন।

টিউটনিক বা জার্মানিক : মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে এই শাখাটি বেরিয়ে এসে যে সব স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে প্রধান হল মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের এক বিশেষ পরিবর্তন যাকে প্রথম জার্মানিক ধ্বনিপরিবর্তন (First Germanic Sound Shift) বলে। এই ধ্বনিপরিবর্তন য়াকপ্ গ্রীম্ যে সূত্রের দ্বারা বিস্তৃত আকারে ব্যাখ্যা করেন তা গ্রীমের সূত্র (Grimm's Law) নামে পরিচিত। (সূত্রটি পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে—দ্রষ্টব্য পৃঃ ৭৩-৭৪)। মূল ভাষা থেকে বেরিয়ে আসার পরে এই শাখায় তিনটি আঞ্চলিক রূপ গড়ে উঠে :—

(১) উত্তর জার্মানিক্

(২) পূর্ব জার্মানিক্ ও

(৩) পশ্চিম জার্মানিক্।

উত্তর জার্মানিক্ শাখার আধুনিক ভাষা হল সুইডেনের ভাষা সুইডিশ্, আইসল্যাণ্ডের ভাষা আইস্ল্যাণ্ডিক ইত্যাদি। আইস্ল্যাণ্ডের ভাষায় প্রাচীন জার্মানির পৌরাণিক কাহিনী 'এড্ডা' (Edda) রচিত হয়েছিল। পূর্ব জার্মানিক্ (গথিক) শাখায় খ্রীস্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে উল্ফিলাস্ বা বুল্ফিলা (Ūlfilas / Wulfila) বাইবেলের অংশবিশেষের যে অনুবাদ করেন তা-ই হল জার্মানিক্ শাখার প্রাচীনতম নিদর্শন। কিন্তু এই পূর্বী শাখার কোনো আধুনিক ভাষা নেই।

পশ্চিম জার্মানিক্ শাখাটি থেকে আধুনিক ভাষা ইংরেজি (English), জার্মান (German) এবং ওলন্দাজ (Dutch) ভাষার জন্ম। জার্মান ভাষা একটি বিশেষ ধরনের ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে অন্যান্য পশ্চিম জার্মানিক ভাষা থেকে পৃথক্ হয়ে যায়। (খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী)। একে দ্বিতীয় জার্মানিক ধ্বনিপরিবর্তন (Second Germanic Sound Shift) বলা হয়।

তোখারীয় : বর্তমান শতাব্দীতে চীনের অন্তর্গত তুর্কীস্থান থেকে এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন কতকগুলি পুঁথি ও প্রত্নলেখ আবিষ্কৃত হয়। এগুলি খ্রীস্টীয় ৭ম থেকে ১০ম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল। এই শাখাটি এখন লুপ্ত, এই শাখা থেকে জাত কোনো আধুনিক ভাষা নেই।

হিত্তীয় : তোখারীয়ের মতো হিত্তীয় ভাষাও বর্তমান শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয়। এশিয়া মাইনরের কাপাদোকিয়া প্রদেশে প্রাপ্ত বাণমুখ লিপিতে লিখিত অনেকগুলি প্রত্নলেখ এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। এগুলি খ্রীঃ পূঃ বিংশ থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে লিখিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এই ভাষায় প্রাচীনতার এমন কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় যাতে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে

হিত্তীয় ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় বংশ থেকে পরবর্তীকালে জাত কোনো শাখা নয়, এটি মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মত অতি প্রাচীন অর্থাৎ এটি ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের সন্তান নয়, এটি ইন্দো-ইউরোপীয়ের ভগিনী স্থানীয় ভাষা। এই মতবাদকে **ইন্দো-হিত্তীয় মতবাদ** বলা হয়। এই মতবাদ অনুসারে হিত্তীয় ও ইন্দো-ইউরোপীয় মিলে আদিতে একটি ভাষাবংশ ছিল তার নাম ইন্দো-হিত্তীয় বংশ। পরে এটি দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটি শাখা হিত্তীয় এবং অন্য শাখা ইন্দো-ইউরোপীয়। এবং এই ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে ন'টি শাখার জন্ম হয়েছিল। কিন্তু এই মতবাদ এখনো সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয় নি। অনেক বিশেষজ্ঞ এই মতবাদকে অহেতুক তাত্ত্বিকতা বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

॥ ৩৭ ॥

ভারতীয় আর্য ভাষা : যুগ-বিভাগ
(Indo-Aryan Language : Periodization)

মূল ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European) ভাষাভাষী আর্য জাতির একটি শাখা এসে ভারতবর্ষ ও ইরান-পারস্যে প্রবেশ করে। এই শাখার ভাষাকেই বলা হয় ইন্দো-ইরানীয় বা সঙ্কীর্ণ অর্থে আর্যশাখা (Indo-Iranian Branch)। এই শাখাটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এর একটি শাখা গিয়েছিল ইরান-পারস্যে। এই শাখার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাচীন পারসীকদের ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তা'য় (খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতাব্দী) ও হখামেনীয় সম্রাটদের প্রাচীন প্রত্নলিপিতে। অন্য শাখাটি আসে ভারতবর্ষে। যে শাখাটি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তাকেই আমরা বলি ভারতীয় আর্যভাষা (Indo-Aryan or Indic Language)। আনুমানিক ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ভারতবর্ষে এই আর্যভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তারপর থেকে আজ বিংশ শতাব্দীর শেষাংশ পর্যন্ত বিবর্তনের নানা স্তর পেরিয়ে ভারতবর্ষে নব-নব রূপে সেই আর্যভাষা বেঁচে আছে। ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশের কাল থেকে আজ পর্যন্ত হিসাব করলে ভারতবর্ষে আর্যভাষার বিস্তৃতিকাল হল প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর। ভারতীয় আর্যভাষার এই সাড়ে তিন হাজার বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসকে পরিবর্তনের লক্ষণীয় পদক্ষেপ অনুসারে তিনটি প্রধান যুগে ভাগ করা হয় :

(১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indo-Aryan = OIA)
(২) মধ্য ভারতীয় আর্য (Middle Indo-Aryan = MIA)
(৩) নব্য ভারতীয় আর্য (New Indo-Aryan = NIA)

মূলত একই ভারতীয় আর্যভাষা বিভিন্ন যুগে পরিবর্তিত হয়ে এতখানি পৃথক্ রূপ লাভ করেছে যে, প্রত্যেক যুগে তাকে পৃথক্ নাম দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক যুগের ভাষাগত নিদর্শনও আমরা পাই ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য-রচনায় বা প্রত্নলিপিতে। ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন যুগের কালগত সীমা, যুগগত নাম ও নিদর্শন আমরা এইভাবে উপস্থাপিত করতে পারি :

যুগ	কালগত সীমা	যুগগত নাম	নিদর্শন
(১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indo-Aryan = OIA)	আঃ ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ থেকে ৬০০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত	বৈদিক ভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত ভাষা	বেদ, মূলত ঋগ্বেদের সংহিতা (মন্ত্র) অংশ
(২) মধ্য ভারতীয় আর্য (Middle Indo-Aryan = MIA)	আঃ ৬০০ খ্রীঃ পূঃ থেকে ৯০০ খ্রীঃ পর্যন্ত	প্রাকৃত ভাষা, পালি ভাষা,	অশোকের শিলা-লিপি, সংস্কৃত নাটকে নারী ও নিম্নশ্রেণীর পুরুষ চরিত্রের সংলাপ, প্রাকৃতে ও পালি ভাষায় রচিত যথাক্রমে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, প্রাকৃতে রচিত মহাকাব্যাদি সাহিত্য-গ্রন্থ ইত্যাদি,
		ক্লাসিক্যাল বা লৌকিক সংস্কৃত ভাষা	কালিদাস প্রমুখ সাহিত্যিকদের সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদি
(৩) নব্য ভারতীয় আর্য (New Indo-Aryan = NIA)	আঃ ৯০০ খ্রীঃ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত	বাংলা, হিন্দি, অবধী, মারাঠি, পঞ্জাবি ইত্যাদি	আধুনিক ভারতীয় আর্যদের মুখের ভাষা ও সাহিত্য

চিত্র নং ৫২ ঃ ভারতীয় আর্যভাষার যুগবিভাগ

॥ ৩৮ ॥

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(Old Indo-Aryan and its Linguistic Features)

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার আনুমানিক বিস্তৃতি হল ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। এই যুগের ভারতীয় আর্যভাষার মূল নিদর্শন পাওয়া যায় হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ 'বেদ'-এ। বেদ চারটি—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। প্রত্যেক বেদের আবার চারটি অংশ—সংহিতা (মূলমন্ত্রভাগ), ব্রাহ্মণ (যজ্ঞানুষ্ঠানের গদ্যাত্মক বিধিবিধান ও কিছু ব্যাখ্যা তথা কিছু আখ্যান-উপাখ্যান), উপনিষদ (গদ্য ও পদ্যে রচিত মূল আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্ব) এবং আরণ্যক (গূঢ়তর দার্শনিক তত্ত্ব ও কিছু আখ্যান-উপাখ্যান)।[৩৪] এগুলির মধ্যে ঋগ্বেদের সংহিতা অংশটি প্রাচীনতম। এই ঋক্-সংহিতাই হল প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সবচেয়ে প্রামাণিক দলিল।

বৈদিক যুগের ভারতীয় আর্যভাষাই হল প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার অবিমিশ্র অবিকৃত নিদর্শন। এই বৈদিক যুগের ভারতীয় আর্যভাষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হল :

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ প্রভৃতি স্বরধ্বনি এবং শ্, ষ্, স্ প্রভৃতি ব্যঞ্জনধ্বনি বেদের পরবর্তী যুগে পরিবর্তিত হয়েছে বা লোপ পেয়েছে, কিন্তু বৈদিক ভাষায় ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ সহ সমস্ত স্বরধ্বনি এবং শ্, ষ্, স্ সহ সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনিই প্রচলিত ছিল।

(খ) স্বরাঘাতের (pitch accent) স্থান পরিবর্তনের ফলে শব্দের অন্তর্গত স্বরধ্বনির বিশেষ ক্রম অনুসারে গুণগত পরিবর্তন (Ablaut qualitative change) হত। স্বরধ্বনির এই পরিবর্তনের তিনটি ক্রম (grade) ছিল—গুণ (strong / normal grade), বৃদ্ধি (lengthened grade) এবং সম্প্রসারণ (weak / reduced grade)। স্বরধ্বনি অবিকৃত থাকলে তাকে গুণ (strong / normal grade) বলে। যেমন—'স্বপ্' ধাতু থেকে জাত 'স্বপ্ন' শব্দে 'অ' স্বরধ্বনিটি অবিকৃত আছে। স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়ে গেলে তাকে বৃদ্ধি (lengthened grade) বলে। যেমন 'স্বপ্' ধাতু থেকে জাত 'স্বাপ' শব্দে 'অ'

৩৪। বৈদিক সাহিত্যের বিস্তৃত পরিচয়ের জন্যে দ্রষ্টব্য : বর্তমান লেখকের 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য : সমাজচেতনা ও মূল্যায়ন'—সাহিত্যশ্রী (পৃঃ ১৩-১৬, ২২-৮৪)।

স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়ে 'আ' হয়েছে। স্বরধ্বনি যখন ক্ষীণ (reduced) হয়ে লোপ পেয়ে যায় এবং তার ফলে শব্দের অন্তর্গত ঋ, র্, ব্ ধ্বনির স্থানে যথাক্রমে র্, ই, উ আসে, তখন এই পরিবর্তনকে সম্প্রসারণ (reduced grade) বলে। যেমন—'স্বপ্' ধাতু থেকে জাত 'সুপ্ত' শব্দে 'স্বপ' ধাতুর 'অ' ধ্বনিটি লোপ পেয়েছে এবং তার ফলে 'ব্' ধ্বনিটি পরিবর্তিত হয়ে 'সুপ্ত' শব্দে 'উ' ধ্বনি হয়ে গেছে।

(গ) সন্নিহিত দু'টি ধ্বনির মধ্যে যেখানে সন্ধি সম্ভব সেখানে সন্ধি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অপরিহার্য ছিল।

(ঘ) বৈদিক ভাষায় শব্দের অন্তর্গত বিশেষ ধ্বনির উপরে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত সুরের তীব্রতা বাড়িয়ে জোর দেবার রীতি প্রচলিত ছিল। একে স্বরাঘাত (pitch accent) বলা হত। বৈদিকে স্বর তিন প্রকার ছিল—উদাত্ত (high/acute), অনুদাত্ত (low/grave) এবং স্বরিত (circumplex)। একই শব্দে একটি অক্ষর থেকে অন্য অক্ষরে স্বরাঘাতের স্থান-পরিবর্তনের ফলে শব্দের অর্থই পরিবর্তিত হয়ে যেত। যেমন—অ́পস্ = কার্য (বিশেষ্য), অপ́স্ = সক্রিয় (বিশেষণ), রা́জপুত্র = রাজা যার পুত্র (অর্থাৎ রাজার পিতাকে বোঝাচ্ছে) বহুব্রীহি সমাস, রাজপুত্র́ = রাজার পুত্র (পুত্রকে বোঝাচ্ছে) ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।[৩৫] পঞ্জাবি ভাষায় দু'একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া স্বরাঘাত এবং শব্দের অর্থনিয়ন্ত্রণে স্বরাঘাতের এমন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পরবর্তী কালের ভারতীয় আর্যভাষায় আর বিশেষ দেখা যায় না।

(ঙ) বিভিন্ন যুক্তব্যঞ্জনের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার প্রচলিত ছিল। যেমন ক্র, ক্ল, ক্ত, ক্তৃ, ক্ষ্ম, র্ম, র্দ্ধ, র্দ্ধ, ষ্ট্র, ৎস্ন ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্তী কালে মধ্যভারতীয় আর্যে অনেক যুক্তব্যঞ্জন সমীভূত হয়েছে এবং আরো পরে নব্য-ভারতীয় আর্যে একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়ে গেছে। যেমন—ভক্ত > ভত্ত > ভাত, ধর্ম > ধম্ম > ধাম।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে জাত গ্রীক, লাতিন, গথিক্ প্রভৃতি ভাষার তুলনায় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি অনেক বেশি রক্ষিত আছে।

৩৫। উদাহরণটি ম্যাক্‌ডোনেল্ সাহেবই প্রথম খুঁজে বের করেন। তিনি পার্থক্যটি এইভাবে দেখিয়েছেন—"rája-putra *having kings as sons* (but rāja-putrá *son of a king*)"–Macdonell, Arthur, A. : *A Vedic Grammar for Students,* Oxford University Press, 1971, p. 455.

(ক) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তিনটি বচন (একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় প্রচলিত ছিল। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় দ্বিবচন অবশ্য শুধু প্রকৃতি-নির্দিষ্ট জোড়া-জোড়া প্রাণীর (যেমন—পিতা-মাতা ইত্যাদি) ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। এই বৈশিষ্ট্য বৈদিক ভাষায় এবং হোমরের গ্রীকেও লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী কালে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে যে কোনো দু'টি জিনিস বোঝাতে দ্বিবচনের প্রচলন হয়। বচনভেদে ধাতুরূপ ও শব্দরূপের পার্থক্য হত।

(খ) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মতো প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাতেও আটটি কারক ছিল—কর্তৃকারক (Nominative), কর্ম কারক (Accusative), করণ কারক (Instrumental), সম্প্রদান কারক (Dative), অপাদান কারক (Ablative), সম্বন্ধপদ (Genitive), অধিকরণ কারক (Locative) এবং সম্বোধন পদ (Vocative)। লক্ষণীয় যে সংস্কৃতে সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদকে ঠিক কারকের মধ্যে ধরা হয় নি, কারণ এই দু'টির সঙ্গে বাক্যের ক্রিয়ার সোজাসুজি সম্পর্ক ছিল না ; সংস্কৃত মতে ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের বিভিন্ন পদের যে সম্পর্ক থাকে শুধু তাকেই কারক বলা হত ('ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্')। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে বিভিন্ন কারকের পৃথক্ বিভক্তিচিহ্ন ছিল এবং বিভক্তিযোগে বিভিন্ন কারকে বিশেষ্য, সর্বনাম ও বিশেষণের পৃথক্ রূপ হত (দু'একটি ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রম ছিল)। মূল শব্দের অন্ত্য ধ্বনি পৃথক্ হলেও শব্দরূপ পৃথক্ হত।

(গ) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মতো প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় তিন প্রকার লিঙ্গ ছিল—পুংলিঙ্গ (Masculine), স্ত্রীলিঙ্গ (Feminine) এবং ক্লীবলিঙ্গ (Neuter)। এই লিঙ্গ-ভেদ প্রকৃতিনির্দিষ্ট (Natural) লিঙ্গ-ভেদ অনুসারে ছিল না, অর্থাৎ শব্দের অর্থের উপরে লিঙ্গ নির্ভর করত না, এই লিঙ্গ-ভেদ ছিল ব্যাকরণগত (Grammatical Gender), অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ শব্দের লিঙ্গ ব্যাকরণে নির্দিষ্ট থাকত। যেমন 'লতা' শব্দ প্রাকৃতিক বিচারে ক্লীবলিঙ্গ, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় আর্য সংস্কৃতে এটি স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ বলে ব্যাকরণে নির্দিষ্ট ছিল। লিঙ্গভেদ অনুসারে শব্দরূপ পৃথক্ হত, কিন্তু ক্রিয়ারূপ পৃথক্ হত না।

(ঘ) শব্দরূপের (Declension) চেয়ে ক্রিয়ারূপে (Conjugation) বৈচিত্র্য প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় অনেক বেশি ছিল। দুইবাচ্যে (কর্তৃবাচ্য = active voice ও কর্ম-ভাববাচ্য = middle voice) ক্রিয়ার রূপ হত পৃথক্-পৃথক্।

(ঙ) ক্রিয়ারূপ দুই পদে বিভক্ত ছিল অর্থাৎ ক্রিয়াবিভক্তির দু'রকম রূপ ছিল—পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ। ধাতুও তিন ভাগে বিভক্ত ছিল—পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী। কর্তৃবাচ্যে পরস্মৈপদী ধাতুর সঙ্গে পরস্মৈপদের

বিভক্তি, আত্মনেপদী ধাতুর সঙ্গে আত্মনেপদের বিভক্তি আর উভয়পদী ধাতুর সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে পরস্মৈপদের বিভক্তি এবং ক্ষেত্রবিশেষে আত্মনেপদের বিভক্তি যোগ হত। নিজের জন্যে কোনো কাজ করলে আত্মনেপদের বিভক্তি এবং পরের জন্যে কোনো কাজ করলে পরস্মৈপদের বিভক্তি যোগ হত। কর্ম-ভাববাচ্যে আত্মনেপদের বিভক্তি যোগ হত।

(চ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে তিন পুরুষে (উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ) ক্রিয়ার রূপ পৃথক্ হত। প্রত্যেক পুরুষের আবার তিন বচনে (একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন) ক্রিয়ারূপের পার্থক্য হত।

(ছ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় (বৈদিক) ক্রিয়ার পাঁচ কাল (Tense) প্রচলিত ছিল। এগুলি হল—লট্ (Present), লঙ্ (Imperfect), লৃট্ (Future), লিট্ (Perfect), লুঙ্ (Aorist)। এগুলির মধ্যে তিনটি (লঙ্, লুঙ ও লিট্) ছিল অতীতকালেরই প্রকারভেদ।

(জ) বৈদিকে ক্রিয়ার পাঁচটি ভাব (Mood) ছিল : অভিপ্রায় (লেট্) (Subjunctive), নির্বন্ধ (Injunctive), নির্দেশক (Indicative), সম্ভাবক (বিধিলিঙ্) (Optative), অনুজ্ঞা (লোট্) (Imperative)। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে প্রথম দু'টি ছিল না।

(ঝ) উত্তরকালের ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে প্র, পরা, অপ, সম, অনু, অব, নির্, দুর্, অভি, বি, অধি, সু, উৎ, অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি, উপ, আ—এই কুড়িটি উপসর্গ ছিল, এগুলি ধাতুর পূর্বে যুক্ত হত এবং ক্রিয়ার অর্থ পরিবর্তিত করত। যেমন—প্র + হৃর = প্রহার, উপ + হৃর = উপহার, বি + হৃর = বিহার। কিন্তু পূর্ববর্তী বৈদিক যুগে এই ধরনের উপসর্গ শুধু ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আকারেই ব্যবহৃত হত না, স্বাধীন পদ রূপে স্বতন্ত্রভাবেও ব্যবহৃত হত।

(ঞ) প্রত্যয়-যোগে প্রচুর নতুন শব্দ গঠনে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা অদ্বিতীয়। প্রত্যয় দু'রকমের ছিল :—কৃৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়। ধাতুর সঙ্গে যে প্রত্যয় যোগ করা হত তাকে বলা হত কৃৎপ্রত্যয়। যেমন—বৃৎ + শানচ্ (মান) = বর্তমান, মন্ + উ = মনু। আর শব্দের সঙ্গে যে প্রত্যয় যোগ হত তাকে বলা হত তদ্ধিত প্রত্যয়। যেমন—মনু + অণ্ = মানব।

(ট) বৈদিক ভাষায় ধাতুর সঙ্গে শতৃ, শানচ্ প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করে বহু বিচিত্র ক্রিয়াজাত বিশেষণ (Present Participle) সৃষ্টি করা হত। যেমন—√হু + শতৃ = নহ্বৎ। √কৃ + শানচ্ = ক্রিয়মাণ।

(ঠ) বৈদিকে ধাতুর সঙ্গে ত্বা, ত্বায় ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করে বহু অসমাপিকা ক্রিয়া (Gerund) রচনা করা হত। যেমন—√পা + ত্বা = পীত্বা, √দৃশ্ + ত্বায় = দৃষ্টায় ইত্যাদি।

(ড) কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, 'সমাসের বিচিত্র ও বহুল প্রয়োগ' প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু যথার্থ প্রাচীন ভারতীয় আর্যে অর্থাৎ বৈদিক ভাষায় বহুপদে গঠিত সমাসের প্রচলন বিশেষ ছিল না। বৈদিক ভাষা-বিশেষজ্ঞ ম্যাক্‌ডোনেল্ বলেছেন : "In the RV. and the AV. no compounds of more than three independent members are met with, and those in which three occur are rare..."[৩৬] বহুপদে গঠিত দীর্ঘ সমাসের ব্যবহার পরবর্তীকালে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় যার অতিশায়িত রূপ আমরা পাই বাণভট্টের 'কাদম্বরী'তে।

(৩) বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য :

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় কর্তা, কর্ম প্রভৃতি কারকের ও ক্রিয়ার বিভিন্নরূপের বিভক্তিচিহ্ন সুনির্দিষ্ট ছিল বলে বাক্যের মধ্যে সেগুলি যেখানেই বসুক, কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া প্রভৃতি সহজেই চিনে নেওয়া যেত। ফলে বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির অবস্থান উল্টে-পাল্টে দিলেও তাতে বাক্যের অর্থ বিপর্যস্ত হত না। এই জন্যে অনেকে বলেছেন 'বাক্যের পদবিন্যাসে নির্দিষ্ট নিয়মের অনাবশ্যকতা' প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মের আবশ্যকতা না থাকলেও বাক্যে পদবিন্যাসের কয়েকটি প্রথাসিদ্ধ বিধিবিধান অবশ্যই ছিল। বিশেষজ্ঞরা বৈদিক ভাষার পদবিন্যাসের নিয়মাবলী সূত্রবদ্ধও করেছেন এবং বৈদিক ভাষার বাক্যগঠনের মূল সাধারণ সূত্রটি যা নির্দেশ করেছেন নব্যভারতীয় আর্যভাষায় মোটামুটিভাবে তারই উত্তরাধিকার বর্তেছে : "The general rule is that the subject begins the sentence and the verb ends it, the remaining members coming between...The verb occasionally moves to the beginning of the sentence when it is strongly emphasized... As regards the cases, the acc. is placed immediately before the verb."[৩৭] অর্থাৎ বাক্যে সাধারণত কর্তা প্রথমে বসে, ক্রিয়া শেষে ; যখন ক্রিয়ার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয় তখন ক্রিয়া বাক্যের প্রথমে চলে আসে। কর্ম সাধারণত ক্রিয়ার ঠিক আগে বসে।

৩৬। Macdonell, Arthur A. : *A Vedic Grammar for Students*, London : Oxford University Press, 1971, p. 267.

৩৭। ibid., p. 284.

(৪) ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য :

বৈদিক ভাষায় ছন্দ ছিল অক্ষরমূলক অর্থাৎ অক্ষরের (syllable) সংখ্যা ও লঘুগুরু বিচার করে ছন্দ নির্ণীত হত ; পরবর্তীকালের মাত্রামূলক ছন্দপদ্ধতি থেকে এই ছন্দের পার্থক্য এইখানে যে, মাত্রামূলক ছন্দপদ্ধতিতে অক্ষর-উচ্চারণের কাল বা মাত্রা অনুসারে ছন্দ নির্ণয় করা হত।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার (বৈদিকের) নিদর্শন :

(ক) অগ্নিমীলে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্।। —ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১/১/১ (অগ্নি)

অনুবাদ ঃ আমি অগ্নির স্তুতি করি, যে অগ্নি পুরোহিত, যজ্ঞের স্বর্গীয় ঋত্বিক্, (দেবগণের) আহ্বানকারী ও রত্নদানকারী (অথবা রত্নধারণকারী)।

(খ) অভীবৃতং কৃশনৈর্বিশ্বরূপং
হিরণ্যশম্যং যজতো বৃহন্তম্।
আস্থাদ্রথং সবিতা চিত্রভানুঃ
কৃষ্ণা রজাংসি তবিষীং দধানঃ।। —ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১/৩৫/৪ (সবিতৃ)

অনুবাদ ঃ (সবিতার) রথটি রত্নখচিত, বিশ্বরূপ, স্বর্ণশঙ্কুযুক্ত, বিরাট্ ; (সেই রথে) যজনীয় ও সূর্যের ন্যায় জ্যোতিসম্পন্ন সবিতা (চারিদিকের) কৃষ্ণ অন্ধকার ধারণ করে অর্থাৎ চারিদিকের কৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যেই সবলে আরোহণ করেছেন।

॥ ৩৯ ॥

বৈদিক ও ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত

(Vedic and Classical Sanskrit)

জীবন্ত ভাষা মাত্রেই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে পরিবর্তিত হয়ে চলে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষাও লোকমুখে আপনা থেকেই কালে-কালে পরিবর্তিত হয়ে আসছিল। কিন্তু বেদের ভাষাকে এদেশের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক মনীষী ও সমাজনেতারা 'দেবভাষা' বলে বিশ্বাস করতেন। প্রকৃতির অপরিহার্য নিয়মে এর

যে স্বাভাবিক পরিবর্তন হয়ে আসছিল তাকে তাঁরা দেবভাষার বিকৃতি মনে করলেন এবং এই বিকৃতি রোধ করার জন্যে তাঁরা ব্যাকরণ রচনা করতে আরম্ভ করলেন। কারণ তাঁদের ধারণা ছিল যে, মানুষকে মূল ভাষার ব্যাকরণ শিখিয়ে দিলে সে শুদ্ধ দেবভাষায় কথা বলবে এবং এতে ভাষার বিকৃতি বন্ধ হবে। এইভাবে তাঁরা ব্যাকরণের নিয়ম দিয়ে ভারতীয় আর্য ভাষার শুদ্ধ মার্জিত রূপের যে আদর্শ রচনা করলেন তারই নাম 'সংস্কৃত' (অর্থাৎ যার সংস্কার সাধন করা হয়েছে) ভাষা। যাঁরা এই রকম সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন মহামনীষী পাণিনি। পাণিনি সম্বন্ধে আমরা আগেই বিস্তৃত আলোচনা করেছি (পৃঃ ১২৯-১৪০)। এখানে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, পাণিনি আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে তাঁর বিখ্যাত ব্যাকরণ 'অষ্টাধ্যায়ী' রচনা করেন। পাণিনির পূর্বে ও সমসময়ে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কথ্যরূপের তিনটি প্রধান আঞ্চলিক ভেদ গড়ে উঠেছিল—

(ক) 'প্রাচ্য' (পূর্বভারতের অযোধ্যা, উত্তর ভারতের পূর্বাঞ্চল বিহার ইত্যাদি),

(খ) 'উদীচ্য' (উত্তর-পশ্চিম ভারত ও উত্তর পঞ্জাব) এবং

(গ) 'মধ্যদেশীয়' (পশ্চিম ভারতের মধ্যদেশ দিল্লি, মিরাট, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চল)।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে[৩৮] সম্ভবত আরো একটি আঞ্চলিক রূপ ছিল, যার নাম দিতে পারি 'দাক্ষিণাত্য' (মহারাষ্ট্র ইত্যাদি অঞ্চল)। এগুলি সবই হল প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কথ্যরূপের আঞ্চলিক উপভাষার নাম। কিন্তু যেটা সাহিত্যিক প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা—যার নিদর্শন পাই ঋগ্বেদের কবিতায়—তার নাম 'ছান্দস' ভাষা।

যাই হোক, পাণিনি নিজে ছিলেন উদীচ্য (উত্তর-পশ্চিম) অঞ্চলের অধিবাসী। অথচ তাঁর সময়ে শিক্ষিত বিদগ্ধ আর্যদের কেন্দ্রভূমি ও সাংস্কৃতিক পীঠস্থান ছিল পশ্চিম ভারতের মধ্যদেশ। এই মধ্যদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মুখে ব্যবহৃত শুদ্ধ আর্যভাষাকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করে এবং তার সঙ্গে নিজের মাতৃভাষা উদীচ্যের কিছু উপাদান মিশ্রিত করে পাণিনি তাঁর ব্যাকরণে শুদ্ধ সংস্কৃতের রূপটি বিধিবদ্ধ করেন। মূলত পাণিনি-কর্তৃক মার্জিত এই সংস্কৃতই সঙ্কীর্ণ অর্থে 'সংস্কৃত ভাষা' যা সাধারণত 'ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত' (Classical

---

৩৮। "Probably there was also a *Dākṣinātya* or Southern dialect."– Chatterji. Dr. Suniti Kumar : *Indo-Aryan and Hindi,* Calcutta : Firma K. L. Mukhopadhyay, 1969, p 63.

Sanskrit) বা 'লৌকিক সংস্কৃত' নামে পরিচিত। বিশেষজ্ঞ ভাষাবিদ্ ড. সুকুমার সেন এই ভাষার গঠনগত উৎস নির্ণয় করে বলেছেন :

"It (Classical Sanskrit) is a literary language based on the speech of the educated men ('śiṣṭa') of midland (Madhyadeśa). At the same time it contains features which really belonged to the dialect of North-West (Udicya), the mother-tongue of Pāṇini, the condifier of Classical Sanskrit."[৩৯] এই ভাষায় যদিও সারা ভারতের অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত বৃহত্তর আর্য জনসাধারণ কথা বলত না, মধ্যদেশের শিক্ষিত লোকেরা ('শিষ্ট') নিশ্চয়ই এই ভাষায় কথা বলতেন। সুতরাং এ ভাষাটি প্রথমে পুরোপুরি কৃত্রিম ভাষা ছিল না। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ তো একে ভারতের অঞ্চলবিশেষের জীবন্ত লোকভাষাই বলেছেন। তাঁদের মতে, "পাণিনি-নির্দিষ্ট ভাষা জীবন্ত লোকভাষা। পাণিনি যে ভাষার পরিচয় দিয়েছেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে, সেই সাধু ভাষা একটি অঞ্চল বিশেষেরই ভাষা এবং তা অকৃত্রিম, জীবন্ত ও গতিশীল ভাষা। কারণ পূর্বতন ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের ভাষার সঙ্গে পাণিনির 'ভাষা'র নিকট সম্পর্ক সহজেই লক্ষণীয়। তাছাড়া তাঁর ব্যাকরণগত অনেক অনুশাসনই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় যদি না স্বীকার করা হয়, এই ভাষা সমাজের অন্তত অভিজাত কোটির দৈনন্দিন জীবনের ভাষা। আর "ভাষা"—পাণিনি-সৃষ্ট এই অভিধার ব্যবহার স্বাভাবিকভাবে কথ্য ভাষাকে নির্দেশ করে নিশ্চয়ই।"[৪০]

অশ্বঘোষ থেকে শুরু করে কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, বিশাখদত্ত, শূদ্রক, বাণভট্ট প্রভৃতি কবি ও নাট্যকারের রচনায় এই সংস্কৃত ভাষার নিদর্শন রয়েছে। এই ভাষা ছিল প্রধানত শিক্ষিত লোকের ভাববিনিময়ের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা। প্রাচীনকালের বৈদিক ভাষা ছিল মূলত বৃহত্তর জনসাধারণের মুখের জীবন্ত ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত ; কিন্তু ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত ছিল পরবর্তী কালের অঞ্চলবিশেষের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের 'সাধুভাষা'। বৃহত্তর জনসাধারণের মুখের ভাষা থেকে এভাষা ছিল অনেক দূরবর্তী, সেই অর্থে অংশত কৃত্রিম ভাষা। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত যখন সাহিত্যের ভাষারূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখনকার বৃহত্তর জনসাধারণের

৩৯। Sen, Dr. Sukumar : *History and Pre-Hhistory of Sanskrit* (University of Mysore, Extension Lecture. 1957). p. 15.

৪০। মজুমদার, ড. পরেশচন্দ্র : 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ', কলকাতা, ১৩৭৮, পৃঃ ৮১।

মুখের ভাষা ছিল 'প্রাকৃত ভাষা'। জনসাধারণের এই জীবন্ত ভাষাস্রোত থেকে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত ক্রমে ক্রমে যত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ততই তা ব্যাকরণের নিগড়ে বাঁধা পড়ে আরো কৃত্রিম হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত 'মৃত ভাষা'য় পরিণত হয়েছে। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের এই পরিণতি ব্যাখ্যা করে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

"As the distance between the vernaculars (of the North-West, Midland, East and South) and this newly risen Sanskrit grew greater and greater, the latter became an artificial language...Its grammar grew hide-bound, and prevented any change of growth that is characteristic of a living language."[৪১] এই ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের বিস্তৃতিকাল পাণিনির পর থেকে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত। অর্থাৎ কালের বিচারে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত মধ্য ভারতীয় আর্যভাষাই, কারণ এর বিস্তৃতিকাল মূলত মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগেই (আঃ ৬০০ খ্রীঃ পূঃ থেকে ১০০০ খ্রীঃ) পড়ে। কিন্তু ভাষার গঠন ও ভাষার বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এতে প্রাকৃতের চেয়ে বৈদিক ভাষার উত্তরাধিকারই বেশি। এইজন্যে ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতকেও ব্যাপক অর্থে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যেই ধরা হয়। 'সংস্কৃত ভাষা' কথাটিও এখন সাধারণত ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়—এর মধ্যে বৈদিক ভাষা ও ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত—দু'টিকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে হলে 'বৈদিক সংস্কৃত' ও 'ক্লাসিক্যাল (বা লৌকিক) সংস্কৃত' নাম দু'টি স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করা হয়। যদিও ভাষার ইতিহাসে প্রাচীন ভারতীয় আর্য বলতে অনেকে ব্যাপক অর্থেই কথাটি গ্রহণ করে থাকেন, তবু বৈদিক ও ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্যও কম নয়। এ পার্থক্যের কয়েকটি প্রধান সূত্র নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল :

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক পার্থক্য :

বৈদিক ও ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের মধ্যে ধ্বনিগত পার্থক্য খুব বেশি নয়। মাত্র দু'একটি লক্ষণীয় পার্থক্য চোখে পড়ে। যেমন—

(ক) স্বরধ্বনির মধ্যে ঌ-কার প্রাচীন বৈদিক ভাষায় প্রচলিত ছিল, বেদের শেষের দিকেই এ ধ্বনির ব্যবহার লোপ পেতে থাকে এবং ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে

৪১। Chatterji, Dr. Suniti Kumar : *The Origin and Development of the Bengali Language,* London : George Allen & Unwin Ltd., 1970. Vol. I, p. 52

একমাত্র 'কৢপ্' ধাতু ছাড়া এই ধ্বনির ব্যবহার নেই।

(খ) বৈদিক ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনির ব্যবহার খুবই কম, ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে মূর্ধন্য ধ্বনির ব্যবহার বেশি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্রাবিড়ীয় ভাষা থেকে গৃহীত হয়ে আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈদিকেরই দন্ত্য ধ্বনির মূর্ধন্যী-ভবনের ফলে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে মূর্ধন্য ধ্বনির প্রয়োগ বেশি হয়েছে।

(গ) বৈদিক ভাষায় স্বরাঘাতের (pitch accent) তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং শব্দের মধ্যে একটি অক্ষর থেকে অন্য অক্ষরে স্বরাঘাতের স্থান-পরিবর্তন করলে তার ফলে শব্দের অর্থও পরিবর্তিত হত। কিন্তু ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে স্বরাঘাতের কোনো ভূমিকা রইল না।

(ঘ) বৈদিক ও ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের মধ্যে আরো একটি পার্থক্যের সূত্র পূর্বাচার্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে ; অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার সেটি উল্লেখ করেছেন। এই পার্থক্যটি হল সন্ধির ক্ষেত্রে। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সন্ধি হয়েছিল বাধ্যতামূলক, কিন্তু বৈদিকে সন্ধি এতখানি বাধ্যতামূলক ছিল না। মনীষা + অগ্নি = 'মনীষা অগ্নি'—এক্ষেত্রে সন্ধি না করলেও চলত।

(২) রূপতাত্ত্বিক পার্থক্য :

(ক) শব্দরূপে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের চেয়ে বৈদিকে বৈচিত্র্য ছিল অনেক বেশি। শব্দরূপে বিভিন্ন কারকে ও বচনে অতিরিক্ত বিকল্প রূপ বৈদিকে বেশি দেখা যায়। যেমন—অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ 'নর'। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে এই শব্দের দ্বি-বচনে প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তিতে শুধু একটাই রূপ পাওয়া যায়—'নরৌ', কিন্তু বৈদিকে আরো একটি রূপ ছিল 'নরা'। তেমনি প্রথমার বহুবচনে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে পাই শুধু 'নরাঃ', বৈদিকে এর অতিরিক্ত রূপ পাই 'নরাসঃ'। আরো লক্ষ্য করা যাবে, 'তৃতীয়ার একবচনে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে শুধু 'নরেণ', বৈদিকে এছাড়াও রয়েছে 'নরা' ; তৃতীয়ার বহুবচনে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে 'নরৈঃ', বৈদিকে অতিরিক্ত রূপ 'নরেভিঃ'।

(খ) ক্রিয়ারূপে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের চেয়ে বৈদিকে বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য আরো অনেক বেশি। বৈদিক ভাষায় ক্রিয়ার পাঁচটি কাল ছিল—লট্ (বর্তমান = Present), লৃট্ (ভবিষ্যৎ = Future), লঙ্ (অসম্পন্ন অতীত = Imperfect Past), লিট্ (সম্পন্ন অতীত = Past Perfect)। লুঙ্ (সদ্য অতীত / অনির্দিষ্ট অতীত / সামান্য অতীত = Aorist)। লক্ষণীয় যে, শেষের তিনটিই ছিল বৈদিক ভাষায় অতীত কালের প্রকারভেদ ; এই তিনের মধ্যে সূক্ষ্ম

অর্থগত পার্থক্য ছিল এবং তিনের ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছিল। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, আধুনিক ভাষার মতো বৈদিকে বিভিন্ন কালের রূপ ঠিক ক্রিয়া সম্পাদনের সময় (time) বোঝাত না, ক্রিয়া সম্পাদনের প্রকৃতি (aspect) বোঝাত। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে আরো দু'টি কাল পাই লৃঙ্ (সম্ভাব্য অতীত = Conditional Past)। এবং লুট্ (বহুভাষিত ভবিষ্যৎ = Periphrastic Future)। এদের মধ্যে লুট্ শেষের দিকে লুপ্ত হয়ে যায়।

(গ) ক্রিয়ার রূপে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের চেয়ে বৈদিক ভাষায় ভাব-প্রকারের (Mood) দিক থেকে বৈচিত্র্য সাধিত হত অনেক বেশি। বৈদিকে ভাব ছিল পাঁচ প্রকার : নির্দেশক (Indicative), অনুজ্ঞা (Imperative), অভিপ্রায় (Subjunctive), সম্ভাবক বা বিধিলিঙ্ (Optative), নির্বন্ধ (Injunctive)। বৈদিক ভাষায় শুধু উত্তম পুরুষে অনুজ্ঞা ভাবের রূপ হত না ; কারণ নিজেই নিজেকে আদেশ বা অনুরোধ করা অর্থহীন। এছাড়া বিভিন্নভাবে ক্রিয়ার রূপ-বৈচিত্র্য বৈদিকে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে ভাববৈচিত্র্য অনেক কম। অভিপ্রায় ভাব (Subjunctive) একেবারেই ছিল না ; নির্বন্ধ ভাবও প্রায় অপ্রচলিতই ছিল, শুধু নিষেধার্থক অব্যয় 'মা' যোগে নির্বন্ধ ভাবের রূপ পাওয়া যায়। এগুলি ছাড়া যে ক'টি ভাব ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে পাওয়া যায়, তাদের প্রয়োগও সীমাবদ্ধ। বৈদিক অসম্পন্ন ছাড়া প্রায় সব কালেই (বর্তমান, সামান্য অতীত, সম্পন্ন অতীত ও ভবিষ্যৎ) বিভিন্ন ভাব অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপ হত। কিন্তু ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে শুধু বর্তমান কালে এবং কখনো কখনো সামান্য অতীতকালে বিভিন্ন ভাব অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপ হতে দেখা যায়।

(ঘ) আগেই বলা হয়েছে বৈদিক ভাষায় শতৃ, শানচ্ ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করে বহু বিচিত্র ক্রিয়াজাত বিশেষণ (Participal Adjectives) সৃষ্টি করা হত (যেমন √যজ্ > যজমান)। তেমনি ত্বা, ত্বায় ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করে বহু অসমাপিকা ক্রিয়া (Gerund) তৈরি করা হত √পা > পীত্বা। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে এরকম ক্রিয়াজাত বিশেষণ ও অসমাপিকার প্রয়োগ কমে যায়।

(ঙ) বৈদিক প্র, পরা, অপ প্রভৃতি উপসর্গ ক্রিয়ার সঙ্গে শুধু যুক্ত হয়েই ব্যবহৃত হত না, ক্রিয়ার বিশেষণ হিসাবে স্বতন্ত্র পদরূপেও ব্যবহৃত হত। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে স্বতন্ত্র পদরূপে উপসর্গের স্বাধীন ব্যবহার বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। উপসর্গ প্রধানত ক্রিয়ার পূর্বে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় এবং ক্রিয়ার অর্থকে পরিবর্তিত করে।

(চ) একথাও আগে বলা হয়েছে যে বৈদিকে সাধারণত দুয়ের বেশি পদে

গঠিত দীর্ঘসমাসের প্রয়োগ নেই, কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতে বহু পদে গঠিত দীর্ঘ সমাস ব্যবহার খুবই চোখে পড়ে।

(ছ) ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে কিছু কিছু নতুন রীতি প্রবর্তিত হতে দেখা যায় যা বৈদিকে ছিল না। যেমন ধাতুর 'তবৎ' প্রত্যয় যোগ করে ক্রিয়ার রূপ গঠন করা হত তা অতীত কালের সমাপিকা ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হত।

(জ) ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে কিছু নতুন ধাতু ও বহু শব্দ এল যা ভারতের অন্-আর্য ভাষা থেকে গৃহীত, বৈদিকে ছিল না।

বৈদিক ভাষার নিদর্শন পূর্বেই দেওয়া হয়েছে (পৃঃ ৫২৮)।

ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত ভাষার নিদর্শন :

(ক) কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি ॥ —শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ২।৪৭

অনুবাদ : কেবলমাত্র কর্মে তোমার অধিকার, ফলে কখনো নয়। কিন্তু কর্মফলে তোমার যেন কখনো আসক্তি না হয়।

(খ) তস্মদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরণ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ৩।১৯

অনুবাদ : সুতরাং (তুমি) অনাসক্ত হয়ে সর্বদা কর্মের অনুষ্ঠান করো। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে মানুষ পরম (সত্য)-কে লাভ করে।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি মা শুচঃ ॥—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ১৮/৬৬

অনুবাদ : সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার (ভগবানের) শরণ গ্রহণ করো। আমি তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত করব। শোক করো না।

(গ) আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥—কুমারসম্ভব, ৩।৫৪

অনুবাদ : স্তনের ভারে ঈষৎ অবনতা প্রভাতসূর্যের মতো লাল-বস্ত্র-পরিহিতা (পার্বতী) যেন পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকের ভারে অবনত কিশলয়-শোভিত সঞ্চরণশীল লতা।

॥ ৪০ ॥

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা : স্তরবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য
(Middle Indo-Aryan : Its Stages and Features)

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার স্তরবিভাগ ও নিদর্শন :

ভারতীয় আর্যদের মুখের ভাষা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে আসছিল। এই পরিবর্তনের ফলে আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৬০০ অব্দের কাছাকাছি সময় থেকে ভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিগত তথা ব্যাকরণগত স্বরূপ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বৈদিক সংস্কৃত থেকে এত পৃথক্ হয়ে গেল যে ঐ সময় থেকে ভারতীয় আর্যভাষার অন্য এক যুগের সূচনা ধরা হয়। এই যুগটির নাম দেওয়া হয় 'মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা' (Middle Indo-Aryan=MIA)-র যুগ। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার যুগগত নাম যেমন 'বৈদিক সংস্কৃত' মধ্যভারতীয় আর্যভাষার তেমনি যুগগত সাধারণ নাম 'প্রাকৃত ভাষা'। 'প্রাকৃত' নামকরণের তাৎপর্য দুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত প্রাকৃত ভাষার বিখ্যাত ব্যাকরণ-রচয়িতা হেমচন্দ্রের মতে 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ হল 'মূল উপাদান' (primeval element)। ভারতীয় আর্যভাষার ক্ষেত্রে এই মূল উপাদান হল বৈদিক সংস্কৃত ভাষা। এই মূল উপাদান থেকে যার জন্ম তা-ই হল প্রাকৃত :

'প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম, তত্র ভবম্ তত আগতম্ বা প্রাকৃতম্"।[৪২]

একথা ঠিকই যে, মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা প্রাকৃত প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বৈদিক সংস্কৃত থেকে জন্মলাভ করেছে। সুতরাং জন্মগত উৎসের বিচারে হেমচন্দ্রের ব্যাখ্যাটি অবশ্যই গ্রহণীয়। দ্বিতীয়ত প্রাকৃত ভাষার স্বরূপ ও উপযোগিতার বিচারে 'প্রাকৃত' নামের আরো একরকম তাৎপর্য ব্যাখ্যাও গ্রহণীয়। বৈদিক সংস্কৃতের পরে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত যখন জনসাধারণ থেকে দূরে সরে মুষ্টিমেয় শিষ্ট শিক্ষিত লোকের ভাষা হয়ে গিয়েছিল তখন প্রাকৃত ভাষার জন্ম হয়েছিল প্রথমে জনসাধারণের মুখের ভাষারূপে। ভিন্টারনিৎসের মতে এটি ছিল জনগণের সাধারণ ভাষা—'common language of the people'। এই সূত্র ধরে ড. সুকুমার সেন 'প্রাকৃত' নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে "প্রাকৃত বা প্রাকৃত ভাষা কথাটির আসল তাৎপর্য হইতেছে 'প্রকৃতি'র অর্থাৎ জনগণের ব্যবহৃত ভাষা।[৪৩] কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, প্রাকৃত ভাষা প্রথমে জনসাধারণের মুখের ভাষারূপে জন্মলাভ করলেও পরবর্তীকালে প্রাকৃত ভাষার

৪২। হেমচন্দ্র ১/১

৪৩। সেন, ড. সুকুমার : 'ভাষার ইতিবৃত্ত' ; ১৯৭৫, পৃঃ ১১১

দ্বিতীয় স্তরে এই ভাষার যে রূপটি সাহিত্যে ব্যবহৃত হতে দেখি সেই রূপটি কিন্তু জনসাধারণের মুখের ভাষা নয়, সেটি মোটামুটি ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতেরই মতো কৃত্রিম ভাষা। একে যথার্থই 'সাহিত্যিক প্রাকৃত' বলা হয়েছে। এই সাহিত্যিক প্রাকৃতের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে ড. সুকুমার সেন বলেছেন :

> "The 'Prakrita' speeches, recognised by the old grammarians, that occur in Sanskrit dramas and in poems, do not come in the direct line of development of Indo-Aryan. The Prakrits are almost entirely based on artificial generalisation of the second phase of MIA and stand in the same relation to MIA proper as Classical Sanskrit to Vedic."[৪৪]

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার ব্যাপ্তিকাল আনুমানিক ৬০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এই পর্বের প্রধান ভাষা হল প্রাকৃত ভাষা। এছাড়া ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত, বৌদ্ধ সংস্কৃত, বা মিশ্র সংস্কৃত এবং পালি ভাষাও মূলত এই যুগে পড়ে। স্পষ্টত দেখতে পাচ্ছি এই যুগটি সুবিস্তৃত ; প্রায় দেড় হাজার বছর হল এর ব্যাপ্তিকাল। এই সুদীর্ঘ কাল ধরে ভারতীয় আর্যভাষা নিশ্চয়ই একই রূপে স্থির হয়ে ছিল না ; কালে কালে তারও পরিবর্তন হয়ে চলেছিল। এই পরিবর্তনের সূত্র ধরে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাসকে বিভিন্ন উপপর্বে বা স্তরে ভাগ করা হয়। আবার ভারতবর্ষে আর্যরা ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলে যতই ছড়িয়ে পড়েছেন, তাঁদের ভাষার যতই ভৌগোলিক বিস্তার ঘটেছে, ততই বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁদের ভাষার অল্পস্বল্প আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যও গড়ে উঠেছে। তাই মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন কালপর্বে বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপও লক্ষ্য করা যায়। ভাষাবিজ্ঞানীরা এইসব আঞ্চলিক রূপ বা আঞ্চলিক উপভাষাকে পৃথক পৃথক প্রাকৃত রূপে অভিহিত করেছেন। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন পর্বের আঞ্চলিক রূপ ও তাদের নিদর্শনগুলি ৫৩ নং চিত্রে উপস্থাপিত করা হয়েছে :

৪৪। Sen. Dr. Sukumar : *A Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan,* Poona : Linguistic Society of India, 1960, p. 5.

পর্ব বা স্তর ও পর্বগত নাম	কালসীমা	আঞ্চলিক রূপ বা উপভাষা	প্রধান নিদর্শন
প্রথম স্তরের মধ্য ভারতীয় আর্য : প্রত্নলিপির প্রাকৃত (Inscriptional Prākṛt)	আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় ১ম শতাব্দী পর্যন্ত	উত্তর-পশ্চিমা (North-Western)	অশোকের শাহ্‌বাজগঢ়ী, মান্‌সেহ্‌রা অনুশাসন।
		দক্ষিণ-পশ্চিমা (South-Western)	গীর্নার অনুশাসন
		প্রাচ্য-মধ্যা (East-Central)	কালসী অনুশাসন
		প্রাচ্যা (Eastern)	ধৌলী ও জৌগড় অনুশাসন
দ্বিতীয় স্তরের মধ্য ভারতীয় আর্য : সাহিত্যিক প্রাকৃত (Literary Prākṛt)	আনুমানিক খ্রীস্টীয় ১ম শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত	পৈশাচী (Paiśāci) প্রাকৃত, মাহারাষ্ট্রী (Māhārāṣṭri), প্রাকৃত, শৌরসেনী (Śauraseni) প্রাকৃত, মাগধী (Māgadhi) প্রাকৃত এবং অর্ধমাগধী (Ardha-Māgadhi) প্রাকৃত	সুবিস্তৃত জৈন ধর্ম-সাহিত্য, সংস্কৃত নাটকে নারী ও ভৃত্যের সংলাপ (রানী ও শিক্ষিত রমণীর ভাষা শৌর-সেনী, ভৃত্য ও নিম্ন-শ্রেণীর ভাষা মাগধী) অনেকগুলি স্বতন্ত্র রচনা (মহাকাব্য, কথানক, নীতিকাব্য, নাটক, ছন্দঃশাস্ত্র, ব্যাকরণ ইত্যাদি)। (সব রকম প্রাকৃতের নিদর্শন সমান নয়)
তৃতীয় স্তরের মধ্যভারতীয় আর্য : অপভ্রংশ (Apabhraṁśa) ও অবহট্‌ঠ (Abahaṭṭha)	আনুমানিক খ্রীস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় ৯ম শতাব্দী	পৈশাচী (Paisaci) অপভ্রংশ, মাহারাষ্ট্রী (Māhārāṣtri) অপভ্রংশ, শৌরসেনী (Śauraseni) অপ-ভ্রংশ, মাগধী (Maga-dhi) অপভ্রংশ, অর্ধ-মাগধী (Ardha-Māgadhi) অপভ্রংশ।	কয়েকটি মহাকাব্য, কথানক কাব্য, কিছু বিচ্ছিন্ন গীতি-কবিতা, সংস্কৃত নাটকের কোনো কোনো সংলাপ ও গান।

চিত্র নং ৫৩ ঃ মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার স্তরবিভাগ ও উপভাষা

উপরে যেসব মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার কথা বলা হল সেগুলি ছাড়া ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতকেও কালের বিচারে মূলত মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগেই ফেলা যায় যদিও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে তাকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যেই ধরা হয়। আর পালি ভাষা তো কালগত বিচার ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য দু'ই দিক থেকেই মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা। তবু ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত ও পালি ভাষার বিবর্তনের স্তরপরম্পরা ঠিক প্রাকৃতের মতো নয় বলে পূর্বোক্ত ছকে এগুলিকে বিন্যস্ত করা যায় না। এগুলি সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হবে।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য (Common Linguistic Features of Middle Indo-Aryan) :

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন কালপর্বে তার যেসব আঞ্চলিক রূপ বা উপভাষা গড়ে উঠেছিল তাদের প্রত্যেকটির কিছু স্বতন্ত্র ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা পরে আলোচনা করা যাবে। তার আগে এখানে সব রকমের মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক :

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দু'টি অর্ধব্যঞ্জন (sonants) ধ্বনি 'ঋ' ও 'ঌ' মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় আর রইল না। 'ঌ'-কার অনেক আগে বৈদিক সংস্কৃতেরই শেষের দিকে লোপ পেতে আরম্ভ করেছিল, মধ্য ভারতীয় আর্য-ভাষায় তা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেল। 'ঋ'-কার এক-এক রকম প্রাকৃতে এক-এক রকম ধ্বনিতে পরিণত হল। যেমন—

ঋ > অ / ই / উ/এ—(মৃগ > মগ, মিগ, মুগ ; বৃদ্ধ > বুড্‌ঢ ; ঋষি > ইসি) ;

ঋ > র / রি / রু—(বৃক্ষ > ব্রচ্ছ, ব্রুচ্ছ, মৃগ > ম্রিগ, ম্রুগ ; ঋসি > রিসি) ;

(খ) 'ঐ' এবং 'ঔ'—এই দু'টি যৌগিক স্বর একক স্বরে—যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও'-তে—পরিবর্তিত হল। যেমন—ঐ > এ (ধর্মানুশস্তৈ > ধম্মানুসখিয়ে) ; ঔ > ও (ঔষধানি > ওসধানি) ;

(গ) 'অয়' এবং 'অব' সঙ্কোচনের (contraction) ফলে যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও' স্বরধ্বনিতে পরিণত হল। যেমন—অয় > এ (পূজয়তি > পূজেতি / পূজেদি / পূজেই) ; অব > ও (ভবতি > ভোদি, হোদি / হোই) ;

(ঘ) পদান্তে স্থিত অনুস্বারের (ম্ > ং) পূর্ববর্তী এবং যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বরে রূপান্তরিত হল। যেমন—কান্তাম্ > কন্তং, দীর্ঘ > দিগ্‌ঘ।

(ঙ) পদের অন্তে অ-কারের পরে অবস্থিত বিসর্গ (ঃ) লোপ পেয়েছে এবং সেই বিসর্গের পূর্ববর্তী অ-কার কখনো ও-কারে, কখনো এ-কারে পরিণত হয়েছে, যেমন—জনঃ > জন > জনো / জনে ; অকার ছাড়া অন্য স্বরের পরবর্তী বিসর্গ শুধু লোপ পেয়েছে, যেমন—পুত্রাঃ > পুত্তা।

(চ) পদের শেষে অবস্থিত অনুস্বার (ং) সাধারণত রক্ষিত হয়েছে। যেমন—নরম্ > নরং, এছাড়া পদান্তে স্থিত বাকি সব ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেয়েছে। যেমন—নরাৎ > নরা।

(ছ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যের তিনটি শিস্ ধ্বনির (শ্, ষ্, স্) সব ক'টি কোনো প্রাকৃতেই রক্ষিত হয় নি, তিনটির জায়গায় একটি মাত্র শিস্ ধ্বনির ব্যবহার প্রচলিত ছিল—কোনো প্রাকৃতে দন্ত্য 'স্', কোনো প্রাকৃতে তালব্য 'শ্'। মূর্ধন্য 'ষ্' অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়েছে, কেবল কোনো কোনো প্রাকৃতে অল্প কিছু কাল প্রচলিত ছিল। যেমন—শুশ্রূষা > সূস্রূষা / সুসূসা।

(জ) মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায়—দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ হলে লোপ পেয়েছে এবং তার স্থানে পরে কখনো কখনো য়-শ্রুতি বা ব-শ্রুতি হয়েছে (যেমন—সকল > সঅল > সয়ল), আর মহাপ্রাণ হলে হ-কারে পরিণত হয়েছে (যেমন—মুখ > মুহ)।

(ঝ) ঋ, র্, ষ্ ধ্বনির পরবর্তী দন্ত্য ধ্বনি (ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্) পরিবর্তিত হয়ে মূর্ধন্য ধ্বনির (ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্) রূপ লাভ করেছে। যেমন—কৃত > কট।

(ঞ) পদের আদিতে অবস্থিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের দু'রকম পরিবর্তন ঘটেছে। কখনো পদের আদিতে অবস্থিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের অন্তর্গত দু'টি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটি লোপ পেয়েছে। যেমন ত্রীণি > তিন্নি। কখনো পদের আদিতে অবস্থিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের অন্তর্গত ব্যঞ্জনগুলির মাঝখানে স্বরধ্বনি এসে সংযুক্ত ব্যঞ্জনকে বিশ্লিষ্ট করে দিয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি বলা হয়। যেমন—দ্বাদশ > দুবাদস ('দ্' ও 'ব্'-এর মাঝখানে 'উ' ধ্বনির আগম)।

(ট) পদের মধ্যে অবস্থিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের অন্তর্গত বিষম ধ্বনিগুলি সম ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। একে সমীভবন বলা হয়। যেমন—ভক্ত (ভ্ + অ + ক্ + ত্ + অ) > ভত্ত (ভ্ + অ + ত্ + ত্ + অ)। এখানে লক্ষণীয় যে, 'ক্ত্' আপাত দৃষ্টিতে পদের অন্তে অবস্থিত মনে হলেও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এটি তা নয়, কারণ শেষে 'অ' উচ্চারিত হচ্ছে। এই 'ক্ত'-এর অন্তর্গত বিষম ব্যঞ্জন দু'টি (ক্ + ত্) সমধ্বনিতে (ত্ + ত্) পরিণত হয়েছে।

(ঠ) সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে কেবল 'ক্ষ' (ক্ + ষ্)-এর পরিবর্তন হয়েছে স্বতন্ত্র ধারায়। এটি কখনো হয়েছে 'ক্খ', কখনো বা 'চ্ছ'। যেমন—বৃক্ষ > লুক্খ, রুচ্ছ।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার তুলনায় মধ্য ভারতীয় আর্যে শব্দরূপ, ক্রিয়ারূপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা দিক থেকে সরলতা দেখা গেল। যেমন—

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে শব্দের অন্তে স্থিত ধ্বনির পার্থক্য অনুসারে শব্দরূপ পৃথক হত। কিন্তু মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় সাধারণত আ-কারান্ত, ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত শব্দ ছাড়া বাকি সব শব্দের রূপ অ-কারান্ত (যেমন—'নর') শব্দের মতো হত। এমনকি ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দেও অ-কারান্ত শব্দের প্রভাব ছিল। যেমন 'মুনি' শব্দের ৬ষ্ঠীর এক বচনে মুনিস্‌স (তুলনীয়—নরস্‌স)।

(খ) ব্যঞ্জনান্ত শব্দগুলির মধ্যে যেসব শব্দের শেষে অনুস্বার ছিল শুধু সেইগুলি ব্যঞ্জনান্ত রইল। অন্য ব্যঞ্জনান্ত শব্দের অন্তে স্থিত ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পাওয়ার ফলে সেগুলি সবই স্বরান্ত শব্দে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং দু'একটি শব্দ ছাড়া প্রায় সব ব্যঞ্জনান্ত শব্দেরও রূপ 'নর' শব্দেরই মতো হত। যেমন 'কর্মণ্' শব্দের ৪র্থীর একবচনে 'কর্মণে-এর স্থানে হল *কর্মায় > কম্মায় (তুলনীয়—নরায়)। ঋ-কারের স্বরধ্বনিতে রূপান্তরের ফলে ঋ-কারান্ত শব্দও সাধারণ স্বরান্ত শব্দের রূপ লাভ করল।

(গ) মধ্য ভারতীয় আর্যে দ্বিবচন লোপ পাওয়ার ফলে শব্দরূপে শুধু একবচন ও বহুবচনের রূপভেদ রইল, দ্বিবচনের স্থানে বহুবচনের রূপ ব্যবহৃত হত। যেমন 'দ্বৌ-ময়ূরৌ'-এর স্থানে হল 'দ্বো মোরা'।

(ঘ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে বিশেষ্য ও সর্বনামের শব্দরূপ পৃথক হত। মধ্য ভারতীয় আর্যে কোথাও কোথাও বিশেষ্যের শব্দরূপ সর্বনামের শব্দরূপের মতো হতে দেখা যায়। যেমন—সপ্তমীর একবচনে সর্বনামের বিভক্তি *স্মিন্ > ম্হি, এই বিভক্তি সর্বনাম ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও প্রায়ই প্রযুক্ত হত (বিজিতে / *বিজিতস্মিন্ > বিজিতে / বিজিতম্হি)।

(ঙ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে বহুবচনে প্রায়ই প্রথমা ও দ্বিতীয়ায় স্বরান্ত শব্দের রূপ পুংলিঙ্গে পৃথক ছিল। যেমন—'নর' শব্দের বহুবচনে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার রূপ পৃথক ছিল—'নর' শব্দের বহুবচনে প্রথমার রূপ 'নরাঃ', দ্বিতীয়ার রূপ 'নরান্'। মধ্য ভারতীয় আর্যে এই পার্থক্য প্রায়ই লুপ্ত হতে দেখা যায়। যেমন—প্রথমা ও দ্বিতীয়া উভয় ক্ষেত্রেই হল 'নরা'।

(চ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে তৃতীয়ার বহুবচনের বিভক্তি ছিল '-ভিস্' (ভিঃ) (যেমন—মুনিভিঃ)। ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে মধ্য ভারতীয় আর্যে এটি হল '-হি'। মধ্য ভারতীয় আর্যে তৃতীয়ার এই বিভক্তিটি পঞ্চমীতেও ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমন পঞ্চমীর বহুবচনের আসল বিভক্তি '-ভ্যস্' (ভ্যঃ) যোগ করে প্রাচীন

ভারতীয় আর্যে হত 'আজীবিকেভ্যঃ'। এর স্থানে মধ্য ভারতীয় আর্যে '-হি' বিভক্তি যোগ করে হল 'আজীবিকেহি'।

(ছ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে ক্রিয়ার ধাতু ভ্বাদি, দিবাদি প্রভৃতি 'গণ' বা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক গণের ক্রিয়ার রূপ পৃথক হত। কিন্তু মধ্য ভারতীয় আর্যে সাধারণত সব ধাতুরই রূপ ভ্বাদিগণীয় ধাতুর মতো হয়ে গেল।

(জ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে ক্রিয়ারূপে আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ দুই প্রকারভেদ ছিল। মধ্য ভারতীয় আর্যে আত্মনেপদ লোপ পেল, প্রায় সর্বক্ষেত্রে শুধু পরস্মৈপদের ব্যবহার প্রচলিত হল।

(ঝ) শব্দরূপে যেমন, ক্রিয়ারূপেও তেমনি প্রাচীন ভারতীয় আর্যের দ্বি-বচন মধ্য ভারতীয় আর্যে লোপ পেল, তার জায়গায় বহুবচনের রূপই ব্যবহৃত হত।

(ঞ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে (বৈদিকে) ক্রিয়ার ভাব (Mood) ছিল পাঁচটি —নির্দেশক (Indicative), অনুজ্ঞা বা লোট্ (Imperative), অভিপ্রায় (Subjunctive), নির্বন্ধ (Injunctive) ও সম্ভাবক বা বিধিলিঙ্ (Optative)। মধ্য ভারতীয় আর্যে এগুলির মধ্যে অভিপ্রায় ও নির্বন্ধ ভাব লোপ পেল। প্রাকৃতে ছিল শুধু নির্দেশক, অনুজ্ঞা ও সম্ভাবক।

(ট) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে (বৈদিকে) ক্রিয়ার কাল (Tense) ছিল পাঁচটি : লট্ (বর্তমান = Present), লঙ্ অসম্পন্ন অতীত (Imperfect), লৃট্ (ভবিষ্যৎ = Future), লিট্ (সম্পন্ন অতীত = Past Perfect), লুঙ্ (অনদ্যতন বা সামান্য অতীত = Aorist)। এগুলির মধ্যে তিনটি (লঙ্, লুঙ্ ও লিট্) ছিল অতীত কালেরই প্রকারভেদ। মধ্য ভারতীয় আর্যে এই তিন প্রকার অতীতের মধ্যে লিট্ একেবারেই লোপ পেলে, আর লঙ্ ও লুঙ্ মিলে একটি রূপ লাভ করল।

(ঠ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে -ত্বা, -ত্বায় ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করে বহু বিচিত্র অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ সৃষ্টি করা হত। মধ্য ভারতীয় আর্যে অসমাপিকার এত বৈচিত্র্য আর রইল না।

(ড) বৈদিকে নয়, ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে নিষ্ঠা প্রত্যয় (-ক্ত, -ক্তবতু) যোগ করে ক্রিয়ার যে রূপ রচিত হত (গম্ + ত = গত ইত্যাদি) তা অতীত কালের সমাপিকা ক্রিয়া অর্থে ব্যবহৃত হত। এই রীতি মধ্য ভারতীয় আর্যে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়।

(৩) বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য :

(ক) আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্যে প্রত্যেক কারকের বিভক্তি সুনির্দিষ্ট ছিল। ফলে বাক্যের মধ্যে কোনো পদ যেখানেই বসুক না কেন, সেটি কর্তা, কি কর্ম, কি করণ ইত্যাদি বিভক্তিচিহ্ন থেকেই বোঝা

যেত। সুতরাং বাক্যে পদবিন্যাসের বাঁধা-ধরা নিয়মের অপরিহার্যতা ছিল না। কিন্তু মধ্য ভারতীয় আর্যে অনেক বিভক্তিচিহ্ন লোপ পেল, ফলে বাক্যের মধ্যে শব্দের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থানের উপরে বাক্যে তাদের ভূমিকা ও পদ-পরিচয় অনেকখানি নির্ভর করত। এই জন্যে বাক্যে পদবিন্যাসক্রমের নিয়মের গুরুত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল।

(খ) কোনো কোনো বিভক্তি লোপ পাবার ফলে বিভক্তির অর্থে কিছু কিছু স্বতন্ত্র শব্দ ও প্রত্যয়ের ব্যবহার প্রচলিত হল এবং অনুসর্গের প্রচলন হল।

(৪) ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য :

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ছন্দ ছিল অক্ষরমূলক অর্থাৎ অক্ষরসংখ্যার উপরে ভিত্তি করে ছন্দের রীতি নির্ণীত হত। কিন্তু মধ্য ভারতীয় আর্যে ছন্দ হয়ে গেল মাত্রামূলক অর্থাৎ অক্ষরের সংখ্যার উপরে নয়, অক্ষর-উচ্চারণের কাল-পরিমাপ (duration) বা মাত্রার উপরে ছন্দের বিন্যাস নির্ভর করত।

(খ) কবিতার চরণ বা পংক্তিগুলি প্রথমে বিষমমাত্রিক ছিল, পরে বিষমমাত্রিক ও সমমাত্রিক দ্বিবিধ চরণই রচিত হত।

(গ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় কবিতার পংক্তিতে অন্ত্যানুপ্রাস বা পংক্তির শেষে মিল ছিল না। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার শেষ পর্বে অন্ত্যানুপ্রাস বা পংক্তির শেষে মিল দেখা দিল।

॥ ৪১ ॥

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা : প্রথম স্তর

(First Stage of The Middle Indo-Aryan)

মোটামুটিভাবে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তরের কালসীমা ধরা হয় খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত। এর ফলে, লক্ষণীয় যে, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মাঝখানে যে একটি ক্রান্তিপর্বের প্রাকৃত (Transitional Prākṛt : ২০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রীস্টাব্দ) পরিকল্পনা করেছিলেন, সেই ক্রান্তিপর্বের অর্ধাংশ এই প্রথম স্তরের মধ্যে পড়ে যায়। এই প্রথম স্তরের প্রধান মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা হল অশোকের শিলালিপির প্রাকৃত (Inscriptional Prākṛt)। এই পর্বে আরো পড়ে অশোকের শিলালিপি ছাড়া খ্রীস্টপূর্ব শতাব্দীর অন্যান্য প্রত্নলিপির ভাষা, হীনযান-পন্থী বৌদ্ধদের ব্যবহৃত মিশ্র সংস্কৃত বা বৌদ্ধ সংস্কৃত

এবং পালি ভাষা। শিলালিপির প্রাকৃত ছিল জনসাধারণের মুখের জীবন্ত ভাষা ; কিন্তু বৌদ্ধ সংস্কৃত ও পালি ছিল ধর্মসাহিত্যের ভাষা এবং এই দুই ভাষা প্রথম স্তরের পরেও দীর্ঘকাল ধর্মসাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছিল। সম্রাট অশোক বুদ্ধদেবের বাণীগুলি তখনকার দিনের জনসাধারণের মুখের ভাষাতেই প্রচার করতে চেয়েছিলেন। এই জন্যে অশোকের শিলালিপিতে খোদাই করা অনুশাসনগুলিতে (খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী) যে প্রাকৃত ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় সেই প্রাকৃত হল তৎকালীন জীবন্ত ভাষার নিদর্শন। এবং যেহেতু এ ভাষা ভারতবর্ষের বৃহত্তর জনসাধারণের মুখের ভাষা ছিল সেহেতু অঞ্চলভেদে এই ভাষার কিছু-কিছু পৃথক্ রূপও গড়ে উঠেছিল। প্রথম স্তরের প্রাকৃত ভাষার এই আঞ্চলিক রূপ বা উপভাষাগুলি হল—(১) উত্তর-পশ্চিমা (North-Western), (২) দক্ষিণ-পশ্চিমা (South-Western), (৩) প্রাচ্য-মধ্যা (East-Central) এবং (৪) প্রাচ্যা (Eastern)।

উত্তর-পশ্চিমা : এই প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া যায় পশ্চিম পাকিস্তানে (পূর্বতন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে) প্রাপ্ত অশোকের শাহ্‌বাজ্‌গঢ়ী ও মান্‌সেহ্‌রা অনুশাসনে। প্রাকৃতের এই উপভাষাটির প্রধান বিশেষত্ব হল :

(১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে র-কার ও স-কার সংযোগে যেসব সংযুক্ত ব্যঞ্জন ছিল সেগুলি সাধারণত অপরিবর্তিত ভাবেই রক্ষিত হয়েছে। যেমন—প্রজ, অস্তি।

(২) য-ফলা-যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সমীভবন হওয়ার পরে সমীভূত দুই ব্যঞ্জনের একটি লোপ পেয়েছে (যেমন—কর্তব্যঃ > *কট্টব্বো > কটবো), অথবা বিপ্রকর্ষের ফলে য-ফলাটি বিশ্লিষ্ট হয়েছে (যেমন—অপত্য > অপতিয়ে)।

(৩) 'স্ম' ও 'স্ব' পরিবর্তিত হয়ে 'স্প' হয়েছে। যেমন—স্বর্গম্ > স্পগ্রম্। তেমনি 'ক্ষ' হয়েছে 'চ্ছ'। যেমন—মোক্ষ > মোচ্ছ।

(৪) দন্ত্য ধ্বনির মূর্ধন্যীভবন এই উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন—অর্থ > অঠ্র।

(৫) 'শ' ধ্বনি ক্বচিৎ রক্ষিত হয়েছে। যেমন—দর্শন > দ্রশন।

(৬) '-ত্বা' অর্থে '-ত্বী' প্রত্যয়ের ব্যবহার এই উপভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যেমন—দৃষ্ট্বা > *দ্রশেত্বী > দ্রশেতি।

উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃতের নিদর্শন :

> "অয়ং ধ্রমদিপি দেবন প্রিঅস রঞো লিখপিতু হিদ নো কিচি জিবে
> অরভিতু প্রযুহোতবে নো পি চ সমাজ কটব। বহুক হি দোষং
> সমজস দেবন প্রিয়ো প্রিঅদ্রশি রয় দখতি।"
>
> —শাহ্‌বাজ্‌গঢ়ী শিলালিপি-১।

সংস্কৃত রূপান্তর : ইয়ং ধর্মলিপিঃ দেবানাং প্রিয়েণ রাজ্ঞো লেখিতা। ইহ ন কশ্চিৎ জীবঃ আলভ্য প্রহোতব্যঃ। ন অপি চ সমাজঃ কর্তব্যঃ। বহুকান্ হি দোষান্ সমাজস্য দেবপ্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী রাজা পশ্যতি।

অনুবাদ : এই ধর্মলিপি দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা কর্তৃক (রাজার নির্দেশে) খোদিত হয়েছে। এখানে কোনো প্রাণীকে বলি দেওয়া উচিত নয়, কিংবা এখানে কোনো (উৎসব উপলক্ষে) ভিড়ও করা কর্তব্য নয়। কারণ দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরকমের সামাজিক (উৎসবের) ভিড়ে অনেক দোষ দেখতে পান।

দক্ষিণ-পশ্চিমা : এই প্রাকৃতের পরিবর্তন হয়েছিল সবচেয়ে কম। তার ফলে এই প্রাকৃতটি সবচেয়ে প্রাচীনতাধর্মী (archaic), প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বৈদিকের উত্তরাধিকার এতে সবচেয়ে বেশি। গুজরাটের জুনাগড়ে প্রাপ্ত অশোকের গীর্ণার অনুশাসনে এই প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই প্রাকৃতের প্রধান প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হল :

(১) ঋ-কার কখনো অ-কার হয়েছে, কখনো উ-কার হয়েছে। যেমন—মৃগ > মগ, বৃত্ত > বুত। কিন্তু 'দৃ' হয়েছে 'রি'। যেমন—যাদৃশ > যারিস।

(২) একক অবস্থানে তালব্য 'শ্' ও মূর্ধন্য 'ষ্' প্রায়ই দন্ত 'স্'-তে পরিণত হয়েছে। এতাদৃশ > এতারিস। কিন্তু সংযুক্ত ব্যঞ্জন 'ক্ষ'-এর 'ষ্' সমীভূত হয়েছে। যেমন—স্ত্রী-অধ্যক্ষ > ইথী-ঝখ।

(৩) পদান্তিক বিসর্গ (ঃ) পরিবর্তিত হয়েছে ও-কারে। যেমন—জনঃ > জনো।

(৪) স-কার যোগে গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জন প্রায়ই রক্ষিত হয়েছে। যেমন—অস্তি > অস্তি। কিন্তু কখনো কখনো সমীভূতও হয়েছে। যেমন—স্ত্রী > *ইত্থী > ইথী।

(৫) 'ব্' ছাড়া অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত য-ফলা (্য) সমীভূত হয়েছে এবং সমীভূত যুগ্মব্যঞ্জনের একটি ব্যঞ্জন লোপ পেয়েছে। যেমন—কল্যাণ > কলান। কিন্তু কর্তব্য > কতব্য।

(৬) 'ত্ব' ও 'ত্ম' এই দু'টি সংযুক্ত ব্যঞ্জনই পরিবর্তিত হয়ে 'ৎপ' রূপ লাভ করেছে। যেমন—চত্বারঃ > চৎপারো, আত্ম > আৎপ।

(৭) কখনো কখনো আত্মনেপদ বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—আরব্ভরে।

(৮) সপ্তমী বিভক্তি -'স্মিন্' হয়েছে '-ম্হি'। যেমন—তস্মিন্ > তম্হি।

দক্ষিণ-পশ্চিমা প্রাকৃতের নিদর্শন :

"ইয়ং ধংমলিপী দেবানং প্রিয়েন প্রিয়দসিনা রাঞ্ঞা লেখাপিতা।
ইধ ন কিংচি জীবং আরভিৎপা প্রজূহিতব্যং। ন চ সমাজো কতব্যো।
বহুকং হি দোসং সমাজম্হি পসতি দেবানং প্রিয়ো প্রিয়দসি রাজা ॥"

—গীর্ণার শিলালিপি-১

অনুবাদ : পূর্ববৎ (শাহ্‌বাজগঢ়ী লিপির অনুবাদ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫৪৪)।

প্রাচ্য-মধ্যা : এই প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া গেছে মসুরী থেকে ষোল মাইল দূরে কাল্‌সী গ্রামে প্রাপ্ত অশোকের একটি অনুশাসনে এবং দিল্লিতে প্রাপ্ত অন্য তোপ্‌রা অনুশাসনে। এই প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য হল :

(১) পদান্তিক অ-কার প্রায়ই দীর্ঘ হয়ে আ-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন—অথ > অথা। কিন্তু পদের অন্তে বিসর্গ (ঃ) থাকলে তার পূর্ববর্তী অ-কার এ-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন—জনঃ > জনে।

(২) পদমধ্যবর্তী ও-কার কখনো কখানো এ-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন—করোতি > কলেতি।

(৩) 'র্' প্রায়ই 'ল্'-তে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন—করোতি > কলেতি।

(৪) 'শ্' ও 'ষ্' কখনো কখনো অপরিবর্তিত থেকে গেছে। আবার কখনো কখনো 'স্'-তে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন—দ্বাদশ > দুবাদস।

(৫) যেসব সংযুক্ত ব্যঞ্জনে মূলত 'র্' অথবা 'স্' (বা 'ষ্') ছিল সেগুলি সবই সমীভূত হয়েছে। যেমন—অষ্ট > *অট্ট > অঠ, অস্তি > অত্থি, সর্বত্র > সব্বত্ত।

(৬) 'ত্', 'ট্' ও 'ব্'-এর সঙ্গে যুক্ত য-ফলা (্য) মধ্যস্বরাগমের ফলে 'ইয়্'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন—অপত্য > অপতিয়, কর্তব্য > কটবিয়। কিন্তু য-ফলাটি যদি 'দ্' বা 'ন্'-এর পরবর্তী হয় তা হলে তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন সমীভূত হয়ে গেছে। যেমন—অন্য > অজ্জ, উদ্যান > উয্যান।

(৭) 'ত্'-এর সঙ্গে যুক্ত ব-ফলা সমীভূত হয়ে যায়। যেমন—চত্বারি > চত্তালি। অন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত 'ব'-ফলা বিপ্রকর্ষের ফলে পৃথক্ হয়ে যায়। যেমন—দ্বাদশ > দুবাদস।

(৮) দু'টি যুক্ত ব্যঞ্জন 'ষ্ম' ও 'স্ম' পরিবর্তিত হয়ে 'প্ফ' হয়েছে। যেমন—তস্মাৎ > তপ্ফা, যুষ্মে > *তুষ্মে > তুপ্ফে। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে 'স্ম'-এর এরকম পরিবর্তন হয় নি—অধিকরণের বিভক্তি '-স্মিন্' হয়ে গেছে—'-(স্)সি'। এখানে '-স্ম'-এর সমীভবন হয়েছে।

(৯) 'ক্ষ' পরিবর্তিত হয়েছে 'ক্খ'-তে। এও এক রকম সমীভবনই। উদাহরণ—মোক্ষ > *মোক্খ > মোখ।

(১০) 'ভূ' ধাতু পরিবর্তিত হয়েছে 'হু'-তে। ভবতি > হোতি।

(১১) আত্মনেপদে শানচ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়।

প্রাচ্য-মধ্যা প্রাকৃতের নিদর্শন :

"ইয়ং ধংমলিপি দেবানং পিয়েনা পিয়দসিনা লেখিতা হিদা নো কিছি
জিবে আলভিতু পজোহিতবিয়ে নো পি চা সমাজে কটবিয়ে।
বহুকা হি দোসা সমাজসা দেবানং পিয়ে পিয়দসি লাজা দখতি"।—
—কাল্সী শিলালিপি-১।

অনুবাদ : পূর্ববৎ (শাহ্বাজগঢ়ী অনুশাসনের অনুবাদ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫৪৪)

প্রাচ্যা : এই প্রাকৃতের নিদর্শন রয়েছে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের কাছে ধৌলী গ্রামে প্রাপ্ত অনুশাসনে এবং গঞ্জাম থেকে আঠার মাইল দূরে জৌগড়ে প্রাপ্ত অনুশাসনে। প্রাচ্য-মধ্যা এবং প্রাচ্যার ভৌগোলিক নৈকট্যের জন্যে এই দু'টি প্রাকৃতের মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক সাধর্ম্য খুব বেশি। এই জন্যে প্রাচ্য-মধ্যার যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা ইতিমধ্যে আলোচনা করা হল সেই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অনেক বৈশিষ্ট্যই প্রাচ্যাতেও দেখা যায়। শুধু কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রাচ্যার স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। যেমন—

(ক) পদমধ্যবর্তী 'ও' প্রাচ্য-মধ্যায় কখনো কখনো 'এ'-তে পরিবর্তিত হত ; প্রাচ্যাতে এই প্রবণতা ব্যাপক হতে দেখা যায়। যেমন—করোতি > কলেতি।

(খ) প্রাচ্য-মধ্যায় 'শ্' ও 'ষ্' কখনো কখনো 'স্'-তে পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে হয় নি। অন্যদিকে প্রাচ্যায় 'শ্' ও 'ষ্' সর্বদাই 'স'-তে পরিবর্তিত হয়ে যেত। এ প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, 'শ্' ও 'ষ্' যে 'স্'-তে পরিণত হয়েছে তার নিদর্শন আমরা পাই শুধু উপরি-উক্ত অনুশাসনগুলিতে। কিন্তু ছোটনাগপুরের রামগড় পাহাড়ের যোগীমারা গুহায় প্রাপ্ত অশোকের অনুশাসনের সমসাময়িক 'সুতনুকা প্রত্নলেখে'র ভাষাকেও বিশেষজ্ঞরা প্রাচ্যারই নিদর্শন মনে করেন। এই প্রত্নলেখে দেখা যায় 'স্' ও 'ষ্'-ই বরং 'শ্'-তে পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনটিই প্রাচ্যার সাধারণ বৈশিষ্ট্য মনে হয়। কারণ পরবর্তী কালের পূর্বদেশীয় সাহিত্যিক প্রাকৃত মাগধীতে আমরা এই বৈশিষ্ট্যটিই লক্ষ্য করি। অনেকে আবার মনে করেন, "প্রাচ্যা প্রাকৃতের দুইটি রূপ—পশ্চিমা প্রাচ্যা ও পূর্ব্বী প্রাচ্যা। পূর্ব্বী প্রাচ্যা মগধে বলা হইত বলিয়া ইহার নাম 'মাগধী'। অশোকের অনুশাসনে পশ্চিমা প্রাচ্যার নিদর্শন রহিয়াছে। পূর্ব্বী প্রাচ্যার সঙ্গে ইহার পার্থক্য এইখানে যে পূর্ব্বীতে কেবল 'শ' ব্যবহৃত হইত এবং পশ্চিমায়

ব্যবহৃত হইত 'স'। পূর্ব্বী প্রাচ্যার নিদর্শন পাওয়া যায়। ছোটনাগপুরের রামগড় পাহাড়ের 'সুতনুকা' লিপিতে।"[৪৫]

(গ) 'র্' পরিণত হয় 'ল্'-তে।

(ঘ) বিসর্গযুক্ত 'অ'-এর এ-কারে পরিণতিও প্রাচ্যাতে ব্যাপক সাধারণ বৈশিষ্ট্যরূপে দেখতে পাই।

(ঙ) প্রাচ্যায় উত্তম পুরুষের সর্বনামের প্রথমার একবচনের বিশিষ্ট রূপ হল 'হকং' যা অন্য প্রাকৃতে পাওয়া যায় না।

প্রাচ্য প্রাকৃতের নিদর্শন :

> "ইয়ং ধংম লিপী খেপিংগলরি (খপিংগলসি) পবতসি দেবানং পিয়েন পিয়দসিনা লাজিনা লিখাপিতা। হিদ নো কিছি জীবং আলভিতু পজোহিতবিয়ে নো পি চ সমাজে কটবিয়ে। বহুকং হি দোসং সমাজসি দখতি দেবানং পিয়ে পিয়দসী লাজা।"
>
> —জৌগড় শিলালিপি-১।
>
> অনুবাদ : এই ধর্মলিপি 'ক্ষপিংগল' পর্বতে দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা কর্তৃক (প্রিয়দর্শী রাজার নির্দেশে) খোদিত হয়েছিল। এখানে কোনো প্রাণী নিধন করা উচিত নয় কিংবা সামাজিক উৎসব উপলক্ষে ভিড় করাও কর্তব্য নয়। দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এ সব সামাজিক অনুষ্ঠানে নানা দোষ দর্শন করেন।

পালি (Pali) : 'পালি' বলতে এখন সাধারণত প্রথম স্তরের একটি মধ্য ভারতীয় আর্যভাষাকে বোঝায়। কিন্তু কোথা থেকে এই শব্দটির উৎপত্তি এবং কেমন করে এটি বর্তমান অর্থের বাহক হয়ে দাঁড়াল তা এখন নিশ্চিত করে নির্ণয় করা দুরূহ। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নানা মত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন, পাল্ (= পালন করা) ধাতু থেকে 'পালি' শব্দের উৎপত্তি। ভগবান বুদ্ধের বাণী এই ভাষা ধারণ ও পালন করে চলেছে বলে একে 'পালি' বলা হয়। এখানে ধাতু-নির্ণয় যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে, কিন্তু প্রত্যয়ের কোনো ব্যাখ্যা নেই। অন্য কারো কারো মতে, 'পল্লী' শব্দ থেকে 'পালি' শব্দের উৎপত্তি। 'পল্লী' শব্দের যুগ্মব্যঞ্জন 'ল্ল'-এর মধ্যে একটি 'ল্' লোপ পেয়েছে এবং ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবনের (Compensatory Lengthening) নিয়মে পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হবার ফলে 'প' হয়েছে 'পা'। এই ভাবে 'পল্লী' থেকে 'পালী'

৪৫। সেন, মুরারিমোহন : 'ভাষার ইতিহাস', প্রথম পর্ব, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃঃ ৯১।

এবং তা থেকে 'পালি' শব্দের উৎপত্তি। এই ব্যুৎপত্তি খুবই সহজ ও স্বাভাবিক। অর্থগত সঙ্গতিও আছে মনে হয়। কারণ প্রাচীন ভারতে বৃহত্তর জনজীবনই ছিল মূলত পল্লীবাসী এবং এই বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্যেই পালি ভাষার মাধ্যমটি গৃহীত হয়েছিল। আবার পালি-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতে, 'পংক্তি' শব্দ থেকে 'পালি' শব্দের উৎপত্তি। পংক্তি বলতে ধরা হয় 'শাস্ত্র পংক্তি, পবিত্র শাস্ত্র, মূল শাস্ত্র'। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত এই মতটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "প্রথম যুগে পালি বলতে বৌদ্ধ শাস্ত্রের পংক্তি বা মূল শাস্ত্র ত্রিপিটককে (বিনয়, সুত্ত, অভিধম্ম-পিটক) বোঝান হত ; পরে ক্রমে ক্রমে ত্রিপিটকের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যে কোন গ্রন্থই পালি নামে অভিহিত হত।"[৪৬] এখানে অর্থগত তাৎপর্যটি গ্রহণীয় হতে পারে। কিন্তু 'পংক্তি' থেকে 'পালি' শব্দের ধ্বনিগত রূপলাভ বিষয়ে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতটি নিঃসন্দেহে দূরকল্পনা মনে হয়। বরং ড. সুকুমার সেন যে বলেছেন 'পরিভাষা' থেকে *'পারিভাষা' এবং 'পারিভাষা' থেকে 'পালিভাষা' এসেছে,[৪৭] সে মতটি তবু অংশত গ্রহণীয় মনে হয়। কারণ পালিতে 'র্' পরিবর্তিত হয়েছিল 'ল্'-তে।

'পালি' নামটির উৎপত্তি বিষয়ে যেমন নানা মত প্রচলিত আছে, তেমনি পালি ভাষার উদ্ভবক্ষেত্র সম্পর্কেও নানা মুনির নানা মত শোনা যায়। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের কাছে উদয়গিরি পাহাড়ে হাতিগুম্ফা নামক গুহার ভিতর খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর রাজা খারবেলের যে অনুশাসনটি পাওয়া গেছে তার ভাষার সঙ্গে পালি ভাষার বিশেষ মিলের উপরে ভিত্তি করে জার্মান পণ্ডিত ওল্ডেনবার্গ্ (Oldenberg) ও ম্যূলার্ (Müller) সিদ্ধান্ত করেছেন উড়িষ্যার আঞ্চলিক ভাষার উপরে ভিত্তি করে পালি ভাষা গড়ে উঠেছিল এবং উড়িষ্যাই হল পালির আদি জন্মস্থান। ভিণ্ডিশের মতে পালি হল অর্ধমাগধীরই প্রকারভেদ এবং এর জন্মস্থান হল কোশল। Lüder-ও অনেকটা একই কথা বলেছেন। তাঁর মতে অর্ধমাগধীর প্রাচীন রূপ থেকে পালির জন্ম। বাঙালি পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং পালি-বিশেষজ্ঞ বিদেশি পণ্ডিত ভিল্‌হেল্‌ম্ গাইগার্ মনে করেন মগধ অঞ্চল হল পালির জন্মস্থান। গাইগার্ বরং আরো বলেন—পালিকে মাগধীরই একটি রূপ মনে করা যেতে পারে ; কারণ বুদ্ধ নিজেই মগধ অঞ্চলের লোক ছিলেন এবং তিনি নিজেই পালি ভাষায় তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন :

৪৬। মজুমদার, ড. পরেশচন্দ্র : 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ', কলকাতা, ১৩৭৮, পৃঃ ২৯৪।

৪৭। Sen, Dr. Sukumar : 'Three Lectures on MIA' in *Journal of the Oriental Institute of Baroda* Vol. XI, Pt. III, p. 208.

"*Pāli* should be regarded as a form of *Māgadhi,* the language in which Buddha himself had preached".[৪৮]

এই মত সম্পর্কে বক্তব্য হল এই যে, "মাগধী হল একটি সাহিত্যিক প্রাকৃতের নাম। বুদ্ধ যখন ধর্ম প্রচার করেন তখন সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলির স্বতন্ত্র রূপ গড়েই উঠে নি। সুতরাং মাগধী প্রাকৃতে বুদ্ধ নিজে ধর্ম প্রচার করেছিলেন, এ কথা বলা যায় না। বরং বলা উচিত মাগধী প্রাকৃতের পূর্ববর্তী যে আদি প্রাকৃত ছিল, যাকে প্রত্নলিপির যুগের 'প্রাচ্যা' প্রাকৃত বলা যায়, সেই প্রাকৃতে তিনি তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন। কিন্তু প্রাচ্যা প্রাকৃতে বুদ্ধ তাঁর বাণী প্রচার করে থাকলেও শুধু প্রাচ্যা থেকেই পালির জন্ম হয় নি। কারণ পালি সর্বভারতীয় ভাব-বিনিময়ের ভাষা (lingua franca)। প্রাচ্যা অর্থাৎ ভারতের পূর্বাঞ্চলের ভাষা কখনো এইরূপ সর্বভারতীয় ভাষার মর্যাদা পায়নি বা তার ভিত্তিস্বরূপ হয়ে উঠে নি।"[৪৯]

ভারতের সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা পর্যবেক্ষণ করে ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লক্ষ্য করেছেন আর্যাবর্তের 'মধ্যদেশ' অঞ্চলই (বর্তমান দিল্লি-মিরাট-মথুরা) চিরকাল এদেশের সংস্কৃতির মূল পীঠস্থান। বেদোত্তর যুগের আর্যদের অভিজাত সারস্বত সাধনার ক্ষেত্র ছিল এই মধ্যদেশ এবং মূলত এই মধ্যদেশের শিক্ষিত 'শিষ্ট' জনের ভাষার উপরে ভিত্তি করেই পাণিনি সংস্কৃত ভাষার ধ্রুপদী ছাঁদটি রচনা করে দিয়েছিলেন যা সুদীর্ঘ কালের ভারতবর্ষের ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্য সাধনার মাধ্যম হয়েছিল। আবার মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগে এখানকার শৌরসেনী প্রাকৃতই ছিল সংস্কৃতের সবচেয়ে নিকট-সম্পর্কিত ভাষা। পরবর্তী কালে এই শৌরসেনী থেকে অপভ্রংশের মাধ্যমে জাত হিন্দিই আজ হয়ে উঠেছে প্রায় সর্বভারতীয় ভাববিনিময়ের মাধ্যম। মধ্যদেশের এই সাংস্কৃতিক গুরুত্বের জন্যে ভাষাচার্য সিদ্ধান্ত করেছেন এখানকার মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা শৌরসেনী প্রাকৃতের পূর্বতন রূপের উপরে ভিত্তি করে পালি ভাষা গড়ে তোলা হয়েছিল। বুদ্ধদেব মগধ অঞ্চলের (পূর্বভারতের) অধিবাসী হলেও এবং তিনি তাঁর নিজ মাতৃভূমির আঞ্চলিক ভাষা প্রাচ্যায় তাঁর বাণী প্রচার করে থাকলেও পালি ভাষার জন্ম হয়েছে তার অনেক পরে, তখন

৪৮। Geiger, Wilhelm : *Pāli Literature and Language,* (trans. from German by B.K. Ghosh), Calcutta : University of Calcutta, 1956, p. 4.

৪৯। দ্রষ্টব্য : বর্তমান লেখকের 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য : সমাজচেতনা ও মূল্যায়ন' কলকাতা : সাহিত্যশ্রী, ১৯৮৩, পৃঃ ১৯।

মূলত শৌরসেনীর পূর্বতন রূপের উপরে ভিত্তি করে সব আঞ্চলিক প্রাকৃতের উপাদান মিশ্রিত করে একটি সর্বভারতীয় ভাষা রূপে পালিকে গড়ে তোলা হয়েছিল। ভেস্টার্‌গার্ট্ (Westergard), কুহ্ন্ (Kuhn) এবং ফ্রাঙ্ক্ এই মত পোষণ করেন যে, অশোক অনুশাসনের প্রাচ্য-মধ্যার কাল্‌সী ও তেপ্‌রা অনুশাসনের ভাষাই হল পালির মূল উপাদান এবং উজ্জয়িনী হল তার আদি জন্মভূমি। অবশ্য এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করা যায় যে মাগধীর পূর্বরূপ প্রাচ্যায় যেহেতু বুদ্ধদেব তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন সেহেতু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাচ্যার অনেক উপাদান পালিতে থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। তবে প্রাচ্যাই এর মধ্যে ব্যাপক মূল উপাদান নয়। যদিও বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাকৃতেরই উপাদান এতে গৃহীত হয়েছে তবু বিশেষজ্ঞরা লক্ষ্য করেছেন এতে দক্ষিণ-পশ্চিমা ও প্রাচ্য-মধ্যার উপাদানই বেশি। ড. সুকুমার সেনের মতে পালির উদ্ভব-কাহিনী হল :

"দক্ষিণ-পশ্চিমা ও প্রাচ্য-মধ্যার মিলনে—সম্ভবত প্রথমে কেন্দ্রীয় উজ্জয়িনী অঞ্চলে—উদ্ভুত দেশিবিদেশি সর্বসাধারণের ব্যবহার্য যে মধ্য ভারতীয় সাধুভাষা—যাহাকে সেকালের lingua franca বলিতে পারি—তাহা হইতে পালি উৎপন্ন।"[৫০]

এখানে প্রাচ্য-মধ্যা ও দক্ষিণ-পশ্চিমার কেন্দ্রীয় রূপ যে মধ্যদেশের ভাষা—ভাষাচার্য সুনীতিকুমার যাকে শৌরসেনীর পূর্বরূপ বলেছেন—সেই উপভাষাকেই বোঝানো হয়েছে। এই মধ্যদেশীয় ভাষাই পালির মূল উপাদান সেটা ড. সেনও অন্যত্র স্বীকার করেছেন—

"In Pali we find a complete though artificial synthesis of the Central and the Eastern, the Central dialect predominating."[৫১]

সংক্ষেপে বলা যায় মূলত মধ্যদেশের প্রাকৃতের উপরে ভিত্তি করে সবরকমের প্রাকৃতেরই উপাদান গ্রহণ করে পালি গড়ে উঠেছিল। তাই এই ভাষাকে সমন্বয়ী ভাষা বা Compromising speech বলা হয়। কোন্ প্রাকৃতের উপাদান কতটুকু গৃহীত হয়েছিল সেটা স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের মূল ধারাটি অনুধাবন করছি বলে এখানে শুধু এই জন্মকাহিনী ও পালির প্রধান প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি

৫০। সেন, ড. সুকুমার : 'ভাষার ইতিবৃত্ত', কলকাতা, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭৫, পৃঃ-১২১।

৫১। Sen, Dr. Sukumar : *A Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan* Poona : Linguistic Society of India, 1960, p. 4.

উল্লেখ করলে এখানকার প্রাসঙ্গিক দায়িত্বটুকু সম্পন্ন হবে। আর পালির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করতে গেলেই আমরা দেখতে পাব বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাকৃতের সঙ্গে তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিরকম গভীর সাদৃশ্য আছে এবং এতেই প্রমাণিত হবে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাকৃত থেকে উপাদান আহরণ করে কিরকম একটি সমন্বয়ী ভাষা (Compromising speech) রূপে পালি গড়ে উঠেছিল। পালি শুধু বৌদ্ধদের ধর্ম-সাহিত্যের ভাষা।

পালির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (Linguistic Features of Pāli) :

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ঋ, ঐ, ঔ পালিতে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। 'ঋ' পরিবর্তিত হয়েছে অ, ই, উ অথবা এ-ধ্বনিতে। যেমন—মৃগ > মগ, ঋষি > ইসি, ঋতু > উতু, গৃহ > গেহ। ঐ-কার হয়েছে এ অথবা ই। যেমন—তৈল > তেল্ল, শৈল > সেল, সৈন্ধব > সিন্ধব। তেমনি ঔ-কার হয়েছে ও অথবা উ। যেমন ঔষধানি > ওসধানি, মৌক্তিক > মুক্তিক। আর প্রাচীন ভারতীয় আর্যের ঌ-কার হয়েছে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত।

(খ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যের তিন স-কার (শ্, ষ্, স্)-এর মধ্যে শ্ ও ষ্ পালিতে হয়েছে অপ্রচলিত। এদের স্থানে স্-এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—শ্রমণ > সমণ।

(গ) পালিতে প্রাচ্য-মধ্যার মতোই বিসর্গযুক্ত অ-কারের এ-কারে পরিণতি ও 'র্'-এর স্থানে 'ল্'-এর ব্যবহার ব্যাপক। যেমন—জনঃ > জনে, পরি- > পলি-, কির- > কিল-।

(ঘ) পালিতে দন্ত্য 'ন্' ও মূর্ধন্য 'ণ্' দুইই রক্ষিত আছে। যেমন— শ্রমণ > সমণ, জনঃ > জনে।

(ঙ) পালিতে দ-কারের মূর্ধন্যীভবন হয়েছে। যেমন—দহতি > ডহতি।

(চ) পালিভাষায় পদান্তে স্বরহীন একক ব্যঞ্জন ও বিসর্গ (বিসর্গও বস্তুত স্বরহীন 'হ্') লোপ পেয়েছে। যেমন—গুণবান > গুণবা, ধেনুঃ > ধেনু।

(ছ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যের সঘোষ ব্যঞ্জন কখনো কখনো অঘোষ হয়েছে। যেমন—মৃদঙ্গ > মুতিঙ্গ, পরিঘ > পলিখ।

(জ) আবার অল্পপ্রাণ ধ্বনি কখনো কখনো মহাপ্রাণ হয়েছে। যেমন—সুকুমার > সুখুমাল।

(ঝ) দক্ষিণ-পশ্চিমার মতো যুক্তব্যঞ্জন কিছু রক্ষিত হয়েছে। আবার কিছু যুক্তব্যঞ্জন সমীভূত হয়ে যুগ্মব্যঞ্জনে পরিবর্তিত হয়েছে (যেমন—ধর্ম > ধম্ম)।

কোথাও কোথাও এরকম সমীভবন হবার পর যুগ্মব্যঞ্জনের একটি ব্যঞ্জন যখন লোপ পেয়েছে তখন পূর্ববর্তী স্বরের ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন হয়েছে। যেমন—সর্ষপ > সাসপ, সিংহ > সীহ। কিন্তু যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী স্বর যদি প্রথমাবধি দীর্ঘই হয়; তবে পালিতে তা বরং হ্রস্ব স্বর হয়ে গেছে, সেখানে আবার ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন হয় নি। যেমন—পরাক্রম > পরক্কম।

(ঞ) 'অ-অ-আ'—স্বরধ্বনির এই ক্রমটি 'অ-ই আ'-তে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন—চন্দ্রমাঃ > চন্দ্রিমা।

(ট) পালিতে 'অয়' হয়েছে 'এ', এবং 'অব' হয়েছে 'ও'। যেমন—নয়তি > নেতি, লবণং > লোণং।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যের দ্বিবচন পালিতে লুপ্ত। 'দুই' অর্থেও বহু-বচনেরই প্রয়োগ হতে দেখা যায়।

(খ) পালি শব্দরূপে বহুবচনে তৃতীয় ও পঞ্চমীতে একই রূপ। যেমন—বুদ্ধেহি/বুদ্ধেভি। তেমনি চতুর্থী ও ষষ্ঠীতেও একই রূপ দেখা যায়। যেমন—বুদ্ধানং।

(গ) মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার সধারণ ধর্ম অনুসারে পালিতেও ক্রিয়ারূপে পরস্মৈপদ প্রয়োগই বেশি, তবে দক্ষিণ-পশ্চিমার মতো। আত্মনেপদের প্রয়োগও দু'একটি ক্ষেত্রে দেখা যায়।

বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাকৃত থেকেই উপাদান সংগ্রহ করে গড়ে তোলা হয়েছিল বলে পালিকেও ব্যাপক অর্থে প্রাকৃত ভাষাই বলতে পারি। অবশ্য মনে রাখতে হবে এই ভাষা ছিল সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলিরই মতো পুরোপুরি সাহিত্যেরই ভাষা ; এ ভাষা জনসাধারণের মুখের ভাষা ছিল না, এটি একটি কৃত্রিম ভাষা। প্রাকৃত থেকে পালির একটি পার্থক্য এই যে, প্রাকৃত যেমন ধর্মসাহিত্যের (জৈন ধর্মের) ভাষা ছিল তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যেরও ভাষা ছিল। কিন্তু পালি ছিল শুধুই ধর্মসাহিত্যের ভাষা। তাছাড়া প্রাকৃতগুলি ছিল মূলত আঞ্চলিক ভাষা, কিন্তু পালি ছিল সর্বভারতীয় ভাষা। অবশ্য পরবর্তীকালে শুধু দক্ষিণ ভারতের হীনযান বৌদ্ধরাই এ ভাষা ব্যবহার করতেন।

পালি ভাষার ইতিহাস ও যুগবিভাগ :

পরবর্তীকালে পালি ভাষার প্রচলন যদিও দক্ষিণ ভারতের হীনযান বৌদ্ধদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তবু এ ভাষার যে জন্মকাহিনী আমরা আলোচনা করেছি তাতে একথা স্পষ্ট যে, পালি ভাষার জন্ম হয়েছিল উত্তর ভারতেই।

এবং এর মূল নিদর্শন 'ত্রিপিটক' হল হীনযান-মহাযান নিরপেক্ষভাবে সর্বদলীয় বৌদ্ধদের আদি ধর্মগ্রন্থ। যদিও সুসংবদ্ধ পালি ভাষার কালসীমা হল খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত, তবু এই ভাষার অঙ্কুরোদ্‌গম থেকে পরবর্তী পরিণতি পর্যন্ত ধরলে ব্যাপক অর্থে পালি ভাষার বিস্তারকাল হল খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী। পালি ভাষার এই বিস্তৃত ইতিহাসকে মোটামুটিভাবে ৫টি পর্বে বা যুগে ভাগ করা হয়—

(১) গাথাসাহিত্যের যুগ :

বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক কালে মিশ্র ও শিথিলবদ্ধ প্রাকৃত ভাষায় যেসব আখ্যানমূলক কবিতা লেখা হয়েছিল সেগুলি এই সময়ের পালি ভাষার নিদর্শন। বস্তুত তখনো ঠিক পালিভাষার জন্ম হয় নি। প্রাকৃতের বিভিন্ন রূপের মিশ্রণে একটি কৃত্রিম ভাষা রচনার সূত্রপাত হয়েছিল।

(২) গদ্য-মিশ্রিত গাথাসাহিত্যের যুগ :

দ্বিতীয় স্তরের নিদর্শন হল পূর্ববর্তী যুগের গাথা-কবিতাগুলির ব্যাখ্যার জন্যে রচিত গদ্যসাহিত্য এবং কিছু পদ্যরচনা।

(৩) ত্রিপিটক সাহিত্যের যুগ :

অশোকের সমসময়ে বৌদ্ধধর্মের মূল গ্রন্থ 'ত্রিপিটক' রচিত হয় এবং এই সময় পালি ভাষার আসল মার্জিত রূপটি গড়ে উঠে। এই ত্রিপিটকেই রয়েছে পালি ভাষার বিকশিত রূপের সার্থক নিদর্শন।

(৪) সংস্কৃত-প্রভাবিত গদ্যের যুগ :

খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কণিষ্কের সময় থেকে পালি ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব পড়তে থাকে। এই সময় মহাযানী বৌদ্ধরা বৌদ্ধ সংস্কৃত গড়ে তোলেন। এই সময়ের সংস্কৃত-প্রভাবিত পালি ভাষার নিদর্শন রয়েছে 'মিলিন্দ পণ্‌হ' গ্রন্থে।

(৫) টীকা-ভাষ্যের যুগ :

খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে পালি ভাষার সৃজনপর্ব শেষ হয়ে যায় এবং তারপরে দক্ষিণ ভারতে প্রধানত টীকা-ভাষ্য জাতীয় রচনার চর্চা চলতে থাকে। খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এসে ভারতবর্ষে পালি ভাষার চর্চা প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। এর পরে পালির শেষ আশ্রয় হয় সিংহলে।

পালি ভাষার নিদর্শন :

(ক) ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং।
অত্তনো ব অবেক্খেয্য কতানি অকতানি চ ॥ —ধম্মপদ,
—পুপ্ফ বগ্গো, ৭। (MIA Reader, C.U., Subhāṣita 3)

অনুবাদ : পরের দোষ দেখবে না, পরের কর্তব্য-অকর্তব্য বিচার করবে না। নিজেরই কর্তব্য-অকর্তব্য বা নিজেরই কৃত্য ও অকৃত্য কর্ম (বিচার করে) দেখবে।

(খ) জয়ং বেরং পসবতি দুক্খং সেতি পরাজিতো।
উপসন্তো সুখং সেতি হিত্বা জয়পরাজয়ং ॥ —ধম্মপদ,
—সুখ বগ্গো, ৫। (MIA, Reader, C.U., Subhāṣita 16)

অনুবাদ : জয় শত্রুতার জন্মদান করে (অর্থাৎ যে জয়লাভ করে পরাজিতরা তার শত্রু হয়ে উঠে), পরাজিত ব্যক্তি দুঃখে শয়ন করে ; উপশান্ত ব্যক্তি (অর্থাৎ যে ব্যক্তি ষড়রিপুকে জয় করে শান্তি লাভ করেছে সে), জয়-পরাজয় দু-ই ত্যাগ করে সুখে শয়ন করে। (অর্থাৎ সুখে দিন কাটায়)।

(গ) অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলীকবাদিনং ॥ —ধম্মপদ,
—কোধবগ্গো, ৩। (MIA Reader, C.U., Subhāṣita 19)

অনুবাদ : অক্রোধ দ্বারা ক্রোধ জয় করবে, সাধুতা দ্বারা অসাধুকে জয় করবে, কৃপণকে দানের দ্বারা জয় করবে, সত্যের দ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করবে।

(ঘ) লাভা বত নো অনপ্পকা
যে ময়ং ভগবন্তং অদ্দসাম।
সরণং তং উপেম চক্খুম
সখা নো হোহি তুবং মহামুনি। —ধনিয়সুত্ত, ১৪
(সুত্তনিপাত) MIA Reader, C.U.

অনুবাদ : আমাদের লাভ খুব কম হয় নি, কারণ আমরা ভগবানের দর্শন লাভ করেছি। হে চক্ষুষ্মান! আমরা তোমার শরণ নিলাম ; হে মহামুনি! তুমি আমাদের শাস্তা (উপদেশদাতা) হও (অর্থাৎ আমাদের উপদেশ দিয়ে ঠিক পথে নিয়ে চলো)।

(ঙ) সোচতি পুত্তেহি পুত্তিমা
গোমিকো গোহি তথেব সোচতি।
উপধী হি নরস্স সোচনা
ন হি সো সোচতি যো নিরূপধি। —ধনিয়সুত্ত, ১৭ (সুত্তনিপাত)

অনুবাদ : পুত্রবান্ পুত্রের জন্যেই শোক করে, তেমনি গোমিক (গো-

সম্পত্তির অধিকারী) শোক করে গরুর জন্যে। সম্পত্তিই মানুষের শোকের কারণ। যে সম্পত্তিহীন শুধু সে-ই শোক করে না।

(চ) "অতীতে বিদেহরট্‌ঠে মিথিলায়ং মখাদেবো নাম রাজা অহোসি ধম্মিকো ধম্মরাজো। সো চতুরাসীতি বস্‌স-সহস্‌সানি কুমারকীলং তথা ওপরজ্জং তথা মহারজ্জং কত্বা দীঘম্‌-অদ্ধানং খেপেত্বা একদিবসং কপ্পকং আমন্তেসি : যদা মে সম্ম কপ্পক সিরস্মিং ফলিতানি পস্‌সেয্যামি অথ মে আরোচেয্যাসীতি।"

—মখাদেব জাতক

অনুবাদ : অতীতকালে বিদেহ রাষ্ট্রের অন্তর্গত মিথিলায় মখাদেব নামে একজন ধার্মিক ধর্মরাজ ছিলেন। তিনি চুরাশী হাজার বছর কুমারক্রীড়া (বাল্যক্রীড়া), যৌবরাজ্য এবং মহারাজ্যের কর্তব্য করে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করে একদিন ক্ষৌরকারকে (নাপিতকে) আমন্ত্রণ করে বললেন—হে সাম্য ক্ষৌরকার! আমার মাথায় যখনি পক্বকেশ দেখতে পাবে তখনি আমাকে জানাবে।

(ছ) "তাত, মম সীসে ফলিতং পাতুভূতং। মহল্লকোম্‌হি জাতো। ভুত্তা খো পন মে মানুসকা কামা। ইদানি দিব্বকামে পরিয়েসিস-সামি। নেক্‌খম্মকালো ময্‌হং। ত্বং ইমং রজ্জং পটিপজ্জ। অহং পন পব্বজিত্বা মখাদেবম্ববনুয্যানে বসন্তো সমণধম্মং করিস্‌সামী তি আহ।"

—মখাদেব জাতক

অনুবাদ : তাত! আমার শিরে পক্বকেশ দেখা দিয়েছে। আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আমি মানুষের সব কামনা ভোগ করেছি। এখন দিব্য কামনার সন্ধান করব। আমার নিষ্ক্রমণের (গৃহত্যাগের) সময় হয়েছে। তুমি এই রাজ্য গ্রহণ কর। আমি প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করে সখাদেবের আম্রকুঞ্জে বাস করে শ্রমণ-ধর্ম পালন করব।

বৌদ্ধ বা মিশ্র সংস্কৃত (Buddhistic/Hybrid Sanskrit) : যদিও বৌদ্ধধর্মের মূলগ্রন্থ ত্রিপিটক পালি ভাষাতেই রচিত এবং বৌদ্ধধর্মের জন্মস্থান উত্তরাপথই তবু পরবর্তীকালে উত্তরাপথের মহাযানী বৌদ্ধরা তাঁদের আলোচনায় পালি ভাষা ব্যবহার করতেন না। তাঁদের গ্রন্থরচনায় তাঁরা কথ্য সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মিশ্রণে তৈরি এক কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা ব্যবহার করতেন। এই ভাষাকেই বলা হয় বৌদ্ধ সংস্কৃত বা মিশ্র সংস্কৃত (Buddhistic Sanskrit / Hybrid Sanskrit)। বৌদ্ধ সংস্কৃতের নিদর্শন পাওয়া যায় 'মহাবস্তু অবদান' (খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী), 'ললিতবিস্তর' (খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দী), 'দিব্যাবদান'

ও 'অবদানশতক' (খ্রীস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দী) প্রভৃতি রচনায়। অবশ্য এই সংস্কৃতের ব্যবহার তাঁদের শাস্ত্রগ্রন্থের বাইরেও কুষাণ রাজাদের অনুশাসনে পাওয়া যায়। এই বৌদ্ধ বা মিশ্র সংস্কৃতের স্থিতিকাল মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তরের শেষ থেকে দ্বিতীয় স্তরের প্রথম দুই-তিন শতাব্দীতে (খ্রীস্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে খ্রীস্টীয় ৩০০ অব্দ পর্যন্ত) অর্থাৎ ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কথিত মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার ক্রান্তিপর্বে (Transitional Period)।

নিয়া প্রাকৃত (Niyā Prākṛta) : চীনের অন্তর্গত তুর্কীস্থানে শান্‌শান্‌ রাজ্যের প্রান্তে নিয়া নামক অঞ্চলে খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ কিছু প্রত্নলিপি পাওয়া গেছে। এগুলি অবশ্য ধর্মবিষয়ক নয়, শাসনকার্য ও ব্যবসাসংক্রান্ত। এগুলির ভাষাই নিয়া প্রাকৃত (Niyā Prākṛta) নামে পরিচিত। এই ভাষাকে ক্রান্তিপর্বের (Transitional Period) (খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী) অর্থাৎ মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের সন্ধিপর্বের ভাষার নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা হয়। ভারতের বাইরে পাওয়া গেলেও ভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শনরূপে একে গ্রহণ করার কারণ হল উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃতের কিছু উত্তরাধিকার এতে লক্ষ্য করা যায় এবং অনুমান করা হয় "এই ভাষারও আদিভূমি ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের পেশোয়ার অঞ্চল।"[৫২]

॥ ৪২ ॥

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা : দ্বিতীয় স্তর

(Middle Indo-Aryan = MIA : Second Stage)

মোটামুটিভাবে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় স্তরের বিস্তৃতিকাল হল খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী। প্রথম স্তরের মধ্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে কয়েকটির (যেমন পালি, বৌদ্ধ বা মিশ্র সংস্কৃত, নিয়া প্রাকৃত) বিস্তার দ্বিতীয় স্তরের কালসীমার মধ্যেও কিছুটা অংশ জুড়ে আছে। এগুলিকে বাদ দিলে পুরোপুরি দ্বিতীয় স্তরের মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা হল পাঁচটি সাহিত্যিক প্রাকৃত (Literary Prākṛta)। এগুলি হল—শৌরসেনী, মাহারাষ্ট্রী, অর্ধমাগধী, মাগধী ও পৈশাচী। প্রথম স্তরে অশোকের অনুশাসনে যে চারটি প্রত্নলিপির প্রাকৃত (Inscriptional Prākṛta) পাই সেইগুলি হল—

৫২। মজুমদার, ড. পরেশচন্দ্র : 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ', কলকাতা ১৩৭৮, পৃঃ ৩১৫-১৬।

উত্তর-পশ্চিমা, পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা, মধ্য-প্রাচ্যা ও প্রাচ্যা। এগুলি ছিল ভারতের চার অঞ্চলের জনসাধারণের জীবন্ত উপভাষা। মূলত এই চারটি জীবন্ত ভাষার উপরে ভিত্তি করেই দ্বিতীয় স্তরের সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলি গড়ে উঠেছিল। অনুমান করা যেতে পারে উত্তর-পশ্চিমা থেকে পৈশাচী, পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা থেকে মাহারাষ্ট্রী, ও শৌরসেনী প্রাচ্য-মধ্যা থেকে, অর্ধমাগধী এবং প্রাচ্যা থেকে মাগধীর জন্ম। তবে সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলি তো সাহিত্যেরই ভাষা ছিল, কখনো জনসাধারণের মুখের জীবন্ত ভাষা ছিল না। ফলে পূর্ববর্তী যুগের প্রত্নলিপির প্রাকৃতের মতো সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলি এক-এক অঞ্চলের মুখের ভাষা ছিল এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না। এক-একটি সাহিত্যিক প্রাকৃত এক-এক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল না বলে এগুলিকে ঠিক আঞ্চলিক উপভাষা (Regional Dialect) বলা যায় না। পূর্ববর্তী যুগের প্রত্নলিপির প্রাকৃতের আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের উপরে ভিত্তি করে এগুলির জন্ম হলেও এগুলিকে সাহিত্যে যাঁরা ব্যবহার করেছিলেন তাঁরা অনেকটা সামাজিক স্তরভেদে বা শ্রেণীভেদে ব্যবহার করেছিলেন। আবার বাস্তব সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তর বা শ্রেণীর ভাষাও এগুলি নয়, এগুলি হল সাহিত্যিকদেরই কল্পিত বিভিন্ন স্তরের ভাষা। সংস্কৃত নাট্যকারেরা শিক্ষিতা নারী, বিদূষক ও অশিক্ষিত পুরুষের মুখে শৌরসেনী, অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের মুখে মাগধী প্রাকৃত ব্যবহার করেছেন। সুতরাং এগুলিকে বাস্তব নয়, সাহিত্যিক-সামাজিক বা শ্রেণীগত উপভাষা (Literary-Social or Class Dialect) বলতে পারি। এগুলির মধ্যে বিশেষ করে মাহারাষ্ট্রী আবার এই স্তরগত বা শ্রেণীগত সীমার বাইরেও সাধারণভাবে ব্যাপক সাহিত্যরচনার মাধ্যম রূপেও ব্যবহৃত হয়েছিল এবং অনেকটা আদর্শ ভাষারও (Standard Language) মর্যাদা লাভ করেছিল। মাহারাষ্ট্রীতে উন্নত মানের পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য সাধনার নিদর্শনও রয়েছে পর্যাপ্ত। সুতরাং বলা যায় মহারাষ্ট্রী ছিল প্রাকৃতের যুগের আঞ্চলিক নয়, আদর্শ স্থানীয় সর্বজনীন সাহিত্যিক ভাষা। অর্ধমাগধীকেও সংস্কৃত নাট্যকারেরা শ্রেণী বিশেষের ভাষা হিসাবে ব্যবহার করেন নি। এর ব্যবহার পাওয়া যায় জৈনদের ধর্মসাহিত্যে। সুতরাং এটিও ঠিক আঞ্চলিক বা সামাজিক উপভাষা নয়, এটি ধর্মসাহিত্যের ভাষা। আর পৈশাচীর তো তেমন কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়াই যায় নি। গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' নাকি মূলত পৈশাচী প্রাকৃতে লেখা হয়েছিল, কিন্তু সেই মূল বৃহৎকথা পাওয়া যায় নি। উপর্যুক্ত পাঁচ প্রকার সাহিত্যিক প্রাকৃতই ছিল প্রধান। এছাড়াও প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা আরো কয়েকটি সাহিত্যিক প্রাকৃতের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল : আবন্তী, শাকারী, চাণ্ডালী, শাবরী ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে কোনোটি ছিল ব্যক্তিভাষা বা নিভাষা (idiolect), কোনোটি বা ছিল শ্রেণীবিশেষের ভাষা,

কোনোটি বা প্রায় মিশ্র ভাষা। যাই হোক প্রথমে যে পাঁচটি প্রধান সাহিত্যিক প্রাকৃতের কথা বলা হয়েছে সেগুলির ব্যবহার-ক্ষেত্র, নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য নীচে পরপর আলোচনা করা হল।

মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত (Māhārāṣṭri Prākṛta) : মাহারাষ্ট্রী যদিও শৌরসেনীর পরবর্তী এবং কারো কারো মতে শৌরসেনী থেকেই জাত (Maharastri is a later phase of Sauraseni.)[৫৩] তবু মাহারাষ্ট্রীকেই আদর্শ ভাষার (Standard Language) মর্যাদা দেওয়া হত। সংস্কৃত নাটকে শ্রেণী-বিশেষের ভাষা রূপে এই প্রাকৃতের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ ছিল না। পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যরচনার মাধ্যম হিসাবে মাহারাষ্ট্রীর যে ব্যাপক প্রচলন ছিল তার নিদর্শন হল হালের 'গাহাসত্তসঈ' (খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দী), প্রবর সেনের 'সেতুবন্ধ' (খ্রীস্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী), বাক্‌পতি রাজের 'গউডবহো' (খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী)। এসব পূর্ণাঙ্গ রচনা ছাড়া সংস্কৃত নাটকেও মাহারাষ্ট্রীর প্রয়োগ দেখা যায়। এই প্রাকৃতের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

(ক) এই প্রাকৃতে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্বরমধ্যগত এক ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ হলে লোপ পেত (যেমন—প্রাকৃত > পাউঅ), আর মহাপ্রাণ হলে হ-কারে পরিণত হত (যেমন—কথম্ > কহম্)। কিন্তু শৌরসেনীতে 'দ্' ও 'ধ্' অপরিবর্তিত থাকত। যেমন—সংস্কৃত মধু > শৌরসেনী মধু।

(খ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যের অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন অর্থাৎ বর্গের প্রথম বর্ণ প্রথমে মহাপ্রাণ বর্ণ অথবা উষ্ম বর্ণে পরিবর্তিত হয় এবং শেষে মাহারাষ্ট্রীতে হ-কারে পরিণত হয়। যেমন—নিকষ > নিখষ > নিহস, ভরত > ভরথ > ভরহ ইত্যাদি।

(গ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যের যুক্তব্যঞ্জন 'ত্ম' মাহারাষ্ট্রীতে 'প্প' হয়ে যায়। এই বৈশিষ্ট্যটি শৌরসেনী ও মাগধী থেকে মাহারাষ্ট্রীকে পৃথক্ করেছে। যেমন—আত্মন্ > মাহারাষ্ট্রী অপ্পা, কিন্তু শৌরসেনী ও মাগধীতে অত্তা।

(ঘ) তেমনি প্রাচীন ভারতীয় আর্যের 'ক্ষ' মাহারাষ্ট্রীতে হত 'চ্ছ', কিন্তু শৌরসেনীতে হত 'ক্খ'। যেমন—ইক্ষু > মাহারাষ্ট্রী উচ্ছু, শৌরসেনী ইক্খু।

(ঘ) সপ্তমীর একবচনের সর্বনামের বিভক্তি 'স্মিন্' মাহারাষ্ট্রীতে হয়েছে '-ম্মি', কিন্তু শৌরসেনীতে হয়েছে 'মৃহি' ও অর্ধমাগধীতে '-ংসি'। যেমন—সর্বস্মিন্ > মাহারাষ্ট্রী সবম্মি, শৌরসেনী সব্বমৃহি।

(ঙ) মাগধী ও অর্ধমাগধীর মতো স্বরমধ্যগত স-কার মাহারাষ্ট্রীতেও কখনো

৫৩। Sarkar, Dr. D. C. : *A Grammar of the Prakrit Language.*

কখনো 'হ'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন—পাষাণ > পাহাণ, অনুদিবসম্ > অণুদিঅহম্।

(চ) মাহারাষ্ট্রীতে ক্রিয়াবিশেষণের প্রত্যয় '-আহি' পঞ্চমীর একবচনের বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—দূরাহি। অবশ্য পঞ্চমীর পূর্বতন বিভক্তিটিও কখনো কখনো ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন—গৃহাৎ > ঘরা।

(ছ) 'কৃ' ধাতুটি মাহারাষ্ট্রীতে সামান্য বর্তমান কালে 'কু' হয়ে গেছে। যেমন—বৈদিক কৃণোতি > *কুণোই > কুণই, কিন্তু শৌরসেনী করোদি।

(জ) কর্মবাচ্যের বিকরণ '-য়' মাহারাষ্ট্রীতে হয়েছে '-ইজ্জ', কিন্তু শৌরসেনীতে '-ঈঅ-'। যেমন—গম্যতে > মাহারাষ্ট্রী গমিজ্জই, শৌরসেনী গমীঅদি।

(ঝ) ল্যবর্থক অসমাপিকার (gerund) বৈদিক প্রত্যয় 'ত্বাচ্' মাহারাষ্ট্রীতে হয়েছে 'উণ'। যেমন—প্রচ্ছ্ + ত্বাচ্ = পৃষ্ট্বা > মাহারাষ্ট্রী পুচ্ছিউণ।

মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের নিদর্শন

উল্ললই দব্ভকবলং মঈ পরিচ্চত্তণচ্চণা মোরী
ওসরিঅ-পণ্ড-বত্তা মুঅন্তি অংসূইং ব লআও।

—অভিজ্ঞান শকুন্তল, ৪র্থ অঙ্ক।

অনুবাদ : মৃগী তার তৃণের গ্রাস উদ্গীরণ করে দিচ্ছে, ময়ূর তার নৃত্য পরিত্যাগ করেছে, লতাগুলি থেকে পাণ্ডুবর্ণ পাতাগুলি খসে পড়ছে—যেন তারা অশ্রুবর্ষণ করছে।

শৌরসেনী (Śauraseni) : শৌরসেনী প্রাকৃত হল সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতাধর্মী (archaic) এবং প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার কাছাকাছি। সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্রভূমি পশ্চিম ভারতের মধ্যদেশ (মথুরা-দিল্লি-মিরাট) এই প্রাকৃতের মূল পীঠস্থান ছিল। মাহারাষ্ট্রী ছিল আদর্শ ভাষা, কিন্তু মাহারাষ্ট্রীর পরেই শৌরসেনীর সম্মানিত স্থান স্বীকৃত ছিল। সংস্কৃত নাটকে শিক্ষিত রমণী, রাজপুরুষ (কর্পূরমঞ্জরী নাটকে) ইত্যাদির সংলাপে শৌরসেনী প্রাকৃত ব্যবহৃত হত। কেউ কেউ বলেছেন 'মাহারাষ্ট্রীর সঙ্গে শৌরসেনীর একটি ছাড়া কোনো বিষয়ে পার্থক্য নাই।'[৫৪] কিন্তু মাহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনীর ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সব ক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই এই দুই প্রাকৃতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। শৌরসেনীর ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

৫৪। সেন, ড. সুকুমার : 'ভাষার ইতিবৃত্ত', ১৯৭৫, পৃঃ ১২৭।

(ক) স্বরমধ্যবর্তী 'দ্' ও 'ধ্' শৌরসেনীতে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। কিন্তু মাহারাষ্ট্রীতে স্বরমধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ হলে লোপ পেয়েছে আর মহাপ্রাণ হলে 'হ-' কারে পরিণত হয়েছে ; এই সূত্র অনুসারে মাহারাষ্ট্রীতে 'দ্' অল্পপ্রাণ বলে লোপ পেয়েছে ও 'ধ্' মহাপ্রাণ বলে হ-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন—সংস্কৃত গচ্ছতি > শৌরসেনী গচ্ছদি, মাহারাষ্ট্রী গচ্ছই, সংস্কৃত মধু > শৌরসেনী মধু, মাহারাষ্ট্রী মহু।

(খ) সংযুক্ত ব্যঞ্জন 'ক্ষ' শৌরসেনীতে হয়েছে 'ক্‌খ', কিন্তু মাহারাষ্ট্রীতে 'চ্ছ'। যেমন—ইক্ষু > শৌরসেনী ইক্‌খু, মাহারাষ্ট্রী উচ্ছু।

(গ) সপ্তমীর একবচনের বিভক্তি '-স্মিন্' শৌরসেনীতে রূপ নিয়েছে 'ম্হি', কিন্তু মাহারাষ্ট্রীতে 'ম্মি', অর্ধমাগধীতে '-ংসি'। যেমন—সর্বস্মিন্ > শৌরসেনী সব্বম্হি, মাহারাষ্ট্রী সবম্মি, অর্ধমাগধী সবংসি।

(ঘ) কর্মবাচ্যের বিকরণ '-য়-' শৌরসেনীতে '-ঈঅ-' হয়ে যায়, কিন্তু মাহারাষ্ট্রীতে হয় '-ইজ্জ-'। যেমন—গম্যতে > শৌরসেনী গমীঅদি, মাহারাষ্ট্রী গমিজ্জই।

(ঙ) √কৃ ধাতুর রূপ শৌরসেনীতে অনেকটা সংস্কৃতেরই মতো, কিন্তু মাহারাষ্ট্রীতে 'কৃ' সামান্য বর্তমানে হয়ে যায় 'কু'। যেমন বৈদিক কৃণোতি/সংস্কৃতে করোতি > শৌরসেনী করোদি, মাহারাষ্ট্রী কুণই।

(চ) বিধিলিঙের (Optative) রূপ শৌরসেনীতে সংস্কৃতের আদর্শে হত, কিন্তু মাহারাষ্ট্রী ও অর্ধমাগধীতে '-ইজ্জ-' যোগে বিধিলিঙের রূপ গঠিত হত। যেমন— *বর্তেৎ > শৌরসেনী বট্টে, মাহারাষ্ট্রী ও অর্ধমাগধী বট্টেজ্জ।

(ছ) সংস্কৃতের 'ত্ম' শৌরসেনীতে শুধুই সমীভূত হয়েছে, কিন্তু মাহারাষ্ট্রীতে 'প্প' হয়ে গেছে। যেমন—আত্মন্ > শৌরসেনী > অত্তা, মাহারাষ্ট্রী অপ্পা।

(জ) শৌরসেনীতে 'শ্' ও 'ষ্' দুই-ই 'স্'-তে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন—আশ্রম > অস্‌সম।

শৌরসেনী প্রাকৃতের দৃষ্টান্ত :

> "তক্‌খণং সো মম পুত্ত-কিদও মঅ-সাবও উবখিদো। তদো তএ অঅং দাব পঢমং পিবদু ত্তি অণুকম্পিণা উবচ্ছন্দিদো। ন উণ দে অবরিচিদস্‌স হত্থাদো উদঅং অবগদো পাদুং। পচ্ছা তস্‌সিং জ্জেব উদএ মএ গহিদে কদো তেণ পণও।"

—অভিজ্ঞান শকুন্তল, ৫ম অঙ্ক।

অনুবাদ : সেই সময়ে আমার পালিত পুত্র হরিণশিশুটি সেখানে উপস্থিত হল। আপনার কাছে জলপান করবে মনে করে আপনি তাকে আদর করতে

লাগলেন। কিন্তু আপনি তার অপরিচিত বলে সে আপনার হাত থেকে জল পান করতে এল না। তারপর আমি সেই জল (নিজের হাতে) নিয়ে নিলে সে (আমার প্রতি) অনুরাগ প্রকাশ করতে লাগল।

অর্ধমাগধী (Ardha-Māgadhī) : অর্ধমাগধীর প্রাচীনতম নিদর্শন সম্বন্ধে ড. সুকুমার সেন বলেছেন : "অশ্বঘোষের নাটকের তালপাতার পুথির টুকরায় প্রাচীন অর্ধমাগধীর ব্যবহার আছে।"[৫৫] অশ্বঘোষের নাটকে অর্ধমাগধীর নয়, বলা যেতে পারে অর্ধমাগধীর পূর্বরূপ প্রাচ্যমধ্যার নিদর্শন আছে। ভাসের নাটকেও অর্ধমাগধীর পূর্বতন রূপের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু অর্ধমাগধীর আসল সম্মানিত ক্ষেত্র হল জৈন ধর্মসাহিত্য। বরং বলা যায় জৈন ধর্মসাহিত্যের মধ্যে অর্ধমাগধীর ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল বলে যাকোবী (Jacobi) একে 'জৈন প্রাকৃত' বলেছেন। অর্ধমাগধী যদিও পরবর্তীকালে জৈন সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠায় কোনো ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে আর সীমাবদ্ধ থাকে নি, তবু এর উৎসস্থানীয় প্রাকৃত প্রাচ্যমধ্যার জন্মভূমি হল অযোধ্যা বা কোশল (বর্তমান লক্ষ্ণৌ-অবধ ইত্যাদি)। অর্ধমাগধীতে শৌরসেনী ও মাগধীর কিছু মিশ্র লক্ষণ বিদ্যমান। অর্ধমাগধীয় ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

(ক) পদের অন্তে অবস্থিত বিসর্গযুক্ত অ-কার কখনো এ-কার, কখনো ও-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন—জনঃ > জণে, পূর্বঃ > পূরবো।

(খ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যের 'র্' মাগধী প্রাকৃতে 'ল্'-তে পরিণত হয়ে গেছে, কিন্তু অর্ধমাগধীতে এই পরিবর্তন দেখা যায় না ; এখানে 'র্' ও 'ল্' দুইই রক্ষিত হয়েছে। যেমন—পূর্বঃ > পূরবো।

(গ) মাগধী থেকে অর্ধমাগধীর আর একটা বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মাগধীতে 'ষ্' ও 'স্' পরিবর্তিত হয়েছে 'শ্'-তে। কিন্তু অর্ধমাগধীতে বরং 'শ্' ও 'ষ্'-ই পরিবর্তিত হয়েছে 'স্'-তে। এখানে বরং শৌরসেনীর সঙ্গেই অর্ধমাগধীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—কেশী > কেসী, ঔষধ > ওসঢ।

(ঘ) অর্ধমাগধীতে স্বরমধ্যগত একক ব্যঞ্জন লোপ পেলে তার স্থানে য়-শ্রুতির ব্যবহার হত। যেমন—নগর > নয়র, স্থিত > ঠিয়, শত > সয়। অবশ্য স্বরমধ্যগত সব ব্যঞ্জনই লোপ পায় নি, 'গ্' কখনো কখনো থেকে গেছে। যেমন—লোক্স্মিন্ > লোগংসি।

(ঙ) অর্ধমাগধীতে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে দন্ত্যধ্বনির মূর্ধন্যীভবন লক্ষ্য করা যায়। যেমন—ঔষধ > ওসঢ, উদায়নঃ > উদায়ণে। কিন্তু

৫৫। সেন, ড. সুকুমার : 'ভাষার ইতিবৃত্ত', কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ১২৯।

মুর্ধন্যীভবন সর্বক্ষেত্রে হয় না। যেমন—তেন, নাম।

(চ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিষম ব্যঞ্জনের মিলনে গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জন মধ্য ভারতীয় আর্যে সমধ্বনিযুক্ত যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত হবার পর অর্ধমাগধীতে সমীভূত দু'টি ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি লোপ পেয়েছে এবং ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবনের (Compensatory Lenthening) নিয়মে পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে। যেমন—বর্ষ > *বস্‌স > বাস।

(ছ) সপ্তমীর একবচনের বিভক্তি 'স্মিন্' অর্ধমাগধীতে হয়েছে '-ংসি', কিন্তু মাহারাষ্ট্রীতে হয়েছে '-স্মি' এবং শৌরসেনীতে '-ম্হি'। যেমন—*লোকস্মিন্ > অর্ধমাগধী লোগংসি।

(জ) ল্যবর্থক অসমাপিকার (gerund) নানা রূপ প্রচলিত আছে। বৈদিক '-ত্বায়' থেকে '-ত্তএ' প্রত্যয়যুক্ত রূপ দেখা যায়। যেমন—*গচ্ছিত্বায় > গচ্ছিত্তএ। আবার সংস্কৃত 'ত্ব' থেকে জাত '-ত্তা' যোগ করে অসমাপিকার রূপও গঠন করা হয়েছে। যেমন—গত্বা > গত্তা। এগুলি ছাড়া অসমাপিকার আরো কয়েকটি রূপ দেখা যায়।

(ঝ) 'কৃ' ধাতু অর্ধমাগধীতে মাহারাষ্ট্রীর মতো 'কু' হয়ে গেছে। যেমন—বৈদিক কৃণোতি > অর্ধমাগধী কুণই।

(ঞ) অর্ধমাগধীতে, পালির মতো 'শানচ্'-জাত '-মান/আন' প্রত্যয়ের প্রয়োগ প্রচলিত। যেমন—পৃচ্ছমান > পুচ্ছমাণো।

অর্ধমাগধী প্রাকৃতের নিদর্শন :

"পোলাসপুরে নাম নয়রে সহস্সম্বব উজ্জণে জিয়সত্তুরায়া। তত্থণং পোলাসপুরে নয়রে সদ্দালপুত্তে নামং কুম্ভকারে অজীবিওবাসএ পরিবসই।"

অনুবাদ : পলাশপুর নামক নগরে সহস্রাম্রবন উদ্যানে জিতশত্রু রাজা (ছিলেন)। সেই পলাশপুর নগরে শব্দালপুত্র নামে অজীবিক-সম্প্রদায়ভুক্ত (ভিক্ষুক-উপাসক) এক কুম্ভকার বাস করত।

মাগধী (Māgadhī) : মাগধীর নিদর্শন সংস্কৃত নাটকে অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের ভাষায় পাওয়া যায় এবং মাগধী নামের সঙ্গে মগধের (দক্ষিণ বিহারের) যোগ আছে। এইজন্যে যদিও মাগধী ছিল সাহিত্যেরই ভাষা এবং সাহিত্যে এর ব্যবহার হত হাস্যরস সৃষ্টির জন্যে তবু 'মাগধী' নামের মধ্যে মগধের (অর্থাৎ দক্ষিণ বিহারের) কথ্যভাষার স্মৃতি রহিয়া গিয়াছে বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। অশোক নিজেকে 'মাগধ' বলিয়াছেন, কালিদাস 'মাগধী'

ব্যবহার করিয়াছেন মগধের গৌরবিনী রাজকন্যা বলিয়া। 'মাগধ' শব্দটির অর্থ শুতিপাঠক, গায়ক। এই সব হইতে অনুমান হয় যে 'মগধ' সংস্কৃতিবান্ এবং গর্বিত জাতি ছিল।"[৫৬] মাগধী সাহিত্যের ভাষা হলেও এর মূলে মগধ অঞ্চলের এই সংস্কৃতিবান্ জাতির জীবন্ত ভাষার ভিত্তি ছিল মনে হয়, সেই ভাষারই প্রাচীনতর রূপের নিদর্শন রয়েছে সুতনুকা প্রত্নলিপিতে। মাগধী প্রাকৃতের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

(ক) অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃতের 'ষ্' ও 'স্' পরিবর্তিত হয়েছে 'শ্'-তে। ফলে মাগধীতে তিন প্রকার শিস্-ধ্বনির (Sibilant) (শ্, ষ্, স্) জায়গায় প্রায়ই একটি শিস্ধ্বনি (শ্) পাওয়া যায়। যেমন—দিবসঃ > দিঅশে, পুরুষঃ > পুলিশে। কোথাও 'স' অপরিবর্তিতও রয়েছে : যেমন—হস্ত।

(খ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যের 'র্' মাগধীতে ল-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন —পুরুষঃ > পুলিশে, নরঃ > নলে। রাজা > লাজা।

(গ) প্রথমার একবচনের বিভক্তি বিসর্গযুক্ত অ-কার পরিবর্তিত হয়ে এ-কার হয়ে গেছে। যেমন—নরঃ > নলে।

(ঘ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার 'ণ্য' 'জ্ঞ', 'ঞ্জ' মাগধীতে হয়েছে 'ঞ্ঞ'। যেমন—পুণ্য > পুঞ্ঞ, রাজ্ঞঃ > লঞ্ঞে, অঞ্জলি > অঞ্ঞলি।

(ঞ) 'জ্' স্থানে 'য্' মাগধীতে দেখা যায়। যেমন—জানাতি > যাণাদি।

(ট) স্বরমধ্যবর্তী 'দ্' রক্ষিত হয়েছে। যেমন—ভবিষ্যতি > ভবিশ্শদি।

(ঠ) মধ্য ভারতীয় আর্যে যুক্তব্যঞ্জনের সমীভবন একটি সাধারণ প্রবণতা। কিন্তু মাগধীতে এই প্রবণতার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন—হস্তিস্কন্ধং। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পৃথক পৃথক্ পরিবর্তন হয়েছে। যেমন— চ্ছ > শ্চ/গ (মৎস্য > মচ্ছ > মশ্চ, গচ্ছ > গগ), র্ত > স্ট (ভর্তা > ভস্টা), ক্ষ > শ্ক (পক্ষ > পশ্ক), র্থ > স্ত (বিক্রয়ার্থ > বিক্কঅস্তং)।

(ড) অ-কারান্ত শব্দ সম্বোধনে আ-কারান্ত হয়ে যায়। হে পুরুষ > হে পুলিশা।

(ঢ) আ-কারান্ত শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে '-আহ' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন— চারুদত্তস্য > চালুদত্তাহ।

(ণ) স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—ভর্তৃকাঃ > ভস্টকে।

৫৬। সেন, ড. সুকুমার : 'ভাষার ইতিবৃত্ত', কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ১২৭-২৮।

মাগধী প্রাকৃতের নিদর্শন :

"ধীবরক:—(ভীতিনাটিতকেন) পশীদন্তু ভাবমিশ্শা। ণ হগে ঈদিশশ্শ অকয্যশ্শ কালকে।

একঃ—কিং ণু ক্খু শোহণে বম্হণে শি ত্তি কদুঅ লঞ্ঞা দে পলিগ্গহে দিণ্ণে।

ধীবরকঃ—শুণধ দাব। হগে ক্খু শক্কাবদালবাশী ধীবলে।"

অভিজ্ঞান শকুন্তল, ৪র্থ অঙ্ক।

অনুবাদ : ধীবর—(ভয়ের অভিনয় করে) মহাশয়েরা প্রসন্ন হোন। আমি এরকম অকর্মের কারক নই (আমি এরকম অকর্ম করিনি)।
একজন—তবে কি তুই সদ্ব্রাহ্মণ যে রাজা তোকে এটা দান করেছেন?
ধীবর—আপনারা সব কথা শুনুন। আমি শক্রাবতার-বাসী ধীবর।

> "ধীবরক :—অব এক্কদিঅশং মঅ লোহিদমশ্চকে খণ্ডশো কপ্পিদে। যাব তশ্শ উদলব্ভন্তলে এবং মহালদণভাশুলং অঙ্গুলীঅ অংপেস্কামি। পশ্চা ইধ বিক্কঅন্তং ণং দংশঅন্তে য্যেব গহিদে ভাবমিশ্শেহিং এত্তিকে দাব এদশ্শ আগমে। অধুনা মালেধ বা কুস্টেধ বা।"

অনুবাদ : ধীবর—তারপর আমি একদিন এক রুইমাছ খণ্ড খণ্ড করে কাটছিলাম। তখন তার পেটের মধ্যে এই মহারত্নোজ্জ্বল আংটিটি দেখতে পাই। পরে সেটা বিক্রয়ের জন্যে দেখাতে গেলে আপনারা আমাকে ধরেছেন। এইটুকুই (হল) এর পাওয়ার বৃত্তান্ত। এখন আপনারা (আমায়) মারুন বা কাটুন।

পৈশাচী (Paiśācī) : সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলির মধ্যে সাহিত্যিক নিদর্শনে সবচেয়ে দীন হল পৈশাচী প্রাকৃত। এই প্রাকৃতে রচিত বহু গল্পকথার বিশাল এক সঙ্কলন করেছিলেন গুণাঢ্য তাঁর 'বৃহৎকথা' (বড্ডকহা) গ্রন্থে (খ্রীস্টীয় ১ম বা ২য় শতাব্দী)। কিন্তু সেটিও এখন বিলুপ্ত, তার গল্প-কাহিনীগুলি শুধু রক্ষিত আছে সংস্কৃতের বিভিন্ন রচনায়। পৈশাচী প্রাকৃতের অল্পস্বল্প নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাচীন বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিকদের উল্লেখ ও উদ্ধৃতিতে। পূর্ববর্তী যুগের উত্তর-পশ্চিমার (গান্ধারী) উত্তরসূরি বলে পৈশাচীর জন্মস্থান উত্তর-পশ্চিম ভারত হতে পারে, কিন্তু পরবর্তী কালে মধ্যভারতেও এর প্রচলন ছিল। পৈশাচী প্রাকৃতের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

(ক) ধ্বনিতত্ত্বে পৈশাচী প্রাকৃত অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল বলে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ও শৌরসেনীর সঙ্গে এর সাদৃশ্য বেশি।

(খ) স্বরমধ্যবর্তী একক স্পৃষ্ট ও ঘৃষ্ট ঘোষ ব্যঞ্জনের অঘোষীভবন পৈশাচীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন—গগন > গকন, রাজা > রাচা, কেশবঃ > কেসপো।

(গ) মাহারাষ্ট্রীতে স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন লোপ পেয়েছে, এবং মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন হ-কারে পরিণত হয়েছে, কিন্তু পৈশাচীতে স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন লোপ পায় নি এবং মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনও হ-কারে পরিণত হয় নি। যেমন—মেঘ > মেখ।

(ঘ) 'ত্' অপরিবর্তিত আছে, কিন্তু 'দ্' পরিবর্তিত হয়ে 'ত্' হয়েছে। যেমন— তরুণী > তলুনী, প্রদেশ > পতেস।

(ঙ) 'শ্' ও 'ষ্' পরিবর্তিত হয়েছে 'স্'-তে। অর্থাৎ পৈশাচীতে তিনটি শিস্‌ধ্বনি নেই, আছে শুধু একটি—স্। যেমন—প্রদেশ > পতেস।

(চ) 'ণ্' পরিবর্তিত হয়েছে 'ন্'-তে। যেমন—গুণেন > গুনেন, তরুণী > তলুনী।

(ছ) সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে জ্ঞ, ন্য, ণ্য—তিনটিই হয়েছে ঞ্ঞ। যেমন— রাজ্ঞঃ > রঞ্ঞো, পুণ্য > পুঞ্ঞ, কন্যকা > কঞ্ঞকা।

(জ) র্য, স্ন, ষ্ট স্বরভক্তির ফলে হয়েছে যথাক্রমে রিঅ, সিন, সট। যেমন— কার্য > কারিঅ, কষ্ট > কসট, স্নেহ > সনেহো।

(ঝ) অসমাপিকার প্রত্যয় '-ত্বা' হয়েছে 'তূন'। যেমন—গত্বা > গন্তূন।

(ঞ) পদের শেষে বিসর্গযুক্ত অ-কার ও-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন— মেঘঃ > মেখো, মদনঃ > মতনো।

পৈশাচী প্রাকৃতের নিদর্শন :

"নচ্চন্তস্‌স য লীলাপাতুক্‌খেবেন কম্পিতা বসুধা—
উচ্ছয়ন্তি সমুদ্দা সইলা নিপতন্তি তং হলং নমথ।"

—হেমচন্দ্র : প্রাকৃত ব্যাকরণ, ৪/৩২৬

অনুবাদ : যার নৃত্য করার সময় চঞ্চল পদক্ষেপে পৃথিবী কম্পিত হয়, সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হয়, পর্বত ধ্বসে পড়ে, সেই হলধরকে প্রণাম করো।

॥ ৪৩ ॥

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা : তৃতীয় স্তর

(Middle Indo-Aryan : The Tertiary Stage)

অপভ্রংশ (Apabhraṃśa) : বিশুদ্ধ সংস্কৃতের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যে লোকভাষা গড়ে উঠেছিল, পতঞ্জলি তাঁর 'মহাভাষ্যে' (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) তাকে 'অপভ্রংশ' বলেছেন। তিনিই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন এবং তাঁর ব্যবহৃত এই শব্দটি এখন তৃতীয় স্তরের মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ অভিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাকৃত বৈয়াকরণদের কেউ কেউ অপভ্রংশকে শৌরসেনী, মাহারাষ্ট্রী ইত্যাদি সাহিত্যিক প্রাকৃতের মতো একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রাকৃতই বলেছেন। একাদশ শতাব্দীর বৈয়াকরণ হেমচন্দ্র প্রথম অপভ্রংশকে স্বীকৃতি দিয়ে এর ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ করেন। পুরুষোত্তম আবার এর তিনটি উপভাষার কথা উল্লেখ করেছেন—নাগরক, উপনাগরক ও ব্রাচড়। কিন্তু আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে জর্জ আব্রাহাম্ গ্রীয়ার্সন ও ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অপভ্রংশকে মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী ইত্যাদির মতো একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রাকৃত রূপে স্বীকার করেন নি, তাঁদের মতে অপভ্রংশ হল সব রকমেরই প্রাকৃতের পরবর্তী পরিণতি। সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলি হল মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় স্তর এবং অপভ্রংশ হল মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার তৃতীয় স্তর, আর অপভ্রংশেরই শেষ স্তরের নাম অবহট্‌ঠ বা অপভ্রষ্ট। ব্যাপক অর্থে অবহট্‌ঠ হল অপভ্রংশেরই অন্তর্গত। এই ব্যাপক অর্থে অপভ্রংশকে গ্রহণ করলে কথ্য ভাষারূপে অপভ্রংশের স্থিতিকাল হল খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দী। কিন্তু অবহট্‌ঠকে বাদ দিয়ে সঙ্কীর্ণ অর্থে অপভ্রংশকে নিলে কথ্যভাষারূপে অপভ্রংশের স্থিতিকাল হল খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত। অবশ্য সাহিত্যের ভাষারূপে অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের চর্চা চলেছিল খ্রীস্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত। অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের কিছু গানে, ধনপালের 'ভবিসয়ত্ত কহা' (ভবিষ্যদত্ত কথা), স্বয়ম্ভুর 'পউমচরিত' (পদ্মচরিত), পুষ্পদন্তের 'যসহর চরিত' (যশোধর চরিত), হেমচন্দ্রের 'কুমার পাল চরিত', 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' ছন্দঃশাস্ত্রের অংশবিশেষে এবং সরহের 'দোহাকোষে'। অনুমান করা হয় প্রত্যেক শ্রেণীর সাহিত্যিক প্রাকৃতেরই ভিত্তি (Infra-structure) রূপে সেই শ্রেণীর একটি মৌখিক প্রাকৃত ছিল এবং তারই স্বাভাবিক পরিণতি হয় সেই শ্রেণীর অপভ্রংশে। সুতরাং যত রকমের সাহিত্যিক প্রাকৃত ছিল তত রকমেরই অপভ্রংশের জন্ম

হয়েছিল। যেমন—শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে শৌরসেনী অপভ্রংশ, মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত থেকে মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ, অর্ধমাগধী প্রাকৃত থেকে অর্থমাগধী অপভ্রংশ, মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ এবং পৈশাচী প্রাকৃত থেকে পৈশাচী অপভ্রংশের জন্ম হয়েছিল। এই সব অপভ্রংশের মধ্যে সবগুলির লিখিত নিদর্শন বা অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার তৃতীয় স্তরের এই অপভ্রংশগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি শুধুই আনুমানিক (hypothetical) স্তর হতে পারে। তাই তাঁদের মতে প্রাকৃতের শেষ স্তরের মৌখিক ভাষার নাম অপভ্রংশ নয়। অপভ্রংশ সাহিত্যিক ভাষাই।[৫৭] এই সব অপভ্রংশের মধ্যে সব চেয়ে বেশি লিখিত নিদর্শন পাওয়া গেছে. শৌরসেনী অপভ্রংশের। কারণ এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত স্থান লাভ করেছিল শৌরসেনী অপভ্রংশ ; এইটি সর্বভারতীয় সাহিত্যচর্চার মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। পুরুষোত্তম কথিত নাগরক অপভ্রংশই হল এই শৌরসেনী অপভ্রংশ। যেহেতু অন্য অপভ্রংশগুলির লিখিত নিদর্শন বিশেষ পাওয়া যায় না, সেই হেতু বিশেষজ্ঞরা এই শৌরসেনী বা নাগরক অপভ্রংশেরই ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলিই সাধারণভাবে উল্লেখ করে থাকেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) শব্দের স্বরধ্বনির যথেচ্ছ পরিবর্তন অপভ্রংশের ধ্বনিগত গঠনের শৈথিল্য প্রকাশ করে। যেমন—জনঃ > জণো, জণু, জণ।

(খ) স্বরমধ্যবর্তী 'ম' লোপ পেয়েছে এবং তার পরবর্তী বা পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির নাসিক্যীভবন হয়েছে। যেমন—কুমার > কুঁবার [কুওয়াঁর], গ্রাম > গাঁব [গাঁও]। অনুনাসিক ব্যঞ্জনের লোপ ছাড়া অ, ই, উ ধ্বনির স্বতোনাসিক্যীভবনও অপভ্রংশে দেখা যায়।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) স্ত্রীলিঙ্গের নানা প্রকার প্রত্যয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যে প্রচলিত ছিল। অপভ্রংশে স্ত্রীলিঙ্গের এত বিচিত্র প্রত্যয় রইল না। অপভ্রংশে শুধু 'ঈ' যোগে স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ গঠিত হত। যেমন—পুষ্ট > পুট্‌ঠ > স্ত্রীঃ পুট্‌ঠী। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে 'আ' ছিল সাধারণত স্ত্রীলিঙ্গের প্রত্যয়। কিন্তু অপভ্রংশে আ-প্রত্যয়টি বরং পুংলিঙ্গেই বহু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে থাকে। ব্যঞ্জনের লোপের ফলে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ

৫৭। মজুমদার, ড: পরেশচন্দ্র : সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ, কলকাতা, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ১১৮-১২০।

স্বরান্ত হয়ে গিয়েছিল আগেই। ফলে শব্দরূপে বৈচিত্র্য অনেক কমে গেল।

(খ) পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে প্রাচীন ভারতীয় আর্যের বিসর্গযুক্ত অ-বিভক্তিটি কোনো কোনো সাহিত্যিক প্রাকৃতে ও-কার বা এ-কারে পরিণত হয়েছিল। অপভ্রংশে সেই বিধান তো ছিলই, তা ছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার বদলে অ-কার বা উ-কারের ব্যবহার চালু হল। এই প্রয়োগ এত ব্যাপক হয়েছিল যে ক্লীবলিঙ্গেও প্রথমার একবচনে অম্-এর বদলে অ-কার বা উ-কারের ব্যবহার দেখা যায়।

(গ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে করণ কারকের একবচনের বিভক্তি ছিল 'এন'। অপভ্রংশে তার নানাবিধ পরিবর্তিত রূপ (-এণ, -এণং, -ইণ, -ইণং) ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন—তেণ, তেণং, তিণ, তিণং।

(ঘ) অপাদান কারকে '-হে' ও '-হুং' দু'টি বিভক্তিই একবচন ও বহুবচনে ব্যবহৃত হত। যেমন—বৃক্ষাৎ, বৃক্ষেভ্যঃ > রুচ্ছহে, রুচ্ছহুং। '-আহু' বিভক্তিটি অবশ্য শুধু একবচনে ব্যবহৃত হত। যেমন—বৃক্ষাৎ > রুচ্ছাহু।

(ঙ) সম্বন্ধের একবচনের বিভক্তিও একাধিক—'-হ', '-হে', '-হো', '-সু'। যেমন—বৃক্ষস্য > রুচ্ছহ, রুচ্ছহে, রুচ্ছহো, রুচ্ছসু।

(চ) অধিকরণের বিভক্তি ছিল '-হি', '-হিং'। যেমন—বৃক্ষস্মিন্ > রুচ্ছহিং।

(ছ) স্ত্রীলিঙ্গে করণ, অপাদান, অধিকরণ ও সম্বন্ধপদের বিভক্তি ছিল '-হে' আর '-হেং'। যেমন—খট্টাহে, রইহেং।

(জ) সম্বোধনের বহুবচনের বিভক্তি হল '-হো'। যেমন—মহিলাহো।

(ঝ) আহ্মার (আম্ভার), তুহ্মার (তুম্ভার) প্রভৃতি সর্বনাম পদগুলি অপভ্রংশেই প্রচলিত হয়েছিল।

(ঞ) শতৃ-প্রত্যয়ান্ত পদ তিনটি কালেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

(ট) ল্যবর্থক অসমাপিকার (Gerund) প্রত্যয় হল '-প্পণ', '-এপ্পি' '-এপ্পিণু', '-এবি', '-এবিণু'।

ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য :

অপভ্রংশে অন্ত্যানুপ্রাস অর্থাৎ পংক্তির শেষে মিল দেখা দিল যা আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় ছন্দে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। আর নানা ধরনের নতুন ছন্দোরীতির প্রচলনও অপভ্রংশের যুগে দেখা যায়।

অপভ্রংশের নিদর্শন :

"পরহুঅ মহুর পলাবিণি কন্তি
ণন্দন-বণ সচ্ছন্দ ভমন্তি
জই তুঈ পিঅঅম সা মহু দিট্‌ঠী
তা আঅক্‌খহি মহু পরপুট্‌ঠি।" —বিক্রমোর্বশীয়, ৪র্থ অঙ্ক।

অনুবাদ : হে মধুর প্রলাপিনি পরভৃতে, হে কান্তিময়ি, তুমি (তো) নন্দনবনে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করো। যদি তুমি আমার প্রিয়তমাকে দেখে থাকো, তা হলে হে পরপুষ্ট সুন্দরী, আমাকে তা বলো।

অবহট্‌ঠ বা অপভ্রষ্ট (Avahaṭṭha) :

প্রত্যেক সাহিত্যিক প্রাকৃতের কথ্যভিত্তি থেকে যেমন সেই শ্রেণীর অপভ্রংশের জন্ম হল তেমনি প্রত্যেক অপভ্রংশের পরবর্তী পরিণতি হল সেই শ্রেণীর অবহট্‌ঠে (বা অপভ্রষ্টে)। যেমন—শৌরসেনী প্রাকৃত > শৌরসেনী অপভ্রংশ > শৌরসেনী অবহট্‌ঠ ; মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত > মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ > মাহারাষ্ট্রী অবহট্‌ঠ ; অর্ধমাগধী প্রাকৃত > অর্ধমাগধী অপভ্রংশ > অর্ধমাগধী অবহট্‌ঠ ; মাগধী প্রাকৃত > মাগধী অপভ্রংশ > মাগধী অবহট্‌ঠ, পৈশাচী প্রাকৃত > পৈশাচী অপভ্রংশ > পৈশাচী অবহট্‌ঠ। অবহট্‌ঠে এসে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগ শেষ হল। অপভ্রংশ হল মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার তৃতীয় স্তর, আর অবহট্‌ঠ হল তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ অপভ্রংশেরই শেষ ধাপ। কথ্যভাষা হিসাবে অবহট্‌ঠের স্থিতিকাল হল আনুমানিক খ্রীস্টীয় অষ্টম থেকে দশম শতাব্দী। এই পর্বের শেষের দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর অবহট্‌ঠ থেকে বিভিন্ন নব্য ভারতীয় আর্যভাষার (বাংলা, হিন্দি, অবধী, মারাঠি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি) জন্ম হতে থাকে। অবশ্য নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির জন্মের পরেও অবহট্‌ঠে সাহিত্য রচনা খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে। সরহের 'দোহাকোষে' অবহট্‌ঠের সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়। অবহট্‌ঠ ও নব্য ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যবর্তী কাল্পনিক একটি স্তর অনুমান করা হয়েছে। তার নাম 'প্রত্ন-নব্য-ভারতীয় আর্য' (Proto-New Indo-Aryan)। ড. সুকুমার সেন এসম্পর্কে বলেছেন :

"নব্য ভারতীয়-আর্যের উদ্ভবের সময়ে ভাষাগুলির মধ্যে যে সাধারণ লক্ষণ ছিল সেইগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সময়ের ভাষাগুচ্ছকে একটি বিশিষ্ট ভাষার সন্তান বলিয়া গণ্য করিতে হয়, ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া আলোচনার সুবিধার জন্য। এই কাল্পনিক ধাত্রী ভাষাটিকে বলা হইল

প্রত্ন-নব্য ভারতীয়-আর্য (Proto-New Indo-Aryan)। অপভ্রষ্টের দ্বিতীয় বা শেষ স্তর হইল এই প্রত্ন-নব্য ভারতীয়।"[৫৮]

সম্প্রতি ড. সুভদ্র কুমার সেন এই প্রত্ন-নব্যভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাঁর Proto-New Indo-Aryan গ্রন্থে (১৯৭৩)। কিন্তু অবহট্‌ঠ সম্পর্কে আলোচনা 'সংক্ষিপ্তসারে'র রচয়িতা ছাড়া প্রাকৃত বৈয়াকরণদের কেউই বিশেষ করেন নি। ড. সুকুমার সেন তাঁর 'A Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan' গ্রন্থে অবহট্‌ঠের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে সূত্রবদ্ধ করেছিলেন এবং 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থেও অপভ্রষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। মূলত তাঁর অনুসরণে অবহট্‌ঠের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল :

(১) পদের আদিতে ও মধ্যে অবস্থিত -'এ' পরিবর্তিত হয়েছে '-ই'-তে। যেমন—ঐক্য > এক্‌ক > ইক্‌ক।

(২) পদের অন্তে অবস্থিত '-এ' এবং '-ও' যথাক্রমে '-ই' এবং '-উ'-তে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন—ক্ষণে > খণে > খণি, জীবঃ > জীবো > জীও > জীউ, চরিতঃ > *চরিতো > *চরিও > চরিউ।

(৩) পাশাপাশি অবস্থিত দুই স্বরধ্বনি প্রায়ই সঙ্কুচিত হয়ে এক হয়ে গেছে। যেমন—অন্ধকার > অন্ধআর > আঁধার।

(৪) পদের অন্তে অবস্থিত 'ম্' লোপ পেয়েছে এবং তার ফলে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়ে লোপ পায় নি। যেমন—তহিম্ > তহিঁ। কিম্ + পি > কিম্পি।

তবে দুই স্বরের মধ্যে অবস্থিত -'ম্' লোপ পেয়েছে এবং তাতে পূর্ববর্তী স্বর অনুনাসিক হয়েছে। যেমন—সম > সঁব।

(৫) তবে পদের অন্তে অ-কারের পরে অবস্থিত অনুস্বার অনেক সময় লোপ পেয়েছে, তাতে অনুস্বারের পূর্ববর্তী অ-কার কখনো কখনো অপরিবর্তিত থেকেছে, কখনো কখনো উ-কারে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যেমন—নরম্ > নরং > নর/নরু।

(৬) পদের অন্তে অ-কারের পরে অবস্থিত বিসর্গ লোপ পেয়েছে, তার পূর্ববর্তী অ-কার কখনো অপরিবর্তিত থেকেছে, কখনো উ-কারে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যেমন—নরঃ > নর/নরু।

৫৮। সেন, অধ্যাপক ড. সুকুমার : 'ভাষার ইতিবৃত্ত', ১৯৭৫, পৃঃ ১৪৭।

(৭) মূল অপভ্রংশে তৎসম শব্দের ও সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার প্রায় ছিলই না।

(৮) সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গের নানা প্রত্যয় ছিল, কিন্তু অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক একটিই প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। সেটা '-ঈ' বা -'ই' প্রত্যয়।

(৯) নতুন-নতুন সর্বনাম পদের প্রচলন হয়। যেমন—যেহ্, কেহ্, এহ্, অহ্মা, তুহ্মা ইত্যাদি।

(১০) শব্দরূপে সরলীকরণের যে প্রবণতা মধ্য ভারতীয় আর্যে সূচিত হয়েছিল তা চলতেই থাকে। অবহট্‌ঠে শব্দরূপে স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ ও পুংলিঙ্গের শব্দের মধ্যে রূপগত ব্যবধান কমে আসে এবং ক্লীবলিঙ্গের স্বতন্ত্র রূপও প্রায় লোপ পায়।

(১১) সংস্কৃতের মতো বিশেষ্যের কারক-বিভক্তি অনুযায়ী বিশেষণের কারক-বিভক্তি হত না। বিশেষণ প্রায়ই বিভক্তিহীন ছিল।

(১২) বিশেষ্যের শব্দরূপে দ্বিবচন ছিলই না। একবচন ও বহুবচনের মধ্যে রূপগত পার্থক্য করণ কারক ছাড়া অন্য কোনো কারকে রক্ষিত হয়নি। সর্বনামের মধ্যে উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে একবচন ও বহুবচনের মধ্যে রূপগত পার্থক্য দেখা যায়।

(১৩) বিভিন্ন কারকের বিভক্তিচিহ্ন লোপ পেতে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে একাধিক কারকের বিভক্তিচিহ্ন এক হয়ে যায়। ফলে একদিকে কর্তৃকারক ও কর্মকারকের রূপ এক হয়ে যায়, অন্যদিকে করণ ও অধিকরণ একরূপ লাভ করে।

(১৪) বিভক্তি লোপ পাওয়ার ফলে বিভক্তির বদলে দু'একটি অনুসর্গের ব্যবহার সূচিত হয়। যেমন—লই।

(১৫) যুক্ত ক্রিয়ার (Compound Verb) ব্যবহার অবহট্‌ঠের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যেমন—'বিসাম করু' (= বিশ্রাম করো), 'ন করহু সেবা' (= সেবা করো না), 'বেঅণ করই' (= বেদনা করে অর্থাৎ ব্যথা লাগে)।

(১৬) ক্রিয়ারূপের নতুন বিভক্তি দেখা যায়। যেমন—সামান্য বর্তমান কালের নির্দেশক (indicativc) ও অনুজ্ঞা (imperative) ভাবের বিভক্তি হল—উত্তম পুরুষের একবচনে -হুং, -মি ; বহুবচনে -মা ; মধ্যম পুরুষের একবচনে -ই, -উ, -হি, বহুবচনে -হা ; প্রথম পুরুষের একবচনে -অই, -ই, -অ ; বহুবচনে -ন্তি, -হিঁ।

(১৭) অবহট্‌ঠে অনেক বিভক্তি লোপ পেল এবং বাক্যে বিভক্তিহীন পদের ব্যবহার প্রচলিত হল। ফলে বাক্যে পদবিন্যাসের সুনির্দিষ্ট নিয়ম গড়ে উঠতে থাকে। বাক্যের শেষে সমাপিকা ক্রিয়া, তার আগে কর্ম, কর্মের আগে কর্তা—এই মূল নিয়মটি তখনই অনুসৃত হতে দেখা যায়। যেমন—'পণ্ডিঅ সকল সত্থ

বক্‌খানই' (অর্থাৎ, পণ্ডিত সকল শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে)। কিন্তু কর্মটি যদি অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ম হত তবে কর্মটি সেই অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসত এবং অসমাপিকা ক্রিয়াটি বাক্যের মূল সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসত। যেমন– 'বেজ্জ দেখ্‌খি কি রোগ পলাই' (অর্থাৎ, বৈদ্য দেখে কি রোগ পালায়?)

(১৮) অপভ্রংশের স্তরে ছন্দের যে বৈচিত্র্য সূচিত হয়েছিল, সেই বৈচিত্র্য এ যুগেও লক্ষ্য করা যায়। দু-একটি ছন্দ ছাড়া সব ছন্দোরূপেই অন্ত্যানুপ্রাস ও সমমাত্রিক চরণ লক্ষণীয়।

অবহট্‌ঠ (অপভ্রংশের শেষ স্তর) ভাষার নিদর্শন :

"ঝাণহীণ পব্বজ্জেং রহিঅউ
ঘরহি বসন্তেং ভজ্জেং সহিঅউ
জই ভিডি বিসঅ রমন্ত ণ মুচ্চই
সরহ ভণই পরিআণ কি মুচ্চই।" —সরহের দোহাকোষ

অনুবাদ : ধ্যানহীন ও প্রব্রজ্যারহিত যে ব্যক্তি ঘরে ভার্যার সঙ্গে বাস করে সে যদি গভীরভাবে বিষয় ভোগ করেও মুক্তিলাভ না করে, তবে পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা কি মুক্তিলাভ হয়?–(এই কথা) সরহ বলেছেন।

"ঘরেং অচ্ছই বাহিরে পেচ্ছই
পই দেক্‌খই পড়িবেসি পুচ্ছই।
সরহ ভণই বঢ জাণউ অপ্পা
ণউ সো ধেয় ণ ধারণ জপ্পা।" —সরহের দোহাকোষ

অনুবাদ : সহজ তত্ত্বের অনুভূতি ঘরেই (অর্থাৎ দেহরূপ গৃহেই) আছে, (কিন্তু লোকে তাকে) বাইরে খুঁজে বেড়ায়, (যেমন) পতিকে দেখেও প্রতিবেশীকে (বধূ) প্রশ্ন করে (সে কোথায়?)। সরহ বলেছেন–ওরে মূঢ়, নিজেকে জানবার চেষ্টা কর। সেই সহজতত্ত্ব ধ্যান, ধারণা ও জপের দ্বারা পাওয়া যায় না।

"অরে রে বাহহি কাহ্নু ণাব ছোড়ি
ডগমগ কুগতি ণ দেহি
তইঁ ইত্থি ণঈহি সন্তার দেই
যো চাহসি সো লেহি।" —প্রাকৃত পৈঙ্গল

অনুবাদ : হে কৃষ্ণ, তুমি ছোট নৌকা বাইছো, ডগমগ করে কুগতি দিও না (অর্থাৎ ভুল পথে নিয়ে যেও না), তুমি স্ত্রীলোকদের নদীটি পার করিয়ে দাও, যা চাও তাই পাবে।

"পণ্ডব বংসহি জন্ম ধরিজ্জে
সম্পঅ অজ্জিঅ ধম্মক দিজ্জে
সোই জুহিট্‌ঠির সংকট পাআ
দেবঅ লিক্‌খিঅ কেণ মেটাআ।" —প্রাকৃত পৈঙ্গল

অনুবাদ : যিনি পাণ্ডববংশে জন্মগ্রহণ করে সম্পদ অর্জন করে ধর্মের জন্যে দান করেছিলেন সেই যুধিষ্ঠিরকেও সঙ্কটে পড়তে হয়েছিল। দৈবের লিখন কে খণ্ডন করতে পারে?

॥ ৪৪ ॥

নব্য ভারতীয় আর্যভাষা : বর্গীকরণ ও অবস্থান

(New Indo-Aryan : Classification and Topography)

আগে বলেছি, ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European) ভাষাভাষী মূল আর্যজাতির একটি শাখার নাম ইন্দো-ইরানীয় (Indo-Iranian) শাখা। এই শাখাটি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়—তার একটি উপশাখা ইরানে-পারস্যে ও অন্য একটি উপশাখা ভারতে প্রবেশ করে। ভারতে যে উপশাখাটি প্রবেশ করে তাদেরই ভাষাকে আমরা বলি ভারতীয় আর্যভাষা (Indo-Aryan)। এই ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের তিনটি যুগ—প্রাচীন ভারতীয় আর্য (আঃ ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ—৬০০ খ্রীঃ পূঃ), মধ্য ভারতীয় আর্য (আঃ ৬০০ খ্রীঃ পূঃ—৯০০ খ্রীঃ) এবং নব্য ভারতীয় আর্য (আঃ ৯০০ খ্রীঃ-বর্তমান কাল)। নব্য ভারতীয় আর্যভাষা হল তাহলে ভারতে প্রচলিত আর্যভাষার বিবর্তনের তৃতীয় ধাপ। বলা বাহুল্য নব্য ভারতীয় আর্যভাষা বলতে কোনো একটি ভাষাকে বোঝায় না। খ্রীস্টীয় আনুমানিক নবম দশম শতাব্দী থেকে ভারতে আর্যশাখা থেকে যেসব নবীন ভাষার জন্ম হয় তাদের সকলকেই বোঝায়। বস্তুত নব্য ভারতীয় আর্য হল ইতিহাসের একটি পর্বের নাম, আর এই পর্বের ভারতীয় আর্যভাষাগুলির নাম হল—বাংলা, হিন্দি, মারাঠি, অবধী, পঞ্জাবি ইত্যাদি। এইসব নব্য ভারতীয় আর্যভাষার বর্গীকরণ বা শ্রেণীবিভাগ বিভিন্ন সময়ে ভাষাতত্ত্ববিদেরা বিভিন্নভাবে করেছেন। এইসব বর্গীকরণের মধ্যে নিম্নোক্ত ত্রিবিধ বর্গীকরণই প্রধান :

(১) অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ বর্গীকরণ (Inner-Outer Classification)
(২) জন্ম-উৎসগত বা ঐতিহাসিক বর্গীকরণ (Genealogical or Historical Classification)
(৩) ভৌগোলিক বা এলাকাগত বর্গীকরণ (Geographical or Topographical Classification)

অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ বর্গীকরণ (Inner-Outer Classification) : জার্মান ভারতবিদ্যাবিদ্ মনীষী আউগুস্ট্ রুডল্ফ্ ফ্রীড্রিশ্ হোয়ের্ন্‌ল্ (August Rudolf Friedrich Hörnle) অনুমান করেছিলেন—আর্যরা ভারতবর্ষে একবারে একদলে আসেন নি। তাঁরা দু'বারে দু'দলে ভারতবর্ষে আসেন। প্রথমে তাঁদের যে দলটি আসে সেটি উত্তর ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। পরে যে দলটি আসে সেই দলটি প্রথম দলের বাসভূমিটির কেন্দ্রে অনুপ্রবেশ করে এবং প্রথম দলকে তাঁদের বাসভূমি থেকে বহিষ্কৃত করে। তখন প্রথম দলের আর্যরা দ্বিতীয় দলকে কেন্দ্রে রেখে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েন। হোয়ের্ন্‌ল্-এর এই অনুমানের উপরে ভিত্তি করে পরবর্তী কালে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের জরীপকারী মহামনীষী জর্জ্ আব্রাহাম্ গ্রীয়ার্সন্ (George Abraham Grierson) সিদ্ধান্ত করেন যে, আর্যদের যে দলটি প্রথম ভারতবর্ষে এসেছিল সেই দলটি দ্বিতীয় দলের আক্রমণে ভারতে তাদের কেন্দ্রীয় বাসভূমি ছেড়ে তার চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে তাদের ভাষা হল কেন্দ্রভূমির বাইরের ভাষা, অতএব বহিরঙ্গ ভাষা (Outer language)। আর দ্বিতীয় যে দলটি এসে ভারতে আর্যদের মূল কেন্দ্রভূমিতে বসবাস করে তাদের ভাষা কেন্দ্রভূমির অভ্যন্তরের ভাষা অতএব অন্তরঙ্গ ভাষা (Inner language)। পরবর্তী কালে বহিরঙ্গ আর্যভাষা থেকে যেসব নবীন ভাষার জন্ম হয় সেগুলিকে তিনি বহিরঙ্গ নব্য ভারতীয় আর্যভাষা বলেছেন এবং অন্তরঙ্গ আর্যভাষা থেকে যেসব নবীন ভাষার জন্ম হয় সেগুলিকে বলেছেন অন্তরঙ্গ নব্য ভারতীয় আর্যভাষা। গ্রীয়ার্সনের এই শ্রেণীবিভাগকেই বলা হয় নব্য ভারতীয় আর্যভাষার অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ বর্গীকরণ (Inner-Outer Classification of New Indo-Aryan Languages)। অন্তরঙ্গ ভাষাগুলি হল—পশ্চিমা হিন্দি ও পঞ্জাবি ; আর বহিরঙ্গ ভাষার মধ্যে পড়ে কাশ্মীরী, সিন্ধি, বাংলা, ওড়িয়া, মারাঠি ইত্যাদি। এই যে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দুই গোষ্ঠীতে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলিকে তিনি ভাগ করেছিলেন এর পিছনে তাঁর যুক্তি ছিল যে, বহিরঙ্গ গোষ্ঠীর ভাষাগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যে সেগুলিকে একটি গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা যায় এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলি আবার অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর ভাষা থেকে তাদের পৃথক করে। কিন্তু পরবর্তী কালে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রীয়ার্সনের যুক্তিগুলি খণ্ডন করেন। তিনি দু'দিক থেকে গ্রীয়ার্সনের যুক্তি খণ্ডন করেন। প্রথমত যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে গ্রীয়ার্সন্ বহিরঙ্গ ভাষাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলেছেন সেইগুলি তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়, অর্থাৎ সেই বৈশিষ্ট্যগুলি সব বহিরঙ্গ ভাষায় পাওয়া যায় না। যেমন—অপিনিহিতিকে গ্রীয়ার্সন্ সব বহিরঙ্গ ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলেছেন, এবং সিন্ধি ও মারাঠিকে বহিরঙ্গ

ভাষার মধ্যে ফেলেছেন। কিন্তু সিন্ধি ও মারাঠি ভাষায় অপিনিহিতি নেই। দ্বিতীয়ত বহিরঙ্গ ভাষাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তরঙ্গ ভাষাগুলি থেকে বহিরঙ্গ ভাষাগুলিকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে অর্থাৎ সেই বৈশিষ্ট্যগুলি শুধু বহিরঙ্গ ভাষায়ই পাওয়া যায়, অন্তরঙ্গ ভাষায় পাওয়া যায় না। যেমন—স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-প্রত্যয়ের ব্যবহার শুধু বহিরঙ্গ ভাষারই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যে পশ্চিমা হিন্দিকে গ্রীয়ার্সন অন্তরঙ্গ ভাষা বলেছেন সেই পশ্চিমা হিন্দিতেও স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-প্রত্যয় দেখা যায় (যেমন : লড়ক—লড়কী)। এইভাবে গ্রীয়ার্সনের যুক্তিগুলি ভাষাচার্য সুনীতিকুমার খণ্ডন করেছেন। আধুনিক কালে গ্রীয়ার্সনের অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ বর্গীকরণটি ভাষাবিজ্ঞানীরা আর গ্রহণ করেন না বলে এই মতের বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যেটুকু আলোচনা করা হল তাতে এই মতবাদের মূল বক্তব্য এবং এটি খণ্ডিত হওয়ার মূল কারণটি সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

জন্ম-উৎসগত বা ঐতিহাসিক বর্গীকরণ (Genealogical or Historical Classification) : আদি উৎসের বিচারে বাংলা, হিন্দি, মারাঠি, অবধী, পঞ্জাবি প্রভৃতি নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলি মূল আর্যভাষা বা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ (Original Aryan or Indo-European Language Family) থেকে জাত হলেও বর্তমান স্তরে পৌঁছোবার আগে তাদের অনেকগুলি মধ্যবর্তী স্তর বা পর্ব পেরিয়ে আসতে হয়েছে। সুতরাং নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির আদি উৎসের বিচারে শ্রেণী-নির্ণয় করতে হলে তাদের আমরা ইন্দো-ইউরোপীয় বলব ঠিকই, কিন্তু তাদের বিবর্তনের মধ্যবর্তী স্তরের বা পর্বের বিচারে তাদের আভ্যন্তরীণ শ্রেণীবিভাগ করতে হলে সমস্যায় পড়তে হয় এই নিয়ে যে কোন্ স্তরটির বা কোন্ পর্বটির উপরে ভিত্তি করে তাদের আভ্যন্তরীণ শ্রেণীবিভাগ বা বর্গীকরণ করা হবে। আদি ইন্দো-ইউরোপীয়ের ঠিক পরবর্তী পর্বটি যদি ধরি তাহলে তাদের ইন্দো-ইরানীয় শাখার ভাষা বলব, আবার তার পরের স্তরটি ধরলে তাদের ভারতীয় আর্যভাষা বলব। কিন্তু এ সবই হল নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির সাধারণ উৎস (Common Source)। উৎসের এই সব স্তর-বিচারে তাদের সাধারণ বংশ-পরিচয় বা সাধারণ উৎসগত শ্রেণী নির্ণীত হয়। কিন্তু নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির সাধারণ উৎস নয়, বিশেষ উৎসের বিচারে তাদের শ্রেণীবিভাগ বা বর্গীকরণ করতে হলে আরো পরবর্তী স্তর বিচার করতে হবে যে স্তরে এসে ভারতীয় ভাষাগুলির নিজেদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ শ্রেণীভেদ বা পার্থক্য গড়ে উঠেছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা ইন্দো-ইরানীয় বা ইন্দো-ইউরোপীয় হল নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির জন্মগত উৎস সন্দেহ নেই, কিন্তু এসব হল ক্রমশ পরম্পরাক্রমিক দূরাগত উৎস, নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির

অব্যবহিত জন্মগত উৎস হল মধ্য ভারতীয় আর্য-ভাষা বা আরো সঠিকভাবে বলতে হলে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার শেষ স্তর অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় যে আঞ্চলিক উপভাষাগত রূপভেদ গড়ে উঠেছিল তার বিবর্তনেই পরবর্তী স্তরে আরো আঞ্চলিক রূপভেদ গড়ে উঠে এবং নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলি হল তারই অপরিহার্য স্বাভাবিক পরিণতি। এইজন্যেই বিশেষজ্ঞরা বলেছেন :

"বাংলা তথা নবীন ভারতীয় আর্য (NIA) ভাষাগুলির আধুনিক ইতিহাস জানতে হলে এই ঐতিহাসিক বিবর্তন স্মরণ না করে উপায় নেই।"[৫৯]

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, নব্য ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাস জানার জন্যে তাদের ঠিক অব্যবহিত জন্ম-উৎস স্বরূপ মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা প্রাকৃত-অপভ্রংশের আঞ্চলিক রূপগুলির উপরে জোর দেওয়া প্রয়োজন। এখানে নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির জন্ম উৎসগত বা ঐতিহাসিক বর্গীকরণ করতে হবে তাদের জন্মের অব্যবহিত উৎসস্বরূপ মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার আঞ্চলিক রূপগুলির উপরে ভিত্তি করেই। কারণ মধ্য ভারতীয় আর্যের এই এক-একটি আঞ্চলিক রূপ থেকেই পরবর্তীকালের নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির এক-একটি গোষ্ঠী বা ঐতিহাসিক শ্রেণী গড়ে উঠেছে।

সব উন্নত ভাষারই সাধারণত দু'টি রূপ থাকে—একটি সাহিত্যিক (Literary), অন্যটি কথ্য (Spoken)। কথ্য ভাষার জীবন্ত রূপের উপরে ভিত্তি করেই সাহিত্যের ভাষার মার্জিত পরিশীলিত রূপটি গড়ে উঠে। সাহিত্যিক রূপটি সাহিত্যে বিধৃত হয় বলে যুগ-যুগান্তরের পরেও তার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু কথ্য-ভাষার নিদর্শন বিশেষ রক্ষিত হয় না, পরবর্তী যুগে প্রায়ই তার নিদর্শন পাওয়া যায় না। আমরা অনুমান করতে পারি ভারতীয় আর্য ভাষার বিবর্তনের প্রত্যেক পর্বেই তার দুটি রূপ—সাহিত্যিক ও কথ্য—প্রায় সমান্তরাল ধারায় বয়ে গেছে যদিও তাদের বিভিন্ন পর্বের নিদর্শন সর্বক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষারও দুটি রূপ বা দু'টি ছাঁদ ছিল—একটি সাহিত্যিক, অন্যটি কথ্য। সাহিত্যিক রূপটির নিদর্শন পাই বেদের ভাষায়—বিশেষত ঋগ্বেদ-সংহিতায়। তার নাম 'ছান্দস' ভাষা। আর কথ্য রূপটির তিনটি আঞ্চলিক ভেদ বা উপভাষা ছিল—প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয়। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার এর আরো একটি উপভাষা অনুমান করেছেন—দাক্ষিণাত্য। কথ্য রূপগুলি সাহিত্যে বিধৃত না হওয়ায় লোকমুখে কালের গতিতে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে দ্বিতীয় যুগে প্রবেশ করেছে।

৫৯। মজুমদার, ড. পরেশচন্দ্র : 'বাঙ্‌লা ভাষাপরিক্রমা' (১ম খণ্ড), কলকাতা, ১৩৮৩, পৃঃ ১২।

এই কথ্য রূপগুলি থেকে জন্ম হয়েছে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা (খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দ)—প্রাকৃতের। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা প্রাকৃত প্রথম স্তর (খ্রীঃ পূঃ ৬০০—খ্রীঃ ০০ অব্দ) চারটি আঞ্চলিক উপভাষায় রূপ লাভ করেছিল —(১) উত্তর-পশ্চিমা (North-Western), (২) পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা (South-Western), (৩) প্রাচ্য-মধ্যা (East-Central) এবং (৪) প্রাচ্যা (Eastern)। অনুমান করতে পারি পূর্ববর্তী যুগের 'প্রাচ্য' থেকে 'প্রাচ্যা' ও 'প্রাচ্য-মধ্যা'র, 'উদীচ্য থেকে 'উত্তর-পশ্চিমা'র, 'মধ্যদেশীয়' ও 'দাক্ষিণাত্য' থেকে 'পশ্চিমা' বা 'দক্ষিণ-পশ্চিমা'র জন্ম হয়েছিল। অশোকের বিভিন্ন শিলালিপি-প্রত্নলিপিতে এই প্রাকৃতগুলির যে নিদর্শন পাওয়া যায় সেই নিদর্শনটি হল সে যুগের কথ্যভাষার নিদর্শন, অশোক বুদ্ধের বাণীগুলি লোক-সাধারণের কথ্য ভাষাতেই প্রচার করতে চেয়েছিলেন। এই স্তরের প্রাকৃতের উন্নত সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি। প্রাকৃতের দ্বিতীয় স্তরে (খ্রীঃ প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী) মূলত পূর্ববর্তী স্তরের প্রাকৃতের আঞ্চলিক কথ্য রূপগুলির উপরে ভিত্তি করে সাহিত্যিক ভাষার রূপ গড়ে তোলা হল। এইভাবে পূর্ববর্তী স্তরের কথ্য প্রাকৃতের এক-একটি উপভাষা থেকে দ্বিতীয় স্তরে সাহিত্যিক প্রাকৃতের এক বা একাধিক উপভাষার জন্ম হল। দ্বিতীয় স্তরের সাহিত্যিক প্রাকৃতের পাঁচটি উপভাষা ছিল—(১) পৈশাচী, (২) শৌরসেনী, (৩) মাহারাষ্ট্রী, (৪) অর্ধমাগধী, এবং (৫) মাগধী। অনুমান করা যায়, উত্তর-পশ্চিমা থেকে জন্ম নিয়েছিল পৈশাচী, পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা থেকে শৌরসেনী ও মাহারাষ্ট্রী, প্রাচ্য-মধ্যা থেকে অর্ধমাগধী এবং প্রাচ্যা থেকে মাগধী। দ্বিতীয় স্তরের প্রাকৃতের অর্থাৎ সাহিত্যিক প্রাকৃতের নিদর্শন রয়েছে প্রাকৃতে রচিত মহাকাব্যে, গীতিকাব্যে, জৈন ধর্মসাহিত্যে, সংস্কৃত নাটকে নারী ও নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের সংলাপের ভাষায়। এই সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলি সাহিত্যের ভাষা ছিল, কিন্তু এই পর্বে নিশ্চয়ই জনসাধারণের মুখের ভাষারও একটি স্বতন্ত্র ছাঁদ বা রূপ ছিল। সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলির সমসাময়িক মৌখিক প্রাকৃতের নিদর্শন আমরা পাই না। অনুমান করতে পারি প্রত্যেক শ্রেণীর সাহিত্যিক প্রাকৃতের ভিত্তি-স্থানীয় যে মৌখিক প্রাকৃত ছিল তা লোকমুখে পরিবর্তিত হয়ে পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করেছিল ; এই পরবর্তী বা তৃতীয় স্তরের নাম—অপভ্রংশ। অপভ্রংশেরই শেষ রূপের নাম অবহট্‌ঠ। গ্রীয়ার্সন প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদেরা সিদ্ধান্ত করেছেন দ্বিতীয় স্তরের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাকৃতের কথ্য রূপ থেকে সেই শ্রেণীর অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের জন্ম হয়েছিল। যেমন—পৈশাচী প্রাকৃত থেকে পৈশাচী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ, শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে শৌরসেনী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ, মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত থেকে মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ, অর্ধমাগধী প্রাকৃত থেকে অর্ধমাগধী অপভ্রংশ অবহট্‌ঠ এবং মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ। অবশ্য শৌরসেনী ছাড়া অন্য অপভ্রংশের লিখিত নিদর্শন পাওয়া

যায় নি। বিভিন্ন প্রাকৃত থেকে এই যেসব বিভিন্ন অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের জন্ম হয়েছিল, সেইসব অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের এক-একটি থেকে একাধিক নব্য ভারতীয় আর্যভাষার জন্ম। এক-একটি প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে জাত ভাষাগুলিকে নিয়ে এক-একটি গোষ্ঠী বা বর্গ বা শ্রেণী গড়ে উঠেছে। জন্ম-উৎসের দিক থেকে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির এই শ্রেণীবিভাগই তাদের জন্ম-উৎসগত (Genealogical) বা ঐতিহাসিক (Historical) শ্রেণীবিভাগ বা বর্গীকরণ। কোন্ প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে কোন্ কোন্ নব্য ভারতীয় আর্যভাষার জন্ম হয়েছিল তা সংক্ষেপে নিম্নে আলোচিত হল। এ থেকেই তাদের জন্ম-উৎসগত বা ঐতিহাসিক বর্গীকরণের শেষ ধাপটি স্পষ্ট হবে।

পৈশাচী গোষ্ঠী (Paiśācī Group) : অশোকের অনুশাসনের উত্তর-পশ্চিমা (গান্ধারী-উদীচ্য) প্রাকৃত থেকে যে পৈশাচী প্রাকৃতের জন্ম হয়েছিল অনুমান করা হয় সেই পৈশাচী প্রাকৃত থেকে পৈশাচী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের জন্ম হয়। এবং তা থেকে প্রথমে দু'টি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার জন্ম হয়—সিন্ধী ও পঞ্জাবি। পঞ্জাবি পরে দুটি রূপ লাভ করে পূর্বী পঞ্জাবি ও পশ্চিমা পঞ্জাবি বা লহ্ন্দী। পৈশাচী গোষ্ঠীতে পড়ে তা হলে তিনটি নব্য ভারতীয় আর্যভাষা—সিন্ধি, পূর্বী পঞ্জাবি ও পশ্চিমা পঞ্জাবি। সিন্ধি ভাষা কোথাও আরবি-ফারসি লিপিতে, কোথাও লণ্ডা লিপিতে লেখা হয়। এই ভাষা সিন্ধুপ্রদেশ (পাকিস্তান) ও কচ্ছ অঞ্চলে প্রচলিত। পূর্বী পঞ্জাবি গুরমুখী (গুরুমুখী) লিপিতে লেখা হয় এবং পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত। শিখদের মূল ধর্মগ্রন্থ গুরু অর্জুন কর্তৃক সঙ্কলিত 'গ্রন্থ সাহিব' বা 'আদি গ্রন্থ' (১৬০৪ খ্রীঃ) এই পূর্বী পঞ্জাবিতেই লিখিত। পশ্চিমা পঞ্জাবি পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের (পাকিস্তান) ভাষা। এই ভাষা তিনটি ধর্মের লোকেরা তিনটি লিপিতে লিখে থাকেন—শিখরা লণ্ডা লিপিতে, হিন্দুরা দেবনাগরীতে ও মুসলমানেরা আরবি-ফারসি লিপিতে।

মাহারাষ্ট্রী গোষ্ঠী (Māhārāṣṭrī Group) : পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা-র দক্ষিণী শাখা থেকে জাত মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত থেকে মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের জন্ম অনুমিত হয়। এই মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে দু'টি নব্যভারতীয় আর্য ভাষার জন্ম—মারাঠি ও কোঙ্কণী। মাহারাষ্ট্রী গোষ্ঠীর এই দু'টি ভাষাই হল দক্ষিণ ভারতের প্রধান আর্য ভাষা—মারাঠি প্রচলিত মহারাষ্ট্রে, আর কোঙ্কণী প্রচলিত গোয়ায়। মারাঠি এখন দেবনাগরীর ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ বালবোধ লিপিতে লেখা হয়। জ্ঞানদেবের গীতাভাষ্য 'ভাবার্থ-দীপিকা' বা 'জ্ঞানেশ্বরী' (খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী) এই ভাষার প্রাচীন সম্পদ।

শৌরসেনী গোষ্ঠী (Śaurasenī Group) : পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমার উত্তর ভারতীয় শাখা থেকে জন্ম নিয়েছিল শৌরসেনী প্রাকৃত। এই প্রাকৃত থেকে জাত

শৌরসেনী গোষ্ঠীর ভাষাগুলি আবার তিনটি শাখায় বিভক্ত—পাহাড়ীশাখা, মধ্যদেশীয় শাখা এবং পশ্চিমা শাখা। শৌরসেনী থেকে সর্বপ্রথমে একটি শাখা হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে চলে যায় (খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দী)। সেই শাখা থেকে জাত ভাষাগুলিকেই পাহাড়ী বা হিমালয়ী ভাষা বলা হয়। এই শাখায় পড়ে তিনটি ভাষা—নেপালি (এবং গোর্খালি), কুমায়নী এবং গাড়োয়ালি। নেপালি দেবনাগরী লিপিতে লেখা হয়। নেপালি ও গোর্খালি নেপালে ও পশ্চিম বাংলার দার্জিলিং-এ প্রচলিত। সাহিত্য-সমৃদ্ধ নেপালি ভাষার একটি পরিচিত সৃষ্টি হল ভানুভক্তের রামায়ণ (১৮৭০ খ্রীঃ)। পাহাড়ী শাখাটি বেরিয়ে যাবার অনেক পরে মধ্যভারতীয় আর্যের শেষস্তরে শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে শৌরসেনী বা নাগর অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের জন্ম হয়। বিভিন্ন প্রাকৃত থেকে জাত অপভ্রংশগুলির মধ্যে কেবল শৌরসেনী অপভ্রংশেরই সমৃদ্ধ সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়। এই অপভ্রংশ থেকে অবহট্‌ঠ হয়ে দু'টি শাখার জন্ম হয়--মধ্যদেশীয় ও পশ্চিম ভারতীয়। মধ্যদেশীয় শাখা থেকে পাঁচটি নব্য ভারতীয় আর্যভাষার জন্ম হয়েছে--কথ্য হিন্দুস্থানী, ব্রজভাষা, কনৌজী, বুন্দেলী ও বঙ্গারু (বা হরিয়ানী)। এই পাঁচটিকে একত্রে পশ্চিমা হিন্দি বলা হয়। আধুনিক কালে যে হিন্দি ভাষা ব্যাপক প্রসার লাভ করে ভারতের রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত হয়েছে সেটি পশ্চিমা হিন্দির অন্তর্গত একটি ভাষা কথ্য হিন্দুস্থানীর মার্জিত আদর্শায়িত (standardised) রূপ। মাতৃভাষারূপে এই ভাষা মূলত বলা হয় দিল্লি-মিরাট অঞ্চলে। হিন্দি দেবনাগরী লিপিতে লিখিত হয়। দাক্ষিণাত্যে মুসলমান কবিরা যে হিন্দির অনুশীলন করেছিলেন তা দখনী ভাষা নামে পরিচিত। এই দখনীরই একটি রূপ হল উর্দু ভাষা। উর্দু হল বস্তুত হিন্দুস্থানী ভাষারই আরবি-ফারসি শব্দ-বহুল একটি নব রূপায়ণ যা এখন উত্তর ভারতেও বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে প্রচলিত এবং আরবি-ফারসি লিপিতে লিখিত। ব্রজভাষা বা ব্রজভাখা প্রধানত মথুরা, আলিগড়, আগ্রা অঞ্চলে প্রচলিত মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বিশেষ সমৃদ্ধ একটি ভাষা। মীরার ভজনগুলি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যযুগের ব্রজভাষার অনন্য সম্পদ। কনৌজী হল প্রাচীন কান্যকুব্জের ভাষা, এখন মথুরার পূর্বে উত্তর দোয়াব অঞ্চলে প্রচলিত। বুন্দেলী হল বুন্দেলখণ্ডের ভাষা, মধ্যভারতের অংশবিশেষে কথিত হয়। বঙ্গারু বা হরিয়ানীর প্রচলন দক্ষিণ-পূর্ব পঞ্জাবে ও আধুনিক হরিয়ানা রাজ্যে। শৌরসেনী অপভ্রংশের পশ্চিম ভারতীয় শাখা থেকে অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ হয়ে জন্ম নিয়েছে দু'টি নব্য ভারতীয় আর্যভাষা গুজরাটি ও রাজস্থানি। নাম থেকেই বোঝা যায় গুজরাটি হল গুজরাটের এবং রাজস্থানি রাজস্থানের (রাজপুতানার) ভাষা। রাজস্থানিরই পশ্চিমা উপভাষা হল মারোয়াড়ি।

অর্ধমাগধী গোষ্ঠী (Ardha-Māgadhī Group) : প্রাচ্য-মধ্যা থেকে জাত অর্ধমাগধী প্রাকৃত থেকে অর্ধমাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের জন্ম হয়। এই অপভ্রংশ-

অবহট্‌ঠ থেকে তিনটি নব্যভারতীয় আর্যভাষার আবির্ভাব—অবধী (বা আওধী), বাঘেলী ও ছত্তিশগড়ী। তিনটিকে একত্রে পূর্বী হিন্দি বা কোশলী বলা হয়। এই তিনটির মধ্যে প্রাচীন অযোধ্যা অঞ্চলের ভাষা অবধী মধ্যযুগীয় সাহিত্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবত' (খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী) ও তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' (খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী) অবধী ভাষায় রচিত।

মাগধী গোষ্ঠী (Māgadhī Group) : প্রাচ্যা থেকে জাত মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের জন্ম অনুমান করা হয়। মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের কোনো লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় নি। মাগধী গোষ্ঠীর ভাষাগুলি দু'টি শাখায় বিভক্ত—পশ্চিমা শাখা ও পূর্বী শাখা। পশ্চিমা শাখা থেকে জন্ম হয়েছে তিনটি আধুনিক ভাষার—মৈথিলী, মগহী ও ভোজপুরী। পূর্বী শাখা থেকে প্রথমে দু'টি উপশাখা বা দুটি আধুনিক ভাষার জন্ম হয়—ওড়িয়া এবং বঙ্গ-অসমিয়া। বঙ্গ-অসমিয়া আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দু'টি ভাষার জন্ম দেয়—বাংলা ও অসমিয়া। ভোজপুরী পশ্চিম বিহারে—বারাণসী-ভোজপুর-রোহতাস-সাসারামে—প্রচলিত। মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি কবীরের দোহাগুলি (খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দী) ভোজপুরী ভাষাতেই রচিত। মগহী হল প্রাচীন মগধের (আধুনিক মধ্যবিহারের) ভাষা, তার কেন্দ্র হল পাটনা-গয়া-মুঙ্গের-হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চল। আর মৈথিলী হল প্রাচীন মিথিলা—আধুনিক উত্তর বিহারের (ভাগলপুর, মজফ্‌ফরপুর) ইত্যাদি অঞ্চলের ভাষা। পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বিদ্যাপতির রচনায় সমৃদ্ধ এই ভাষার সঙ্গে একদা বাংলা ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ভোজপুরী ও মৈথিলী ভাষায় আধুনিক কালে আবার সাহিত্যরচনা সূচিত হয়েছে এবং এই দুটি ভাষা এখন দেবনাগরী লিপিতেই লেখা হয়। পূর্বী মাগধীয় তিনটি ভাষা বাংলা, অসমিয়া ও ওড়িয়ার মধ্যে ওড়িয়া ভাষার পৃথক লিপি আছে। বাংলা ও অসমিয়া মূলত একই লিপিতে লেখা হয়, এই তিনটি ভাষাই সাহিত্যে সমৃদ্ধ, বিশেষ করে বাংলা রবীন্দ্রখ্যাতিতে আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করেছে। মাধবকন্দলী রচিত রামায়ণ (খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দী) ও বৈষ্ণব কবি শঙ্করদেব রচিত পদাবলী ও নাটক (খ্রীঃ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী) প্রাচীন ও মধ্যযুগের অসমিয়া ভাষার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। অসমিয়া ও ওড়িয়া যথাক্রমে মূলত আসাম ও উড়িষ্যায় প্রচলিত। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা, ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজের কোনো কোনো অঞ্চলেও ওড়িয়া ভাষা প্রচলিত। বাংলার প্রচলন—পশ্চিম বাংলা, বাংলাদেশ, আসাম ও বিহারের কোনো কোনো অঞ্চলে।

দরদীয় গোষ্ঠী (Dardic Group) : জর্জ আব্রাহাম্ গ্রীয়ার্সন্ ইরানীয় ও ভারতীয় আর্যের মধ্যবর্তী দরদীয় নামে যে তৃতীয় আর্য শাখা অনুমান

করেছিলেন সেই শাখা থেকে জাত একটি ভাষা কাশ্মীর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। এইটি হল কাশ্মীরী ভাষা। কাশ্মীরী ভাষায় অনেক সাহিত্য লেখা হয়েছে। পূর্বে এই ভাষা লেখা হত শারদা লিপিতে, এখন লেখা হয় ফারসি লিপিতে।

ইরানীয় গোষ্ঠী (Iranian Group) : প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে মধ্য ভারতীয় আর্য হয়ে না এসে সোজাসুজি ইরানীয় শাখা থেকে জন্ম লাভ করেছে এমন দুটি ভাষা ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রচলিত আছে। এ দুটি হল আফগানিস্তানের ভাষা আফগান বা পশ্‌তো (বা পখ্‌তো) এবং বেলুচিস্তানের ভাষা বেলুচী। ভারতীয় আর্যভাষার প্রসঙ্গে গ্রীয়ার্সন এই দুটি ভাষার কথা আলোচনা করেছেন। ইরানীয় শাখাও আর্যভাষা সন্দেহ নেই, কিন্তু এগুলি এখন ভারতের বাইরে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে পড়ে গেছে বলে এখন এগুলিকে ঠিক ভারতীয় ভাষা বলা যায় না।

সিংহলী (Cylonese) ও জিপ্‌সী (Gupsy) : ভারতীয় আর্যভাষা থেকে জাত অথচ ভারতের বাইরে প্রচলিত দুটি ভাষা হল সিংহলী ও জিপ্‌সী। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা প্রাচ্যা প্রাকৃতের একটি শাখা আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৪০০ অব্দে সিংহলে (শ্রীলঙ্কায়) চলে যায়। এই শাখা থেকে সিংহলে প্রচলিত আধুনিক সিংহলী ভাষার জন্ম। মাগধীর পূর্বরূপ থেকেই বিবর্তনের ফলে এর জন্ম বলে একে ব্যাপক অর্থে মাগধী গোষ্ঠীর ভাষা বলা যায়। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি আর্যশাখা ভারতের বাইরে চলে যায়। এই শাখা থেকে জাত জিপ্‌সী ভাষা (বা যাযাবরী ভাষা) ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত আছে। অনুমান করা যায় এটি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মধ্য ভারতীয় আর্যের বংশধর ; সুতরাং এটি পৈশাচী গোষ্ঠীর সঙ্গেই সম্পৃক্ত।

এখন চিত্রগুলির সাহায্যে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির জন্ম-উৎসগত বা ঐতিহাসিক বর্গীকরণ সংক্ষেপে দেখানো হল (চিত্র নং ৫৪—ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ)।[৬০]

৬০। নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির বিস্তৃত পরিচয়ের জন্যে দ্রষ্টব্য : (ক) Languages and Literatures of Modern India–Prof. Suniti Kumar Chatterji (Prakash Bhavan, 1963) এবং (খ) 'আধুনিক ভারতীয় ভাষা প্রসঙ্গে' —ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার (সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯৮৭)।
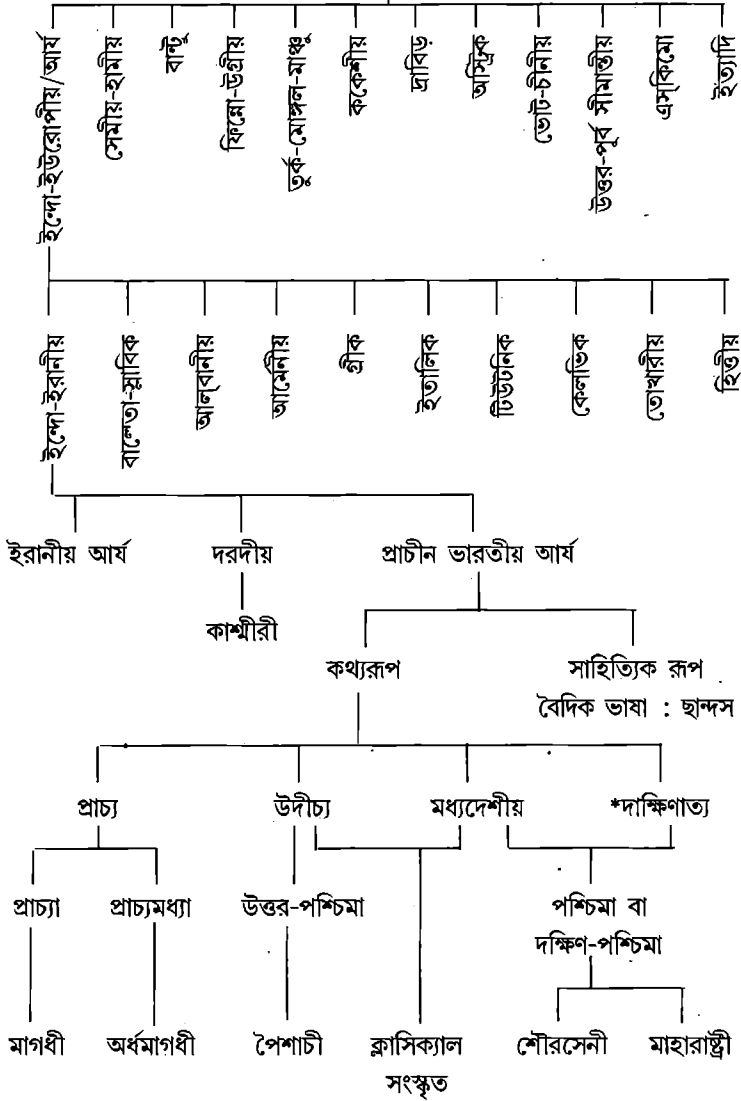
চিত্র নং ৫৪ (ক) : নব্যভারতীয় আর্যভাষার ঐতিহাসিক বা জন্ম-উৎসগত বর্গীকরণ।
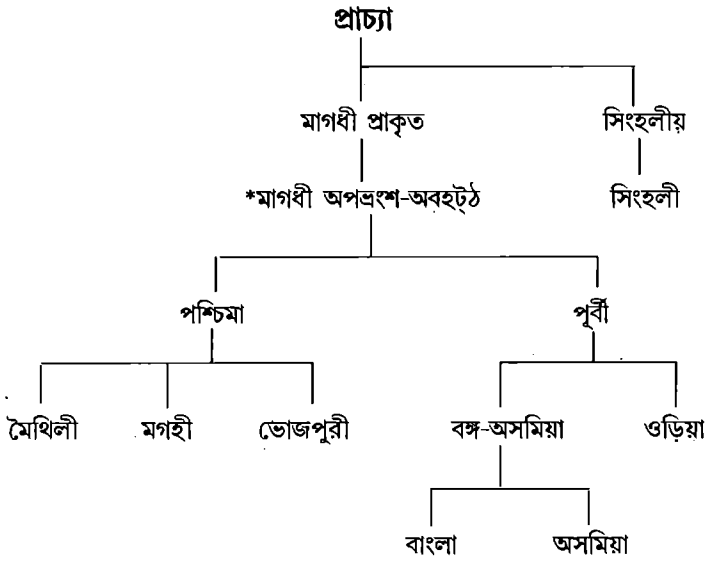
চিত্র নং ৫৪ (খ) : নব্যভারতীয় আর্যভাষার ঐতিহাসিক বা জন্ম-উৎসগত বর্গীকরণ।
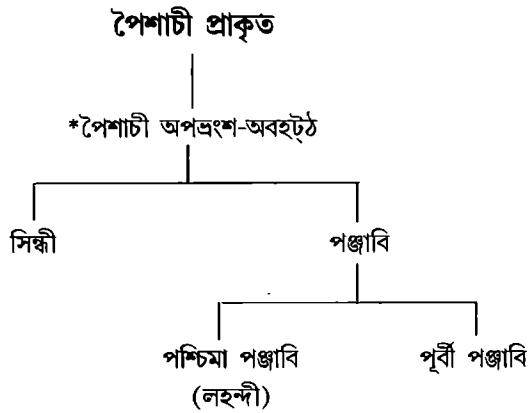
চিত্র নং ৫৪ (গ) : নব্যভারতীয় আর্যভাষার ঐতিবাসিক বা জন্ম-উৎসগত বর্গীকরণ।
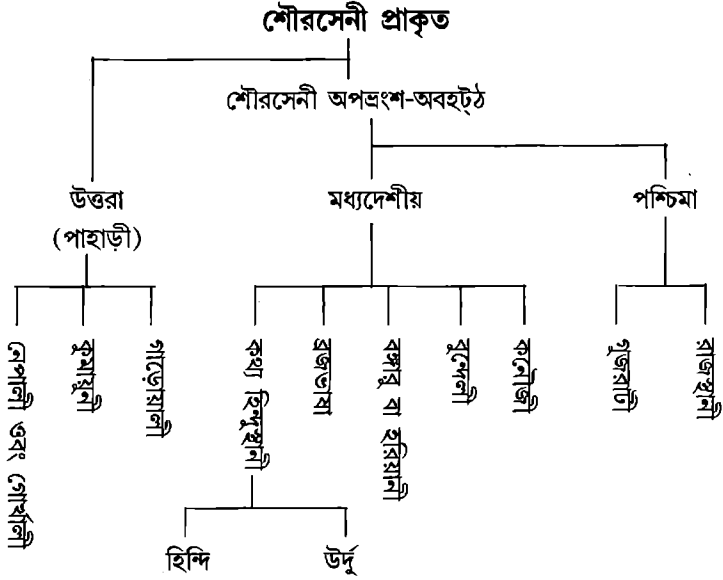
চিত্র নং ৫৪(ঘ) : নব্যভারতীয় আর্যভাষার ঐতিহাসিক বা জন্ম-উৎসগত বর্গীকরণ
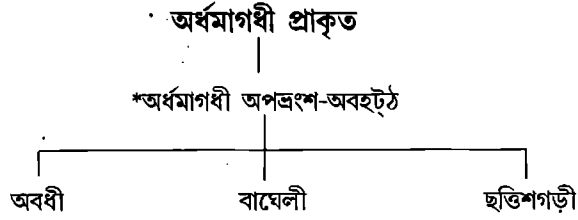
চিত্র নং ৫৪(ঙ) : নব্যভারতীয় আর্যভাষার ঐতিহাসিক বা জন্ম-উৎসগত বর্গীকরণ
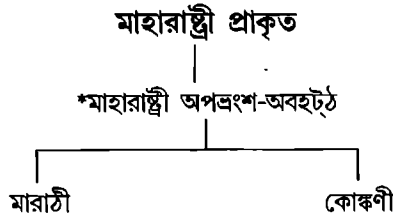
চিত্র নং ৫৪(চ) : নব্যভারতীয় আর্যভাষার ঐতিহাসিক বা জন্ম-উৎসগত বর্গীকরণ

নব্য ভারতীয় আর্যভাষার ভৌগোলিক বর্গীকরণ (Geographical Classification of New Indo-Aryan) : মোটামুটিভাবে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুসরণে নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলির বর্তমান অবস্থান (distribution) বা প্রচলন-ক্ষেত্রের সঙ্গে ইতিহাসের যোগ রেখে এগুলির ভৌগোলিক বর্গীকরণ করা যায় এইভাবে[৬১]—

(১) উত্তর-পশ্চিমা (উদীচ্য)—সিন্ধি ও পঞ্জাবি।

(২) মধ্যদেশীয়—পশ্চিমা হিন্দি (অর্থাৎ কথ্য হিন্দুস্থানী, ব্রজভাষা, বুন্দেলী, বঙ্গারু ও কনৌজী), পূর্বী পঞ্জাবি, রাজস্থানি, গুজরাটি।

(৩) প্রাচ্য :—বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী।

(৪) দাক্ষিণাত্য :—মারাঠি ও কোঙ্কণী।

(৫) প্রাচ্য-মধ্য :—অবধী, বাঘেলী, ছত্তিশগড়ী।

(৬) উত্তরা বা হিমালয়ী :—গোর্খালি ও নেপালি, কুমায়ুনী, গাড়োয়ালি।

॥ ৪৫ ॥

নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ বা ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
(Common Linguistic Features of New Indo-Aryan)

অপেক্ষাকৃত দূরতর উৎসের বিচারে ভারতের সব নবীন আর্যভাষাই এক উৎস থেকে জাত। সেই উৎসটি হল প্রাচীন ভারতীয় আর্য বৈদিক সংস্কৃত। কিন্তু যদি নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির অব্যবহিত জন্ম-উৎস বিচার করি তা হলে দেখব, সব নব্য ভারতীয় আর্যভাষা এক উৎস থেকে জন্ম লাভ করে নি। প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে যে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা প্রাকৃত-অপভ্রংশের জন্ম, সেই প্রাকৃত-অপভ্রংশই হল নব্যভারতীয় আর্য ভাষাগুলির অব্যবহিত জন্ম-উৎস। ড. সুকুমার সেন বলেছেন, "নব্য ভারতীয়-আর্যভাষাগুলি এক মূল অপভ্রষ্ট ও তাহার কাণ্ড প্রত্ন নব্যভারতীয় আর্য হইতে উদ্‌গত", কিন্তু বাস্তবে একটিমাত্র মূল অপভ্রংশ-অপভ্রষ্ট থেকে সব নব্য ভারতীয় আর্যভাষা জন্মলাভ করে নি বা অপভ্রংশ-অপভ্রষ্ট স্তরে ভারতীয় আর্যভাষার একটি মাত্র রূপ ছিল না, অপভ্রষ্টের সাহিত্যিক নিদর্শনে আঞ্চলিক রূপভেদের চিহ্ন বিশেষ দেখা না

৬১। Chatterji, Dr. Suniti Kumar : *Languages and Literatures of Modern India,* Calcutta, 1963, p. 32.

গেলেও তার কথ্যরূপে নিশ্চয়ই আঞ্চলিক পার্থক্য ছিল, যে পার্থক্য অনেক আগে থেকে ভারতীয় আর্যভাষায় সূচিত হয়েছিল। প্রাকৃত-অপভ্রংশের এই যেসব আঞ্চলিক রূপভেদ বা উপভাষা ছিল সেই সব রূপভেদ থেকে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় আরো আঞ্চলিক রূপভেদের ফলেই নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলি পৃথক পৃথক রূপলাভ করেছে। ফলে এদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। কিন্তু এদের প্রত্যেকের পার্থক্যটি বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচ্য নয়। বিবর্তনের ধারায় ভারতের আর্যভাষাগুলি কালগত বিচারে যে নব্য ভারতীয় আর্য-পর্বে পদার্পণ করল, সেই পর্বের নবীনতার কিছু সাধারণ চিহ্ন আছে। নব্যভারতীয় আর্যভাষার নব্যতার যে সাধারণ অভিজ্ঞানগুলি তাদের পূর্ববর্তী পর্ব থেকে ভিন্নতর পর্বে এনে দিল ইতিহাসের ধারা বিচারে সেইগুলিই গুরুত্বপূর্ণ। নব্য-ভারতীয় আর্যভাষার এই সব সাধারণ লক্ষণ বা ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হল :

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিষম ব্যঞ্জনের মিলনে গঠিত যুক্ত-ব্যঞ্জন মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় সমীভবনের নিয়মে সম ব্যঞ্জনে গঠিত যুগ্ম-ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছিল। যেমন—নৃত্য > নচ্চ, বর্গ (= বর্‌গ) > বগ্গ, পক্ব > পক্ক, অক্ষি > অক্‌খি, হস্ত > হত্ত। এই সমব্যঞ্জনে গঠিত যুগ্ম-ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জন নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় লোপ পেল এবং এই লোপের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হল। ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের ক্ষতিপুরণ স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বরের এই দীর্ঘীভবনকে বলে মাত্রাপূরক বা ক্ষতিপূরকা দীর্ঘীভবন (Compensatory Lengthening)। যেমন—নচ্চ > নাচ (বাংলা), বগ্গ > বাগ (হিন্দি), পক্ক > পাক (হিন্দি), অক্‌খ > আঁখ (হিন্দি), হত্থ > হাথ (হিন্দি)/হাত (বাংলা)। উত্তর-পশ্চিমা প্রথমাবধি একটু রক্ষণশীল বলে এই উৎস থেকে জাত ভাষাগুলিতে (সিন্ধি, পঞ্জাবি) এই রকমের পরিবর্তন হয় নি। যেমন—কর্ম্ম > প্রাকৃত কম্ম্ > পঞ্জাবি কম্ম্, হস্ত > প্রাকৃত হত্ত > পঞ্জাবি > হত্থ্।

(খ) যে যুক্তব্যঞ্জনের প্রথম ধ্বনি নাসিকা ব্যঞ্জন (ঙ্, ঞ্, ণ, ন্, ম্) সেই যুক্তব্যঞ্জনের নাসিক্য ব্যঞ্জনটি লোপ পেয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ স্বরধ্বনি হয়ে অনুনাসিক হয়ে গেছে। যেমন—কণ্টক > প্রাকৃত > কন্টঅ > বাংলা কাঁটা। পঞ্চ > বাংলা ও হিন্দি পাঁচ। দন্ত > বাংলা ও হিন্দি দাঁত। কিন্তু পঞ্জাবি ও সিন্ধিতে এই নাসিক্য ব্যঞ্জনটি লোপ পায় নি, ফলে পূর্ববর্তী স্বর

অনুনাসিকও হয় নি। যেমন—কণ্টক > প্রাকৃত কণ্টঅ· > সিন্ধি কণ্ডো, দন্ত > পঞ্জাবি দন্ধ, সিন্ধি দন্দু।

(গ) পদের অন্তে অবস্থিত স্বরধ্বনি প্রায়ই লুপ্ত হয়েছে অথবা বিকৃত হয়েছে। যেমন—সংস্কৃত রাম (র্ + আ + ম্ + অ) > বাংলা, হিন্দি রাম্ (র্ + আ + ম্), অগ্নি > হিন্দি আগ্। দধি > হিন্দি দহী। পদান্তিক স্বরধ্বনি অবশ্য অনেকটা রক্ষিত হয়েছে ওড়িয়া ভাষায় ; যেমন—ওড়িয়া রাম = র্ + আ + ম্ + অ।

(ঘ) দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জন মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার কোনো কোনো উপভাষায় লুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু ঐ ব্যঞ্জনের সংশ্লিষ্ট স্বরটি লোপ পেত না। এই সংরক্ষিত স্বরকে বলা হয় অবশিষ্ট বা উদ্বৃত্ত স্বর (residual vowel)। যেমন ঘৃত (ঘ্ + ঋ + ত্ + অ) > ঘিঅ (ঘ্ + ই + অ)। এখানে 'ত্' লোপ পেয়েছে, এবং তৎসংলগ্ন 'অ' থেকে গেছে। এই 'অ' হল অবশিষ্ট বা উদ্বৃত স্বর। নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলিতে এই ধরনের উদ্বৃত্ত স্বরের নানা রকম পরিণতি হয়েছে। কখনো এই উদ্বৃত্ত স্বর লোপ পেয়েছে। যেমন—ঘৃত > ঘিঅ > বাংলা ঘী, মৌক্তিক > মোত্তিঅ > বাংলা ও হিন্দি মোতী। কখনো উদ্বৃত্ত স্বরটির সঙ্গে পার্শ্ববর্তী স্বরের সন্ধি হয়ে গেছে। যেমন গত > গঅ, গঅ। ইল্ল > বাংলা গেল (অ + ই = এ) কখনো বা উদ্বৃত্ত স্বরটি পার্শ্ববর্তী স্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে দ্বিস্বরে (Diphthong) পরিণত হয়েছে। যেমন—বধূ > বউ > বৌ, মধু > মউ > মৌ (বাংলা)।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে লিঙ্গ নির্ণয় করা হত অনেক ক্ষেত্রে পদান্তিক স্বরধ্বনি অনুসারে। যেমন—ঈ-কারান্ত শব্দ 'নদী'—স্ত্রী লিঙ্গ, আ-কারান্ত শব্দ 'লতা' —স্ত্রী লিঙ্গ। পদের অন্তে অবস্থিত স্বরধ্বনি বিকৃত অথবা লুপ্ত হওয়ায় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার লিঙ্গবিধি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় থাকে নি। নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় লিঙ্গবিধি অনেক ক্ষেত্রে নতুন ধরনের। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে লিঙ্গ নির্ণীত হত অনেক ক্ষেত্রে শব্দের অর্থ নিরপেক্ষভাবে শব্দের গঠন অনুসারে। ফলে অপ্রাণীবাচক শব্দও কখনো কখনো ক্লীবলিঙ্গ না হয়ে স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ হয়েছে। যেমন সংস্কৃতে 'লতা' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু অনেক নব্য ভারতীয় আর্যে লিঙ্গ নির্ণয় করা হয় শব্দের অর্থ অনুসারে। যেমন—বাংলায় পুরুষবোধক শব্দ পুংলিঙ্গ, স্ত্রীবোধক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ; অপ্রাণীবোধক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ (যেমন—

'লতা' শব্দ বাংলায় ক্লীবলিঙ্গ)। আর কোনো কোনো নব্যভারতীয় আর্যভাষায় শব্দের লিঙ্গ অর্থনিরপেক্ষ হলেও সংস্কৃতের লিঙ্গ-বিধি থেকে তা স্বতন্ত্র হয়ে নিজস্ব প্রথানুসারে গড়ে উঠল। যেমন—সংস্কৃতে 'দধি' শব্দ ছিল ক্লীবলিঙ্গ, কিন্তু নব্য ভারতীয় আর্য হিন্দিতে দধি থেকে জাত শব্দ 'দহী' হল পুংলিঙ্গ, সিন্ধিতে 'দহী' স্ত্রীলিঙ্গ, মারাঠিতে 'দহি' ক্লীবলিঙ্গ। সংস্কৃতে 'রশ্মি' পুংলিঙ্গ, কিন্তু হিন্দিতে 'রশ্মি' স্ত্রীলিঙ্গ। সংস্কৃতে আত্মা (< আত্মন্) পুংলিঙ্গ, হিন্দিতে আত্মা স্ত্রীলিঙ্গ। বাংলা, গুজরাটি, সিন্ধি ভাষা ছাড়া অন্য নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় ক্লীবলিঙ্গ অপ্রচলিত হয়ে গেছে ; সাধারণত ক্লীবলিঙ্গবাচক শব্দ হয় স্ত্রীলিঙ্গ, নয় পুংলিঙ্গ রূপে স্বীকৃত হয়েছে। যেমন—সংস্কৃতে 'ফল' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, কিন্তু হিন্দিতে 'ফল' শব্দ হয়েছে পুংলিঙ্গ। বাংলা সর্বনামে পুং লিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ভেদ নেই ('আমি', 'তুমি', 'সে'—পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ দুই-ই)।

(খ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় প্রত্যেক কারকের সুনির্দিষ্ট বিভক্তি ছিল এবং শব্দের সঙ্গে এইসব বিভক্তি যুক্ত হওয়ার ফলে প্রায় প্রত্যেক কারকে শব্দের স্বতন্ত্র রূপ হত। কিন্তু নব্য ভারতীয় আর্যে এই বিভক্তিগুলি প্রায় সবই লুপ্ত হল। মাত্র দু'-একটি প্রাচীন বিভক্তির পরিবর্তিত রূপ রয়ে গেল। যেমন—গৃহাণাম্ > পঞ্জাবি ঘরাঁ। আর যেসব ক্ষেত্রে প্রাচীন বিভক্তিগুলি লুপ্ত হল সেসব ক্ষেত্রে বিভক্তির অর্থ প্রকাশের জন্যে নতুন প্রত্যয়, প্রত্যয়স্থানীয় শব্দ ও অনুসর্গের ব্যবহার প্রচলিত হল। যেমন—সম > হিন্দি সে (কলম সে = কলমের দ্বারা, ঘর সে = ঘর থেকে)। কর- > -অর > বাংলা -র (যেমন ঘড়ির), *কের- > বাংলা -এর (যেমন—ঘরের)। অগ্র- > বাংলা আগে (আমার আগে তোমাকে মরতে হবে), কক্ষ- > বাংলা কাছ (আমার কাছে বসো)। কিছু কিছু অনুসর্গের অবক্ষয়িত রূপ বিভক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিছু কিছু অনুসর্গের অবক্ষয়িত রূপ বিভক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—অনুসর্গ 'কৃত' > বাংলা-কে, হিন্দি -কো (বাংলা রামকে, হিন্দি রামকো)।

(গ) শব্দরূপের বিচারে নব্যভারতীয় আর্য ভাষায় কারক পাই দু'টি—মুখ্য কারক (Direct case) বা কর্তৃকারক এবং গৌণকারক বা তির্যক্ কারক (Oblique case)। সংস্কৃতে কর্তৃকারকের নিজস্ব বিভক্তি ছিল প্রথমা বিভক্তি। নব্য ভারতীয় আর্যে প্রথমায় প্রায়ই শূন্য বিভক্তি (অর্থাৎ বিভক্তিহীনতা) দেখা যায়। এ ছাড়া তৃতীয়ার অবক্ষয়-জাত বিভক্তিও নব্য ভারতীয় আর্যে কর্তৃকারকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন—সংস্কৃতে অনুক্ত কর্তায় যে তৃতীয়া বিভক্তির ব্যবহার ছিল তার অবক্ষয়িত রূপ থেকে বাংলায় কর্তৃকারকের -'এ' বিভক্তির

প্রচলন বলে অনেকে মনে করেন। (সংস্কৃত 'পুত্রেণ খাদ্যতে' > অপভ্রংশ 'পুত্তে খাইঅই' > বাংলা 'পুতে খায়')। অর্থাৎ মুখ্য কারকে (কর্তৃকারকে) হয় শূন্য বিভক্তি, নয় তৃতীয়ার অবক্ষয়জাত বিভক্তি প্রচলিত হল। আর গৌণ কারকে বা তির্যক কারকে ষষ্ঠী বিভক্তি বা সপ্তমী বিভক্তি যোগ করে তার সঙ্গে অনুসর্গ যোগের রীতি প্রচলিত হল। যেমন—বাংলা 'আমার সঙ্গে', হিন্দি 'মেরে সাথ্'।

(ঘ) অধিকাংশ নব্যভারতীয় আর্যভাষায় একবচন ও বহুবচনের রূপভেদ রইল না। সেসব ভাষায় বহুবচন বোঝায় শব্দের পৃথক্ রূপ দিয়ে নয়, বহুত্ববাচক পৃথক শব্দ দিয়ে অথবা ষষ্ঠী বিভক্তির অবক্ষয়িত রূপ দিয়ে। যেমন—বাংলা পুরুষ + এর (ষষ্ঠী বিভক্তি) = পুরুষের > পুরুষেরা। কিন্তু পশ্চিমা হিন্দি, সিন্ধি, মারাঠি প্রভৃতি কয়েকটি নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় একবচন ও বহুবচনের পৃথক রূপ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—পশ্চিমা হিন্দি একবচন—লড়কা, বহুবচন—লড়কে, একবচন—বাত, বহুবচন—বাতেঁ (< বার্তানি)। এরকম রূপভেদ অবশ্য পশ্চিমা হিন্দিতেও সব শব্দের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। কোনো কোনো শব্দের বহুবচনে পৃথক্ রূপ হয় না, বহুত্ববোধক শব্দ যোগ করে বহুবচন প্রকাশ করা হয়। যেমন—হিন্দিতে একবচন—সন্ত্, বহুবচন—সন্তলোগ্, একবচন—আপ্, বহুবচন—আপ্লোগ্। বিভক্তি যোগ না করে শুধু শব্দের দ্বিত্ব করে অনেক ক্ষেত্রে বহুবচন প্রকাশ করা হয়। যেমন—বাংলা 'দলে দলে যোগদান করুন', হিন্দি 'বাত বাত মে' (= কথায়-কথায়)।

(ঙ) নব্যভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ারূপেও সরলীকরণ হয়েছে খুব বেশি। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে ক্রিয়ার পাঁচ ভাবে (Mood) ও পাঁচ কালে পৃথক পৃথক্ রূপ ছিল, এই রূপবৈচিত্র্য সাধিত হত পৃথক পৃথক বিভক্তি যোগ করে। নব্য ভারতীয় আর্যে শুধু কর্তৃবাচ্যে ও কর্মভাব বাচ্যে বর্তমানের বিভক্তি-ঘটিত রূপ-স্বাতন্ত্র্য বজায় আছে, আর ভাবের মধ্যে শুধু বর্তমান কালে নির্দেশক ও অনুজ্ঞার স্বতন্ত্র রূপ আছে। অন্যদিকে অতীত কালের রূপ রচিত হয় নিষ্ঠা প্রত্যয়, আর ভবিষ্যৎ কালের রূপ রচিত হয় শতৃ প্রত্যয় যোগে। যেমন √ চল্ + ক্ত = চলিত-এর অনুসরণে √ চল্ + ইল্ল বাংলা—চলিল, ভোজপুরী—চলল (এখানে ক্ত / ইল্ল হল নিষ্ঠা প্রত্যয়)। শতৃ-প্রত্যয় তব্য > অব / ইব ; √ চল্ + অব = ভৌজপুরী চলব।

(চ) নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় একাধিক ধাতুর সংযোগে গঠিত যৌগিক কালের রূপ দেখা দিল। যেমন—বাংলা √ কর + ইয়া (এ) + √ আছ্ + এ = করেছে। (এখানে কর্ ও আছ্—দুটি ধাতু মিলে একটি ক্রিয়া গঠিত হয়েছে)।

(৩) বাক্য গঠনগত ও ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য :

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যে গঠিত বাক্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলিতেও কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের বাক্যের গঠনে পার্থক্য আছে। তবে ঐতিহাসিক বিচারে দেখা যায়—প্রাচীন ভারতীয় আর্যের কর্মবাচ্যের বাক্য পরিবর্তিত হয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নব্য ভারতীয় আর্যে কর্তৃবাচ্যের বাক্যরূপে প্রচলিত হয়েছে। যেমন—অস্মাভিঃ পুস্তিকা পঠিতা (কর্মবাচ্য) > আমি পুথি পড়ি (কর্তৃবাচ্য)। আরো একটি লক্ষণীয় দিক হল—ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে কর্মবাচ্যে গঠিত বাক্যের বহুল প্রচলন ছিল, কিন্তু নব্য ভারতীয় আর্যে কর্মবাচ্যের বাক্যের ব্যবহার সাধারণ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম। শুধু বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মবাচ্যের ব্যবহার শোভন মনে হয়। যেমন—বাংলায়—আমাকে দিয়ে একাজ হবে না (কর্মবাচ্য), হিন্দিতে মুঝসে যহ্ কাম্ নহী হোগা (কর্মবাচ্য)। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কর্মবাচ্যের ব্যবহার বেশি নেই।

(খ) বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের (Parts of Speech) স্বতন্ত্র বিভক্তিচিহ্ন নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় অনেক ক্ষেত্রে লোপ পেয়েছে। ফলে বাক্যে কোন্ পদ কর্তা, কোন্‌টি কর্ম ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে বিভক্তিচিহ্ন থেকে চেনা যায় না, বাক্যের মধ্যে পদের অবস্থান থেকে চেনা যায়। এইজন্যে বাক্যে অনেক ক্ষেত্রে কর্তা, কর্ম প্রভৃতি পদের স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে, এই স্থান পরিবর্তন করে দিলে বাক্যের অর্থ বিপর্যস্ত হয়। যেমন : বাংলায়—'মানুষ কোনো কোনো বন্যপ্রাণী খায়' (এখানে 'মানুষ' কর্তা, বাক্যের আদিতে বসেছে)। কিন্তু 'কোনো কোনো বন্যপ্রাণী মানুষ খায়' (এখানে মানুষ কর্ম, ক্রিয়ার আগে বসেছে)।

(গ) নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় ছন্দোরীতি হল মাত্রামূলক ও সমমাত্রিক এবং অধিকাংশ ছন্দে অন্ত্যানুপ্রাস প্রচলিত হল। অতি আধুনিক কালে নব্য আর্যভাষাগুলিতে গদ্যচ্ছন্দের ব্যবহার বহু প্রচলিত হওয়ায় সমমাত্রিক অনুপ্রাসযুক্ত ছন্দোরীতিও প্রায় অচল হয়ে গেছে।

॥ ৪৬ ॥

বাংলা ভাষার উৎস, ইতিহাস ও যুগবিভাগ

(The Origin, History and Periodisation of the Bengali Language)

একথা আমরা জানি যে, সারা পৃথিবীর প্রায় চার হাজার ভাষাকে তাদের মূলীভূত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রধানত তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পদ্ধতির সাহায্যে এই ক'টি ভাষাবংশে (Language Families) বর্গীকৃত করা হয়েছে—(১) ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য (Indo-European or Aryan), (২) সেমীয়-হামীয় (Semito-Hamitic), (৩) বান্টু (Bantu), (৪) ফিন্নো-উগ্রীয় (Finno-Ugrian), (৫) তুর্ক-মোঙ্গোল-মাঞ্চু (Turk-Mongol-Manchu), (৬) ককেশীয় (Caucasian), (৭) দ্রাবিড় (Dravidian), (৮) অস্ট্রিক (Austric), (৯) ভোট-চীনীয় (Sino-Tibetan), (১০) উত্তর-পূর্ব সীমান্তীয় (Hyperborean), (১১) এস্‌কিমো (Esquimo), (১২) আমেরিকার আদিম ভাষাগুলি (American Indian Languages) ইত্যাদি।

এইসব ভাষাবংশের মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষাবংশটি নানা কারণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত এই ভাষাবংশ থেকে জাত আধুনিক ভাষাগুলি পৃথিবীর বহু অঞ্চলে—দুই বিশাল মহাদেশ ইউরোপ ও এশিয়ার অনেকাংশে—প্রচলিত আছে। দ্বিতীয়ত শুধু ভৌগোলিক বিস্তারে নয়, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতে এই ভাষাবংশ থেকে জাত প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলি পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করেছে। এই বংশের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত, গ্রীক ও লাতিন পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রাচীন ভাষা। বৈদিক সংহিতার সূক্তগুলি সংস্কৃতের মহাকবি ব্যাস-বাল্মীকির মহাভারত-রামায়ণ, কালিদাসের কাব্য-নাটকাদি, গ্রীকের মহাকবি হোমরের ইলিয়দ-অদিসি, লাতিন কবি ভার্জিলের ইনিদ ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের প্রাচীন সাহিত্যকীর্তি। এই বংশের আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, ইতালীয়, বাংলা প্রভৃতি ভাষা সাহিত্যসৃষ্টিতে এত বেশি সমৃদ্ধ যে ইংরেজ কবি-নাট্যকার শেক্‌স্‌পীয়র, জার্মান কবি-নাট্যকার গ্যেটে, শীলার, কবি রিল্‌কে, ফরাসি সাহিত্যিক ভল্‌তেয়র, মলেয়র, মালার্মে, ভালেরি, ইতালীয় কবি পেত্রার্ক, দান্তে, নন্দনতত্ত্ববিদ্‌ ক্রোচে আর বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথের অবদান এখন কোনো ভাষাবিশেষের বা ভাষাবংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যেরই সম্পদ রূপে বিবেচিত। বাংলা ভাষার গর্ব এই যে, বাংলা ভাষা এই

সমৃদ্ধ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশেরই একটি ভাষা। বাংলা ভাষার এই বংশগৌরবের কথা স্মরণ করেই একালের একজন প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ববিদ্ সিদ্ধান্ত করেছেন :

> "সম্প্রতি হয়তো বাঙলা ভাষা হাজার বছরে পা দিয়েছে..., কিন্তু বংশ-কৌলীন্যে তা পৃথিবীর এক মহান ভাষা-পরিবারের উত্তরাধিকার অর্জন করেছে।"[৬২]

এই ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষাবংশই হল বাংলা ভাষার আদি উৎস। তবে এই আদি উৎস থেকে বিবর্তনের পরবর্তী ধাপেই বাংলা ভাষার জন্ম হয় নি, ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ধারায় মধ্যবর্তী অনেকগুলি স্তর পেরিয়ে বাংলা ভাষা জন্মলাভ করেছে। ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষাবংশ থেকে ক্রমবিবর্তনের ধারায় বাংলা ভাষার জন্মকাহিনীটি সংক্ষেপে এই রকম :

ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী তাদের আদি বাসস্থান দক্ষিণ রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশ থেকে আনুমানিক ২৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। এই বিস্তারের পরে তাদের ভাষায় ক্রমশ আঞ্চলিক পার্থক্য বৃদ্ধির ফলে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে প্রথমে দশটি প্রাচীন ভাষা বা প্রাচীন শাখার জন্ম হয়। এগুলি হল—(১) ইন্দো-ইরানীয় (Indo-Iranian), (২) বাল্তো-স্লাবিক (Balto-Slavic), (৩) আল্বানীয় (Albanian), (৪) আর্মেনীয় (Armenian), (৫) গ্রীক্ (Greek), (৬) ইতালিক্ বা লাতিন (Italic/Latin), (৭) টিউটনিক্ বা জার্মানিক্ (Teutonic/Germanic), (৮) কেলতিক্ (Celtic), (৯) তোখারীয় (Tokharian) এবং (১০) হিত্তীয় (Hittite)।

এই শাখাগুলির মধ্যে শুধু ইন্দো-ইরানীয় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের 'আর্য' নামে অভিহিত করত বলে সঙ্কীর্ণ অর্থে অনেকে শুধু ইন্দো-ইরানীয় শাখাটিকে আর্য শাখা বলে থাকেন, যদিও ব্যাপক অর্থে সমগ্র ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশকেই আর্য ভাষাবংশ বলা হয়। যাই হোক, ইন্দো-ইরানীয়

৬২। মজুমদার, ড. পরেশচন্দ্র : 'বাঙলা ভাষা পরিক্রমা' (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ১৩৮৩, পৃঃ ৪।

শাখাটি দুটি উপশাখায় বিভক্ত হয়ে যায় : ইরানীয় (Iranian) ও ভারতীয় আর্য (Indo-Aryan)। ইরানীয় উপশাখাটি ইরান-পারস্যে চলে যায়। তার প্রাচীনতম সাহিত্যকীর্তি হল 'আবেস্তা' (Avesta) নামক ধর্মগ্রন্থ (৮০০ খ্রীঃপূঃ)। আর ভারতীয় আর্য উপশাখাটি ভারতে প্রবেশ করে আনুমানিক ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। সেদিন থেকে ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাসের সূচনা এবং আজ পর্যন্ত এই আর্যভাষা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে বিকাশ লাভ করে চলেছে। যীশুখ্রীস্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে থেকে যীশুখ্রীস্টের জন্মের পরে প্রায় দু'হাজার বছর পর্যন্ত—ভারতীয় আর্য ভাষার এই প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের ইতিহাসকে বিবর্তনের স্তরভেদে প্রধানত তিনটি যুগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indo-Aryan = OIA) : আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ থেকে ৬০০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত। এ যুগের আর্যভাষার নাম দিতে পারি—বৈদিক ভাষা বা ব্যাপক অর্থে সংস্কৃত ভাষা। এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ঋগ্বেদ-সংহিতা।

(২) মধ্য ভারতীয় আর্য (Middle Indo-Aryan = MIA) : আনুমানিক ৬০০ খ্রীঃ পূঃ থেকে ৯০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুগের আর্যভাষার নাম পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ। অশোকের শিলালিপির প্রাকৃত, সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত, জৈন ধর্মগ্রন্থে ও কিছু স্বতন্ত্র রচনায় ব্যবহৃত প্রাকৃত, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে ব্যবহৃত পালি এ যুগের ভাষার নিদর্শন।

(৩) নব্য ভারতীয় আর্য (New Indo-Aryan = NIA) : আনুমানিক ৯০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। বিভিন্ন নব্য ভারতীয় আর্যভাষার নাম — বাংলা, হিন্দি, মারাঠি, পঞ্জাবি, অবধী ইত্যাদি। নানা সাহিত্যগ্রন্থ ও আধুনিক ভারতীয় আর্যদের মুখের ভাষাই এর নিদর্শন।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যের দুটি রূপ ছিল : সাহিত্যিক (বৈদিক ভাষা বা ছান্দস ভাষা) ও কথ্য। কথ্য রূপটির চারটি আঞ্চলিক উপভাষা ছিল : প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয় ও *দাক্ষিণাত্য। এই কথ্য উপভাষাগুলি লোকমুখে স্বাভাবিক পরিবর্তন লাভ করে যখন প্রাকৃত ভাষার রূপ নিল তখন মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগ সূচিত হল। প্রাকৃতের প্রথম স্তরে তার চারটি আঞ্চলিক কথ্য উপভাষা ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের কথ্য রূপগুলি থেকে প্রাকৃতের এই কথ্য উপভাষাগুলির জন্ম এইভাবে অনুমান করতে পারি : প্রাচ্য থেকে প্রাচ্যা (Eastern) প্রাকৃত ও প্রাচ্য-মধ্যা (East-Central) প্রাকৃত, উদীচ্য থেকে

উত্তর-পশ্চিমা (North-Western) প্রাকৃত এবং মধ্যদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য থেকে পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা (South-Western) প্রাকৃত। প্রাকৃত ভাষা বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে যখন পদার্পণ করল তখন মূলত এই চার রকমের মৌখিক প্রাকৃত থেকে পাঁচ রকমের সাহিত্যিক প্রাকৃতের জন্ম হল। যেমন : উত্তর-পশ্চিমা থেকে পৈশাচী, পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা থেকে শৌরসেনী ও মাহারাষ্ট্রী, প্রাচ্যমধ্যা থেকে অর্ধমাগধী এবং প্রাচ্যা থেকে মাগধী। পৈশাচী, মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী ও মাগধী ছিল শুধু সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাকৃত। প্রাকৃতের বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে এইসব সাহিত্যিক প্রাকৃতের ভিত্তিস্থানীয় তাদের কথ্যরূপগুলি থেকে অপভ্রংশের জন্ম হল এবং অপভ্রংশের শেষ স্তরে পেলাম অবহট্‌ঠ। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাকৃত থেকে সেই শ্রেণীর অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের জন্ম হয়েছিল। যেমন—পৈশাচী প্রাকৃত > পৈশাচী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ, মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত > মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ, শৌরসেনী প্রাকৃত > শৌরসেনী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ, অর্ধমাগধী প্রাকৃত > অর্ধমাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ, এবং মাগধী প্রাকৃত > মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ। মধ্য ভারতীয় আর্যের শেষ স্তরে যে পাঁচ রকমের অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ অনুমিত হয়েছে, তাদের মধ্যে সবগুলির লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় নি, শুধু শৌরসেনী অপভ্রংশের সমৃদ্ধ সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া গেছে।

অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের পরে ভারতীয় আর্যভাষা তৃতীয় যুগে পদার্পণ করল (আঃ ৯০০ খ্রীঃ)। তখন এক-একটি অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে একাধিক নব্য ভারতীয় আর্যভাষা জন্ম লাভ করল। যেমন—পৈশাচী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে পঞ্জাবি ইত্যাদি ; মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে মারাঠি ইত্যাদি, শৌরসেনী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে হিন্দি ইত্যাদি, অর্ধমাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে অবধী ইত্যাদি এবং মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে বাংলা ইত্যাদি ভাষার জন্ম হল।

সাধারণের ধারণা হল সংস্কৃত থেকেই বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য আধুনিক ভাষাগুলির জন্ম। কিন্তু এই ধারণার মূলে উচ্ছ্বসিত স্বদেশপ্রেম যতই থাক, সঠিক বিচারে এ ধারণা যে ভ্রান্ত তা সতর্ক ভাষাবিজ্ঞানী মাত্রেই স্বীকার করবেন। কারণ প্রথমত সংস্কৃত ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য বংশের ভাষা। কিন্তু ভারতে আর্য-পূর্ব দ্রাবিড়, অস্ট্রিক প্রভৃতি বংশের অনেক ভাষা (তামিল, তেলুগু, মলয়ালম, সাঁওতালি প্রভৃতি) আছে, যেগুলির জন্ম সংস্কৃত থেকে বলা নিতান্ত মূর্খতা মাত্র। দ্বিতীয়ত পঞ্জাবি, মারাঠি, হিন্দি, অবধী, বাংলা প্রভৃতি যেসব

আধুনিক ভারতীয় ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য বংশ থেকে জাত, সেগুলির জন্মও ঠিক সংস্কৃত থেকে হয় নি। সূক্ষ্ম বিচারে সংস্কৃত হল বৈদিকের পরবর্তী একটি প্রায়-কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা যা পরে মৃত ভাষা হয়ে গিয়েছিল ; ফলে জীবন্ত ভাষার মতো তার কোনো বিবর্তন হয় নি এবং তা থেকে কোনো ভাষার জন্ম হয় নি। বস্তুত বৈদিক ভাষাই ছিল জীবন্ত ভাষা। এরই যে কথ্য ভিত্তি ছিল তারই বিবর্তনের ধারায় মধ্যবর্তী স্তর হয়ে বাংলা প্রভৃতি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির জন্ম হয়েছে। সুতরাং অব্যবহিত জন্মসূত্র বিচারে বৈদিক ভাষাকেও নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির জন্ম-উৎস বলা যায় না। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির অব্যবহিত জন্ম-উৎস হল বৈদিক ভাষার কথ্যরূপ থেকে জাত মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার শেষস্তর বিভিন্ন অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষা। আমরা দেখেছি বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে।

এখানে একটি কথা অবশ্য বলে রাখা ভাল—মধ্য ভারতীয় আর্য যে প্রাকৃত সেই প্রাকৃতের বিভিন্ন শ্রেণীর শেষ স্তরে সেই শ্রেণীর অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের কল্পনা করা হয়েছে ; কিন্তু সব রকমের প্রাকৃত থেকে জাত অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় নি, কেবল শৌরসেনী অপভ্রংশের সমৃদ্ধ সাহিত্যিক নিদর্শন রয়েছে। আমাদের বাংলা ভাষারও উৎস-স্থানীয় মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের কোনো লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এই কারণে ভাষাবিজ্ঞানী ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার মাগধী অপভ্রংশের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন মাগধী অপভ্রংশ থেকে নয়, 'আদর্শ কথ্য প্রাকৃত' থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। কিন্তু আদর্শ কথ্য প্রাকৃতেরও কোনো লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি এবং এটিও অনুমিত স্তর মাত্র। অন্য পক্ষে জর্জ্‌ আব্রাহাম্‌ গ্রীয়ার্সন, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষা বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। উভয় মতের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেওয়া যায়। কিন্তু সেই বিতর্কে না গিয়ে আমরা গ্রীয়ার্সন্‌ ও ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতটিই অধিকতর প্রচলিত বলে সেই মতটিই গ্রহণ করতে পারি।

উপরে বাংলা ভাষার জন্ম-উৎস সম্পর্কে যে আলোচনা করা হল তাকে আমরা সংক্ষেপে একটি (৫৫ নং) চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপিত করতে পারি—
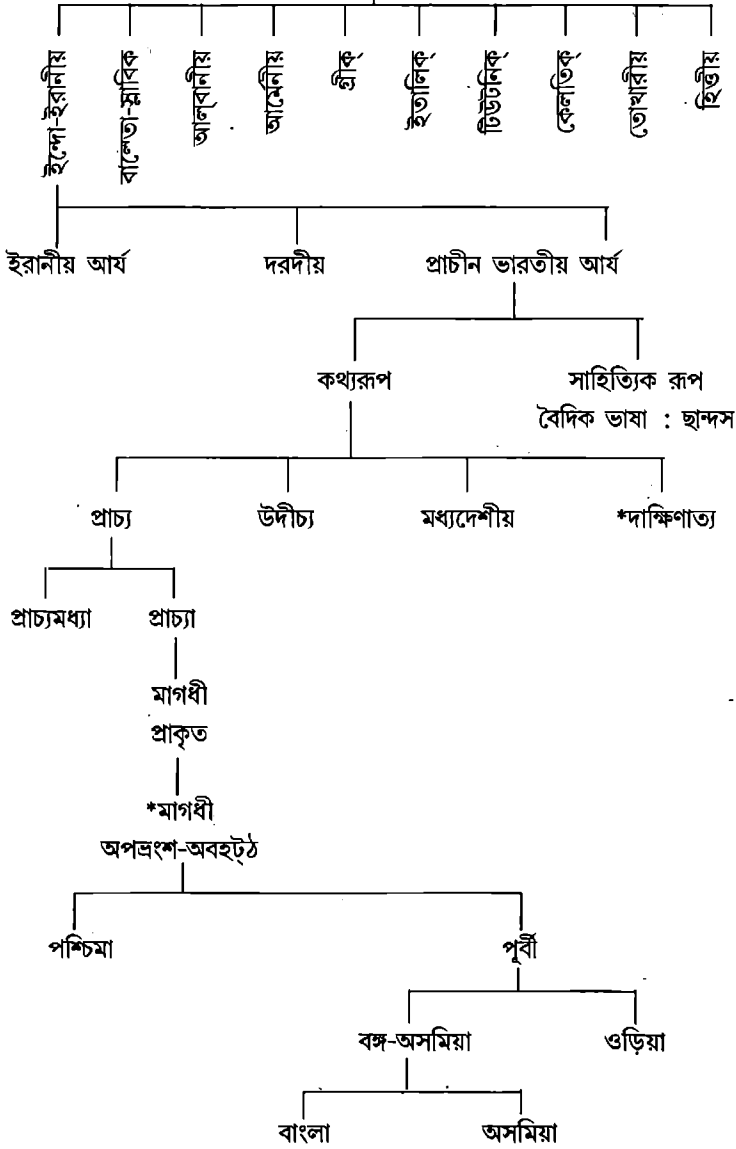
চিত্র নং ৫৫ : বাংলা ভাষার জন্ম-উৎস

আনুমানিক ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয় এবং একটি নব্য ভারতীয় আর্যভাষারূপে বাংলা ভাষা এখনো জীবন্ত রয়েছে। আনুমানিক ৯০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষার বিবর্তনের প্রায় এক হাজার বছরের ইতিহাসকে আমরা মোটামুটিভাবে এই তিনটি যুগে ভাগ করতে পারি :

(১) প্রাচীন বাংলা (Old Bengali = OB) : আনুমানিক ৯০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এই পর্বের বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের রচিত চর্যাগীতিতে, 'অমরকোষে'র সর্বানন্দ রচিত টীকায় প্রদত্ত চার শতাধিক বাংলা প্রতিশব্দে, বৌদ্ধ কবি ধর্মদাস রচিত 'বিদগ্ধ মুখমণ্ডন' গ্রন্থে উৎকলিত দু'চারটি বাংলা কবিতায় এবং 'সেক-শুভোদয়া'য় উদ্ধৃত গানে ও ছড়ায়। এ যুগের বাংলা ভাষার প্রধান বিশেষত্ব ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন (ধর্ম > ধম্ম > ধাম), পদান্তিক স্বরধ্বনির স্থিতি (ভণতি > ভণই), য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি (নিকটে > নিয়ড্ডী), -এর / -অর / -র বিভক্তিযোগে সম্বন্ধপদ (রুখের তেন্তলি), -ক / -কে / -রে বিভক্তিযোগে গৌণকর্ম ও সম্প্রদানের পদ (ঠাকুরক = ঠাকুরকে), -ই / -এ / -হি / -তে বিভক্তিযোগে অধিকরণ (নিয়ড্ডী = নিকটে), -এ বিভক্তিযোগে করণ (সাদেঁ = শব্দের দ্বারা), বিভক্তির স্থানে কিছু অনুসর্গের ব্যবহার (তোহোর অন্তরে = তোর তরে) ইত্যাদি।

সঠিক বিচারে বলা যায় প্রাচীন বাংলার বিস্তৃতিকাল আনুমানিক ৯০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। আর ১২০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কালপর্বের মধ্যে রচিত বাংলা ভাষার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি ; সেইজন্যে এই পর্বটিকে অনুর্বর পর্ব বা অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্ব বলা যায়। এই পর্বটিকে প্রাচীন যুগ না মধ্যযুগের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ কোনো নিদর্শন না পাওয়ার ফলে এই পর্বের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য আমরা নির্ণয় করতে পারি না।

(২) মধ্য বাংলা (Middle Bengali = MB) : আনুমানিক ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। বাংলা ভাষার এই মধ্যপর্বের বিস্তার সুদীর্ঘ প্রায় চার শ' বছর। এই চার শ' বছরের দীর্ঘ পর্বটিকে দু'টি উপ-পর্বে ভাগ করা হয় :

(ক) আদিমধ্য (Early Middle Bengali) : আনুমানিক ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রীস্টাব্দ। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রচনাকাল বিতর্কিত হলেও মোটামুটিভাবে এই রচনাটিকেই আদিমধ্য পর্বের বাংলা ভাষার একমাত্র নিদর্শন রূপে ধরা হয়। এই পর্বের বাংলা ভাষার প্রধান বিশেষত্ব আ-কারের পরবর্তী ই/উ ধ্বনির ক্ষীণতা (বড়াই > বড়াই), সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনে -রা বিভক্তি (আহ্মারা = আমরা), -ইল যোগে অতীত কালের ও -ইব যোগে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ারূপ (শুনিলোঁ, করিবোঁ), আছ্ ধাতু যোগে যৌগিক কালের

পদ (লই + (আ)ছে > লইছে), পাদাকুলক-পজ্ঝটিকা ছন্দ থেকে বহুপ্রচলিত পয়ার ছন্দের সৃষ্টি, ইত্যাদি।

(খ) অন্ত্যমধ্য বাংলা (Late Middle Bengali) : আনুমানিক ১৫০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ। এই উপপর্বের ভাষার সমৃদ্ধ নিদর্শন মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারা, বৈষ্ণব সাহিত্য রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। এই সময়ের বাংলা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য একক ব্যঞ্জনের পরবর্তী পদান্তিক স্বরধ্বনির লোপ-প্রবণতা (রাম > রাম্), মধ্যস্বরের লোপের ফলে দ্বিমাত্রিকতা (ভাবনা > ভাব্না, গামোছা > গাম্ছা), অপিনিহিতি (কালি > কাইল, করিয়া > কইর‍্যা), বিশেষ্যের কর্তৃকারকের বহুবচনে -রা বিভক্তি; নামধাতুর ব্যবহার (নমস্কার > নমস্কারিলা), আরবি-ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ও বৈষ্ণব কবিতায় ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি।

(৩) **আধুনিক বাংলা** (New Bengali = NB) : ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। বাঙালির মুখের বাংলা ভাষাই এই পর্বের বাংলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই পর্বের বাংলার নিদর্শন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকবৃন্দের ও খ্রীস্টান মিশনারীদের রচিত বাংলা গ্রন্থ, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিকের রচনায় পাওয়া যায়। কিন্তু এইসব সাহিত্যিকের রচনায় বাংলার জনসাধারণের মুখের ভাষার নিদর্শন সর্বক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সাহিত্যিক ভাষামাত্র। আধুনিক কালের বাঙালির মুখের ভাষার প্রধান পাঁচটি আঞ্চলিক রূপ বা উপভাষাগুচ্ছ আছে। সেগুলি হল—মধ্য পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা 'রাঢ়ী', দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবঙ্গের (ও অংশত বিহারের) উপভাষা 'ঝাড়খণ্ডী', উত্তরবঙ্গের উপভাষা 'বরেন্দ্রী', পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের উপভাষা 'বঙ্গালী' এবং উত্তর-পূর্ব বঙ্গের উপভাষা 'কামরূপী' বা 'রাজবংশী'। এগুলির মধ্যে গঙ্গাতীরবর্তী তথা কলকাতার নিকটবর্তী পশ্চিম বাংলার রাঢ়ী উপভাষার উপরে ভিত্তি করে এখন শিক্ষিত জনের সর্বজনীন আদর্শ চলিত বাংলার (Standard Colloquial Bengali) রূপ গড়ে উঠেছে। আধুনিক বাংলা ভাষার দু'টি প্রধান বিশেষত্ব হল সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা এবং সাহিত্যে গদ্যরীতির ব্যাপক বাবহার। এ যুগের চলিত বাংলার প্রধান বিশেষত্ব হল—অভিশ্রুতি (করিয়া > কইর‍্যা > করে), স্বরসঙ্গতি (দেশী > দিশি), বহুপদী ক্রিয়া রূপ (গান করা, জিজ্ঞাসা করা), ফারসি 'ব' (wa) থেকে আগত 'ও'-এর সংযোজক অব্যয়রূপে ব্যবহার (রাম ও শ্যাম), বহু ইংরেজি শব্দের অনুপ্রবেশ (চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি), নতুন নতুন ছন্দোরীতি এবং গদ্যচ্ছন্দের সাম্প্রতিক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

উপরে বাংলা ভাষার ইতিহাসের যে যুগবিভাগ আলোচিত হল তা একটি (৫৬ নং) চিত্রের সাহায্যে সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা যায়—

চিত্র নং ৫৬ : বাংলা ভাষার যুগবিভাগ।

॥ ৪৭ ॥

প্রাচীন বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
(Linguistic Features of Old Bengali)

বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগের বিস্তৃতিকাল হল আনুমানিক ৯০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়সীমার মধ্যে ১২০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যে কালপর্ব সেই পর্বের মধ্যে রচিত বলে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে এমন কোনো বাংলা রচনার সন্ধান পাওয়া যায় নি। সেই জন্য ১২০০ খ্রীঃ থেকে ১৩৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বটিকে অনুর্বর পর্ব (barren period) বলা হয়। এই পর্বের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় নি বলে এর বৈশিষ্ট্যও আমরা জানতে পারি না ; তাই এই পর্বটিকে অন্ধকার যুগও বলা যায়। এইজন্যে এই পর্বটিকে বাদ দিয়েই অনেকে বলে থাকেন প্রাচীন যুগের বিস্তারকাল হল ৯০০ খ্রীঃ থেকে ১২০০ খ্রীঃ পর্যন্ত। বাংলা ভাষায় প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়াদের রচিত চর্যাগীতিগুলিতে। বৌদ্ধ সহজিয়াদের রচিত এই সাধনসঙ্গীতগুলি নেপালের রাজদরবার থেকে আবিষ্কার করে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' গ্রন্থে-র 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' অংশে প্রথম প্রকাশ করেন (১৯১৬) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পরবর্তীকালে এগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (The Origin and Development of the Bengali Language), ড. সুকুমার সেন (চর্যাগীতি পদাবলী), ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় (Old Bengali Language and Text এবং চর্যাগীতি), ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার (বাঙলা ভাষাপরিক্রমা, ২য় খণ্ড)। চর্যার ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যিক গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (Les Chants Mistique de Kanha et Saraha), ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত (Obscure Religious Cults, বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি), ড. সুকুমার সেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড), এবং ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত প্রথম খণ্ড) ; এবং চর্যার একটি পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি সংস্করণ প্রকাশ করেন ড. নীলরতন সেন (চর্যাগীতিকোষ)। চর্যাগীতি ছাড়া প্রাচীন বাংলার আর যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি নিতান্তই নগণ্য। অমর সিংহ রচিত সংস্কৃত অভিধান-কল্প গ্রন্থ 'অমরকোষে'র টীকা রচনা করেছিলেন বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ। এতে যে প্রায় চার শ বাংলা শব্দ আছে সেগুলিকে প্রাচীন বাংলার নিদর্শন বলে ধরা হয়। আর 'সেকশুভোদয়া'য় সঙ্কলিত যে দু'চারটি বিচ্ছিন্ন বাংলা গান পাওয়া যায়

সেগুলিকেও প্রাচীন বাংলার নিদর্শন রূপে গ্রহণ করা হয়। আর আছে বৌদ্ধকবি ধর্মদাসের 'বিদগ্ধ মুখমণ্ডন'-এ দু-চারটি বাংলা ছড়া ও কবিতা।

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিষম ব্যঞ্জনের মিলনে গঠিত যুক্ত ব্যঞ্জনগুলি মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় সমীভূত হয়ে সমব্যঞ্জনে গঠিত যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছিল (পর্বত > পব্বত, জন্ম > জম্ম)। প্রাচীন বাংলায় এই যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি লুপ্ত হল (যেমন—পব্বত > পবত, জম্ম > জম) এবং এই লোপের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হল (যেমন—পবত = প্ + অ + ব্ + অ + ত্ + অ > পাবত = প্ + আ + ব্ + অ + ত্ + অ, জম = জ্ + অ + ম্ + অ > জাম = জ + আ + ম্ + অ)। এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় অর্ধতৎসম শব্দে। সেখানে সমীভূত যুগ্ম ব্যঞ্জনের একটি লোপ্ পেয়েছে কিন্তু পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়নি। যেমন—মিথ্যা > মিছা। নাসিক্য ব্যঞ্জনের সংযোগে গঠিত যুক্তব্যঞ্জনও অনেক সময় সমীভূত হয়নি ; তা সত্ত্বেও প্রাচীন বাংলায় এই ধরনের যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়েছে। যেমন—বন্ধ > বান্ধ, চন্দ্র > চান্দ।

(খ) নাসিক্য ব্যঞ্জন অনেক ক্ষেত্রে লোপ পেল এবং তার ফলে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়ে গেল। যেমন—শব্দেন > সাদেঁ।

(গ) পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক স্বরধ্বনি বজায় ছিল, অর্থাৎ দু'টি মিলে একটি স্বরে পরিণত হয় নি। যেমন—উদাস > উআস। কিন্তু পদের অন্তে অবস্থিত একাধিক স্বর যৌগিক স্বররূপে উচ্চারিত হত এবং ক্রমে দু'টি মিলে একক স্বরে পরিণত হল। যেমন—ভণতি > ভণই (= ভ্ + অ + ণ্ + অ + ই > ভ্ + অ + ণ্ + অই), পুস্তিকা > পোত্থিআ (= প্ + ও + ত্ + থ্ + ই + আ > প্ + ও + ত্ + থ্ + ইআ) > পোথী (= প্ + ও + থ্ + ঈ)।

(ঘ) পাশাপাশি অবস্থিত দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে প্রায়ই য়-ধ্বনি শ্রুতিধ্বনি (glide) রূপে এসে যেত। যেমন—নিকটে > *নিঅড্ডী (ন্ + ই + অ + ড্ + ড্ + ঈ) > নিয়ড্ডী (ন্ + ই + য় + অ + ড্ + ড্ + ঈ) নিয়ড়ি।

(ঙ) স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ ধ্বনি প্রায়ই হ-কারে পরিণত হত। যেমন—মহাসুখ (ম্ + অ + হ্ + আ + স্ + উ + খ্ + অ) > মহাসুহ (ম্ + অ + হ্ + আ + স্ + উ + হ্ + অ), কথন (ক্ + অ + থ্ + অ + ন্ + অ) > কহন (ক্ + অ + হ্ + অ + ন্ + অ)।

(চ) 'শ্' স্থানে 'স্'-এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের **আস** (< আশা), **সুনুপাখ** (শূন্যতাপাখা) ভিড়ি লাহু রে পাস

(পাশ) (ছন্দের পটুতার আশা ছাড়া হোক, শূন্যতা পাখা পাশে ভিড়ে ধর)।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি (বিভক্তিহীনতা) প্রাচীন বাংলায় লক্ষ্য করা যায়। যেমন—চঞ্চল চীএ পইঠো **কাল** (চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হল)। কখনো কখনো অনির্দিষ্ট কর্তায় 'এ'-বিভক্তির প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন—রুখের তেন্তলি **কুম্ভীরে** খাঅ (গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়)।

(খ) কোনো কোনো ক্রিয়ার দু'টি করে কর্ম থাকে : মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম। ক্রিয়াটির প্রসঙ্গে 'কি' প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তা মুখ্য কর্ম এবং 'কাকে' প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তা গৌণ কর্ম। সাধারণত মুখ্য কর্ম অপ্রাণীবাচক কর্ম ও গৌণ কর্মই প্রাণীবাচক কর্ম হয়ে থাকে। প্রাচীন বাংলা থেকেই গৌণকর্ম ও সম্প্রদান কারকের রূপ একই রকম হতে থাকে। বাংলায় প্রায়ই গৌণ কর্মে ও সম্প্রদান কারকে—ক/কে / রে বিভক্তি বা শূন্য বিভক্তি পাওয়া যায়। যেমন—লুই ভণই **গুরু** পুচ্ছিঅ জান (লুই বলে—গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও)। এখানে 'গুরু'-তে শূন্য বিভক্তি। মতিএঁ **ঠাকুরক** পরিণিবিত্তা (মন্ত্রীর দ্বারা রাজাকে পরিবৃত করা হয়েছে অর্থাৎ মন্ত্রীর দ্বারা ঘিরে ফেলা হয়েছে)। ঠাকুরক (= রাজাকে)—এখানে -'ক' বিভক্তি। কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই (কেউ-কেউ তোকে বিরূপ কথা বলে)। তোহোরে (তোকে)—এখানে -রে বিভক্তি।

মুখ্য কর্মে শূন্য বিভক্তি দেখা যায় ; যেমন—সসুরা **নিদ** গেল বহুড়ী জাগঅ। **কানেট** চোরে **নিল** কা গই মাগঅ।। (শ্বশুর ঘুমিয়ে পড়ল, বউ জেগে আছে, কানের দুল চোরে নিয়ে গেল, কোথায় গিয়ে চাওয়া যায়) (কানেট = শূন্য বিভক্তি)।

(গ) করণ কারকের বহু প্রচলিত বিভক্তি ছিল -এঁ (< এন)। যেমন—**মতিএঁ** ঠাকুরক পরিণিবিত্তা, (মতিএঁ = এঁ বিভক্তি), করণ ও অধিকরণ কারক প্রায়ই একাকার হয়ে গেছে। ফলে অধিকরণেও প্রায়ই একই বিভক্তি চোখে পড়ে। যেমন—ঘরেঁ।

(ঘ) অধিকরণের আরো বিভক্তি ছিল -ই ~ এ ~ হি ~ তেঁ ~ ত। যেমন—**নিঅড়ি** বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক। চঞ্চল **চীএ** পইঠো কাল (চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হল)। আইসনি চর্য্যা কুক্কুরী পাএঁ গাইউ, কোড়ি মাঝেঁ একু **হিঅহিঁ** সামাইউ। (এমন চর্যা কুকুরীপাদ গাইল, কোটি লোকের মধ্যে একের হৃদয়ে তা প্রবেশ করল)। সকল সমাহিঅ কাহি করিঅই, **সুখদুখেতেঁ** নিচিত মরিঅই (এত

সমাধি সাধন করে কি হয়? সুখে দুঃখে তো মরতেই হবে)। **হাঁড়িত** ভাত নাহি নিতি আবেশী (হাঁড়িতে ভাত নেই)।

(ঙ) অধিকরণের বিভক্তিগুলির মধ্যে -এ বিভক্তির প্রয়োগ ছিল ব্যাপক। এত ব্যাপক যে অন্যান্য কারকের অর্থ প্রকাশ করার জন্যেও এই বিভক্তির তির্যক ব্যবহার ছিল। যেমন—কর্তৃকারকের অর্থে—কানেট **চোরে** নিল কা গই মাগঅ (কানের দুল চোরে নিল, কোথায় গিয়ে চাওয়া যায়?) ; অপাদানের অর্থে—**জামে** কাম কি **কামে** জাম (জন্ম থেকে কর্ম হয়, নাকি কর্ম থেকে জন্ম হয়?)।

(চ) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি ছিল -এর ~র ~ক। যেমন—**রুখের তেন্তুলি** কুম্ভীরে খাঅ (গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়), **মোহোর** বিগোআ কহণ ন জাই (আমাদের মিলনসুখের কথা বলা যায় না)। এড়িএউ **ছান্দক** বান্ধ করণক পাটের আস (ছন্দের বন্ধ ও ইন্দ্রিয়পটুতার আশা ত্যাগ করো)।

(ছ) তির্যক্ বিভক্তি ছাড়া অপাদানের নিজস্ব বিভক্তি ছিল -হুঁ। যেমন—রঅণহুঁ (< রত্নাৎ = রত্ন থেকে)।

(জ) বিভক্তির অর্থ প্রকাশ করার জন্য যেসব শব্দ বিভক্তির বদলে ব্যবহৃত হয়, অথচ যেগুলি বিভক্তির মতো মূল শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় না সেগুলিকে অনুসর্গ বলে। এই রকম অনুসর্গের ব্যবহার প্রাচীন বাংলাতেই সূচিত হয়েছিল। যেমন—নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তির স্থানে 'অন্তরে'—তোহোর **অন্তরে** মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী (তোর জন্যে আমি হাড়ের মালা নিলাম)।

(ঝ) সংস্কৃত করণ কারকের বহুবচনের পদ অস্মাভিঃ (> প্রাকৃত অম্‌হাহি > অপভ্রংশ অম্‌হহি) থেকে আগত অম্‌হে (আহ্মে, আম্হে, অহ্মে, অম্হে) প্রাচীন বাংলাতেই কর্তৃকারকের একবচনের পদরূপে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে। সংস্কৃত করণ কারকের বহুবচন পদ *তুষ্মাভিঃ (যুষ্মাভিঃ) (>প্রাকৃত তুম্‌হাহি, >অপভ্রংশ তুম্‌হহি) থেকে আগত পদ তুহ্মে (তুম্হে) প্রাচীন বাংলায় কর্তৃকারকের একবচনের পদরূপে ক্বচিৎ কখনো ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন—ভণই লুই আম্‌হে ঝাণে দিঠা। অথবা বৈদিক ৪র্থী ৭মীর বহুবচনের পদ অস্মে > প্রা অম্‌হে (স্ > হ্ ; হ্ম > ম্হ : বিপর্যাস) > প্রা-বাং আম্‌হে / অম্‌হে > অম্‌হি > ম-বাং আহ্মি > আ-বাং আমি (হ্ম > ম্হ > ম : মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতার লোপ)।

(ঞ) ক্রিয়ারূপে বর্তমান কালের বিভক্তি ছিল উত্তম পুরুষে -মি ~ হুঁ, মধ্যম পুরুষে -স এবং প্রথম পুরুষে -ই। যেমন -হা লো ডোম্বী তো **পুছমি** সদ্‌ভাবে। **আইসসি জাসি** ডোম্বি কাহারি নাবেঁ।। (হাঁ রে ডোমনী, তোকে সাদামনে একটা কথা জিজ্ঞেস করি—তুই কার নৌকোয় আসা যাওয়া করিস রে), চউষট্‌ঠি কোঠা গণিআ **লেহুঁ** (চৌষট্‌টি ঘর গুণে নিই), লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ (লুই বলে

গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও)। এখানে উত্তম পুরুষ—পুছসি, লেহুঁ : মধ্যম পুরুষ—আইসসি, জাসি, প্রথম পুরুষে—ভণই)।

(ট) অতীত কালের ক্রিয়ারূপ গঠন করা হত দু'ভাবে : নিষ্ঠান্ত পদ (past participle) দিয়ে এবং ধাতুর সঙ্গে -ল বা -ইল প্রত্যয় যোগ করে। যেমন—নিষ্ঠান্ত পদের সাহায্যে : গম্ + ক্ত = গত > গঅ > গউ—সসহর গউ নিবাণে (সসুধর নির্বাণে গত হল) ; প্র—√ বিশ্ + ক্ত = প্রবিষ্ট > পাইট্‌ঠ > পইঠ > পাইঠো : চঞ্চল চীএ পইঠো কাল (চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হল)। ল ~-ইল—প্রত্যয় যোগ করে : যেমন—দেখ্ + ইল = দেখিল—মই দেখিল (আমি দেখিলাম)। ভূ + ইল = ভইল + ঈ = ভইলী। সবরী নিচেতন ভইলী (শবরী নিশ্চেতন হল)। গম্ + ল = গেল—সসুরা নিদ গেল (শ্বশুর ঘুমিয়ে পড়ল)। -ল ~ইল-যুক্ত ক্রিয়ারূপগুলি প্রথমে কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে বিধেয় বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হত ; এইজন্যে এইগুলির পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে পৃথক রূপ হত। যেমন —শশুরা নিদ **গেল** (পুং), সবরী নিচেতন **ভইলী** (স্ত্রী)। ব্যতিক্রম—আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী। -ল ~ইল প্রত্যয়ান্ত পদ যে মূলত বিশেষণ ছিল তার প্রমাণ বিশেষ্যের পূর্বে তার ব্যবহার থেকেই পাওয়া যায়। যেমন—**দুহিল** দুধু কি বেন্টে ষামায় (দোয়া দুধ কি আবার বাঁটে প্রবেশ করে?)।

(ঠ) ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ারূপ গঠিত হত -ইব যোগ করে। যেমন—মই ভাইব (আমি ভাববো)।

(ড) অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ গঠিত হত তিন ভাবে। যেমন—এক : ধাতুর সঙ্গে নিষ্ঠা প্রত্যয় যোগে নিষ্ঠান্ত পদ (past participle) রচনার পর তার সঙ্গে -এ বিভক্তি যোগ করে : যেমন—চড়্ + ইল = চড়িল, চড়িল + এ = চড়িলে—সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বামে মা হোহী (সাঁকোতে চড়লে ডাইনে বামে ঘুরো না)। দুই : শত্রন্ত পদের (present participle) সাহায্যে : যেমন—বুড়্ + অন্ত = বুড়ন্ত, বুড়ন্ত + এ = বুড়ন্তে—মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা (আমি এখন বুড়িয়ে যাওয়াতে কিছু দেখতে পাই না)। তিন : -ই (ঈ) ~ ইঅ ~ ইআ প্রত্যয় যোগ করে : দিঢ় **করিঅ** মহাসুহ পরিমাণ লুই ভণই গুরু **পুছিঅ** জান (দৃঢ় করে মহাসুখ পরিমাণ করো। লুই বলে গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জানো)।

চর্যাপদে এমন কিছু কিছু বিশিষ্ট প্রয়োগের কথা বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন যা বাংলা ছাড়া অন্য নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় পাওয়া যায় না। যেমন—গুণিয়া লেহুঁ (গুণে নিই), দুহিল দুধু (দোয়া দুধ) ইত্যাদি। কিন্তু এইসব অনন্যসুলভ প্রয়োগের জোরে এমন দাবি করা যাবে না যে শুধু বাংলার সঙ্গেই চর্যার ভাষার সাদৃশ্য আছে। কর্তার লিঙ্গভেদ অনুসারে ক্রিয়ার লিঙ্গভেদ (পুং—সসুরা নিদ গেল, স্ত্রী—সবরী নিচেতন **ভইলী**) এবং 'শ' স্থানে 'স'-এর বহুল ব্যবহার হিন্দির

সঙ্গেও চর্যার ভাষার সাদৃশ্য প্রতিপন্ন করে।

ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য :

"প্রাকৃত মাত্রাবৃত্তে তিনটি সুপরিকল্পিত ছন্দোবন্ধ হল : (ক) ষোল মাত্রার (৪।৪।।৪।।৪) পাদাকুলক (< সং পজ্ঝটিকা,) (খ) চব্বিশ মাত্রার (১৩।।১১) দোহা, এবং (গ) ত্রিশ মাত্রার (১০।।৮।।১২) চউপই়আ। এই ছন্দোবন্ধগুলি থেকেই সম্ভবত পরবর্তী বাংলা কাব্যে যথাক্রমে পয়ার (৮।।৬), লঘু ত্রিপদী (৬।৬।৮) বা মহাপয়ার (১০।৮) এবং দীর্ঘ ত্রিপদী (৮।৮।১০) জন্মলাভ করেছিল।" (ডঃ নীলরতন সেন : 'চর্যাগীতিকোষ', ১৯৭৮, পৃঃ ষ)। চর্যায় পাদাকুলক ছন্দই প্রধান। উদাহরণ :

। । । । ॥ ॥ । ।।। । ॥ ॥	॥ । । ।।।। । । ॥ । । ॥
দুলি দুহি। পি টা।। ধরণ ন। জা ই।	আঙ্গণ। ঘরপণ।। সুন ভো। বিআতী।
। ॥ । ॥ । । ॥ । । ॥ ॥	॥ । । ॥ ॥ । । । । ॥ ॥
রুখের। তেন্তলি।। কুম্ভীরে। খা অ।।	কা নেট। চৌরি।। নিল অধ। রা তি।।

॥ ৪৮ ॥

মধ্যবাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(Linguistic Features of Middle Bengali)

সাধারণত মধ্যবাংলার ব্যাপ্তি ধরা হয় ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু মধ্যযুগের ব্যাপ্তিকালের দুই প্রান্তের এই কালসীমার কোনোটিই তর্কাতীত নয়। এর সূচনাকাল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্বয়ং ড. সুকুমার সেন : "চতুর্দশ শতাব্দে ও পঞ্চদশ শতাব্দে লেখা বলিয়া নিশ্চিতভাবে নেওয়া যাইতে পারে এমন কোন রচনা মিলে নাই। সুতরাং ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ অবধি শতাব্দ কালের কতটা প্রাচীন বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল এবং কতটা আদি-মধ্য বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই।"[৬৩] অন্য প্রান্তটি সম্পর্কেও আবার তিনিই তর্কের অবতারণা করেছেন : "শুধু ভাষার পরিবর্তনের কথা মনে রাখিলে অন্ত্য-মধ্য উপস্তরের শেষসীমা ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দ ধরাই সঙ্গত।

৬৩। সেন, ড. সুকুমার : 'ভাষার ইতিবৃত্ত', কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ১৭৮-১৭৯।

তবে সেই সঙ্গে সাহিত্যে ব্যবহারের দিকেও লক্ষ্য রাখিলে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ ধরিতে হয়।"[৬৪] মধ্যযুগের সূচনাকাল সম্পর্কে অধ্যাপক সেনের সংশয় বিষয়ে কিছু বলার নেই ; কিন্তু মধ্যযুগের সমাপ্তিকাল সম্পর্কে আমরা অন্তত এইটুকু বলতে পারি যে, লোকের মুখ থেকে মধ্যযুগের জীবন্ত কথ্যভাষার নিদর্শন পাবার এখন আর কোনো উপায় নেই, শুধু সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার রূপ ধরেই এই পর্বের ভাষার স্বরূপবৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে হবে। সেদিক থেকে দেখলে মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সালটিকেই (১৭৬০) মধ্যযুগের সমাপ্তিলগ্ন বলে চিহ্নিত করা যায়। সুতরাং আমরা মোটামুটিভাবে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আনুমানিক ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগের বিস্তৃতিকাল। তা হলে মধ্যযুগের বিস্তৃতিকাল প্রায় চার শ' বছর। এই চার শ' বছর ধরে কোনো জীবন্ত ভাষা একরূপে অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। এই বিস্তৃত পর্বের মধ্যে বাংলা ভাষারও লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়েছিল। সেই পরিবর্তনের চিহ্ন ধরে এই পর্বকে দু'টি উপপর্বে ভাগ করা হয়েছে—আদিমধ্য (১৩৫০ খ্রীঃ থেকে ১৫০০ খ্রীঃ) ও অন্ত্যমধ্য (১৫০০ খ্রীঃ থেকে ১৭৬০ খ্রীঃ)।

আদিমধ্য বাংলা (Early Middle Bengali) :

আদিমধ্য যুগের (আনুমানিক ১৩৫০ খ্রীঃ থেকে ১৫০০ খ্রীঃ) বাংলা ভাষার একমাত্র প্রামাণিক নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এটি ছাড়া মোটামুটি ভাবে কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এবং কয়েকটি মঙ্গলকাব্য এই পর্বের রচনা বলে ধরা হয়। কিন্তু এগুলির অধিকাংশই এই পর্বের শেষের দিকের রচনা এবং এগুলির ভাষা পরবর্তীকালে এত বেশি পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়েছিল যে এগুলিকে আদিমধ্য যুগের বাংলা ভাষার প্রামাণিক নিদর্শনরূপে গণ্য করা যায় না। তাই শুধু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র উপরে নির্ভর করে এই পর্বের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ণয় করা হয়।

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) 'আ-কারের পরস্থিত ই-কার ও উ-কার ধ্বনির ক্ষীণতা' এই যুগের বাংলার অন্যতম ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই যুগের বাংলা ভাষার উচ্চারণ এখন পরীক্ষা করার উপায় নেই, সুতরাং এই ধ্বনিগুলি ক্ষীণ উচ্চারিত হত কি না তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। পাশাপাশি অবস্থিত দুই ধ্বনির মধ্যে দ্বিতীয়টি (বিশেষত দ্বিতীয়টি যদি পদের শেষ ধ্বনি

৬৪। তদেব, পৃঃ ১৭৯।

হয় তা হলে) ক্ষীণ উচ্চারিত হতে পারে এবং তার ফলে পাশাপাশি অবস্থিত দুই ধ্বনি মিলিয়ে যৌগিক স্বরের (diphthong) সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু সেরকমের পাশাপাশি অবস্থিত দুই স্বরের সংযোগ, শুধু 'আই' 'আউ' কেন, আরো অনেকগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায়। যেমন—আওঁ ('জাওঁ), এউ ('দেউ'), ইআঁ ('পসিআঁ') ইঅ ('তিঅজ'), অএ ('রএ'), এআ ('বেআকুলী'), ওআ ('গোআলিনী'), আই ('নাইল'), আএ ('বাএ, 'রাএ'), ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় পাশাপাশি দুই স্বরের স্থিতি তার বৈশিষ্ট্য, এসব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধ্বনির ক্ষীণতা সম্বন্ধে আমরা অসংশয়িত নই। মনে হয় এসব ক্ষেত্রে যে স্বরসংযোগ পাই তা থেকেই পরবর্তী কালের বাংলার বিভিন্ন যৌগিক স্বরের সৃষ্টি হয়েছিল।

(খ) কোনো কোনো ভাষাতত্ত্ববিদের মতে নাসিক্য ব্যঞ্জনের সংযোগে গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের 'সরলীভবন' আদিমধ্যযুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য। যেমন— কান্তি > কাঁতি, ঝম্প > ঝাঁপ। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটিও সর্বক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় না। এর বহুল ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। যেমন—চন্দ্রাবলী, কুম্ভার, আহ্মি, ব্রহ্মা, কান্দো, নন্দন, নিন্দ ইত্যাদি। শুধু এইটুকু বলা যায় যে তদ্ভব শব্দে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীকরণের প্রবণতা সূচিত হয়েছিল মাত্র, কিন্তু সেটি তখনো ব্যাপক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠে নি।

(গ) তেমনি আবার 'মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতার লোপ অথবা ক্ষীণতা' আদিমধ্য যুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য, এমন সিদ্ধান্ত করেছেন কোনো কোনো প্রতিষ্ঠিত ভাষাবিজ্ঞানী। অর্থাৎ হ-কার-যুক্ত নাসিক্য ব্যঞ্জন থেকে হ-কার লোপ পেয়েছে। যেমন—হ্ন (ন্‌হ) >ন এবং হ্ম (ম্‌হ) > ম। যেমন—কাহ্ন > কানু, আহ্মি > আমি। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটিকেও এ যুগের বাংলা ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য রূপে গ্রহণ করতে পারি না। কারণ 'কানু' ও 'আমি' শব্দের চেয়ে বরং 'কাহ্ন' ও 'আহ্মি' শব্দের প্রয়োগই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বেশি এবং 'হ্ন', 'হ্ম' প্রভৃতি ধ্বনিসংযোগ ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। যেমন—'কোঁঅলী পাতলী বালী **আহ্মে** চন্দ্রাবলী', 'গোঠে হৈতে আসি **আহ্মি** বুঢ়ী গোআলিনী', 'তিরীর যৌবন রাতির সপন **যেহ্ন** নদীকের বাণে', **'কাহ্নাঞি** বাঁশীত দিল সানে', 'বুয়িল **ব্রহ্মার** ঠাএ', 'আজি হৈতেঁ **আহ্মারা** হৈলাহোঁ একমতী', 'পুছিল **তোহ্মারা কেহ্নে** তরাসিলা মণে', **'তোহ্মার** মুখত **কাহ্নাঞি** নাহিঁ কিছু লাজ', 'কোকিলের নাদ মোকে **যেহ্ন** যমদূত' ইত্যাদি।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) কর্তৃকারকে শূন্যবিভক্তি (বিভক্তিহীনতা) প্রথম লক্ষণীয় রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ—'শীতল মনোহর **বাঁশি** কে না বাএ। ডালত বসিঞা যেহ্ন

কুয়িলী কাঢ়ে রায়ে।'

(খ) আদি মধ্যযুগে মুখ্য কর্মেও বিভক্তিহীনতা দেখা যায়। যেমন—'অরেরে বাহিহি কাহ্ন **নাব** ছোড়ি ডগমগ কুগই ন দেহি। তুঁহ এখনই সন্তার দেই জো চাহসি সো লেহি।'

(গ) গৌণকর্মে ও সম্প্রদানে -ক ~ -কে ~ -রে বিভক্তি পাওয়া যায়। যেমন—'**কংসকে** বুলিয়ে কন্যা আঁকাসে থাঁকিয়া', 'হাণ পাঁচ বাণে **তাক** না করিহ দয়া', **যমুনাক** যাই ছলে পাণী আনিবার', 'সাপেরে করিয়াঁ বিষদানে'।

(ঘ) পঞ্চমী বিভক্তির বদলে 'হৈতে' অনুসর্গের সাহায্যে অপাদানের অর্থ প্রকাশ করা হত। যেমন—'গোঠে হৈতে আসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী'। 'আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী'।

(ঙ) সম্বন্ধ পদের অর্থ প্রকাশের জন্যে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ছিল -এর ~ র ক ~ কের। যেমন—বারেঁ বারেঁ কাহ্ন সে কাম করে। যে কামে হএ **কুলের** খাঁখারে।' 'ভাঁগিল **সোণার** ঘট যুড়ীবাক পারী, উত্তম জনের নেহা তেহ্নে মুরারি'। 'চাহা চাহা আল বড়ায়ি **যমুনাক** ভিতে', 'আনাথী **নারীক** কত থাকে অভিমান। আলিঙ্গন দিআঁ কাহ্ন রাখহ পরাণ।' 'তিরীর যৌবন রাতির সপন যেহ্ন **নদীকের** বাণে'। 'আয়িলা **দেবের** সুমতি শুনি।'

(চ) অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত হত -তঁ-তে-এ। যেমন—'রাধার **হিআত** মাইল সুদৃঢ় সন্ধান'। 'মদনবাণে **পরাণে** আকুলী ল'।

(ছ) উত্তম পুরুষের সর্বনাম ছিল আহ্মে-মোঁ এবং মধ্যম পুরুষের সর্বনাম ছিল তোঁ-তোহ্মে ইত্যাদি। এইগুলির সঙ্গে বিভিন্ন কারকের বিভক্তিচিহ্ন যোগ হত।

(জ) সর্বনাম পদের সঙ্গে কর্তৃকারকের বহুবচনে -রা বিভক্তি যুক্ত হত। যেমন—'আজি হৈতেঁ **আহ্মারা** হৈলাহোঁ একমতী'। 'পুছিল **তোহ্মরা** কেহ্নে তরাসিলা মনে' ইত্যাদি।

(ঞ) ক্রিয়া-বিভক্তির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় উত্তমপুরুষে বর্তমান কালে -ওঁ ~ -ই, অতীত কালে -লোঁ ~ -ইল ও ভবিষ্যৎকালে -ইব বিভক্তি। যেমন—'তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী। ধরিবাক না **পারোঁ** পরাণী।' 'পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ি পড়ি **জাঁও**। 'একসরী হৈলোঁ মাত্র হেন ঘোর বনে'। **ছাড়িলোঁ** মো মাহাদান **তেজিলাঁ** মো বাটে। 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা। দাসী হআঁ তার পায়ে নিশিবোঁ আপনা।'

(ট) ধাতুর সঙ্গে -ই - ইআঁ - ক - ইতেঁ - ইলে যোগ করে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ রচিত হত। যেমন—

'পাখি নহোঁ তার ঠাই **উড়ি পড়ি** জাঁও।
মেদিনী বিদার দেউ **পসিআঁ** লুকাঁও।
'এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবই আসার
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।
মুছিআঁ পেলাইবোঁ মোয়ে সিসের সিন্দুর
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর।...
মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর
যোগিনীরূপ **ধরি** লাইবোঁ দেশান্তর।'
'অযোড়-যোড়ন আহ্মে **করিবাক** পারি,
সে কি রাধিকা **ভৈল** সীতা সতী নারী।'
'যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে দেখিল হুএ মুকতি
স দেব সনে নেহা **বাঢ়াইলে** হয়ে বিষ্ণুপুরে স্থিতি।'
'এবার কাহ্নাঞি' বড় কৈল উপকার।
জরমে **সুঝিতেঁ** নারো এ গুণ তাহার।।'
'যমুনা নদীর রাধা **তুলিতেঁ** পানি।
কেহ্নে ধীরেঁ ধীরেঁ বুইলে মধুর বাণী।'

(৩) ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য :

অপভ্রংশের বিশিষ্ট ছন্দ পাদাকুলকে প্রতিপদে ছিল ষোলো মাত্রা। তা থেকে অর্বাচীন অপভ্রংশের ছন্দ চতুষ্পদীর জন্ম হয়। পাদাকুলকের একমাত্রা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে চতুষ্পদীর প্রতি পদে দাঁড়ায় পনেরো মাত্রা। চতুষ্পদী থেকে বাংলা পয়ার ছন্দের জন্ম হয় চর্যাগীতিতে। আদিমধ্য বাংলায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পয়ার ছন্দ পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। চতুষ্পদীর একমাত্রা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে পয়ারে দাঁড়িয়ে ছিল প্রতি পদে চৌদ্দ মাত্রা। যেমন—

'যমুনার তীরে রাধা / কদমের তলে। = ৮ + ৬
তরল করিলেঁ কেহ্নে / নয়ন যুগলে'। = ৮ + ৬

এই পয়ার ছন্দ আদিমধ্য বাংলার প্রধান ছন্দ। এ ছাড়া নানা ছাঁদের ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি ছন্দের ব্যবহারও পাওয়া যায়।

অন্ত্যমধ্য বাংলা (Late Middle Bengali) :

অন্ত্যমধ্য বাংলার স্থিতিকাল ১৫০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এই যুগের বাংলা ভাষা নানা ধারায় সমৃদ্ধ। যেমন—বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্যজীবনী, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, বিভিন্ন সংস্কৃত

গ্রন্থের অনুবাদ, আরাকানের মুসলমান কবিদের রচনা ইত্যাদি। এই সব ধারার বিভিন্ন রচনায় এই যুগের বাংলা ভাষার পর্যাপ্ত নিদর্শন পাওয়া যায়। অন্ত্য মধ্য যুগের বাংলা ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি নিচে সংক্ষেপে সূত্রবদ্ধ করা হল :

(১) ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য :

(ক) পদের অন্তে একক ব্যঞ্জনের পরে অবস্থিত অ-কার লোপ পেল। যেমন— 'আর্ শুন্যাছ আলো সই গোরাভাবের্ কথা /
কোণের্ ভিতর্ কুলবধূ কান্দ্যা আকুল্ তথা।'

কিন্তু এই সূত্রের ব্যতিক্রমও ছিল মনে হয়। যেমন—
'তৈল বিনে কৈল স্নান করিল উদক পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে।' —মুকুন্দ চক্রবর্তী

(খ) পদের অন্তে যুক্তব্যঞ্জনের পরে অবস্থিত অকার লোপ পায়নি, উচ্চারিত হত। যেমন—

'মিছা কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাষবাস
অন্নবস্ত্র কতেক যোগাইব বারো মাস।' —মুকুন্দ চক্রবর্তী

(গ) পদের অন্তে অবস্থিত একক ব্যঞ্জনের পরবর্তী অকার-ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনিও রক্ষিত হয়েছে, লোপ পায়নি। যেমন—

'বিশেষে বামন **জাতি** বড় দাগাদার।
আপনারা এক জপে আরে বলে আর।।' —ভারতচন্দ্র

(ঘ) আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দমধ্যস্থ স্বর অনেক সময় লোপ পেয়েছে। যেমন—হরিদ্রা > হল্‌দি। 'হল্‌দিবরণ্ গোরাচাঁদ পড়্যা গেল মনে'। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটিও মধ্যবাংলায় ব্যাপক হয়নি। এর বিপরীত দৃষ্টান্তই বরং বেশি পাওয়া যায়। যেমন—

'হাটে হাটে তোর বাপ বেচিত **আমলা**।
যতন করিয়া তাহা কিনিত **অবলা**।।' —মুকুন্দ চক্রবর্তী

(ঙ) অন্ত্যমধ্য যুগে শব্দমধ্যস্থ 'ই' ও 'উ' অপিনিহিতি বা বিপর্যাসের প্রক্রিয়ায় কখনো কখনো তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে সরে এসেছে। 'উ' কখনো-কখনো 'ই'-তে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন—বেগুন > *বেউগণ > বাইগণ।

"শাক **বাইগণ** মূলা আট্যা-থোড় কাঁচকলা
সকলে পুরিয়া লয় পাতি।।" —মুকুন্দ চক্রবর্তী

কখনো কখনো বিপর্যাস বা অপনিহিতির ফলে আগে সরে আসা 'ই' বা 'উ' লোপ পেয়েছে। যেমন—রাখিয়াছি > *রাইখ্যাছি > রাখ্যাছি।

"গোধিকা **রাখ্যাছি** বান্ধি দিয়া জাল-দড়া
ছাল উতারিয়া প্রিয়ে কর শীক-পোড়া।" —মুকুন্দ চক্রবর্তী

কিন্তু এই সব বৈশিষ্ট্য ব্যাপক হয়ে দেখা দেয় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপিনিহিতির পূর্ববর্তী রূপই দেখা যায়। যেমন—'কইর‍্যা' বা 'কর‍্যা'-র বদলে করিয়া প্রভৃতি রূপই বেশি। যেমন—

"**করিয়া** পরম দয়া দিয়া চরণের ছায়া
আজ্ঞা মোরে করিলা পার্বতী।" —মুকুন্দ চক্রবর্তী

"তোমা ঝি হইতে মজিল গারিয়াল
ঘরে জামাই **রাখিয়া** পুষিব কত কাল।" —মুকুন্দ চক্রবর্তী

সুতরাং অপিনিহিতিকে এই যুগের বাংলা ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলা যায় না।

(চ) মহাপ্রাণ নাসিক্য (অর্থাৎ বর্গের হ-যুক্ত পঞ্চম বর্ণ) অল্পপ্রাণ (অর্থাৎ বর্গের হ-বিহীন পঞ্চম বর্ণ) হতে আরম্ভ করেছিল আদিমধ্য যুগের বাংলাতেই ; অন্ত্যমধ্য যুগে এই প্রবণতা ব্যাপকতর হল। যেমন—আহ্মি > আমি, তুহ্মি > তুমি, আহ্মার > আমার, তোহ্মার > তোমার ইত্যাদি।

"দড় বেঞ্জন **আমি** যেই দিনে রান্ধি
মারয়ে পিঁড়ির বাড়ি কোণে বস্যা কান্দি।" —মুকুন্দ চক্রবর্তী
"আনের আছয়ে অনেক জন্য
আমার কেবল **তুমি**।"

কেউ কেউ বলেছেন 'ঢ়'-এরও মহাপ্রাণতা লোপ পেয়েছে, অর্থাৎ 'ঢ়' হয়েছে 'ড়'। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য অন্ত্যমধ্য যুগের শেষ দিকেও ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। যেমন—

"ওরে বুঢ়া আঁটকুড়া নারদ অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে।।" —ভারতচন্দ্র

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) আদিমধ্য বাংলায় সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনে -রা বিভক্তির প্রয়োগ সূচিত হয়েছিল। অন্ত্যমধ্য বাংলায় এই -রা বিভক্তি বিশেষ্যেরও কর্তৃকারকের

বহুবচনে প্রযুক্ত হতে আরম্ভ করে। এছাড়া -গুলা - **গুলি** বিভক্তির প্রয়োগ নির্দেশক বহুবচনে তো হতই, অনির্দেশক বহুবচনেও হত। যেমন—

"কে বলে **শারদ শশী** ও মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে আছে তার কতগুলা।।"

(খ) ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ছিল -র -এর ইত্যাদি। যেমন—

"**হিয়ার** পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে।।" —জ্ঞানদাস
"**রূপের** পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।" —ঐ

(গ) -য় - এ - তে সপ্তমী বিভক্তি রূপে প্রযুক্ত হতে থাকে। যেমন—

"উই চারা খাই **বনে** জাতিতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক।।" —মুকুন্দ চক্রবর্তী
"**ধূলায়** ধূসর হয়্যা কান্দয়ে হস্তিনী।
মিথ্যা বর দিয়া কেন বধ কর প্রাণী।" —মুকুন্দ চক্রবর্তী

(ঘ) সাধারণ সদ্য অতীত কালের উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি ছিল ইলাঙ —ইলাম এবং প্রথম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি ছিল -ইল -ইলা ইত্যাদি। যেমন—

উত্তম পুরুষ—

"সেই পুণ্যের ফলে কবি হৈয়া শিশুকালে
রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে।" —মুকুন্দ চক্রবর্তী

প্রথম পুরুষ—

"ধনি ধনি কলিকালে রত্না নদের কূলে
অবতার করিলা শঙ্কর
ধরি চক্রাদিত্য নাম দামুন্যা **করিল** ধাম
তীর্থ **কৈলা** সেই ত নগর।।" —ঐ

(ঙ) সাধারণ ভবিষ্যৎকালের উত্তম পুরুষের বিভক্তি ছিল -ইব। যেমন—

"সখীর উপরে দেহ তণ্ডুলের ভার।
তোমার বদলে আমি **করিব** পসার।।" —মুকুন্দ চক্রবর্তী

(চ) মূল ক্রিয়ার অসমাপিকার রূপের সঙ্গে 'আছ্' ধাতু যোগ করে তথাকথিত যৌগিক কালের (বহুভাষিত কালের) রূপ গঠন করা হত। যেমন—

"গোধিকা **রাখ্যাছি** বান্ধি দিয়া জাল দড়া।
ছাল উতারিয়া প্রিয়ে কর শীক-পোড়া।" —মুকুন্দ চক্রবর্তী

(রাখ্যাছি < রাখিয়া + আছি—এখানে √রাখ্ ও √আছ্ —দুটি ধাতু আছে)

(ছ) কিছু সংস্কৃত নামশব্দকে ক্রিয়ার ধাতুরূপে গ্রহণ করে তার সঙ্গে ক্রিয়ার বিভক্তি যোগ করা হত। নামধাতুর এই বহুল ব্যবহার অন্ত্যমধ্য বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন—নমস্কার + ইলা = নমস্কারিলা, ইত্যাদি।

(জ) মধ্য যুগে বাংলা ছিল মুসলমান-শাসিত। ফলে মুসলমানদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় বহু আরবি-ফারসি ও কিছু তুর্কি শব্দ ও প্রত্যয় গৃহীত হয়। যেমন —আরবি—গজব, আজব, আদমি, আইন, কেতাব, খাজনা ইত্যাদি। ফারসি—দার (ডিহিদার), গিরি (বাবুগিরি), গোলাপ (< গুলাব) ইত্যাদি। তুর্কি—খাঁ, খাতুন, দারোগা, বিবি, বেগম ইত্যাদি।

"পাতশা কহেন শুন মানসিংহ রায়। **গজব** করিলে তুমি **আজব**কথায়।।
লস্করে দু-তিন লাখ আদমি তোমার। হাতী ঘোড়া উট গাধা খচর যে আর।।"
—ভারতচন্দ্র।

(৩) ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য :

এই যুগে পয়ার ছন্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণ কাহিনীমূলক রচনা ছাড়াও উচ্চাঙ্গের দার্শনিক রচনাতে পয়ার ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন ছাঁদের ত্রিপদী ছন্দেরও প্রয়োগ ছিল। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বৈষ্ণব কবিতায় অপভ্রংশের চতুষ্পদী ছন্দের ব্যবহার ছিল।

(৪) অন্যান্য বৈশিষ্ট্য :

মিথিলার কবি বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদ এক সময় বাঙালির খুবই প্রিয় ছিল। এরই মাধ্যমে বাংলার সঙ্গে মৈথিলী ভাষার ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। মূলত মৈথিলী ভাষা ও অংশত অবহট্‌ঠ ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিশ্রণে অন্ত্যমধ্য যুগের বাঙালি বৈষ্ণব কবিরা একটি সাহিত্যিক ভাষার সৃষ্টি করেন। তার নাম ব্রজবুলি ভাষা। কিছু বৈষ্ণব পদে এই ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার অন্ত্যমধ্য যুগের বাংলা ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন—

"যাঁহা পহুঁ অরুণচরণে চলি যাত। তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত।
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ। হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ।।"
—গোবিন্দদাস।

॥ ৪৯ ॥

আধুনিক বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(Linguistic Features of Modern Bengali)

মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে। এই বছরটিতে আমরা বাংলা ভাষার মধ্যযুগের সমাপ্তি ও আধুনিক যুগের সূচনা হয় বলতে পারি। মোটামুটিভাবে তা হলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলা ভাষার আধুনিক যুগের বিস্তৃতিকাল। আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া হল :

(১) অনেকে বলে থাকেন গদ্যের জন্ম আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বাংলা গদ্যের জন্ম আধুনিক যুগেই হয় নি। বাঙালির মুখে মুখে গদ্যের ব্যবহার চিরকালই প্রচলিত ছিল ; দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রে বাঙালি যে আধুনিক যুগের আগে পদ্যে কথা বলত, তা নয়। আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য এই যে, যে গদ্য বাঙালির দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রচলিত ছিল, সাহিত্যে তার প্রয়োগ সূচিত হল অর্থাৎ গদ্যসাহিত্য রচনার সূত্রপাত হল।

(২) সাহিত্যে ব্যবহৃত গদ্যেরও আবারও দুটি রীতি গড়ে উঠল—সাধু ও চলিত। মূলত পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের (হুগলি, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা ইত্যাদি) কথ্যভাষার উপরে ভিত্তি করে চলিত গদ্যের রূপ গড়ে তোলা হয়েছিল, অন্যদিকে মূলত মধ্যযুগীয় বাংলার শব্দরূপ-ধাতুরূপ ও প্রধানত সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার নিয়ে সাধু গদ্য গড়ে তোলা হয়েছিল। যদিও সাধু এবং চলিত গদ্যের ধারা ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রায় সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছিল, তবু ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাধুগদ্যের ধারাটিই অপেক্ষাকৃত অধিক পুষ্টি লাভ করেছিল। পরে ক্রমে চলিত গদ্যের ধারাটি একচ্ছত্র হয়ে উঠে।

(৩) সাধুভাষায় ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণতর দীর্ঘরূপ বজায় ছিল। যেমন—করিয়া, করিয়াছিল, তাহার, যাহার, হইতে ইত্যাদি। চলিত ভাষায় এগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ প্রচলিত হল। যেমন—করে, করেছিল, তার, যার, হতে, থেকে ইত্যাদি।

(৪) মধ্যযুগের বাংলায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপিনিহিতি বা বিপর্যাসের ফলে শব্দ-মধ্যবর্তী 'ই' বা 'উ' তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে উচ্চারিত হত (যেমন—করিয়া > কইর‍্যা ইত্যাদি) ; আধুনিক যুগের আদর্শ চলিত বাংলায় অপিনিহিতির পরবর্তী ধাপের ধ্বনি-পরিবর্তন অভিশ্রুতি সংঘটিত হল (যেমন—

কইর‍্যা > করে ইত্যাদি)।

(৫) আধুনিক চলিত বাংলায় শব্দের মধ্যে পাশাপাশি বা কাছাকাছি অবস্থিত দু'টি বিষম স্বরধ্বনি স্বরসঙ্গতির প্রক্রিয়ায় সমীভূত হয়ে একই রকম বা প্রায়-একই রকম স্বরধ্বনিতে পরিণত হল। যেমন—দেশি > দিশি, পটুয়া > পোটো ইত্যাদি।

(৬) মূল ক্রিয়ার ধাতুর সঙ্গে -অনট্ (অন) প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করে প্রথমে ক্রিয়াজাত বিশেষ্য পদ রচনা করা হয়। যেমন—গম্ + অনট্ (অন) = গমন, গৈ + অনট্ (অন) = গান, গ্রহ্ + অনট্ (অন) = গ্রহণ, জ্ঞা + সন্ (ইচ্ছার্থে) + অ (ভাবে) + আপ্ (স্ত্রীং) = জিজ্ঞাসা ইত্যাদি। তারপর তাকে পূর্বপদ রূপে গ্রহণ করে কৃ (কর্) ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়ার বিভক্তি যোগ করে নানা যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন—গমন করা, গ্রহণ করা, গান করা, জিজ্ঞাসা করা ইত্যাদি। এই রকমের যৌগিক ক্রিয়াপদ প্রথমে সাধুভাষায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হত। পরে কিছু কিছু যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার চলিত ভাষাতেও স্বাভাবিক হয়ে উঠে। যেমন—গান করা, জিজ্ঞাসা করা, দান করা ইত্যাদি। অন্যদিকে সাধুভাষা যতই সরল ও স্বাভাবিক হয়ে আসে ততই সাধু ভাষাতে আবার যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার কমে আসে।

(৭) আধুনিক বাংলায় দুটি সংযোজক অব্যয়ের (Conjunction) ('ও', 'এবং') ব্যবহার খুব বেশি। এই দু'টির মধ্যে 'এবং' সাধারণত দু'টি বাক্যকে যোগ করে, 'ও' যোগ করে দু'টি পদকে, যদিও এই নিয়মের ব্যতিক্রম কম নয়। এই দুটি সংযোজক অব্যয়ের মধ্যে 'এবং' আগে থেকেই প্রচলিত। 'ও' হল আধুনিক বাংলার বৈশিষ্ট্য। ড. সুকুমার সেনের মতে এটি ফারসি 'ব' (wa) থেকে এসেছে।

(৮) আধুনিক বাংলার বাক্য-গঠনরীতির একাধিক বৈশিষ্ট্যের কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে (পৃঃ ৩৯৫-৪০৩)। একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—নঞর্থক অব্যয় 'না', 'নাই', 'নি' বসে সমাপিকা ক্রিয়ার পরে (যেমন—রামচন্দ্র সত্যভঙ্গ করেন নি), এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে (যেমন—রামচন্দ্র সত্যভঙ্গ না করে চিরকাল সৎপথে চলেছেন)। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় এবং নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ারও আগে বসে। যেমন—মেয়েটি না স্নান করল, না খেলো, না ঘুমোলো, সারাদিন মন খারাপ করে চুপ করে বসে রইল।

(৯) একাধিক সরল বাক্যকে সংযোজক অব্যয় দিয়ে যোগ করে যৌগিক বাক্য রচনা করা যায়। যেমন—রামচন্দ্র বনে গেলেন এবং পঞ্চবটীতে বাস করতে লাগলেন। এরকম সংযোজক অব্যয় দিয়ে যোগ না করে পূর্ববর্তী বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিবর্তিত করেও বাক্য দু'টিকে যোগ

করে একটিমাত্র সরল বাক্য রচনা করা যায়। এটি আধুনিক বাংলার বৈশিষ্ট্য। যেমন—রামচন্দ্র বনে **গিয়ে** পঞ্চবটীতে বাস করতে লাগলেন।

(১০) আধুনিক যুগে বাঙালির চিন্তা-চেতনার সঙ্গে বিশ্বসংস্কৃতির—বিশেষত পাশ্চাত্য ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির—যোগ স্থাপিত হয়। তার ফলে ভাষাঋণের বিভিন্ন সূত্র ধরে বাংলায় বিভিন্ন ভাষা থেকে উপাদান গৃহীত হয়। প্রধানত ইংরেজি ভাষা থেকে বহু শব্দ আধুনিক বাংলায় গৃহীত হয়। যেমন—চেয়ার (chair), টেবিল (table), রেডিও (radio) ইত্যাদি। কিছু কিছু ইংরেজি শব্দ বাংলায় গৃহীত হবার পর বাংলা ভাষার নিজস্ব উপাদানের সঙ্গে মিলে এমন পরিবর্তিত হয়ে দেশীয় (naturalised) রূপ লাভ করেছে যে তাদের বিদেশি শব্দ বলে চেনাই যায় না। যেমন—lord > লাট্, chord > কার (লাল কার, কালো কার), lantern > লণ্ঠন ইত্যাদি। শব্দ ছাড়াও কিছু কিছু বাক্য, বাক্যাংশ, শব্দগুচ্ছ ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়া হয়েছে। যেমন—university > বিশ্ববিদ্যালয়, wrist watch > হাতঘড়ি, He will place his opinion now > এবার তিনি তাঁর বক্তব্য রাখবেন। ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষা থেকেও বহু শব্দ আধুনিক বাংলায় গৃহীত হয়েছে। যেমন—পর্তুগীজ :—আনারস, আলপিন, আলমারি ইত্যাদি ; ফরাসি :—কুপন, বুর্জোয়া ইত্যাদি ; ইতালীয় :—গেজেট ইত্যাদি ; জার্মান :—জার, নাৎসি ইত্যাদি ; রাশিয়ান :—সোভিয়েত ইত্যাদি ; হিন্দি :—লাগাতার বন্ধ, বাতাবরণ, জাঠা ইত্যাদি।

(১১) ছন্দোরীতিতে নানা বৈচিত্র্য আধুনিক বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পুরানো পয়ার ছন্দ থেকে অমিত্রাক্ষর ও গৈরিশ ছন্দের জন্ম তো হলই, আধুনিক কবিতায় গদ্যচ্ছন্দেরও সূচনা হল। এছাড়া বাংলায় ইংরেজি ও সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহারও দেখা দিল।

॥ ৫০ ॥

উপভাষা

(Dialects)

ভাষার সংজ্ঞায় আমরা বলেছি, ভাষা হচ্ছে কতকগুলি অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপ যার সাহায্যে একটি বিশেষ সমাজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় করে। যে জনসমষ্টি একই ধরনের ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপের দ্বারা নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় করে ভাষাবিজ্ঞানীরা তাকে একটি ভাষা-সম্প্রদায়

(Speech Community) বলেন : "A Group of people who use the same system of speech signals is a ***speech community.***"[৬৫] যেমন একটি ধ্বনিসমষ্টি ধরা যাক—'আমরা বই পড়ি'।

এখানে যে নির্দিষ্ট ধ্বনিসমষ্টি দিয়ে একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, সেই ধ্বনিসমষ্টি এই নির্দিষ্ট ক্রমে বিন্যস্ত করে শুধু বাঙালিরাই ব্যবহার করে এবং এর দ্বারা যে ভাব প্রকাশিত হয় তা শুধু বাঙালিরাই বুঝতে পারে। সুতরাং বাঙালিদের একটি ভাষা-সম্প্রদায় (Speech Community) বলতে পারি। এই একই ভাব প্রকাশের জন্যে আবার অন্য ভাষা-সম্প্রদায় অন্য ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার করবে।

এক্ষেত্রে ইংরেজরা যে ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার করবে তা হল—We read books. জার্মানরা এক্ষেত্রে বলবে—Wir lesen Bücher. ফরাসিরা বলবে—Nous lisons des livres. হিন্দি ভাষীরা বলবে—हम किताव पडते है।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে একই ধরনের ধ্বনিসমষ্টি দিয়ে সব মানুষের কাজ চলে না। এক-এক ধরনের ধ্বনিসমষ্টি ও ধ্বনিসমাবেশ-বিধিতে এক-একটি জনগোষ্ঠী অভ্যস্ত। অর্থাৎ এক-একটি ভাষা এক-একটি জনসমষ্টির নিজস্ব প্রকাশ-মাধ্যম। এক-একটি বিশিষ্ট ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধরূপের ব্যবহারকারী জনসমষ্টিই হল এক-একটি ভাষা-সম্প্রদায়। কিন্তু এক-একটি ভাষা-সম্প্রদায় যে ভাষার মাধ্যমে ভাববিনিময় করে, সেই ভাষারও রূপ সর্বত্র সম্পূর্ণ একরকম নয়। যেমন, পূর্ব বাংলা ('বাংলাদেশ') এবং পশ্চিম বাংলায় বাংলা ভাষাই প্রচলিত, কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উচ্চারণ ও ভাষারীতি পুরোপুরি একরকম নয়। একই ভাষার মধ্যে এই যে আঞ্চলিক পার্থক্য একে বলে আঞ্চলিক উপভাষা। উপভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—"A specific form of a given language, spoken in a certain locality or geographic area, showing sufficient differences from the standard or literary form of that language, as to pronunciation, grammatical construction and idiomatic usage of words, to be considered a distinct entity, yet not sufficiently distinct from other dialects of the language to be regarded as a different language."[৬৬] অর্থাৎ উপভাষা হল একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ-বিশেষ রূপ যা এক-একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত, যার সঙ্গে আদর্শ ভাষা (standard

---

৬৫। Bloomnfield, Leonard : *Language.* Delhi Motilal Banarsidass, 1963, p. 29.

৬৬। Pei, Merio A. and Gaynor, Frank : *A Dictionary of Linguistics,* London : Peter Owen, 1970, p. 56.

language) বা সাহিত্যিক ভাষার (literary language) ধ্বনিগত, রূপগত ও বিশিষ্ট বাগ্‌ধারাগত পার্থক্য আছে ; এই পার্থক্য এমন সুস্পষ্ট যে ঐসব বিশেষ-বিশেষ অঞ্চলের রূপগুলিকে স্বতন্ত্র বলে ধরা যাবে, অথচ পার্থক্যটা যেন এত বেশি না হয় যাতে আঞ্চলিক রূপগুলিই এক-একটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা হয়ে উঠে। এই সংজ্ঞায় উপভাষার পরিচয় মোটামুটি ভাবে বোঝা যায় বটে, কিন্তু ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্যটি সুস্পষ্ট হয় না। কারণ ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্যটি চূড়ান্ত নয়, আপেক্ষিক ; শ্রেণীগত নয়, মাত্রাগত। একই ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক পৃথক রূপকে উপভাষা বলে। কিন্তু এই আঞ্চলিক পার্থক্য বেড়ে চরমে গেলেই আবার একই ভাষা থেকে একাধিক ভাষার জন্ম হয়। অর্থাৎ আঞ্চলিক রূপগুলি তখন একই ভাষার উপভাষা নয়, তখন সেগুলি এক-একটি স্বতন্ত্র ভাষা। যেমন বাংলা ও অসমিয়া ভাষা প্রথমে একই ভাষার দু'টি উপভাযা ছিল, পরে ক্রমে বঙ্গদেশ ও অসমের ভাষার আঞ্চলিক পার্থক্য যখন বেড়ে গেল তখন বাংলা ও অসমের আঞ্চলিক রূপ দু'টিকে পৃথক ভাষারূপে চিহ্নিত করা হল—বাংলা ভাষা ও অসমিয়া ভাষা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একই ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক রূপের পার্থক্যকে কোন্ স্তর পর্যন্ত উপভাষা বলা হবে, এবং এই পার্থক্য বাড়তে বাড়তে কোন্ স্তরে এলে সেগুলিকে আর উপভাষা বলা যাবে না, সেগুলি হয়ে উঠবে স্বতন্ত্র ভাষা? বস্তুত এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। কেউ কেউ বলেছেন, ভাষার আঞ্চলিক রূপ যখন স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীর ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠবে তখন সেগুলিকে আর উপভাষা না বলে ভাষার মর্যাদা দিতে হবে। যেমন—বাংলা ও অসমের ভাষা। কিন্তু এই মানদণ্ড অনুসরণ করলে পূর্ববাংলা (বাংলাদেশ) ও পশ্চিমবাংলা (ভারত)-এর উপভাষাকে দু'টি স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা দিতে হয়। অথচ পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার ভাষাকে তো আমরা স্বতন্ত্র ভাষা বলি না, একই ভাষার দুটি উপভাষা বলি। তাহলে বলতে হবে, দু'টি জনগোষ্ঠী যখন সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথক হবে তখন তাদের আঞ্চলিক ভাষা স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা পাবে। যেমন অসম ও বাংলার জনগোষ্ঠী সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথক, কিন্তু পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার জনগোষ্ঠী সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথক নয়, তাদের একই সংস্কৃতি—বাঙালির সংস্কৃতি। এখানে মনে রাখতে হবে আবার সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ব্যাপারটিও অনেকটাই আপেক্ষিক। কারণ বাংলা ও অসমের সংস্কৃতির মধ্যেও কিছুটা ঐক্যসূত্র আছে, অন্যদিকে পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতিতেও কিছুটা পার্থক্য আছে। আবার ভাষাও তো সংস্কৃতিরই একটা অঙ্গ। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়াই ভালো যে, ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্যটি চূড়ান্ত কিছু নয়, আপেক্ষিক মাত্র। এই আপেক্ষিকতার কথা মনে

রেখেও কেউ কেউ বলেছেন, একই ভাষাভাষী এলাকার অন্তর্গত একাধিক অঞ্চলের ভাষার আঞ্চলিক রূপের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত পারস্পরিক বোধগম্যতা (mutual intelligibility) থাকে ততদিন ঐ আঞ্চলিক রূপগুলিকে বলা হবে উপভাষা (dialect)। যখন এই আঞ্চলিক রূপগুলি পৃথক হতে-হতে পারস্পরিক বোধগম্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তাদের স্বতন্ত্র ভাষা বলা যায়। কিন্তু এই মানদণ্ডও সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। বাংলা ভাষারই দু'টি উপভাষা রাঢ়ী ও চট্টগ্রামীর মধ্যে পারস্পরিক বোধগম্যতা প্রায় নেই বললেই চলে। চট্টগ্রামের বাঙালি দ্রুত কথা বলে গেলে পশ্চিমবাংলার বাঙালি কিছুই বুঝতে পারবে না ; তার চেয়ে সে বরং বুঝতে পারবে অসমিয়া ভাষায় রেডিও সংবাদ। আদর্শ বাংলা ও আদর্শ অসমিয়ার (Standard Assamese) মধ্যে পারস্পরিক বোধগম্যতা বরং বেশি। তবু অসমিয়া ও বাংলা দু'টি পৃথক ভাষা, কিন্তু বাংলা ও চট্টগ্রামী একই ভাষার দুটি উপভাষা। আরো মনে রাখতে হবে যে, এই পার্থক্যও মোটামুটি ধরনের পার্থক্যই। কারণ বোধগম্যতার তারতম্য হয় অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিভেদে, আর বোধগম্যতা ব্যাপারটিও অনেকক্ষেত্রে subjective। সাধারণত দেখা যায়, ভাষা একটি বৃহৎ অঞ্চলে প্রচলিত, উপভাষা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঞ্চলে প্রচলিত। ভাষার একটি সর্বজনীন আদর্শ (standard) রূপ থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা নিজের নিজের অঞ্চলে ঘরোয়া কথায় (informal discourse) আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করে, কিন্তু সাহিত্যে, শিক্ষায়, আইন-আদালতে, বক্তৃতায়, বেতার-সংবাদপত্রে আদর্শ ভাষা ব্যবহার করে। এরকম ভাবে প্রায়ই দেখা যায় একটি আদর্শ ভাষার (Standard Language) এলাকার মধ্যে একাধিক উপভাষা প্রচলিত। উপভাষায় সাধারণত লোকসাহিত্য রচিত হয়। আধুনিক কালে শিষ্ট সাহিত্যে যে বেশি করে উপভাষার ব্যবহার দেখা যায়, সেটা বস্তুত আঞ্চলিক লোকজীবনকে জীবন্তভাবে তুলে ধরার জন্যেই। উপভাষাগুলিতে সাধারণত উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বিশেষ রচিত হয় না, তেমনি এগুলির কোনো ব্যাকরণও সাধারণত লিখিত হয় না। সম্প্রতি উপভাষা সমীক্ষা ও উপভাষার ব্যাকরণ রচনার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কোনো উপভাষায় স্বতন্ত্র সাহিত্য চর্চা ও তার ব্যাকরণ রচনার সচেতন প্রয়াস যখন সংঘটিত হয় তখন তা ক্রমে ভাষার মর্যাদা লাভ করতে থাকে। এই প্রচেষ্টা ভারতে ভোজপুরি ও অন্যান্য কোনো কোনো ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। এইভাবে ক্রমে তা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হলে তা স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা লাভ করে।

অঞ্চলভেদে যেমন একই ভাষার মধ্যে অল্পস্বল্প পার্থক্য হয়, তেমনি সামাজিক স্তরভেদেও একই ভাষাভাষী লোকেদের কথায় অল্পবিস্তর পার্থক্য হতে পারে। একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, একজন অধ্যাপক, একজন উকিল, একজন

রাজনৈতিক নেতা, একজন শ্রমজীবী এবং একজন দাগী অপরাধী গুণ্ডার ভাষার উচ্চারণে ও শব্দ ব্যবহারে বেশ পার্থক্য চোখে পড়ে। একই ভাষার মধ্যে সামাজিক স্তরভেদে এই যে পার্থক্য একে **সামাজিক উপভাষা (Social dialect)** বলতে পারি। আবার সমাজে ইতরজনের, মস্তানদের অপরাধ-জগতের মানুষের ভাষাও অনেকটা আলাদা। সমাজের ইতরশ্রেণী ও অপরাধীদের মধ্যে গোপন সাঙ্কেতিক ইঙ্গিতপূর্ণ যে ভাষা প্রচলিত থাকে তাকে **অপার্থ ভাষা (Cant)** বা **সঙ্কেতভাষা (Code Language)** বলে। যেমন—

"গণেশ যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'পটাশদার কোনো দোষ নেই। যত দোষ ওই বদে শালার। ও-ই পটাশদাকে ডেকে অপমান করেছে। বাপ তুলে খিস্তি দিয়েছে। আমি শুনেছি। পটাশদা তাই মাঝরাতে বড়খোকা ঝেড়ে দিয়েছে দু'খানা—'

'বড়খোকা কি?'

'জানেন না? ছ্যছোও। এই যে সাইজ—' ডান হাতের পাঁচ আঙুলের মুদ্রায় একটা গোলাকার বস্তুর রূপ ফুটিয়ে তুলল গণেশ।" (—ড. তপোবিজয় ঘোষ : 'কাল-চেতনার গল্প', ১ম খণ্ড, একটি মস্তানী গল্পের ভূমিকা)।

—এখানে 'বোমা' অর্থে 'বড় খোকা' কোনো কোনো জায়গার অপরাধ-জগতের সঙ্কেতপূর্ণ ভাষার নিদর্শন।

এরকমের গোপনে ব্যবহারের প্রয়োজনে সৃষ্ট সঙ্কেত-শব্দ বা সঙ্কেত-ভাষা ছাড়াও ইতর বা অভদ্র জনের মধ্যে এমন কিছু শব্দ ও শব্দগুচ্ছ প্রচলিত থাকে যার ব্যবহার সমাজের শিক্ষিত ভদ্রজনের মধ্যে নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হয়। একে **ইতর শব্দ (Slang)** বলে। যেমন—মাল খাওয়া (মদ্য পান করা) বাঁশ দেওয়া (গোপনে পরের ক্ষতি করা), ল্যাঙ্ দেওয়া (গোপনে পরের ক্ষতি করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত করা), চাম্‌চে (পরের তোষামোদকারী বা অনুগামী), বডি ফেলা (ঘুমানো বা শুয়ে পড়া), আলুর দোষ (অবৈধ প্রণয়ের দিকে ঝোঁক) ইত্যাদি। ইতর শব্দ কিছুদিন ব্যরহারের পর ক্রমশ ভদ্রসমাজেও স্থান পায়, তখন আর তা ইতর শব্দ থাকে না। যেমন—হাতানো (আত্মসাৎ করা) ইত্যাদি।

ভদ্র-ইতর নির্বিশেষে সর্বসাধারণের দ্রুত উচ্চারণ ও ব্যবহারের সুবিধার জন্যে অনেক সময় কোনো বড় শব্দের অংশবিশেষ কেটে বাদ দিয়ে শুধু তার একটা অংশকেই গোটা শব্দের অর্থে ব্যবহার করা হয়। একে **খণ্ডিত শব্দ (Clipped Word)** বলে। এমন প্রয়োগ চলিত ভাষাতেই বেশি হয়ে থাকে। যেমন—মিনি (Minimum), ম্যাক্‌সি (Maximum), এন্‌থু (Enthusiasm), কং-ই (কংগ্রেস-ই), মাইক (মাইক্রোফোন), ফোন (টেলিফোন), কংগ্রাট্ (Congratulation), ভেজ্ (Vegetarian) ইত্যাদি।

এরকম দ্রুত ব্যবহারের সুবিধার জন্যে অনেক সময় আবার একাধিক শব্দে গঠিত একটি নামকে বা পদগুচ্ছকে এমন ভাবে ছোট করা হয় যে তাতে শুধু একটিমাত্র শব্দের অংশবিশেষ নেওয়া হয় না, একাধিক শব্দের প্রথম বর্ণ বা অক্ষরটি নিয়ে সেগুলি যোগ করে একটি শব্দই গড়ে তোলা হয়। একে **মুণ্ডমাল শব্দ (Acrostic Word)** বলে। যেমন—ওয়াব্‌কুটা = WBCUTA (West Bengal College and University Teachers' Association), ইউনেস্কো = Unesco (United Nations Educations Scientific and Cultural Organisations), নেফা = Nefa (North-Eastern Frontier Area), তদেব (তৎ + এব = ibid, < ibidem দপ্‌ড়ে (দরকার পড়লে ডেকো), সি পি এম = CPM (Communist Party Marxist) ইত্যাদি। এরকমের প্রয়োগ সাধু ও চলিত ভাষা এবং উপভাষা সর্বক্ষেত্রেই চলে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে একই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষার নানা স্তর, নানা পার্থক্য থাকে—ভাষার রূপ জটিল ও বিচিত্র। একটি সমাজে ভাষার এইসব জটিল রূপকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণী-বিভক্ত করেছেন ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুম্‌ফিল্ড্‌—

(১) আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা (literary standard), (২) আদর্শ চলিত ভাষা (colloquial standard), (৩) প্রাদেশিক আদর্শ ভাষা (provincial standard), (৪) ইতরজনের ভাষা (sub-standard), (৫) আঞ্চলিক উপভাষা (local dialect)।

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে ব্লুম্‌ফিল্ডের এই শ্রেণীবিভাগ পুরোপুরি গ্রহণীয় নয় এবং সব ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন—বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে আদর্শ চলিত ভাষা ও প্রাদেশিক আদর্শ ভাষা—এরকম দু'টি শ্রেণী বিভাগের উপযোগিতা নেই।

যাই হোক, ভাষার যে এত বিচিত্র রূপ ও স্তরভেদ তার সবগুলি সম্পর্কে সমান গবেষণা হয়নি। সামাজিক উপভাষা সম্পর্কে গবেষণা আধুনিক কালে কিছু কিছু হয়েছে, কিন্তু সে আলোচনা পূর্ণাঙ্গ নয় ; তা এখনো বিস্তৃত গবেষণার অপেক্ষা রাখে। আঞ্চলিক উপভাষার দিকেই ভাষাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি বেশি আকৃষ্ট হয়েছে এবং প্রায় সবদেশের আঞ্চলিক উপভাষার একটা মোটামুটি চিত্র এখন রচিত হয়েছে।

অঞ্চলভেদে একই ভাষার মধ্যে পার্থক্য হওয়ার ফলে ভাষার আঞ্চলিক রূপভেদ প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় Attic-Ionic, Arcadian-Cyprian, Aeolic, Doric প্রভৃতি আঞ্চলিক উপভাষা ছিল। হোমরের মহাকাব্যেও Ionic ও Aeolic উপভাষার পরিচয় রয়েছে। প্রাচীন

ভারতীয় আর্যভাষাতেও আঞ্চলিক পার্থক্য গড়ে উঠেছিল। তখনকার তিনটি প্রধান উপভাষা ছিল : উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে 'উদীচ্য', মধ্য ভারতে (আধুনিক দিল্লি-মিরাট অঞ্চল) 'মধ্যদেশীয়' এবং পূর্বভারতে 'প্রাচ্য'। সম্ভবত আরো একটি উপভাষা ছিল—'দাক্ষিণাত্য'।[৬৭] মধ্যভারতীয় আর্যভাষায়ও প্রথমে চারিটি প্রধান উপভাষা ছিল—উত্তর-পশ্চিমা, দক্ষিণ-পশ্চিমা, মধ্যপ্রাচ্যা এবং প্রাচ্যা। পৃথিবীর আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যেও আঞ্চলিক রূপভেদ কম নয়। পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ইংরেজির দুই প্রধান রূপ—ব্রিটিশ ও আমেরিকান। ব্রিটিশ ইংরেজিও সর্বত্র একরকম নয়—তাতেও উত্তর ও দক্ষিণের দুই প্রধান উপভাষাগত রূপ—Northern English ও Southern English। জার্মান ভাষায় আঞ্চলিক পার্থক্য আরো বেশি। জার্মান ভাষার উপভাষাগুলি সংখ্যায় এত বেশি যে এগুলিকে আলোচনার সুবিধার জন্য মাত্র তিনটি প্রধান গুচ্ছে ভাগ করা হয়—উচ্চ-জার্মান গুচ্ছ (Upper German Group), পশ্চিম-মধ্য জার্মান গুচ্ছ (West-Middle German Group), পূর্ব-মধ্য জার্মানগুচ্ছ (East-Middle German Group)। এই প্রত্যেক গুচ্ছে রয়েছে একাধিক উপভাষা। দক্ষিণ জার্মানির দু'টি উপভাষা Alemanic (Alemanisch) ও Bavarian (Bairisch) নিয়ে উচ্চ জার্মান গুচ্ছ রচিত। Alemanic-এর দু'টি ভাগ—High Alemanic ও Low Alemanic। আবার High Alemanic উপভাষারই তিন অঞ্চলে তিন নাম : সুইজারল্যাণ্ডে Schwyzertütsch, জুরিখে Züritüütsch আর বের্ণে Bärndütsch। পশ্চিম-মধ্য জার্মান গুচ্ছেও অনেকগুলি উপভাষা ; একে High Franconian গুচ্ছও বলা হয়। প্রথমত এর দু'টি উপবিভাগ—Upper Franconian ও Middle Franconian। এদের আবার নানা আঞ্চলিক বৈচিত্র্য, আঞ্চলিক নাম। জার্মান ভাষার সর্বপ্রধান উপভাষাগুচ্ছ—উত্তর জার্মানির East-Middle German Group। এই গুচ্ছেও অনেকগুলি উপভাষা রয়েছে। ক্লপস্টক, লেসিং, হের্ডার, গ্যেটে, শীলার প্রভৃতির প্রমুখের এই উপভাষারই মূল কাঠামোকে অবলম্বন করে রচিত। এই উপভাষাগুচ্ছেরই অন্তর্গত হ্যানোভার-কেন্দ্রিক ভাষা হল আধুনিক আদর্শ জার্মান (Standard German) ভাষার মূল ভিত্তি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় সব ভাষারই রয়েছে নানা আঞ্চলিক বৈচিত্র্য—আঞ্চলিক উপভাষা। বাংলা ভাষায়ও এই নিয়মের

৬৭। Chatterji, Dr, Suniti Kumar : *Indo-Aryan and Hindi,* Calcutta : Firm K. L. Mukhopadhyay, 1969, p. 60.

ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলা ভাষারও প্রধান পাঁচটি উপভাষা রয়েছে। বাংলার পাঁচটি প্রধান উপভাষা ও সেগুলির অবস্থান মোটামুটি এই রকম :

উপভাষা	অবস্থান
রাঢ়ী	মধ্য-পশ্চিমবঙ্গ (পশ্চিম রাঢ়ী—বীরভূম, বর্ধমান, পূর্ব বাঁকুড়া। পূর্ব রাঢ়ী—কলকাতা, ২৪-পরগনা, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি, উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ)।
বঙ্গালী	পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ (ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম)।
বরেন্দ্রী	উত্তরবঙ্গ (মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা)।
ঝাড়খণ্ডী	দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ (মানভূম, সিংভূম, ধলভূম, দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর)।
কামরূপী বা রাজবংশী	উত্তর-পূর্ব বঙ্গ (জলপাইগুড়ি, রংপুর, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা)।

চিত্র নং ৫৭ ঃ বাংলা উপভাষার অবস্থান

এক-একটি উপভাষার অভ্যন্তরেও আবার নানা আঞ্চলিক পার্থক্য গড়ে উঠতে পারে। এই রকম এক-একটি উপভাষার (dialect) মধ্যেও যে নানা আঞ্চলিক পৃথক রূপ গড়ে উঠে তাকে বিভাষা (sub-dialect) বলে। বাংলার উপভাষাগুলির মধ্যে রাঢ়ী ও বঙ্গালীর বিস্তার খুব বেশি। এই জন্যে রাঢ়ী ও বঙ্গালী দুইয়ের অভ্যন্তরে একাধিক বিভাষা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের প্রধান উপভাষা (dialect) রাঢ়ী। যদিও মোটামুটিভাবে রাঢ়ীর দুটি প্রধান বিভাগ—পূর্ব ও পশ্চিম, তবু সূক্ষ্ম বিচারে রাঢ়ীর বিভাগ ৪টি। এগুলি হল : (ক) পূর্ব-মধ্য (east central) : কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া। (খ) পশ্চিম-মধ্য (west central) : পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব বীরভূম, হুগলি, বাঁকুড়া। (গ) উত্তর-মধ্য (north central) : মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দক্ষিণ-মালদহ। (ঘ) দক্ষিণ-মধ্য উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (ডায়মন্ড হারবার)।

পূর্বে বঙ্গালীর দু'টি বিভাষা ছিল—(ক) বিশুদ্ধ বঙ্গালী (ঢাকা, ফরিদপুর,

মৈমনসিংহ, বরিশাল, খুলনা, যশোহর এবং (খ) চাটিগ্রামী (চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি)। এখন এই দু'টি বিভাষার মধ্যে পার্থক্য এত বেশি যে চট্টগ্রামের উপভাষা ঢাকার লোকে প্রায় বুঝতেই পারে না। এখন এ দু'টিকে স্বতন্ত্র উপভাষা ধরাই ভাল।

বাংলা ভাষার উপভাষাগুলির প্রত্যেকটির কিছু কিছু নিজস্ব ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আছে, এই সব বৈশিষ্ট্যের জন্যেই একটি উপভাষা অন্য উপভাষা থেকে পৃথক হয়ে উঠেছে। যেমন—

রাঢ়ীর বৈশিষ্ট্য :

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (phonological features) :

(ক) ই, উ, ক্ষ এবং য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী 'অ'-এর উচ্চারণ হয় 'ও'। যেমন—অতি > [ওতি], মধু > [মোধু], লক্ষ > [লোক্‌খো], সত্য > [শোত্তো]। অন্য ক্ষেত্রেও অ-কারের ও-কার-প্রবণতা দেখা যায়। যেমন—মন > [মোন], বন > [বোন]। কিন্তু অ-কারের এই ও-কার প্রবণতা সর্বত্র লক্ষ্য করা যায় না। যেমন—'দল'-এর উচ্চারণ [দোল] হয় না।

(খ) পূর্ববাংলার বঙ্গালী উপভাষায় শব্দের মধ্যে অবস্থিত 'ই' এবং 'উ' সরে এসে তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে উচ্চারিত হয়। যেমন— করিয়া > কইর‍্যা (অর্থাৎ ক্ + অ + র্ + ই + য়্ + আ > ক্ + অ + ই + র্ + য়্ + আ)। এই প্রক্রিয়াকে বলে অপিনিহিতি। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ী উপভাষায় এর পরবর্তী ধাপের ধ্বনি পরিবর্তন দেখা যায়। এখানে অপিনিহিতির ফলে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে সরে আসা এই 'ই' ও 'উ' পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিশে যায় এবং তার পরবর্তী স্বরধ্বনিকেও পরিবর্তিত করে ফেলে। যেমন—কইর‍্যা > করে (ক্ + অ + ই + র্ + য়্ + আ > ক্ + অ + র্ + এ) (এখানে 'ই' পূর্ববর্তী স্বর 'অ'-এর সঙ্গে মিশে গেছে এবং পরবর্তী স্বর 'আ' তার প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে 'এ' হয়ে গেছে)। একে অভিশ্রুতি বলে। এই অভিশ্রুতি রাঢ়ী উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(গ) রাঢ়ীতে স্বরসঙ্গতির ফলে শব্দের মধ্যে পাশাপাশি বা কাছাকাছি অবস্থিত বিষম স্বরধ্বনি সম স্বরধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। দেশি > দিশি (দ্ + এ + শ্ + ই + > দ্ + ই + শ্ + ই) ইত্যাদি।

(ঘ) শব্দমধ্যস্থ নাসিক্য ব্যঞ্জন যেখানে লোপ পেয়েছে সেখানে পূর্ববর্তী স্বরের নাসিক্যীভবন ঘটেছে। যেমন—বন্ধ > বাঁধ, চন্দ্র > চাঁদ (এসব ক্ষেত্রে নাসিক্য ব্যঞ্জন 'ন্' লোপ পেয়েছে এবং পূর্ববর্তী স্বর 'অ' দীর্ঘ হয়ে 'আ' হয়েছে

এবং অনুনাসিক হয়ে 'আঁ' হয়েছে)। কোথাও কোথাও নাসিক্য ব্যঞ্জন না থাকলেও স্বরধ্বনির স্বতোনাসিক্যীভবন দেখা যায়। যেমন—পুস্তক > পুথি > পুঁথি। এখানে পুস্তক শব্দে কোনো নাসিক্য ব্যঞ্জন নেই ; তা সত্ত্বে 'উ' স্বরধ্বনিটি অনুনাসিক হয়ে 'উঁ' উচ্চারিত হয়।

(ঙ) শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের অন্তে অবস্থিত মহাপ্রাণ ধ্বনি (বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ) স্বল্পপ্রাণ (বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ) উচ্চারিত হয়। যেমন—দুধ > দুদ্, মাছ > মাচ্, বাঘ্ > বাগ্ ইত্যাদি।

(চ) শব্দের অন্তে অবস্থিত অঘোষ ধ্বনি (বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় বর্ণ ইত্যাদি) কখনো কখনো সঘোষ ধ্বনি (বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ ইত্যাদি) হয়ে যায়। যেমন—ছত্র > **ছাত** > **ছাদ**, কাক > **কাগ**। ব্যতিক্রম—**রাত্রি** > **রাত**। অন্যদিকে শব্দের অন্তে অবস্থিত সঘোষ ধ্বনি কখনো কখনো অঘোষ হয়ে যায়। যেমন—ফারসি গুলাব > গোলাপ, ইত্যাদি।

(ছ) 'ল্' কোথাও কোথাও 'ন্'-রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—লবণ > নুন, লুচি > নুচি, লৌহ > নোয়া।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকে বহুবচনে -'দের' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন : কর্মকারক—আমাদের বই দাও। করণকারক—তোমাদের দ্বারা একাজ হবে না।

(খ) সাধারণত সকর্মক ক্রিয়ার দু'টি কর্ম থাকে—মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম। ক্রিয়ার প্রসঙ্গে 'কি?'—এই প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তা মুখ্য কর্ম আর 'কাকে'?—এই প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তা গৌণ কর্ম। রাঢ়ীতে গৌণ কর্মের বিভক্তি হচ্ছে '-কে' এবং মুখ্য কর্মে কোনো বিভক্তি যোগ হয় না। যেমন—আমি রামকে (গৌণকর্ম) **টাকা** (মুখ্য কর্ম) ধার দিয়েছি। রাঢ়ীতে সম্প্রদান কারকেও '-কে' বিভক্তির ব্যবহার করা হয়। যেমন—**দরিদ্রকে** অর্থদান করো।

(গ) অধিকরণ কারকে '-এ' এবং '-তে' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন—**ঘরেতে** ভ্রমর এলো গুণগুণিয়ে। গজদন্ত-**মিনারে** বসে জনতার প্রতি প্রেমের বাণী প্রচার করা ঠিক নয়, বিবেকানন্দের মতো সারা দেশ পায়ে হেঁটে দেখতে হবে।

(ঘ) সদ্য অতীত কালে প্রথম পুরুষের অকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি হল '-ল'। (যেমন—সে গেল = He went) ; কিন্তু সকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি হল '-লে' (যেমন—সে বললে = He said)। সদ্য অতীত কালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি হল '-লুম' (যেমন—আমি বললুম = I said)।

(ঙ) মূল ধাতুর সঙ্গে 'আছ্' ধাতু যোগ করে সেই আছ্ ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষের বিভক্তি যোগ করে ঘটমান বর্তমান ও ঘটমান অতীতের রূপ গঠন করা হয়। যেমন—কর্ + ছি = করছি (আমি করছি), কর্ + ছিল = করছিল (সে করছিল)।

(চ) মূল ক্রিয়ার অসমাপিকার রূপের সঙ্গে আছ্ ধাতু যোগ করে এবং সেই আছ্ ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়ার কাল ও পুরুষবাচক বিভক্তি যোগ করে পুরাঘটিত বর্তমান ও পুরাঘটিত অতীতের ক্রিয়ারূপ রচনা করা হয়। যেমন—করে + ছে = করেছে (সে করেছে), করে + ছিল = করেছিল (সে করেছিল)।

রাঢ়ী উপভাষার নিদর্শন :

কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা—"একজন লোকের দু'টি ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটোটি বাপকে ব'ললে—বাবা, আপনার বিষয়ের মধ্যে যে ভাগ আমি পাবো, তা আমাকে দিন। তাতে তাদের বাপ তার বিষয়-আশয় তাদের মধ্যে ভাগ ক'রে দিলেন।"[৬৮]

(১) বঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য :

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) শব্দমধ্যে অবস্থিত 'ই' বা 'উ' তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে সরে আসে। এই প্রক্রিয়াকে বলে অপিনিহিতি। বঙ্গালী উপভাষায় এই অপিনিহিতির ফলে সরে-আসা স্বরধ্বনি রক্ষিত আছে। যেমন—আজি > আইজ (আ + জ্ + ই > আ + ই + জ্), করিয়া > কইর‍্যা ইত্যাদি। এছাড়া য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন, 'জ্ঞ' ও 'ক্ষ'-এর আগে একটি ইকারের আগম হয়। যেমন—বাক্য > বাইক্ক, যজ্ঞ > যইগ্গ, রাক্ষস > রাইক্খস্ ইত্যাদি।

(খ) নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির (ঙ্, ন্, ম্ ইত্যাদির) লোপ হয় না, ফলে এই রকম লোপের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির নাসিক্যীভবনের প্রক্রিয়া বঙ্গালীতে দেখা যায় না। যেমন—চন্দ্র > চান্দ (এখানে নাসিক্য ব্যঞ্জন 'ন্' রক্ষিত আছে)।

(গ) উচ্চমধ্য অর্ধসংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি 'এ' বঙ্গালীতে নিম্নমধ্য অর্ধবিবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি 'অ্যা'-রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—দেশ > দ্যাশ্।

৬৮। Chatterji, Prof. Suniti Kumar : *Languages and Literatures of Modern India*, Calcutta : Prakash Bhavan, 1963, p. 73.

(ঘ) উচ্চমধ্য অর্ধসংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি 'ও' উচ্চারিত হয় উচ্চ সংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি 'উ'-রূপে। যেমন—লোক > লুক, সোদপুর > সুদপুর, দোষ > দুষ।

(ঙ) সঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ (অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ ঘ্, ধ্, ভ্) বঙ্গালীতে সঘোষ অল্পপ্রাণ (অর্থাৎ বর্গের তৃতীয় বর্ণ গ্, দ্, ব্) রূপে উচ্চারিত হয়। তাছাড়া এগুলি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী দু'টি যুক্ত হয়ে স্বরপথ রুদ্ধ করে দেয় এবং বাইরের বায়ু আকর্ষণ করে উচ্চারণ করতে হয়। এই জন্যে এগুলি রুদ্ধস্বরপথ-চালিত অন্তর্মুখী (Glottalic Ingressive) ধ্বনি। এগুলিকে কেউ কেউ অবরুদ্ধধ্বনি (Recursive) বলেছেন। উদাহরণ—ভাই > বা'ই, ভাত > বা'ত, ঘর > গ'র।

(চ) চ্, ছ্, জ্ প্রভৃতি ঘৃষ্টধ্বনি (affricate) বঙ্গালীতে প্রায় উষ্মধ্বনি (fricative/spirant) রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—চ্ > ৎস্, ছ্ > স্, জ্ > জ় [z]। খেয়েছে > খাইসে, জানতে পারো না > জান্তি [zanti] পারো না।

(ছ) 'স্' ও 'শ্' -স্থানে 'হ্' উচ্চারিত হয়। যেমন—শাক > হা'গ, সে > হে, বসো > বহো।

(জ) শব্দের আদিতে ও মধ্যে 'হ্'-স্থানে 'অ' উচ্চারিত হয়। যেমন—হয় > অ'য়।

(ঝ) তাড়িতধ্বনি 'ড়্' কম্পিতধ্বনি 'র্'-রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—বাড়ি > বারি।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) কর্তৃকারকে (নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট কর্তায়) '-এ' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন —**রামে** খায়। **মায়ে** ডাকে।

(খ) সকর্মক ক্রিয়া প্রসঙ্গে '-কি?'—এই প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে মুখ্য কর্ম বলে এবং 'কাকে?'—এই প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে গৌণ কর্ম বলে। বঙ্গালীতে গৌণ কর্মে ও সম্প্রদান কারকে '-রে' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন—**আমারে** দাও। **রামেরে** কইসি। গরীব **মানসেরে** দু'টি পয়সা দাও।

(গ) অধিকরণ কারকের বিভক্তি হল '-ত'। যেমন—**বাড়িত** থাকুম।

(ঘ) কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকে বহুবচনের বিভক্তি হল '-গো'। যেমন—**আমাগো** খাইতে দিবা না?

(ঙ) ক্রিয়ারূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—রাঢ়ীতে যেটা সাধারণ বর্তমানের রূপ বঙ্গালীতে সেটা ঘটমান অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—মায়ে **ডাকে** (অর্থাৎ মা ডাকছে)।

(চ) সদ্য অতীতে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি হল '-লাম'। যেমন—আমি খাইলাম।

(ছ) রাঢ়ীতে যেটা ঘটমান বর্তমানের বিভক্তি বাঙ্গালীতে সেটা পুরাঘটিত বর্তমানের বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—আমি **করসি** (< করছি) (অর্থাৎ আমি করেছি)।

(জ) মধ্যম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি হল '-বা'। যেমন—তুমি **যাবা** না?

(ঝ) উত্তম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি হল 'উম্' ও '-মু'। যেমন—আমি **যামু** (অর্থাৎ আমি যাবো)। আমি **খেলুম** না (অর্থাৎ আমি খেলব না)।

(ঞ) রাঢ়ীতে অতীত কালের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নঞর্থক অব্যয় যেখানে 'নি', বঙ্গালীতে সেখানে 'নাই'। যেমন—তুমি যাও নাই? (তুমি যাও নি?)

(ট) অসমাপিকার সাহায্যে গঠিত যৌগিক ক্রিয়ার সম্পন্নকালের মূল ক্রিয়াটি আগে বসে, অসমাপিকা ক্রিয়াটি পরে বসে। যেমন—রাম **গ্যাসে গিয়া** (= রাম চলে গেছে)।

বঙ্গালী উপভাষার নিদর্শন :

ঢাকা (মানিকগঞ্জ) : "য়্যাক্ জনের্ দুইডী ছাওয়াল্ আছিলো। তাগো মৈদ্দে ছোটডি তার বাপেরে কৈলো, "বাবা, আমার বাগে যে বিত্তি-ব্যাসাদ্ পরে, তা আমারে দ্যাও।" তাতে তিনি তান্ বিষয়-সোম্পত্তি তাগো মৈদ্দে বাইটা দিল্যান্।"[৬৯]

বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্য :

উত্তরবঙ্গের উপভাষা বরেন্দ্রী ও পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা রাঢ়ীর মধ্যে পার্থক্য খুবই কম, কারণ এ দু'টি প্রথমে একটিই উপভাষা ছিল। পরে উত্তরবঙ্গের ভাষায় পূর্ববঙ্গের উপভাষা বঙ্গালীর ও বিহারের ভাষা বিহারীর প্রভাব পড়ায়, উত্তরবঙ্গের ভাষার কিছু স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠে এবং একটি স্বতন্ত্র উপভাষার সৃষ্টি হয়।

৬৯। Grierson, George Abraham : *Linguistic Survey of India,* Vol. V, Pt. I Delhi, Motilal Banarasidass, reprint 1968. p. 206.

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) বরেন্দ্রীর স্বরধ্বনি অনেকটা রাঢ়ীরই মতো। অনুনাসিক স্বরধ্বনি রাঢ়ীর মতো বরেন্দ্রীতেও রক্ষিত আছে।

(খ) সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি, অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ (যেমন—ঘ্, ঝ্, ঢ্, ধ্, ভ্) শুধু শব্দের আদিতে বজায় আছে, শব্দের মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে প্রায়ই অল্পপ্রাণ হয়ে গেছে (যেমন—বাঘ্ > বাগ্)।

(গ) রাঢ়ীতে সাধারণত শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে, কিন্তু বরেন্দ্রীতে শ্বাসাঘাত অতখানি সুনির্দিষ্ট স্থানে পড়ে না।

(ঘ) বঙ্গালী উপভাষার প্রভাবে বরেন্দ্রীতে জ্ (ɟ) প্রায়ই জ়্ (z)-রূপে উচ্চারিত হয়।

(ঙ) শব্দের আদিতে যেখানে 'র্' থাকার কথা নয় সেখানে 'র্'-এর আগম হয় (যেমন—আম > রাম), আবার যেখানে 'র্' থাকার কথা সেখানে 'র্' লোপ পায় (যেমন— রস > অস)। ফলে 'আমের রস' উত্তরবঙ্গের উচ্চারণে দাঁড়ায় 'রামের অস'।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) বরেন্দ্রীতে অধিকরণ কারকে কখনো কখনো '-ত' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন—ঘরত (= ঘরে)।

(খ) সামান্য অতীতকালে উত্তম পুরুষে '-লাম' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন—খেলাম।

বরেন্দ্রী উপভাষার নিদর্শন :

মালদহ : "য়্যাক্ ঝোন্ মানুসের দুটা ব্যাটা আছ্লো। তার ঘোর বিচে ছোট্কা আপনার বাবাক্ কহ্লে, বাব ধন্-করির যে হিস্যা হামি পামু, সে হামাক্ দে। তাৎ তাঁই তারঘোরকে মালমাত্তা সব ব্যাঁটা দিলে।"[৭০]

কামরূপী (রাজবংশী) উপভাষার বৈশিষ্ট্য :

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, কামরূপীর সঙ্গে বরেন্দ্রীর ভাষাতাত্ত্বিক সাদৃশ্য বেশি, কারণ কামরূপী হল উত্তরপূর্ব বঙ্গের উপভাষা এবং বরেন্দ্রী হল উত্তরবঙ্গের উপভাষা, সুতরাং দু'য়ের মধ্যে ভৌগোলিক নৈকট্য আছে। কিন্তু

৭০। Grierson, George Abraham ; *Linguistic Survey of India,* Vol. V, Part I. Delhi, 1968. p. 130.

কামরূপীর সঙ্গে বরেন্দ্রীর সাদৃশ্য খুবই কম, কারণ বরেন্দ্রী মূলত রাঢ়ীর একটি বিভাগ। বরং কামরূপীর সঙ্গে সাদৃশ্য বেশি বঙ্গালীর। কামরূপী হল কামরূপের (অসমের) নিকটবর্তী বঙ্গালীরই রূপান্তর।

(ক) সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ (ঘ্, ঝ্, ঢ্, ধ্, ভ্) শুধু শব্দের আদিতে বজায় আছে (যেমন—ধরিল, ভরা), মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে প্রায়ই পরিবর্তিত হয়ে অল্পপ্রাণ হয়ে গেছে (যেমন—সমঝা-সমঝি > সম্‌জা-সম্‌জি)।

(খ) বঙ্গালীর মতো কামরূপীতেও 'ড়্' হয়েছে 'র্' এবং 'ঢ়্' হয়েছে 'র্হ্'। কিন্তু এই প্রবণতা সর্বত্র দেখা যায় না। কোচবিহারের উচ্চারণে 'ড়' অপরিবর্তিতই আছে। যেমন—বাড়ির।[৭১]

(গ) চ্ জ্, স্ / শ্ (c ɟ ʃ/s) হয়েছে যথাক্রমে ৎস্, জ্, হ্ [ts z h], কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটি সর্বত্র দেখা যায় না। গোয়ালপাড়া-রংপুরের উচ্চারণে 'স্' রক্ষিত আছে। যেমন—সতেরো > সাতির, সমঝাবার > সমজেবার। দিনাজপুরে 'চ্' অপরিবর্তিত। যেমন—বাচ্চা।[৭২]

(ঘ) রাঢ়ীতে যেমন সাধারণত শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে কামরূপীতে তেমন নয়, কামরূপীতে শ্বাসাঘাত শব্দের মধ্যে এবং অন্তেও পড়ে।

(ঙ) 'ও' কখনো-কখনো 'উ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—কোন্ > কুন্, তোমার > তুমার। তবে এই প্রবণতা সর্বত্র সুলভ নয়। যেমন—কোচবিহার, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থানে 'কোন' উচ্চারণই প্রচলিত।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) সামান্য অতীতে উত্তম পুরুষে '-নু' এবং প্রথম পুরুষে '-ইল' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন—সেবা কনু (সেবা করলাম), কহিল (বলল), ধরিল (ধরল)।

(খ) উত্তম পুরুষের একবচনের সর্বনাম হল—'মুই', হাম'।

(গ) অধিকরণের বিভক্তি হল '-ত'। যেমন—পাছত, পাছৎ (পশ্চাতে)।

(ঘ) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি হল—'র', 'ক'। যেমন—বাপোক (বাপের), ছাগলের।

(ঙ) গৌণ কর্মের বিভক্তি হল '-ক'। যেমন—বাপক্ (= বাপকে), হামাক্ (আমাকে)।

৭১। দাশ. ড. নির্মল : 'উত্তরবঙ্গের ভাষাপ্রসঙ্গ', ১৯৮৪, পৃঃ ১৭।

৭২। তদেব।

কামরূপী (রাজবংশী) উপভাষার নিদর্শন :

কোচবিহার—"এক জনা মান্‌সির্ দুই কোনা বেটা আছিল্। তার মদ্দে ছোট জন উয়ার বাপোক্ কইল্, 'বা, সম্পত্তির যে হিস্যা মুই পাইম্ তাক্ মোক্ দেন।" তাতে তাঁয় তার মালমাত্তা দোনো ব্যাটাক্ বাটিয়া-চিরিয়া দিল্।"[৭৩]

ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য :[৭৪]

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) অনুনাসিক স্বরধ্বনির বহুল ব্যবহার ঝাড়খণ্ডীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন—চাঁ, হইঁছে, উঁট, আঁটা।

(খ) 'ও'-কারের 'অ'-কার প্রবণতাও ব্যাপক। যেমন—লোক > লক, চোর > চর।

(গ) অপিনিহিত ও বিপর্যাসের ফলে শব্দের মধ্যে আগত বা বিপর্যস্ত স্বরধ্বনির ক্ষীণ উচ্চারণ থেকে যায়, তার লোপ বা অভিশ্রুতিজনিত পরিবর্তন হয় না। যেমন—সন্ধ্যা > সাঁইঝ > সাঁ‍ইঝ, কালি > কাইল > কা‍ইল, রাতি > রাইত > রা‍ইত।

(ঘ) অল্পপ্রাণ ধ্বনিকে মহাপ্রাণ উচ্চারণের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন—দূর > ধূর, পতাকা > ফত্‌কা।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি ব্যবহারের রীতি সংস্কৃতে ছিল। এই রীতি অনুসারে বাংলাতেও নিমিত্তার্থে ব্যবহৃত বিভক্তিকে যদি চতুর্থী বিভক্তি বলি তবে বলতে পারি এই বিভক্তি '-কে' ঝাড়খণ্ডীতে ব্যবহৃত হয়। যেমন—বেলা যে পড়ে এল **জলকে** (জলের নিমিত্ত = জল আনতে) চল।

রাঢ়ীতে এসব ক্ষেত্রে বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না, অনুসর্গ (জন্যে, নিমিত্ত, হেতু) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

৭৩। Grierson, George Abraham : *Linguistic Survey of India,* Vol. V, Part I, Delhi. 1968, p. 188.

৭৪। এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করেছেন ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা। দ্রষ্টব্য : (ক) 'ভাষাতত্ত্ব ও ভারতীয় আর্যভাষা' (১৯৭১) এবং 'ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা' (১৯৮৩)।

(খ) নামধাতুর বহুল ব্যবহার ঝাড়খণ্ডীর আরো একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন—এবার শীতে ভারি **জাড়াবে** (নামধাতু 'জাড়')। 'হমর ঘরে চর **সাঁদাইছিল**' (সিঁধিয়েছিল)।

(গ) ক্রিয়াপদে স্বার্থিক '-ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন—**যাবেক** নাই?

(ঘ) যৌগিক ক্রিয়াপদে 'আছ্' ধাতুর বদলে 'বট্' ধাতুর ব্যবহার কোথাও কোথাও দেখা যায়। যেমন—করি **বটে**।

(ঙ) সম্বন্ধপদে ও অধিকরণে শূন্যবিভক্তি অর্থাৎ বিভক্তিহীনতা দেখা যায়। যেমন—সম্বন্ধ :—'**ঘাটশিলা** (ঘাটশিলার) শাড়ী কুনি (কুনির) মনে নাই লাগে।' অধিকরণ :— '**রাইত** (রাতে) ছিলি ঘাটশিলা টাঁইড়ে'।

(চ) অপাদানে **পঞ্চমী** বিভক্তির চিহ্ন হল -নু, -লে, -রু। 'মায়ের লে মাউসীর দরদ (মায়ের চেয়ে মাসির দরদ)।

(ছ) অধিকরণের বিভক্তি হল '-কে'। আঁইজ **রাঁইতকে** ভারি জাড়াবে।

বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য :

নেতিবাচক বাক্যে নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন—চুনটুকু কেনে নাই দিলি (চুনটুকু কেন দিলি না?)।

ঝাড়খণ্ডী উপভাষার নিদর্শন :

মানভূম—"এক লোকের দুটা বেটা ছিল। তাদের মাঝে ছুটু বেটা তার বাপ্‌কে বল্লেক, 'বাপ্ হে, আমাদের দৌলতের যা হিস্বা আমি পাব তা আমাকে দাও।' এতে তার বাপ আপন দৌলৎ বাখরা করে তার হিস্বা তাকে দিলেক।"[৭৫]

॥ ৫১ ॥

সাধু ও চলিত ভাষা

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষা থেকে কিছুটা পৃথক্ হয়ে থাকে। যে সাহিত্যের ভাষা উন্নত চিন্তা, কল্পনা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করে তা অপেক্ষাকৃত মার্জিত, পরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত। অন্য দিকে যে মুখের ভাষা আমরা দৈনন্দিন জীবনে পথে-ঘাটে-হাটে-বাজারে সাংসারিক কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার করি তা

৭৫। Grierson, George Abraham : *Linguistic Survey of India*, Vol. V, Part I, Delhi, 1968, p. 72.

অপেক্ষাকৃত অপরিমার্জিত, অপরিকল্পিত, অবিন্যস্ত, এলোমেলো। এরকমের দ্বিধাবিভক্তি সব দেশের সব উন্নত ভাষার ক্ষেত্রেই দেখা যায়। বাংলা ভাষাতেও এই দ্বিধাবিভক্তি রয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, এই দ্বিধাবিভক্তি ছাড়া বাংলা ভাষায় এক সময় আরো এক রকমের দ্বিধাবিভক্তি দেখা গিয়েছিল। সাহিত্যের ভাষারই দু'টি রূপ ও রীতি গড়ে উঠেছিল। সে দুটি হল—সাধু ও চলিত ভাষা।

অধিকসংখ্যক বিশুদ্ধ সংস্কৃত (তৎসম) শব্দ, মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার শব্দরূপ-ক্রিয়ারূপ, বিভক্তি-অনুসর্গ ইত্যাদি নিয়ে গড়ে ওঠা সাধুভাষা ছিল অনেকটা কৃত্রিম, বিদগ্ধ, ধীর-গম্ভীর ভাষা, যার ব্যবহার ছিল শুধুই সাহিত্যে সীমাবদ্ধ। এই সাধু ভাষার পরিচয় দিতে গিয়ে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

> "...with its forms belonging to Middle Bengali, and its vocabulary highly Sanskritised, it could only be compared to a 'Modern English' with a Chaucerian grammar and a super Johnsonian vocabulary, if such a thing could be conceived.[৭৬]

অন্যদিকে চলিত ভাষা হল জীবন্ত ভাষা। বাংলার মানুষের মুখের জীবন্ত ভাষার যে পাঁচটি প্রধান উপভাষা (রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, কামরূপী ও ঝাড়খণ্ডী), সেগুলির মধ্যে রাঢ়ীর কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের (হুগলি, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা) রূপের উপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এই সর্ববঙ্গীয় আদর্শ চলিত বাংলা (Standard Colloquial Bengali = SCB)।

জর্জ্ আব্রাহাম্ গ্রীয়ার্সনের মতে বিশেষ করে হুগলির উপভাষা হল শিক্ষিত জনের আদর্শ চলিত বাংলার মূল ভিত্তি : "the purest and most admired Bengali is spoken in the area marked as Central and...perhaps, that spoken in the District of Hooghly, near the river of the same name is the shade with which it is considered the most desirable to be familiar."[৭৭] আবার ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে কলকাতা ও নদিয়ার শিক্ষিতজনের কথ্য বাংলাই হল আদর্শ চলিত বাংলার ভিত্তি : "The speech of the upper

---

৭৬। Chatterji Prof. Suniti Kumar : *'The Origin and Development of the Bengali Language,* London. 1970. p. 134.

৭৭। Grierson, George Abraham : *Linguistic Survey of India,* Vol. V, Part I, Delhi. 1968, p. 18

classes in the western part of the Delta and in Eastern Rā ḍha gave the literary language to Bengal, and now the educated colloquial of this tract, especially of the cities of Nadiya and Calcutta, has become the standard one for Bengali, having come to the position of which educated Southern English now occupies in Great Britain and Ireland."[৭৮] আসলে হুগলি বনাম নদিয়ার বিতর্কে না গিয়ে আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি—কলকাতা এবং তার নিকটবর্তী উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, হুগলির কথ্য বাংলাই হল আদর্শ চলিত বাংলার মূল ভিত্তি।

এই চলিত ভাষার শব্দভাণ্ডারে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ কিছু আছে, কিন্তু এর মূল সম্পদ হল সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আসা বিপুল তদ্ভব শব্দভাণ্ডার আর এদেশের আর্যপূর্ব জাতিদের ভাষা থেকে স্বাভাবিক ভাবে গৃহীত দেশি শব্দসমূহ। এর শব্দরূপ, ক্রিয়ারূপ, বাক্যগঠন মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষা থেকে গৃহীত নয়, একালের মুখের জীবন্ত ভাষা থেকে গৃহীত। এ ভাষা শুধু সাহিত্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ ভাষা এখন যেমন সাহিত্যের ভাষা তেমনি শিক্ষিতজনের মৌখিক ভাববিনিময়ের মার্জিত মাধ্যম।

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই সাহিত্যে সাধু ও চলতি ভাষার ব্যবহার প্রায় সমান্তরাল ভাবে হতে থাকে যদিও প্রথমে সাধু ভাষায় ধারাটি ছিল বেশি পুষ্ট এবং চলিত ভাষার ধারাটি ছিল ক্ষীণ। বাংলা সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে এই দুই ধারার প্রতিষ্ঠার কাহিনী বিস্ময়কর। খ্রীস্টান মিশনারি ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকেরা যখন বাংলায় ধর্মগ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে উদ্যোগী হন তখন তাঁদের সামনে সাহিত্যিক গদ্যের কোনো আদর্শ ছিল না। বাঙালির মুখে গদ্যভাষার ব্যবহার তাঁরা শুনেছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু এই মৌখিক ভাষা গুরুগম্ভীর বিষয়ের মাধ্যম হিসাবে হয়তো তাদের কাছে যোগ্য মনে হয় নি। তখন তাঁরা ভাষাকে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর করার জন্যে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ভাষা থেকে ক্রিয়ারূপ, শব্দরূপ, বিভক্তি, অনুসর্গ ইত্যাদি গ্রহণ করেন এবং অধিক সংখ্যক সংস্কৃত শব্দ ও কিছু আরবি, ফারসি ও দেশি শব্দ নিয়ে বাংলা সাধু ভাষার মূল কাঠামোটি প্রথম রচনা করেন। এঁদের মধ্যে যাঁর হাতে বাংলা সাধু গদ্যের প্রাথমিক রূপটি বিশেষভাবে গড়ে উঠেছিল তিনি হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তার পরে এই সাধু গদ্যের আরো যুক্তিনির্ভর দৃঢ়পিনদ্ধ রূপ রচনা করেন রামমোহন রায়। তিনিই প্রথম 'সাধুভাষা' কথাটি ব্যবহার করেন তাঁর

৭৮। Chatterji, Prof. Suniti Kumar : *The Origin and Development of the Bengali Language,* Vol. I, London, 1970. p. 139.

'বেদান্ত গ্রন্থে' (১৮১৫)। মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহনের গঠিত সাধুগদ্যের কাঠামোতে ছন্দঃস্পন্দন ও শিল্পগুণ সঞ্চারিত করে একে প্রথম আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের যোগ্য মাধ্যম করে তোলেন বিদ্যাসাগর। অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীদের হাতে এই ধারা পুষ্ট হতে থাকে। শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে এসে বাংলা সাধু-গদ্য পূর্ণ বিকশিত রূপ লাভ করে—একাধারে সৃজনধর্মী ও মননধর্মী সাহিত্যের যোগ্য প্রকাশমাধ্যম হয়ে উঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে ক্রমে এই ধারায় একটা সরলীকরণের প্রবণতা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে এবং সাধুগদ্য তার আভিজাত্যের সিংহাসন থেকে জনজীবনের ভাষার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে পাত্রপাত্রীর সংলাপে চলিত গদ্য ব্যবহার করেছেন, শুধু বর্ণনায় ও বিবৃতিতে রেখেছেন সাধুগদ্য। কিন্তু সাধু গদ্যেও শুধু পুরানো কাঠামোটুকুই বজায় রেখেছেন তিনি, এর শব্দসম্ভারে এনেছেন জীবন্ত ভাষার উপাদান। শরৎচন্দ্রের ভাষায় সাধুগদ্যের শুধু বাহ্য খোলসটুকু আলগাভাবে লেগে আছে ; প্রাণধর্মের দিক থেকে এ ভাষা বাঙালির জীবন্ত চলিত ভাষাই। শরৎচন্দ্রের এই ধারাই মোটামুটিভাবে অনুসরণ করেছেন—বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে বিভূতিভূষণের হাতে বাংলা গদ্য সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাধর্মী প্রকাশমাধ্যম রূপে চরম বিকাশ লাভ করেছে। তারপরে ক্রমে সাধুগদ্যের বাহ্য কাঠামোটুকুও খসে গেছে এবং বাংলা সাহিত্য থেকে সাধু গদ্য বিদায় গ্রহণ করেছে।

সাহিত্যে চলিত গদ্যের ব্যবহার প্রথমে ক্ষীণ ধারায় সূচিত হয় এবং ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করে। উইলিয়াম কেরীর 'কথোপকথনে'-র বিভিন্ন শ্রেণীর সংলাপে ব্যবহৃত গদ্য যদিও সর্ববঙ্গীয় ব্যবহারের উপযোগী আদর্শ চলিত বাংলা (Standard Colloquial Bengali) ছিল না, তবু এখানেই মৌখিক গদ্য সাহিত্যে প্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করে। তারপরে বিদ্যাসাগরের শকুন্তলার সংলাপ-অংশে ইতস্ততভাবে কিছু চলিত গদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। ইংরেজ শাসনের সময় কলকাতা বাংলার রাজধানী এবং আইন-আদালত ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল আর ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের সময় কলকাতা শিক্ষা-সাহিত্যচর্চা-সামাজিক আন্দোলনের কেন্দ্রও ছিল। ফলে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষা প্রাধান্য পায় এবং শিক্ষিত ব্যক্তির ভাববিনিময়ের সর্বজনীন মাধ্যম হয়ে ওঠে। এই কলকাতা অঞ্চলের চলিত ভাষাকে, কিঞ্চিৎ সাধুভাষার মিশ্রণসহ, সাহিত্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বলিষ্ঠ আসন দেন প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) তাঁর 'আলালের ঘরের দুলালে' (১৮৫৮) এবং পুরোপুরি চলিত ভাষার ব্যবহার করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় (১৮৬২)। বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদ মিত্রের ব্যবহৃত কথ্য ভাষাকে স্বীকৃতি

জানিয়েছিলেন এবং এই ভাষাকে 'অপর ভাষা' নামে অভিহিত করেছিলেন। একটি প্রবন্ধে তিনি এই ভাষাকে 'প্রচলিত ভাষা'ও বলেছিলেন। মনে হয় এই 'প্রচলিত ভাষা' থেকেই পরে 'চলিত ভাষা' কথাটির প্রচলন হয়। এর পর থেকেই কলকাতা অঞ্চলের কথ্য বাংলার উপরে ভিত্তি করে আদর্শ চলিত বাংলার সর্বজনীন রূপ গড়ে তোলার এবং সাহিত্যে তার ব্যাপক প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন সূচিত হয়। বিবেকানন্দের মতো সন্ন্যাসী সংস্কারকও এক্ষেত্রে আশ্চর্য দূরদৃষ্টি ও বাস্তব বোধের সঙ্গে চলিত ভাষার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। ইতিমধ্যে বাংলা নাটকের সংলাপে চলিত গদ্যের ব্যবহার হয়েই আসছিল। উপন্যাসের সংলাপে বঙ্কিমচন্দ্র এবং প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ সাধারণত সাধু গদ্যের ব্যবহার করলেও সংলাপে কোথাও কোথাও চলিত গদ্যের ব্যবহার করেছিলেন। ১৯১৪ সালে যখন প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশ করে চলিত গদ্যের সপক্ষে ব্যাপক সাহিত্যিক আন্দোলন শুরু করেন তখন রবীন্দ্রনাথও তাতে উৎসাহিত হয়ে সাহিত্যে সাধু গদ্যের ব্যবহার প্রায় ছেড়েই দেন এবং পুরোপুরি চলিত গদ্যে লেখা আরম্ভ করেন। তারপর থেকেই সাহিত্যে ক্রমে চলিত গদ্য একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

একদিকে শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায় সাধু গদ্য ক্রমশ সরলীকৃত হয়ে মৌখিক গদ্যের কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে, অন্য দিকে চলিত গদ্য আঞ্চলিকতার গণ্ডি পেরিয়ে প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বিদগ্ধ লেখকের হাতে মার্জিত হয়ে গেছে। ফলে এখন সাধু গদ্য ও চলিত গদ্যের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ কমে এসেছে। এখন সাধু গদ্য ও চলিত গদ্যের মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য শুধু এই কয়েকটি দিকে লক্ষ্য করা যায় :

(ক) সাধারণত সাধুভাষার শব্দভাণ্ডারে তৎসম (সংস্কৃত) শব্দ বেশি, কিন্তু চলিত ভাষায় তদ্ভব ও দেশি-বিদেশি শব্দের আধিক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য এখন অবশ্য প্রায় নেই বললেই চলে।

(খ) সমাসবদ্ধ পদের সংখ্যা সাধু ভাষায় বেশি, চলিত ভাষায় কম।

(গ) সাধু ভাষার সর্বনামের পূর্ণ বিস্তৃত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন— তাহা, যাহা, তাহার, যাহার, তাহাদের, তাহাদিগের, যাহাদের, যাহাদিগের, ইহা, উহা ইত্যাদি। চলিত ভাষায় অনেক সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন—তা, যা, তার, যার, তাদের, যাদের, এ, ও ইত্যাদি।

(ঘ) ক্রিয়ারও অনেকক্ষেত্রে সাধু ভাষায় দীর্ঘরূপ প্রচলিত, চলিত ভাষায় প্রচলিত সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন—সাধুভাষা :—করিয়া, করিতেছি, করিয়াছি, করিয়াছিলাম ইত্যাদি। চলিত ভাষায় সেখানে দেখা যায়—করে, করছি, করেছি,

করেছিলাম ইত্যাদি।

(ঙ) বিভক্তির বদলে ব্যবহৃত কতকগুলি অনুসর্গেও সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন—সাধুভাষা :—দ্বারা, সহিত, সমভিব্যাহারে, হইতে, অভ্যন্তরে ইত্যাদি। চলিত ভাষা :—দিয়ে, সঙ্গে, থেকে, ভেতরে বা মধ্যে ইত্যাদি।

(চ) যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার সাধু ভাষায় বেশি, চলিত ভাষায় অপেক্ষাকৃত কম। যেমন—সাধুভাষা :—গমন করা, শয়ন করা, শ্রবণ করা, আহার করা ইত্যাদি। চলিত ভাষা :—যাওয়া, শোয়া, শোনা, খাওয়া ইত্যাদি।

(ছ) কথ্য ভাষায় প্রচলিত প্রবাদ প্রবচন (Proverbs) ও বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছ (Idioms) চলিত ভাষায় সহজেই খাপ খেয়ে যায়, সাধুভাষায় সেগুলির প্রয়োগ বিরল।

(জ) সাধুভাষার বাক্যে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া—এই বিন্যাসক্রম সাধারণত লঙ্ঘন করা হয় না। চলিত ভাষার বাক্যে পদের বিন্যাসক্রম অতখানি যান্ত্রিক নয়, অনেকখানি নমনীয়।

সাধু ও চলিত ভাষা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে প্রায় সমান্তরালভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। তখন সাহিত্যে সাধুভাষা ব্যবহৃত হবে, না চলিত ভাষা ব্যবহৃত হবে—এই সমস্যা বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। বিভিন্ন মনীষী ও সমালোচক এই বিতর্কে এক-এক পক্ষে নানা যুক্তি উপস্থাপিত করেছিলেন। আজ সাধুভাযা বনাম চলিত ভাষার বিতর্কের পুনঃ অবতারণার কোনো উপযোগিতা নেই। কারণ ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনধারার ইতিহাসই এই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে এবং মহাকবির ভবিষ্যৎ-বাণী এক্ষেত্রে অব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে :

> "রূপকথায় বলে, এক-যে ছিল রাজা, তার দুই ছিল রানী, সুয়োরানী আর দুয়োরানী। তেমনি বাংলা বাক্যাধিপেরও আছে দুই রানী— একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধুভাষা ; আর একটাকে কথ্য ভাষা, কেউ বলে চলিত ভাষা।...আমার বিশ্বাস সুয়োরানী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরানী বসবেন রাজাসনে।"

—রবীন্দ্রনাথ

॥ ৫২ ॥

ভারতের অন্‌-আর্য ভাষাসমূহ
(Non-Aryan Languages of India)

পৃথিবীর মূল ভাষাবংশগুলির মধ্যে চারটি বংশ থেকে জাত আধুনিক ভাষা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত আছে। এই বংশগুলি হল : (১) ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European), (২) অস্ট্রিক (Austric), (৩) দ্রাবিড় (Dravidian) এবং (৪) ভোট-চীনীয় (Sino-Tibetan)। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এগুলির বিকল্প নাম দিতে চেয়েছেন যথাক্রমে (১) আর্য, (২) নিষাদ (৩) দ্রমিড় বা দ্রাবিড় এবং (৪) কিরাত। এই সব ভাষাভাষী জাতি ছাড়া আরো দু'টি আদি জাতি ভারতে প্রাচীনকালে এসেছিল— সেমিটিক ও নিগ্রো। কিন্তু এদের কোনো ভাষা ভারতে আর প্রচলিত নেই।

ইন্দো-ইউরোপীয় ছাড়া অন্য যেসব বংশের ভাষা ভারতে প্রচলিত আছে সেইগুলিকেই আমরা ভারতের অন্‌-আর্য ভাষা বলছি। এই ভাষাগুলির উৎস ও পরিচয় নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হল :

(১) অস্ট্রিক (নিষাদ) ভাষাবংশ

পশ্চিম এশিয়া থেকে প্রত্ন-অস্ট্রালয়েড্ (Proto-Australoid) জাতির যে শাখা ভারতে এসেছিল তারাই এখানকার পূর্ববর্তী অধিবাসী নিগ্রোদের সঙ্গে মিশে অস্ট্রিক জাতির সৃষ্টি করে। ভারতে এখন যেসব বংশের ভাষা পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অস্ট্রিক বংশই হল ভারতে আগত প্রাচীনতম বংশ। ভারতে প্রচলিত অস্ট্রিক বংশের ভাষাগুলির জন্ম-উৎস নিম্নে দেখানো হল (চিত্র নং ৫৮)
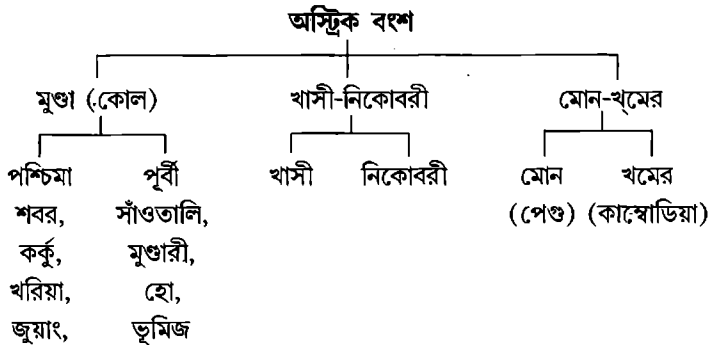
চিত্র নং ৫৮ : অস্ট্রিক বংশের ভাষা

এই বংশের ভাষাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল সাঁওতালি। কারণ আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালি ভাষাভাষী জনসাধারণের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। সাঁওতালি ভাষা বিহারের ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগনা, রাঁচি প্রভৃতি অঞ্চলেই বেশি প্রচলিত। এই ভাষা এখন নিজস্ব লিপি আল্‌চিকিতে লিখিত হয়।

অস্ট্রিক বংশের ভাষার প্রভাব বাংলায় সবচেয়ে বেশি। এই বংশ থেকে সংস্কৃত হয়ে কতকগুলি শব্দ বাংলায় এসেছে। যেমন—তাম্বূল, কদলী, অলাবু (লাউ) ইত্যাদি। আর বহু শব্দ সোজাসুজি অস্ট্রিক থেকে বাংলায় এসেছে এবং 'দেশি' শব্দ নামে খাঁটি বাংলার মূল শব্দভাণ্ডার গঠন করেছে। অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস প্রমুখ পণ্ডিতেরা সম্প্রতি প্রমাণ করেছেন বাংলায় যেসব শব্দকে আমরা আর্য ভাষার শব্দ বলি তাদের মধ্যে অনেকগুলিই অস্ট্রিক উৎস থেকে জাত পরিবর্তিত শব্দ। বাংলায় আগত অস্ট্রিক শব্দের নিদর্শন—খোকা, খুকি, খড়, খুঁটি, ঢেঁকি, ঢিল, ঢিবি, ঝিঙ্গা, চিংড়ি, মুড়কি ইত্যাদি। এমন কি, 'বঙ্গ' শব্দটিও অস্ট্রিক উৎসজাত।

(২) দ্রাবিড় (দ্রমিড়) ভাষাবংশ

দ্রাবিড় বংশের প্রধান ভাষাগুলির উৎস নির্দেশ নিম্নোক্ত চিত্রের (চিত্র নং ৫৯) সাহায্যে দেখানো যেতে পারে।
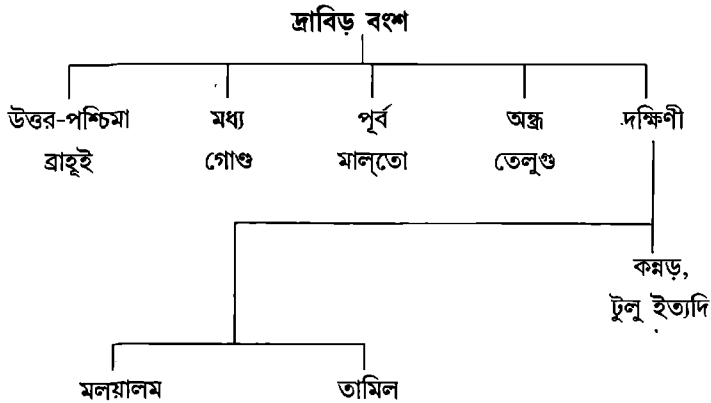
চিত্র নং ৫৯ : দ্রাবিড় বংশের ভাষা

অস্ট্রিকদের পরে ভারতে এসেছিল দ্রাবিড় জাতির লোকেরা (আঃ খ্রীস্টপূর্ব ৩৫০০)। এই দ্রাবিড়দের আদি বাসস্থান ছিল সম্ভবত ভূমধ্যসাগরীয় (Mediterranian) অঞ্চল। ভারতে আসার পরে দক্ষিণ ভারতে এই ভাষার প্রায় একচ্ছত্র বিস্তার ঘটে। এখন দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র প্রদেশে তেলুগু, তামিলনাড়ু, পণ্ডিচেরী ও সিংহলে তামিল, কর্ণাটকে (মহীশূর) কন্নড়, কেরালায় মলয়ালম, উত্তর-পশ্চিম ভারতের বেলুচিস্তানে ব্রাহুই, মধ্যভারতে গোণ্ড বা গোণ্ডী, বাংলার রাজমহল পাহাড়ে মাল্‌তো (মাল পাহাড়ী) ভাষা প্রচলিত। প্রাচীন সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তামিল, ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিকতম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মলয়ালম্ ভাষা বিশেষ সমৃদ্ধ।

অস্ট্রিক বংশের মতো দ্রাবিড় বংশের প্রভাব বাংলা ভাষায় অতখানি ব্যাপক ও প্রত্যক্ষ নয়। দ্রাবিড় ভাষার যা প্রভাব পড়েছে তা মূলত সংস্কৃতের মাধ্যমে অর্থাৎ পরোক্ষভাবে। অনেকের মতে মূল আর্যভাষায় ট্ ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্, ষ্ প্রভৃতি মূর্ধন্য ধ্বনি ছিল না, এইসব ধ্বনি তামিল ভাষা থেকেই আর্যভাষা সংস্কৃতে এসেছিল এবং সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে উত্তরাধিকার-সূত্রে। কিন্তু এই মতবাদ সকলে সমর্থন করেন না। শব্দে ও বাক্যে আদি শ্বাসাঘাতের বিধিটিও দ্রাবিড় প্রভাবজাত। ধ্বনিগত প্রভাব ছাড়া রূপতাত্ত্বিক ক্ষেত্রেও কিছু প্রভাব এসেছে। যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার বাংলায় দ্রাবিড় রীতি অনুসারী। সমাপিকা ক্রিয়ার বদলে শতৃ-শানচ্ প্রভৃতি প্রত্যয়যুক্ত (শত্রন্ত ও নিষ্ঠান্ত) নামপদের ব্যবহারের রীতি দ্রাবিড় ভাষা থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে বাংলায় এসেছে। বাংলার বহুবচনের বিভক্তি -গুলা, -গুলি কারো কারো মতে এসেছে তামিল ভাষার -গল বিভক্তি থেকে। শব্দভাণ্ডারেও কিছু তামিল উৎসজাত শব্দ পাই। যেমন—পিলে (ছেলেপিলে) (< পিল্লৈ), উলু (উলু ধ্বনি), অনল, কজ্জল, কুন্তল, কুণ্ডল, চন্দন ইত্যাদি।

(৩) ভোট-চীনীয় (কিরাত) ভাষাবংশ

পূর্বদিকের কোনো দেশ থেকে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে ভোট-চীনীয় বংশের লোকেরা ভারতবর্ষে আসে। এই বংশের ভাষাগুলি এখন ব্রহ্মদেশ ও চীনের নিকটবর্তী আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং হিমালয়ের পাদদেশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আকারে প্রচলিত আছে। এই বংশের ভারতীয় ভাষাগুলির উৎসগত পরিচয় এইরকম (দ্রঃ চিত্র নং ৬০) :
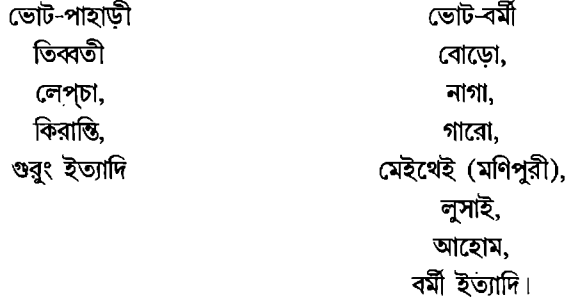
চিত্র নং ৬০ : ভোট-চীনীয় বংশের ভাষা

এই বংশের ভাষার প্রভাব বাংলায় বিশেষ কিছু দেখা যায় না।

॥ ৫৩ ॥

বাংলা শব্দভাণ্ডার

(Bengali Vocabulary)

ভাষার সম্মান নির্ভর করে তার প্রকাশক্ষমতার উপরে। যে ভাষা যত বিচিত্র ভাব ও বস্তু এবং যত গভীর অনুভূতি প্রকাশ করতে সক্ষম সে ভাষা তত উন্নত। ভাষার এই প্রকাশক্ষমতার মূল আধার হল ভাষার শব্দসম্পদ। ভাষার এই শব্দসম্পদ আবার তিনভাবে সমৃদ্ধ হয়—উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন শব্দের সাহায্যে, অন্য ভাষা থেকে গৃহীত কৃতঋণ শব্দের সাহায্যে এবং নতুন সৃষ্ট শব্দের সাহায্যে। আজকের উন্নত বাংলা ভাষাও এই ত্রিবিধ উপায়ে নিজের শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে উৎসগত বিচারে আমরা প্রথমত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি— (১) মৌলিক বা নিজস্ব

(২) আগন্তুক বা কৃতঋণ (৩) নবগঠিত।

যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক ও সংস্কৃত) থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে বাংলায় এসেছে সেইগুলিকে **মৌলিক শব্দ** বলে। বৈয়াকরণরা আবার আর এক শ্রেণীর শব্দকে ব্যাকরণে মৌলিক নামে অভিহিত করে থাকেন—যেসব শব্দকে ক্ষুদ্রতর অর্থপূর্ণ অংশে ভাগ করা যায় না, ভাগ করলে অংশগুলির কোনো অর্থ হয় না। সেইসব শব্দকে তাঁরা মৌলিক শব্দ বলেছেন। নামকরণের এই গোলযোগ এড়াবার জন্যে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে আগত শব্দগুলিকে উত্তরাধিকাব-লব্ধ নিজস্ব বলতে পারি। এই উত্তরাধিকার-লব্ধ মৌলিক বা নিজস্ব শব্দগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়— (ক) তৎসম, (খ) অর্ধতৎসম ও (গ) তদ্ভব।

যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক / সংস্কৃত) থেকে অপরিবর্তিতভাবে বাংলায় এসেছে সেগুলিকে **তৎসম** (Tatsama) শব্দ বলে। 'তৎ' বলতে এখানে মূল উৎস-স্বরূপ বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষাকে বোঝাচ্ছে। 'তৎসম' মানে ঠিক তার মতো, অর্থাৎ অপরিবর্তিত শব্দ। বাংলায় বহু প্রচলিত তৎসম শব্দের সংখ্যা কম নয়। যেমন—জল, বায়ু, কৃষ্ণ, সূর্য, মিত্র, জীবন, মৃত্যু, বৃক্ষ, লতা, নারী, পুরুষ ইত্যাদি।

তৎসম শব্দগুলিকে আবার দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—**সিদ্ধ তৎসম** ও **অসিদ্ধ তৎসম**। যেসব শব্দ বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় এবং যেগুলি ব্যাকরণ-সিদ্ধ সেগুলি হল সিদ্ধ তৎসম। যেমন—সূর্য, মিত্র, কৃষ্ণ, নর, লতা ইত্যাদি। আর যেসব শব্দ বৈদিক বা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না ও সংস্কৃত ব্যাকরণসিদ্ধ নয় অথচ প্রাচীনকালে মৌখিক সংস্কৃতে প্রচলিত ছিল, সেগুলিকে ড. সুকুমার সেন অসিদ্ধ তৎসম শব্দ বলেছেন। যেমন— কৃষাণ, ঘর, চাল, ডাল (বৃক্ষশাখা) ইত্যাদি।

যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্য (বৈদিক সংস্কৃত) থেকে মধ্যবর্তী স্তর প্রাকৃতের মাধ্যমে না এসে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং আসার পরে কিঞ্চিত পরিবর্তন ও বিকৃতি লাভ করেছে, সেগুলিকে **অর্ধতৎসম** (Semi-tatsama) বা **ভগ্নতৎসম** শব্দ বলে। যেমন— কৃষ্ণ > **কেষ্ট, নিমন্ত্রণ** > **নেমন্তন্ন**, ক্ষুধা > **খিদে**, রাত্রি > **রাত্তির** ইত্যাদি।

যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে সোজাসুজি বাংলায় আসেনি, মধ্যবর্তী পর্বে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তন লাভ করে বাংলায় এসেছে তাদের **তদ্ভব শব্দ** বলে। খাঁটি বাংলার মূল শব্দসম্পদ হল এইসব তদ্ভব শব্দ। উদাহরণ—সংস্কৃত ইন্দ্রাগার > প্রাকৃত ইন্দাআর > বাংলা ইন্দারা, সংস্কৃত একাদশ > প্রাকৃত এগ্‌গারহ > বাংলা এগার, সংস্কৃত উপাধ্যায় > প্রাকৃত উবজ্‌ঝাঅ > বাংলা ওঝা, সংস্কৃত কৃষ্ণ

> প্রাকৃত কণ্হ > বাংলা কানু, সংস্কৃত ধর্ম > প্রাকৃত ধম্ম > বাংলা ধাম ইত্যাদি।

কখনো কখনো দেখা যায় একই মূল শব্দ থেকে জাত অর্ধতৎসম ও তদ্ভব দুই রূপই বাংলায় একই অর্থে প্রচলিত আছে। যেমন— কৃষ্ণ > অর্ধতৎসম কেষ্ট, তদ্ভব কানু ; রাত্রি > অর্ধতৎসম রাত্তির, তদ্ভব রাত ইত্যাদি।

তদ্ভব শব্দকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—নিজস্ব ও কৃতঋণ তদ্ভব। যেসব তদ্ভব শব্দ যথার্থই বৈদিক বা সংস্কৃতের নিজস্ব শব্দের পরিবর্তনের ফলে এসেছে সেগুলিকে নিজস্ব তদ্ভব বলতে পারি। যেমন— ইন্দ্রাগার > ইন্দাআর > ইন্দারা, উপাধ্যায় > উবজ্‌ঝাঅ > ওঝা ইত্যাদি। আর যেসব শব্দ প্রথমে বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের অন্য ভাষা থেকে বা ইন্দো-ইউরোপীয় ছাড়া অন্য বংশের ভাষা থেকে কৃতঋণ শব্দ (Loan word) হিসাবে এসেছিল এবং পরে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তন লাভ করে বাংলায় এসেছে সেসব শব্দকে **কৃতঋণ তদ্ভব** ব **বিদেশি তদ্ভব শব্দ** বলে। যেমন— ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্য ভাষা থেকে : গ্রীক দ্রাখ্‌মে (drakhme = 'মুদ্রা') > সংস্কৃত দ্রম্য > প্রাকৃত দম্ম > বাংলা দাম।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ ভিন্ন অন্য বংশ থেকে : দ্রাবিড় বংশের তামিল পিল্লৈ > সংস্কৃত পিল্লিক > প্রাকৃত * পিল্লিজ > বাংলা পিলে (ছেলে-পিলে), তামিল কাল > সংস্কৃত খল্ল > প্রাকৃত খল্ল > বাংলা খাল। অস্ট্রিক বংশ থেকে আগত সংস্কৃত ঢক্ক > প্রাকৃত ঢক্ক > বাংলা ঢাকা। মোঙ্গল বংশ থেকে আগত সংস্কৃত তুর্ক > প্রাকৃত তরুক্ক > বাংলা তুরুক।

যেসব শব্দ সংস্কৃতের নিজস্ব উৎস থেকে বা অন্য ভাষা থেকে সংস্কৃত হয়ে আসেনি, অন্য ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে সেই শব্দগুলিকে **আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ** (Loan words) বলতে পারি। এগুলি অন্য ভাষা থেকে সংস্কৃত প্রাকৃত হয়ে বাংলায় আসেনি বলে এইগুলি হল কৃতঋণ শব্দ ; কৃতঋণ তদ্ভব শব্দ থেকে এগুলি পৃথক। এই আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ দুই শ্রেণীর—দেশি ও বিদেশি।

যেসব শব্দ এদেশেরই অন্য ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে সেগুলিকে দেশি (Deshi) শব্দ বলে। দেশি শব্দ আবার দু'রকম হতে পারে— অন্-আর্য এবং আর্য। যেমন— অন্-আর্য :— অস্ট্রিক বংশের ভাষা থেকে ডাব, ঢোল, ঢিল, ঢেঁকি, ঝাঁটা, ঝোল, ঝিঙ্গা, কুলা ইত্যাদি। আর্য :— হিন্দি থেকে লগাতার, বাতাবরণ, সেলাম, দোস্ত্, ওস্তাদ, মস্তান, ঘেরাও, জাঠা (এগুলির মধ্যে যেগুলি মূলত আরবি-ফারসি শব্দ, সেগুলি আরবি-ফারসি থেকে এদেশেরই ভাষা হিন্দির মাধ্যমে বাংলায় এসেছে বলে সেগুলিকেও দেশি শব্দ রূপে গ্রহণ করতে হবে)। গুজরাতি থেকে—হরতাল।

যেসব শব্দ এদেশের বাইরের কোনো ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে সেগুলিকে বিদেশি শব্দ বলে। যেমন– ইংরেজি থেকে স্কুল, কলেজ, চেয়ার, টেবিল, ফাইল, টিকিট, কোট, লাট (<Lord), সিনেমা, থিয়েটার, হোটেল, কমিটি ইত্যাদি।

যেসব ভাষা থেকে বাংলায় বিদেশি শব্দ গৃহীত হয়েছে তাদের মধ্যে ইংরেজির শব্দসংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। ইংরেজি আমাদের প্রতিদিনের জীবনে কীরকম মিশে গেছে তার একটা চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন কবি-সমালোচক ড. জগন্নাথ চক্রবর্তী :

"যদি কেউ বলেন আমরা সকাল থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত অনুক্ষণ ইংরেজির দ্বারা শাসিত, তবে তিনি খুব ভুল বলবেন না। আমরা টুথব্রাশ, টুথপেইস্ট দিয়ে দাঁত মাজি, ব্লেড দিয়ে শেইভ করি, হকার পেপার দিয়ে গেলে বক্সনম্বর দেওয়া বিজ্ঞাপনে চোখ বুলাই। ম্যানেজার, রিসেপ্শনিস্ট, ক্যানভাসার, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, সেইলসম্যান, হোটেল, সিনেমা, থিয়েটার, পোর্ট কমিশন, জুনিয়র বা সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট বা একজিকিউটিভ নানা পদ, নানা প্রতিষ্ঠান, এবং বি-এসসি, বি-ই, বি-কম নানারকমের যোগ্যতার ফিরিস্তি। টেলিফোন রিং করলে তুলে দেখি রং নাম্বার ; নিজের প্রয়োজনে ডায়ালটোনই পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও কনেকশনের জন্য অনেকটা দৈববাণীর মতো ওয়ান-নাইন-নাইন নামক অপারেটরের শরণাপন্ন হই। রিপ্লাই পোস্টকার্ডে ডটপেন দিয়ে ঠিকানা লিখতে লিখতে মনে পড়ে সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাশ বই থেকে শেষ ব্যাল্যান্সটা টুকে নিতে হবে। অফিসে বেরোবার আগে মানিব্যাগ (টাকার থলি অবশ্যই নয়), রেশন কার্ড, ব্রেড কুপন, চেক বই, ড্রাইভিং লাইসেন্স সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিই। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে সাবধানে ড্রাইভ করি, কারণ অ্যাকসিডেন্টের ঝুঁকি সর্বত্র ; রীতিমত সিগন্যাল দিই, হর্ন দিই, ব্রেক কষি, উত্তেজিত হয়ে অ্যাকসিলারেটর চাপি না, ওভারব্রীজে কখনো ওভারটেইক করি না, জেব্রা ক্রসিংয়ে সংযত থাকি, স্পীডলিমিট রক্ষা করি ; কিন্তু ট্রাফিক জ্যাম সর্বত্র। অফিসে লেইট করতে চাই না। লাঞ্চের আগেই ফাইল ধরি, স্টেনোকে ডেকে ডিকটেশন দিই, সিংগল না ডাবল্ স্পেইসে টাইপ হবে তাও বলে দিই। ক্যাজুয়াল লীভ, মেডিক্যাল লীভের দরখাস্তগুলি রেকমেণ্ড করে যথাস্থানে পাঠাই। অফিসে নানা গুজব পে-কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে–ডি-এ, টি-এ, গ্র্যাটুইটি, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ধারা নিয়েই সমালোচনা। বন্ধু নার্সিং হোমে রয়েছেন, তাঁকে একবার দেখতে যাওয়া দরকার ; ক্যাপসুল, ইন্‌জেকশন, ব্লাডপ্রেসার, অপারেশন প্রভৃতির কথাই সেখানে শুনতে হবে। যদি না যাওয়া হয় এবং সকাল সকাল

বাড়ি ফিরতে পারি তবে নাইট শোতে সপরিবারে সিনেমায় যাই—মেট্রো, লাইট হাউস, নিউ এম্পায়ার, এলিট যেখানেই হোক টিকেট মিলে যায়। খেলাধূলায় আগ্রহ জেগে উঠলে হয় ক্লাবে গিয়ে ব্রীজ, পেশেন্স, ফ্লাশ খেলি অথবা টেবিল-টেনিস, লন টেনিসে সামিল হই। মাঠে গেলে ঋতু অনুযায়ী ক্রিকেট বা ফুটবল, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের (পূর্ববঙ্গ দলের নয়) ময়দানে অথবা ইডেন গার্ডেনে, হয় কর্নার কিক না হয় মিড-অন মিড-অফের ব্যূহ ভেদ করে ব্যাটস্‌ম্যানের রান করার তারিফ করি। কখনো বা রেডিও রীলেতেই তৃপ্ত থাকি এবং পেপার ব্যাক পড়তে পড়তে ঘুমের আগে ক্লাসিক্যাল গানের সর্বভারতীয় প্রোগ্রামটির সাহায্য নিই এবং সারাদিন এইভাবে ইংরেজির দাপট সহ্য করি।"[৭৯]

ইংরেজি থেকে অনূদিত শব্দ বা শব্দসমষ্টি (Translation Loan)—বাতিঘর (Light-house), সুবর্ণ সুযোগ (Golden Opportunity), আমি আসতে পারি কি? (May I come in?) ইত্যাদি। (এ বিষয়ে আগে ভাষাঋণ পর্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ৪৭০)

জার্মান থেকে জার, নাৎসি ইত্যাদি। পর্তুগিজ থেকে আনারস, আলপিন, আলকাতরা, আলমারি, পেয়ারা, সাগু ইত্যাদি। ফরাসি (French) থেকে কার্তুজ, কুপন, রেস্তরাঁ, বুর্জোয়া, প্রোলেতারিয়েৎ ইত্যাদি। স্পেনীয় থেকে কম্‌রেড (< Comarada)। ইতালীয় থেকে কোম্পানি, গেজেট ইত্যাদি। ওলন্দাজ থেকে ইস্‌কাবন, হরতন, রুইতন ইত্যাদি। রুশীয় থেকে সোভিয়েত, বলশেভিক ইত্যাদি। চীনা থেকে চা, চিনি ইত্যাদি। বর্মী থেকে ঘুগনি, লুঙ্গি ইত্যাদি। ফারসি থেকে সরকার, দরবার, বিমা, আমীর, উজীর, ওমরাহ্, বাদশা, খেতাব ইত্যাদি। আরবি থেকে আক্কেল, কেতাব, ফসল, মুহুরি, হ্‌জম, তামাসা, জিলা ইত্যাদি।

এসব শব্দ ছাড়া বাংলায় কিছু নবগঠিত শব্দ আছে। এগুলির মধ্যে কিছু হল অবিমিশ্র শব্দ। যেমন—অনিকেত, অতিরেক ইত্যাদি। আবার কিছু শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উপাদানের সংযোগে গঠিত। এগুলিকে মিশ্র শব্দ বা সঙ্কর শব্দ (Hybrid Word) বলে। যেমন—হেড (ইংরেজি) + পণ্ডিত (বাংলা) = হেড-পণ্ডিত, হেড (ইংরেজি) + মৌলবী (আরবি) = হেড-মৌলবী, ফি (ফরাসি) + বচ্ছর (বাংলা) = ফি-বচ্ছর ইত্যাদি।

৭৯। চক্রবর্তী, ড. জগন্নাথ : "বাংলা শব্দভাণ্ডার গঠনে ইংরেজির ভূমিকা" (ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ সম্পাদিত 'বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য', কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ১০০-১০১)।
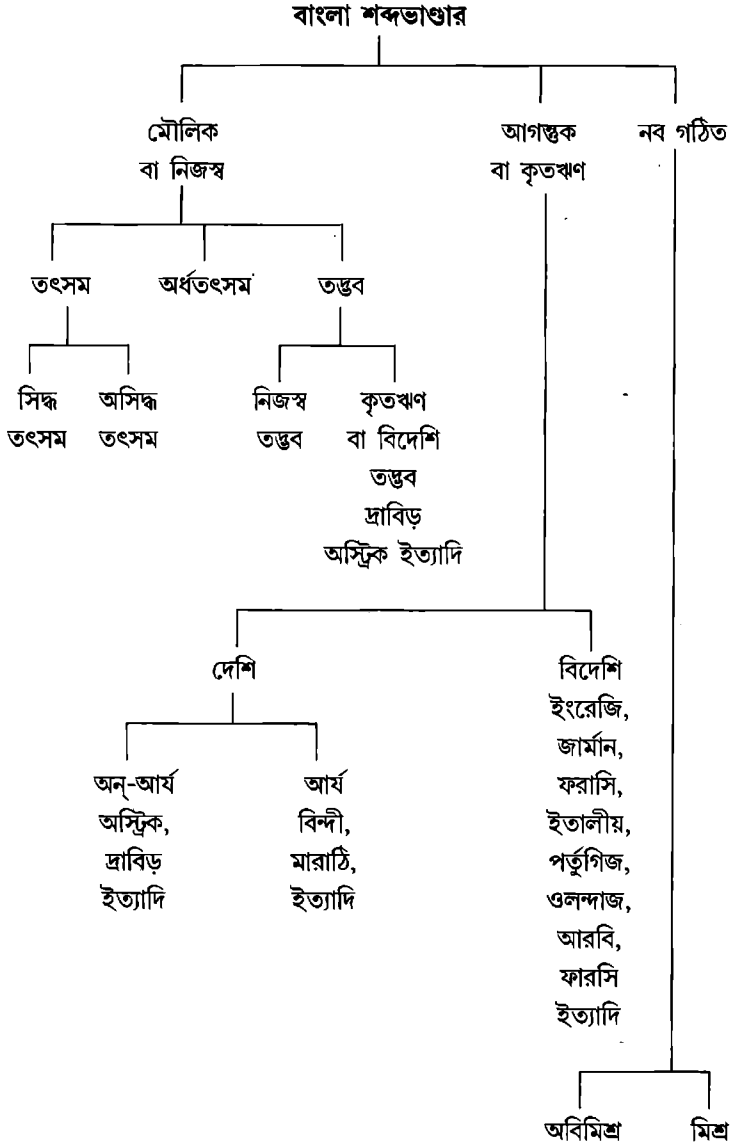
চিত্র নং ৬১ : বাংলা শব্দভাণ্ডার

॥ ৫৪ ॥

বাংলা শব্দের উৎস ও বিবর্তন

(Origin and Evolution of Bengali Words)

অপরূপ : সং অপূর্ব (পূর্ব্ + অচ্ = পূর্ব ; ন + পূর্ব = অপূর্ব) > অপুরুব (র্ব > রুব : মধ্যস্বর উ-এর আগম : বিপ্রকর্ষ / স্বরভক্তি) > অপরূপ (রুব > রূপ : লোকনিরুক্তি ; ব্ > প্ : অঘোষীভবন)।

অমিয় : সং অমৃত (মৃ + ক্ত = মৃত ; ন + মৃত = অমৃত) > অমিঅ (মৃ > মিঃ প্রাকৃতে ঋ > অ / ই / উ ; ত > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জনের লোপ) > অমিয় (য়-শ্রুতি)।

অর্ধচন্দ্র : অর্ধচন্দ্রের মতো অর্ধবৃত্তাকারে হাতের আকৃতি করে গলা ধাক্কা দেওয়াকে বলে অর্ধচন্দ্র দেওয়া অর্থাৎ তাড়িয়ে দেওয়া। এখানে আলঙ্কারিক প্রয়োগ থেকে শব্দের অর্থসংক্রম ঘটেছে।

আইচ : সং আদিত্য (অদিতি + ষ্ণ্য) > আইচ্চ (স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ বর্ণ 'দ্'-এর লোপ্ ; ত্য > চ্চ : তালব্যীভবন ও সমীভবন) > আইচ (চ্চ > চ : যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ)।

আইবুড়ো : অব্যূঢ় > *আইব্বুঢ় (আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে অ > আ। য-ফলার আগে ই-কারের আগম, যেমন বাক্য > বাইক্ক : অপিনিহিতি) > আইবুঢ় (*ব্ব্ > ব্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ) > আইবুড়ো : পদান্তিক মহাপ্রাণ ধ্বনি "ঢ়্"-এর অল্পপ্রাণীভবন। বুড়া > বুড়ো : আংশিক স্বরসঙ্গতির ফলে উআ > উও)।

আঁকশী / আঁকশি : সং আকর্ষণী (আ + কৃষ্ + ল্যুট্ = আকর্ষণ। আকর্ষণ + ঙীষ্ = আকর্ষণী) > *আকশ্শঈ (র্ষ > শ্শ : সমীভবন। ণী > ঈ : নাসিক্য ধ্বনির লোপ) > * আকশ্শী (শ্শঈ > শ্শী : সঙ্কোচন) > আঁক্শী (আ > আঁ : স্বতোনাসিক্যীভবন। ক > ক্ : আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের জন্যে মধ্যস্বরলোপ এবং দ্ব্যক্ষরতা)

আখড়া : অক্ষবাট > প্রা অক্খআড (ক্ষ্ = ক্ষ্ > ক্খ্ : সমীভবন। বা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক স্পর্শ ব্যঞ্জনের লোপ। ট্ > ড্ : ঘোষীভবন) > আখড়া (ক্খ্ > খ্ : যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ। অ > আ : ক্-এর লোপের জন্যে ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)।

আগাপাসতলা : আগাপাছতলা > আগাপাস্তলা (ছ্ > স্ : সকারীভবন = assibilation)।

আজ : সং অদ্য (ইদম্ [এই] + অহ্ন্ [দিনে] + ৭মী বিভক্তিস্থানে নিপাতনে সিদ্ধ) > প্রা অজ্জ (দ্ = দ্য্ > জ্জ : সমীভবন ও দ্-এর তালব্যীভবন) > আজ (জ্জ > জ : যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ এবং তার ফলে অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)।

আঠার : অষ্টাদশ (অষ্টাদশন্ + ডট্ পূরণার্থে) > প্রা অট্‌ঠারস (ষ্ট্ > ট্‌ঠ্ : সমীভবন। দ্ > র্ : রকারীভবন (rhotacism) > অপ অট্‌ঠারহ > বাং আঠার ট্‌ঠ্ > ঠ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ এবং তার ফলে অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন। পদান্তিক হ-এর লোপ)।

আঁঠি / আঁটি : সং অস্থি (অস্ + ক্থিন্) > অট্‌ঠি (স্থ > ট্‌ঠ্ : স্বতোমূর্ধন্যী-ভবন ও সমীভবন) > আঠি (ট্‌ঠ্ > ঠ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ এবং তার ফলে পূর্ববর্তী স্বর অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন) > আঁটি (আ > আঁ স্বতোনাসিক্যীভবন) > আঁটি (ঠ্ > ট্ অল্পপ্রাণীভবন)।

আড়াই : সং অর্ধতৃতীয় / অর্ধত্রিক (= প্রথম দু'টি সংখ্যা পুরো + তৃতীয়ের অর্ধ = আড়াই) > প্রা অড্‌ঢইঅ (র্ধ্ = র্ধ্ > ড্ঢ্ : ধ্-এর মূর্ধন্যীভবন ও পরে সমীভবন। তৃতীয় > ইঅ : তৃ, ত্, য়্-এর লোপ) বাংলা আড়াই (ড্‌ঢ্ > ঢ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ এবং তার ফলে অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন। বাংলায় স্বরমধ্যবর্তী ড্ > ড়। পদান্তিক অ-এর লোপ।)

আদিখ্যেতা : আধিক্যতা = অধিক থেকে 'আধিক্য'-ই বিশেষ্য। বিশেষ্যের সঙ্গে তা' যোগ করে আবার বিশেষ্য করার প্রয়োজন ছিল না। এটা ভুল প্রয়োগ। আধিক্যতা > আদিখ্যতা (ধ্ = দ্ + হ্ ; হ্ = মহাপ্রাণতা। এই মহাপ্রাণতা 'ধ্' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'ক্'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ক্ + হ্ = খ্। এখানে শুধু মহাপ্রাণতার বিপর্যাস হয়েছে।) > আদিখ্যেতা (খ্য > খ্যে : 'ই'-এর সঙ্গে আংশিক স্বরসঙ্গতির ফলে অ > এ)।

আনারস : পর্তুগিজ আনানস্ (annanas) > বাং আনারস (আনানস্—নস্ = আনা। আনা + রস = আনারস : বিমিশ্রণ)

আপন : সং আত্মন্ (আ + অত + মন্) > অপ্পন (ত্ম্ > প্প্ : ম্ ছিল ওষ্ঠ্য ধ্বনি, এই ম্-এর প্রভাবে ত্ ওষ্ঠ্য ধ্বনিতে পরিবর্তিত : অন্যোন্য সমীভবন) > আপন (পপ্ > প্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ এবং তার ফলে অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)

আমড়া : সং আম্রাতক (আম্র + অত + ণ্বুল্) > প্রা অম্বাডঅ (ম্র > ম্ব্ : আংশিক সমীভবন। ত্ > ড্ : র্-এর প্রভাবে মূর্ধন্যীভবন। শেষে স্বরমধ্যবর্তী একক স্পৃষ্ট ধ্বনি ক্-এর লোপ) > আমড়া (ম্ব > *ম্ম : সমীভবন > ম :

যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ এবং তার ফলে অ > আ ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)। পদান্তিক উদ্বৃত্ত স্বর অ পূর্বস্বরের সঙ্গে যোগের ফলে আ।

আমি : সং অস্মদ্ শব্দের করণকারকের বহুবচন অস্মাভিঃ > প্রা অম্‌হাহি (স্ম্ > ম্স্ : বিপর্যাস > ম্হ। ভ্ = ব্ + হ্ > হ্: ব্-এর লোপ) > অপ অম্‌হহি (হা > হ : আ-কারের ক্ষীণতা) > প্রা-বা অম্‌হে (আহ্মে, আম্ভে, অহ্মে, অম্ভে) (ই > এ : স্বরসঙ্গতি। হ্হি > হে : একটি হ্-এর লোপ : সমাক্ষর লোপ) > ম-বা আহ্মি > (হ্ম = ম্ + হ্ > ম্ : নাসিক্য ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতার লোপ। অস্মাভিঃ (বহুবচন) > আমি (একবচন) : অর্থসঙ্কোচ। অথবা বৈদিক অস্মে (সম্প্রদান / অধিকরণ) > প্রা অম্‌হে (স্ম্ > ম্স্ : বিপর্যাস। ম্স্ > ম্হ্ : স্-এর হ্-কারীভবন) > প্রা-বা অম্‌হে > ম-বা আহ্মি > আমি (হ্ম = ম্হ > ম : মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতার লোপ)।

অথবা বৈদিক ৪র্থী / ৭মীর বহুবচনের পদ অস্মে > প্রা অম্‌হে (স্ > হ্ : হ্ম > ম্হ : বিপর্যাস) > প্রা-বাং আম্‌হে / অম্‌হে > অম্‌হি > ম-বাং আহ্মি > আ-বাং আমি (হ্ম > ম্হ > ম : মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতার লোপ।

আরশি : সং আদর্শিকা (আ—দৃশ্ + ঘঞ্ + ইকা) > আঅর্‌শিআ (স্বর-মধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন দ্ ও ক্-এর লোপ) > আর্‌শি (উদ্বৃত্ত স্বর অ এবং আ-এর লোপ।

আলতা : সং অলক্তক (অলক্ত + কন্) > অলত্তঅ (ক্ত > ত্ত : সমীভবন। ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনির লোপ) > আলতা আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে আদি অ > আ। পদান্তিক উদ্বৃত্ত স্বর অ পূর্ববর্তী স্বর অ-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ + অ = আ)।

আলমারি : (পোর্তুগিজ আর্মারিও (armario) > বাং আলমারি (র্ > ল্ ; শব্দের দু'টি 'র্'-এর মধ্যে একটি 'র্' পরিবর্তিত হয়েছে 'ল্'-তে ; একে বিষমী-ভবন বলে)। এটি বাংলায় পোর্তুগিজ থেকে গৃহীত একটি কৃতঋণ শব্দ (Loanword)।

আশি / আশী : সং অশীতি (অষ্ট + দশন্ + তি) > প্রা আসীই (তি > ই : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনির লোপ) > অপ অসি (পদান্তিক উদ্বৃত্ত স্বর অ-এর লোপ) বাং আশি / আশী।

আঁশ (fibre) : সং অংশু (অন্‌শ + উ) > আঁশ (নাসিক্য ধ্বনি ং-এর লোপ এবং তার ফলে পূর্বস্বর আ-এর নাসিক্যীভবন। অন্ত্যস্বর উ-এর লোপ।)

আঁষ : আমিষ (আ + মিষ + ক) > আঁইষ (নাসিক্যব্যঞ্জন ম্-এর লোপ এবং তার ফলে পূর্বস্বর আ-এর নাসিক্যীভবন) > আঁষ (মধ্যস্বর ই-এর লোপ)।

আস্তাবল : ইং ষ্ট্যাব্‌ল্ (stable) > স্তাবল (দন্ত্য স্‌-এর প্রভাবে ট্‌-এর দন্ত্যীভবন, তার ফলে ট্‌ > ত্‌। স্তাবল > আস্তাবল : আদি স্বরাগম)।

আস্পর্ধা : সং স্পর্ধা (স্পর্ধ + অ + টাপ্‌) > আস্পর্ধা (আদি স্বরাগম)।

আস্পৃহা : সং স্পৃহা। (স্পৃহ্‌ + অঙ্‌ + টাপ্‌) > আস্পৃহা (আদি স্বরাগম)।

ইঁট : সং ইষ্টক (ইষ + তকন্‌) > ইট্‌ঠঅ (ষ্ট > ট্‌ঠ : সমীভবন। ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনির লোপ) > ইট (ট্‌ঠ্‌ > ট্‌ যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ। পদান্তিক স্বর অ-এর লোপ।) ইঁট (ই > ইঁ : স্বতোনাসিক্যীভবন)।

ইঁদারা : সং ইন্দ্রাগার > প্রা ইন্দাআর (ন্দ্র > ন্দ : র্‌-এর লোপ। গা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনির লোপ।) > ইঁদারা (নাসিক্যধ্বনি ন-এর লোপ এবং তার ফলে পূর্বস্বর ই > ইঁ : নাসিক্যীভবন। ন্দাআ > ন্দা : উদ্বৃত্ত স্বর আ পূর্ববর্তী স্বর আ-এর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ। পদান্তে আ স্বরাগম)।

ইস্কাবন / ইস্কাপন : ওলন্দাজ স্কোপেন (Schopen) > ইস্কাবন (আদি স্বরাগম)। প্‌ > ব্‌ : ঘোষীভবন।

উজবুক : তুর্কি উজবেগ > উজবুক (এ > উ : স্বরসঙ্গতি ; গ্‌ > ক্‌ : অঘোষীভবন)। মধ্যযুগে মুসলমান শাসনকালে বাংলায় উজবেকিস্তান থেকে যেসব সৈনিক এসেছিল তাদের বলা হত উজবেক। এদের দৈহিক শক্তির খ্যাতি ছিল, কিন্তু মানসিক উৎকর্ষের খ্যাতি ছিল না। সেই থেকে মানসিক উৎকর্ষহীন ব্যক্তি অর্থে উজবুক কথাটি প্রচলিত হয়। ক্রমে অর্থ দাঁড়ায় দৈহিক শক্তিসর্বস্ব বুদ্ধিহীন ব্যক্তি এবং তা থেকে অর্থ দাঁড়ায় একদম বোকা লোক। এখানে শব্দের অর্থসংক্রম হয়েছে।

উদো : সং উদ্ধব (উৎ + হু + অপ্‌) = কৃষ্ণের বন্ধু। শ্রীকৃষ্ণ যখন উদ্ধবকে ব্রজে দূতরূপে পাঠিয়েছিলেন তখন গোপীরা উদ্ধবকে উপলক্ষ করে শ্রীকৃষ্ণকে অনেক ভর্ৎসনা করেছিলেন। সেইসব ভর্ৎসনা উদ্ধব নীরবে সহ্য করেছিলেন। সেই থেকে উদ্ধব থেকে আগত 'উদো' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'নীরবে সহ্যকারী যে-কোনো বোকা লোক'। এখানে একজন ব্যক্তি থেকে যে-কোনো লোকের দিকে অর্থ প্রসারিত হয়েছে বলে এটা অর্থবিস্তারের দৃষ্টান্ত। উদ্ধব > উদ্দঅ (দ্ধ্‌ > দ্দ্‌ : সমীভবন ; ব > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > উদো (দ্দ্‌ > দ্‌ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ, মধ্যস্বর অ > ও : স্বরসঙ্গতি ; অন্ত্যস্বর অ-এর লোপ)।

উদ্বেল : সং উদ্বেল (উৎ + বেলা)। মূল অর্থ বেলাভূমি অতিক্রান্ত, কূলাতিক্রান্ত ; তা থেকে অর্থ দাঁড়িয়েছে সীমাতিক্রান্ত, উচ্ছ্বলিত। এখানে আলঙ্কারিক প্রয়োগ থেকে শব্দটির অর্থসংক্রম হয়েছে।

উনান / উনুন : সং উষ্মাপন (উষ্ + নক্ = উষ্ম। আপ + ল্যুট্ = আপন (প্রাপ্তি)। উষ্ণ + আপন = উষ্ণাপন) > উন্হাবন (ষ্ণ = ষ্ + ঞ্ > ঞ্ + ষ্ : বিপর্যাস। ঞ্ + ষ্ > ন্ + হ্ (ঞ্ স্থানে ন্ এবং ষ্ স্থানে হ্। প্ > ব্ : ঘোষীভবন) > উন্হাঅন (ব > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পৃষ্টব্যঞ্জনের লোপ) > উনান (হ্-এর লোপ, উদ্বৃত্ত স্বর অ-এর লোপ) > উনুন (স্বরসঙ্গতি)।

উবু : ঊর্ধ্ব (উৎ + হাড় + ড) > উব্‌ভ (র্ধ্ব > *ব্ব্ : পরাগত সমীভবন। ব্ব্ > ব্‌ভ্ : ধ্ থেকে মহাপ্রাণতার বিপর্যাসের ফলে দ্বিতীয় ব্ > ভ) > উভ (ব্‌ভ > ভ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ) > উভু (ভ > ভু : স্বরসঙ্গতি) > উবু (অল্পপ্রাণীভবন)।

উপুড় / উবুড় : সং উৎ + পুট (উৎ = ঊর্ধ্ব, পুট্ + ক = পুট = পাত্রবিশেষ। উৎপুট = ওল্টানো পাত্র) প্রা *উপ্‌পুড (ৎপ্ > প্‌প্ : সমীভবন) > বাং উপুড় (প্‌প্ > প্ : সমাক্ষর লোপ) > উবুড় (ঘোষীভবন)।

এগার : সং একাদশ (একাদশন্ + ডট্) > প্রা এগ্‌গারহ (ক্ > গ্ : ঘোষীভবন ; গ্ > গ্ গ্ : ব্যঞ্জনদ্বিত্ব ; দ্ > র্ : র-কারীভবন ; শ্ > হ্ : হ-কারীভবন) > প্রা-বাং এগারহ (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন) > ম-বাং, আ-বাং এগার (পদান্তিক হ-কারের লোপ)।

এয়ো : সং অবিধবা (অ + বি + ধব + টাপ্) > অইহআ (বি > ই : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ। ধ্ > হ্ : স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনির হ-কারে পরিণতি। বা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনির লোপ) > আইও (আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের জন্যে অ > আ। হ-এর লোপ। আ > ও : ই-এর প্রভাবে স্বরসঙ্গতি) > এয়ো (আ + ই = এ : সন্ধি। য়-শ্রুতি)।

এলো : সং আকুলায়িত > প্রা আউলাইঅ (কু > উ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; য়ি > ই : স্বরমধ্যবর্তী একক ধ্বনির লোপ ; ত > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; অপ আউলাইঅ > প্রা-বাং আউল (পদান্তিক স্বরের লোপ) > এলো (ল > লো : 'উ'-এর প্রভাবে স্বরধ্বনির পরিবর্তন। আ > এ : আংশিক স্বরসঙ্গতি)।

ওঝা : সং উপাধ্যায় (উপ + অধি + ই + ঘঞ্) প্রা উপাজঝাঅ (ধজ্ > জ্ঝ্ : সমীভবন ; য় > অ স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ ধ্বনির লোপ) > অপ উঅজ্‌ঝাঅ (প > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জন ধ্বনির লোপ) > প্রা-বাং উঅজ্‌ঝঅ (ঝা > ঝ : স্বরসঙ্গতি) > আ-বাং ওঝা (উ > ও : স্বরসঙ্গতি ; জ্-এর লোপ ; ঝঅ > ঝা : সঙ্কোচন) > রোজা (র্-এর আগম ; ঝ্ > জ্ : অল্পপ্রাণীভবন)।

কনে : সং কন্যা (কন্ + যৎ + টাপ্) > কনে।

কনুই : সং কফণিকা (ক + ফণ্ + ইকা) > প্রা কহণিআ (ফ্ > হ্ : স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ ধ্বনির হ-কারে পরিণতি ; কা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ ধ্বনির লোপ) > *কঅণি ('হ্'-এর লোপ) > অপ *কণই ('অ' এবং 'ই'-এর বিপর্যাস) > কনুই (ণই > নুই : স্বরসঙ্গতি)।

কলা : অস্ট্রিক কদল (কদলী) > কঅল (দ > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > কল (উদ্বৃত্ত মধ্যস্বর অ-এর লোপ) ; কল + আ = কলা।

কষ্টি : (সোনা পরীক্ষার জন্যে ঘর্ষণ-প্রস্তর, নিকষ) : √ কষ্ (ঘর্ষণ করা, পরীক্ষা করা) + ক্তিন্ = কষ্টি।

কষ্ঠী / কোষ্ঠী : সং কর্ষপট্টিকা (কৃষ্ = কর্ষণ করা, চর্চা করা) + ঘঞ্ = কর্ষী + পট্টিকা) > প্রা কস্‌সপট্টিআ / কস্‌সবট্টিআ (র্ষ্ > স্‌স্ : সমীভবন ; প্ > ব্ : ঘোষীভবন ; কা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > অপ কস্‌সবট্টিঅ (আ > অ : আদি শ্বাসাঘাতের জন্যে পদান্তিক স্বরের হ্রস্বীভবন) > *কসটি (স্‌স্ > স্ : যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ, ট্টি > টি : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ ; 'ব' ও 'অ'-এর লোপ) > কষ্টি (স্ > ষ্ মূর্ধন্যীভবন) > কষ্ঠি ; (ট্ > ঠ্ মহাপ্রাণীভবন) > কোষ্ঠী (ক > কো : স্বরসঙ্গতি)।

কাছারি : সং কৃত্যগৃহ / কৃত্য গৃহীকা > *কচ্ছঘর / *কচ্ছঘরিঅ > প্রা কচ্ছহরিঅ (কৃ > ক : ঋকার > অ-কার ; ত্য্ > চ্ছ : অন্যোন্য সমীভবন ; ঘ্ > হ্ : স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ ধ্বনির হ-কারে পরিণতি ; গৃহ > ঘর : মহাপ্রাণতার বিপর্যাসের ফলে হ-কার গ্-এর সঙ্গে যোগ হওয়ায় 'গৃ' হয়েছে 'ঘৃ' ; ঘৃ = ঘ্রি > ঘরি : বিপ্রকর্ষ) > বাং কাছারি (চ্ছ্ > ছ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ ; ক > কা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন ; হরিঅ > রি : 'হ' ও 'অ'-এর লোপ)।

কানু : সং কৃষ্ণ (কৃষ্ + নক্) > প্রা কণ্‌হ (কৃ > ক : ঋ-কার > অ-কার ; ষ্ণ > ণ্‌হ : 'ষ্'-এর হ্-কারে পরিণতি বা হকারীভবন ও 'ঞ্'-এর 'ণ্'-কারে পরিণতি : মূর্ধন্যীভবন তারপর 'হ্' ও 'ণ্'-এর বিপর্যাস) > অপ কণ্‌হ > প্রা-বাং কাহ্ন ('হ্' ও 'ণ্'-এর বিপর্যাস) > *কান (হ্ন > ন্ : যুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ ; ক > কা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন) > আ-বাং কানু / কানাই।

কাম : কর্ম (কৃ + মন কর্তৃবা) > কম্ম (র্ম = র্‌ম > ম্ম : সমীভবন) > কাম (ম্ম > ম : একটি 'ম্'-এর লোপ, অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)।

কামার (Blacksmith) : সং কর্মকার (কর্মন্ + কৃ + অণ্) > প্রা কম্মআর (র্ম্ > ম্ম্ : সমীভবন ; কা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক স্পর্শব্যঞ্জন 'ক্'-এর

লোপ) > বাং কামার (কম্ম > কাম : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন ; কাম + আর = কামার : সন্ধি)।

কাহন : সং কার্ষাপণ (কার্ষাপণ + ষ্ণ স্বার্থে) > প্রা কাহাবন / কহাবণ র্ষ্ > হ্ : 'র্'-এর লোপ এবং 'ষ্'-এর হ-কারীভবন ; প্ > ব্ : ঘোষীভবন) > বাং কাহন (হা > হ : আদি শ্বাসাঘাতের জন্যে মধ্য স্বরধ্বনির ক্ষীণতা ; স্বরমধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন 'ব্'-এর লোপ)।

কুমোর (Potter) : সং কুম্ভকার (কুম্ভ + কৃ + অণ্) > *কুম্মআর (ম্ভ > ম্ম : সমীভবন ; কা > আ স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জন-এর লোপ) > কুমার (ম্ম > ম : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ। কুম + আর = কুমার : সন্ধি ; কুমার > কুমোর : আংশিক স্বরসঙ্গতি)।

কুলুপ : আরবি কুফ্‌ল্ > *কুল্‌ফ্ (ফ্‌ল্ > ল্‌ফ্ : বিপর্যাস) > বাংলা কুলুপ (ল > লু : স্বরসঙ্গতি ; ফ্ > প্ : অল্পপ্রাণীভবন)।

কেওড়া : সং কেতক + ট (কিত + ণ্বুল্ = কেতক। কেতক + ট = কেতকট) > প্রা কেদগড় (ত্ > দ্ : ঘোষীভবন ; ক্ > গ্ : ঘোষীভবন ; ট্ > ড়্ : ঘোষীভবন) > কেঅঅড় (স্বরমধ্যবর্তী একক স্পর্শ ব্যঞ্জন 'দ্' ও 'গ্'-এর লোপ) > বাং কেওড়া (অ > ও : স্বরসঙ্গতি ; একটি 'অ'-এর লোপ)।

কেন : সং *কীদৃশন > প্রা কদিসণ (কী > ক ; দৃ > দি : ঋকারের ই-কারে পরিণতি) > কইসণ (দি > ই : স্বরমধ্যবর্তী একক স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > অপ কইহ্ণ / কেহেণ (স্ > হ্ : হ-কারীভবন ; কই > কে : অ + ই = এ স্বরসন্ধি) > প্রা-বাং কেহ্ন (হেণ > হ্ন = স্বরলোপ) > আ-বাং কেন (হ্ন > ন : অল্পপ্রাণীভবন)।

কেয়া : সং কেতক (কিত + ণ্বুল্ = কেতক) > প্রা কেদগ (ত্ > দ্ : ঘোষীভবন ; ক্ > গ্ : ঘোষীভবন) > কেঅঅ (স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন 'দ্' ও 'গ্'-এর লোপ) > কেআ (অ + অ = আ) > কেয়া (য়-শ্রুতি)।

খই : খদিকা > প্রা খইআ (দি > ই : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; কা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > বাং খই খৈ (পদান্তিক উদ্বৃত্ত স্বর 'আ'-এর লোপ)।

খাজা : সং খাদ্য (খাদ্ + ণ্যৎ) > প্রা খজ্জ (দ্য > জ্জ্ : সমীভবন) > অপ খজ্জ > বাং খাজা (জ্জ্ > জ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ ; খ > খা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)। খাদ্য > খাজা : অর্থসঙ্কোচ।

খার : সং ক্ষার (ক্ষর্ + ণ) > *ক্‌খার (ক্ষ্ > ক্‌খ্ : সমীভবন) > খার (যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ)।

খুদ : সং ক্ষুদ্র (√ ক্ষুদ্ + রক্) > *ক্খুদ্দ (ক্ষ > ক্খ্ : সমীভবন ; দ্র্ > দ্দ্ : সমীভবন) > প্রা খুদ্দ > খুদ (ক্খ্ > খ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ ; দ্দ্ > দ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ)।

খেয়া : সং ক্ষেপ (ক্ষিপ্ + ঘঞ্) > *ক্খেঅ (ক্ষ > ক্খ্ : সমীভবন) > খেঅ (ক্খ্ > খ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ) > খেয়া (য়-শ্রুতি ও অন্ত্যস্বরাগম)।

গাঁ : সং গ্রাম (গম্ + ঘঞ্ অথবা √ গ্রস্ + মন্, নিপাতনে) > প্রা গাম (র-কারের লোপ) > বাং গাঁ (ম্-এর লোপ এবং পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন)।

গাঙ্ : সং গঙ্গা (গম্ + গন্ + টাপ্ = গঙ্গা) > প্রা গঙ্ঙা (ঙ্গ্ > ঙ্ঙ্ : সমীভবন) > গাঙ্ (ঙ্ঙ্ > ঙ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ; গ > গা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)। 'গঙ্গা' শব্দে ভারতবর্ষের একটি বিশেষ নদীকে বোঝায়। কিন্তু গঙ্গা থেকে আগত বাংলা 'গাঙ' শব্দের অর্থ 'যে কোনো নদী'। এখানে শব্দের অর্থ বিস্তার ঘটেছে। আবার 'গাঙ্' শব্দে কখনো কখনো যেকোনো নদীর শুষ্ক খাতকে বোঝায়। সেখানে শব্দের আংশিক অর্থসংক্রম হয়েছে বলা যায়।

গাজন : সং গর্জন (গর্জ্ + অনট্) > প্রা গজ্জণ (র্জ > জ্জ্ : সমীভবন) > বাং গাজন (জ্জ্ > জ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ ; গ > গা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)।

গাঁঠ / গাঁট : সং গ্রন্থি (গ্রন্থ্ + ইন্) > প্রা গণ্ঠি (র-কারের লোপ, র্ এর প্রভাবে থ্-এর মূর্ধন্যীভবনের ফলে থ্ > ঠ্) > গাঁঠ (নাসিক্যব্যঞ্জন 'ন্'-র লোপ এবং তার ফলে পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন এবং পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন)।

গাধা : সং গর্দভ (গর্দ্ + অভচ্) > প্রা গদ্দহ (র্দ্ > দ্দ্ : সমীভবন ; ভ্ > হ্ : স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনির হ্-কারে পরিণতি) > অপ গদ্দহ > প্রা-বাং গাদহ (দ্দ্ > দ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ ; গ > গা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন) > আ-বাং গাধা (দহ > *ধঅ অর্থাৎ দ্ + অ + হ্ + অ > দ্ + হ্ + অ : মহাপ্রাণতার বিপর্যাস ; ধঅ > ধা : পদান্তিক স্বরের সঙ্গে পূর্বস্বরের সন্ধি অর্থাৎ অ + অ = আ)।

গামছা : গামোছা > গাম্ছা (মা > ম্ : শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের জন্যে মধ্যস্বর 'ও'-এর লোপ এবং তার ফলে দ্ব্যক্ষরতার / দ্বিমাত্রিকতার সৃষ্টি)।

গারদ : ইংরেজি গার্ড্ (guard) > গারদ (র্ড্ > রদ্ : স্বরভক্তি : র্ ও দ্-এর মধ্যে অ-এর আগম ; ড্ > দ্ : দন্ত্যীভবন)। 'গার্ড্' (guard) শব্দের অর্থ—পাহারা বা প্রহরী। বাংলা 'গারদ' শব্দের অর্থ কয়েদখানা, কারাগার। এখানে অর্থসংক্রম হয়েছে।

গিন্নী / গিন্নি : সং গৃহিণী ((√ গৃহ্ + ইনি = গৃহিন্ (গৃহস্থ) ; গৃহিন্ + ঈপ্ = গৃহিণী) > গির্‌হিণী (গৃ = [গ্রি] > গির অর্থাৎ গ্ + র্ + ই > গ্ + ই + র্ : স্বরধ্বনির বিপর্যাস) > গির্‌ণী ('হি' লোপ) > গিন্নী (র্ণ্ > ন্ন্ : সমীভবন) > গিন্নি।

গুঁই : সং গোমিক > প্রা গোমিঅ (ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > অপ গোঁবিঅ (নাসিক্য ব্যঞ্জন 'ম্'-এর নাসিক্যতার লোপ এবং পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন) > বাং গুঁই ('ব্' ও 'অ'-এর লোপ ; উচ্চস্বর 'ই'-এর সঙ্গে পূর্বস্বর 'ও'-এর আংশিক স্বরসঙ্গতির ফলে ও > উ (উ = উচ্চস্বর)।

গুয়া (betel nut) : সং গুবাক (গু + আক) (= সুপারিগাছ, সুপারি) > গুআঅ (বা > আ, ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > গুআ (অন্ত্য উদ্বৃত্ত স্বরের লোপ) > গুয়া (য়-শ্রুতি)।

গোরু : সং গোরূপ (গম্ + ডো = গো ; রূপ্ + ক = রূপ্ ; গো + রূপ = গোরূপ) > গোরূঅ (প > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > গোরু (পদান্তিক উদ্বৃত্ত স্বর 'অ'-এর লোপ)।

গোলাপ : ফারসি গুল্ + আব্ = গুলাব্ > বাং গোলাপ (উ > ও : আংশিক স্বরসঙ্গতি ; ব্ > প্ : অঘোষীভবন)।

গোসাঁই : সং গোস্বামী > গোস্‌সামী (স্ব্ > স্‌স্ : সমীভবন) > গোসাঁই (স্‌স্ > স্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ ; ম্-এর লোপ এবং তার ফলে পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন)।

গোয়াড়ি / গোয়াড়ী : সং গোপবাটিকা (গো + পা + ক = গোপ ; বাট + কণ্ স্বার্থে + আপ্ স্ত্রীং, অক-স্থানে ইক = বাটিকা ; গোপ + বাটিকা = গোপবাটিকা) > প্রা গোববাডিঅ (প্ > ব্ : ঘোষীভবন ; ট্ > ড্ : ঘোষীভবন ; কা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; আ > অ) > অপ গোঅবাডিঅ (ব > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > বাং গোয়াড়ী ('অ'-এর লোপ, স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জন 'ব'-এর লোপ, য়-শ্রুতি, পদান্তিক উদ্বৃত্ত স্বর অ-এর লোপ)।

ঘড়েল : ঘটিকাপাল (watchman) > ঘড়িয়াল (ট্ > ড্ > ড়্ : ঘোষীভবন ; কা > আ, পা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; আ + আ > আ : সন্ধি ; আ > য়া : য়-শ্রুতি) ঘড়েল (য়-এর লোপ ; ইআ > এ : সঙ্কোচন)। আগেকার দিনে ঘটিকা (ছোট ঘড়া)-র মধ্যে জল বা বালি রেখে দেওয়া হত। তার তলার ছোট ছিদ্র দিয়ে সেই জল বা বালি ধীরে ধীরে পড়ত। এই পড়া জল বা বালির পরিমাণ থেকে সময় নির্ধারণ করা হত। ঐ ঘটিকা থেকে বাংলায় এসেছে 'ঘড়ি' যা সময় নির্দেশক যন্ত্র। এখানে

অর্থসংক্রম হয়েছে। 'ঘটিকাপাল' থেকে 'ঘড়িয়াল' এবং তা থেকে 'ঘড়েল'— এখানেও অর্থসংক্রম হয়েছে। যে ব্যক্তি 'ঘটিকা' বা 'ঘড়ি'র দিকে নজর রাখে এবং সময় অনুযায়ী ঘণ্টা বাজায় সে-ই হল ঘটিকাপাল ; কিন্তু ক্রমশ অর্থ পরিবর্তনের ফলে দাঁড়িয়েছে 'সতর্ক ব্যক্তি' > 'চালাক লোক' > 'ধুরন্ধর লোক'।

ঘর : সং গৃহ (গ্রহ্ + ক) > *গরহ (প্রাকৃতে ঋ > অর) > ঘর (মহাপ্রাণতার বিপর্যাস : মহাপ্রাণ ধ্বনি 'হ্' স্থানান্তরিত হয়ে 'গ্'-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে গ্ + হ্ = ঘ্ হয়েছে ; পদান্তিক উদ্বৃত্ত স্বর 'অ' লোপ পেয়েছে)।

ঘরনী : গৃহিণী (গ্রহ + ক = গৃহ ; গৃহ + ইন্ + ঈপ (স্ত্রীলিঙ্গে) = গৃহিণী) > প্রা ঘরিণী / ঘরিণি (গৃ > গর : 'ঋ' প্রাকৃতে 'অর' হয়েছে ; মহাপ্রাণ ধ্বনি 'হ্' স্থানান্তরিত হয়ে 'গ্'-এর সঙ্গে যোগের ফলে গর > ঘর : মহাপ্রাণতার বিপর্যাস) > ঘরণী (স্বরসঙ্গতির ফলে অই > অঅ)।

ঘা : সং ঘাত (হন্ + ঘঞ্) > ঘাঅ (স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জনের লোপ) > ঘা (পদান্তিক উদ্বৃত্ত স্বরের লোপ)।

ঘি / ঘী : সং ঘৃত (ঘৃ + ক্ত) > ঘিঅ (প্রাকৃতে ঋ > ই ; ত > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > ঘি (পদান্তিক উদ্বৃত্ত স্বর 'অ'-এর লোপ)।

ঘুঁটে : ঘুন্টিক > প্রা ঘুন্টিঅ (ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জনের লোপ) > অপ ঘুণ্টিঅ > বাং ঘুঁটে (পদান্তিক উদ্বৃত্ত স্বর 'অ'-এর লোপ ; নাসিক্য ব্যঞ্জন 'ন্'-এর লোপ এবং তার ফলে পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন ; ই > এ : স্বরের অসঙ্গতি)। অথবা গোবিষ্ঠা (গম্ + ডো = গো ; বি—স্থা + ক + টাপ্ = বিষ্ঠা) > প্রা গোইট্‌ঠা (বি > ই : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; ষ্ঠ > ট্‌ঠ : সমীভবন) > গোইট্‌ঠ (পদান্তিক স্বরের হ্রস্বতা) > ঘুঁটে ('ঠ' থেকে মহাপ্রাণতা স্থানান্তরিত হয়ে 'গ'-তে যুক্ত হয়েছে, ফলে ঠ > ট, গ > ঘ ; ট্‌ঠ > ট্ যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ)।

চশমা : ফারসি চশ্‌মহ > চশমা (হ-এর লোপ ও অন্ত্যস্বর আ-এর আগম)।

চাক / চাকা : সং চক্র (কৃ + ক) > প্রা চক্ক (ক্র > ক্ক : সমীভবন) > বাং চাক (ক্ক > ক্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ ; চ > চা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন) > চাকা (অন্ত্যস্বরাগম)।

চাঁদ : চন্দ্র (চন্দ + ণিচ্ + রক্) > প্রা চন্দ > প্রা-বাং চান্দ (আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের জন্যে স্বরদৈর্ঘ্যের ফলে চ > চা) > আ-বাং চাঁদ (নাসিক্য ব্যঞ্জন 'ন্'-এর লোপ ও পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন)।

চামচা / চামচে : ফারসি চম্‌চহ্ (সং চমস্) > বাং চামচা / চামচে (ফারসি থেকে বাংলায় গৃহীত কৃতঋণ শব্দ (Loan word)। সাধারণত শব্দটির মানে

'ছোট হাতা'। এখন অর্থসংক্রমের ফলে এর অর্থ কখনো কখনো হয় 'তোষামোদকারী', 'শাগরেদ', 'তাঁবেদার'।

চারি / চার : সং চত্বারি > প্রা চত্তারি (ত্ব্ > ত্ত্ : সমীভবন) > অপ চারি (ত্ত্ব > আ : ত্ত্-এর লোপ ; চ + আ = চা) > বাং চারি > চার (অন্ত্যস্বর লোপ)।

চিড়া : সং চিপিটক্ (চি + পিট্ = চিপিট। চিপিট + স্বার্থে ক = চিপিটক) > চিইড়অ (পি > ই : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; ট্ > ড় : ঘোষীভবন) : ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > চিড়া (মধ্যস্বর 'ই'-এর লোপ ; ড় + অ = ড়া : সন্ধি)।

চিৎপটাং : চিত্রপটাঙ্গ (চিত্র + পট + অঙ্গ = চিত্রপটাঙ্গ = চিত্রপটের মতো অঙ্গ যার) > বাং চিৎপটাং (মাটির দিকে পিঠ করে চিত্রপটের মতো চিৎ হয়ে শোয়া বা পড়ে থাকা) (অর্থসংক্রম)। চিৎপটাং = অর্ধতৎসম শব্দ।

চিরতা : চিরাতিতিক্ত (চি + রক্ = চির ; অতি = অব্যয় ; তিজ্ + ক্ত = তিক্ত ; চির + অতি + তিক্ত = চিরাতিতিক্ত) > প্রা চিরাইইত্ত (তি > ই : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > অপ চিরাঅইত্ত (আই > আঅ : আংশিক স্বরসঙ্গতি) > প্রা বা চিরাইত (আঅ > আ : সন্ধি) > চিরাত (মধ্যস্বর লোপ) > চিরতা (রা > র : আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের জন্যে মধ্যস্বরের হ্রস্বীভবন ; ত > তা : পদান্তে আ যোগ)।

চুয়ান্ন : সং চতুঃপঞ্চাশৎ > চউপন্নাশ (তু > উ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) ; ঞ্চ > ন্ন : সমীভবন ; পদান্তিক ব্যঞ্জন 'ৎ'-এর লোপ) > চউআন্ন (প > অ > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ও দীর্ঘীভবন) > চুয়ান্ন।

চৌকা / চৌকো : সং চতুষ্ক (চতুঃ + কন্) > চতুহ্‌ক (ষ্ > হ্ : হ-কারীভবন) > চউক (তু > উ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; হ-এর লোপ) > চৌক > চৌকা (অন্ত্য স্বরাগম)।

ছা : সং শাবক (শব + ণ্বুল্) > *ছাবঅ (শ্ > ছ্ ; ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > প্রা ছাব (অন্ত্যস্বর লোপ) > ছাঅ (ব > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জনের লোপ) > অপ ছাঅ > বাং ছা।

ছাউনি / ছাউনী : ছাদনিকা (ছদ্ + অনট্ + কন্ + আপ্) > প্রা ছাঅনিআ দ > অ, কা > আ + স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > বাং ছাঅনি (পদান্তিক উদ্বৃত্ত স্বর 'আ'-এর লোপ) > ছাউনি (অই > উই : আংশিক স্বরসঙ্গতি)।